[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়' শ্রেণীর ও বর্ধমান
বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা' (Entrance)
পরীক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত।]

রচনা-বিতান

(আবশ্যিক বাংলা-পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস,
প্রবন্ধাবলী, ব্যাকরণ ও রচনা-শৈলী, পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ
এবং ঐচ্ছিক বাংলা-পাঠ্যসূচির অন্তর্গত
ছন্দ ও অলংকার সংবলিত)

মনোজিৎ বসু, এম্-এ
প্রাক্তন অধ্যাপক, উইমেন্‌স্ কলেজ, কলিকাতা

মেদিনীপুর বুক ডিপো :: প্রকাশক ও
:: ১২নং কর্ণ[illegible]

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীশীতলচন্দ্র চৌধুরী
মেদিনীপুর বুক ডিপো
১২, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৮
(জুলাই, ১৯৬১)

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা' বাংলা পরীক্ষার জন্য যে পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে, তদনুসারে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। আবশ্যিক বাংলা পাঠ্যগ্রন্থের আলোচনা এই জাতীয় সাহায্য-গ্রন্থের আওতায় পড়ে না ব'লে, সে-আলোচনা এতে নেই। কিন্তু, আবশ্যিক বাংলা প্রশ্নপত্রের পঞ্চাশ নম্বর নির্দিষ্ট হয়েছে (১) বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস (২০ নম্বর); (২) প্রবন্ধাবলী (১৫ নম্বর), ও (৩) ব্যাকরণ ও রচনাশৈলী (১৫ নম্বর)-র জন্য। বর্তমান গ্রন্থে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে, শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ও বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমনোজিৎ বসু, যেভাবে আলোচনা করেছেন, পরীক্ষার্থীদের কাছে তা বিশেষ সহায়ক হবে ব'লেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জাতীয় সহায়ক-গ্রন্থ শুধু যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যেই রচিত হয়েছে তা নয়, এই গ্রন্থ-পাঠে শিক্ষার্থীরা বাংলাভাষার শব্দসম্ভার, পদসম্ভার ও বাক্যসম্ভারের সঙ্গে সম্যক্‌ পরিচিত হয়ে নিজেদের সহজাত চিন্তাশক্তির বিকাশসাধনে বিশেষ সাহায্যলাভ করবেন। আবশ্যিক বাংলা পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ-সম্পর্কেও এই গ্রন্থে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, ঐচ্ছিক বাংলা পাঠ্যসূচির অন্তর্গত দুটি বিষয়, অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কেও গ্রন্থকার সরস আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, একমাত্র 'ব্যাকরণ ও রচনাশৈলী' অংশ ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সহজ, সরল, অথচ প্রাঞ্জল চলিত-ভাষায়। বিভিন্নকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে উপযুক্ত উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে যে-ভাবে তা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেই ধরনের সুপ্রযুক্ত উদাহরণ-বাহুল্য এই জাতীয় সহায়ক-গ্রন্থে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ পাঠ করলেই প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যিক বাংলা পরীক্ষার জন্য আর আলাদা ক'রে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত কোনো পুস্তক, কিংবা ঐচ্ছিক বাংলা পরীক্ষার জন্য ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ক কোনো পৃথক গ্রন্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। আশা করি, 'রচনা-বিতান' শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকমহোদয়গণের সমাদর লাভে সমর্থ হবে।

—প্রকাশক

॥ রথযাত্রা ॥
১৪ই জুলাই, ১৯৬১
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রবন্ধ-রচনা

তৃতীয় খণ্ড ঃ ব্যাকরণ ও রচনাশৈলী

চতুর্থ খণ্ড

পরিশিষ্ট

রচনা-বিতান

[প্রথম খণ্ড]

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস

[প্রথম পর্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বাংলাভাষার উদ্ভব

প্রাচীনকালে সংস্কৃত-ভাষাই ছিল ভারতীয় আর্যদের ভাষা। তার রূপ ছিল দু'টি—অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত (বা 'ছন্দস্') আর লৌকিক সংস্কৃত। ভারতীয় আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন কথ্যভাষায় সাহিত্যিক রূপের পরিচয় রয়েছে বেদমন্ত্রে। বেদের সেই ভাষাকে বলা হয় 'ছন্দস্' বা 'ছন্দোভাষা'। সেই ভাষাই কালের পরিবর্তনে সুসংস্কৃত হয়ে যে-রূপ নেয় তার নাম সংস্কৃত। সেই সংস্কৃতভাষাতেই লিখিত হয়েছে এদেশের বিভিন্ন পুরাণ, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক, এবং বিভিন্ন শাস্ত্র। ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ এবং মহাভারতও সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল এই সংস্কৃতভাষায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য-সম্রাট্‌দের সময় থেকে এদেশে আর্যদের বসতি শুরু হয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই তারা ছড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। সেকালের আর্যেরা শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা ও রাজকীয় ব্যাপারে সংস্কৃতভাষা-ই ব্যবহার করতেন। ক্রমে, কোল, ভোটতিব্বতীয়, দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্যেতর ভাষার প্রভাবে প'ড়ে সংস্কৃতভাষার একটা সহজ চলিতরূপ দেখা যায়। তার নাম দেওয়া হয় প্রাকৃত। রাজা-মহারাজা, পণ্ডিত-পুরোহিত এবং সমাজের অভিজাত-সম্প্রদায় কিন্তু প্রাকৃতভাষা গ্রহণ করেননি, প্রাকৃত তখন ছিল সাধারণ লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, সংস্কৃত তখন ছিল সাধুভাষা, আর চলিতভাষা ছিল প্রাকৃত।

আদিভাষা—সংস্কৃত

প্রাকৃতভাষা ভারতবর্ষের আর্য-অধ্যুষিত আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, এবং বিভিন্ন প্রদেশের নাম অনুযায়ী তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, মগধ-প্রদেশে প্রচলিত প্রাকৃতভাষার নাম হয় মাগধী, মগধের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রাকৃতভাষাকে বলা হয় অর্ধ-মাগধী, শূরসেন প্রদেশের (মথুরা অঞ্চলের) প্রাকৃতভাষা পরিচিত হয় শৌরসেনী নামে এবং মাহারাষ্ট্রী নামে যে-ভাষা পরিচিতি লাভ করে আসলে তা মহারাষ্ট্র-প্রদেশের প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা। দু'একটা শব্দের নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—পক্ষ (সং)>পক্‌খ (প্রা) ; অদ্য (সং)>অজ্জ (প্রা) ; শব্দ (সং)>সদ্দ (প্রা) ; উষ্ট্র (সং)>উট্‌ঠ (প্রা) ; কর্ম (সং)>কম্ম (প্রা) ; মৃত্তিকা (সং)>মট্টিআ (প্রা) ; রশ্মি (সং)>রস্‌সি বা রশশি (প্রা) প্রভৃতি। প্রধান প্রধান প্রাকৃত বলতে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী এবং অর্ধ-মাগধীকেই বোঝায়। মাহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত যেমন বৈদিক ছন্দস্-ভাষার অনুগত, শৌরসেনী-প্রাকৃত তেমনি ছিল লৌকিক সংস্কৃতভাষার অনুসারী। সংস্কৃত নাটকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের সংলাপে শৌরসেনী-প্রাকৃতের ব্যবহার আছে। মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের মতো মাগধী-প্রাকৃত কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যে তেমন সমাদর লাভ করেনি। সেকালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল মগধ নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, কামরূপ (আসাম)-বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সে-সময় ছিল মগধেরই অন্তর্ভুক্ত। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'শকুন্তলা'-নাটকে

প্রাকৃত-ভাষা প্রধানত চারটি

ধীবরের মুখে যে-ভাষার ব্যবহার করেছেন সেই-ভাষাই হ'লো মাগধী-প্রাকৃত। আর, অর্ধ-মাগধীর নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধানত জৈন-শাস্ত্রগ্রন্থে। সংস্কৃতের 'সাগর' শব্দটি শৌরসেনী বা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে যেমন হয়েছিল 'সাঅর', তেমনি অর্ধ-মাগধীতে তার রূপ দাঁড়িয়েছিল 'সায়র'-এ। এই রকমের শব্দগত পার্থক্যই বিভিন্ন প্রাকৃতের স্বরূপত্ব বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

কালক্রমে প্রাকৃত-ভাষার আরও পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতভাষাকে যেমন বলা চলে 'প্রাচীন-ভারতীয় আর্যভাষা', প্রাকৃত-ভাষাকে তেমনি পরিচিত করানো যায় 'মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা'-রূপে। এই মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃত যখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর পেরিয়ে তৃতীয় স্তরে আরও সরলরূপে দেখা দিল, তখন তার নাম হ'লো **অপভ্রংশ**। এই রকমের একটি প্রাদেশিক অপভ্রংশ (বা মাগধী-অপভ্রংশ) ভাষা থেকেই বাংলাভাষার জন্ম। বাংলাভাষা ঠিক কবে অপভ্রংশের জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তা সুনির্ধারিত না হলেও, ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতেই বাংলাভাষা মাগধী অপভ্রংশ থেকে পৃথক হয়ে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাভাষাকে তাই আজ আমরা প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো ভাষা বলতে পারি। বাংলাভাষার মতো 'অসমীয়া', 'ওড়িয়া', 'মগহী', 'মৈথিলী' ও 'ভোজপুরিয়া' ভাষাও মাগধী-অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া-কে যেমন পূর্বী-মাগধী-অপভ্রংশের বংশধর বলা যায়, মৈথিলী, ও ভোজপুরিয়াকে তেমনি বলা চলে পশ্চিমী-মাগধী-অপভ্রংশের উত্তরাধিকারী। আর, কেন্দ্রীয়-মাগধী-অপভ্রংশ থেকে মগহী-র উৎপত্তি। মগহী, মৈথিলী, আসলে বিহার অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দীভাষার নামান্তর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র শৌরসেনী-অপভ্রংশ ছাড়া অপর কোনো প্রাদেশিক প্রাকৃতের অপভ্রংশের রূপ-নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না। শৌরসেনী-অপভ্রংশ একটা সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছিল ব'লেই বোধ করি নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বাংলাভাষার আদিযুগের সাহিত্য ব'লে স্বীকৃত যে বৌদ্ধ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' তা প্রধানত শৌরসেনী-অপভ্রংশ দ্বারাই প্রভাবান্বিত।

অপভ্রংশ ভাষা—বাংলাভাষার উদ্ভব

(ক) চর্যাপদ

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বাংলাভাষার আদিযুগ খ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১৩-শ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগের বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা মহাযানপন্থী বাঙালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের সাধন-সংকেত সমন্বিত সঙ্গীতাবলী (সাধারণভাবে যাকে বলা হয়—**চর্যাপদ**)। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অমূল্য সাহিত্যকীর্তির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থশালায়। পরে তিনি এই চর্যাপদাবলীর পাঠোদ্ধার ক'রে 'টীকা-টিপ্পনী' সমেত একখানি বই ছাপান। তা থেকেই আমরা পরিচিত হই বাংলাভাষার আদিরূপের সঙ্গে। বৌদ্ধ যুগে নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সম্ভবতো, সেই

'চর্যাপদ'—বাংলাভাষার আদিযুগের নিদর্শন

সূত্রেই বাঙালী সাধকদের রচিত ঐ পুঁথি নেপালে চ'লে যায়। শাস্ত্রী-মহাশয় চর্যাপদ-এর যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন তার মধ্যে মোট সাতচল্লিশটি বৌদ্ধ গান ও দোঁহা স্থান পেয়েছে। ঐ সব গান ও দোঁহার রচয়িতা ব'লে যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন—লুইপাদ, কাহ্নপাদ বা কানুপা, ভুসুকুপাদ, কুক্কুরীপাদ প্রভৃতি। চর্যাপদের ভাষা এইরকম—

(১) কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পাইঠো কাল॥

[আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করলে হবে—কায়ারূপ তরুবর পাঁচ তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে প্রবেশ করে কাল॥ অর্থাৎ, শরীররূপ গাছের পাঁচটি শাখা বলতে বোঝাচ্ছে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে। আর, চিত্ত যখন সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন কাল বা শমনরূপ মৃত্যু এসে শরীরকে অধিকার করে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বশীভূত মানুষ যে ক্রমশ মৃত্যুপথে অগ্রসর হয়, পদকর্তা এখানে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।]

(২) ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥
ধার্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোক নিভর তরই॥

[আধুনিক বাংলায় ঢেলে সাজলে হবে—গহন ভবনদী গম্ভীর বেগে বহে। মাঝে থই নাই, দুই তীরে পঙ্ক রহে॥ চাটিল ধর্মের তরে সাঁকো দিল গড়ি। পারগামী লোক যায় তাতে ভর করি॥

অর্থাৎ, সংসার-কে এখানে সুগভীর এক নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে-নদী এমন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে যে পার হবার উপায় নেই। সেই সংসার-নদীতে হাবুডুবু খেয়ে যে-সব মানুষ পরপারে যাবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, ধর্মাচার্য চাটিল তাদের ধর্মানুশীলনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। ধর্মাচরণকে এখানে বলা হয়েছে মোক্ষ-লাভের সাঁকো। মানুষ যদি মুক্তি পেতে চায় সেজন্য ধর্মানুশীলন করুক, এই কথাই বলতে চান বৌদ্ধ পদকর্তা।]

(৩) উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী॥

[উচা = উঁচু ; পাবত = পর্বত ; তঁহি = সেখানে ; বসই = বাস করে ; সবরী-বালী = শবরীবালা অর্থাৎ ব্যাধকন্যা ; মোরঙ্গি = ময়ূর ; পীচ্ছ = পুচ্ছ ; পরহিণ = পরিহিত ; গিবত = গ্রীবায় বা গলায় ; গুঞ্জরীমালী = গুঞ্জামালা। তাহ'লে আধুনিক বাংলায় এর রূপ দিলে হবে—উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরীবালা। ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত শবরীর গলায় গুঞ্জামালা।]

চর্যাপদের এই ভাষাকে পুরোপুরি বাংলাভাষা ব'লে চিনতে কষ্ট হয় ব'লেই, ভাষাবিশেষজ্ঞরা এই ভাষাকে বলেছেন সান্ধ্যভাষা অর্থাৎ, সন্ধ্যাকাল যেমন দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ, এই সান্ধ্যভাষাও তেমনি অপভ্রংশ ও আধুনিক ভাষার মিলনমুহূর্তের

ভাষা। আধুনিক যে-কোনো ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভাষা এইভাবেই ক্রমশ বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আত্মবিকাশ করে। চর্যাপদের প্রত্যেকটি পদই রহস্যপূর্ণ ; অর্থাৎ, বাইরে তার একটা সাংকেতিক ছদ্মবেশ, ভিতরের নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যেই এইসব আধ্যাত্মিক পদ রচিত হয়েছিল।

আদিযুগের অন্যান্য সাহিত্য-নিদর্শন

চর্যাপদ ছাড়া, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বাংলার আর যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা রয়েছে সর্বানন্দ বন্দ্য নামক জনৈক বাঙালী পণ্ডিতের লেখা 'টীকাসর্বস্ব' নামে অমরকোষের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত প্রায় তিনশ' শব্দে। তাছাড়া, তুর্কীবিজয়ের পূর্বযুগের সংস্কৃত-প্রত্নতত্ত্বলিপিতে এমন কতকগুলি জায়গা ও লোকের নাম পাওয়া যায় যে-সব নামের সঙ্গে বাঙালী নামের অনেক মিল আছে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণ' (ধর্মপূজার ইতিহাস ও পদ্ধতি সম্পর্কিত একখানি গদ্যগ্রন্থ), নাথ সম্প্রদায়ের 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' এবং 'ময়নামতীর গান' বা 'গোপীনাথের গান' প্রভৃতিকেও আদিযুগের সাহিত্য-নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়।

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মধ্যযুগের আদিপর্ব ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

মধ্যযুগের বাংলাভাষা বলতে বোঝায় আনুমানিক ১৪-শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ শতাব্দীর বাংলাভাষা। কিন্তু, আদিযুগের শেষ একশ' বছর ও মধ্যযুগের প্রথম একশ' বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য রচিত হয়েছিল কিনা তার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু, ১৫শ-শতাব্দী থেকে বাংলাভাষা যে ক্রমোন্নতিমূলক সাহিত্যের পথ ধ'রে অগ্রসর হয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করেছে। ১৫-শ শতাব্দী পর্যন্ত যে-যুগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তা আদি-মধ্যযুগ। এই যুগের সাহিত্য গীতিকবিতা ও আখ্যানমূলক কাব্যের রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়কার যে-সব সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-ই নানাদিক থেকে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে। বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে-পুঁথি বাঁকুড়া-জেলার এক নিভৃত পল্লী থেকে উদ্ধার করেন তাতে গ্রন্থের কোনো নাম ছিল না। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাহিনী অবলম্বন ক'রে পুঁথিখানি রচিত হয়েছিল ব'লে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তার নাম দেন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই পুঁথি ঠিক কবে লিখিত হয়েছিল তার সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, নানাদিক থেকে বিচার ক'রে ভাষা-গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৫-শ শতাব্দীর বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস খুব সম্ভবতো বীরভূম জেলার লোক ছিলেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন তিনি ছিলেন বাঁকুড়াজেলার অধিবাসী। তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিলেন বাসুলী। বীরভূমের নান্নুর-গ্রামে এবং বাঁকুড়ার ছাতনা-

গ্রামে এখনও বাসুলী-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই নান্নুর-গ্রাম বা ছাতনা-গ্রাম বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল, না পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেননি। দানবীয় শক্তিতে বলীয়ান মহারাজ কংসের অত্যাচারে যখন পৃথিবীর মানুষেরা উৎপীড়িত, সে-সময় ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন কংস-বধ ক'রে পৃথিবীকে অন্যায় ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীরাধাও অবতীর্ণা হন সে-সময়। সেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বারোটি খণ্ডে বিস্তৃত এক কাব্য-কাহিনী রচনা করেন বড়ু চণ্ডীদাস। দেবদেবীকে কেন্দ্র ক'রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আখ্যানভাগ রচিত হ'লেও, এর মধ্য দিয়ে কবি তৎকালীন সমাজের একটা পরিচয়ও দিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে যে গ্রাম্যতা দোষ ও অমার্জিত রুচির পরিচয় মেলে তা সাহিত্য-ধর্মের শালীনতা-বিরোধী হ'লেও বাস্তবধর্মের পরিচায়ক। সে-কালের বাঙালীসমাজে ঐরকমের যে রুচিবিকার ছিল কবি সম্ভবতো তাঁর শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের কথা চিন্তা ক'রেই তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। যুগধর্মকে একেবারে অস্বীকার করা কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে কবি যে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। ছন্দে, অলঙ্কারে ও রসঘন ভাবের মাধুর্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অনেক পদ শ্রীমণ্ডিত। নিদর্শনস্বরূপ এখানে দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

(১) কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোর আউলাইল রন্ধন॥

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শ্রীরাধার ব্যাকুলতাই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে। সহচরী বৃদ্ধা বড়ায়িকে উদ্দেশ ক'রে শ্রীরাধা বলছেন—কালিন্দী (কালিনী) নদীর কূলে (নইকুলে) কে যেন বাঁশি বাজায় (বাএ)? এই গোকুলের গোষ্ঠে (গোঠে) কে যেন বাঁশি বাজায়? বাঁশির সেই সুর শুনে শরীর আমার (মোর) আকুল হচ্ছে, মন হচ্ছে ব্যাকুল (বেআকুল); বাঁশি শব্দে (শবদে) আমার রান্নাবাড়া সব পণ্ড হয়ে গেল (আউলাইল=এলাইয়া পড়িল)। [বড় আই বা আইমা (অর্থাৎ দিদিমাতুল্য কেউ) অর্থেই বড়ায়ি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।]

(২) দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও
তভোঁ বিরহ না টুটে॥
মেদিনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত রাধাবিরহের একটি করুণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে। বড়ায়িকে উদ্দেশ ক'রে শ্রীরাধা বলছেন—দিনের সূর্য (সুরুজ) পুড়িয়ে মারে, রাত্রেও (রাতিহো) এই দুঃখ (দুখ) চাঁদের (চান্দে) জন্য। এই বিরহ-যন্ত্রণা কেমন ক'রে (কেমনে) সইব (সহিব) বড়-আই ? চোখে (চখুত) নিদ্রা (নিন্দে) আসে না (নাইসে=না+আইসে)। শীতল চন্দন অঙ্গে (আঙ্গে) বুলিয়ে দিচ্ছি (বুলাও), তবু (তভোঁ) বিরহ-যন্ত্রণায় উপশম হয় না (না টুটে)! বড়-আই, এখন মেদিনী বিদীর্ণ (বিদার) হোক, আমি তাতে আত্মগোপন করি (লুকাওঁ)।

চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে যে-সব সুমধুর কবিতা প্রচলিত আছে সেগুলি কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়। সে-সব পদ চৈতন্য-সমসাময়িকযুগের বা চৈতন্য-পরবর্তীযুগের অন্য কোনো এক বা একাধিক চণ্ডীদাস নামধেয় কবির রচনা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের আদিপর্ব বা আদি-মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য যে-সব সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'কৃষ্ণায়ন' (বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়) এবং কানা হরিদত্তের ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা-মঙ্গল'। এর পর ১৬শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ শতাব্দী পর্যন্ত এই তিনশ' বছর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগ বা মধ্যযুগের শেষ পর্ব।

মধ যুগের অন্ত্যপর্ব

এ যুগেই রচিত হয় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, সুমধুর বৈষ্ণব-পদাবলী, শাক্তপদাবলী ও অনুবাদিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ। পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শাক্ত-পদকর্তা রামপ্রসাদ, মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ঘনরাম এবং রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা, মহাভারত-অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবি এই যুগের। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বন ক'রেও অনেকগুলি জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এই সময়ে। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। অন্ত্য-মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি হলেন রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। তাঁর পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরু।

১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গেই গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে ব্যাপকভাবে। বাংলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-ই বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। বাংলাসাহিত্যে সাধু গদ্যভাষার আদর্শ স্থাপনে যেমন

বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগ—গদ্যরচনার উদ্ভব, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতির উন্নতি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি, তেমনি চলিত গদ্যভাষার প্রবর্তনে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের উদ্যমও স্মরণযোগ্য। তাঁর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই বাংলাভাষার আদি উপন্যাস বলা হয়। খাঁটি উপন্যাস না হ'লেও এই গ্রন্থে উপন্যাসের বহু লক্ষণ যে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁদের দান অমূল্য ব'লে স্বীকৃতিলাভ করেছে তাঁরা হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার দানও অনস্বীকার্য। বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-সাহিত্য-পত্রিকা হ'লো গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাঙাল গেজেটি' (বেঙ্গল গেজেট) এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্র মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন'। এর পর যে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তার নাম 'সমাচার দর্পণ'। এটিও সম্পাদনা করেন মার্শম্যান। সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাসে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার ফলেই উনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যে নবজাগরণের প্রথম সোপান রচিত হয়। তখনকার দিনের নামকরা সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ছিলেন 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর লেখক। গদ্যসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতিও লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম অভিনীত নাটকটির নাম 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। বাংলাসাহিত্যের আসরে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সমসাময়িক। কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদনের দান আজও বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে। তাঁর 'মেঘনাদ-বধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্য এবং 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী, প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়েই তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের পর বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাঁরা হলেন—'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র; 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'চৈতন্যলীলা', 'জনা' প্রভৃতির নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ; 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবারপতন', 'নূরজাহান', 'সাজাহান' প্রভৃতি নাটক-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; এবং 'নরনারায়ণ', 'আলমগীর', 'আলিবাবা', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। উনবিংশ শতকের কাব্য-সাহিত্য যে-ধারায় প্রবাহিত হয় তার আমূল পরিবর্তন ক'রে সারা বিশ্বে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পূর্বে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের আবির্ভাব হয়। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', হেমচন্দ্রের 'বীরবাহুকাব্য' ও 'বৃত্রসংহার' এবং নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র পথপ্রদর্শক হিসাবে স্মরণীয় হ'লেও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি নিয়ে তিনি সাহিত্য-

জগতে উদিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়—'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উপন্যাস লিখে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' প্রভৃতির লেখক প্রতিভাধর রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও করতে হয়। উপন্যাস রচনা ক'রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধি লাভ করলেও, তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প রচনার পথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রযুগে ঔপন্যাসিক হিসাবে যিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি হলেন বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির দান অপরিসীম।

সমগ্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এককভাবেই এক বিরাট অধ্যায়। মূলত কবি হিসাবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করলেও, সাহিত্যের এমন দিক নাই, যেখানে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শ পড়েনি। কবি রবীন্দ্রনাথ বড়, না গীতিকার রবীন্দ্রনাথ বড় সে-মীমাংসা আজও হয়নি। কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে—এককথায় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পৃথিবীর যে আটটি প্রধান ভাষায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বাংলাভাষা তাদের মধ্যে একটি। আর সে-ভাষার আজ যে এমন উন্নতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অবিস্মরণীয় দান। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব একহাজার বছর পূর্বে হ'লেও, সত্যিকারের গর্ব করবার মতো যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার বয়স এখনও শতবর্ষ অতিক্রম করেনি।

রবীন্দ্রনাথের দানে সমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্য

অনুশীলনী

১। বাংলাভাষার উদ্ভব কিভাবে হয় তাহা বর্ণনা কর।

২। বাংলাভাষার আদিযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৪। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ব্যতীত আর কী উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-নিদর্শন আছে?

৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মঙ্গলকাব্য

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য প্রধানত তিনপ্রকার সাহিত্যের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অনুবাদ-সাহিত্য, লৌকিকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের মূল্যবান সৃষ্টিগুলি এই যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ভাণ্ডারকে বিশেষভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছে। লৌকিকসাহিত্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যই প্রধান। মানুষের সহজাত দুর্বলতা থেকে যে-সব লৌকিক দেবতার সৃষ্টি হয়, মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেইসব দেবতার গুণকীর্তন বা মাহাত্ম্যপ্রচার করা হয়েছে। এই সব লৌকিক দেবতার মধ্যে যেমন আছেন মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর, তেমনি আছেন শিব, শীতলা, সূর্য, শনি, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবী। তবে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের মঙ্গলগানই জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ সার্থকতালাভ করেছে।

লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক কাব্য

'মঙ্গল'-শব্দের অর্থ কল্যাণ বা শুভ। অর্থাৎ, মঙ্গলকাব্য এমন একশ্রেণীর কাব্য যার রচনা, পাঠ ও শ্রবণ কল্যাণকর, এইরূপ একটা বিশ্বাস থেকেই এই জাতীয় নামকরণ হয়েছে। 'মঙ্গলকাব্য' এই নামকরণের সার্থকতা অনেকখানি। দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারই যখন এই শ্রেণীর কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন একে একরকমের মঙ্গলগানই বলা চলে। প্রথমত, এতে ধর্মের পুণ্যলাভ, দ্বিতীয়ত এই শ্রেণীর আখ্যানমূলক কাব্যপাঠে দেবতার আশীর্বাদলাভ—তাতে ব্যক্তি ও পরিবার উভয়েরই মঙ্গল। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় এই জাতীয় কাব্যের উৎপত্তি, তাই নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্য।

ঠিক কবে ও কি কারণে মঙ্গলকাব্য-রচনার সূত্রপাত হয় সে-কথা বলা শক্ত। সম্ভবতো দেশে যখন পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, অনার্য সমাজে লৌকিক দেবদেবীর আবির্ভাব হচ্ছিল, মঙ্গলকাব্য-রচনার সূত্রপাত তখন থেকেই। কিন্তু, এ-সম্পর্কে সাহিত্য-গবেষকরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেননি। তবে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যে এদেশে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল 'মনসামঙ্গল-'ই তার প্রমাণ। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা 'মনসামঙ্গল'-কেই প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশের লোকসমাজে সর্পের দেবী মনসা যে লৌকিক প্রাধান্যলাভ করবে তা খুবই স্বাভাবিক।

আদি মঙ্গলকাব্য

(ক) মনসামঙ্গল

বাংলাভাষায় মনসামঙ্গল-কাব্য রচনা করেছেন অনেকে। সব মনসামঙ্গলের আখ্যানভাগ প্রায় একইরকম। মনসাদেবীর প্রতি শিবভক্ত চাঁদসদাগরের বিরূপতা এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে তিনি তাঁর পূজা করলে সমাজে মনসাপূজার প্রচলন হয়—মনসামঙ্গল-কাব্যের প্রধান উপজীব্য তাই।

মনসা শিবের কন্যা। তাঁর জন্ম হয় এক পদ্মবনে। সেইজন্য তাঁর অপর একটি নাম পদ্মা। নাগলোকে লালিত-পালিত হয়ে তিনি একদিন সর্পকুলের রানী হয়ে বসেন। শিব তাঁকে একসময় কৈলাসে নিয়ে গেলে চণ্ডীদেবী ক্রুদ্ধ হয়ে মনসার এক চোখ কানা ক'রে দেন। ফলে, মনসার পক্ষে কৈলাসে থাকা আর সম্ভব হয় না। তাঁর বিয়ে হয়েছিল জরৎকারু নামে এক মুনির সঙ্গে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী

কিন্তু, পুত্র আস্তীক জন্মাবার পর, জরৎকারুও মনসাকে ত্যাগ ক'রে তপশ্চর্যার জন্য দূরে চ'লে যান। একদিকে পিতৃগৃহে ঠাঁই হ'লো না, অন্যদিকে স্বামীসুখ থেকেও বঞ্চিতা হলেন তিনি। কাজেই, মনে মনে মনসার তখন ক্ষোভের আর অন্ত রইল না। চণ্ডী ও শিবের অবহেলাই তাঁকে বিশেষ ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যেমন ক'রেই হোক মর্ত্যে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে এবং তার ফলে যখন মর্ত্যের মানুষ চণ্ডী ও শিবকে ভুলে মনসার পূজা করবে তখনই তিনি শান্তি পাবেন, সেই সঙ্গে চণ্ডীর অপমানজনক আচরণেরও যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মনসাদেবী নিজের মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রচলনের উদ্দেশ্যে মর্ত্যে এসে দেখলেন চম্পকনগরে চন্দ্রধর বা চাঁদবেনে নামে এক সদাগরের খুব প্রতিপত্তি। ধনে, মানে প্রতিপত্তিতে সে-সময় চাঁদসদাগরের সমান আর কেউ ছিল না। কাজেই মনসাদেবী দেখলেন যে, এমন লোককে দিয়ে যদি তিনি নিজের পূজা প্রচলন করাতে পারেন, তাহ'লে অতি সহজেই সমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হ'তে পারবে। তিনি তখন চাঁদসদাগরের কাছে গিয়ে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। কিন্তু, সে-সময় মহাজ্ঞানের দ্বারা চাঁদ তাঁর পূর্বজন্মের কথা সব জানতে পেরে মনসার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেন এবং সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, চাঁদসদাগরের রাজত্বে বাস ক'রে কেউ মনসার পূজা করতে পারবে না। পূর্বজন্মে চন্দ্রধর একদিন যখন স্বর্গোদ্যানে শিবপূজার জন্য ফুল তুলতে যান সে-সময় তাঁর সঙ্গে একচক্ষু মনসার দেখা হয়। চন্দ্রধরের ভয়ে সাপেরা তখন মনসাকে পরিত্যাগ ক'রে দ্রুত পলায়ন করে। মনসা সে-সময় স্বভাবতই চন্দ্রধরের প্রতি বিরূপ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলেই চন্দ্রধরকে পৃথিবীর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অভিশপ্ত হবার সময় চন্দ্রধরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সাপের শত্রু হয়েই জন্মগ্রহণ করবেন।

চাঁদসদাগর শিব ছাড়া অন্য কোনো দেবতার পূজা করতেন না। মনসা যখন তাঁর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন, তখন স্বামীর অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে সদাগর-পত্নী সনকা গোপনে গোপনে মনসার পূজা আরম্ভ করেন। কিন্তু, চাঁদসদাগরের কাছে তিনি ধরা প'ড়ে যান। চাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে পূজার সমস্ত জিনিস পদদলিত ক'রে স্ত্রীকে নিষেধ ক'রে দেন যে, চন্দ্রবংশে কখনও মনসাপূজা হ'তে পারবে না। চরম অপমানিত বোধ ক'রে মনসা তখন চাঁদসদাগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শত্রুতায় লিপ্ত হন। চাঁদের বাগানবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, তাঁর ছয়পুত্র বাণিজ্য করতে গিয়ে মনসার কোপে জলমগ্ন হয়। চাঁদসদাগর তাতে এতটুকু বিচলিত হন না।

তিনি মহাজ্ঞান-মণি বা দৈবশক্তির দ্বারা জলমগ্ন ছয়পুত্রকে আবার বাঁচিয়ে তোলেন এবং বাগানবাড়িরও পুনরুদ্ধারসাধন করেন। মনসা তখন উপায়ান্তর না দেখে এক হীন ছলনার মাধ্যমে চাঁদকে বশীভূত ক'রে তাঁর দৈবশক্তিরূপী মহাজ্ঞানমণি হরণ ক'রে নেন এবং সেই সঙ্গে চাঁদের দুর্দশার দিন আসে। তাঁর ছয়পুত্র আবার মারা যায় এবং বিষয়সম্পত্তিও যায় নষ্ট হয়ে। তথাপি শিবভক্ত চাঁদসদাগর নিজ-সংকল্পে অটুট থাকেন এবং যে-হাতে তিনি শিবের পূজা করেন সে-হাতে কখনও 'চেঙ্‌মুড়ী কানী' মনসার পূজা করতে পারবেন না ব'লে ঘোষণা করেন।

বিষয়সম্পত্তি যাতে আবার হয়, চাঁদসদাগর সেই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যে যাত্রা করলেন। সে-সময় স্ত্রী সনকা ছিলেন গর্ভবতী। বাণিজ্যের নৌকাবহর নিয়ে চাঁদ যখন মাঝ-সমুদ্রে, মনসাদেবী তখন তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে চাঁদকে উপদেশ দিলেন তাঁর পূজা করতে, নতুবা পরিণাম যে আদৌ শুভ হবে না সে ভয়-ও দেখালেন। সংকল্পে অটল চাঁদ কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে গালাগালি দিয়ে বিতাড়িত করলেন। এর ফলে, প্রচণ্ড এক ঝড়ে চাঁদের চৌদ্দডিঙা সমুদ্রে ডুবে যায় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে তীরে ওঠেন। তারপর সুদীর্ঘ বারোটি বছর কেটে যায় দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে, অনাহারে, অনিদ্রায়, নিদারুণ দুঃখকষ্টে। বারো বছর পরে চাঁদ দেশে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর স্নেহে লালিতপালিত হয়ে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র (বা লক্ষিন্দর) সুন্দর এক কিশোরে পরিণত হয়েছে। লক্ষিন্দর বড় হ'লে তিনি তাঁকে সায়বেনের এক সর্বসুলক্ষণা কন্যা বেহুলার সঙ্গে বিবাহ দেন। লক্ষিন্দরের ভাগ্যে যে বিবাহের রাত্রেই সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে লেখা ছিল, সে-কথা চাঁদসদাগর জানতেন। কিন্তু, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই, বিয়ের রাতটুকু যাতে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যায় সেজন্য তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। লোহার এক বাসরঘরে তিনি নব-দম্পতির থাকবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, লোহার সেই বাসর-ঘর তৈরি করবার সময়, মনসার কোপে ভীত হয়ে, কর্মকার একজায়গায় যে ছিদ্র রেখে দেয় তাই হয় লক্ষিন্দরের কাল। সেই ছিদ্রপথে কালনাগ বাসরঘরে প্রবেশ করে এবং ঘুমন্ত বেহুলার অসতর্কতার সুযোগে লক্ষিন্দরকে দংশন ক'রে পালিয়ে যায়। এর আগে অবশ্য বেহুলা কয়েকটি সাপকে দুধকলা দিয়ে বশীভূত ক'রে বন্দী করেছিল। কিন্তু, শেষরাত্রের দিকে মায়াঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ায় অঘটন ঘটে যায়, লক্ষিন্দর মারা যায়। সে যাই হোক, বেহুলা তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে, স্বামীর শব এক ভেলার উপরে চাপিয়ে, স্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথে নানারকম বিপদ-আপদ দেখা দেয় এবং নানা প্রলোভন উপস্থিত হয়। কিন্তু, সতী নারী বেহুলা সবকিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে স্বর্গরাজ্যের রজকিনী ও দেবী মনসার সহচরী নেতার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর, সেই নেতার সাহায্যেই বেহুলা স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে নিজের অপরূপ নৃত্য পরিবেশন ক'রে দেবতাদের মনোরঞ্জন করে। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বেহুলাকে বর-প্রার্থনা করতে বলেন। বেহুলা তখন চিরসধবা থাকার বর প্রার্থনা করে এবং তার সে-প্রার্থনা সফল হয়। শিবের

আদেশে লক্ষিন্দরকে পুনর্জীবিত করেন মনসা এবং চাঁদসদাগরের অন্যান্য পুত্রও প্রাণ ফিরে পেয়ে বেঁচে ওঠে। বেহুলার প্রার্থনামতো মনসাদেবী চাঁদসদাগরকে তাঁর বাণিজ্যের নৌকা, জিনিসপত্র ও ধনরাশি সব ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধেই চন্দ্রধর মনসাপূজায় সম্মত হন, কিন্তু পূজা করেন বাঁ হাতে। সেই থেকেই মর্ত্যলোকে মনসাপূজা প্রচলিত হয়।

॥ মনসামঙ্গল-রচয়িতা ॥

বাংলাসাহিত্যে যতগুলি 'মনসামঙ্গল'-কাব্য আছে তার মধ্যে কানা হরিদত্তের 'মনসামঙ্গল'ই সবচেয়ে প্রাচীন। 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের অন্যতম রচয়িতা বিজয় গুপ্তই এ-কথা স্বীকার ক'রে বলেছেন—

হরিদত্তের 'পদ্মাপুরাণ'

"মূর্খ রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥"

হরিদত্তের মনসামঙ্গল-পুঁথি আবিষ্কৃত হয় মৈমনসিংহ জেলায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, হরিদত্ত শ্রীচৈতন্যের জন্মের অন্তত দু'শ বছর আগে (১৩-শ শতাব্দীর শেষভাগে) মৈমনসিংহ-অঞ্চলের কোনো জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই, তাঁর রচনা যে ১৪-শ শতাব্দীর প্রথমদিককার সে কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে। হরিদত্তের কাব্যে শুধু যে তাঁর কবিত্বশক্তিই প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, চরিত্র-চিত্রণের বিশেষ ক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে একজন পণ্ডিত ছিলেন তাও বোঝা যায় তাঁর কাব্য পাঠ করলে; তাঁর মনসামঙ্গল 'পদ্মাপুরাণ' নামেই অভিহিত। পদ্মা যে মনসাদেবীর অন্য নাম সে-কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। হরিদত্তের বর্ণনাশক্তি ছিল অপূর্ব। মনসাদেবীর সর্পসজ্জা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

"অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালী কাছুনি ॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি ॥"

পূর্ববঙ্গের অন্যতম কবি নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ'-এর নাম করতে হয় এর পরেই। তিনিও ছিলেন মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী এবং সংস্কৃত ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। নারায়ণ দেবের কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের গুণেই তাঁর মনসামঙ্গল-কাব্য পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আসাম-অঞ্চলেও তাঁর কাব্যখানি সমাদর লাভ করে। করুণ-রসের বর্ণনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, তাঁর বাস্তব-চেতনাও ছিল প্রশংসনীয়। সর্পদষ্ট লক্ষিন্দর যেখানে নিদ্রিতা বেহুলাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলছেন নারায়ণ দেবের বর্ণনায় করুণ-রস সেখানে যেন পরম উৎকর্ষতালাভ করেছে। কবি লিখেছেন:

নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ'

"ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও ॥

তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রতফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লখিন্দর॥"

নারায়ণ দেব কিন্তু 'পদ্মাপুরাণ' নাম না দিয়ে তাঁর কাব্য-পুঁথির নাম দিয়েছিলেন 'পদ্মপুরাণ'। পূর্ববঙ্গে 'পদ্ম' বা 'পদ্মা'-ই মনসাদেবীর প্রচলিত নাম।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'

চৈতন্য-পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে কবি বিজয় গুপ্ত ছিলেন নারায়ণ দেবের সমসাময়িক। পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বশক্তিতে তিনি ছিলেন নারায়ণ দেবের সমকক্ষ। কিন্তু বাস্তবজীবনের নিখুঁত বর্ণনায় তিনি যেন নারায়ণ দেবকেও ছাড়িয়ে গেছেন। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ (বরিশাল)-জেলার ফুল্লশ্রী-গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল-কাব্য দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়। অলঙ্কার-প্রয়োগের নিপুণতা ও ছন্দ-মাধুর্যই তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ ব'লে অনেকে মনে করেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সম্পূর্ণ কোনো পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে বিজয় গুপ্ত ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী আমলের বাংলা-দেশের একখানি সমাজচিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। বিজয় গুপ্তের কবিত্বশক্তির চমৎকার এক নিদর্শন পাওয়া যায় চণ্ডীর নিকটে মনসায় কৃপাভিক্ষার বর্ণনায়। কবি বলেছেন—

"জনম-দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥"

লোহার বাসরে সর্পদংশনে লক্ষিন্দরের মৃত্যু হ'লে চাঁদ-সদাগর-পত্নী সনকার বিলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাঁর করুণ-রস বর্ণনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন—

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়॥
দুই হস্ত ধরি রানী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রানী বদন কমলে॥"

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা-বিজয়'

বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'মনসা-বিজয়'। তিনি ছিলেন চব্বিশ-পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার নাদুড্যা-বট-গ্রামের অধিবাসী। তাঁর কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য পূর্বে উল্লিখিত কবিগণের তুলনায় কম হ'লেও, তাঁর রচনা সরলতা ও আন্তরিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল। কেউ কেউ বিপ্রদাসকে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি ব'লে মনে করেন এবং তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর

শেষভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনেকের ধারণা। কিন্তু, রচনায় আধুনিকতার জন্য অনেকে তাঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি ব'লে স্বীকার করতে নারাজ।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাসই শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামের অধিবাসী। ১৬-শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' রচিত হয়। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের একজন ভক্ত ও সাধক কবি ব'লেই বোধহয় তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবী ভক্তিধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেই সংকীর্তনের দল গঠন ক'রে গ্রাম-গ্রামান্তরে মনসামঙ্গল গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও মঙ্গলকাব্য-বর্ণিত ভক্তিধর্মের গুণে কেনারাম নামক নরঘাতক দস্যু তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যেভাবে প্রাণবিসর্জন দিতে চেয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। মানুষের হৃদয়-পরিবর্তনে বংশীদাসের মনসামঙ্গল-কাব্য যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কবির কন্যাই হলেন বাংলাদেশের অন্যতমা মহিলা কবি ও রামায়ণ-পালাগান রচয়িত্রী চন্দ্রাবতী।

দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ'

মনসামঙ্গলের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ১৭-শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল ব'লে অনেকে অনুমান করেন। পশ্চিমবঙ্গের যে-সব কবি মনসামঙ্গল রচনা করেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেমানন্দই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। কবি তাঁর প্রকাশভঙ্গি ও অলঙ্কার-প্রয়োগের নিপুণতার জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ক্ষেমানন্দ ছিলেন বর্ধমান-জেলার অধিবাসী। 'কেতকা'-অর্থে দেবী মনসা। কবি নিজেকে তাই বলেছেন কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস। লক্ষিন্দরের সর্পদংশন বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'

"পুষ্পপান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে।
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়॥
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে॥"

এইভাবে ১৪-শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কবি মনসাদেবীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা করেন। যে-সব কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের বাদ দিয়ে আর যাঁরা মনসামঙ্গল-কাব্য রচয়িতা হিসাবে কম-বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বীরভূম-জেলার বিষ্ণুপাল, দিনাজপুর-জেলার জগজ্জীবন ঘোষাল, মল্লভূম ও সেনভূমের মধ্যবর্তী অঞ্চলের রামবিনোদ ও দ্বিজ রসিক প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল-কাব্যে সর্পের দেবী মনসার বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—পদ্ম, পদ্মা, বিষহরি, কেতকা, জাগুলি প্রভৃতি। তবে মনসা নামটিই বহুল-প্রচারিত। মনসামঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়ে শুধু যে লৌকিক দেবী-মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়েছে তা নয়, সামাজিক চেতনার উন্মেষেও এই কাব্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে। দৈবশক্তি ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বের অপূর্বসুন্দর একখানি আলেখ্য ফুটে উঠেছে মনসামঙ্গল-কাব্যে। চাঁদসদাগরের মতো বলিষ্ঠ চরিত্র যেন পৌরুষেরই প্রতীক। চাঁদ দৈবশক্তির দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, কিন্তু কখনও নিজের পৌরুষের অবমাননা করেননি, দৈবের পরাভব স্বীকার করেননি। কাব্যের পরিসমাপ্তিতে তিনি পুত্রবধূর অনুরোধে যেভাবে বাঁ হাত দিয়ে দেবী মনসার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর স্নেহকোমল অন্তরেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলার চরিত্রটিও মনসামঙ্গল-কাব্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের শাশ্বত বধূদের মতো, বেহুলা কিন্তু সবকিছুর জন্য নিজেকে ভাগ্যের পায়ে সঁপে দেয়নি। সতী-সাবিত্রীর আদর্শ নিয়েই সে ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের আত্মিকশক্তির পরীক্ষা করেছে। বেহুলা শক্তিময়ী, কিন্তু নারীর স্বভাবকোমলতা সে হারায়নি। বেহুলার এইরূপ চরিত্রাঙ্কনই তাকে মনসামঙ্গল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। বেশির ভাগ মনসামঙ্গল-ই পূর্ববঙ্গে রচিত ব'লে মনসামঙ্গল-কাব্যকে পূর্ববঙ্গের জাতীয়-কাব্য হিসাবে অভিহিত করা যায়।

মনসামঙ্গল-কাব্যের বিশেষত্ব

মনসামঙ্গল-কাব্যে আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন বণিক্-সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই লক্ষ্য করি। সে-সময় দেশে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব যে কতকটা মন্দীভূত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে, মনসামঙ্গল-কাব্যের কোনো প্রধান চরিত্রই ব্রাহ্মণ নয়। বৈশ্য-সম্প্রদায়ই ছিল তখন দেশের সমাজরক্ষক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই তখন তাঁরা একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করেছেন।

মনসামঙ্গল-কাব্যে সমাজ-বর্ণনা

বাংলাদেশ একসময়ে যে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল তার প্রমাণ আমরা শুধু মনসামঙ্গলেই পাই না, চণ্ডীমঙ্গলেও পাই। বাণিজ্যযাত্রা সমুদ্রের বিবরণ, নৌকার বহর এবং পণ্যদ্রব্যের সম্ভার এ সমস্তই উভয় মঙ্গল-কাব্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। দক্ষিণ পাটন অর্থাৎ সিংহলের সঙ্গে যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, মনসামঙ্গলের কাহিনীটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ বিষয়ে সমকালীন অবস্থা ও পরিবেশের দ্বারা কবি যে বিশেষ প্রভাবান্বিত ছিলেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের বণিক্-সম্প্রদায় যে কত ধূর্ত ছিলেন নারায়ণ দেবের বর্ণনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চাঁদসদাগর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করতে গিয়ে সেখানকার বণিক্‌দের বলছেন—

"করঙ্গা জামির হালি দেও মোক্তি বদলি,
পীঙ্গল বদলে দিবা সোনা।"

অর্থাৎ, করমচা ও জামির-লেবুর বদলে চাঁদসদাগর মোতি চাইছেন এবং পিপুলের

বদলে সোনা! মনসামঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালী-সমাজের পুরনারীদের বিভিন্ন সামাজিক-সংস্কারের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ-প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলকাব্য-রচয়িতারা তাঁদের সমকালীন সমাজের স্ত্রী-আচারের বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছেন। বিয়ের সময় বেহুলার সাজসজ্জার যে বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তাতে ক'রে সেকালের প্রতিপত্তিশালী বণিক্-সমাজের সৌন্দর্য-প্রীতি ও বিলাসিতারই পরিচয় মেলে। সামাজিক অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিরা বঙ্গরমণীদের রন্ধন-পটুতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি উপভোগ্য। পূর্ববঙ্গের কবিদের রচনায় পূর্ববঙ্গীয় রন্ধন-রীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চাঁদসদাগরের গুয়াবাড়ি, টাঙ্গীঘর, বেহুলার লোহার বাসরঘর প্রভৃতির বর্ণনায় মধ্য-যুগীয় বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের শিল্পদক্ষতারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর, মনসামঙ্গল-কাব্যের এই বস্তুতান্ত্রিক বিবরণের জন্যই তা সাধারণ পাঠকচিত্ত জয় করেছে তাতে ভুল নেই। শুধু দেবী-মাহাত্ম্য-প্রচার করাই যদি কবিদের একমাত্র লক্ষ্য হ'ত তাহ'লে অশিক্ষিত জনগণের অন্তরে যুগ যুগ ধ'রে তা এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারত কিনা সন্দেহ।

(খ) চণ্ডীমঙ্গল

মনসামঙ্গল-কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য যেমন লৌকিক দেবী মনসার মাহাত্ম্য-প্রচার, চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে তেমনি চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন অন্য কোনো পুরাণ-গ্রন্থে দেবী 'চণ্ডী'র কোনো উল্লেখ নাই দেখেই মনে হয় যে, প্রথম দিকে 'চণ্ডী' অনার্য-সমাজে পূজিতা কোনো লৌকিক দেবীই ছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমাজের সংস্কৃত পুরাণে যে 'চণ্ডী'র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তা সম্ভবতো অনার্য-সমাজের এই দেবী-মাহাত্ম্যেরই প্রভাব। দ্রাবিড় প্রমুখ আর্যেতর সমাজে ঘটা ক'রে স্ত্রী-দেবতার পূজা হ'ত। এই স্ত্রী-দেবতার পূজাকে কেন্দ্র ক'রেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজে শক্তিপূজার প্রচলন হয়। এই শক্তি-দেবতার মধ্যে মহাদেব-পত্নীই প্রধান। প্রাচীন পুরাণাদিতে তাঁর অনেক নাম, যেমন—দুর্গা, নারায়ণী, শঙ্করী, ভবানী, ঈশাণী, রুদ্রাণী প্রভৃতি। মুণ্ডা-শ্রেণীভুক্ত ওরাওঁ প্রভৃতি অধিবাসীদের মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তি-দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। অনেকের মতে এই অনার্য 'চাণ্ডী' থেকেই আর্য 'চণ্ডী'-র উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া, 'চাণ্ডী' মূলত ব্যাধজাতির আরাধ্য দেবতা এবং পশু-সমাজের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে পূজিতা। চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর নায়ক কালকেতুও ছিল ব্যাধ, এবং সেখানেও চণ্ডী-দেবীকে, পশুসমাজের রক্ষাকর্ত্রী দেবীরূপেও দেখা যায়। কাজেই, অনার্য-সমাজের 'চাণ্ডী'-ই যে-আর্য-প্রভাবে প'ড়ে 'চণ্ডী' বা 'চণ্ডিকা' রূপ ধারণ করেছেন সেরূপ ধারণা খুব অস্বাভাবিক নয়।

'চণ্ডী'-দেবীর উদ্ভব

ঠিক কোন্ যুগে চণ্ডীপূজার প্রচলন হয় ইতিহাসে, তার কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। চৈতন্য-ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

"ধর্ম কর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥"

'চণ্ডী'-পূজার প্রচলন

অনেকের তাই অনুমান যে, ১৫-শ শতকের পূর্বেই এদেশে চণ্ডীপূজা প্রচলিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'চণ্ডী'র উল্লেখ দেখে আবার অনেকের ধারণা, খ্রীষ্টীয় ১৪-শ শতকের অনেক আগেই বঙ্গসমাজে চণ্ডীপূজার প্রবর্তন হয়। কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, মনসামঙ্গল প্রাক্-চৈতন্যযুগে যতটা প্রচারলাভ করেছিল, 'চণ্ডীমঙ্গল' ততটা হয়নি ; আর সেই কারণেই তাঁরা বলেন যে, মনসা-পূজা লোকসমাজে প্রচলিত হবার পরে চণ্ডী-পূজার উদ্ভব হয়। পৌরাণিক চণ্ডী মহাশক্তির নামান্তর মাত্র। তিনি 'শুম্ভ' নামক অসুরের সেনাপতি 'চণ্ড'-কে বধ করেছিলেন ব'লে 'চণ্ডী' নামে অভিহিত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে-'চণ্ডী'র উল্লেখ আছে তা পৌরাণিক চণ্ডী। তার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-এর দেবীর কোনো সম্পর্ক নাই, এমন কথা বললে কিন্তু ভুল হবে। কারণ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের অনেকাংশই মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তথ্যাদিকে ভিত্তি ক'রে রচিত। দ্বিতীয়ত, চণ্ডীমঙ্গল-এর প্রথমাংশে 'চণ্ডী'র উদ্ভব যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি যে শিবজায়া এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। বাঙালী হিন্দুসমাজে 'চণ্ডী' সাধারণত 'মঙ্গলচণ্ডী'-নামেই অভিহিতা। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে এই 'মঙ্গলচণ্ডী'-র কথাই বলা হয়েছে এবং 'মঙ্গলচণ্ডী'-র মাহাত্ম্য-প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মনসামঙ্গল-কাব্যের ভিত্তি একটি কাহিনী (বেহুলা-লক্ষিন্দর-চাঁদসদাগর-মনসার উপাখ্যান)। কিন্তু, চণ্ডীমঙ্গল-এর আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে দু'টি পৃথক কাহিনী অবলম্বন করে। সেই আখ্যানভাগের একটিতে আছে কালকেতু-ব্যাধ, তার স্ত্রী ফুল্লরা ও দেবী চণ্ডীর কাহিনী, অন্যটিতে আছে ধনপতি-সদাগর ও দেবী 'চণ্ডী'র উপাখ্যান।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম : ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর একদিন শিবপূজার জন্য ফুল তুলছিল। দেবী চণ্ডী সেই সময় এক কীট হয়ে একটি ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করেন। নীলাম্বরের পূজাশেষে যখন সেই কীট শিবকে দংশন করে, যন্ত্রণায় কাতর ও ক্রুদ্ধ হয়ে শিব তখন নীলাম্বরকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে নীলাম্বর কালকেতু ব্যাধরূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াও এক ব্যাধের ঘরে জন্ম নেয়, তার নাম হয় ফুল্লরা। কিশোরী বয়সেই কালকেতুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। কালকেতু ছেলেবেলা থেকেই ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির। যেমন বলিষ্ঠ ছিল তার চেহারা, তেমনি তার স্বভাব। বনে বনে ঘুরে বন্য জন্তু-জানোয়ার শিকার ক'রে সে ঘরে আনে, আর ফুল্লরা সেই সব পশুর মাংস ঘরে ঘরে বিক্রি ক'রে বেড়ায়। তাতে ক'রে যে উপার্জন হয় তাই দিয়ে কালকেতু-ফুল্লরার সংসার কোনোমতে চলে। দারিদ্র্য ও দুঃখ যেন তাদের নিত্য-সঙ্গী।

(১)
কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী

ওদিকে কালকেতুর নিত্য শিকারের ভয়ে ভীত হয়ে, বন্য পশুরা একদিন দেবী চণ্ডীর কাছে গিয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাল। চণ্ডী তাদের আশ্বস্ত ক'রে বিদায় দিলেন এবং তাঁরই মায়ায় পর পর কয়েকদিন কালকেতু বনে বনে ঘুরে কোনো শিকার-ই পেল না। ফলে, অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় কালকেতু ও ফুল্লরার কষ্ট উঠল চরমে। অবশেষে একদিন অত্যন্ত নিরাশ হয়ে কালকেতু যখন ঘরে ফিরছিল তখন পথে একটি স্বর্ণ-গোধিকা দেখতে পেয়ে তাকেই সঙ্গে নিয়ে আসে। তারপর ফুল্লরাকে সেই গোধিকা পুড়িয়ে রাখতে ব'লে সে বাজারে গেল নুন কিনে আনতে। এদিকে ঘরে একমুঠো চালও নেই যে তা দিয়ে ভাত রাঁধা যায়। ফুল্লরা তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেল চালের খুদ ধার ক'রে আনতে। ফিরে এসে দেখে আশ্চর্য এক কাণ্ড। স্বর্ণ-গোধিকাটিকে সে যে-জায়গায় বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে সে অন্তর্হিত হয়েছে, তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পরমাসুন্দরী এক রমণী। ফুল্লরা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে যে, কালকেতু তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে; এখন থেকে সে কালকেতুর সংসারেই থাকবে। সে-কথা শুনে ফুল্লরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সে তখন সেই রমণীকে বারোমেসে দুঃখ দুদশার কাহিনী জানিয়ে তাকে ফিরে যেতে বারবার অনুরোধ করলে। কিন্তু তাতে কোনো ফলই হ'লো না, রমণীটি ঘর থেকে উঠতেই চায় না। ফুল্লরা তখন স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে গেল বাজারের দিকে। কালকেতুর সঙ্গে তার পথেই দেখা হ'লো এবং অভিমান দেখিয়ে কান্নাকাটি ক'রে মহা অনর্থ বাধাল ফুল্লরা। মেয়েটির সম্বন্ধে কালকেতু কিছুই জানত না, তাই সেও খুব অবাক হ'লো। বাড়ি ফিরে, অনেক ক'রে সে মেয়েটিকে অনুরোধ করলে যে, সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যাক। কিন্তু কিছুতেই যখন সে কালকেতুর বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী হ'লো না, কালকেতু তখন তাকে লক্ষ্য ক'রে ধনুকে বাণ যোজনা করলে। রমণী তখন নিজমূর্তি ধারণ করলে। কালকেতু ও ফুল্লরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল যে, দশভুজা মূর্তিতে দেবী চণ্ডী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। দেবী চণ্ডীই যে স্বর্ণ-গোধিকা ও রমণীর রূপ ধারণ ক'রে তাদের গৃহে আবির্ভূতা এতক্ষণে তারা তা বুঝতে পারল। চণ্ডী তখন কালকেতুকে পশুবধ করতে নিষেধ ক'রে তাকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন যাতে তার দারিদ্র্য ঘোচে এবং সে ধনে মানে লোকসমাজে বড় হ'তে পারে। দেবীর আশীর্বাদে কালকেতুর আর কোনো দুঃখই রইল না। সে বন কেটে নগর পত্তন করলে এবং কালক্রমে সেই অঞ্চলের রাজা হয়ে বসল। ঘটনাচক্রে তার যুদ্ধ বাধল কলিঙ্গের রাজার সঙ্গে এবং সেই রাজার হাতে বন্দী হ'তে হ'লো কালকেতুকে। কারাগারে ব'সে কালকেতু চণ্ডীর স্তব করতে লাগল এবং দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলিঙ্গরাজ সবশেষে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। কালকেতু আবার নিজের রাজ্য ফিরে পেয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল। কালকেতু ও ফুল্লরাই চণ্ডীপূজার প্রবর্তন করে এবং তাদের মাধ্যমেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় মর্ত্যলোকে। শাপ-মোচনের পর তারা আবার স্বর্গে ফিরে যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীটি গ'ড়ে উঠেছে ধনপতি সদাগরকে কেন্দ্র ক'রে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ : উজানি নগরের সাধু ধনপতি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু তার একটা বড় দুঃখ, সে নিঃসন্তান। তার প্রথমা স্ত্রী লহনার কোনো ছেলেপুলে হ'লো না দেখে, ধনপতি পরে ইচ্ছানি নগরের বণিক লক্ষপতির কন্যা খুল্লনাকে বিয়ে করে। খুল্লনা আসলে ছিল শাপভ্রষ্টা এক অপ্সরা এবং মর্ত্যসমাজে লহনার খুড়তুতো বোন। বিয়ের পর রাজার আদেশে ধনপতিকে সিংহলযাত্রা করতে হয় চন্দনকাঠ আনবার জন্যে। যাত্রার সময় ধনপতি যখন দেখতে পেল যে, খুল্লনা তারই মঙ্গলের জন্য মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করছে তখন সে শুধু বিস্মিত-ই হয় না, ক্রুদ্ধ হয়। কারণ, ধনপতির ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব, চণ্ডীপূজার প্রতি তার কোনো আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। সে তখন রাগের বশে চণ্ডীর ঘট লাথি মেরে ফেলে দেয়। ধনপতির আচরণে দেবী স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁরই মায়ায় ধনপতির ছয়খানি বাণিজ্যতরণী সমুদ্রে ডুবে গেল। ধনপতি কোনোরকমে তখন তার মধুকর ডিঙায় ক'রে সিংহলের কূলে গিয়ে পৌঁছুল। সিংহল পৌঁছুবার পথেই কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পায় ধনপতি। চণ্ডীর ছলনায় সমুদ্রে এক মায়া-পদ্মবনের সৃষ্টি হয়েছিল। ধনপতি প্রত্যক্ষ করে, সেই পদ্মবনে পদ্মাসনে ব'সে একটি রমণী একবার ক'রে একটি হাতিকে গিলছে, আবার পরক্ষণেই তাকে মুখ থেকে বের ক'রে দিচ্ছে। এরকম ঘটনা ধনপতি জীবনে আর কখনও দেখেনি। সিংহলে পৌঁছে সে, সেখানকার রাজার কাছে সেই 'কমলে কামিনী'র বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে এবং রাজাকে সে প্রতিশ্রুতিও দিল যে, সে দৃশ্য তাঁকে প্রত্যক্ষ করাবে। কিন্তু, ধনপতি তখনও বুঝতে পারেনি যে, সবটাই দেবী চণ্ডীর ছলনা। তাই, রাজাকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে গেল, তখন গিয়ে দেখতে পেল যে, কোথাও সেই পদ্মবনের চিহ্নমাত্র নেই, 'কমলে কামিনী' তো দূরের কথা। রাজা তাই মিথ্যা সংবাদ দেবার অপরাধে ধনপতিকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ওদিকে খুল্লনার এক ছেলে হয়। আদর ক'রে খুল্লনা তার নাম রাখে শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হয়ে সিংহলে রওনা হ'লো তার পিতা ধনপতি সদাগরের খোঁজে। সমুদ্রপথে শ্রীমন্তও 'কমলে কামিনী'-র দৃশ্য দেখতে পায়। সিংহলে পৌঁছে ধনপতির মতো সে-ও রাজাকে সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা বলে। রাজা কিন্তু এবারেও সেই দৃশ্য দেখতে পান না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তখন শ্রীমন্তকে বধের আদেশ দেন। ইতিমধ্যে কারাগারে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। পুত্রের কল্যাণকামনায় খুল্লনা সেইসময় দেবী-চণ্ডীর পূজা করায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভূত-প্রেত সৈন্যদের পাঠিয়ে দেন সিংহল-রাজাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। দেবীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়ে রাজা তখন ধনপতি ও শ্রীমন্তকে কারামুক্ত করেন এবং দেবীর আদেশে শ্রীমন্তের সঙ্গে নিজের কন্যা সুশীলার বিয়ে দেন। ধনপতি পুত্র ও পুত্রবধূ সঙ্গে ক'রে

ধনপতি সদাগরের কাহিনী

উজানিতে ফিরে আসে এবং চণ্ডীপূজার প্রচলন করে। চণ্ডী-মাহাত্ম্য এইভাবেই প্রচারিত হয় মর্ত্যলোকে।

চণ্ডীমঙ্গলের এই দুই কাহিনীর মধ্যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য যেমন প্রাধান্যলাভ করেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে চমৎকার এক সমাজ-চিত্র। কালকেতুর উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে সামাজিক দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মানুষ কিভাবে বড় হ'তে পারে তার একটা আদর্শ। তথাকথিত নীচু জাতের ঘরে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেও কালকেতু প্রমাণিত করেছে যে, শক্তি ও সাহস, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকলে, মানুষ সকল দুঃখ-কষ্ট জয় ক'রে রাজসম্মান পর্যন্ত পেতে পারে। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে কালকেতুর চরিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে ক'রে তাকে বলা যায় বাঙালীর জাতীয় বীরের আদর্শ। একদিকে তার অসীম শক্তি, সাহস ও নৈতিক জ্ঞান, অন্যদিকে প্রকৃতির দুলালের মতো তার সরল ও স্বাধীন জীবন, উপাস্যদেবতার প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা—তার চরিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে। অন্যদিকে ফুল্লরার চরিত্রও স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। দরিদ্র বাঙালী কুলবধূর সে যেন এক জলন্ত প্রতীক। সংসারের শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার স্বামী-অনুরাগ ও নারীত্বের দৃঢ়তা লক্ষ্য করলে অবাক্ হ'তে হয়। কালকেতুর উপাখ্যানে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি সাহিত্যিক-সৃষ্টি হিসাবে সর্বাপেক্ষা সার্থক। সে যেন ধূর্ততার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ছলে বলে কৌশলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না, ভাঁড়ুদত্ত তাদেরই প্রতীক। কালকেতুর এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ যে বাস্তবধর্মী সমাজ-চিত্র অঙ্কন করেছেন তা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। ফুল্লরার 'বারোমাস্যা' (বারো মাসের দুঃখকাহিনী)-র মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দরিদ্র-সমাজের নিখুঁত একটি ছবি ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি এই মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি ১৬-শতাব্দীর বাঙালী-সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, জাতিভেদ-প্রথা, নগরপত্তনের উদ্যম ইত্যাদির পরিচয়। অনেক ক্ষেত্রে কবিকল্পনার আতিশয্য থাকলেও ইতিহাস-কে অগ্রাহ্য করা হয়নি। বন্য জন্তুদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতারা ১৬-শ শতাব্দীর রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করিয়েছেন।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর বৈশিষ্ট্য

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের পরিকল্পনায় 'মনসামঙ্গল'-কাব্যের প্রভাব যে স্পষ্ট তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, চাঁদসদাগরের মতো ধনপতি সদাগরের সেই বলিষ্ঠ পৌরুষ নেই। "ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত কোনো কাজের নহে"—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন সে কথা। খুল্লনার চরিত্রাঙ্কণ অবশ্য কিছুটা সার্থক হয়ে উঠেছে, এবং ফুল্লরার আদর্শই যেন কবিরা তাঁকে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন। ধনপতির উপাখ্যানে যেমন ১৬-শ শতাব্দীর অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের পরিচয়

পাওয়া যায়, তেমনি ঐ উপাখ্যানের 'মাল্যচন্দনের বিবাদ' অংশে সামাজিক গোঁড়ামি ও কু-সংস্কারগুলিকে প্রকটিত করা হয়েছে। 'কমলে কামিনী'-প্রসঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট। অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ আদ্যাশক্তিই ক্রমশ হিন্দু চণ্ডী-তে পরিণত হয়েছে।

॥ চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা ॥

মানিক দত্ত-কে চণ্ডীকাব্যের আদি-রচয়িতা ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুঁথিতে আছে :

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল

"মানিক দত্তের আমি করি যে বিনয়।
যাঁহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয় ॥"

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি ব'লে তাঁর কাব্য-রচনার সঠিক কালনিরূপণ করা শক্ত। কিন্তু, এ-বিষয়ে অধিকাংশের ধারণা এই যে, মানিক দত্ত ১৬-শ শতাব্দীর পূর্বের কবি। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস' আলোচনায় বলেছেন : "মানিক দত্ত···সম্ভবতঃ ১৩-শ শতাব্দীর লোক।" অত আগের না হ'লেও, তিনি যে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি সে-কথা সকলেই স্বীকার করেন।

১৬-শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। অনেকের ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন হুগলি-জেলার সপ্তগ্রাম নিবাসী, পরে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসবাস করেন। তাঁর যে-পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তা পাওয়া যায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলে।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল

তা থেকে আবার অনেকে অনুমান করেন যে, দ্বিজ মাধব ছিলেন চট্টগ্রাম-জেলার অধিবাসী। 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে তিনি বাস্তব জীবনবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন এবং চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী আর কোনো কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পাঁচালি ও লোকগাথার বৈচিত্র্যহীন রচনা থেকে তিনিই সর্বপ্রথম চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে একটি রসসমৃদ্ধ কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। কালকেতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"তবে বাড়ে বীরবর জিনি মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
যতেক আখেটিসুখ তারা সবে পরাভূত
খেলায় জিনিতে কেহ নাড়ে ॥"

খুল্লনাকে সতীনরূপে পেয়ে লহনার মনে কোনো সুখ ছিল না। নানাভাবে সে খুল্লনাকে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতির জন্য সবসময় তার মনোগত বাসনা পূর্ণ হয় না। তাই, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে কিভাবে একবার খুল্লনাকে ছাগল রাখার কাজে নিযুক্ত করেছিল দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় তা এইরকম—

"খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনা ক্ষুদের অন্ন বাড়ে ॥

অল্প অন্ন দিল ছেছাপোড়া বহুল।
পাটশাক রান্ধি দিল পাকাকলার মূল॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনা।
ভোজন করিতে বৈসে খুল্লনা ব্যাণানী॥"

বাঙালী-সমাজে একসময় সতীনকাঁটার যে জ্বালা ছিল, তার প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে দ্বিজ মাধব তার নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত এক বর্ণনা দিয়েছেন।

[দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মধ্যে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে আর যে-সব কবিকে আমরা পাই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মদন দত্ত, মুক্তারাম (বা মক্তারাম) সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, কীর্তিচন্দ্র দাস, বলরাম কবিকঙ্কন, দ্বিজ হরিরাম, জয়নারায়ণ, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতি। অনেকের বিশ্বাস, বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য দ্বারা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কারণ, মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের গোড়ায় লিখেছেন—'গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।' এই 'কবিকঙ্কণ' যে বলরাম কবিকঙ্কণ তা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ, মুকুন্দরামের পূর্বে বলরাম ব্যতীত আর কোনো কবি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কবি হরিরাম যে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী সে-বিষয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। কিন্তু, হরিরাম যদি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি ব'লে কোনোদিন প্রমাণিত হন, তাহ'লে মুকুন্দরামের কবি-গৌরব যে অনেকাংশে ম্লান হয়ে যাবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, হরিরামের কাব্যের সঙ্গে মুকুন্দরামের কাব্যের বহু জায়গায় আশ্চর্যরকমের মিল আছে। মুকুন্দরামের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অনেকেই মনে করেন যে, হরিরাম তাঁর পরবর্তীকালের কবি।]

'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকেই শ্রেষ্ঠকবির সম্মান দেওয়া হয়। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন : "বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতকাব্যগুলির কথা বাদ দিলে ১৬-শ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য।" দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও লিখে গিয়েছেন : "কাব্য ও নীতি হিসাবে মুকুন্দকবির নির্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব।" মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে Cowell-সাহেব তার কিছু কিছু অংশ ইংরেজী-পদ্যে তর্জমা করেন, এবং মুকুন্দরামের সঙ্গে প্রাচীন ইংরেজী-সাহিত্যের বিখ্যাত কবি চসারের তুলনা দিয়েছিলেন। ১৬-শ শতাব্দীর শেষাশেষি কোনো সময়ে মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির জন্ম হয়। বাংলার সুবাদার যখন মানসিংহ সে-সময় মামুদ সরিপ নামে এক ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে কবি সপরিবারে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত আড়রা-গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গিয়ে ওঠেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল

রঘুনাথ রায়ের অনুরোধেই নাকি কবি তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন এইরূপ অনেকের অনুমান। মুকুন্দরাম প্রধানত জনপদের কবি। গ্রাম-জীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই বোধ হয় তাঁর কাব্যে গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কণ বিশেষ সার্থকতালাভ করেছে। কবিকল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছে মর্ত্যলোকে, তাই তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে বাস্তবধর্মী। তৎকালীন সমাজের বহুবিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাব্যবর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, কবিসুলভ সহৃদয়তা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতা ও রসবোধের অপূর্ব সমন্বয়ে মুকুন্দরামের কাব্য অনির্বচনীয় আস্বাদনের বস্তু হয়ে উঠেছে। দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল ব'লে দুঃখ-কষ্টের নিবিড় অনুভূতিকে তিনি রূপ দিয়েছেন ফুল্লরার 'বারোমাস্যা'-র মধ্য দিয়ে। ফুল্লরার উক্তিতেই রয়েছে তার প্রমাণ—

(ক) "ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।"
(খ) "শিরে দিতে নাহি আঁটে অঙ্গের বসন।"
(গ "বেঙচির ফল খ্যায়া করি উপবাস।"
(ঘ) "নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥"

সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বর্ণনার স্বাভাবিকত্ব এবং অলঙ্কার ও কবিত্বের প্রসাধনে মুকুন্দরামের কাব্য-প্রতিভা যে-কোনো কবির 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কালকেতু-ফুল্লরার সহজ ও সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন বাংলাদেশের দরিদ্র-দম্পতির ঘর-সংসারের নিখুঁত একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি লহনা-খুল্লনার কোন্দলের মধ্যে ফুটে উঠেছে এদেশের সতীন-বিবাদ, ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শঠতা ও প্রবঞ্চনার বাস্তবসম্মত রূপ। চণ্ডী-প্রদত্ত একটি অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করতে গেলে মহাজন মুরারি শীল কালকেতুকে এই ব'লে প্রতারিত করে—

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥"

এই মুরারি শীলের চরিত্র কবির এক মৌলিক সৃষ্টি। ষোড়শ শতকের বাংলাদেশে প্রজাদের উপর স্থানীয় ডিহিদারের অত্যাচার যে চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, কবি যেন তারই আভাস দিতে চেয়েছেন কালকেতুর অত্যাচার প্রসঙ্গে চণ্ডীর কাছে পশু-প্রতিনিধি এক ভালুকের কাতরোক্তির মধ্য দিয়ে—

"উইচারা খাই পশু নামেতে ভল্লুক।
নেউগী চৌধুরী নাহি না করি তালুক ॥
প্রতিদিন নিদ্রা নাহি বীরের তরাসে।
মাগু মৈলা পুত্র মৈলা দু'টি নাতি শঁসে ॥"

মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের আদিকবি নন। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী তাঁর পূর্বেই এদেশে প্রচলিত হয়, কিন্তু মুকুন্দরামের বিশেষত্ব হ'লো এই যে, তিনি পুরাতন কাহিনীর এমন এক সু-সংস্কৃত রূপ প্রকাশ করেছেন, সাহিত্যের মাপকাঠিতে যা সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃতিলাভ করেছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হ'লেও তাতে একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বহু লক্ষণ বর্তমান, অন্যদিকে তা আবার নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত।

মুকুন্দরামের পর আর যে-সকল কবি 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজ রামদেব কিছুটা মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি দ্বিজ মাধবের রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত। দ্বিজ রামদেব ছিলেন পূর্ববঙ্গের কবি, সম্ভবতো সেইজন্যই তাঁর পক্ষে মুকুন্দরামের কবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। মুকুন্দরামের পর আর কোনো কবি 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্য রচনা ক'রে মুকুন্দরামের কবিখ্যাতিকে যে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেননি, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

(গ) ধর্মমঙ্গল

বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মহিমাকীর্তনের জন্য যে-কাব্য রচিত হয় বাংলাদেশে সেই কাব্যই 'ধর্মমঙ্গল' নামে পরিচিত। ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলাদেশে গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী রাঢ়-অঞ্চলে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। 'ধর্মমঙ্গল'-এর কোনো পুঁথি আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায়নি ব'লে এই কাব্যকে 'রাঢ়বঙ্গের জাতীয় কাব্য' হিসাবে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। 'ধর্ম' এই নামটি বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, ধর্মরাজ বুদ্ধেরই অপর একটি নাম। তাছাড়া, 'ধর্ম' বা 'ধম্ম' (পালিভাষায়) বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম—অর্থাৎ, 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি'। হয়তো সেই বৌদ্ধ প্রভাবেই রাঢ়-অঞ্চলের বিশেষ কোনো লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরে পরিণত হন। অনেকে অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ পালরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৌদ্ধধর্ম গৌড় থেকে রাঢ়-ভূমি পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে এবং সেই যুগেই হয় ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। ১১-শ শতাব্দীতে আবার যখন হিন্দু সেনরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে-সময় সারা বাংলাদেশেই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা দেখা দেয়। তারই প্রভাবে কোনো কোনো জায়গায় আবার ধর্মঠাকুর বিষ্ণু বা সূর্যরূপে পূজিত হ'তে থাকেন। কিন্তু, ধর্মঠাকুর ও বিষ্ণুর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা ঠিক নয়। কারণ, বিষ্ণুর উপাসনায় পশুবলি নিষিদ্ধ, অথচ ধর্মঠাকুরের উপাসনায় ছাগ (লুয়ে)-বলি প্রধান একটি অঙ্গ। কোথাও কোথাও আবার ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যম অথবা শিবের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু, পৌরাণিক কোনো দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতা 'ধর্মঠাকুর'-এর অভেদ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের বিশ্বাস, যখন যে ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, তখন সেই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই বৌদ্ধ ধর্মঠাকুরের নামান্তর ঘটেছে।

ধর্মমঙ্গল ও ধর্মঠাকুর ঃ বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব

সম্ভবতো সেই কারণেই, ধর্মঠাকুর কোথাও বিষ্ণু, কোথাও সূর্য, কোথাও বা শিব কিংবা যম।

বৌদ্ধধর্মাশ্রিত লৌকিক-দেবতা ধর্মঠাকুরের কোনো বিগ্রহ নাই, তিনি নিরাকার। সাধারণভাবে একখণ্ড পাথরই তাঁর প্রতীক। যুগপ্রভাবে ও স্থানভেদে সেই পাথর কোথাও আকৃতিবিহীন, কোথাও আবার কূর্মাকৃতি কিংবা পাদুকা-সদৃশ। রাঢ় অঞ্চলে যেমন এখনও ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, তেমনি আছে সন্নিহিত মুর্শিদাবাদ-মালদহ এলাকায়। শেষোক্ত দুই জেলায় এখনও ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরের কাছে নিঃসন্তান নারী যেমন সন্তান-কামনা প্রকাশ করে, রোগগ্রস্ত অজ্ঞ গ্রাম-বাসীরাও তেমনি রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। মৃতবৎসার সন্তাননাশ-রোধ ও শিশুমৃত্যু-নিবারণের উদ্দেশ্যেও বহু নরনারী ধর্মঠাকুরের 'থানে' (স্থানে) মানসিক করে। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দেয় ছাগবলি। বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—ধর্ম, কালু রায়, বুড়া রায়, কৌতুক রায়, বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায় প্রভৃতি। ধর্মপূজা প্রধানত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সমাজে, অর্থাৎ ডোম, হাড়ী, চণ্ডালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তারাই এই পূজার পুরোহিত। অনেক জায়গায় ধর্মশিলার নিত্যপূজা হয়, কোথাও কোথাও আবার বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ঘটস্থাপন ক'রে পূর্ণিমা পর্যন্ত পূজা চলে। পূজার শেষে অনেক জায়গাতেই শিবের গাজনের মতো ধর্মের গাজনও অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজনের বিশেষত্ব—'শালেভর' বা লৌহশলাকার উপর শয়ন' এবং 'বাণফোঁড়'। ছাগবলি ধর্মপূজার প্রধান একটি অঙ্গ ; ছাগরক্তে মিশ্রিত ঘিয়ের দ্বারা হোমের অনুষ্ঠান পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ধর্মঠাকুরের পূজা

'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইরকম। ধর্মপালের পুত্র যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত' তখন তাঁর মন্ত্রী ছিলেন মহামদ। সামাজিক সম্পর্কে তিনি গৌড়-রাজ্যের শ্যালক। স্বেচ্ছাচারী মহামদ অকারণে সোমঘোষ নামে অনুগত এক প্রজাকে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। গৌড়রাজ তাঁকে মুক্ত ক'রে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে (মতান্তরে ঢেঁকুরগড়ে) পাঠিয়ে দেন। ত্রিষষ্ঠীর গড়ে সে-সময় কর্ণসেন নামে সামন্ত এক নৃপতি রাজত্ব করতেন। গৌড়রাজ সোমঘোষকে সেই কর্ণসেনের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ক'রে পাঠান। পরে সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে ত্রিষষ্ঠীর গড় থেকে বিতাড়িত ক'রে নিজেই গড়ের মালিক হয়ে বসে। ইছাই ঘোষ শুধু কর্ণসেনকে বিতাড়িত ক'রেই ক্ষান্ত হয় না. গৌড়-রাজসরকারের রাজস্ব জমা দিতেও অস্বীকৃত হয়। ফলে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে তার ভীষণ এক যুদ্ধ বাধে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয় ইছাই ঘোষ। কিন্তু, সে-যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের পক্ষাবলম্বনকারী কর্ণসেনের ছয়পুত্র নিহত হয়, কর্ণসেনের স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করেন, এবং অবস্থার বিপাকে প'ড়ে কর্ণসেনও প্রায় পাগলের মতো হয়ে যান। কর্ণসেনের দুঃখে ব্যথিত হচ্ছে

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কাহিনী : লাউসেন-উপাখ্যান

গৌড়রাজ তখন নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন এই উদ্দেশ্যে যে, সংসারী হয়ে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হবেন। বিবাহের পর গৌড়রাজ কর্ণসেনকে ময়নাগড়ের রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। রঞ্জাবতী ছিলেন গৌড়ের মন্ত্রী মহামদের ভগিনী। তাঁর অমতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, মহামদ মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হন এবং সেই ক্রোধবশত রঞ্জাবতী ও কর্ণসেনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেন। অনেকদিন পর্যন্ত রঞ্জাবতীর কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় সে ধর্মঠাকুরের পূজা আরম্ভ করে এবং ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদেই শেষ পর্যন্ত তার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয়—লাউসেন। ধর্মের কৃপায় লাউসেন কালক্রমে মহাবীর হয়ে ওঠে। গৌড়েশ্বর তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলেও, মন্ত্রী ও সামাজিক সম্পর্কে মাতুল মহামদ কিন্তু আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ভাগিনেয়কে অপদস্থ করবার বাসনায় তাকে পাঠিয়ে দেন কামরূপে—রাজস্ব আদায় করতে। অপদস্থ হওয়া তো দূরে থাক, লাউসেন কামরূপ জয় ক'রে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রে দেশে ফিরে এলো। লাউসেনের বীরত্বকাহিনী ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। বৃদ্ধ বয়সে গৌড়রাজ সিমুলার রাজা হরিপালের পরমাসুন্দরী কন্যা কানড়াকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কানড়ার কাছে ছিল দেবী-প্রদত্ত একটি লোহার গণ্ডার। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ঐ লোহার গণ্ডারকে যে-পুরুষ এককোপে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে একমাত্র তার গলাতেই সে বরমাল্য পরিয়ে দেবে। গৌড়েশ্বরের পক্ষে লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করা যখন সম্ভবপর হ'লো না, তরুণ বীর লাউসেন তখন এলো এগিয়ে। লাউসেন অতি সহজেই গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করল এবং কানড়া তার প্রতিজ্ঞামতো তাকেই বরণ ক'রে নিলে স্বামীরূপে। এর পর মন্ত্রী মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পাঠালেন ত্রিষষ্ঠীর গড়ে বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে পরাভূত করতে। লাউসেনের সঙ্গে ইছাই ঘোষের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে বহু সৈন্যসামন্ত সহ ইছাই ঘোষ শেষ পর্যন্ত নিহত হয়। লাউসেন তখন জয়গৌরবে চন্দনতিলকে অভিষিক্ত হয়ে ফিরে আসে এবং গৌড়েশ্বরও নিশ্চিন্ত হন শত্রু নির্মূল হ'লো ব'লে। লাউসেনকে কোনোমতেই জব্দ করতে না পেরে মন্ত্রী মহামদ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, যে-দেবতার আশীর্বাদে লাউসেন এমন পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে তিনি তাঁর পূজা করবেন। কিন্তু, দেবী তাঁর পূজা গ্রহণ না ক'রে গৌড়ে এক মহাসংকটের সৃষ্টি করলেন। গৌড়েশ্বর তখন লাউসেনের শরণাপন্ন হলেন। লাউসেন এক কঠিন তপস্যা ক'রে ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে সিদ্ধিলাভ করে এবং গৌড়কে মুক্ত করে সকল সংকট থেকে। লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মহামদ এদিকে ময়নাগড় আক্রমণ ক'রে বসে। সে-যুদ্ধে লাউসেনের আশ্রিত কালু ডোম যুদ্ধ না করলেও তার স্ত্রী মহামদের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করে এবং ময়নাগড়ের রানী কানড়ার হাতে মহামদকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মহামদকে তখন চরম অপমানে লাঞ্ছিত ক'রে ময়নাগড় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ তাঁর জীবনের শেষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে আসে এবং বহুকাল

শান্তিসুখে রাজত্ব ক'রে অবশেষে স্বর্গারোহণ করে। এইভাবে দেশে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, এ-বিষয়ে, সঠিক প্রমাণাদির একান্তই অভাব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, ধর্মমঙ্গল জাতীয় কোনো গ্রন্থই ১৬-শ কিংবা ১৭-শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নয়। তবে, রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'কে কেউ কেউ ১৫-শ শতকের শেষভাগে কিংবা ১৬-শ শতকের প্রথমভাগের রচনা ব'লে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু 'শূন্যপুরাণ' ধর্মমঙ্গল নয়, ধর্ম-পূজাবিষয়ক গ্রন্থ। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে বীর রসেরই প্রাধান্য। সেই রসসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় নায়ক লাউসেনের বীরত্ব-বর্ণনায় বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণে, সৈন্যসজ্জায়। রঞ্জাবতীর চরিত্রাঙ্কণে অধিকাংশ কবিই বাৎসল্য-রসের আশ্রয় নিয়েছেন। পুত্র-কামনায় তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মাতৃহৃদয়ের যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা চিরন্তন নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য। পুত্রলাভের জন্য তাঁর সুকঠিন তপশ্চরণ-ই যেন তাঁকে মহিমময়ী ক'রে তুলেছে। মন্ত্রী মহামদের চরিত্রটি যে বাস্তবধর্মী তাতে সন্দেহ নেই। কাহিনী-বিন্যাসে এই খলস্বভাব লোকটির দুরভিসন্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যকলাপ ঘটনার গতিকে নানা সময় নানা দিকে চালিত করেছে। ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কানড়া চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। কানড়াকে বীরাঙ্গনার পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। কানাড়া-র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যেন বীরাঙ্গনা রাজপুত-রমণীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কানড়া বাঙালী-রমণী। এই স্ত্রী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীশক্তির যে পরিচয় মেলে, গতানুগতিকতাবর্জিত বাঙালী স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে তা বৈচিত্র্য এনেছে। কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত হৃদয়বেদনা, পুরুষের মতো, নারীও যে দিতে পারে লখাই-ডোমনির চরিত্রই তার দৃষ্টান্ত। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে পুরুষচরিত্রগুলি কিন্তু এ-বিষয়ে নারী-চরিত্রগুলির কাছে বহুলাংশে হীনপ্রভ। পুরুষের বীরত্ব অপেক্ষা নারীর বীরত্ব, পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা নারীর বুদ্ধি, ধর্মমঙ্গল-কাব্যের অনেক স্থানেই প্রাধান্যলাভ করেছে।

রচনাকাল ও চরিত্রাঙ্কন

॥ ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা ॥

ময়ূরভট্টকেই সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা ধর্মমঙ্গল-কাব্যের আদি রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী রচয়িতাদের উক্তির মধ্যেও ময়ূরভট্টের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। মানিক গাঙ্গুলী বলেছেন—"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।" ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—"হাকন্দ পুরাণমতে ময়ূর-ভট্টের পথে।' কিন্তু, ময়ূরভট্টের প্রামাণ্য কোনো পুঁথি আবিষ্কৃত হয়নি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি পুঁথি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু নানাকারণে তা অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। ময়ূরভট্টের পর খেলারাম ও রূপরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্য প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে—"১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে খেলারাম ধর্ম-

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি—ময়ূরভট্ট, কেনারাম, রূপরাম, মানিক গাঙ্গুলী

মঙ্গল-কাব্য রচনা করেন। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস রূপরাম খেলারামের পূর্ববর্তী।" সে যাই হোক, ১৬ শ শতাব্দীর পূর্বে এঁদের কেউই যে ধর্মমঙ্গল রচনা করেননি সে-বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। মানিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি। কেউ কেউ তাঁকে ১৬-শ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের কবি ব'লে স্বীকৃতি দিতে চান, কেউ বলেন যে, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা পূর্বোক্ত সময়েরই সমর্থক। মানিকরামের কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন রচয়িতাদের মধ্যে শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম, রামদাস আদক প্রভৃতির নামও করা যায়।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর রচনাই প্রথম মুদ্রিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। ১৭১১-খ্রীঃ অব্দে ঘনরাম তাঁর কাব্যরচনা শেষ করেন। বর্ধমান-জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক। ঘনরামের ভাষা প্রাঞ্জল, ছন্দ নতুন, ভাষা ও ভাবের মধ্যে গ্রাম্যতা-দোষ নাই। তাঁর কাব্য মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। অনেক ক্ষেত্রেই ঘনরাম তাঁর কবিত্বশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন, যুগের কথা মনে রেখে, নিঃসন্দেহে তা উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে। সংস্কৃত ভাষাতেও যে তাঁর দখল ছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘনরামের বর্ণিত কাহিনীতে বিষয়বস্তুর কোনো নূতনত্ব নাই, ধর্মানুগৃহীত লাউসেনের শৌর্যবীর্যের কাহিনীকেই তিনি অনুসরণ করেছেন বিশ্বস্তভাবে। কিন্তু, তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচলিত চির-পুরাতন কাহিনীকে সরস ও সর্বজন-উপভোগ্য ক'রে তোলবার চেষ্টায়। নায়ক লাউসেনের বীরত্ব বর্ণনায়, কর্পূরধবলের বালসুলভ চপলতায় ও কাপুরুষতার মধ্যে, মন্ত্রী মহামদের কপটতার বর্ণনায় ঘনরামের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভীরু বাঙালীর প্রতীক কর্পূরধবলের চরিত্রের মাধ্যমে কবি তাঁর বীররসাত্মক কাব্যে একদিকে যেমন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অবতারণা করেছেন হাস্যরসের। লাউসেনের চরিত্র আদর্শমূলক হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম, কিন্তু কর্পূরধবল এবং মন্ত্রী মহামদ বহুলাংশে বাস্তবধর্মী। রঞ্জাবতীর চরিত্রাঙ্কনে ঘনরামের আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। পুত্রকামনায় ঘনরামের রঞ্জাবতী বলেছে —"কানা খোঁড়া হোক পুত্র, তবু দুঃখ ঘোচে।" লাউসেনের ত্রিষষ্ঠীর গড় বা গৌড় যাত্রার সংবাদ শুনে রঞ্জাবতী যেভাবে তার মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে তাও প্রশংসনীয়। যেমন—

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'

(১) "রানী বলে তুমি মোর কৃপণের কড়ি।
আন্ধার মানিক তুমি, অন্ধকের নড়ি॥"

(২) "কালি অতি শুভদিনে গৌড় তুমি যাবে।
অভাগীর বর্দ্ধন বাপু আজি কিছু খাবে॥"

এই জাতীয় উক্তির মধ্য দিয়ে কবির সমাজ-জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মমঙ্গল বীররসের কাব্য। ঘনরামের কাব্যেও এই বীর-

রসের প্রাধান্য। অবশ্য, বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনায় ও সৈন্যসজ্জার বিবরণে কবির প্রকাশ-ভঙ্গি একই রকমের। যেমন—

"ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে
আকাশ একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে কত কত হুতাসে
গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম ॥"

এই বীররসের বর্ণনায় ক্ষেত্রবিশেষে কবির দেশাত্মবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরাম ছিলেন রামভক্ত কবি। কাজেই, তাঁর রচনায় রামায়ণের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে হনুমান তাঁর কাব্যে ধর্মভক্ত লাউসেনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত রামায়ণের অনেক উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন কবি। তাছাড়া সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঘনরাম তাঁর লাউসেনকে রামচন্দ্রের আদর্শে এবং মহামদকে রাবণের আদর্শেই চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া, জায়গায় জায়গায় মহাভারত ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

ঘনরামের পর আর যাঁরা 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন— মহাদেব চক্রবর্তী (১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ) ; নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীঃ অঃ) ; হৃদয়রাম সাউ (১৭৫৮ খ্রীঃ অঃ) ; গোবিন্দরাম (১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। 'মঙ্গলকাব্য' কাহাকে বলে ? এইরূপ নামকরণের সার্থকতা কোথায় ?

২। 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। সেই সঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনামা মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম লিখ।

৩। (ক) 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের কাহিনী দুইটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, উক্ত কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (খ) 'চণ্ডীমঙ্গল'-রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। ধর্মপূজার প্রচলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা কে ? তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর।

৫। 'ধর্মমঙ্গল'-এর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। 'ধর্মমঙ্গল'-রচয়িতাদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ :—

(ক) কালকেতু ; (খ) চন্দ্রধর বা চাঁদসদাগর ; (গ) লাউসেন ; (ঘ) ফুল্লরা ; (ঙ) বেহুলা ; (চ) রঞ্জাবতী ; (ছ) নারায়ণ দেব ; (জ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ; (ঝ) ঘনরাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতের যে দুই মহাকাব্য ভারতের জাতীয় কাব্যস্বরূপ, সেই রামায়ণ ও মহাভারত বিশ্বসাহিত্যেও সমাদৃত। মহর্ষি বাল্মীকি যেমন রামায়ণের আদিকবি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তেমনি মহাভারতের। মূল রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত। বাংলা সাহিত্যে আমরা যে রামায়ণ পাই তা সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ এবং অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস। আর, কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদই সবচেয়ে প্রাচীন ব'লে মনে হয়। তবে কাশীরাম দাসের যে অনুবাদ বাংলাদেশে প্রচলিত, জনপ্রিয়তার দিক থেকে সেই মহাভারতই বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় কাব্য। বাংলাদেশে যখন সেনরাজারা রাজত্ব করতেন, দেশে সে-সময় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছে। তখনকার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন বৃদ্ধি পায়। মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থাদিও সে-সময় অনেক রচিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষা সবে তখন অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে স্বরূপে আত্মবিকাশের পথ খুঁজছে। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের কৃষ্ণভক্ত বাঙালী কবি জয়দেব। 'গীতগোবিন্দ' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী-বিজয়ের পর বাংলাদেশে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সেই যুগে, মুসলমান শাসনকর্তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। সংস্কৃতভাষায় লিখিত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন কাব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ একটা উদ্যম পরিলক্ষিত হয় সেই মুসলমান-আমলের বাঙালী কবিদের মধ্যে। তার সুফল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। অনুবাদ-সাহিত্য হিসাবে এই দুই অমূল্য গ্রন্থ মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের বিরাট দুই কীর্তি। প্রায় পাঁচশ' বছর ধ'রে এই দুই অনুবাদ-মহাকাব্য বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে চলেছে।

(ক) রামায়ণ

কৃত্তিবাস ঃ জন্মসময়, বংশ-পরিচয় ও কাব্য-বৈশিষ্ট্য

যতদূর জানা যায় কৃত্তিবাসের বহুবিখ্যাত রামায়ণই সংস্কৃত-রামায়ণের আদি বঙ্গানুবাদ। যুগ যুগ ধ'রে এই কাব্যানুবাদ বাংলাদেশের নরনারীকে তাদের দুঃখে সুখে; উত্থানে পতনে, ভোগে ত্যাগে, কর্মে অবসরে, সকল অবস্থায় মানসিক আনন্দবিধান ক'রে আসছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই যুগ-প্রসারী প্রভাবশক্তিই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের সঠিক কোনো তারিখ এযাবৎ পাওয়া যায়নি। তাঁর নিজের হাতের লেখা পুঁথিও অনাবিষ্কৃত। প্রাচীনতম যে-পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা শুধু 'উত্তরকাণ্ড'-এর। কিন্তু, নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে-পুঁথি অবলম্বন ক'রে রামায়ণের 'আদিকাণ্ড' প্রকাশ করেছেন, অনেকের

মতে, তা পূর্বোক্ত 'উত্তরকাণ্ড'-সংবলিত পুঁথির চেয়েও প্রাচীন। হারাধন ভক্তিনিধি আবিষ্কৃত 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ' থেকে কবির কাল ও বংশপরিচয়ের কিছু কিছু হদিশ মেলে। ঐ আত্মবিবরণ থেকে জানা যায় কৃত্তিবাসের কোনো এক পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করেন। নরসিংহ ওঝার পৌত্র মুরারি ওঝা। সেই মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী ওঝা কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। আত্মবিবরণে বলা হয়েছে—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।"

কবির নিজস্ব এই উক্তির সূত্র ধ'রে, সাহিত্য-গবেষক পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তারিখ গণনা ক'রে কবির যে জন্মতারিখ নির্ধারণ করেছেন তা হ'লো—১৩৫৪ শকাব্দের ২৯-এ মাঘ রবিবার। অর্থাৎ, ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি এক তারিখে (সম্ভবতো ১১ই ফেব্রুআরি) কৃত্তিবাসের জন্ম। আত্মবিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, কৃত্তিবাস রাজকবি হবার উচ্চাশা নিয়ে তদানীন্তন গৌড়েশ্বরের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন তা নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রাজা গণেশ, কেউ বলেন রাজা কংসনারায়ণ। 'ফুলিয়া মেলবন্ধন' থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কোনো সময়ে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল। এই সব অনুমান এড়িয়ে, আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি যে, কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ববর্তী সময়ের কবি এবং তিনি ১৪-শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে কিংবা ১৫-শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আত্মবিবরণ থেকে এ-কথাও জানা যায় যে, কবি গৌড়ের রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সাতটি শ্লোক রচনা করে রাজার প্রশস্তি-গান করেন। রাজা তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে মাল্যচন্দনে অভিষিক্ত ক'রে শ্রদ্ধা জানান এবং পরে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূল রামায়ণের বঙ্গানুবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন। কবির ভাষায়—

"বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরু আজ্ঞাদান।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ-গান॥"

আমরা সাধারণত কৃত্তিবাসের যে-রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত, তার আদর্শ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মুদ্রিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল-অনুবাদের অনেক পরিবর্তন বা রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই, প্রচলিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-থেকে কবির দোষ-গুণ বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু একথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে যে, বাল্মীকির রামায়ণের যতগুলি বঙ্গানুবাদ হয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃত্তিবাস কী উদ্দেশ্য নিয়ে রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন তা তিনি নিজেই বলেছেন—

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

অর্থাৎ, বাল্মীকির রামায়ণের কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, কৃত্তিবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাই। কবির এই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য যে যথার্থই সার্থক হয়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের অবিসংবাদী জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেননি ব'লেই মনে হয়। কোনো আখ্যানকে তিনি যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি কোনো আখ্যানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নানা পুরাণ অনুসরণ ক'রে নতুন নতুন গল্প সংযুক্ত করেছেন। সেগুলির মধ্যে রত্নাকরের উপাখ্যান ও গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামের মিতালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন,—"রাম-লক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার ব্রীড়াবনত মাধুরী বোধহয় মূলাপেক্ষা আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।" কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তির যে অপূর্ব সুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাই যেন আজও পর্যন্ত উক্ত রামায়ণকে সর্বজন-সমাদৃত ক'রে রেখেছে। এই রামায়ণে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পাঠকমনে তা স্বভাবতই গভীর রেখাপাত করে। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ 'বাঙালীর জাতীয় কাব্য'।

কবি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে আরও অনেক কবি রামায়ণ রচনা করেন। সেই সব রামায়ণের মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ একসময় উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রচার লাভ করে। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের কোনো কোনো অংশ বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ বোধহয় উত্তরবঙ্গের কোনো কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি নকল করতে গিয়ে স্থানবিশেষে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম সম্ভবতো নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি খ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীর লোক, অর্থাৎ চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি। 'অদ্ভুতাচার্য' তাঁর ছদ্মনাম। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করতে গিয়ে একদিকে যেমন কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃত পুরাণাদি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রামায়ণে অনেক অলৌকিক তথা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ আছে। সেই কারণেই সম্ভবতো তিনি 'অদ্ভুতাচার্য' এই নাম গ্রহণ করেছিলেন।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ

রামায়ণ-রচনার ক্ষেত্রে, চৈতন্য-পরবর্তী যুগের আর একজন কবির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি হলেন মনসামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা—কবি চন্দ্রাবতী। সে-যুগে তাঁর মতো একজন মহিলা যে-রকম কবিত্বের সঙ্গে রামায়ণ-পালা রচনা করেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নারী-সমাজের গৌরবের বিষয়। চন্দ্রাবতী খ্রীষ্টীয় ১৬-শ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ১৭-শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর রামায়ণ রচনা করেন ব'লে সাহিত্য-গবেষকদের ধারণা। তাঁর রচনাকে অবশ্য কাব্যের মর্যাদা না দিয়ে, পালাগানের মর্যাদা দেওয়াই সঙ্গত। তিনি রাম-সীতা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন ক'রে যে গীতাবলী রচনা করেন তা লোকের মুখে

মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-পালা

মুখেই প্রচারিত হয়, লিপিবদ্ধ অবস্থায় তাঁর রচনার কোনো সম্পূর্ণ পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ব'লে যে পালাগান আমরা পাই, তা পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ-অঞ্চলের লোকমুখ থেকেই প্রধানত সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর রচনা বিশেষ কবিত্বময় এবং করুণরসের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের সুযোগ্যা কন্যা। পিতার কাছেই তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ ক'রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চন্দ্রাবতীর জীবন-কাহিনীও বড় করুণ। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ-বালকের নিত্য-সহচরী। দু'জনের ভালোবাসাও ছিল গভীর। কিন্তু, জয়ানন্দ বড় হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী এক তরুণীকে বিবাহ করেন। সেই থেকে চন্দ্রাবতীর জীবন বিরহব্যথায় পূর্ণ। জয়ানন্দ যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসেন, ঘটনাচক্রে তখন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে তাঁর মিলন আর সম্ভব হয় না। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জয়ানন্দ তখন ফুলেশ্বরীর জলে নিজেকে বিসর্জিত করেন। সে ঘটনায় চন্দ্রাবতীর মন আরও ভেঙে পড়ে। কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা ক'রে বংশীদাস তখন তাঁকে রামায়ণ রচনা করতে বলেন। রাম-সীতার কাহিনীকে গীতি-কবিতায় রূপ দিতে গিয়ে তিনি বোধ করি নিজের জীবনের করুণ দিকটাকে কখনও ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর পালাগানে করুণ রসেরই প্রাবল্য। চন্দ্রাবতীর জীবন এইভাবে রামায়ণের পালা রচনা ক'রে এবং ফুলেশ্বরী-তীরবর্তী শিবমন্দিরে দেবতার আরাধনায় কেটে যায়।

(খ) মহাভারত

বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকদের অনুমান চট্টগ্রামনিবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বররচিত 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়-পাণ্ডবকথা'-ই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত 'মহাভারত'-এর প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদ। এখানে অনুবাদ বলতে আখ্যানভাগ বা গল্পাংশের অনুবাদই বুঝতে হবে। কারণ, এক কাশীরাম দাস ছাড়া আর কারও সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী এই যে, বাংলাদেশে যখন হুসেন শাহের রাজত্ব চলছিল তখন তাঁর এক সেনাপতি, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর ইচ্ছানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারত-পাঁচালি রচনা করেন। হুসেন শাহ্ রাজত্ব করেন ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কবীন্দ্রের মহাভারত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই রচিত হয়েছিল। কবীন্দ্রের মহাভারত শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই নয়, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, রংপুর, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলেও পাওয়া গেছে। কবীন্দ্রের পরে আর যাঁরা 'মহাভারত'-এর অনুবাদ-কার্যে প্রবৃত্ত হন তাঁদের মধ্যে শ্রীকর নন্দী, ষষ্ঠীধর সেন, বিজয় পণ্ডিত, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, নিত্যানন্দ ঘোষ, ঘনশ্যাম কবিচন্দ্র প্রভৃতির নাম করা যায়। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশেই শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব

'মহাভারত'-এর অনুবাদ: কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি

অনুবাদ করেছিলেন মাত্র। পূর্বোক্ত অন্যান্য কবিরাও মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ ক'রে প্রচার করেন। কোনো কোনো সাহিত্য-গবেষক মনে করেন যে, 'সঞ্জয়'-কৃত মহাভারত এঁদের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা; এমনকি সে-মহাভারত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পূর্বে রচিত হয়েছিল ব'লে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা 'সঞ্জয়'-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। তাঁদের মতে 'সঞ্জয়' পূর্বোক্ত কবিদের কারও ছদ্মনাম। সে যাই হোক, 'সঞ্জয়'-ভনিতাযুক্ত মহাভারত সম্পর্কিত পদ্য-রচনাগুলি বেশ সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর।

মহাভারত-এর অনুবাদকদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রাচীন সে-বিষয়ে মতভেদ থাকলেও কাশীরাম দাসের মহাভারত-ই যে অনুবাদের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে সকলেই একমত। বস্তুত, কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতোই কাশীদাসী মহাভারত বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো, কাশীরাম দাসের মহাভারতকেও আমরা তাই 'বাঙালীর জাতীয় কাব্য' বলতে পারি।

কাশীরাম দাস: জন্মসময়, পরিচয় ও কাব্য-বৈশিষ্ট্য

কাশীরাম মহাভারতের প্রায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি বর্ধমান-জেলার সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার আউশগড়-ই ছিল তাঁর কর্মস্থল। সেখানকার জমিদারবাড়িতে থেকে তিনি স্থানীয় পাঠশালায় অধ্যাপনা করতেন। কবি ছিলেন চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উপাসক। সম্ভবতো সেই কারণেই তাঁর রচনায় বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশীরাম তাঁর বিরাট অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেন। বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ছাড়াও তিনি পুরাণ-বর্ণিত বহু কাহিনী তাঁর রচনায় স্থান দেন। জায়গায় জায়গায় তাঁর বর্ণনা যেমন সুন্দর, তেমনি কবিত্বপূর্ণ। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি অনিন্দ্যকান্তি অর্জুন সম্পর্কে বলেছেন—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥"

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হইতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কাশীরাম মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, ও বিরাটপর্ব রচনা ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতে আমরা যে-সব পর্ব পাই সেগুলির রচয়িতা তাঁর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্যস্থানীয় আরও অনেকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যেমন বাংলাদেশের প্রাণের সুর প্রতিধ্বনিত, কাশীরামের মহাভারতও তেমনি বাঙালী ঘরানায় রচিত।

অনুশীলনী

১। রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২। কৃত্তিবাস ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। কাশীরাম দাসের পরিচয় দিয়া তাঁহার মহাভারত-এর বিশেষত্ব বর্ণনা কর।
৪। কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-পালাগানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ ঃ—
(ক) অদ্ভুতাচার্য ; (খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ; (গ) সঞ্জয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

(ক) শ্রীচৈতন্যের জীবন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতের এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম, মানব-প্রেমধর্মেরই নামান্তর মাত্র। তাঁর কাছে সবই ছিল কৃষ্ণময়,—অর্থাৎ নর ও নারায়ণের মধ্যে তিনি অভেদ কল্পনা করতেন। মানবতা-বোধে পরমবিশ্বাসী এই মানুষটি তাই ব্রাহ্মণ হয়েও আচণ্ডাল সকলকেই প্রীতিভরে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করতে সারা ভারতবর্ষে আজ যে কর্মোদ্যোগ দেখা যায়, বাংলাদেশে তার সূত্রপাত যে তিনিই করেছিলেন ইতিহাসই তার সাক্ষী। প্রেম, মৈত্রী ও করুণার প্রতিমূর্তি তিনি।

জন্ম, বংশ-পরিচয়, পাণ্ডিত্য

বঙ্গাব্দ ৮৯২ সালে (খ্রীষ্টীয় ১৪৮৫ অব্দে)-র ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম—জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম—শচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী, পরে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে। শ্রীচৈতন্য তাঁর দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে শ্রীচৈতন্যের ডাকনাম ছিল নিমাই এবং পোশাকী নাম বিশ্বম্ভর। তিনি দেখতে ছিলেন সুদর্শন, গায়ের রঙও ছিল তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল। সেই কারণে তাঁর আর এক নাম ছিল—গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র। শৈশবের দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে তিনি যখন যৌবন-সীমায় উপনীত হন তখন তাঁর অন্যরূপ। গঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের টোলে পড়াশুনা ক'রে

তিনি ক্রমে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিতে পরিণত হন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ভারতের নানা অংশে। বহু প্রাচীন পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে তর্ক করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেন। বিশ্বম্ভর তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। তিনি নিজে যে টোল প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করত। এই সময় লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইতিপূর্বেই গত হয়েছিলেন।

বিবাহ, দীক্ষাগ্রহণ, নাম-সংকীর্তন

বিবাহের পর বিশ্বম্ভর একবার পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। প্রায় একবছর পর যখন দেশে ফিরে আসেন তখন লক্ষ্মীদেবী পরলোক গমন করেছেন। সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও বিধবা জননী শচীদেবীর সকাতর অনুরোধ তিনি এড়াতে পারেন না। শচীদেবীর মনে আশঙ্কা ছিল যে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের মতো বিশ্বম্ভরও না শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে সংসার ত্যাগ করে। তাই তিনি বিশ্বম্ভরকে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক সর্বসুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সংসারে বিশ্বম্ভরের আর মন বসল না কিছুতেই। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গয়াধামে গিয়ে তিনি ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তারপর নবদ্বীপে ফিরে এসে টোল দিলেন উঠিয়ে এবং হরিনাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমভক্তি প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

এই সময় তাঁর অনুরাগীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সারা বাংলাদেশ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসমান। বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশেরই বা বলি কেন, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামে বিরাট একটা সাড়া প'ড়ে যায়। এইভাবে

সন্ন্যাস, ভক্তিধর্মের প্রচার

বৎসরখানেক অতিবাহিত হবার পর, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ ক'রে কাটোয়ায় গিয়ে উপনীত হন। সেখানে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে (শ্রীচৈতন্য নামে) বেরিয়ে পড়েন তীর্থ-পরিক্রমায়। বহু তীর্থ ঘুরে অবশেষে তিনি পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হন। সেইখানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। যে আঠার বছর তিনি পুরীধামে ছিলেন, সেই কয়েক বছর বৈষ্ণবধর্মের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সময়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর ভক্তিধর্ম সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্যের মাধ্যমে। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণেও তিনি প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—নিত্যানন্দ, রঘুনাথ, অদ্বৈত আচার্য, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, বিজয়নগরের মন্ত্রী রামানন্দ, গৌড়েশ্বরের দুই মন্ত্রী শাকর মল্লিক ও দবিরখাস (যথাক্রমে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত), হরিদাস, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, বাসুদেব সার্বভৌম, কাশী মিশ্র, শিখি মাইতি, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস,

মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ, নরহরি সরকার, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গুণরাজ খাঁ, মালাধর বসু, নরোত্তম ঠাকুর, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে (আটচল্লিশ বৎসর বয়সে) পুরীধামে দেহত্যাগ করেন। দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই তিনি সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে বিসর্জন দেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁর ভক্তি-রসাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ষোড়শ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গসমাজের পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ, তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে-যুগের বাঙালী-সমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের উগ্র-গোঁড়ামিতে, মুসলমানী আদব-কায়দায় এবং তান্ত্রিক অনাচারে নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। জাতিভেদের অভিশাপে এবং মিথ্যা লোকাচারে দেশের মানুষ তখন আত্মিক উন্নতির কোনো পথ যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। দেশের সেই সংকটকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যেন সেই পথেরই সন্ধান দিল। সমাজের সকল আত্মিক দৈন্য দূরীভূত করতেই তিনি দেশের মানুষকে ভক্তিধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাণী ছিল—'জীবে দয়া ও নামে রুচি'। সর্বজীবে সমভাবে দয়া-প্রদর্শন ও ঈশ্বর-ভক্তিই যে মানুষের আত্মিক উন্নতির সোপান এই সত্যকে তিনি তাঁর নিজের আচরণের মধ্য দিয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিরোভাব : চৈতন্যধর্মের শিক্ষা

(খ) শ্রীচৈতন্য-জীবনী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে শুধু যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের উপকার হয়েছিল তা নয়, বাংলা-সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে তাঁর আবির্ভাবকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ব'লেই মনে হবে। কারণ, প্রধানত বাংলাভাষার মাধ্যমেই তাঁর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয় এবং সেই সুযোগে এদেশে যে বৈষ্ণবসাহিত্য গ'ড়ে ওঠে, বাংলাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে। তাছাড়া মহাপ্রভুর অলোক-সামান্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে জীবনী-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সাহিত্যের দিক থেকে তার মূল্যও বড় কম নয়। চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলি শুধু যে সেই মহাপুরুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁর ভক্তিধর্মের গুণকীর্তন করেছে তা নয়, সামাজিক শিক্ষার দিক থেকেও সেগুলি যেন বিশেষ একটি নৈতিক কর্তব্য পালন করেছে। চৈতন্য-জীবনীর মাধ্যমে আমরা একাধারে জানতে পারি তৎকালীন সমাজের ইতিহাস, লোক-চরিত্রের কথা, বৈষ্ণবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী এবং ভক্তিধর্মের তত্ত্বকথা।

চৈতন্যের সমসাময়িক যে-সকল ভক্তবৈষ্ণব তাঁর জীবনের ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন ক'রে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে চৈতন্য-সহচর ও সহপাঠী মুরারি গুপ্তই অগ্রণী। সংস্কৃত পদ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর বাল্যজীবন রচনা করেন। সে-গ্রন্থের নাম—'কড়চা', 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই তা প্রসিদ্ধ। মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীহট্ট-নিবাসী। তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত মহাপ্রভুর বাল্যলীলাকেই পরবর্তী জীবনীকারেরা প্রামাণ্যস্বরূপ

সংস্কৃতভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী

গ্রহণ করেন। এর পর ২৪-পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ানিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কাব্য ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক সংস্কৃতভাষায় রচিত দুটি প্রামাণ্য চৈতন্য-জীবনী। এই দু'খানি গ্রন্থ যে পরবর্তী জীবনীকারদের চৈতন্য-জীবনী রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছিল সে-কথা তাঁদের অনেকেই স্বীকার করেছেন। চৈতন্য-সমসাময়িক স্বরূপ দামোদর ও রূপ গোস্বামীর 'কড়চা' ও সংস্কৃতে রচিত চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ। শেষোক্ত এই দু'খানি গ্রন্থ আজ আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে-যুগে বাংলা-গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি এবং পণ্ডিত-মহলে সংস্কৃত ভাষারই ছিল প্রাধান্য। মহাপ্রভুর যে-সব জীবনী পরে বাংলাভাষায় রচিত হয়, তার সবগুলিই পদ্যে রচিত।

গোবিন্দদাসের 'কড়চা'

সমসাময়িক চরিতকার হিসাবে গোবিন্দদাসের 'কড়চা'-কে কেউ কেউ বাংলাভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম ও নির্ভরযোগ্য চৈতন্য-জীবনী ব'লে মনে করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু মূল পুঁথি না পাওয়া যাওয়াতে অনেকেই এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দিহান। গোবিন্দদাসের যে-পুঁথি পাওয়া গেছে সে-পুঁথির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। গোবিন্দদাস জাতিতে ছিলেন কর্মকার এবং বেশী লেখাপড়াও শিখতে পারেননি। কাজেই তাঁর পক্ষে এইরকম অনাড়ম্বর ভাষায় জীবনী রচনা হয়তো বা সম্ভব। মহাপ্রভুর পারিবারিক বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
শান্তমূর্তি শচীদেবী অতি খর্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস-রজনী॥"

চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ব'লে অনেকে মনে করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুঁথির আবিষ্কর্তা। বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল ব'লে অনেকেই একে প্রামাণিক গ্রন্থ বলতে নারাজ। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা যদি কখনও স্বীকৃত হয়, তাহ'লে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'-র মতোই একে মূল্যবান একখানি গ্রন্থ বলতে হবে। গোবিন্দদাস তাঁর রচনায় যেমন প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ কিন্তু সে-রকম কোনো বর্ণনা নেই। জয়ানন্দকে নির্ভর করতে হয়েছিল অপরের অভিজ্ঞতা ও জনশ্রুতির উপর। বাল্যকালে তিনি মহাপ্রভুকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহচর্যলাভের কোনো সুযোগ তিনি পাননি। জয়ানন্দের গ্রন্থে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অবস্থার অনেক কথাই জানা যায় বটে, কিন্তু

মহাপ্রভুর ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তেমন কিছু নাই; অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা ও পৌরাণিক কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সম্ভবতো এইসব কারণেই এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে অনাদৃত ছিল। তাছাড়া, জয়ানন্দের রচনায় কবিত্বের বিশেষ অভাব, পদ্যে রচিত হ'লেও বহু ক্ষেত্রে ভাষা গদ্যধর্মী, নীরস ও ছন্দের ত্রুটিতে পূর্ণ।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'

চৈতন্যপরবর্তী যুগে বাংলাভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবন-দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-ই সম্ভবতো প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের আদিনাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবতের অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত ব'লে এর নাম রাখেন—'চৈতন্যভাগবত'। বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা কঠিন। কারণ, কেউ বলেন তিনি ১৪২৯ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেউ বলেন ১৪৫৭ শকাব্দে। কিন্তু, তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীর মধ্যভাগে সে-বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা এমন সুন্দরভাবে তৎকালীন অন্য কোনো বাংলা জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ভাগবতকে অনুসরণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সমপর্যায়ে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন ব'লে ভক্তসমাজে গ্রন্থখানির বিশেষ আদর। পরবর্তী জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' ব'লে অভিহিত করেছেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' যেন তৎকালীন সমাজের একখানি উজ্জ্বল দর্পণ। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, চৈতন্য-পূর্ববর্তী বঙ্গসমাজের ধর্মজীবন কেমন তমসাচ্ছন্ন ছিল এবং চৈতন্যের আবির্ভাবে কেমন ক'রে সেই তমসা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'

সাহিত্য-গবেষকদের মতে বৃন্দাবন দাসের পরেই লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়। ইতিহাসের দিক থেকে এই গ্রন্থের মূল্য অল্প হ'লেও, কাব্যের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। স্বরাঘাতপূর্ণ ছন্দে রচিত লোচনদাসের এই চৈতন্যজীবনী কাব্যসুষমায় মণ্ডিত। লোচনদাস বৈষ্ণব-গীতিকবিতারও একজন সার্থক কবি। মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' অবলম্বন ক'রে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন এবং অনেকটা মঙ্গলকাব্যের আদর্শেই তা রচিত। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। বৃন্দাবন দাসের রচনায় বৈষ্ণবজনোচিত দীনতার যে অভাব আছে লোচনদাসের রচনায় তা নাই। কবি তাঁর রচনাকে উপভোগ্য কাব্যসাহিত্যে পরিণত করতে গিয়ে স্থানবিশেষে স্বকল্পিত অনেক বিষয়েরও অবতারণা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনী হিসাবে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' সার্থক না হ'লেও, কাব্যকাহিনী হিসাবে যে বিশেষ উপভোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোচনদাস ছিলেন বর্ধমান-জেলার কোগ্রাম-নিবাসী। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের নিকটবর্তী কোনো সময়ের রচনা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আর একখানি চৈতন্যজীবনী রচিত হয়। তার নাম—'চৈতন্যচরিত্র' রচয়িতা—চূড়ামণি দাস।

চৈতন্য-জীবনীসাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে-কথা প্রায় সর্ববাদীসম্মত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণবসমাজে শাস্ত্রগ্রন্থের মতোই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। 'চৈতন্য-ভাগবত'-এ মহাপ্রভুর জীবনের শেষ অধ্যায় বর্ণিত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণতা দূর ক'রে একখানি পূর্ণাঙ্গ চৈতন্য-জীবনী রচনার প্রস্তাব নিয়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে উপস্থিত হন। কবিরাজ গোস্বামী (এই নামেই তিনি বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত) সে-সময় বৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি বৈষ্ণব-সমাজের অনুরোধ রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি। সাত বছরের অক্লান্ত ও আন্তরিক পরিশ্রমের পর তিনি তাঁর রচনা সমাপ্ত করেন (খ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীর প্রথম দশকে)। কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' একাধারে চৈতন্য-জীবনী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ইতিহাস। এর মধ্যে একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের উত্থান ও পরিণতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা। মহাপ্রভু প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী একজায়গায় লিখেছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'

"জীবের দুঃখ হেরি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

এই উক্তি মহাপ্রভুরই উক্তি, এবং এই স্বল্প কথার মধ্য দিয়েই তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। সর্বজীবের আত্মিক উন্নতি কামনাই যে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সাধনা ছিল এই কথার মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; ঈশ্বর-ভজনায় যে সকলেরই সমান অধিকার আছে, জাতিভেদের কোনো প্রশ্নই যে সেখানে উঠতে পারে না, মহাপ্রভুর সেই আদর্শকেও কবিরাজ গোস্বামী সুস্পষ্ট করেছেন এই কথায়—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-এর সাহায্য নিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী (রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব গোস্বামী)-দের কাছে চৈতন্য-কাহিনী শুনে তা কাজে লাগিয়েছেন। এ-বিষয়ে তিনি স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস ও লোকনাথ গোস্বামীর কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। তাছাড়া, মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' এবং কবিকর্ণপুরের কাব্য ও নাটক থেকেও তিনি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো

এই যে, তিনি একজন প্রকৃত ভক্তবৈষ্ণব। বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে, ভক্তির পুণ্যধারায় এবং সর্বোপরি পাণ্ডিত্যে তিনি মহাপ্রভুর যে অপূর্ব জীবন-ইতিহাস রচনা ক'রে গিয়েছেন তার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য প্রায় সমান। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা তথা দিব্যোন্মাদের যে অপূর্ব বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তাঁর পূর্ববর্তী কোনো চরিতকারের রচনায় সে-রকমটা নেই। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার বর্ণনায়। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কে তাই পরস্পরের পরিপূরক বলা যেতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান বর্ধমান-জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর-গ্রামে। এই ঝামটপুর-কে অনেকে আবার হুগলি-জেলার অন্তর্গত বলে মনে করেন। তাঁর পিতার নাম—ভগীরথ, মাতার নাম—সুনন্দা। শেষজীবন তিনি বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন।

অনুশীলনী

১। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা কর।

২। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকারদের নামোল্লেখপূর্বক তাঁহাদের রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৩। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। টীকা লিখ :—

(ক) গোবিন্দদাসের 'কড়চা'; (খ) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'; (গ) লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গীতিসাহিত্য

গীতিসাহিত্যের সংজ্ঞা

বাংলা-সাহিত্যের জন্ম হয় গানে। এদেশের শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ, জল, মাটি, ও আবহাওয়া সবই যেন স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের অনুকূল। সুরের মধ্য দিয়েই এদেশের মানুষ মনের কত না বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে এবং সেই সুরকে অবলম্বন ক'রেই গ'ড়ে ওঠে কীর্তন-পদাবলী; শ্যামাসঙ্গীত; বাউল গান; সারি, জারি, ভাটিয়ালী গান; ব্রতকথা ও পাঁচালি, পল্লীর বারমাস্যা প্রভৃতি। এইভাবে বিভিন্ন যুগে এদেশে যে বিশেষ এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাকেই আমরা 'গীতিসাহিত্য' আখ্যায় অভিহিত ক'রে থাকি। এই গীতিসাহিত্য একদিকে যেমন ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার অবলম্বন হয়েছে মানবমনের বিচিত্র আকুতি ও লৌকিক আচার-আচরণ। এই জাতীয় সাহিত্যে কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-ই এর মূল কথা। বাংলাদেশে প্রাচীন যুগের 'চর্যাপদাবলী'-র মধ্য দিয়ে সার্থক গীতিসাহিত্যের সূচনা হয়, মধ্যযুগের 'বৈষ্ণব-পদাবলী' ও 'শাক্ত-পদাবলী'র মধ্যে হয় তার পুষ্টি-সাধন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিশেষ এক শাখার সাধন-ভজনকে কেন্দ্র ক'রে যেমন 'চর্যাপদাবলী'র উদ্ভব, তেমনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তিমার্গের পথ ধ'রে রচিত হয়েছে 'বৈষ্ণব-পদাবলী' আর শাক্ত-সম্প্রদায়ের ইষ্ট আরাধনাকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেছে 'শাক্ত-পদাবলী'। তাছাড়া বিভিন্ন লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য এবং বারব্রত জনপদ-কবিদের অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে বিচিত্র লোকগীতির সৃষ্টি করতে। এই জাতীয় গীতিসাহিত্যে বাংলা-দেশের সাহিত্যভাণ্ডার বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ।

(ক) বৈষ্ণব-পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা : জয়দেব

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যে-সকল কীর্তন-পদ রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সূচনা তা থেকেই। রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে সে যুগের কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস যে সকল গীতি-কবিতা রচনা করেন ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও সুরে তা অপূর্ব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রাম-নিবাসী কবি জয়দেব ছিলেন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভা-কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অমর কাব্য 'গীত-গোবিন্দ' রচনা করেন। সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হ'লেও 'গীত-গোবিন্দ'-এর শ্রুতিমধুর ভাষা বাংলাভাষারই সমগোত্রীয়। ভাষার এই শ্রুতিমাধুর্যে 'গীত-গোবিন্দ' আজও পাঠকচিত্ত জয় ক'রে নেয়। জয়দেবের ভক্তি-রসাত্মক এই পদাবলী একসময় বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পরবর্তী বহু বৈষ্ণবকবির রচনায় প্রেরণা

জুগিয়েছিলেন জয়দেব। তাঁর পদাবলীর শব্দলালিত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকেই—

(১) "নিন্দতি চরণমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং।
সা বিরহে তব দীনা।
মাধবমনসিজ বিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়িলীনা॥"

(২) "দিশি দিশি কিরতি সজলকণাজালং।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালং॥"

(৩) "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল-মলয়-সমীর।"

(৪) "অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ নিরাকুল-বকুল-কলাপ।"

বৈষ্ণব-সমাজে 'পদ' অর্থে গীতিকবিতা বা কীর্তনযোগ্য কবিতা-কেই বোঝায়। সাধারণভাবে গীতিকবিতা বলতে আমরা লিরিকধর্মী যে-কবিতাকে বুঝে থাকি, বৈষ্ণব-পদাবলী ঠিক সেই শ্রেণীর গীতিকবিতা নয়। অনেক বৈষ্ণব-পদ লিরিকধর্মী কবিতার পর্যায়ে পড়লেও বৈষ্ণব-পদাবলী মূলত ভক্তিরসের কবিতা, বৈষ্ণবদের সাধন-ভজনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়বস্তু

বৈষ্ণব-পদাবলী একাধারে সঙ্গীত, কবিতা ও ভক্তিরসের উৎস। ভক্ত-সাধকেরা এই জাতীয় পদাবলীর স্রষ্টা ব'লে, বৈষ্ণব-পদাবলীকে মহাজন-পদাবলীও বলা হয়ে থাকে। বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাই রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাই তাঁদের কবিতাবলীর উপজীব্য হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণের (ভগবানের) প্রতি যে প্রেম বা ভালোবাসা তারই নাম ভক্তি। কেউ তাঁকে ভালোবাসে প্রিয়তম ব'লে, কেউ বা সখারূপে, দাসরূপে, কিংবা সন্তানরূপে। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান রূপে জ্ঞান ক'রে যখন বৈষ্ণব-পদকর্তারা নিজেদের তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে চান, তখনই সৃষ্টি হয় শান্তরসের পদ। যেমন—

"মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়,
দেই তুলসী-তিল এ দেহ সমর্পলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥ (বিদ্যাপতি)

ভগবানকে প্রভু-রূপে জ্ঞান ক'রে ভক্তের যে ভক্তি-নিবেদন তাকেই বলা হয় দাস্য। বৈষ্ণব-পদকর্তারা এই দাস্যভাবে বিভাবিত হয়েও অনেক পদ রচনা করেছেন। ভক্ত যখন ভগবানকে সখারূপে জ্ঞান ক'রে প্রেম-নিবেদন করে তখন সেই ভক্তিকে বলা হয় সখ্য-ভক্তি। এই ভক্তিতে একদিকে যেমন সেবার মনোভাব থাকে, অন্যদিকে তেমনি থাকে ভগবানের প্রতি একাত্মবোধ। বাৎসল্যভাবেও ভগবানের প্রতি ভক্তি-নিবেদন করা যায়। ভগবানকে সেখানে কল্পনা করা হয় আত্মজ বা সন্তানরূপে। মা-যশোদার ভূমিকা গ্রহণ করে কোনো বৈষ্ণব কবি এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছে তাঁদের রচিত বাৎসল্য-রসাশ্রিত পদাবলীর মাধ্যমে। বৈষ্ণবদের

মতে মধুররসই হ'লো সর্বশ্রেষ্ঠ রস। ভক্ত যেখানে ভগবানকে প্রিয়তম দয়িতের আসনে বসিয়ে ভক্তি জানাতে চায়, সেখানেই ফুটে ওঠে—মধুর-রস। এই মধুর-রসের উপাসনায় একদিকে যেমন থাকে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা (অর্থাৎ শান্তভাব), অন্যদিকে তেমনি থাকে সেবা (অর্থাৎ দাস্য), বিশ্বাস (অর্থাৎ, সখ্যভাবে যে বিশ্বাস জন্মে সেই ভাব), স্নেহ-মমতা (অর্থাৎ, বাৎসল্য-ভাব), প্রেম (অর্থাৎ দয়িতভাবের মধুরতা)। সকল ভাবের মাধুর্যে মধুর-রস তাই অভিষিক্ত ও শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-পদাবলীতে শান্ত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ অপেক্ষা মধুর-রসের পদই বেশি। মধুর-রসের পদ বলতে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, রাধিকার অভিসার, মান, মাথুর (বিরহ) বিষয়ক কবিতাকেই বোঝায়। পূর্বরাগের পদ যেমন—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥" (চণ্ডীদাস)

বৈষ্ণব-পদাবলীতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা মধ্যযুগের বাংলাভাষা ও ব্রজবুলি। ব্রজ অর্থে বৃন্দাবন হ'লেও, ব্রজবুলি কিন্তু বৃন্দাবনের ভাষা নয়। মৈথিল ও বাংলা ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি' নামে যে কৃত্রিম অথচ ললিতমধুর ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলাদেশে, বৈষ্ণব-পদাবলী প্রধানত সেই ভাষাতেই রচিত। আধুনিক গায়কদের হাতে প'ড়ে বহু ক্ষেত্রে আবার পদাবলীর বহু শব্দ-পরিবর্তন ঘটেছে এবং আধুনিক অনেক বাংলা-শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বৈষ্ণব-গীতিকবিতায়। বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি বিশেষত্ব হ'লো এই যে, প্রত্যেক পদের শেষেই পদকর্তার নাম উল্লিখিত থাকে। তাকে বলা হয় ভনিতা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ পদাবলী যেমন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, তেমনি চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কিছু কিছু পদ রচিত হয়েছে চৈতন্য বা গৌরাঙ্গ-বিষয়কে অবলম্বন ক'রে।

পদাবলীর ভাষা : ব্রজবুলি

বৈষ্ণব-পদাবলীর-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি—বিদ্যাপতি। তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। পঞ্চ গৌড়েশ্বর মিথিলা-নৃপতি শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন তিনি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর কবিতা ছন্দে ও অলঙ্কারে বিশেষ সমৃদ্ধ। ভাব ও রসের দিক থেকেও তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাই অপূর্ব। ভাষার মাধুর্যে ও বর্ণনার চাতুর্যে বিদ্যাপতির পদাবলী তুলনাহীন। 'পূর্বরাগ' ও 'বয়ঃসন্ধি'-বিষয়ক কবিতা রচনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

বিদ্যাপতি

"জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নবজলধর বিজুরি-রেহা, দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

ধনি অলপ বয়সি বালা
জনু গাথলি পুহপ মালা।
থোরি দরসে আশ না পূরল, বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥"

[শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির রূপবর্ণনা দিতে গিয়ে বিদ্যাপতি এখানে বলেছেন যে, গোধূলি-বেলায় যখন রাইধনি অর্থাৎ শ্রীরাধা ঘরের বাইরে এলেন তখন মনে হ'লো যেন মেঘের বুকে বিদ্যুৎ খেলে গেল। শ্রীরাধার বয়স অল্প। কিন্তু, তাঁর সৌন্দর্য যেন সদ্যরচা একখানি পুষ্পমাল্যের মতো। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দর্শন পেয়ে যেন আশা মিটল না, সেই সৌন্দর্যানুভূতি উপভোগের ইচ্ছা যেন প্রবল হয়ে উঠল।]

বিদ্যাপতি মৈথিল-কবি হ'লেও তাঁর পদাবলী বাংলাসাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। তার কারণ বোধ হয়, তাঁর সুললিত ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার খুব বেশী পার্থক্য নেই। বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর এ মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর', 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল' কিংবা 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়ামুখ চন্দা' প্রভৃতি পদ বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে আদৃত।

বিদ্যাপতির মতোই চণ্ডীদাসও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অদ্বিতীয় কবি। বস্তুত ইনিই বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলীর আদি কবি। কিন্তু 'চণ্ডীদাস' এই নামটি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক জটিল-সমস্যা যে, আজও তার কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়নি। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আমরা যে চণ্ডীদাসকে পাই তিনি বড়ু চণ্ডীদাস, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এর রচয়িতা। দীন চণ্ডীদাস নামে পদাবলী-রচয়িতা এক চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়—কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি চৈতন্য-পরবর্তী কবি। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পদাবলী-রচয়িতা কোনো চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই ছিলেন, তাঁর ভাবধারা চৈতন্য-পরবর্তী যুগের স্বনামধন্য কবি গোবিন্দদাস, বিশেষ ক'রে জ্ঞানদাসকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাসও হ'তে পারেন। কিংবা অন্য কোনো চণ্ডীদাস-ও হ'তে পারেন। মোটকথা, চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেই যে পদাবলী-রচয়িতা একজন 'চণ্ডীদাস'-এর আবির্ভাব হয়েছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত। কারণ, ইতিহাসই বলে যে মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করতেন, এবং গঙ্গাতীরে একসময় মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বাংলার কবি চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। যাই হোক, পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস যে একজন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সহজ, সরল অথচ মধুর ভাষায় তিনি যে-সব পদ রচনা ক'রে গিয়েছেন যুগ যুগ ধ'রে তা বৈষ্ণব-ভক্তদের যেমন ভক্তিরসে আপ্লুত করেছে, তেমনি পাঠকচিত্ত জয় করেছে অনাবিল এক আনন্দরসে। চণ্ডীদাস একাধারে কবি ও সাধক। তাই তাঁর পদাবলী একদিকে যেমন কবিত্বমাধুর্যে উজ্জ্বল, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবরসে সমৃদ্ধ। বিদ্যাপতি যেমন আনন্দের অভিব্যক্তিতে নিপুণতা দেখিয়েছেন, চণ্ডীদাস তেমনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দুঃখের অনুভূতি প্রকাশে। রাধা-বিরহের করুণভাব যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে চণ্ডীদাসের পদে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। বিদ্যাপতি যেমন শ্রীরাধার

চণ্ডীদাস

সৌন্দর্য-বর্ণনায় স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, চণ্ডীদাস তেমনি কৃতিত্ব দিয়েছেন শ্রীরাধার অন্তরের অনুরাগ প্রকাশে। চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ'-এর রাধিকা—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসি যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি॥"

এই চণ্ডীদাসের মানবতার আদর্শও ছিল সার্থক। তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" চণ্ডীদাস ছিলেন রাঢ়-অঞ্চলের কবি। কেউ বলেন, বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে তাঁর জন্ম, কেউ বলেন বাঁকুড়া-জেলার ছাত্না গ্রামে। তিনি ছিলেন 'বাশুলী'-উপাসক।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব-যুগের শেষ দিকে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (সম্ভবতো ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে) বিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। বর্ধমান শহরের কিছু উত্তরে কাঁদ্ড়া-গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃক-নিবাস। সাধনক্ষেত্রে তিনি চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দের শিষ্য এবং সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। অবশ্য বিদ্যাপতিরও কিছু কিছু প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী ও চৈতন্যের অনন্য-সাধারণ জীবনীই ছিল তাঁর পদাবলী-রচনার উৎস। ব্রজবুলি ও খাঁটি বাংলা, উভয় ভাষাতেই তিনি অজস্র কবিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে ভাবের গভীরতা যেমন আছে, তেমনি আছে ভাষার লালিত্য। শ্রীরাধিকার 'আক্ষেপানুরাগ' বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শ্রীরাধিকার জবানীতেই বলেছেন—

জ্ঞানদাস

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

জ্ঞানদাসের এই পদের তুলনা সমগ্র বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে নাই।

জ্ঞানদাসের সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি হলেন গোবিন্দদাস (গোবিন্দদাস কবিরাজ)। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (সম্ভবতো ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে) তাঁরও জন্ম হয় বর্ধমান-জেলায়। শ্রীখণ্ড-গ্রামের অধিবাসী ও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ্ চিরঞ্জীব সেন (কবিরাজ) ছিলেন তাঁর পিতা। গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁরই উপদেশে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। গোবিন্দদাসের পদাবলী যেমন ভাবসমৃদ্ধ, তেমনি তা কাব্যালঙ্কারে ভূষিত ও ভক্তি-রসাপ্লুত। জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, গোবিন্দদাসকেও তেমনি বলতে হয় বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। বাংলাসাহিত্যে গোবিন্দদাস ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্বীকৃত। পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস রাধাপ্রেমের যে গভীরতা প্রকাশ করেছেন,

গোবিন্দদাস

ভাবমাধুর্যের দিক থেকে তা যেমন চিত্তাকর্ষক, শিল্পকলাচাতুর্যের দিক থেকেও তেমনি প্রশংসনীয়। যেমন—

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥"

চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবসাহিত্যে যে-সব পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাসের আসন সর্বোচ্চে। কারণ, তিনি একাধারে কবিতার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সজ্জায় যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, আর কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে ভক্তিধারার যে রসনির্ঝর প্রবাহিত দেখা যায় তাও যেন তুলনাহীন। এই জাতীয় পদ যেমন—

(১) "নীরদ-নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব॥"

(২) "চম্পক শোন কুসুম-কণকাঞ্চল জিতল গৌরতনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব জগ-মন-মোহিনী ভাঙনি রে॥"

[গৌরাঙ্গবিষয়ক এই জাতীয় সমস্ত পদকেই বলা হয়—**গৌরচন্দ্রিকা**। চৈতন্যের তিরোধানের পর যখন কোনো আসরে বৈষ্ণব-পদাবলী বা পালাকীর্তন হ'ত তখন গৌরাঙ্গবিষয়ক এই 'গৌরচন্দ্রিকা'র কোনো পদ গান ক'রে অনুষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হ'ত। বৈষ্ণব-সমাজে এখনও এই রীতি প্রচলিত।]

অন্যান্য পদকর্তা

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরও অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁদের পদাবলী দ্বারা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এইসব কবিদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যাঁরা প্রখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হলেন বলরাম দাস, অনন্ত দাস, বাসুদেব ঘোষ, শশিশেখর, জগদানন্দ প্রমুখ কবি। বাৎসল্য-রসের পদাবলী রচনা ক'রে বলরাম দাস যেমন খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তেমনি বাসুদেব ঘোষের সুখ্যাতি হয়েছিল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা ক'রে। বলরাম দাস ছিলেন চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দের শিষ্য এবং জ্ঞানদাসের সমকালীন কবি। তাঁর রচনায় ব্রজবুলির প্রভাব নেই, তিনি সম্পূর্ণ বাঙালী ঘরানায় পদ রচনা করেছিলেন। বাসুদেব ঘোষের গৌরচন্দ্রিকার পদ কখনও ব্রজবুলি-প্রভাবান্বিত, কখনও বা বাংলা-ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যেমন—

"রজত কাঞ্চন নানা আভরণ
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাঙা উতপল চরণ-যুগল
তুলিতে নূপুর বাজে॥

শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে ধর ধর ধর কোলে
গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥

(খ) শাক্ত-পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা-গীতিসাহিত্য একদিকে যেমন বৈষ্ণব-পদাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি শাক্ত-পদাবলী তার সমৃদ্ধিসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। শাক্তধর্মী কবির 'মঙ্গলকাব্য' রচনা ক'রে যেভাবে আদ্যাশক্তি চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত সে আখ্যানমূলক কাব্যের ধারা এদেশে প্রবাহিত হয়েছিল। তারই পাশাপাশি আবার আখ্যানকে বাদ দিয়ে ভাবমূলক গীতিকবিতার সৃষ্টি ক'রে বৈষ্ণব কবিরা দেশের মানুষের সহজাত সঙ্গীত-পিপাসা দূর করেছিলেন। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার প্রভাব ক্রমশঃ এমনভাবে বিস্তার-লাভ করে যে, আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়, পদাবলী-কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার পল্লীপ্রান্তর। কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন উপাখ্যান খণ্ড খণ্ড হয়ে গীতি-কবিতার আকার ধারণ করে এবং এদেশে শাক্ত-পদাবলীর সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। সাহিত্যের এই নতুন ধারা প্রবর্তিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

শাক্ত-পদাবলীর সূত্রপাত

শাক্ত পদাবলীর ধারা দু'টি। অর্থাৎ, উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত। উমাসঙ্গীতের মধ্যে যেমন বাঙালীর বাৎসল্যরসাশ্রিত ঘরোয়া সুরটি বর্তমান, শ্যামাসঙ্গীতে তেমনি ভক্তি-রসাশ্রিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য। উমাসঙ্গীত-রচয়িতারা মহাশক্তি চণ্ডীর রূপকে যেমন কন্যারূপে কল্পনা ক'রে বাৎসল্য-রসের প্রশ্রয় দিয়েছেন, শ্যামাসঙ্গীতকারগণ তেমনি আদ্যাশক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে ভক্তিরসের আশ্রয় নিয়েছেন। উমা ও শ্যামা যথাক্রমে মহাশক্তির লৌকিক ও আধ্যাত্মিক রূপ। উমাসঙ্গীতে আমরা পাই উমার শৈশবলীলা, বিবাহ, শিবের সংসারে তাঁর দুঃখ-কষ্ট, মা-মেনকার আক্ষেপ, শরৎকালে উমার পিত্রালয়ে আগমন এবং বিজয়ার দিন পতিগৃহে যাত্রার বিবরণ। উমাসঙ্গীতে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-ই যেন প্রাধান্যলাভ করেছে এবং তার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে সাধারণ বাঙালীর আনন্দ-বেদনার সহজ সুর। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বাৎসল্যরসের পদে যেমন মা-যশোদার স্নেহ-মমতা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি উমাসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উমার প্রতি মা-মেনকার স্নেহবিগলিত রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন শাক্তকবিরা। উমা যেন বাঙালীর ঘরের কন্যা, আর মেনকা হলেন সেই মা, যে-মা কন্যার দারিদ্র্য-নিপীড়িত সংসারের কথা চিন্তা ক'রে দিনরাত চোখের জলে বুক ভাসান, স্বামীকে পাঠিয়ে দেন ক'দিনের জন্য কন্যাকে স্বামীর ঘর থেকে নিয়ে আসতে।

উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত

ভিখারী শিবের সংসারে গিরিরাজ-দুহিতা কখনও যে সুখে থাকতে পারেন না, সেই সত্যকেই যেন আঁকড়ে থাকতে চান মেনকা। শরৎকালে যখন আকাশে বাতাসে মা-আনন্দময়ীর আগমনীর সুর বেজে ওঠে তখন গিরিরাজকে উদ্দেশ ক'রে মেনকা বলেন—

"শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই।"

ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের শর্তে উমা যখন আসেন বাপের বাড়িতে, স্নেহাতুরা মা-মেনকার তখন আনন্দের সীমা থাকে না। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা ক'রে বলেন—

"কেমন ক'রে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল্ না তাই।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে
জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥"

তারপর বিজয়ার দিন যখন আবার উমার পতিগৃহে যাত্রার সময় উপস্থিত হয়, মেনকা তখন দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পাড়া-পড়শীদের উদ্দেশ ক'রে ব'লে ওঠেন—

"কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হয়ে দিব বিদায়॥"

বাৎসল্য ও করুণ রসে মিশ্রিত উমাসঙ্গীতগুলি শাক্ত-পদাবলীর একটি বিশিষ্ট ধারা। এই ধারার উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হলেন—রাম বসু, দাশরথি রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়), কমলাকান্ত প্রভৃতি। রাম বসুর 'কও দেখি উমা', 'কেমন ছিলে ভিখারী হরের ঘরে'; দাশরথি রায়ের 'গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল'; কালী মির্জার 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে' প্রভৃতি উমাসঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়ে যে বাৎসল্য ও করুণ রসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে পাঠকচিত্ত স্বভাবতই তাতে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উমাসঙ্গীতের বেশির ভাগ রচয়িতাই জনপদ-কবি বা কবিয়াল। সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন-ও 'আগমনী', বিজয়া'র বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক গীত-কবিতা রচনা করেছিলেন এবং বাংলার ঘরে ঘরে এখনও সেই গানের সুর শুনতে পাওয়া যায়।

শাক্ত-পদাবলী ও রামপ্রসাদ

শাক্ত-পদাবলীর দ্বিতীয় ধারা হ'লো শ্যামাবিষয়ক আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত। বৈষ্ণব-পদকর্তারা যেমন দয়িতাভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের আরাধনা করেছেন এবং সেই সাধনার রূপটি যেমন ফুটে উঠেছে মধুর-রসাশ্রিত বিভিন্ন বৈষ্ণব গীতিকবিতায়, শাক্ত-কবিরা তেমনি সন্তানভাবে বিভাবিত হয়ে শ্যামারূপিণী আদ্যাশক্তির আরাধনা করেছেন এবং তাঁদের সেই সাধনার রূপটি ফুটে উঠেছে ভক্তিরসাশ্রিত বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীতে। জগজ্জননী মহামায়াকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে শাক্তকবিরা যেভাবে শিশুর সারল্য নিয়ে মনের দুঃখ-সুখের কথা বলেছেন, আবদার জানিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েও বাঙালীর একটা ঘরোয়া সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে, অথচ জীবনের তত্ত্বকথাও প্রকটিত হয়েছে একই সঙ্গে। বাংলা শাক্ত-পদাবলীর, বিশেষত শ্যামাসঙ্গীত বা কালীকীর্তনের প্রবর্তক হলেন শক্তিসাধনায় সিদ্ধ কবি রামপ্রসাদ। ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২০ খ্রীঃ অব্দে তাঁর জন্ম হয়। সন্ন্যাস অবলম্বন না করে এবং সংসারে বাস ক'রেও তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদ একাধারে সাধক, পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁর রচনা একদিকে যেমন সহজ ও সরল, অন্যদিকে তেমনি ভাবসমৃদ্ধ। যেমন—

(১) "মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥"

(২) "মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥"
কালী নামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥

(৩) "মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥"

রামপ্রসাদ তাঁর এইসব গীতিকবিতায় যে-সুর দিয়েছিলেন 'রামপ্রসাদী সুর' নামে তা পরিচিত। তাঁর সেই সুরের ধারা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে পূর্বের মতোই প্রবহমান। রামপ্রসাদের পর আরও বহু কবি তাঁরই রচনার ধারাকে অনুসরণ ক'রে অজস্র কালীকীর্তন রচনা করেছেন। এই সাধক-কবি ছাড়া শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে এমন আরও কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায় যাঁদের নামও

রামপ্রসাদ। যেমন—পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ, তান্ত্রিক-সাধক রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, কবিয়াল রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শাক্ত-পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে সাধক কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য) ও গোবিন্দ চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি কমলাকান্ত। প্রায় আড়াইশ' পদ রচনা করেছিলেন তিনি। বর্ধমান-জেলায় অম্বিকা-কালনা গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃক-বাসভূমি। কমলাকান্তের পদাবলীতে ভক্তিরসের যে অপূর্ব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। উত্তরবঙ্গের সাধক-কবি গোবিন্দ চৌধুরীর রচনাতেও এই ভক্তির সুর এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তা বিশেষ সমৃদ্ধ। শাক্ত-সঙ্গীত রচনা ক'রে সে যুগে আর যাঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দেওয়ান রঘুনাথ রায়, শশিমুখী দেবী, করুণাময়ী, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির নামও স্মরণযোগ্য। এখানে এ-কথা উল্লেখ করলে বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সাধক-কবি (কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের শ্যামাসঙ্গীত পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে, এবং তাঁর কণ্ঠে প্রায়ই তাঁদের রচিত শ্যামাসঙ্গীত গীত হ'ত।

অন্যান্য শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা

[বাংলাদেশের গীতিসাহিত্যে বাউল-গানেরও বিশেষ একটা স্থান আছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে বাংলাদেশে বাউল-ধর্ম তথা বাউল-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় খ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীতে। বাউল-সম্প্রদায়ের মানুষ সহজিয়া-পন্থী। অর্থাৎ, ভগবানের সঙ্গে তাঁরা যে একাত্মতা অনুভব করতে চান, তা কোনো জটিল সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নয়। মনের আবেগে তাঁরা ভগবানকে ডাকেন এবং সেই পথেই মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়ান। বাউল-ধর্মমতের সঙ্গে একসময় নানা ধর্মমতের সমন্বয় ঘটেছিল। এ বিষয়ে মুসলমান-ধর্মের সুফী মতবাদও বাউল-সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করে। বাংলার বাউলেরা সুফী-সাধকদের মতোই কোনরূপ আচার পালন না ক'রে, শুধু মনের ভক্তি দিয়ে ঈশ্বর-সাধনার পক্ষপাতী। সাধন-ভজনের অঙ্গ হিসাবে তাঁরা একসময় যে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তার ধারা আজও নষ্ট হয়ে যায়নি। বাংলা-সঙ্গীতে বাউল-গায়কদের সহজ অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর উল্লেখযোগ্য একটি সংযোজনা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাউল-গানের ভাবে ও সুরে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বহু গান বাউলের সুরে বেঁধেছিলেন। বাউল-গান ও বাউল-সুর বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। এইসব গানের মধ্য দিয়ে বাউল-সাধনার যে সহজ অথচ ভাবপূর্ণ রূপটি ফুটে ওঠে তার যেন কোনো তুলনা নেই। যেমন—

বাউল-সঙ্গীত

(১) "(মোর) যাইতে তো চায় না রে মন মক্কা-মদিনা।
(ঐ যে) বন্ধু আমার আছে, আমি রই রে তারি কাছে,
(আমি) পাগল হৈতাম, দূরে রইতাম
তারে চিনতাম রে যদি না।"

(২) "আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
আমি হারায়ে সেই মানুষে
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে ॥"

(৩) "কোথায় আছে রে দীন দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গ ল'য়ে খবর করো ভাই ॥"

বাউল-গানে 'সাঁই'-শব্দটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যাবে। 'সাঁই' অর্থে স্বামী। বাউল-সাধকেরা ভগবানকে স্বামী বা সাঁই ব'লেই ডাকেন। বাউল-সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন—মুসলমান-বাউল লালন ফকির, গগন হরকরা, রসিক বাউল, পুলিন বাউল, জলধর, বনমালী, রেজ্জো ক্ষ্যাপা, যাদুবিন্দু প্রভৃতি।]

অনুশীলনী

১। গীতিসাহিত্য বলিতে কী বুঝায় ? বাংলাদেশের গীতিসাহিত্যের প্রধান দুইটি ধারার নাম কর ও সংক্ষেপে তাহাদের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দাও।

২। বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়বস্তু কী ? উদ্ধৃতি সহযোগে সেই বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বর্ণনা কর। মধুর-রস বলিতে কী বুঝায় ?

৩। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। শাক্ত-পদাবলীর দুইটি ধারা কী কী ? উহাদের স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনা কর।

৫। উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য কোথায় উদ্ধৃতি সহযোগে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৬। ইহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—
(ক) বিদ্যাপতি ; (খ) চণ্ডীদাস ; (গ) রামপ্রসাদ ; (ঘ) জ্ঞানদাস ; (ঙ) গোবিন্দদাস।

[দ্বিতীয় পর্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বাংলা-গদ্যের অনুশীলন

(ক) ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য

রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর (অর্থাৎ, খ্রীষ্টীয় ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা গিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনী এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত পদকর্তাদের পদাবলী কতকাল আর মানুষের বহুবিচিত্র রসতৃষ্ণা মেটাতে পারে? তাই সেই সময় থেকে মানুষের অন্তরের বাণী প্রকাশিত হবার নতুনতর এক পথ খুঁজে ফিরছিল। আর সুখের কথা এই যে, সুযোগও তার এসে গেল বিরাট একটা রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ) মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইংরেজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই, পর্তুগীজ মিশনারী-সম্প্রদায় এদেশে এসে বসবাস শুরু করেন এবং বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন প্রধানত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। বলতে গেলে তখন থেকেই (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই) বাংলা গদ্য-রচনার একটা ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। গদ্যরচনার প্রয়োজন সে যুগে দেখা দিয়েছিল প্রধানত শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মোপদেশ প্রচারের জন্য। ১৬-শ শতাব্দীর বিভিন্ন বাংলা রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু গদ্যের নমুনা পাওয়া গেলেও, সাহিত্যিক গদ্য তখনও দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। কতকগুলি পুরানো চিঠিপত্র, যেমন—কোচবিহারের মহারাজা নর-নারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজকে লিখিত চিঠি, এবং দলিল-দস্তাবেজে প্রাচীন বাংলা-গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-গ্রন্থে বাংলা-গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, অনেকের মতে সেই গদ্যই নাকি খাঁটি বাংলা-গদ্যের প্রাচীনতম রূপ। কিন্তু বইখানির রচনাকাল সম্বন্ধেই নানা মুনির নানা মত! কেউ বলেন ১৩-শ শতাব্দীর আগেই বইখানি লেখা হয়েছিল, কেউ কেউ আবার 'শূন্যপুরাণ'-পুঁথির রচনাকালকে ১৭-শ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে ফেলতে চান না। বইখানি যখনই লেখা হোক না কেন, তার ভাষাকে খাঁটি গদ্য বলতে অনেকেই নারাজ। কারণ, 'শূন্যপুরাণ'-এর গদ্য পদ্যেরই সঙ্কর-রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর, রূপ গোস্বামীর 'কারিকা' (১৬-শ শতাব্দীর) এবং নরোত্তম ঠাকুরের 'দেহ-কড়চা' (১৭-শ শতাব্দী)-র গদ্যও নিতান্ত সাধারণ ও অসংবদ্ধ। সাহিত্যিক স্পর্শ ঐ-সব রচনায় খুঁজে পাওয়া ভার!

বাংলা গদ্য-রচনার উদ্যোগপর্ব

আসলে, বাংলা-সাহিত্যে খাঁটি গদ্যের যে সূচনা হয়েছিল ১৭-শ শতাব্দীর শেষভাগে তার জন্য আমরা ইউরোপী মিশনারী-সম্প্রদায়, বিশেষত পর্তুগীজ পাদরি

সাহেবদের কাছে ঋণী। মিশনারী-প্রবর্তিত বাংলা-গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন মিলবে 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ' শীর্ষক একখানি খ্রীষ্টধর্ম-পুস্তিকায়। রচয়িতা—দোম আন্তনিও। রচনার নমুনাঃ "ব্রাহ্মণ—তুমি কারে ভজো? রোম-পরমেশ্বরের পুর্ণোব্রমেরে (অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্মকে)। ব্রা—তবে তোমরা বরো উতোম ভজোনো ভজো, আমরা তাহারে ভজি" ইত্যাদি। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে দোম আন্তনিও ছিলেন একজন বাঙালী জমিদার-পুত্র। ১৭-শতাব্দীর ষষ্ঠ-দশকের কোনো সময়ে পর্তুগীজ মগদস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে। একজন পর্তুগীজ পাদরি তাঁকে দস্যুদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনে নেন এবং তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ক'রে খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ক'রে তোলেন। সম্ভবতো প্রাণ বাঁচাবার ঋণ পরিশোধ করবার জন্যই তিনি পরে পাদরি সাহেবদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ঐ বইখানি লিখেছিলেন। সে যাই হোক, মিশনারীদের উদ্যোগে সেদিন এক বাঙালীর হাতেই যে বাংলা-গদ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল তাতে ভুল নেই। রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে দোম আন্তনিও যে গদ্যভাষার প্রয়োগ করেছিলেন তদানীন্তন যুগবিচারে তা অবশ্যই প্রসংসনীয়। যেমন—"রামের এক স্ত্রী, তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ তাহান ভাই লকন, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুর্দ করিলেন।" শব্দগত ভুলভ্রান্তি এবং তথ্যের অপূর্ণতা (যেমন, তাহান, লকন, রাজা অযোধ্যা প্রভৃতিঃ 'তাহান' হবে তাহার' 'লকন' হবে লক্ষ্মণ, 'রাজা অযোধ্যা' না হয়ে হবে 'অযোধ্যার রাজা দশরথ) থাকা সত্ত্বেও গদ্যের প্রকাশভঙ্গিটি সহজ এবং স্পষ্ট।

দোম আন্তনিও-র ধর্মপ্রচার-পুস্তিকা

এর পর, ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে লিখিত ও ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি বাংলা-গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান পাবার যোগ্য। রচয়িতা—পর্তুগীজ মিশনারী মানো-এল্-দ্য আসসুম্পসাউ। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি যখন এদেশে এসেছিলেন তখন যে বাংলাভাষা আয়ত্ত ক'রে যান (অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা), সেই ভাষাতেই তিনি বইখানি লেখেন। রচনায় সেকালে প্রচলিত ফারসী শব্দেরও বাহুল্য আছে। সে যাই হোক্, রোমান হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-গদ্যপুস্তক এই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। গদ্যপুস্তকই বা বলি কেন, বাংলা কোনো বই-ই এর আগে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। বইখানির মধ্যে (গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে) অবশ্য খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়েছে। ভাষায় নমুনা—"খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল, রক্তও পোছাইল, ওষধ্যও দিল, পরে দুইজন মিলিয়া দোস্ত হইল।" আসসুম্পসাউ পরে পর্তুগীজ ভাষায় একখানি বাংলা-ব্যাকরণ ও একখানি

মানো-এল্-দ্য আসসুম্পসাউ ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'

পর্তুগীজ-বাংলা অভিধানও রচনা করেন। কাজেই, বাংলা-গদ্যের অনুশীলনে তাঁর যে বিশেষ চেষ্টা ছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়।

১৮-শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যখন বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হ'লো তখন এলেন ইংরেজ ধর্মযাজকেরা। শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হ'লো তাঁদের ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র। সেখানকার উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন ধর্মযাজকের চেষ্টাতে বাংলা-গদ্যের যে অনুশীলন আরম্ভ হয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই ইংরেজ ধর্মযাজকদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, প্রথম বাংলা গদ্য-গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগী হন তাঁরা হলেন—উইলিয়ম কেরী, উইলিয়ম ওআর্ড, ও জোশুয়া মার্শম্যান। বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে,—শ্রীরামপুর শহরে। সেই ছাপাখানার মালিক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। ছাপার বিষয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক কর্মচারী ও সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ উইলকিন্স সাহেবের কাছে। চার্লস্ উইল্‌কিন্স-ই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখার প্রয়োজনে সর্বপ্রথম বাংলা-ছাপার হরফ প্রবর্তন করেন। এ-বিষয়ে পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। তাঁর ছাপাখানা থেকে বাংলা-হরফে ছাপা হয়ে বাংলা-গদ্যের প্রথম যে-বই প্রকাশিত হয়, তা হ'লো হ্যালহেড্ সাহেবের লেখা একখানি 'বাংলা ব্যাকরণ'। এর পর ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে খানকতক আইনের বই বাংলায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ডানকান্ কর্তৃক অনুবাদিত 'ইম্পে আইন' এবং ফস্টার সাহেবের অনুবাদ-করা 'কর্নওআলিশ কোড'। অবশ্য, বিষয়ের জটিলতা ও বিদেশী অনুবাদকদের অসম্পূর্ণ বাংলাভাষাজ্ঞান মিলে এইসব বইয়ের গদ্যকে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক ক'রেই তুলেছিল।

বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন : পঞ্চানন কর্মকার, চার্লস্ উইল্‌কিন্স প্রভৃতির উদ্যোগে গ্রন্থ-প্রকাশ

(খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় ১৯-শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই। বিলেত থেকে সদ্য-আগত, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে কলকাতায় 'কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম' স্থাপিত হয়। সেই কলেজে প্রাচ্য ভাষা (বিশেষত, সংস্কৃত ও বাংলা) বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শ্রীরামপুরের 'ব্যাপটিস্ট মিশন'-এর অন্যতম ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী। কেরী সাহেব ও তাঁর অধীনে কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও ফারসী মুন্সীর সাহায্যেই বাংলা-গদ্যগ্রন্থ রচনার চেষ্টা চলতে থাকে। কেরী সাহেব নিজেই কতকগুলি বাংলা বই লেখেন ও সম্পাদনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একখানি বাংলা ব্যাকরণ, বাইবেলের একটি সরল বঙ্গানুবাদ, একখানি বাংলা-ইংরেজী অভিধান, 'কথোপকথন' নামে একখানি গল্পের বই, আর

উইলিয়ম কেরী

"ইতিহাসমালা' নামে ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন। 'কথোপকথন' বইখানিতে তদানীন্তন কলকাতাবাসীর কথ্যভাষার নমুনা পাওয়া যায়। তাছাড়া, তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদনা ক'রেও প্রকাশ করেন। বাংলাভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশেও কেরী সাহেবের চেষ্টা ও যত্ন ছিল অনেকখানি।

বাংলা গ্রন্থাদি, বিশেষ ক'রে পাঠ্যপুস্তকাদি, রচনার ব্যাপারে কেরী সাহেবকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই অন্য দুই সহকারী অধ্যাপক —রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। রামরাম বসু প্রথমে কেরী সাহেবের মুন্সী ছিলেন, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলাভাষার অন্যতম সহকারী অধ্যাপক বা পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বইখানা প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে নানাদিক থেকে এ বইখানি বিশেষ মূল্যবান। একজন বাঙালীর লেখা এই বইখানিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এতে সংস্কৃত ও ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও জায়গায় জায়গায় রামরাম বসু রীতিমত সাহিত্যিক-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী, সেই সঙ্গে বসন্ত রায়, রাজা বিক্রমাদিত্য, গৌড়ের নবাব সোলেমান, তাঁর পুত্র দাউদ, দিল্লীর সম্রাট্ আকবর প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের বিষয় আমরা জানতে পারি এই বই থেকে। এই বই-এর ভাষার নমুনা: "তাহার অপূর্ব জল। সরোবরের চারিপার্শ্বে তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারি বেদি। চারিদিকে শ্বেত-প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের উপরে অপূর্ব বিরামের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।" এর পর ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে রামরাম বসুর দ্বিতীয় বই 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয়। কয়েকটি প্রচলিত পৌরাণিক গল্পের সংকলন এটি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুকাল ধ'রে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হ'ত।

রামরাম বসু

উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয় সহকারী ছিলেন সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। তিনি কলেজের পাঠ্যহিসাবে যে-সব গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে ছিল—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলী', 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি। শেষোক্ত বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইখানির প্রথম-ভাগ যেমন সংস্কৃত ও সমাসবহুল শব্দের দ্বারা ভারাক্রান্ত, তৎকালীন কথ্যভাষার প্রয়োগে দ্বিতীয়-ভাগটি আবার তেমনি সহজ। বিদ্যালংকারের 'রাজাবলী' বইখানিকে বাংলাভাষায় লিখিত মুসলমানযুগের ভারত-বর্ষের সর্বপ্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ বলা যায়। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছাড়া, পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরও দু'একজন অধ্যাপক কয়েকখানি গদ্য-পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁদের প্রায় সকলের রচনাভঙ্গিই ছিল বর্ণনামূলক এবং সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষাকেও তাঁরা প্রয়োজনমতো খাপ খাইয়ে নিতেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

বাংলা-গদ্যের প্রসারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলায় অভিজ্ঞ বাঙালী-অধ্যাপকেরা এবং কেরী সাহেবের মতো মিশনারীরা যে পরিশ্রম করেছেন সেজন্য বাঙালীমাত্রেই তাঁদের কাছে চিরঋণী। সেই সঙ্গে সেকালের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার দানও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে সেকালের বাংলাদেশে, বিশেষত রাজধানী কলকাতায়, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার যে-প্রবাহ বাঙালীসমাজে দেখা দেয় নবজাগ্রত এক চেতনা। সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সেকালের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। বাংলাভাষায় প্রথম যে সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মূলেও ছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় তথা ব্যাপটিস্ট মিশনের আন্তরিক চেষ্টা। কেরী সাহেবের উদ্যোগেই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন সেই পত্রিকার সম্পাদক। এরই মাসখানেক পরে সাপ্তাহিক-সংবাদপত্রের আকারে বের হয় 'সমাচার দর্পণ'। যতদূর জানা যায়, বাংলাভাষায় মুদ্রিত এখানিই হ'লো আদি সংবাদপত্র। মার্শম্যান নামে এর সম্পাদক থাকলেও পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন দেশীয় পণ্ডিতেরাই। এতে দেশবিদেশের খবরাখবর, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ প্রভৃতি অনেক তথ্য পরিবেশিত হ'ত। শ্রীরামপুর থেকে যখন 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়, প্রায় একই সময়ে আবার (অর্থাৎ, ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের মে-মাস নাগাদ) কলকাতা থেকে হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তার নাম—'বাঙাল গেজেটি' (অর্থাৎ 'বেঙ্গল গেজেট')। এতে অবশ্য মিশনারীদের কোনো হাত ছিল না; এই পত্রিকাখানি সম্পূর্ণরূপে বাঙালীদের উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। (বলা বাহুল্য, এইসব বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হবার অনেক আগেই কয়েকখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব সাময়িক-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই যেন শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম গদ্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। অনেক নতুন নতুন গল্প ও বহুবিচিত্র তথ্যের সন্ধান পেলেন তাঁরা এইসব কাগজের মধ্যে। ফলে, বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের চাহিদা আশাতীতভাবেই বেড়ে গেল। মাসিক-পত্রিকার আকারে একে একে বের হ'লো—'পশ্বাবলী', 'জ্ঞানোদয়', 'বিজ্ঞানসেবধি', 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি। আর, সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল—'সম্বাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন মিলে 'বেঙ্গল্ হেরাল্ড' নামে যে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, 'বঙ্গদূত' তারই বাংলা-সংস্করণ। এর পরে বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে যে কাগজখানি সবচেয়ে বেশী

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা হ'লো কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে, প্রথমে এটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তকবি এটিকে দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত করেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-ই বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। সেকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকমাত্রই ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর লেখক এবং সেই সূত্রে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতির ব্যাপারে এই পত্রিকার সহায়তাও অনেকখানি।]

(গ) রামমোহন রায় প্রমুখ গদ্যলেখকবৃন্দ

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী এক নব জাগরণের যুগ। যে-সব জ্ঞানী, গুণী ও মনীষী এই যুগে বাংলা তথা ভারতের জাতীয়-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অগ্রণী। ১৮১৮-১৯ খ্রীঃ অব্দে যখন শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় 'সমাচার দর্পণ'-এর মাধ্যমে এবং কলকাতার পাদরি সাহেবরা 'গস্পেল ম্যাগাজিন'-পত্রিকার ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ প্রচার করতে শুরু করেন, তখন রাজা রামমোহন রায়-ই হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি শিবপ্রসাদ শর্মার এই ছদ্মনামের আড়াল থেকে 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামে যে পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন, তার মধ্য দিয়েই তিনি মিশনারীদের ভুলগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। রামমোহন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। একদিকে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় যেমন তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, অন্যদিকে বেদ, উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল তেমনি। মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ করতে গিয়ে তিনি যে বাংলা-গদ্যের আশ্রয় নেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বে তার মূল্য অপরিসীম। রামমোহনের গদ্যরচনা প্রাঞ্জল ও মাধুর্যসম্পন্ন না হ'লেও, সাহিত্য-রসাশ্রিত বাংলা গদ্যের তিনিই জনক। সংস্কৃতকে অনুসরণ ক'রে তাঁর গদ্য-ভাষা সৃষ্ট হ'লেও, সে-ভাষা যে সাহিত্য-বিকাশের উপযোগী হয়েছিল সে-কথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁর নমুনা: "শতার্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা।...কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরাজ যাঁহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।" রামমোহন প্রধানত ধর্মতত্ত্ব, দর্শন-উপনিষদ, ব্যাকরণ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সম্ভবতো সেই কারণে তাঁর ভাষা সর্বত্র সরস ও অলঙ্কারমণ্ডিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু, গদ্যভাষার মধ্য দিয়ে কিভাবে 'বিচার-বিশ্লেষণমূলক

তত্ত্ব-কথার অবতারণা সম্ভব, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই তার পথ-প্রদর্শক। রামমোহন প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'পথ্যপ্রদান', 'পাদরি-শিষ্য-সংবাদ', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

[রাজা রামমোহন ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষে উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-ই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ব্রিস্টল-শহরে তিনি পরলোকগমন করেন।]

॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

বিদ্যাসাগরীয় ভাষা : সাধু গদ্যরীতির আদর্শ

বাংলা-গদ্যকে সাহিত্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাজা রামমোহন যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে প'ড়ে বাংলা-গদ্য সেখানেই সার্থক হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী যুগে বাংলা-গদ্যরীতিতে প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যের বিশেষ অভাব ছিল। বাক্যরচনার মধ্যে কোনো সংহতি ছিল না, তৎসম শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তদ্ভব ও দেশী শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে তারও সুনির্দিষ্ট কোনো রীতি বা পদ্ধতি গ'ড়ে ওঠেনি এবং ছেদ-চিহ্নাদির প্রয়োগে বাক্য কিভাবে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে বা বাক্যের মধ্যে শব্দগুলিকে কিভাবে সাজালে তা শ্রুতিমধুর হ'তে পারে সে-যুগের লেখকেরা সে-বিষয়ে সতর্ক বা যত্নশীল ছিলেন না। তখনকার লেখকদের কাছে ভাবের প্রকাশটাই ছিল বড় কথা, ভাষাকে শ্রীমণ্ডিত করবার ব্যাপারটা ছিল যেন গৌণ। বাংলা গদ্যকে সেই সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ক'রে তাকে সাহিত্যধর্মী ক'রে তুললেন বিদ্যাসাগর। নীরস তত্ত্বালোচনা ছাড়াও বাংলা গদ্য যে সার্থক সাহিত্য-রচনার বাহন হয়ে উঠতে পারে তিনি তার প্রমাণ দিলেন তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দ); 'শকুন্তলা' (১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর ভাষার নমুনা : "মহর্ষি শোকাকুল হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে ; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে ; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছে ; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কী আশ্চর্য ! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে ; না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কী দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।" বিদ্যাসাগর ভাষার এই যে শিল্পরূপ সৃষ্টি করলেন বাংলা সাধুভাষার আদর্শ হিসাবে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তা চ'লে এসেছে। বিদ্যাসাগরীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণে ও অলঙ্কারাদি প্রয়োগে বিশেষ একটি নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-বিস্তারের একটা মহান আদর্শ নিয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর সে কাজে সহায়ক হবে মনে ক'রেই তিনি প্রথম দিকে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন ; যেমন 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস'

'বাংলার ইতিহাস', 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'কথামালা', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি। তাঁর মৌলিক রচনাবলীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব', 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় প্রবন্ধমূলক রচনায় তিনি যে শুধু তাঁর যুক্তিসঙ্গত বিচার-বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সাহিত্যরস-সৃষ্টির অপূর্ব একটা দক্ষতাও দেখিয়েছেন। উত্তরকালের সাহিত্য-স্রষ্টাদের সম্মুখে বিদ্যাসাগর যে সুশৃঙ্খল একটা গদ্যরীতি উপস্থাপিত ক'রে গিয়েছিলেন তাতে কোনো ভুল নেই।

[হুগলী (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের ২৬-এ সেপ্টেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২২৭-সালের ১২ই আশ্বিন) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে এবং স্বীয় প্রতিভার গুণে তিনি কর্মজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হন। মানবিক বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। একাধারে পণ্ডিত, দৃঢ়চেতা, সমাজ সংস্কারক ও পরদুঃখকাতর এমন মানুষ সে-যুগে একান্ত বিরল ছিল। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ২৯-এ জুলাই, কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ প্যারীচাঁদ মিত্র ॥

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন: বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনি তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন সেকালের বাংলাসাহিত্যে সাধু গদ্যভাষার একটা আদর্শ স্থাপন করেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তেমনি দেখিয়েছিলেন যে, চলিত গদ্যভাষাও সাহিত্য-রচনার পক্ষে উপযোগী। কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সর্ববিধ রচনার বাহন করবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্রই করেন। 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ ক'রে তিনি ও তাঁর সহযোগী রাধানাথ সিকদার যেভাবে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন ক'রে তোলেন সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিঃসন্দেহে একটা দুঃসাহসিক কাজ। পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সে-ভাষা পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্রই সর্বপ্রথম তাকে সেই কাঠিন্যের কবল থেকে মুক্ত ক'রে সর্বজনগ্রাহী ক'রে তোলেন। ১৯-শ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে তিনি ও তাঁর অনুগামী লেখকেরা এই সৎসাহস না দেখালে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা-সাহিত্যের যে উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল, তা সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহের বিষয়। সাহিত্য-সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন: "সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীচাঁদ বাংলা-ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত এই দুই রীতির সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বাহনস্বরূপ এই শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।" প্যারীচাঁদ মিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল।' অনেকের মতে, এই

কথ্যভাষায় সাহিত্য-রচনার উদ্যোগপর্ব

বইখানিই বাংলা-সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে যেভাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনা-নৈপুণ্য। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামেই তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর রচয়িতা। তাঁর ভাষার নমুনা: "এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে ২ (অর্থাৎ, স্থানে স্থানে) কাণা মেঘ আছে—রাস্তাঘাট সেঁত ২ (অর্থাৎ সেঁত সেঁত) করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়াগাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল।" এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্যারীচাঁদের এই ভাষা আদৌ সংস্কৃতের অনুগামী নয়, বর্ণনাও সহজবোধ্য ও বাস্তবের অনুসারী। প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব এইখানেই। তাঁর এই ভাষা সেকালে 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত হয়েছিল।

[১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের ২২-এ জুলাই কলকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'-র গ্রন্থাগারিক হিসাবে তিনি কর্মজীবনে খ্যাতিলাভ করেন। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। 'মাসিক পত্রিকা'-র সম্পাদনায় এবং জনহিতকর বহু কাজে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া 'রামারঞ্জিকা', 'কৃষিপাঠ', 'অভেদী', 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', 'আধ্যাত্মিকা', 'বামাতোষিণী' প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।]

॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥

বাংলাসাহিত্যে সাধু গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্তেরও বিশেষ একটা স্থান আছে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং তাঁর মতো তিনিও সংস্কৃত-অনুসারী বাংলা গদ্যের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে তাঁর প্রথম দিককার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত হ'লে অক্ষয়কুমার দত্ত তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় তাঁর লেখা দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সেকালের সুধী-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়। তাঁর গদ্য-রচনার নমুনা:

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ-রচনায় উদ্যম

"আহা কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমন কলরবপরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই।" সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অক্ষয়কুমার দত্তের বিশেষ দখল ছিল। তাঁর রচনার মাধ্যমেই তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের

বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। অক্ষয়কুমারের ভাষা সর্বত্র সরস না হলেও প্রাঞ্জল এবং তাঁর বিষয়বর্ণনা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও তাঁর রচনা সার্থক। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন সংস্কৃত-গ্রন্থ অবলম্বনে বা সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ ক'রে অনেকগুলি বাংলা বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, অক্ষয়কুমার দত্তের অনেক বই তেমনি ইংরেজীগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত, কিংবা ইংরেজী-গ্রন্থেরই অনুবাদ। স্বদেশের উন্নতি বিষয়েও তাঁর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে।

[১৮২০ খ্রীঃ অব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ভূগোল'; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'; 'চারুপাঠ'; 'ধর্মনীতি'; 'পদার্থবিদ্যা'; 'প্রাচীন হিন্দু-দিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।]

॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥

চিন্তামূলক প্রবন্ধ-রচনার আদর্শ স্থাপন

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের চিন্তাশক্তি ও রচনা-দক্ষতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তী লেখকগণ তাতে যে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই যুগেই বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী প্রবন্ধলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র এবং কবি মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। হিন্দু কলেজের বেশির ভাগ ছাত্রই সেযুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়ে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু, সেই পরিবেশের মধ্যে থেকেও ভূদেব যেভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন সে কথা চিন্তা করলে অবাক হ'তে হয়। আসলে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল বলেই তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হননি। অথচ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমস্ত সদ্গুণই তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতো এই কারণেই তাঁর চিন্তাধারা ছিল বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ও উদার। সমাজচিন্তাই তাঁর প্রবন্ধাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্য-রচনাভঙ্গির মধ্যে যে সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়, তাঁর পূর্ববর্তী লেখকগণের মধ্যে সেই গুণের অভাব ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করলেও তিনি তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলীর দ্বারা বাংলাভাষাকে সজীব ও প্রসাদগুণসম্পন্ন ক'রে তুলেছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ভূদেব যেভাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজকে সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক বিষয়ে সচেতন ক'রে তুলেছিলেন, তা উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে। সামাজিক বহু সমস্যার কিভাবে সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন তাঁর প্রবন্ধাবলীতে। এইভাবে তিনি সমাজ-সংস্কারের একটা গুরু দায়িত্বও পালন করেছিলেন। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী শুধু যে সাহিত্যের মাপকাঠিতেই সার্থক তা নয়, দেশবাসীর মনে স্বাদেশিক ভাব

জাগিয়ে তুলতে, দেশবাসীকে সদ্‌গুণসম্পন্ন হ'তেও সেইসব প্রবন্ধ বিশেষ সহায়তা করেছিল। পূর্ববর্তী লেখকগণের তুলনায়, তাঁর গদ্যরচনা ছিল অধিকতর প্রাঞ্জল ও সাবলীল, তাঁর বক্তব্য-বিষয়ও ছিল অধিক স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ। তাঁর ভাষার নমুনা: "ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের অর্থাৎ শাস্ত্রকারদের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবল—নিবৃত্তি দুর্বল। শাস্ত্রকারেরা উহাদিগের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে যেটি দুর্বলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটির সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।" নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি তাঁর যে সহজাত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তার প্রভাব তাঁর বহু রচনাতেই সুস্পষ্ট।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে। হিন্দুকলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে তিনি ক্রমে বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সম্পাদনায় 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশিত হ'ত। তাঁর লেখা 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা-প্রবন্ধসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ শক্তিশালী রচনা

উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা গদ্যের যে অনুশীলন আরম্ভ হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সেই গদ্য ভাষা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হ'লেও পরিবর্তনশীল যুগধর্মের সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখকেরা বাংলাভাষার দুর্বলতা বা দীনতাকে বহুলাংশে দূর করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং তাঁদের রচনা ক্রমশ সাহিত্যধর্মীও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের রচনাশৈলীতে প্রতিভার এমন কোনো স্পর্শ ছিল না যাতে ক'রে তা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের বাংলাসাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ক'রে তুলতে পারে। বিদেশী সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাহিত্যরসের যে আস্বাদ পেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী লেখক-বৃন্দ তাঁদের রচনার সেই বহুবিচিত্র রসের সন্ধান দিতে পারেন নি। তাছাড়া, তাঁদের রচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই সংস্কৃতের অনুসারী হওয়ায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী বাঙালী পাঠকবৃন্দ বাংলাসাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোনো মনোযোগ দেবার মতো অন্তরের তাগিদ অনুভব করেননি। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে সেই অঘটন ঘটালেন, তাঁদের দৃষ্টি ফেরালেন বাংলা-সাহিত্যের দিকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করে। এইসব পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রবন্ধ-সাহিত্যের সূত্রপাত, অন্যদিকে তেমনি সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভব। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ',

'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতিতে যে বিপুল সম্ভাবনার আংশিক আভাসমাত্র দেখা গিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকা প্রকাশিত হ'লে সেই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকশিত রূপ লক্ষ্য করা গেল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানলাভ ক'রে, বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন বাংলাভাষার সাহিত্য রচনা করতে উদ্যোগী হলেন সেইদিন থেকেই বাংলাসাহিত্যে যুগান্তর ঘটল। উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি সেকালের পাঠকসমাজকে চমৎকৃত করেছেন সন্দেহ নেই এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি আজও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু প্রবন্ধকাররূপেও তিনি সে-যুগে যে সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তারও কোনো তুলনা নেই। প্রবন্ধ ও সমালোচনা শুধু যে সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তারও কোনো তুলনা নেই। প্রবন্ধ ও সমালোচনা শুধু যে কতকগুলি তত্ত্ব ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে রচনা-কৌশলে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি ক'রে তাদের আনন্দের বা মানসিক তৃপ্তির আস্বাদ এনে দিতে সক্ষম, বঙ্কিমচন্দ্রই তা সর্বপ্রথম সার্থকভাবে প্রমাণিত করেন। সাধু ও চলিত গদ্যরীতির মধ্যে অপূর্ব একটা সামঞ্জস্য বিধান ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব একটা রচনা-রীতির প্রবর্তন করেন। সে-ভাষা পরে 'বঙ্কিমীভাষা' নামেই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। সে-ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো—প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা, যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ, অলঙ্কার-মণ্ডন ও রসসৃষ্টি। অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়কেও তিনি সরস ক'রে তুলেছেন। সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টিই ছিল বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য। 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকায় তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেন, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'লোকরহস্য', 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' নামে সেই সব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর ক'রে তোলে।

সংযত ব্যঙ্গ বা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে যেভাবে তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমালোচনা করেছেন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও তা তুলনাহীন। এইসব রচনায় মানবপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের মুষ্টিমেয় ধনী-সম্প্রদায়কে নিয়ে যে দেশ নয়, অগণিত দরিদ্র ও দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে নিয়েই যে দেশ, সে-কথা তিনি 'বিড়াল'-প্রবন্ধে কেমন প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে বলেছেন—"...আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই?"

'বিবিধ প্রবন্ধ'-র বিভিন্ন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁর বিশ্লেষণীশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর গদ্যরীতি এক সরস ভঙ্গিমায় নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রমাণিত করেছেন এক আদর্শ পুরুষরূপে এবং 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরিপূর্ণ জীবনের এক উচ্চ আদর্শ। সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার ও দোষত্রুটিকে তিনি যেমন ব্যঙ্গ করেছেন তার 'লোকরহস্য'-এ, তেমনি সরকারের খয়েরখাঁদের প্রতি তাঁর সুতীব্র শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা-সাহিত্যে নির্মল কৌতুকরসের আমদানি করেন। পরবর্তীকালের প্রবন্ধকারদের কাছে 'বঙ্কিমী গদ্যরীতি'-ই আদর্শ রচনারীতিরূপে দেখা দেয়।

[১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ২৬-এ জুন ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী-কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর অনেক গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক-খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ও তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনে। সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃতের কাজ করেছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।]

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের আসরে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী হয়ে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের অন্যতম। বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রচনার সরসতায় তাঁর প্রবন্ধাবলী উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব এই সকল বিষয়েই তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়। তাঁর ভাষা ওজস্বী, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। তাঁর রচনার মধ্যেই সেই সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র জগৎ', 'জিজ্ঞাসা' 'কর্ম-কথা', 'শব্দ-কথা', 'নানাকথা' 'জগৎ-কথা', 'যজ্ঞ-কথা', 'চরিতকথা' 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। জীবনী-রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' শীর্ষক জীবনী-প্রবন্ধ থেকে তাঁর গদ্যরীতির কিছু নমুনা উদ্ধৃত হচ্ছেঃ "বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সে গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটী-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।"

দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশে রামেন্দ্রসুন্দরের বলিষ্ঠ ও সরস গদ্যরীতি যে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল সে-কথা সকলেই স্বীকার করবেন তাঁর বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করলেই। যেমন—"পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছে নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মতো উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিভিন্ন নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী, কেহ বলিবে—পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন-নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়তো বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।" 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'-য় রামেন্দ্রসুন্দরের যে স্বদেশী ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়, সে-যুগে জাতীয়চেতনার উন্মেষে তা বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লো দুরূহ তত্ত্বকথার সরল ও সরস আলোচনা।

[রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২০ এ আগস্ট। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞাবৈদ্যপুর গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে; পরে তিনি কলকাতার রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' নবজীবন লাভ করে। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।]

অনুশীলনী

১। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অনুশীলনে ইউরোপীয় মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের দান কতখানি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য লিখ।

৪। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান নির্ণয় কর।

৫। প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গদ্যরচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :—

(ক) উইলিয়ম কেরী; (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার; (গ) রামরাম বসু; (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত; (ঙ) 'আলালের ঘরের দুলাল'; (চ) 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নাটক ও নাট্যশালা

(ক) কবিগান, যাত্রা ও পাঁচালি

বাংলাসাহিত্যে গদ্য-রচনার প্রকৃত অনুশীলন যেমন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নাটক-রচনার সূত্রপাতও তেমনি হয় এই যুগে। এদেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্বে বাংলা-ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো নাটক রচিত হয়নি এবং সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের কোনো চেষ্টাও ছিল না। প্রাচীন ভারতে অবশ্য সংস্কৃত নাটকের প্রচলন ছিল এবং সংস্কৃত-সাহিত্য নাট্য-রচনার দ্বারাই বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃতের পর

কবিগান

অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে বাংলাভাষা যেদিন এদেশের মানুষের ভাবপ্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠল সেদিন থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯-শ শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাংলা-নাটকের কোনো নিদর্শন নেই। সুদীর্ঘ এই যুগে রসপিপাসু বাঙালী মন তৃপ্তিলাভ করত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে, মঙ্গলকাব্যের পালাগানে, কিংবা কীর্তনের মাধ্যমে। ১৮-শ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাবসময় পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগের শেষদিকে একদল কবি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যাঁদের রচনা 'কবিগান'-রূপে সারা বাংলাদেশে, বিশেষত বাংলার পল্লীসমাজে চিত্তবিনোদনের অন্যতম বাহনরূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কবিগানের সঠিক কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। বাংলা-দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তরজা, পাঁচালি, খেউড, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, দাঁড়া-কবিগান, বসা-কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীত প্রভৃতি বহুবিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে। 'কবি' অর্থে এখানে অশিক্ষিত অথচ স্বভাবকবি। তাঁদের রচনা ও সঙ্গীত বিভিন্ন নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা। শেষ পর্যন্ত এই কবিগান বিতণ্ডামূলক সঙ্গীত-সংগ্রামে (বা 'কবির লড়াই'তে) পর্যবসিত হয় এবং তরজা, আখড়াই ও পাঁচালি এই তিনটি ভিন্ন নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। নিধুবাবুর টপ্পা, দাশু রায়ের (বা দাশরথি রায়ের) পাঁচালি, ভোলা ময়রা ও আণ্টুনি ফিরিঙ্গীর তরজা বা আখড়াই, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি বাংলা কবিগানের কয়েকটি বিশেষ প্রচলিত রূপ। কবিগানকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভবানী-বিষয়ক লোকসঙ্গীত (যেমন, আগমনী, বিজয়ার গান ও শ্যামাসঙ্গীত); (২) রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক লোকসঙ্গীত বা সখী-সংবাদ (যেমন, মাথুর-গানের পালা ও গোষ্ঠসঙ্গীত); (৩) নানাবিষয়ক শ্লেষাত্মক গীত; এবং (৪) খেউড়। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কবিগানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দুই দলের নায়কদের মধ্যে গানের মধ্য দিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হ'ত। সময় বিশেষে তাঁরা সাধারণ রুচিবোধকে অতিক্রম ক'রে

পরস্পরকে গালাগালি দিয়ে, আসর মাত্ করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগতেন। গানের যেমন অস্থায়ী, আভোগ ও অন্তরা, কবিগানেরও তেমনি তিনটি স্তর— মোহড়া, চিতেন ও অন্তরা। অর্থাৎ, প্রথমে গানের বক্তব্য-বিষয়ের ভূমিকা, তারপর বক্তব্য এবং সবশেষে তার উপসংহার। কবিগানের, বিশেষ ক'রে লড়াই-জাতীয় কবিগানের, আর একটি বিশেষত্ব 'চাপান'-ও 'উতোর'। অর্থাৎ, কোনো একটি বিষয়ে একদল কবিয়ালের গান শেষ হ'লে তাকে বলা হ'ত 'চাপান', বিপক্ষদলের মূল-গায়েনকে তখন সেই 'চাপান'-এর উতোর (বা উত্তর) দিতে হ'ত। সেই উতোরের পর আবার উতোর চলত। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সব 'চাপান' ও 'উতোর'-এর বাণী মুখে মুখেই রচিত হ'ত লৌকিকগীতির সুরে। একদল হয়তো কৃষ্ণের গুণগান ক'রে 'চাপান' দিত, অন্যদল তেমনি রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন ক'রে তার 'উতোর' দিত। এইভাবে চলত কবির লড়াই। কবিগানের প্রথম যুগে যেমন গোঁজলা গুঁই, রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু প্রভৃতি কবি-গায়কদের পাওয়া যায়। 'চাপান' ও 'উতোর'-প্রথার প্রবর্তক হিসাবে অনেকে তেমনি রাম বসুর নাম করেন। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে আর যাঁরা কবিগান রচনা ক'রে জনপ্রিয় হন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস প্রভৃতির। নিধুবাবুর টপ্পা কবিগানের পর্যায়ে পড়লেও, কবিগান অর্থে সাধারণত যে লঘুরসাত্মক গান বোঝায়, তা ছিল না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শে ও সুরে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় যে লৌকিক প্রেমসঙ্গীত রচনা করেন এদেশে তাই 'টপ্পা' নামে পরিচিত। নিধুবাবুর আদর্শে, ১৯-শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, আর যাঁরা লোকসঙ্গীত রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ ক'রেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন— কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, ওরফে কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক।

সে-যুগে সাধারণ মানুষের চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম যেমন ছিল কবিগান তেমনি ছিল—যাত্রা। চৈতন্যযুগেও যাত্রার অনুরূপ পালাগানের অভিনয় হ'ত।

যাত্রা

মহাপ্রভু নিজেই কয়েকবার ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছেন। সেকালে ঝুমুর-গানের যে অনুষ্ঠান হ'ত তা-ও যাত্রাগানের অনুরূপ, কিন্তু তার সবটাই পদ্যে রচিত। অর্থাৎ, নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন চরিত্র তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। খ্রীষ্টীয় ১৬-শ শতাব্দী থেকে ১৯-শ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্য-পদ্য-সংলাপ সংবলিত যাত্রাগানের এক অবিচ্ছিন্ন যুগ। সেকালের যাত্রাপালা রচিত হ'ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ভাগবতের বিভিন্ন উপাখ্যানকে অবলম্বন ক'রেই এবং ধর্মীয় ও লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তা উন্মুক্ত-প্রাঙ্গণে চণ্ডীমণ্ডপে বা জমিদারবাড়ির অঙ্গনে অভিনীত হ'ত। সেকালে এই সব যাত্রাপালা একাধারে আনন্দদান ও লোকশিক্ষার বাহনরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীদাম, সুদাম, পরমানন্দ অধিকারীর যাত্রা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পালা

যখন ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে ওঠে, তখন যাত্রার আসরে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-পালা নতুন এক আবেদন নিয়ে আসে। ১৯-শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে যেমন গোবিন্দ অধিকারীর 'কৃষ্ণযাত্রা' জনপ্রিয়তা লাভ করে, তেমনি করে গোপাল উড়ে ও রাধামোহন সেনের 'বিদ্যাসুন্দর'-যাত্রা। এই সময় পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'রাই উন্মাদিনী-'পালাও সমাদরলাভ করে। তারপর, ইংরেজ-রাজত্বের সূচনায় যখন এদেশে নাট্যশালা স্থাপিত হয় এবং বাংলা-নাটকের অভিনয় হ'তে থাকে, তখন দেখা দেয় এক নতুন ধরনের যাত্রা। ইংরেজী 'অপেরা'-র সঙ্গে সেই যাত্রার অনেক মিল। এই শ্রেণীর যাত্রায় যেমন গদ্য-সংলাপের প্রাধান্য দেখা দেয়, তেমনি নাটকের অনুকরণে সেই যাত্রার পালা কয়েকটি অঙ্কে ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত হ'তে থাকে। কিন্তু, যুগ-পরিবর্তনে নাটকের প্রাধান্য স্বীকৃত হ'লে যাত্রাগানের কদর ক্রমে কমে আসে, এবং শিক্ষিত-সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে তা কেবল পল্লীর অশিক্ষিত-সমাজে নিজের অস্তিত্ব কোনমতে টিকিয়ে রাখে। বিংশ-শতকের স্বদেশীযুগে আবার এক নতুন ধরনের যাত্রাগান শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মনে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তা হ'লো চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশীযাত্রা। এই বিশেষ ধরনের যাত্রার মাধ্যমে স্বদেশী-ভাবধারার প্রচার ক'রে মুকুন্দ দাস যেভাবে দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন তার তুলনা হয় না।

পাঁচালি-গানও কবিগান ও যাত্রাগানের মতোই লৌকিক সাহিত্যের বিশেষ একটি রূপ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য যে গানের মধ্য দিয়েই বিকাশলাভ করে সে-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে যেসব মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয় সেগুলিকে পাঁচালি বলা যায়।

পাঁচালি

পরে, ঐ-সব কাব্যের অনুকরণে জনপদ-কবিরা মনসার ভাসান (বা মনসার পাঁচালি), চণ্ডীর পাঁচালি, শিবের পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি প্রভৃতি রচনা করেন। ছড়াজাতীয় এইসব রচনা বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানের আসরে সুর ক'রে পড়া হ'ত এবং ধর্মমাহাত্ম্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা যেন চিত্তবিনোদনেরও একটা অবকাশ পেতেন। কবিগানের যুগে দাশরথি রায়ের পাঁচালি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাঁচালিকার হিসাবে সেযুগে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ও রাধামোহন সেনও বিশেষ নাম করেন।

(খ) নাটক রচনার সূত্রপাত

বাংলাদেশে নাটক রচনার যে-ইতিহাস তার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের যাত্রা বা পাঁচালির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারার আদর্শে। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে) বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতায়, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের

অবসর বিনোদনের জন্য যে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়, তার নির্মাতা ছিলেন লেবেডফ্ নামে একজন রাশিয়ান। তাঁর উদ্যোগেই ঐ রঙ্গালয়ে কৌতুকরসাশ্রিত দু'খানি ইংরেজী নাটকের বাংলা-অনুবাদ অভিনীত হয় এবং বাঙালী দর্শকেরা সেই প্রথম পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকে রচিত বাংলা নাটকের সঙ্গে পরিচিত হন। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের আমদানি এবং নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জাও সকলের কাছে নতুনত্বের স্বাদ আনে। সাহেবপাড়ার ঐ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে, এরপর শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে যে রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে ওঠে সেখানে 'বিদ্যাসুন্দর'-যাত্রাপালাই নাটকাকারে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু, সাধারণের পক্ষে সে-অভিনয় দেখা সম্ভবপর হয়নি। কারণ, এই শ্রেণীর পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক দেখবার জন্য শুধু অভিজাত-সম্প্রদায়ের নরনারী ও সাহেব-সুবাদেরই প্রবেশাধিকার থাকত। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে, 'হিন্দু থিয়েটার' নামে যে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হয় সেখানে সাধারণত ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হ'ত। ক্রমে, কলকাতায় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে যে-সব পারিবারিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় সেখানেও কয়েকটি ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বাংলা-অনুবাদ অভিনীত হয়; অর্থাৎ মৌলিক কোনো বাংলা-নাটক তখনও পর্যন্ত রচিত বা অভিনীত হয়নি। সেক্সপীয়র ও কালিদাসের নাটকের বঙ্গানুবাদই তখনকার দিনে প্রাধান্যলাভ করেছিল।

প্রথম রঙ্গালয় স্থাপন ও অনুবাদ-নাটক অভিনয়

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তারাচরণ শিকদার, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে-নাটকটি রচনা করেন তার নাম—'ভদ্রার্জুন'। বাংলাভাষায় রচিত এই নাটকটিকেই প্রথম মৌলিক রচনা বলা যায়। মহাভারতের সুভদ্রা-হরণ উপাখ্যানটি অবলম্বন ক'রে এই নাটকটি রচিত হয় এবং এর দৃশ্যবিভাগ গঠিত হয় ইংরেজী নাটকের আঙ্গিকে। বাংলাভাষায় 'ভদ্রার্জুন' প্রথম মৌলিক নাটক হ'লেও এতে নাট্যকারের রচনারীতির অনেক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। সংলাপও গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। এই বৎসরই আর একটি মৌলিক নাটক রচিত হয়, তার নাম—'কীর্তিবিলাস'। রচয়িতা—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। 'ভদ্রার্জুন' যেমন প্রথম মিলনান্তক নাটক, 'কীর্তিবিলাস' তেমনি প্রথম বিয়োগান্তক নাট্য-রচনা। কিন্তু, রচনার দিক থেকে, 'কীর্তিবিলাস'-নাটকেও নাট্যকারের রচনানৈপুণ্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে পাইকপাড়ার জমিদারবাড়ীতে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' স্থাপিত হ'লে বাংলা নাট্য-রচনা ও নাট্যাভিনয় ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এবিষয়ে পাইকপাড়ার জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগ ও পৃষ্টপোষকতার কাহিনী বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার তৎকালীন সমাজ-জীবন, বিশেষত কৌলীন্য-প্রথার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ক'রে তুলতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে যে নাটক রচনা

প্রথম যুগের বাংলা মৌলিক নাটক

করেন 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'-য় তা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল। সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-ই এদেশে প্রথম অভিনীত মৌলিক বাংলা-নাটক। অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রামনারায়ণ তাঁর এই নাটকে স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে। তাঁর রচিত 'রত্নাবলী'-নাটকটিও 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'য় অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু সেটি ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। তিনি 'নবনাটক' নামে আর একখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন। তাতে বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা করা হয়। সে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার'-এ। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-নাটকের পর, বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, তা হ'ল অসামান্য প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'। 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'তেই এই নাটকের অভিনয় হয়। 'শর্মিষ্ঠা'-নাটকের মধ্য দিয়েই যে এদেশে প্রথম সার্থক বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯-শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বাংলা নাটকের প্রথম যুগের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯-শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে এবং এই যুগেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের আন্তরিক চেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি হয় সুদৃঢ়। মধুসূদন-পূর্ববর্তী যুগের নাটকগুলিকে নাটক না ব'লে (রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক ব্যতীত) অভিনয়োপযোগী খণ্ডকাব্য বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। নাটকের পক্ষে যে-সব লক্ষণ অপরিহার্য, অর্থাৎ, চমৎকারিত্ব, চরিত্র-চিত্রণের বৈচিত্র্য এবং ঘটনা-সংঘাত মধুসূদনের নাটকেই তা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়।

(গ) কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয়

॥ মধুসূদন ॥

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নাট্যকার-কবি মাইকেল মধুসূদনের দান অবিস্মরণীয়। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক—এই তিন শ্রেণীর নাটকই তিনি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেন। তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দ) মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। তার দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ) রচিত হয় গ্রীক্ পুরাণের ছায়া অনুসরণ ক'রে। গ্রীক্-পুরাণের সুপরিচিত স্বর্ণ আপেল-উপাখ্যানের আদর্শে বিদর্ভ-রাজ নীলধ্বজের সঙ্গে মাহিষ্মতীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর মিলন এই নাটকের বিষয়বস্তু। মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী'-নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করেন এবং পদ্যাংশগুলি লিখিত হয় অমিতাক্ষর ছন্দে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'শর্মিষ্ঠা'-নাটক রচনার পূর্বে

'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'

মাইকেল বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। সেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে, মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'-য় তাঁর যে রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। ইংরেজী নাটকের আদর্শে তিনি এই নাটক রচনা করলেও এতে সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবই যেন বেশি ক'রে চোখে পড়ে। নাটকীয় ভাব ও কলাকৌশলের অভাব সত্ত্বেও, সে-যুগে 'শর্মিষ্ঠা'-র নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

'কৃষ্ণকুমারী'

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ) ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। মহারানা প্রতাপসিংহের বংশধর উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবন-কাহিনীই এই নাটকের বিষয়বস্তু। বাংলা নাট্যসাহিত্যে 'কৃষ্ণকুমারী'-ই সর্বপ্রথম সার্থক 'ট্র্যাজেডি' (বা বিয়োগান্তক)-নাটক। এই নাটকে মধুসূদন সম্পূর্ণরূপেই গ্রীক্ নাট্যরীতি অনুসরণ করেন এবং পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মধুসূদন মুখবন্ধ, ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি, ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা, জটিলতা-মুক্তি ও পরিসমাপ্তি সৃষ্টি ক'রে যে রীতিতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তা সম্পূর্ণ অভিনব। করুণরসের উদ্দীপনেও মধুসূদন এই নাটকে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

'কৃষ্ণকুমারী'-নাটকের পূর্বে মধুসূদন আর যে দু'টি নাটক রচনা করেন, সে দু'টিকেই বলা যেতে পারে সামাজিক নাটক বা প্রহসন। এই প্রহসন দু'টির নাম—

'একেই কি বলে সভ্যতা'
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'

(১) 'একেই কি বলে সভ্যতা'; আর, (২) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ)। ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের অনাচারে হিন্দু-সমাজ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রথম প্রহসনে তারই পরিচয় পাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয় প্রহসনে পাওয়া যায় ভণ্ড ও অনাচারী প্রাচীন সমাজের প্রতি মধুসূদনের কঠোর শ্লেষ। এই দু'টি প্রহসনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুসূদনের বাস্তবতা-বোধ ও মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় সে-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে তা একান্তই দুর্লভ ছিল। এই নাটক দু'টি অভিনীত হয়েছিল 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'য়।

[যশোহর-জেলার সাগরদাঁড়ি-গ্রামে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত) ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের ২৫-এ জানুআরি মধুসূদনের জন্ম হয়। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময় খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন ক'রে তিনি 'মাইকেল মধুসূদন' এই নাম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য-রীতি-সঙ্গত-নাটক ও প্রহসন, অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং বিশিষ্ট এক গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলা-সাহিত্যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ২৯-এ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥

বয়সের দিক থেকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী হ'লেও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের পরবর্তী। কারণ, মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'-নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হবার পর তাঁর যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণ' আত্মপ্রকাশ করে (১৮৬০ খ্রীঃ)।

'নীলদর্পণ'

বিদেশী নীলকরসাহেবদের অমানুষিক প্রজাপীডনের কাহিনী অবলম্বন ক'রে রচিত তাঁর এই 'নীলদর্পণ'-নাটকখানি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। মিসেস্ স্টো-র 'Uncle Tom's Cabin' উপন্যাস যেভাবে আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার মূলে আঘাত হানে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-নাটকও তেমনি নীলকরসাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে এদেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। 'নীলদর্পণ' শুধু দীনবন্ধুর এক অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টিই নয়, তৎকালীন বাংলাদেশের একখানি বাস্তবধর্মী সমাজচিত্র। এই নাটকে যেমন জীবন সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় তাঁর নাট্যরচনার অসাধারণ ক্ষমতা। 'নীলদর্পণ'-নাটকের মধ্য দিয়ে বাস্তবধর্মী চরিত্র-সৃজনের যে নিপুণতা তিনি দেখিয়েছেন সে-যুগের নাট্য-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। দীনবন্ধুর এই নাটক দিয়েই সেকালের প্রথম সাধারণ নাট্যশালা 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'-এর (বাগবাজারে অবস্থিত) উদ্বোধন হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর। 'নীলদর্পণ'-নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ক'রে (শোনা যায় মাইকেল মধুসূদনই আসলে অনুবাদ করেন) পাদরি লংসাহেব নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু, রাজরোষে প'ড়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়।

দীনবন্ধু ছিলেন প্রকৃতই নাট্যকার। নাট্যরসসৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতা ছিল অনন্য-সাধারণ। তাঁর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে) নাটক উচ্চস্তরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। এই নাটকে তিনি হালকা হাসি ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছলে, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী-সমাজের যে চিত্রাঙ্কণ করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর ব্যঙ্গপূর্ণ নাটক বা প্রহসন-জাতীয় রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ); 'বিয়েপাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ); 'লীলাবতী' (১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দ); 'জামাইবারিক' (১৮৭২ খ্রীঃ অব্দ); 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ)। দীনবন্ধুর নাটক-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একজায়গায় লিখেছেন—"দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।...গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি না।"

'সধবার একাদশী' ও অন্যান্য নাটক

[১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ ক'রে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন পাটনার পোস্টমাস্টার হিসাবে।

তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু হয় পদ্য-রচনার মধ্য দিয়ে। সে-দিক থেকে তিনি ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাবশিষ্য। তাঁর 'সুরধনী কাব্য' ও 'দ্বাদশ কবিতা' উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।]

॥ গিরিশচন্দ্র ॥

গিরিশচন্দ্র ও 'সাধারণ রঙ্গালয়'

বাংলাদেশে সাধারণ-রঙ্গালয় বা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল কলকাতার বাগবাজার-অঞ্চলের একদল নাট্যামোদী ভদ্রসন্তানের আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যম। নাট্যকার, কবি ও নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। এই নাট্যশালা স্থাপনে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নিকট কতটা ঋণী ছিলেন, সে-কথা জানা যায় গিরিশচন্দ্রেরই একটি লেখায়—"যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'-তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" এই সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সেকালের সর্বপ্রধান নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ হয়। 'সধবার একাদশী'-নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি অভিনেতারূপে অভাবনীয় জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের মধ্যযুগ শুরু হয় গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই (১৯-শতকের ষষ্ঠ দশকে)। প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার নেতৃত্ব ক'রে গিয়েছেন।

নাট্য-রচনায় অসামান্য দক্ষতা

গিরিশচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে অজস্র নাটক রচনা এবং কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক সকল প্রকার নাটক রচনাতেই তিনি ছিলেন সুদক্ষ। যুগধর্ম ও জনরুচির প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি থাকায় তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি নাটক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর সর্বপ্রথম নাটক—'আনন্দ রহো'। তারপর একে একে যে-সব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(পৌরাণিক-নাটক) 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'অভিমন্যুবধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'জনা', 'নল-দময়ন্তী', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐতিহাসিক-নাটক), 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'বিল্বমঙ্গল' (সামাজিক নাটক), 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'মায়াবসান', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'গৃহলক্ষ্মী', (গীতিনাট্য), 'মায়াতরু', 'মোহিনীপ্রতিমা',

'মলিনমালা' প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যরচনায় গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই অবলম্বন করেছিলেন, এবং পদ্যে তিনি যে বিশিষ্ট ছন্দের প্রবর্তন করেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর কয়েকটি নাটকে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও, অধিকাংশক্ষেত্রেই তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মনে যে ভক্তিভাবের উদয় হয় তারও ছাপ পড়ে ভক্তিরসাত্মক কয়েকটি নাটকের মধ্যে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তাঁর 'চৈতন্যলীলা' 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটকে। প্রথম দু'টি নাটকের মধ্য দিয়ে ভক্তিরস যেমন প্রাধান্যলাভ করে, 'জনা' নাটকের মধ্য দিয়ে তেমনি ফুটে ওঠে বীররসের অভিব্যক্তি। সামাজিক চিত্রের অপূর্ব এক আলেখ্য তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটক। এর মধ্য দিয়ে মদ্যপানের কুফল ও পারিবারিক বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আর, পণপ্রথার পরিণাম কতদূর মর্মান্তিক হ'তে পারে তার এক করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'বলিদান'-এ। চরিত্র-চিত্রণে, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে এবং ঘটনার সংঘাত-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অভিনেতারূপে, নাটক-পরিচালনায় এবং অভিনয়-শিক্ষাদানের ব্যাপারেও গিরিশচন্দ্র ছিলেন সেকালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, যেমন ছিল তাঁর চরিত্রোপযোগী বাচনভঙ্গি, তেমনি ছিল তাঁর চলাফেরা ও বহুবিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি। এইজন্য তিনি সেকালের অভিনেতাদের কাছে 'নটগুরু' ব'লে অভিহিত হতেন, এবং একালের অভিনেতাদের কাছেও তাঁর সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র এককভাবেই একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

[১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয় কলকাতায়। নাট্যকার ও অভিনেতারূপে তিনি সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ করলেও, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপেও সম্মানিত। তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কয়েকটি খণ্ডকাব্যে, নাটকের পদ্যাংশে এবং বিভিন্ন গীতিকবিতায়। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তাঁর দেহাবসান হয়।]

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল ॥

কবি ও নাট্যকাররূপে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব

গিরিশ-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো উজ্জ্বল, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় তিনি গিরিশ-প্রতিভাকেও অনেকাংশে ম্লান ক'রে দিয়েছেন। নানা দিক থেকে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। বাংলা-সাহিত্যের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হয় কবি হিসাবে। হাসির কবিতা রচনা ক'রে তিনি

অল্প দিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সেই সব হাস্যরসাত্মক বা কৌতুক-রসাশ্রিত কবিতাবলী বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'শ্মশান-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে। প্রহসন এবং সামাজিক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অনেক নাটকই তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর নাট্য-প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ দেখা যায় ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেই। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল-ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকার। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশের স্বদেশী-আন্দোলন যে তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর নাটকগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাঈ' (১৯০৩ খ্রীঃ অঃ)। তারপর, একে একে প্রকাশিত হয়—'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫ খ্রীঃ অঃ) ; 'দুর্গাদাস' (১৯০৬ খ্রীঃ অঃ) ; 'মেবার পতন' (১৯০৮ খ্রীঃ অঃ) ; নূরজাহান' (১৯০৮ খ্রীঃ অঃ) ; 'সাজাহান' (১৯০৯ খ্রীঃ অঃ) ; 'চন্দ্রগুপ্ত' ১৯১১ খ্রীঃ অঃ) ; 'সিংহল-বিজয়' (১৯১৫ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি। এই সব নাটকের মধ্য দিয়ে একদিকে তিনি যেমন শাশ্বত মানবধর্মের জয়গান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি পরাধীন জাতির মনে নবীন আশার সঞ্চার করেছেন স্বাধীনতার বাণী প্রচার ক'রে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের নায়ক রানা প্রতাপ যেভাবে সর্বস্ব পণ ক'রে চিতোর-উদ্ধারের জন্য মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তাতে ক'রে তাঁকে দেশপ্রেমিকের মূর্ত প্রতীকরূপে আমরা দেখতে পাই। দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগপূর্ণ ও কবিত্বময় সংলাপ তাঁর নাট্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাটকের এই অনবদ্য ভাষাই তাঁর নাটকগুলিকে বিশেষ জনপ্রিয় ক'রে তোলে। তাছাড়া, নাটকের চরিত্র-চিত্রণে, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টিতে এবং পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণেও তিনি অসামান্য রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন নাটকে সংযোজিত তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতগুলিও তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় দেয়। মঞ্চ-সাফল্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্তই' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, আজও পর্যন্ত এই দু'টি নাটকের আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে—নাটক দু'টির সাহিত্য-সৌন্দর্য, ভাষার আলংকারিকতা, অভিনয়োপযোগিতা, গঠনরীতি ও চরিত্র-সৃষ্টি। ঘটনার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, চরিত্রের বিশ্লেষণ, ঘটনা-সংঘাতের চমৎকারিত্ব, ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গীয় নাটকীয় লক্ষণে এ দু'টি নাটক পরিপূর্ণ। 'চন্দ্রগুপ্ত'-নাটকের 'চাণক্য' এবং 'সাজাহান'-নাটকে 'সাজাহান', ও 'ঔরংজীব' দ্বিজেন্দ্রলালের অনবদ্য সৃষ্টি। নাটকের মাধ্যমেই তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী-সঙ্গীত 'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' একদিন সমগ্র দেশবাসীকে অপূর্ব এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে।

ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় অসামান্য সাফল্য-অর্জন

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে তুলনায় অবশ্য তিনি সার্থকতালাভ করেননি তাঁর পৌরাণিক নাটকে। 'সীতা', 'ভীষ্ম', ও 'পাষাণী' তাঁর তিনখানি পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিতে অলৌকিকতা সৃষ্টি ও ভক্তিরসের প্রাধান্য থাকায় সেগুলি যেমন সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক তিনটিতে তার বিশেষ অভাব থাকায় সেগুলি তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। মানবীয় ভাবে পৌরাণিক চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েই তিনি এ-বিষয়ে পাঠক ও দর্শকের সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যরসবিচারে, এই নাটকগুলিতেও তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। 'বঙ্গনারী' ও 'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রলালের দু'টি সামাজিক নাটক। শেষোক্ত নাটকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বঙ্গসমাজের বাস্তবধর্মী একটি আলেখ্য ফুটে উঠেছে। ব্যঙ্গ-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সার্থক শিল্পী। উচ্চাঙ্গের হাস্যরস ও শ্লেষ তিনি পরিবেশন করেছেন, তাঁর 'কল্কি-অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি প্রহসনে। 'বাঙালী হাসতে জানে না'—এ অপবাদ তিনি সার্থকভাবেই দূর করেছিলেন তাঁর এই প্রহসনগুলি ও বিভিন্ন হাসির কবিতার মধ্য দিয়ে।

পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক এবং প্রহসন

[১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১৯-এ জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক-নিবাস ছিল নদিয়া জেলার সদর-শহর কৃষ্ণনগরে। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটরূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। বিলাতে থাকবার সময় তিনি ইংরেজীতে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর বহুমুখী কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই মে তিনি পরলোকগমন করেন।]

॥ অন্যান্য নাট্যকার ॥

বাংলা-নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দানেও বিশেষ সমৃদ্ধ। অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁর সহকর্মী। রচনা-রীতির দিক থেকে তিনি মূলত গিরিশচন্দ্রের অনুসারী হ'লেও, স্বকীয় বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। হাস্যরস-সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত দেশবাসীর প্রতি তাঁর বিদ্রূপ সার্থক হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তাঁর বিষোদ্গার নিতান্তই অযৌক্তিক। তাঁর ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক বা প্রহসনগুলির মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু' ও 'খাসদখল' একসময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবে এবং প্রায় একই ধরনের শ্লেষ থাকায় তাঁর 'সম্মতি-সংকট', 'কালাপানি', 'একাকার', 'বৌমা', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'বাহবা বাতিক' প্রভৃতি প্রহসন তেমনি জমেনি। অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে', 'ডিস্‌মিস্', 'কৃপণের ধন', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'চোখের উপর বাটপাড়ি' প্রভৃতি। এই নাটকগুলিতে শ্লেষের চেয়ে হাস্যরসই প্রাধান্যলাভ করেছে। প্রহসন ছাড়াও, অমৃতলাল বসু কয়েকখানি

সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'তরুবালা', 'হরিশ্চন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' প্রভৃতির। নাট্যকার অপেক্ষা অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষকরূপেই অমৃতলাল অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমসাময়িক। তিনি প্রথম দিকে আরব্য-উপন্যাস জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে যে-সব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকায় নাট্যজগতে সেগুলি নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিল। যেমন তাঁর 'আলিবাবা', 'আলাদিন', 'কিন্নরী', 'বাসন্তী' প্রভৃতি নাটক। নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ এইসব নাটকের মধ্যে 'আলিবাবা'-ই সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পৌরাণিক দু'টি নাটক 'বভ্রুবাহন' ও 'নরনারায়ণ'-এ। গদ্যপদ্য মিশ্রিত ভাষায় এই নাটক দু'টি রচিত এবং চরিত্র-চিত্রণেও নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভীষ্ম', 'উলুপী', 'সাবিত্রী' ও 'মন্দাকিনী' তাঁর অন্যান্য পৌরাণিক নাটক। কিন্তু, পৌরাণিক নাটকের চেয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি অভিনয়ের দিক থেকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হয়। যেমন—'প্রতাপাদিত্য,' 'নন্দকুমার', 'আলমগীর', 'বাংলার মসনদ', 'অশোক', 'পদ্মিনী', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি। রসবিচারে 'আলমগীর'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

অনুশীলনী

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রারম্ভিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বাংলাদেশে নাট্যশালা স্থাপনের ইতিহাস কী? এ-বিষয়ে বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যম কতখানি?

৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের স্থান নির্ণয় কর।

৪। নাট্যশালা-স্থাপনে ও নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৫। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য কী? কোন্ শ্রেণীর নাটকে তিনি সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ করেছিলেন এবং কেন?

৬। টীকা লিখ :—

(ক) কুলীনকুলসর্বস্ব; (খ) নীলদর্পণ; (গ) ন্যাশনাল থিয়েটার; (ঘ) কবিগান; (ঙ) যাত্রা; (চ) পাঁচালি; (ছ) অমৃতলাল বসু; (জ) ক্ষীরোদ-প্রসাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প

উপন্যাস ও ছোটগল্প গদ্যসাহিত্য তথা কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র দু'টি রূপ। আকারে ছোটগল্পের অভাব পৃথিবীতে বোধ করি কোনো কালেই ছিল না। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', বৌদ্ধসাহিত্যে 'জাতকাবলী', ইংরেজী সাহিত্যে 'চসারের গল্প', 'ঈশপের গল্প' প্রভৃতি এই সাক্ষ্যই বহন করেছে যে, ছোটগল্পের আবেদন চিরন্তন। কিন্তু, আধুনিককালে ছোটগল্প বা Short Stories বলতে যে বিশেষ একশ্রেণীর সাহিত্যরসমৃদ্ধ গল্পকে বোঝায়, উল্লিখিত পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতকাবলী প্রভৃতির গল্প সে-শ্রেণীর নয়। প্রাচীনকালের গল্প বা কাহিনীমূলক রচনার মতো আধুনিক ছোটগল্প 'যথেচ্ছবিহারী, প্রগল্‌ভ ও নিরুদ্দেশপন্থী' নয়। বর্তমান যুগের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—এক একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে, মানবজীবন এক একটি বিশেষ মুহূর্তে কিভাবে স্পন্দিত হয় তারই বর্ণনা। শুধু আকারে ছোট হ'লেই যে ছোটগল্প হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রকারগত ও মর্মগত অনেক বিভিন্নতাই ছোটগল্পকে উপন্যাস (Novel) থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। ছোটগল্প আসলে জীবনের খণ্ড-অংশের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে তাই বহু ঘটনার সমাবেশ বা বহু চরিত্রের ভিড় থাকে না। লেখক এখানে শুধু স্বল্প পরিবেশের মধ্যে একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্তের চিত্রাঙ্কন করেন। উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত, ছোটগল্পের পটভূমি সংহত। উপন্যাস যেমন সমগ্র জীবনের ইতিহাস, ছোটগল্প তেমনি খণ্ডজীবনের একটি কাহিনী মাত্র। উপন্যাস পাঠককে সব কিছুই যেন বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু ছোটগল্প আকারে-ইঙ্গিতে তাকে বোঝাবার অবকাশ দেয়, সবটা খোলাখুলি বুঝিয়ে দেয় না। উপন্যাসে একদিকে যেমন বহুবিচিত্র চরিত্রের ভিড় থাকে তেমনি থাকে জীবনের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রতিহিংসার নানান পরিচয়। কিন্তু ছোটগল্পে সে-রকমের চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়, লেখক সেখানে স্বল্প-পরিবেশের মধ্যে জীবনের বিশেষ কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেন মাত্র। মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের যেমন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি গীতিকবিতা-(বা লিরিক)-র সঙ্গে ছোটগল্পের পাওয়া যায় একটা সামঞ্জস্য।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্বরূপ

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত 'কাদম্বরী' গ্রন্থ যেমন আছে, তেমনি ছোটগল্পের আকারে বহু আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে, পুরাণে, রামায়ণ-মহাভারতে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে। পালি-সাহিত্যের 'জাতক'-ও বহু

ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু মঙ্গলকাব্য গদ্যসাহিত্য নয়। তেমনি বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র মধ্যেও-হয়তো আধুনিক গল্পের সন্ধান মিলবে। কিন্তু, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-ও পদ্যে রচিত। এদেশে গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ইংরেজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে। আর, সার্থক গদ্যরচনার ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় ১৯-শ শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশক থেকে। অনেকের মতে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও বইখানিকে 'বাংলাসাহিত্যের আদি উপন্যাস' ব'লে অভিনন্দিত করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলাসাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ হ'লেও, উপন্যাসের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এতে স্পষ্টতালাভ করেনি। ইংরেজী 'নভেল' অর্থে আমরা যে 'উপন্যাস' বুঝি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারা থেকেই আমাদের দেশে তার উদ্ভব এবং বঙ্কিমচন্দ্রই সার্থক বাংলা-উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ। আর, আধুনিক ছোটগল্পের প্রচলনও এদেশে খুব বেশী দিনের নয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প রচনার সূচনা করে। অবশ্য, এ-বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দানও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলাসাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের উদ্ভব

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র

উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—"বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও রাজ-রাজেশ্বর'। এই উক্তিকে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব'লে মনে হ'লেও এতে সত্যের কোনো অপলাপ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আজ চিরন্তন সাহিত্য বা 'ক্লাসিক লিটারেচার'-এর পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম পাতাটি অধিকার ক'রে না থাকলেও, সেই ইতিহাসের প্রথম দিককার বিরাট একটি অধ্যায় যে তাঁকে নিয়েই রচিত হয়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবু বিলাস', কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি হয়তো স্থাপন করেছে, কিন্তু সে-ভিত্তির ওপরে সে-কালের কোনো লেখক সৌধ রচনা করতে পারেননি। সে-কাজ করেছিলেন প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কথাসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন ছিল প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ধারা, অন্যদিকে তেমনি ছিল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'লেও নিজের মৌলিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে নবযুগের সূচনা

করেননি। উপন্যাস-রচনার রীতি তিনি হয়তো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং নিজস্ব ভাবসম্পদে তা সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে সে-যুগে যে-অভিনব মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সজীব ক'রে রেখে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্তু বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে। 'ললিতা ও মানস' গ্রন্থখানি তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতা-সংকলন। কিন্তু, কবিতার মাধ্যম ত্যাগ ক'রে যেদিন তিনি নিজের সাহিত্য-প্রতিভাকে বিকশিত করলেন তাঁর গন্ত-রচনার মধ্য দিয়ে সেদিন সকলে বিস্ময়বোধ না ক'রে পারেনি। ইংরেজী ভাষা অবলম্বন ক'রে সর্বপ্রথম তিনি যে-উপন্যাসখানি রচনা করেন তার নাম 'Rajmohan's Wife'। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে বাঙালীর পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করেছিলেন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। কথাশিল্পীরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা যে প্রচুর, 'Rajmohan's Wife' প'ড়ে সে-কথা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি মনের দিক থেকে বোধ হয় পুরোপুরি সন্তোষলাভ করতে পারেননি। সেইজন্যই পরে মাতৃভাষা বাংলাকেই তিনি তাঁর রচনার বাহন ক'রে নিয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রথম দিকে বাংলাভাষার মাধ্যমে সার্থক রচনা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে তাঁর মনে একটা সংশয়ের ভাব থাকলেও, তাঁর হাতে প'ড়ে সেই বাংলাভাষাই অভাবনীয়রূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল। বাংলাগন্তের প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় তাঁর সময় থেকেই। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী'।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং (২) সামাজিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে, সেই সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে, তিনি যে-সব উপন্যাস রচনা করেন সেগুলি হ'লো—'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম'। এগুলির মধ্যে অবশ্য একমাত্র 'রাজসিংহ'-ই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস; কারণ এর মুখ্য চরিত্র যেমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তেমনি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশেও লেখক ইতিহাসেরই শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু, অন্যান্য উপন্যাসে ঐতিহাসিক বহু চরিত্রের সমাবেশ থাকলেও, ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি বহু ক্ষেত্রেই নিজস্ব কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

'দুর্গেশনন্দিনী'-উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মোগল-পাঠান সংঘর্ষের পটভূমিকা গ্রহণ করলেও, আসলে তিনি ঐতিহাসিক কোনো কাহিনী বর্ণনা করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে নরনারীর চিরন্তন প্রেমের মাধুর্য প্রকাশ করতে। এই উপন্যাসের বলিষ্ঠ ও কবিত্বময় ভাষা, বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ও ঘটনা-সংস্থাপনের

চাতুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশক্তির প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করে, এবং স্বভাবতই তিনি পাঠকচিত্ত জয় করেন। 'মৃণালিনী'-উপন্যাস রচিত হয় বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পটভূমিকায়, এবং এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেশাত্মবোধ প্রচার করেছিলেন। মৃণালিনী-কে তিনি সৃষ্টি করেছেন ধৈর্য ও আত্মত্যাগের এক মূর্ত প্রতীকরূপে। 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে একদিকে যেমন ইংরেজের সঙ্গে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের সংগ্রাম ও তার পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রূপ পেয়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের এক বাস্তবধর্মী চিত্র। 'রাজসিংহ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র মোগল ও রাজপুতের শৌর্যবীর্যের কথা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি প্রচার করেছেন দেশপ্রীতি। এই দেশপ্রীতির পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর 'আনন্দমঠ'-এ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত তাঁর এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বাণী প্রচারিত হয়েছিল, স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেই বাণী এদেশের যুবকবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্বদেশীযুগে ভারতবাসী এই উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্'-সঙ্গীতকেই প্রধান জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিল। 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস দু'টিতে ধর্মসমস্যাই প্রাধান্যলাভ করেছে, এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্ম-বোধেরও বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল গ্রন্থ সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে সেগুলি হ'লো—'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারানী', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ) উপন্যাসখানিই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ও কল্পনার যে অপূর্ব বিকাশ এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় তা তুলনাহীন। আজন্ম অরণ্যে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার মধ্যে যে মুক্তজীবনের রূপ গ'ড়ে ওঠে, সাংসারিক জীবনে এসেও সে তার আকর্ষণ ভুলতে পারে না এবং তারই ফলে সমাজ-সংস্কার সব তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। কপালকুণ্ডলা-র চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব। এই উপন্যাসে ঘটনা-সংস্থাপনের যেমন চমৎকারিত্ব আছে, তেমনি আছে কাব্যরসের মাধুর্য। যেখানে নায়িকার বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা—বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে যেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী। 'কপালকুণ্ডলা'-কে সামাজিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত না ক'রে কাব্যসুষমামণ্ডিত কাল্পনিক উপন্যাস বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-ই সর্বাপেক্ষা সার্থক। সামাজিক সমস্যা ও চারিত্রিক নীতিবোধের প্রেরণায় এই উপন্যাস-দু'টি রচিত হয়। রূপজ মোহে বিভ্রান্ত হয়ে পুরুষ বা নারী কিভাবে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এই দুইটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র তা অপূর্ব লিপিকুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক উপন্যাস

'ইন্দিরা'-উপন্যাসটি চরিত্র-প্রধান নয়, ঘটনা-প্রধান এবং সেখানে নায়িকার জবানীতেই সমগ্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রচনার এই আঙ্গিকটি 'রজনী'-তেও বর্তমান। 'রজনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারানী'-কে উপন্যাস না ব'লে বড়গল্প বলাই যুক্তিসঙ্গত।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, পাশ্চাত্ত্য উপকরণকে তিনি নিজস্ব প্রতিভায় স্বকীয় ক'রে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্তু কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশীয় ভাবে বিকৃত হয়ে ওঠেনি। নরনারীর প্রণয়-বৈচিত্র্য, সামাজিক নীতিবোধ ও দেশপ্রেম তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। নৈতিক সমস্যা-বর্জিত কোনো উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের নেই। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। সে-আদর্শ ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আদর্শবাদী লেখক হ'লেও, বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিকতাকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁর রচনায় তাই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো তাঁর ভাষার মাধুর্য। রচনা-নৈপুণ্যে, উদ্ভাবনী-শক্তিতে, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি সত্য সত্যই বাংলাদেশের সাহিত্য-সম্রাট্।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্য

(খ) রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে-যুগে আর যাঁরা উপন্যাস, বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই প্রভাব শুধু যে ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী। উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে তিনি মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর অনুকরণ করেছিলেন ব'লেই তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তাঁর উপন্যাস তেমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তিনি যে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মূলত ঐতিহাসিক। এইজন্য তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য যেমন বিশ্বস্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে, সে তুলনায় তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে সাহিত্যের দিক থেকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশে তিনি সুখপাঠ্য কাহিনী সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যের রসবিচারে সে-সব কাহিনী সার্থক উপন্যাসে পরিণত হ'তে পারেনি।

উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

রমেশচন্দ্র দত্ত মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে চারখানি ঐতিহাসিক, আর দু'খানি সামাজিক। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হ'লো—'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ); 'মাধবী-কঙ্কণ' (১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ); 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'

(১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ) আর 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯ খ্রীঃ অঃ)। 'বঙ্গবিজেতা'-ই রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে পাঠান-বিদ্রোহের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এর মুখ্য চরিত্র রাজা টোডরমল্ল। ঘটনার জটিলতায় এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রই যথার্থভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। রচনার এই দুর্বলতা অবশ্য লেখক অনেক পরিমাণেই কাটিয়ে উঠেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'-এ। এই উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল পরিবেশে রচিত একটি পারিবারিক কাহিনী বলা যেতে পারে। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে তাঁর পুত্রদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এ-কাহিনীতে। কিন্তু এই উপন্যাসের নায়ক কোনো মোগল রাজপুত্র নয়। এর নায়ক একজন বাঙালী যুবক নরেন্দ্রনাথ, আর নায়িকা হেমলতা। তাদের ভালোবাসাকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনীর ঘটনাবলী বিভিন্ন খাতে আবর্তিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ-হেমলতার প্রণয়-কাহিনীটি রমেশচন্দ্রের রচনা-নৈপুণ্যে যেমন সার্থক হয়ে উঠেছে, তেমনি চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের অন্য দুইখানি উপন্যাস, অর্থাৎ 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-র বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে যথাক্রমে মারাঠা ও রাজপুতদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'-কে যেমন মারাঠানায়ক শিবাজীর অভ্যুত্থানের ইতিহাস বলা যায়, 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'কে তেমনি বলা যায় রানা প্রতাপ তথা রাজপুতজাতির পতনের ইতিহাস। এই উপন্যাস দু'টিতে রমেশচন্দ্র বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই মুখ্য চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু, ঐতিহাসিক কাহিনীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, লেখক উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেমকাহিনীকে মানবিক অনুভূতিতে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দু'টি হ'লো—'সংসার' ও 'সমাজ'। পল্লীজীবনের পরিবেশে, তিনি এই দু'টি উপন্যাসে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর সহানুভূতিসম্পন্ন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংসার'-উপন্যাসে তিনি নরনারীর প্রেমকে যেমন উচ্চ স্থান দিয়েছেন, তেমনি সমর্থন করেছেন বিধবা-বিবাহকে। 'সমাজ'-উপন্যাসে একদিকে যেমন জাতিভেদ-সমস্যা আলোচিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি আবার অসবর্ণ-বিবাহের বর্ণনাও দেখতে পাওয়া যায়। এই দু'টি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র যেন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। চরিত্র-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা প্রকাশ না পেলেও, সমাজ-চিত্র অঙ্কনে তিনি যে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় প্রশংসনীয় কবিত্ব-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক উপন্যাস

[১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে কলকাতায় রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। উপন্যাস ব্যতীত তাঁর ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং 'Civilisation of Ancient India' এবং 'Literature of Bengal' উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।]

[এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের সমকালীন ও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম করা যেতে পারে। রমেশচন্দ্রের সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা' নামে একখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা ক'রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা করুণরসাত্মক। রমেশচন্দ্র ও তারকনাথের পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে যাঁরা উপন্যাস রচনা ক'রে অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হলেন—স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।]

(গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। এদেশের সাহিত্যে ছোটগল্প-রচনার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ একদিন স্থাপন করেছিলেন, প্রভাতকুমার সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিচিত্র অনুভূতিকে অবলম্বন ক'রে তিনি যে-সব ছোটগল্প রচনা করেন সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান। অনবদ্য ভঙ্গিতে, অনাবিল কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে, তিনি মানুষের খণ্ড জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে মানবজীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে যে হাস্যরসের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় পাঠকমনকে তা অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তোলে, কোথাও সে হাস্যরসের মাধ্যমে মানুষকে আঘাত করবার চেষ্টা নেই। এইখানেই তিনি সাহিত্যিক হিসাবে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার কোনো কোনো গল্প যেমন কৌতুকরসে উপভোগ্য, তেমনি অনেক গল্প আবার করুণরসের স্নিগ্ধতায় অন্তরস্পর্শী। কৌতুকরসের দিক থেকে তাঁর 'প্রতিজ্ঞাপূরণ', 'নিষিদ্ধ ফল', 'রসময়ীর রসিকতা', 'বিলাতফেরতের বিপদ', 'মুক্তি', 'পুনর্মূষিক', 'মাস্টার মশাই', যেমন উল্লেখযোগ্য, করুণরসের দিক থেকে তেমনি সার্থক তাঁর 'আদরিণী', 'বাল্যবন্ধু', 'মাতৃহারা', 'সতী' প্রভৃতি গল্প। তাঁর 'আদরিণী' গল্পটি বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ। জয়রাম মোক্তারের গৃহপালিত একটি হাতিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি যেভাবে মূক পশুর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ানুভূতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা স্বভাবতই অন্তরকে স্পর্শ করে। জয়রাম মোক্তারের চরিত্র-চিত্রণেও লেখক অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্প-রচনায় কৃতিত্ব

প্রভাতকুমারের কয়েকখানি উপন্যাসও সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন—'রত্নদীপ', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুর কৌটা' 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও, মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বা উত্থান-পতনের যে রূপটি থাকলে পাঠকমনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে, সে-রূপের কোনো পরিচয় নেই। 'সিন্দুর কৌটা'-উপন্যাসেও জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু, চরিত্র-সৃষ্টির

বিভিন্ন উপন্যাস

দিক থেকে তাঁর 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসখানি অপেক্ষাকৃত সার্থক। এই উপন্যাসে প্রভাতকুমার অনাবিল কৌতুকরসের সৃষ্টিতেও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনা-বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁর 'রত্নদীপ' উপন্যাসখানি একসময় পাঠকমহলে বিশেষ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণেও প্রভাতকুমার সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে তিনি ছোটগল্প-রচনাতেই অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় একজন ব্যারিস্টাররূপে। তাঁর ছোটগল্পের দু'টি সংকলন-গ্রন্থ 'দেশী ও বিদেশী' এবং 'ষোড়শী'। ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

(ঘ) শরৎচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক হিসাবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তেমনি খ্যাতি লাভ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের দানেই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্র যে-ভাবে বাংলার ঘরোয়া জীবনকে তাঁর বিভিন্ন রচনার ভিতর দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর পরবর্তী কোনো লেখকের পক্ষেই ঠিক সে-রকমটা সম্ভব হয়নি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার যে অন্তরঙ্গ রূপটি তাঁর সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ একটি শিল্পী মন। সমাজের অসহায়, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ বেদনাকে তিনি যেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন এবং সেই কারণেই তাঁর সমস্ত দরদ গিয়ে পড়েছে তাদের উপর। বাঙালী পাঠকমহলে শরৎচন্দ্র তাই 'দরদী কথাশিল্পী'-রূপে অভিনন্দিত। শরৎচন্দ্রের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো তাঁর সহজ ও সাবলীল ভাষা, চিত্তস্পর্শী কথোপকথনের ভঙ্গি, মানবমনের নিবিড় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা, বাস্তবধর্মী চরিত্র-চিত্রণ এবং সর্বোপরি অবজ্ঞাত, নিপীড়িত নরনারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি। শিশু ও কিশোর চরিত্রে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে এবং নারী-চরিত্র চিত্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রযুগে সাহিত্য রচনা ক'রে শরৎচন্দ্র যেভাবে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদালাভ করেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

শরৎচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্য

শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে। এর আগে 'মন্দির' নামে তাঁর একটি গল্প কোনো একটি সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পুরস্কার লাভ করে। 'বড়দিদি'-কে অবশ্য উপন্যাস না ব'লে বড়গল্প বলাই যুক্তিসঙ্গত। সে যাই হোক, এই 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তারপর, আর যেসব প্রকাশিত হয় সেগুলি হ'লো— 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'দেনা-পাওনা', 'কাশীনাথ', পরিণীতা', 'নিষ্কৃতি', 'স্বামী',

'মেজদিদি', 'পণ্ডিতমশাই', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বামুনের মেয়ে', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস' 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি। উপন্যাস হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'দেনা-পাওনা', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত,' 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন-ই নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক উৎপীড়নের বাস্তবধর্মী চিত্র তিনি যেমন এঁকেছেন 'পল্লীসমাজ' ও 'অরক্ষণীয়া'-য়, সমাজের সেই নিপীড়নের ও স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা তেমনি স্থান পেয়েছে তাঁর আরও অনেক গল্পে ও উপন্যাসে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েও চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে, একজন সামান্য নারী কিভাবে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'তে পারে তার পরিচয় রয়েছে 'দেনা-পাওনা'-উপন্যাসের নায়িকা অলকার চরিত্রে। এই উপন্যাসের নায়ক জীবানন্দ তৎকালীন বঙ্গসমাজের অধঃপতিত এক জমিদারের প্রতীকরূপে অঙ্কিত হ'লেও শরৎচন্দ্রের রচনা-নৈপুণ্যে তাঁর জীবনের গতিধারা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'চরিত্রহীন-উপন্যাসে' যে সমস্যার কথা আছে, সেই সমস্যা 'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনসম্মত প্রেম বড়, না সকল সংস্কারমুক্ত স্বাভাবিক প্রেম বড়। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রেম ও তার পরিণতির কথা তিনি যেমন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা ক'রে মানবধর্মের সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন, তাতে ক'রে তাঁর সমাজবিরোধী কতকগুলি ভাব যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে তা দুঃসাহসের পরিচায়ক। কিন্তু, শরৎচন্দ্র যাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে কোনোদিনই কুণ্ঠিত হননি। 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসে ভ্রমণ-কাহিনীর যে আস্বাদ পাওয়া যায় সাহিত্যের দিক থেকে তা অভিনব। 'পথের দাবী'-উপন্যাস ভারতের স্বদেশী-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। দেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বোধ সম্পর্কে বিভিন্ন তর্কবিতর্ক ও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। 'শেষ প্রশ্ন'-উপন্যাসটি তাঁর পরিণত বয়সের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু তার সমাধানের কোনো পথনির্দেশ করেননি, সে-ভার তিনি অতি কৌশলে ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকদের উপর।

বড়গল্প ও উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের মানবপ্রীতিই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের ভিত্তি। মানুষকেই তিনি বড় ক'রে দেখেছেন, কাজটাকে নয়। পাপকে তিনি ঘৃণা করলেও পাপীকে কখনও ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেননি। নরনারীর সহজাত ভালোবাসাকেই তিনি দিয়েছেন শ্রদ্ধার আসন, মনের মিলনকেই তিনি দেখেছেন বড় ক'রে, লৌকিক সংস্কার বা আচার-অনুষ্ঠানকে নয়। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা প্রধানত সমাজের অভিজাত বা উচ্চবিত্তদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনবৃত্তান্তকেই উপন্যাসের উপজীব্য করেছিলেন। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ উপন্যাসের অবলম্বন হয়েছে সমাজের

বিভিন্নধর্মী চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য

নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ও সর্বহারাদের জীবনকথা। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রতিহিংসা ইত্যাদির মর্মস্পর্শী রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্রেরই প্রাধান্য। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি একদিকে যেমন স্নেহময়ী ও মমতাময়ী, অন্যদিকে তেমনি চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমুজ্জ্বল। স্নেহ-প্রীতির অপূর্ব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় 'মেজদিদি'-র উপন্যাসের হেমাঙ্গিনী, 'পল্লী-সমাজ'-এর বিশ্বেশ্বরী, 'রামের সুমতি'-র নারায়ণী, 'বিন্দুর ছেলে'-র বিন্দু প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। প্রেমের দ্বন্দ্বে যে-সকল নারী-চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিকাশ লাভ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী, 'দেবদাস'-এ পার্বতী, 'দত্তা,-র বিজয়া, 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। কিশোর-চরিত্র-চিত্রণেও শরৎচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। যেমন—'শ্রীকান্ত'-র শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, 'রামের সুমতি'-র রাম, 'দত্তা'-র পরেশ প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ প্রধান পুরুষ-চরিত্রই কিঞ্চিৎ আত্মভোলা প্রকৃতির। কয়েকটি ধূর্ত-চরিত্র সৃষ্টি ক'রেও শরৎচন্দ্র তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে। যেমন—'পল্লী সমাজ'-এর বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী, 'দত্তা'-র রাসবিহারী, 'বামুনের মেয়ে'-র গোলক চাটুজ্জে প্রভৃতি।

ছোটগল্প-রচনাতেও শরৎচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'মহেশ'-গল্পের বিষয়বস্তুর সার্বজনীন আবেদনই গল্পটিকে বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'পরেশ', 'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'রামের সুমতি', 'অনুরাধা', 'ছবি' প্রভৃতি।

[শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী-জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। ভাগলপুরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁর কর্মজীবনের অনেক দিন কাটে ব্রহ্মদেশে এবং সেখানে থেকেই তিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়—১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে।]

অনুশীলনী

১। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। বাংলা-উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হইয়াছে এবং উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা বর্ণনা কর। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্যসম্রাট' কেন বলা হয়?

৩। ঔপন্যাসিক হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তের পরিচয় দাও।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত কর।

৫। শরৎচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্য কী এবং বাংলাসাহিত্যে তাঁর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কাব্য ও কবিতা

কবিতার মাধ্যমেই বাংলাসাহিত্যের উদ্ভব হয় প্রায় একহাজার বছর আগে। খ্রীষ্টীয় ১০-ম শতাব্দীর বৌদ্ধ গান ও দোঁহা বা চর্যাপদাবলীর মধ্য দিয়ে যে কাব্যের ধারা প্রবাহিত হয় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলীই তার উন্নত রূপ। ১৮-শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার জাতীয়-জীবনে দেখা যায় একটা বিপ্লবের ভাব। পলাশী-যুদ্ধের সময় থেকে দেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে সূচিত হয় নবজাগরণের স্পন্দন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় তারিখ। কারণ, ভারতচন্দ্রকেই আমরা জানি পুরাতন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি ব'লে। অস্তগামী ও উদয়োন্মুখ দুই যুগের কাব্যসাহিত্যের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি ভারতচন্দ্রে সুপরিস্ফুট। তিনি মঙ্গলকাব্য ('অন্নদামঙ্গল') রচনা করলেও সে-কাব্যে দেবমাহাত্ম্য-প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে দেখা দেয়নি, মর্ত্যমানবের মর্মকথাই সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের লেখনীতে শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং তাঁদের মিলন-কলহময় গার্হস্থ্য চিত্রটি একান্তভাবেই মানবীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ঈশ্বর পাটনীর উক্তির (যথা : প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড়হাতে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে ॥) ভিতর দিয়ে কবি জীবনকে কত নিবিড়ভাবে দেখেছেন তার স্বরূপত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। সেই কবি ভারতচন্দ্রের পর থেকেই বাংলা কাব্য ও কবিতার আধুনিক যুগের শুরু।

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শতাব্দী (অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত) ধ'রে চলেছে কবিয়ালদের যুগ। সাহিত্যে কবিগানের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ, নবযুগের লক্ষণগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তাঁদের গানে, ছড়ায়, পাঁচালিতে। ১৯-শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই, আধুনিক যুগের চিন্তাধারার অন্যতম ধারক ও বাহক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হয়। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি হিসাবে তাঁর আসন যতটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবে কিন্তু ততটাই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সংবাদপত্র তথা সাময়িক-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আধুনিক যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ রচয়িতার সন্ধান পাই। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, গুপ্তকবির সময়ে তাঁর সমকক্ষ আর কোনো কবি ছিলেন না, ব্যঙ্গকবিতা রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা হয়তো গুপ্তকবির প্রতি সুবিচার করতে পারব না, কিন্তু ছড়াজাতীয় কবিতায় তিনি যে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। ভারতচন্দ্রের রচনা-রীতিকে মূলত অনুসরণ করলেও, তাঁর লঘু-রচনার মধ্যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁরই সম-

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সাময়িক কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছন্দ-চাতুর্য দেখিয়ে সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খাঁটি দেশীয় ভাবধারার শেষ কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারার মত্ত হাওয়া তখন এদেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই চঞ্চলতার মধ্যে যে-সব কবি আবির্ভূত হন, সেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতির পূর্বেই কাব্য-সাহিত্যের আসরে দেখা দেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের তিনি সর্বাঙ্গীণ পারিপাট্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং বাংলাসাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক কাব্যরচনার তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁর 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ), 'কর্মদেবী' (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ) ও 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক) মধুসূদন

আধুনিক-যুগের বাংলাসাহিত্যের আসরে বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি এক নবযুগের প্রবর্তক। কবি হিসাবে তাঁর আবির্ভাব কতকটা আকস্মিক, তাই বিস্ময়করও বটে। রঙ্গলালের পূর্বেই তিনি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু নাট্যকাররূপে; কাব্যরচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন কিছু পরে, রঙ্গলালের কবি-খ্যাতি তখন বিশেষভাবেই বিস্তারলাভ করেছে। মধুসূদন তাঁর পূর্ববর্তী কোনো কবির কাব্যরীতিকেই অনুসরণ করেননি, কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি চলেছেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পথে। তাঁর কাব্য-রচনার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবধারা ও আঙ্গিকের আদর্শ, অন্যদিকে বিষয়বস্তু তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন ভারতের অমূল্য ভাবসম্পদ্ থেকেই। মধুসূদনকে তাই আমরা বলতে পারি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সমন্বয়ের কবি।

কাব্য-রচনার মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা

অন্ত্যানুপ্রাসহীন (অমিতাক্ষর) ছন্দের প্রবর্তন ক'রে মাইকেল মধুসূদন বাংলা-কাব্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত রূপটাকেই দেন সম্পূর্ণ বদলে। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে, অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব'-কাব্য প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন ছন্দে রচিত তাঁর এই কাব্যখানি সে-যুগে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় 'মেঘনাদবধ-কাব্য' (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ), 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' (১৮৬২ খ্রীঃ অঃ) ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬২-৬৬ খ্রীঃ অঃ)। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রতি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হন। ইংরেজী ভাষায় কাব্য-রচনা

বিভিন্ন কাব্য : অমিতাক্ষর ছন্দ ও সনেটের প্রবর্তক

ক'রে তিনি একজন প্রখ্যাত কবি হবেন, এই রকমের একটা আকাঙ্ক্ষা প্রথম থেকেই তাঁর মনে বাসা বাঁধে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তিনি মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে বিলাতে যান এবং ইংরেজ-সমাজে মিশে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হন। তারপর দেশে ফিরে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত হয়ে মাদ্রাজে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর ইংরেজী কাব্য 'Captive Lady' প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন বাদে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাংলাভাষাই তাঁর কাব্য-প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত বাহন। এই উপলব্ধির ফলেই সৃষ্ট হয় তাঁর প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ—'তিলোত্তমাসম্ভব'-কাব্য। এই কাব্যে তিনি যে অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দের প্রবর্তন করেন, আসলে তা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত বর্ধিত-মাত্রার পয়ার ছন্দ। যেমন—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;"

এই ছন্দের প্রধান গুণ হ'লো এই যে, বক্তব্যবিষয়ে একটা স্বচ্ছন্দ গতিবেগ সঞ্চারের ক্ষমতা। মধুসূদনের হাতে প'ড়ে বাংলা-কাব্য যে শুধু ছন্দের দিক থেকেই অভিনবত্বের সৃষ্টি করল তা নয়, ভাবব্যঞ্জক শব্দসম্ভারে, শব্দের ধ্বনি মধুর্যে ও অলঙ্কার-প্রয়োগে তা অপূব এক সুষমায় মণ্ডিত হ'লো। পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনী অবলম্বন ক'রে মধুসূদন তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব'-কাব্য রচনা করেন। এর পর তিনি ছন্দমিল যোগে ও গীতিকবিতার অপূর্ব সুরে তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনা করলেও, সেখানি প্রকাশিত হয় 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-এর পরে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং এই কাব্যই তাঁকে ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বাংলাকাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছে। পাশ্চাত্ত্য 'এপিক'-জাতীয় মহাকাব্যের আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি সংগ্রহ করেন রামায়ণ থেকে, কিন্তু চরিত্র-কল্পনায় তিনি যে মৌলিকত্বের পরিচয় দেন তা যেমন অভিনব, তেমনি উচ্চ-প্রশংসার যোগ্য। মধুসূদন-অঙ্কিত রাবণ ও মেঘনাদ রাক্ষস নয়, মানবোচিত বিবিধ গুণসমন্বিত মানুষ। রাম, সীতা, সরমা, মন্দোদরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেও তিনি দেবতা বা রাক্ষসের বিশেষ কোনো মূর্তি কল্পনা না ক'রে তাঁদেরও এঁকেছেন মানবিক গুণসম্পন্ন ক'রে। মধুসূদনের রাবণ একদিকে যেমন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বীরপুরুষ, অন্যদিকে তেমনি তিনি পুত্রশোকে অধীর স্নেহবৎসল পিতা। 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-এ যুদ্ধের বর্ণনায় যেমন বীররস প্রকটিত হয়েছে, তেমনি করুণরসের এক অপূর্ব ধারা সঞ্চারিত হয়েছে সরমার নিকট সীতার অতীত-সুখের বিবরণ প্রকাশে। 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' মধুসূদনের আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাবধারা যে অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করেছে, নিঃসন্দেহে তা উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে। গীতিকবিতার সুর-মূর্ছনা ধ্বনিত হয়েছে প্রতিটি কবিতায়।

অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'-এর মধ্যেও যেন গীতি-কবিতার সেই সুরটি আপনা থেকে বেজে ওঠে। 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' পত্রাকারে রচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। এইসব পত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বীর-রমণী তাঁদের প্রিয়-জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মনের বিচিত্রভাব প্রকাশ করেছেন। রাজবধূ জনার দৃপ্ত-তেজের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'-কবিতায়, 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'-কবিতায় তেমনি শকুন্তলার প্রেম-মাধুর্যের অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের আর একটি বিশেষ দান তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। ইংরেজী সনেটের আদর্শে রচিত তাঁর এই চৌদ্দ-চরণে সম্পূর্ণ এক একটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবি-মানসের যে বিচিত্র রূপটি প্রকাশিত হয়েছে তার যেন কোনো তুলনা নেই। কবি যখন ইউরোপের ভার্সাই নগরে অবস্থান করছিলেন তখন এই কবিতাগুলি রচিত হয়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-র বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে কবি স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় দিয়েছেন। তার সেই অনুরাগ শুধু যে বাংলাদেশের প্রতি তা নয়, সে অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাভাষার প্রতি, এদেশের প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণীর প্রতি, নদ-নদী, নিসর্গ-প্রকৃতি এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রতি। চতুর্দশপদী কবিতা হিসাবে তাঁর 'বঙ্গভাষা', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কাশীরাম দাস', 'কৃত্তিবাস', 'বিদ্যাসাগর', 'বিজয়া-দশমী' প্রভৃতি বিশেষ প্রসাদ-গুণসম্পন্ন।

(খ) হেমচন্দ্র

কবি রঙ্গলালের পর, ১৯-শ শতাব্দীর আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদনের কাব্যরীতি ও ভাবধারাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখবার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব। তিনি শুধু যে মধুসূদনের একান্ত ভক্ত ছিলেন তাই নয়, মধুসূদনের ভাবশিষ্যও বটেন। হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি মেলে সামাজিক ও পারিবারিক বিপ্লবের চেতনা। তাঁর বেশির ভাগ রচনাই ছন্দ ও মিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত; কোনো কোনো কবিতা আবার অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দে রচিত। ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্র কবিতা রচনা করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়—'বীরবাহু-কাব্য' (১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ); 'কবিতাবলী' ১ম খণ্ড (১৮৭০ খ্রীঃ অঃ); 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ); 'আশাকানন' (১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ); 'কবিতাবলী' ২য় খণ্ড (১৮৮০ খ্রীঃ অঃ), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০ খ্রীঃ অঃ); 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২ খ্রীঃ অঃ) 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দ); 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি। হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়ে সহজ প্রাণের যে সরল উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে, তৎকালীন কবিতা-পাঠকদের কাছে তা স্বাভাবিক কারণেই হৃদয়গ্রাহী হয়ে

মধুসূদনের ভাবশিষ্য : বিভিন্ন কাব্য ও কবিতা

ওঠে। কবির দেশাত্মবোধের প্রথম অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর 'বীরবাহু কাব্য'-এ। এই কাব্যে কোনো পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত হয়নি, কবি এখানে প্রাচীনকালের দেশরক্ষাব্রতী হিন্দু বীরপুরুষদের বীরত্বের কথাই প্রকাশ করেছেন কল্পনার রঙ্ মিশিয়ে। এই কাব্যের রচনা-রীতিতে কবি ভারতচন্দ্র ও রঙ্গলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কবিতাবলী'-র বিভিন্ন কবিতায় একদিকে যেমন গীতিকবিতার সুরটি বেজে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ভাষা ও ছন্দের উপর কবির দখল। এর পরে নাম করতে হয় তাঁর 'বৃত্রসংহার'-কাব্যের। যুগধর্মে প্রভাবান্বিত মহাকাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার' রচনা করলেও, নানা কারণে তা সার্থকতালাভ করেনি। এই কাব্যে মাইকেলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চরিত্র-সৃষ্টি এবং ঘটনা-বিন্যাসের দিক থেকেও এই কাব্যের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনেক মিল সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, 'বৃত্রসংহার'-কাব্যে যে মহাকাব্যোচিত একটা বিস্তৃত পরিবেশ ও গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনা, চরিত্র ও রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যও আছে। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর (বা অমিতাক্ষর) উভয় ছন্দেই কাব্যের বিভিন্ন অংশ রচিত। ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিক থেকে 'দশমহাবিদ্যা'-য় হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার একটা পরিণত রূপ দেখা যায়। এই কাব্যে কবির কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টি এখানে যেন গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠেছে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা। ফলে, এই কাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর 'কবিতাবলী'র দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কবিতাই উল্লেখযোগ্য। যেমন, তাঁর, 'জীবনসঙ্গীত', 'যমুনাতটে', 'ভারতভিক্ষা', 'ভারতসঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা। এক জায়গায় কবি যেমন বলেছেন—

> "একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
> ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
> কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
> তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।"

বাংলাদেশে জাতীয়-চেতনার উন্মেষে এই ধরনের কবিতা যে বিশেষ সাহায্য করেছিল তাতে কোনো ভুল নেই। প্রকৃতির বর্ণনাতেও কবি জায়গায় জায়গায় বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

[হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। বি. এ. পাস ক'রে তিনি প্রথমে শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হন, পরে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। বৃদ্ধবয়সে কবি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪-এ মে তাঁর মৃত্যু হয়।]

(গ) নবীনচন্দ্র

বাংলাসাহিত্যের আসরে হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পরেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের আবির্ভাব। তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ), 'রৈবতক' (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩ খ্রীঃ অঃ) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ)

কাব্যগ্রন্থ। মহাকাব্য-রচনার বিরাট সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তা সার্থকতা লাভ করেনি। কৃষ্ণ-চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই, এবং মনুষ্যত্বের জয়গানেও তাঁর কাব্য মুখর। এই সব কারণেই নবীনচন্দ্র বাংলা-কাব্যসাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ও রচনা-বৈশিষ্ট্য

নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা-সংকলন 'অবকাশ রঞ্জিনী'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয় উক্ত কবিতা-সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড। গীতিধর্মী এইসব কবিতার মধ্য দিয়ে কবির ভাবপ্রবণ মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, কবিতাগুলির অধিকাংশই তাঁর প্রথম যুগের রচনা ব'লে লিপি-কুশলতা তেমন প্রকাশ পায়নি। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' কিন্তু তাঁর রচনা-কৃতিত্বের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বদেশের প্রতি কবির ঐকান্তিক অনুরাগ এই কাব্যে যেন জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। মোহনলালের আত্মত্যাগ ও জাগরণের বাণীর মধ্য দিয়ে কবি যে একদিন বাঙালীর চিত্ত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন সে-কথা অনস্বীকার্য। নবীনচন্দ্রের আখ্যানমূলক অন্যতম কাব্যগ্রন্থ হ'লো 'রঙ্গমতী' (১৮৮০ খ্রীঃ অঃ)। আখ্যানভাগে বীরেন্দ্র-কুসুমিকার যে প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণই কাল্পনিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সুন্দর একটি পরিবেশ রচিত হয়েছে এই কাব্যে, এবং করুণরসই প্রাধান্যলাভ করেছে। এর পর নবীনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক তিনখানি কাব্য—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই কাব্য তিনখানিকে একত্র ক'রে বিচার করলে, একে মহাকাব্যের পর্যায়েই ফেলতে হয়। এতে একদিকে যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শরূপে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ('রৈবতক'-এ আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্র'-এ মধ্যলীলা এবং 'প্রভাস'-এ অন্ত্যলীলা) বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিরাট একটি দেশের (ভারতবর্ষের) জাতীয় জীবনেরও কিছু কিছু পরিচয় আছে। এই কাব্যত্রয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি ও গার্হস্থ্যনীতির যেমন স্থান রয়েছে, তেমনি রয়েছে সদা-বিবদমান দেশে একটা মহাজাতি গঠনের পরিকল্পনা। 'রৈবতক' থেকে শুরু ক'রে 'প্রভাস'-এর শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্রের যে সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা আছে তাই এই কাব্যতিনখানিকে একটি অখণ্ড কাব্যে পরিণত করেছে। মানবজীবনের চিরন্তন ধারার সঙ্গে তা যেন অভিন্ন। যেমন 'রৈবতক'—লীলার জীবন, 'কুরুক্ষেত্র'—কর্মের জীবন এবং 'প্রভাস'—বৈরাগ্যের জীবন। এই কাব্যত্রয়ের পটভূমিকা হ'লো সমগ্র আর্যসভ্যতা ও আর্য-অনার্য সংঘর্ষ। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ হলেন ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত সমাজ-শাসক-বিরোধী, আর দুর্বাসা হলেন সেই সমাজ-শাসকের প্রতীক-ব্রাহ্মণ। দুর্বাসার অভিশাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলেছিলেন—

"নরের অদৃষ্ট
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান!"

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার অভিনবত্বেই নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব ও খ্যাতি। মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বন ক'রেও কবি অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খ্রীষ্ট', 'অমিতাভ' (বুদ্ধের জীবনী), 'অমৃতাভ' (চৈতন্যের জীবনী)। কাব্যকলার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নবীনচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির অনেক গুণ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল উচ্ছ্বাস-সংযমের অভাব, ও সুসঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারার দৈন্য। ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের রাশকে সংযত করতে পারলে, কবি হিসাবে নবীনচন্দ্র যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসংখ্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও, মনুষ্যত্বের আদর্শ, স্বদেশানুরাগ, গীতিকবিতার সুরধর্ম, সর্বোপরি কবির কবিপ্রাণ—তাঁর কাব্য ও কবিতাবলীকে একটা অপূর্ব সুষমা দান করেছে।

[নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন চট্টগ্রামের নয়াপাড়া-অঞ্চলের অধিবাসী। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুআরি তাঁর জন্ম হয়। বি. এ. পাস ক'রে প্রথমে তিনি শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হন, পরে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মূলত কবি হ'লেও গল্প-রচনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর আত্মচরিত 'আমার জীবন'ই তার প্রমাণ। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জানুআরি তিনি পরলোকগমন করেন।]

(ঘ) বিহারীলাল

পূর্বোক্ত কবিগণের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, ১৯-শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয়। তিনি আর কেউ নন—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলাকাব্যে যে নূতনত্বের সন্ধান দেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার মধ্যেই হয় তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না, ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল এবং তাঁর কাব্যের মর্মকথাও সর্বত্র স্পষ্টতালাভ করেনি,—তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে ও কবিতায় কবি-অনুভূতির যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তাই যেন তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিহারীলাল 'অবোধবন্ধু' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেই পত্রিকাতেই ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁর নিসর্গ-সন্দর্শন', 'প্রেম-প্রবাহিনী' ও 'বঙ্গসুন্দরী' এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব কবিতার মাধ্যমে তিনি নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে যে গীতিধর্মী কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন তদানীন্তন বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নূতন। বাংলার কাব্যনিকুঞ্জ যখন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মৃদঙ্গ-মুরজ-বীণার ধ্বনিতে মুখর, বিহারীলাল তখন এসে হঠাৎ যেন বাঁশের বাঁশির সুর শুনিয়ে চমক লাগালেন। অর্থাৎ, সাহিত্যক্ষেত্রে যখন মহাকাব্য-রচনার ধারা চলছিল, সেই সময় গীতিকবিতা-রচনার একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন কবি বিহারীলাল। তাঁর রচনার ভাব ও সুরে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রথম বয়সে কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে-কথা কবিগুরু

আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক : রবীন্দ্রনাথের উপরে প্রভাব

নিজের মুখেই স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কাজেই আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিহারীলালের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক গীতিকবিতার (ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'লিরিক') বিশেষ একটা লক্ষণ এই যে, বক্তব্যের সঙ্গে কবির নিজস্ব অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বিহারীলালের কবিতায় এই বিশেষ লক্ষণটি আবিষ্কার ক'রে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—"ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা-কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

'বঙ্গসুন্দরী'-কাব্যের দ্বারাই কবি বিহারীলাল সর্বপ্রথম পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করেন। দশটি পৃথক সর্গে এই কাব্য বিভক্ত হ'লেও, প্রত্যেকটি সর্গ-ই যেন এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক কবিতা। এই সকল কবিতার মধ্য দিয়ে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও বা অস্পষ্টরূপে কবির বহুবিচিত্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুভূতির প্রকাশে সবখানেই যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে তা নয়, কিন্তু কাব্যসৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য কবি যে একটা আত্মসমাহিত ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন সে-কথা বোঝা যায়। তাছাড়া, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতেই ফুটে উঠেছে ছন্দের একটা লালিত্য, অলঙ্কারযুক্ত ভাষা-প্রয়োগের একটা বিশেষত্ব। 'বঙ্গসুন্দরী'-র তৃতীয় সর্গ 'সুরবালা'য় কবি লিখেছেন—

বিভিন্ন কাব্য ও কবিতা

"বিকশিত নীল কমল আনন
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ
পূরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।"

এইভাবে ছন্দের মাধুর্যে, লালিত্যে, ও আত্মসমাহিত ভাবের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে কবি বিহারীলাল একদিন যে নূতন কাব্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই হয় তার পূর্ণ বিকাশ। 'বঙ্গসুন্দরী'র পরে, বিহারীলাল আরও কয়েকখানি কাব্য ও বিভিন্ন কবিতা রচনা করেন। কিন্তু, তিনি তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখেছেন একমাত্র 'সারদামঙ্গল'-কাব্যই। এই কাব্যেই যে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক নাট্যকাব্যে। 'সারদামঙ্গল' কাব্যরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে একে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত। বিহারীলালের 'সারদা' কোনো পৌরাণিক বা লৌকিক দেবতা নন, কবির কাছে তিনি বিশ্বব্যাপিনী এক রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। 'হৃদয়-প্রতিমা'-রূপে কবি তাঁর আরাধনা করেছেন, 'মানস-সুন্দরী'-রূপে তাঁর ধ্যানে বিভোর হয়েছেন, কখনও আবার তাঁকে 'সৌন্দর্যময়ী'-রূপে

কল্পনা ক'রে প্রেমের সূত্রে একান্ত আপনার ক'রে নিতে চেয়েছেন। এই 'সারদা'ই তার কাব্যলক্ষ্মী বা সরস্বতী এবং সমগ্র কাব্যে কবি তাঁরই ধ্যানে আত্মসমাহিত। 'সারদামঙ্গল'-এর বিভিন্ন কবিতা পাঠ ক'রে এই সত্যেই উপনীত হওয়া যায় যে, বিহারীলালের কবিতাবলীর প্রধান লক্ষণ হ'লো ভাব-বিভোরতা। তাঁর কবিতা বস্তু-নির্ভর বা অব্‌জেকটিভ্‌ নয়, বরং তা অতিমাত্রায় সাব্‌জেকটিভ্‌ বা ব্যক্তি-সাপেক্ষ। তিনি বহির্বিশ্বে তাকিয়েছেন, কিন্তু তার যথাযথ রূপকে গ্রহণ করেননি, বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে কী রহস্য আছে তারই ধ্যানে বিভোর হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে, এই রহস্য আছে ব'লেই বিশ্বচরাচর এত সুন্দর। বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই রহস্যকে তিনি স্পষ্ট ক'রে দেখতে বা বুঝতে চাননি এবং সম্ভবতো সেই কারণেই তা দেখতে বা বোঝাতেও পারেননি। এই দেখা যেন প্রদোষ-আলোকে পৃথিবীকে দেখার মতো, আলো-আঁধারে বোঝার মতো। কল্পনার মৌলিকতায়, ভাবের গভীরতায়, ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণনা-নৈপুণ্যে বিহারীলাল যে কাব্যসৃষ্টি করেছেন, তাঁর আগে আর কোনো কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। 'সারদামঙ্গল'-এর কবির বিশেষত্ব এইখানেই। এই সারদামঙ্গল' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন—"সারদা-মঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে।" বিহারীলালের অন্যান্য কাব্য ও কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সঙ্গীত-শতক', 'বাউল-বিংশতি', 'মায়াদেবী', 'শরৎকাল', 'ধূমকেতু', 'দেববাণী', 'সাধের আসন'। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই তাঁর সর্বশেষ রচনা।

[কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ ক'রে তিনি তাঁর কর্মজীবন সুরু করেন। 'অবোধবন্ধু' তাঁর সম্পাদিত একখানি সাহিত্য-পত্রিকা। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

[ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব পর্যন্ত আরও কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনেশচরণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী, অক্ষয়কুমার বড়াল। কিন্তু, প্রতিভার নবোন্মেষে তাঁরা তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি ব'লেই হয়তো পাঠকসমাজ আজ তাঁদের ভুলতে বসেছে।]

অনুশীলনী

১। আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য কিভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, কবির রচনা-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

৩। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর দান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৫। নিম্নলিখিত কাব্য-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর :—
(ক) মেঘনাদবধ-কাব্য; (খ) চতুর্দশপদী কবিতাবলী; (গ) বৃত্র-সংহার; (ঘ) সারদামঙ্গল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রবীন্দ্রনাথ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় জাতীয় জীবনে নবজাগরণের যে বিরাট প্লাবন এসেছিল, সেই প্লাবনের উচ্ছ্বাসে দেখা গিয়েছিল প্রতিভা ও মনীষার প্রাচুর্য। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, সেই প্রতিভা ও মনীষা প্রাচুর্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। আর, একা রবীন্দ্রনাথই যেন সেই অভিব্যক্তির পূর্ণবিকাশ। যে বিরাট প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী হয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন বোধ করি আজও সম্ভব হয়নি। মহাকাব্য রচনা না ক'রেও তিনি মহাকবি, তাঁর সমগ্র জীবনই একটা মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। এ-কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেননি।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, রাষ্ট্রনীতি, এমন কোনো দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ না করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধু তাঁর সাহিত্যের দিক নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যুগান্তকারী একটা ঘটনা। কারণ, তাঁর বহুমুখী রচনার ঔজ্জ্বল্যে বাংলাসাহিত্যের সকল অন্ধকার দূর হয়েছে, সূর্যকিরণের মতোই রবীন্দ্র-সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের করেছে পুষ্টিসাধন। একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের জোরেই বাংলাসাহিত্য আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে একজন কবি হবেন তার আভাস তাঁর ছেলেবেলাতেই পাওয়া গিয়েছিল। সাত-আট বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। ঠাকুরবাড়ির যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, সেই পরিবেশ তাঁর প্রতিভা বিকাশের পক্ষে যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণে গিয়ে। অনন্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, পাখির কূজন, নদীর কলোচ্ছ্বাস, আলোছায়ার খেলা, নিসর্গ-প্রকৃতির বহুবিচিত্র রঙ এবং সর্বোপরি তুষারমৌলী হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর রূপ,— বালক কবির মনে সেদিন গভীরভাবেই রেখাপাত করেছিল। বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে যে কবিত্বের উন্মেষ হয়, ধীরে ধীরে তা পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে ভারতীয় দর্শন-উপনিষদের মর্মবাণী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে। প্রাচীন ভারতের সুমহান্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা একদিকে যেমন তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তিনি পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় দিকগুলিকেও আত্মস্থ ক'রে নিজের ভাবধারার পুষ্টিসাধন করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার এক বিস্ময়কর সমন্বয় তাই লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও

জীবনে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লো তার বিশ্বজনীন আবেদন। আর, সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি বিশ্বকবিরূপে বিশ্ববন্দিত।

রবীন্দ্রসাহিত্য বহুমুখী। একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া, সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যেদিকে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান-প্রাচুর্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে মহোজ্জ্বল নয়। যুগধর্মের প্রভাবে প'ড়েই হয়তো তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেননি। কিন্তু মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'লে তিনি যে বিস্ময়কর ও কালজয়ী কোনো মহাকাব্য পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যেতেন সে-বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ—সাহিত্যের সকল দিকেই তাঁর যে অফুরন্ত দান, তারই ঐশ্বর্যে বাংলাসাহিত্য আজ সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

॥ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, সেই সময় 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'য় 'অভিলাষ' নামে তাঁর একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। সেইটিই তার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা। তারপর একে একে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—'ভানুসিংহের পদাবলী', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কণিকা', 'কল্পনা', 'কথা ও কাহিনী', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'স্মরণ', 'শিশু', 'উৎসর্গ', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'বলাকা', 'শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী', 'বনবাণী', 'মহুয়া', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'গীতবিতান', 'লেখন', 'খাপছাড়া', 'স্ফুলিঙ্গ', 'ছড়ার ছবি', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যায়', 'শেষলেখা' প্রভৃতি। নব নব ভাবলহরীর সঙ্গে বহুবিচিত্র ছন্দের ও অলংকারের অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত তাঁর কবিতা ও গান পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দরের বাণী, সেই সঙ্গে দিয়েছে অমৃত-লোকের সন্ধান, উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবতার আরাধনায় আত্মস্থ হ'তে। প্রকৃতি ও মানুষকে একান্তভাবে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

কাব্য-সাহিত্য : কবিতা ও গান

"মরিতে চাহি না এই সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।" ('কড়ি ও কোমল')

মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বহুবিচিত্র রূপ রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় যে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে অসীম ও অরূপের মর্মোপলব্ধি ক'রে আনন্দে গেয়ে উঠেছেন—

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর ॥" ('গীতাঞ্জলি')

তেমনি আবার মানবতার লাঞ্ছনায় অপমানে ব্যথিত হয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছেন—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" ('গীতাঞ্জলি')

প্রকৃতির রহস্য-চেতনা ও মানবতার বোধ রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির সন্তান মানুষকেও ভালোবেসেছেন। তাঁর সেই অনুরাগ-মাধুর্যেই তাঁর সমগ্র কাব্যসাহিত্য শ্রীমণ্ডিত। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তাঁর প্রেম এবং ভক্তিও অপরিসীম। এই প্রেম ও ভক্তি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ও উপনিষদের দিব্যানুভূতিকে কবি এমন এক নতুন ভাষায়, নতুন ভঙ্গিতে ও নতুন ছন্দে রূপ দিয়েছিলেন, তাঁর পূর্বে বা পরে আর কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। দেশপ্রেমের অপূর্ব অভিব্যক্তিও ফুটে উঠেছে তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রভাব সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে আজ এমনভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে রেখেছে যে, রবীন্দ্রোত্তর কোনো কবি বা সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি নতুন কোনো বাণী শোনানো। প্রকৃতি ও মানবমনের যে লীলাবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া যায়, তাঁর অজস্র গানের মধ্যে দিয়েও ফুটে ওঠে সেই বিচিত্র ভাবমাধুর্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তাঁর গানের বাণীও সর্বজনের, সর্বকালের সর্বদেশের। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপূর্ব ভাষা ও ছন্দে, ভাব আর অনুভূতিতে তাঁর নিজস্ব সুরের যে ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়েছে, মানুষের মন তাতে স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ে।

কথা-সাহিত্য : উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা, রসরচনা

কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যেমন অসামান্য, কথা-সাহিত্যেও ঠিক তাই। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলাদেশে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে বাংলা উপন্যাস-সহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বঙ্কিমীভাষার জটিলতা থেকে বাংলা-ভাষাকে তিনি যেমন মুক্ত করেছেন, তেমনি বাংলা-উপন্যাসকে করেছেন বাস্তবধর্মী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান এবং বহু সংশয়ের নিরাকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভাবের দিক থেকে, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও রসসমৃদ্ধ ভাষার দিক থেকে, চরিত্র-সৃষ্টি ও নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে উপন্যাস কিভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিণত হ'তে পারে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার পদপ্রদর্শক। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'ল্যাবরেটারি' প্রভৃতি। প্রথম দু'টি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অনুসরণ করলেও তাঁর আর সব উপন্যাসই সামাজিক। ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে 'চোখের বালি'

'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ' যেমন তাঁর অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়' তেমনি দেয় তাঁর সামাজিক ও রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। বাংলাসাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের প্রচলন খুব বেশীদিনের নয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভাই সর্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের বিরাট সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকথা-সাহিত্যে তিনিই আধুনিক ও উচ্চাঙ্গের ছোটগল্পের পথপ্রদর্শক। তাঁর বেশির ভাগ ছোটগল্পই লিরিক-ধর্মী। মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি কি চমৎকারভাবেই না ফুটে উঠেছে তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর প্রতিটি গল্পে। পরিবেশ-সৃষ্টির চমৎকারিত্ব এবং মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ রবীন্দ্র-নাথের ছোটগল্পের আর দু'টি বিশেষত্ব। 'ক্ষুধিত-পাষাণ'-এর পরিবেশ রচনা এবং 'নষ্টনীড়'-এর নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ এককথায় তুলনাহীন সাহিত্যকৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্প স্থান পেয়েছে তাঁর কয়েকটি সংকলন-গ্রন্থে। যেমন—'গল্পগুচ্ছ', 'তিনসঙ্গী', 'গল্পসল্প', 'সে' প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি সর্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প হ'লো—'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'নষ্টনীড়', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ছুটি', 'কঙ্কাল', 'দুরাশা', 'কাবুলিওয়ালা', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি। আধুনিককালে রম্যরচনা নামে একশ্রেণীর বর্ণনাত্মক ও কবিত্বপূর্ণ যে-সব রচনা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই জাতীয় রচনারও সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'লিপিকা'-ই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। আর, রসরচনায় তিনি যে অদ্বিতীয় সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'হাস্যকৌতুক' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিটি রচনাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির দান অপরিসীম। কিন্তু নাটক-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সে-রকম প্রতিভার স্পর্শ সমগ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যের কোথাও নেই। বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রচনা-নৈপুণ্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ ক'রে তাঁর রূপক-নাটক, গীতিনাট্য ও নৃতনাট্য। রূপক-নাটকের মধ্যে আছে 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর,' 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'বাঁশরী', 'অচলায়তন' প্রভৃতি। গীতিনাট্যের মধ্যে যেমন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নৃত্যনাট্যের মধ্যে তেমনি জনপ্রিয় তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা'। এই ধরনের ভাবসমৃদ্ধ ও বিশেষ কবিত্বপূর্ণ নাটক-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যেই তা দুর্লভ। এই জাতীয় নাটকের দ্বারা বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথ যে এক নূতন ধারার প্রবর্তন ক'রে গিয়েছেন সে-কথা আজ শিক্ষিত ও রুচিশীল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। নির্মল আনন্দ ও প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটক। সাধারণ নাট্যশালায় তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গরসাত্মক ও কৌতুকরসাশ্রিত নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা

নাট্য-সাহিত্য : রূপক-নাট্যক, গীতিনাট্য ও কৌতুক-নাটক

লাভ করেছে। যেমন—'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা'। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত একটা কাব্যধর্মী নাটক।

বাংলা গদ্যভাষা রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে যে কতখানি উন্নত হয়েছে, আমরা তার পরিচয় পাই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীতে ও পত্রাবলীতে। প্রবন্ধ-রচনায় তিনি একদিকে যেমন উন্নত রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি দিয়েছেন তাঁর চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা ক'রে বাংলা-গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছেন। তাঁর রাজনীতিক প্রবন্ধাবলী একসময় সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল-জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর অপূর্ব দেশাত্মবোধ এবং মানব-মৈত্রীরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হ'লো—'স্বদেশ', 'সভ্যতার সংকট' 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'লোকসাহিত্য', 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', 'বাংলাভাষা পরিচয়' প্রভৃতি। তার 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'যাত্রী', 'জাপানযাত্রী', 'পথের সঞ্চয়', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনাবলীও বাংলা-গদ্যসাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছে। চিঠিপত্রও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিণত হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'চিঠিপত্র' (কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত)-ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলা জীবনী-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' একটি অমূল্য সংযোজন।

প্রবন্ধ-সাহিত্য : বিবিধ প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী ও চিঠিপত্র

[রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ৭ই মে (বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ) কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতে-গড়া 'শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসংখ্যা হবে তিনশ'র বেশি। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে 'গীতাঞ্জলি' (ইংরেজী-অনুবাদ)-গ্রন্থের জন্য তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-পুরস্কার 'নোবেল-প্রাইজ' দ্বারা সম্মানিত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগে দেশবাসীর উপর ইংরেজ-পুলিসের অবর্ণনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি 'নাইট' (স্যার) উপাধি ত্যাগ ক'রে যেভাবে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় দেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। 'বিশ্বভারতী'-বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'শ্রীনিকেতন সমাজ-সেবা-কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের দু'টি অক্ষয় কীর্তি। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দের ৭ই অগাস্ট (বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ সালের ২২-এ শ্রাবণ) তিনি পরলোকগমন করেন।]

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় প্রদান কর।

২। 'রবীন্দ্রনাথের দানে বাংলা-সাহিত্য সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ'—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৩। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান কী?

রচনা-বিতান

[দ্বিতীয় খণ্ড]

প্রবন্ধাবলী

ভূমিকা

প্রবন্ধ-রচনার মাধ্যমেই লেখক নিজের সুচিন্তিত চিন্তাধারা অন্যের নিকটে প্রকাশ করেন। এই রচনার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায় লেখকের চিন্তাধারার সারবত্তা, তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গির চাতুর্য ও ভাষার মাধুর্য। প্রবন্ধ-রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই, থাকা সম্ভবও নয়। এ-বিষয়ে লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রবন্ধ-রচনায় 'ভাষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, মনের ভাব প্রকাশ করিতে যে 'ভাষা'র সাহায্য লইতে হয় তাহা যদি হৃদয়গ্রাহী না হয় তাহা হইলে রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। ভাষার জটিলতায় যদি ভাবের গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে লেখক কখনও পাঠকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন না। সেক্ষেত্রে, পাঠক উক্ত রচনা বিরক্তির সহিত বর্জন করিয়া যাইবেন। কাজেই, প্রবন্ধের ভাষা হওয়া উচিত সহজ, অনাড়ম্বর ও যুক্তিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে প্রবন্ধকে অলঙ্কারমণ্ডিত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অনাবশ্যক অলঙ্কারে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে রচনা যাহাতে ভাবঘন ও রসমধুর হইয়া উঠে, সে-বিষয়ে যত্ন লওয়া উচিত। ভাষাকে উন্নত ও শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে খ্যাতিমান প্রবন্ধকার ও সাহিত্যিকদের রচনা বার-বার করিয়া পাঠ করিতে হয়। তবেই, শিক্ষার্থীদের নিকট ভাষার একটা আদর্শ স্থাপিত হইতে পারে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত হইবে, না চলিতভাষায় (কথ্যভাষায়) রচিত হইবে? কিন্তু, এরূপ প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কারণ, প্রবন্ধের ভাষা কী হইবে তাহা লেখকের নিজস্ব রুচি ও ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। অনেকের ধারণা, গুরুগম্ভীর বিষয় হইলে তাহা সাধুভাষায় রচনা করা উচিত এবং সাধারণ বর্ণনামূলক কোনো বিষয় হইলে তাহা চলিতভাষায় রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু, এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আসলে সাধুভাষা ও চলিত-ভাষার পার্থক্যটা যাঁহাদের নিকট তেমন স্পষ্ট নয় তাঁহারাই ঐরূপ ধারণার বশবর্তী। সাধুভাষা ও চলিতভাষার স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

> "রূপকথায় বলে এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী—সুয়োরানী আর দুয়োরানী! তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রানা, একটাকে আদর ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলিতভাষা। আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা

অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা। চলিতভাষায় আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলঙ্কারের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে—কবি বলেন, কিমিব হি মুধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা।……সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। "হচ্ছে" "করছে"-কে যদি জল-চল ক'রে নেওয়া যায় তাহ'লে জাত ঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। "উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই সর্পবংশের ধ্বংসের উৎপত্তি"-এর ক্রিয়া ক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু-ভাষার ভঙ্গি দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। "তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি" মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায়, "তাঁর কাজে কথায় মিল নেই।" "বাসুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন" এ-কথাটা মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার "বাসুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন" এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না।"

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) প্রমুখ সাহিত্যরথীরাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রবন্ধের যে-কোনো বিষয়বস্তুকেই চলিত বা কথ্যভাষায় রূপ দেওয়া যায়। আসলে ভাষার উপরে সম্পূর্ণ দখল থাকা চাই।

যুগের পরিবর্তনে ভাষারও কত না পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে ভাষা ছিল সংস্কৃতানুগ। যেমন, রামমোহন, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণের ভাষা। বিদ্যাসাগরীয় ভাষার নমুনা যেমন—

> "লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন, দেখুন, হর-শরাসন-ভঙ্গবার্তা-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ভগবান ভৃগুনন্দন আমাদিগের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, আবার এদিকে, দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য তাঁহার দর্প সংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শর-সন্ধান করিয়াছেন।" ("সীতার বনবাস")

এই ভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের যেমন আধিক্য, তেমনি ইহা সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সম্মত সন্ধি-সমাসের ভারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু, বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের এই ভাষাই ছিল সাহিত্যের আদর্শ।

প্রবন্ধকার হিসাবে একসময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনিও সংস্কৃত-ব্যাকরণ-অনুসারী সাধুভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে, তাঁহার ভাষা তাঁহার পূর্বসূরীগণের তুলনায় অনেকখানি সরলতালাভ করিয়াছিল। যেমন—

> "মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্বেরটি অগ্রবর্তী হয়। অতএব গমনরূপ

একটি কার্যের মধ্যে স্থিরভাব ও চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবন-বর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি-প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি-প্রভাবে বিশ্রাম।" ("সামাজিক প্রবন্ধ")

বাংলা-গদ্যে বিপ্লব ঘটাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিও সংস্কৃত-ব্যাকরণের অনুশাসন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার হাতে পড়িয়া বাংলা গদ্য যেন এক নূতন শ্রী লাভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনামূলক ভাষার মাধুর্যে পাঠকচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইল। যেমন—

"সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্বস্বই লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?" ("সীতারাম")

"রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপরে। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।" ("কপালকুণ্ডলা")

বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় গদ্যভাষা-ই উনবিংশ-শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাধুভাষার আদর্শ হিসাবে চলিয়াছে, এমন কি বিংশ-শতকের প্রথম দিকেও বঙ্কিমী-ভাষার প্রভাব অনেকের পক্ষে কাটাইয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা গদ্যের একটা বলিষ্ঠ রূপ দিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার গদ্য-রচনাতেও পড়িয়াছে একথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে না। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

"রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য স্রোতঃস্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।" ("আধুনিক সাহিত্য")

যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাহা তো বঙ্কিমী ভাষাই। কিন্তু, ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংস্কারপন্থী। এ-

বিষয়ে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। অধুনা, চলিতভাষা বা কথ্যভাষারূপে যে-ভাষা সাহিত্যে চলিতেছে, সে-ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-এর দানও অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী-(বীরবল)-ই কথ্যভাষাকে সাহিত্যে দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

"কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তার পরে চুন সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি কথা। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।"

(রবীন্দ্রনাথ—"বাংলাভাষা পরিচয়")

"আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া।"

(প্রমথ চৌধুরী—"বীরবলের খাতা।")

"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ-দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না ক'রে, পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মঙ্গল করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধমচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গালা-দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।"

(প্রমথ চৌধুরী—"বীরবলের খাতা")

বিদ্যাসাগরীয় ভাষার তুলনায় রবীন্দ্রনাথ-বীরবলের এই ভাষা যে বহুলাংশে সহজ, সরল অথচ কাব্যসুষমা-মণ্ডিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু, যে-যুগে বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রচনা করিয়াছেন সে-যুগে তাঁহার রচিত বাংলা-গদ্যই ছিল সহজ-সরল। আবার, যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-যুগে তাঁহার ভাষাই অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। আধুনিক কালে আমরা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকে যেন ঐতিহাসিক যুগের ভাবাপর্যায়ে ফেলিয়াছি। আমাদের কাছে এখন আদর্শ হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির ভাষা।

শরৎচন্দ্রের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত। অথচ, চলিতভাষার ক্রিয়াপদ-ব্যবহারেও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্য সংলাপের ক্ষেত্র ছাড়া। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন সাধুভাষা। যেমন—

"রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে

জন্মাল কেন ? এইবার ওর একটু গতি ক'রে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।" (শরৎচন্দ্র—"অভাগীর স্বর্গ")

প্রকৃতপক্ষে ভাব-প্রকাশের সারল্য, ভাষার উপরে দখল, সুপ্রযুক্ত শব্দাবলীর নির্ভুল ব্যবহার, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাষার আলঙ্কারিকতা ইত্যাদি নানাবিধ গুণের উপরেই প্রবন্ধ-রচনার সাফল্য নির্ভর করে। যাঁহারা প্রবন্ধ-রচনা সম্পর্কে এখনও অনুশীলন-কার্যে ব্যাপৃত তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলি সাধারণ বা প্রচলিত নিয়ম মানিয়া চলা প্রয়োজন। যেমন—(১) বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথমেই কয়েকটি সংকেত-সূত্র ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবং এক-একটি সংকেত-সূত্র ধরিয়া মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। এক-একটি অনুচ্ছেদে এক-একটি সংকেত-সূত্র বিস্তৃতি-লাভ করিলে দেখিতে হইবে তাহাতে রচনার ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি না। একটি অনুচ্ছেদের ভাব অন্য অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হওয়া কখনই উচিত নহে। কারণ ঐরূপ ভাব-প্রকাশে রচয়িতার চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলতাই প্রকট হইয়া উঠে। (২) সাধারণত, প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের একটা ভূমিকা এবং শেষ অনুচ্ছেদে তাহার একটা উপসংহার থাকে। আর, মধ্যেকার অনুচ্ছেদগুলিতে থাকে বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা। প্রবন্ধের আরম্ভ ও শেষ যাহাতে বিশিষ্টতালাভ করে সে-বিষয়েও লেখকের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, আরম্ভটি যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে প্রবন্ধ-পাঠে স্বভাবতই পাঠকের একটা আগ্রহ জন্মে এবং সমাপ্তিটি যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে পাঠকের মনে তৃপ্তির একটা আস্বাদ থাকিয়া যায়। অবশ্য, মধ্যেকার অনুচ্ছেদ-গুলিও যাহাতে রচনা-চাতুর্যে হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে, সেদিকেও লেখকের সতর্ক থাকা উচিত। (৩) রচনায় অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে নাই এবং ভাবের জটিলতা ও বক্তব্যের পুনরুক্তিও সর্বদা বর্জনীয়। কষ্ট-কল্পিত কোনো ভাবের অবতারণা রচনার গৌরব নষ্ট করে। লেখকের ভাবের প্রকাশ হইবে সহজ ও সরল পথে, পাঠকের চিত্তজয়ই হইবে তাহার প্রধান লক্ষ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, অন্তঃসারশূন্য চটকদার কথার জাল বুনিয়া পাঠককে আকর্ষণ করা গেলেও, তাহার চিত্তে রেখাপাত করা যায় না। (৪) রচনার মধ্যে বিষয়-বহির্ভূত অবান্তর কোনো কথার উল্লেখ করাও উচিত নয়। কিন্তু, বিষয়কে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কোনো বিষয়-বহির্ভূত প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়, তাহা হইলে উহা এমন কৌশলে করিতে হইবে যাহাতে একটা যুক্তি ও সঙ্গতি থাকে। (৫) রচনাকে শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধৃতির সাহায্য লওয়া যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ধৃতিগুলি যেন নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক হয়। অপ্রাসঙ্গিক ও ভুল উদ্ধৃতি যেমন রচনার কলঙ্কস্বরূপ, তেমনি একটি রচনায় অত্যধিক উদ্ধৃতি সংযোজনা রচনার সৌন্দর্য-হানিকর। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো প্রবন্ধকেই অনাবশ্যক দীর্ঘ করিতে নাই; প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপরেই নির্ভরশীল। প্রবন্ধ যাহাতে গাঢ়বন্ধ, নির্ভুল ও সুখপাঠ্য হয় সেদিকেই লেখকের লক্ষ্য থাকা উচিত। ক্ষেত্রবিশেষে রচনাকে

অলঙ্কারমণ্ডিত করিতে পারিলে লেখকের রচনা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, অলঙ্কার-প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত সেই চেষ্টায় বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। লেখকের ভাবের প্রকাশ যদি সহজ, স্বচ্ছন্দ ও যুক্তিপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই রচনা সার্থক হইবে; অলঙ্কার-প্রয়োগ হইল-কি না হইল তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইবে না। (৬) সাধুভাষা অথবা চলিতভাষা (কথ্যভাষা)—ইহার যে-কোনোটির সাহায্যেই প্রবন্ধ রচনা করা চলে; কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো ক্ষেত্রেই সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ করা চলিবে না। এইরূপ মিশ্রণ বা গুরুচণ্ডালী-দোষ অমার্জনীয় অপরাধ। ভাষাতে যাহাতে কোনোরূপ গ্রাম্যতা আসিয়া না পড়ে সেদিকেও লেখকের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ঋতু-বৈচিত্র্য

বিচিত্র এই বাংলা দেশ। ঋতু-চক্রের আবর্তনে প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্র্য, তা যেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় এ-দেশে, তেমন ক'রে ফুটে ওঠে না ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে। গ্রীষ্ম আসে তার রুদ্র মূর্তি নিয়ে, ছড়িয়ে যায় তার উষ্ণ নিশ্বাস; তাপদগ্ধ বাংলা তখন তৃষ্ণায় কাতর। তার সে-তৃষ্ণা দূর করে 'তৃষাহরা' শ্যামরূপা বর্ষা, দুঃসহ দহনক্লিষ্ট প্রাণে যেন নবজীবনের সঞ্চার করে; সবুজের সমারোহ তখন বাংলার পল্লী-প্রান্তরে। এ-রূপ আবার অপরূপ হয়ে ওঠে শরতের আবির্ভাবে। বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘমুক্ত নীলাকাশে তখন ছুটির আভাস, বঙ্গ-জননীর অঙ্গে তখন স্নিগ্ধ মধুর শিউলি-পদ্মের সৌরভ; উৎসবের বাঁশি তখন প্রাণে প্রাণে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। হেমন্তের আবির্ভাবে আবার বাংলার রূপ যায় বদ্‌লে। সে আসে কুয়াশার আবরণে তার মুখখানি ঢেকে ছড়িয়ে দেয় তার হিমেল-স্পর্শ; সেই স্পর্শেই সোনালী রূপ নিয়ে ঝলমল ক'রে ওঠে বাংলার পল্লী-প্রকৃতি। অনুজ্জ্বল হেমন্ত আনে শস্য-সৌন্দর্যের উচ্ছলতা। সেই উচ্ছলতা আবার ম্লান হয়ে আসে কঠিন শীতের পদক্ষেপে। 'জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে' আগমন তার, নির্মম কৃপণতায় সে সকল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কণ্ঠরোধ করতে চায়, চতুর্দিকে যেন এঁকে দিতে চায় একটা রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু, সে-ছবি আবার রূপান্তরিত হয় ঋতুরাজ বসন্তের জাদুস্পর্শে। 'স্থলে জলে বনতলে' তখন নতুন ক'রে দোল্ লাগে, পাতাঝরা গাছের ডালে ডালে দেখা দেয় কিশলয়ের প্রাচুর্য, বিচিত্রসুন্দর ফুলের মাধুর্যে তখন প্রকৃতির এক অপূর্ব শোভা।

ভূমিকা—ষড়ঋতুর পরিচয়

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য বাংলার পল্লী-প্রকৃতিতে যেমন ক'রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমন ক'রে ধরা পড়ে না তার নগর-প্রকৃতিতে। তাই, যে ঋতু-বৈচিত্র্যের কথা

আমরা বলতে চাই, সে-বৈচিত্র্য প্রধানত বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকেই কেন্দ্র ক'রেই। প্রথমেই বলতে হয় গ্রীষ্ম-ঋতুর কথা; কারণ, গ্রীষ্ম-ঋতু দিয়েই বাংলা-বর্ষের আরম্ভ। ঋতু-বিভাগে যদিও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসকে এদেশে গ্রীষ্ম-কাল ব'লে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাপ্তি চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, বাংলাদেশে গ্রীষ্মের সূচনা বসন্তের শেষে, আর তার সমাপ্তি শরতের মধ্যভাগে। গ্রীষ্মের যে-মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা যেমন শুষ্ক, তেমনি কঠোর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'দীপ্তচক্ষু' 'শীর্ণ সন্ন্যাসী'; যে-সন্ন্যাসীর 'ধূলায় ধূসর উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল', যার 'তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু।' গ্রীষ্মের আবির্ভাবে বাংলার পল্লী-প্রকৃতিতে নামে কঠোর একটা রুক্ষতা। সূর্যের তাপ হয় অসহনীয়, নদীর জল যায় শুকিয়ে, খাল-বিল হয় জলশূন্য, তৃণশূন্য মাঠ তখন যেন তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হ'তে থাকে। গ্রীষ্মের সেই তাপদগ্ধ দিনগুলি সমস্ত প্রাণিলোকেই যেন একটা বিরক্তির ভাব এনে দেয়। মানুষেরা ঘর্মাক্ত দেহে দৈনন্দিন কাজ ক'রে যায় বটে, কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করে গ্রীষ্মের ত্বরিত অবসান। কি পল্লী, কি নগর, সর্বত্রই—'প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে, বায়ু করে হাহাকার।' গ্রীষ্মের জ্বালাময় দ্বিপ্রহরের মুহূর্তগুলি যেন মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করে; ঘরের বাইরে যেতে সাহসের অভাব ঘটে; পথচারীরা খুঁজে বেড়ায় বনস্পতির ছায়া। পাখিরাও তখন আত্মগোপন ক'রে থাকতে চায় গাছের ডালে ডালে, পত্রগুচ্ছের অন্তরালে। গৃহপালিত পশুরাও তখন শ্রান্ত দেহে নিরালা কোণে আশ্রয় নেয়, তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা বিবর্ণ বিষণ্ণ ভাব। কিন্তু, গ্রীষ্মের সন্ধ্যা যখন মৃদুমন্দ হাওয়া এনে প্রাণিলোকের ক্লান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়, সকলেই তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, বিষণ্ণতার মধ্যে জাগে একটা স্নিগ্ধ শান্তি। তাপদগ্ধ দিনের শেষে এমন সন্ধ্যা সকলের কাছেই পরম কাম্য; যেমন কাম্য কালবৈশাখী। ভয়াবহ মত্ত হাওয়ার রূপ নিয়ে তার আবির্ভাব ঘটলেও, গ্রীষ্মতাপজর্জর পৃথিবীর বুকে সেই তো আনে বৃষ্টির ধারা, সেই তো উড়িয়ে নিয়ে যায় বায়ুমণ্ডলের সকল আবর্জনা, ভীষণতার মধ্যেও তখন যেন তার একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আর একটি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে গ্রীষ্মের করস্পর্শে, তা হ'লো সরস ফলের অপূর্ব সম্ভার। গাছের ডালে ডালে বসন্ত যে ফুল ফোটায়, গ্রীষ্মেই তার পূর্ণতা—ফুল থেকে হয় ফলের আবির্ভাব। বাংলাদেশের ফলের বাগানে বাগানে তখন দেখা দেয় আম-জাম-লিচু-কাঁঠালের প্রাচুর্য।

গ্রীষ্ম-ঋতু ও পল্লী-প্রকৃতি

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা! বাংলাদেশে বর্ষার যে রূপটি ফুটে ওঠে তার যেন কোনো তুলনা নেই। বর্ষাঋতুতে বাংলার পল্লী-প্রকৃতি যেন একটা বিচিত্র-সুন্দর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। কবির ভাষায়—

"দহনশয়নে তপ্তধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হ'লো ক্ষীণ, দিকে দিকে হ'লো দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয় পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—" (রবীন্দ্রনাথ)

সাধারণভাবে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল ব'লে চিহ্নিত করা হ'লেও, বাংলাদেশে বর্ষাকালের ব্যাপ্তি জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলার আকাশের রূপ যেমন বদলে যায়, প্রকৃতির পরিবেশেও তেমনি একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। সারা আকাশে জলভরা কালোমেঘের ছুটোছুটি, কখনও বা সেই মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি হয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, পরক্ষণেই আবার তার মত্ত হুঙ্কার। তারপর যখন প্রবল ধারায় বর্ষার বারিধারা নেমে আসে মাটির বুকে, গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ প্রকৃতিতে তখন যেন একটা উন্মাদনা জাগে। ধূলিধূসর রুক্ষ মাটি যেন স্নান ক'রে দেহের গ্লানি দূর করে; জলস্পর্শে মাটি ভেদ ক'রে উঁকি দেয় নব তৃণাঙ্কুর; নবদূর্বাদলের শ্যামল শোভায়, পল্লী-প্রকৃতি যেন নতুন ক'রে সাজে। কেতকী, কদম, কামিনী, বেলা, মল্লিকা, জুঁই, গন্ধরাজ, টগর, রজনীগন্ধার সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ তো এই বর্ষাকালেই। শ্বেত ও সুগন্ধি এই সব ফুলের অলঙ্কারেই বঙ্গজননী যেন অপরূপা হ'য়ে ওঠেন। কবি ও ভাবুক চিত্তে বর্ষার এই প্রভাব যে কত গভীর আমরা তার পরিচয় পাই বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের মতই তখন যেন ভাবুক বাঙালীচিত্ত আনন্দে বলতে চায়— 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।' বর্ষার আবির্ভাবে বাংলার কৃষকদের মুখে হাসি ফোটে, মাঠে মাঠে তখন তারা ধান্য-রোপণের কাজে ব্যস্ত হয়; নদীনালায় তখন শুরু হয় জল-কল্লোল, নদী-পথে যাতায়াত হয় সুবিধা, কত না বিচিত্র পাল তুলে যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌকা চলে। বাংলাদেশে ফলফুল ও মাছের প্রাচুর্যও বাড়ে এই সময়। শস্যসম্পদে বাংলাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যেই যেন বর্ষার আবির্ভাব, আর সেই কারণে কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলে তার এত সমাদর। কিন্তু, যে-বছর তাণ্ডব-নৃত্যে ভয়াবহ প্লাবন আসে, সে বছর ভয়ার্ত হয়ে ওঠে বাংলার নরনারী। অতি বর্ষণে ও প্লাবনে শুধু যে শস্যহানিই হয় তা নয়, কত বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়, কত মানুষ ও পশু প্রাণ হারায়। অতি বর্ষায় কি গ্রাম, কি শহর সর্বত্রই মানুষের লাঞ্ছনা ও অসুবিধার সীমা থাকে না, জলে-কাদায় পথঘাট ক্লেদাক্ত ও দুর্গম হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় নানারকম অসুখ-বিসুখ। বাংলাদেশে সুষম বর্ষা তাই যেমন সকলের অভিনন্দন লাভ করে, তেমনি আবার বিষম বর্ষা অভিশাপ কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বর্ষাকালের এই আনন্দ-বিরহের মধ্য দিয়েই বাঙালী তার কত-না উৎসব উদ্‌যাপন করে। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনোৎসব থেকে শুরু ক'রে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান, কালিদাস-মেঘদূতের স্মরণোৎব, বন-মহোৎসব, মনসার ভাসান; সেই সঙ্গে আরও কত পাল-পার্বণ।

বর্ষার বর্ণনা ও প্রকৃতিরাজ্যে তার প্রভাব

বাংলাদেশে বর্ষাকালের ব্যাপ্তি জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত হ'লেও শ্রাবণের শেষ থেকেই হয় তার গভীরতার অবসান। ঋতুচক্রের আবর্তনের নিয়মানুসারে ভাদ্রের গোড়া থেকেই শারদলক্ষ্মীর উজ্জ্বল মুখখানি উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে হাল্‌কা মেঘের মধ্য দিয়ে; শাদা কাশফুল আর শিউলি-ঝরানো পথে পথে যেন

শোনা যায় তার নিঃশব্দ সঞ্চরণ। ধীরে ধীরে এক সময় বর্ষাকে আড়াল ক'রে চোখের সামনে ভেসে ওঠে শারদ-শ্রী। উৎসব আর অবকাশের ছাড়পত্র নিয়েই যেন শরতের আবির্ভাব এ-দেশে। শিশির ভেজা ঘাসের স্পর্শে মিষ্টি-মধুর রৌদ্রে, জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রির সুষমায় শরতের যে প্রশান্ত একটি রূপ ফুটে ওঠে, বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির মধ্যেই যেন তার পূর্ণ বিকাশ। শরৎ-ঋতুর আগমনে চতুর্দিকে যেন একটা প্রসন্নতার আমেজ লাগে। বিভিন্ন শারদোৎসবের কথা স্মরণ ক'রে ছোট থেকে বড় সকলের মনই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে; অবকাশের দিনগুলিকে আনন্দময় ক'রে তোলবার কল্পনায় বিভোর হয় বাঙালী মন। বহুবিধ সমস্যার মধ্যেও বাঙালী এইসময় প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করে, সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যেও আনতে চায় মানসিক প্রসন্নতা। এইখানেই বোধ করি বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে, যে-রূপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তার সহজাত সৌন্দর্য-প্রীতি, উৎসব আনন্দের প্রতি আকর্ষণ। শরৎকালেই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়। শুধু দুর্গাপূজা কেন, বিশ্বকর্মা পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একের—পর এক পূজা-উৎসব। শরৎ-ঋতু তাই যেন বাঙালীর কাছে সব ঋতুর সেরা বলেই অভিনন্দিত হয়। প্রকৃতির বহিরঙ্গের রূপ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় যেন বাঙালীর অন্তর্লোকে বিরাট একটা পরিবর্তন আসে।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঋতু শরৎ ও বাঙালীর মানসপ্রকৃতি

শরতের পরেই আসে হেমন্ত। সে হেমন্ত যেন শরতেরই পরিণত ভাবগম্ভীর রূপ। শরতের উচ্ছ্বাস ও উচ্ছলতা হেমন্তে আর দেখা যায় না, তার পরিবর্তে তার চেহারায় নেমে আসে একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য। হেমন্ত-লক্ষ্মীর সেই রূপসজ্জার দিকে তাকিয়ে যেন মনে হয় মাতৃত্ব-গৌরবে সে ধন্যা। চতুর্দিকে শস্যের প্রাচুর্য, পাকা ধানের সোনালী আভায় হেমন্তলক্ষ্মীর মুখখানি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখখানি তার কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঈষৎ ঢাকা পড়লেও সে ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হয় বাংলার পল্লী-পরিবেশে। হেমন্তে বিচিত্র ফুলসম্ভার নেই, কিন্তু সোনালী ধানের প্রাচুর্য আছে; হেমন্তে শীতের আভাস আছে বটে, কিন্তু শীতের জড়তা নেই। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তখন নবান্নের উৎসব, কৃষকের মুখে তখন আনন্দের রেখা। বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশে তাই হেমন্ত-ঋতুরও একটা বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

হেমন্তের ভাবময় রূপ ও শস্যের প্রাচুর্য

কার্তিক-অগ্রহায়ণের সেই হৈমন্তী রূপের পর বঙ্গজননীর সর্বশরীরে নেমে আসে একটা উদাস বিষণ্ণতা। হিমের তীব্রতা বাড়তে থাকে ক্রমশ, চতুর্দিকে দেখা দেয় রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। ঋতুচক্রের আবর্তনে আসে জড়তা, প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে যেন নেমে আসে বার্ধক্য। শুষ্ক-কঠিন একটা রূপ নিয়ে হয় শীতের আবির্ভাব। নিসর্গ-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সে যেন কোন তপস্বীর মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে ধ্যানমগ্ন। গাছের পাতাগুলি ঝ'রে পড়ে একে একে, বিশুষ্ক শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে বনস্পতিরা যেন হাহাকার

শীতার্ত বাংলার পল্লী-পরিবেশ

করে উর্ধ্ব-আকাশে মুখ তুলে; শস্যশূন্য মাঠে মাঠে তখন বিরাট একটা শূন্যতা। শীতের জড়তা দূর করতে সবাই তখন রোদে এসে বসে, সন্ধ্যার অন্ধকারে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে তখন দেখা যায় পল্লীবাসীদের সমাবেশ। উত্তরের হাওয়া এসে তখন কাঁপন ধরিয়ে দেয় প্রাণিজগতে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস ধ'রে শীত-ঋতুর যে তপস্যা তার সিদ্ধি যেন ফাল্গুন-চৈত্রে—ঋতুরাজ বসন্তের প্রাণ-চাঞ্চল্যে। শীতের বহিরঙ্গে রিক্ততার রূপ ফুটলেও, অন্তরঙ্গে সে রিক্ত, নিরাভরণ নয়। এই ঋতুতেই বাংলাদেশে দেখা যায় তরিতরকারি ও মৎস্যের প্রতুলতা। নতুন গুড়ের সুমিষ্ট গন্ধে তখন পল্লী-পরিবেশ আমোদিত হয়ে ওঠে, পৌষ-পার্বণ-উৎসবের আয়োজন দেখা যায়। বাংলাদেশে কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো শীতের তীব্রতা নেই; যেটুকু আছে তার ব্যাপ্তিও কম সময়ের জন্য।

ধীরে ধীরে শীত চ'লে যায় যেন চির-যৌবন বসন্তের নবজন্ম দিয়ে। দক্ষিণা বাতাসে ভর ক'রে ফাল্গুনী-বসন্ত আসে তার জয়-পতাকা উড়িয়ে, প্রাণচেতনায় সজীব হয়ে উঠে নির্জীব নিসর্গপ্রকৃতি। গাছের ডালে ডালে দেখা দেয় কিশলয়ের সমারোহ, আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে মৌমাছিরা ছুটে আসে, কোকিলের কুহুতানে মুখর হয়ে উঠে চতুর্দিক। প্রকৃতি আবার বিচিত্র ফুলসম্ভারে সজ্জিত হয়, অশোক-পলাশ-রঙ্গনের রক্তিমাভায় বাংলার পল্লী-প্রান্তর অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। কবির ভাষায় তখন যেন বলতে ইচ্ছে করে—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।' শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতীপূজা আর দোলযাত্রার মধ্য দিয়ে বসন্তোৎসবে মেতে ওঠে বাংলাদেশের নরনারী। কিন্তু, নববসন্তের যে আনন্দময় স্পর্শে চতুর্দিকে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, শেষবসন্তে বা চৈত্রের দিনগুলিতে সে চঞ্চলতা আর থাকে না। চৈত্রের ধূলিঝঞ্ঝা আর উষ্ণ বাতাসের মধ্য দিয়ে বসন্তের ক্ষ্যাপামিতে ভয়ার্ত হয়ে ওঠে সকলেই। মহামারী বসন্ত যখন তার রুদ্র রূপ নিয়ে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে তখন ঋতুরাজের প্রতি কেউ-ই আর প্রসন্ন থাকতে পারে না। তারপর 'চৈত্রদিনের ঝরাপাতার' পথ ধ'রে সে যখন আবার গ্রীষ্মঋতুকে নিয়ে আসে তখন স্বভাবতই প্রাণিজগৎ শঙ্কাকুল হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বসন্তের দ্বৈত-প্রকাশ

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু এতই স্পষ্ট যে, কোনো ঋতুকে চিনে নিতে কারও কষ্ট হয় না। এদেশের ঋতু-বৈচিত্র্য তাই এদেশের অধিবাসীদের মনে মনে সুগভীর একটা ছাপ রেখে যায়। ঋতুর এই প্রভাব তাই পড়ে দেশবাসীর মানস-প্রকৃতিতে, তার সাংসারিক জীবনে, অধ্যাত্ম-সাধনায়, কাব্যে, সাহিত্যে, উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সংস্কৃতিতে। বাঙালী-জীবনের বহুবিচিত্রতাকে যেন ষড়ঋতুর এই লীলা-বৈচিত্র্যই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব

বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে উৎসব আগেও ছিল, এখনও আছে। আর, ভবিষ্যতেও যে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ, উৎসবাদির মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের একাকীত্ব দূর ক'রে অপর মানুষের সংস্পর্শে আসে, পরস্পর একাত্ম হবার সুযোগ পায়। আর সেই সুযোগেই গ'ড়ে ওঠে মানুষের সমাজ-জীবন। এই সমাজ-জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও আনন্দ-ময় ক'রে তুলতে যেমন পৃথিবীর যে-কোনো দেশের অধিবাসীরা সচেষ্ট, বাংলাদেশের অধিবাসীরাও তেমনি। বাঙালীর সমাজ-জীবনে তাই উৎসবাদির বিশেষ একটা মূল্য আছে। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশে 'বারো মাসে তের পার্বণ' ব'লে একটা কথা আছে। সেই কথাতেই বোঝা যায় বাঙালী উৎসব-প্রবণ জাতি। একসময় বাংলাদেশের সমাজ-জীবন ছিল দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সে-সময় বাঙালীর সমস্যাও যেমন ব্যাপক ছিল না, তেমনি বর্তমানকালের মতো এমন অর্থসংকটের সম্মুখীনও সে হয়নি। বংশ-কৌলীন্য বা জাতিভেদপ্রথা হয়তো অতীতের সমাজ-জীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিন্তু আধুনিক কালের মতো সম্পদ্-কৌলীন্য সে-সময় জাতির জীবনে ফাটল সৃষ্টি করতে পারেনি। বিত্তবান্ জমিদারবাড়িতে সেকালে যে-সব উৎসব হ'ত তাতে দরিদ্র-জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকত। সমাজের কাউকে বাদ দিয়ে বিত্তবানেরা সে-সময় কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান করতেন না। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাঙালী এতকাল ধ'রে পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের সান্নিধ্যে এসেছে, পরস্পরের প্রীতি-ভালোবাসা ও আশীর্বাদের স্পর্শ পেয়েছে। প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আন্তরিকতা ছিল, আধুনিক বাংলার সমাজ-জীবনের বহুবিচিত্র উৎসবে কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্তি ও আন্তরিকতার অভাব দেখতে পাই। যুগের পরিবর্তনে, শিক্ষা ও রুচির পরিবর্তনে, এদেশের সমাজ-জীবন আর পূর্বের মতো দৃঢ়-সঙ্ঘবদ্ধ নয়। সংস্কার-বশে বাঙালীরা আজও হয়তো সামাজিক উৎসবগুলিকে পরিহার করতে পারেনি, কিন্তু সেই উৎসবগুলিতে আর আগেকার মতো যেন মানুষের অন্তরের অন্তস্তলের সাড়া নেই। আগেকার উৎসবাদিতে মানুষের যে পারস্পরিক হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যেত, এখনকার উৎসব-অনুষ্ঠানে যেন তার বিশেষ অভাব। আধুনিককালে সার্বজনীন উৎসব-এর নামে যে-সব আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে তাতে আন্তরিকতার চেয়ে আড়ম্বরটাই বেশী, প্রতিযোগিতার ভাবটাই যেন প্রকট। এ-যুগের বেশির ভাগ সামাজিক উৎসবই যেন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের সম্পদ্-কৌলীন্যের বহিঃপ্রকাশ।

সেকাল ও একালের উৎসবে পরিবর্তন

বাংলাদেশের সামাজিক উৎসবগুলি প্রধানত ঋতু, ধর্ম ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়। ঋতুচক্রের আবর্তনে বাংলার বহিঃপ্রকৃতিতে যে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পড়ে বাঙালীর অন্তর-প্রকৃতিতে। বিচিত্র সেই ভাবের প্রভাবেই বাঙালী ঋতু-উৎসবে মেতে ওঠে। বর্ষারম্ভের প্রথম দিন থেকে শুরু ক'রে বর্ষশেষের শেষদিনটি পর্যন্ত ঋতুর বন্দনাগানে তাই মুখর হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস—বাংলার পল্লীপ্রান্তর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গ্রীষ্মকে আহ্বান জানিয়ে বাঙালী গেয়ে উঠে—

তিনশ্রেণীর সামাজিক উৎসব—ঋতু-উৎসব

"এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ!
তাপনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥"

পহেলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন। এই দিনটিতে আমরা আজকাল বিদেশীদের অনুকরণে প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন ক'রে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাষণ বিনিময় করি। কিন্তু, চিরাচরিত প্রথায় পরিচালিত বাঙালীর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি যে 'হালখাতা'-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাই যেন বাংলাদেশের বর্ষারম্ভের প্রথম সামাজিক উৎসব। পল্লীগ্রামে এই দিনটিতে এখনও বাস্তুদেবতা ও গো-পূজার প্রচলন আছে। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষা-বন্দনায় কবিকণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়—

"এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে॥"

'বর্ষামঙ্গল'-উৎসবে বাংলার আধুনিক সমাজ-জীবন এখন মুখর। আর, চিরাচরিত প্রথায় বাংলার কোনো কোনো পল্লী-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় 'মনসাপূজা' বা 'মনসার ভাসান।' পল্লীর সমাজ-জীবনে এই জাতীয় উৎসবের একটা সার্থকতা আছে বৈকি! কারণ, বর্ষাকালেই বাংলার পল্লী-অঞ্চল হয় সর্পসঙ্কুল; আর সর্পদেবতা মনসার পূজা ক'রেই বাংলার পল্লীবাসী চায় নিঃশঙ্কচিত্তে বর্ষাঋতু অতিক্রম করতে। ঋতুচক্রের তৃতীয় আবর্তনে যখন শরতের আবির্ভাব হয়, বাংলাদেশে তখন উৎসবের অন্ত নাই। শারদলক্ষ্মীর বন্দনা-গানে তখন যেন আমরা বলতে চাই—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন-ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজায়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল-পথে
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরি-পর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল শীতল-শিশির ঢালা॥"

শারদোৎসবের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। কিন্তু, সে উৎসবকে ঋতু-উৎসবের পর্যায়ে না ফেলে ধর্মীয় উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। ঋতু-উৎসব হিসাবে বরং 'ভাদু উৎসব' বা 'ভাদুলি ব্রত'-কে গণ্য করা যেতে পারে বাঙালীর সামাজিক উৎসবের অঙ্গরূপে। ঋতু-উৎসব হিসাবে যে-উৎসবটি বাংলার পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেটি হ'লো 'নবান্ন'। সেই 'নবান্ন'-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় হেমন্ত-ঋতুতে, সোনালী পরিপক্ক ধানে যখন কৃষক ও গৃহস্থের গোলা ভ'রে ওঠে। হেমন্ত-লক্ষ্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে তখন যেন গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করে—

"ধরার আঁচল ভ'রে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা।"

তারপর পৌষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হয় শীতের আবির্ভাব। শীত-ঋতুর পৃথিবী-পরিক্রমা চলে মাঘ মাস ধ'রে। পল্লীর সমাজ-জীবনে তখন দেখা দেয় 'পৌষ-পার্বণ'-এর উৎসব, 'মাঘমণ্ডল'-এর অনুষ্ঠান। বাংলার সাংস্কৃতিক-জীবনে শান্তিনিকেতনের 'পৌষ-উৎসব'-ও আজ একটি বিশেষ ঋতু-উৎসব হিসাবে সমাদর লাভ করেছে। শীত-ঋতুর বন্দনা-গানে শান্তিনিকেতনের মেঠোপথ তখন এই ব'লে মুখর হয়—

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চ'লে, আয় আয় আয়,
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়॥"

তারপর আসে বসন্ত। বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে তখন চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'বসন্তোৎসব'-এ মেতে ওঠে বাংলার নরনারী। সে-উৎসবের পূর্ণ-বিকাশ যেন হয় 'দোল' বা 'হোলি'র লাল রঙে। উৎসবমত্ত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়—

"ওরে গৃহবাসী, খোল্, দ্বার খোল্ লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥"

এই বসন্তের শেষদিনটিতেই বর্ষশেষ। আর, সেদিনটিও বাঙালীর এক উৎসবের দিন। যদিও 'চৈত্র-সংক্রান্তি'-র সেই 'গাজন'-উৎসব কোনো ঋতু-উৎসব নয়, কিন্তু ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে তারও যেন একটা যোগ আছে।

ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান—হিন্দুধর্মের উৎসব

ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই বাংলাদেশের বেশির ভাগ সামাজিক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সব ধর্মীয়-উৎসবের আয়োজন। এই জাতীয় উৎসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান উৎসব—দুর্গাপূজা, যে পূজার নামে সারা পৃথিবীর বাঙালী-চিত্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে এই মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গার পূজা প্রচলিত হয় প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বাংলাদেশে এই দুর্গোৎসবের প্রবর্তক।

প্রকৃতপক্ষে এতবড় সামাজিক-উৎসব বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নাই। এই পূজা-উৎসবকে কেন্দ্র ক'রেই বাঙালী-সমাজ বছরে অন্তত একবার পরস্পরের নিকটতম সান্নিধ্যে আসবার চেষ্টা করে। তিনদিন ধ'রে চলে মহামায়ার পূজা, চতুর্থ দিনে হয় তাঁর বিসর্জন। বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদের সুর বেজে উঠলেও সেই বিজয়াদশমীতে হিন্দু-বাঙালী আত্মপর ভেদাভেদ ভুলে সকলের সঙ্গে নতুন ক'রে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে আলিঙ্গন, প্রণাম ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে শ্রীদুর্গার যে-মূর্তি পরিকল্পিত হয় তার মধ্যেও যেন ফুটে ওঠে বাঙালী-সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি। মা দুর্গা যেন বাংলাদেশেরই এক বিবাহিতা কন্যা। বছরে মাত্র একবার তিনি যেন শ্বশুরালয় থেকে পিতৃগৃহে আসবার সুযোগ পান। তাও মাত্র তিনদিনের জন্য। সঙ্গে ক'রে তাই নিয়ে আসেন পুত্র-কন্যাদের। স্বল্প-অবকাশ-যাপনের মেয়াদ শেষ হ'লেই আবার বিদায় নেন—বাপ-মা, ভাই-বোন সকলকে কাঁদিয়ে। বাঙ্গালীর এই ভাবকল্পনার মধ্যে যেন স্নেহকাতর বাঙালীর স্বাভাবিক রূপটি ফুটে ওঠে। দুর্গা-কে একদিকে সে মহামায়া আদ্যাশক্তিরূপে পূজা করে, অন্যদিকে বিসর্জনের দিন তার মনে হয় সে যেন নিজের আদরিণী কন্যা ও নাতি-নাত্নীদের বিদায় দিয়ে এল। বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন ও ভাবজীবনের সুন্দর একটি সমন্বয় যেন সাধিত হয় এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র ক'রে। দুর্গাপূজার পর আসে ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মীর পূজা-উৎসব। বাংলাদেশের শহরে গ্রামে প্রায় প্রতিটি হিন্দুগৃহই সেদিন লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক আলিম্পনা, সেই আলিম্পনার মধ্যে লক্ষ্মীর পাদস্পর্শসূচক পায়ের ছাপ, সম্পদের প্রতীক ধানের ছড়া। কেউ লক্ষ্মীর পটে, কেউ-বা লক্ষ্মীমূর্তি-চিত্রিত মাটির সরায়, কেউ-বা কলাগাছের খোলে পরিপূর্ণ ধানে, কেউ-বা আবার লক্ষ্মী-প্রতিমায় ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ কল্পনা ক'রে নিয়ে পূজা করেন। এই পূজা প্রধানত বঙ্গ-পুরনারীদেরই পূজা। সেদিন তাঁরা মনে মনে মহালক্ষ্মীর কাছে সংসারের কল্যাণ, স্বামীপুত্র-পরিজন সকলের কল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ কামনা করেন। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে তাই লক্ষ্মীপূজার বিশেষ একটা আবেদন আছে। কোজাগরী শারদ-পূর্ণিমায় হয় লক্ষ্মীপূজা, তার একপক্ষ পরে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে আবার হয় কালীপূজা বা শ্যামাপূজা। বাঙালী আবার আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে, মহাশক্তির আরাধনায় সম্মিলিত হয় গ্রাম ও শহরের হিন্দু নরনারী। যে মহাশক্তি এই জড় বিশ্বের অন্তরালে বর্তমান, তারই আধ্যাত্মিক প্রতীকরূপে মহাকালীর আরাধনা করে বাঙালী। শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পূজা সীমাবদ্ধ হ'লেও, এই পূজায় যোগদান করে হিন্দুধর্মের সকল-সম্প্রদায়ের লোক। মাতৃস্বরূপিনী মহাকালীর আশীর্বাদ যেন সকলের কাছেই কাম্য। এই পূজাকে কেন্দ্র ক'রেই দীপান্বিতা বা দীপাবলী-উৎসব। ঘরে ঘরে সেদিন আলোকমালার অপূর্ব সজ্জা, আতসবাজি পোড়ানোর ধুম। দীপাবলীর আলোকে মানুষ যেন চায় অন্তর-বাহিরের সকল কালিমা অপসারিত করতে, বাজি-পোড়ানোর মধ্য দিয়ে কামনা

করে আসুরিক-প্রবৃত্তিকে পরাভূত করতে। হিন্দু-বাঙালীর আর একটি স্মরণীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা সামাজিক উৎসব হ'লো জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা। মাঘ বা ফাল্গুন মাসের শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে, শিক্ষানিকেতনে, ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হয় বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন। তারপর আসে বসন্ত-ঋতুর শ্রেষ্ঠ উৎসব দোলযাত্রা বা হোলি। বসন্ত-ঋতুর সঙ্গে তার যেন একটা ভাব-গত সামঞ্জস্যও আছে। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার মর্মকথা যেন—মনে মনে প্রীতি ও প্রেমের পরশ দাও বুলিয়ে, সবাইকে একই রঙে দাও রাঙিয়ে, আপনার ক'রে নাও সকলকে। আবিরে-কুঙ্কুমে মানুষের ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণসত্তাকে উজ্জীবিত করাই যেন এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। আরও কত উৎসব, ছোট-বড় কত-না পাল-পার্বণ তিথিতে তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বাঙালী হিন্দু-সমাজে। যেমন—রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাস-পূর্ণিমার উৎসব, বিশ্বকর্মা পূজা, কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, বাসন্তী পূজা। তবে বাঙালী-সমাজে এইসব উৎসবের আবেদন পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান পূজা-উৎসবের মতো সার্বজনীন নয়।

অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব

হিন্দুদের পূজা-উৎসবগুলি বাদ দিলে অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে-সব উৎসব-অনুষ্ঠান বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে সাড়া আনে সেগুলির মধ্যে আছে মুসলমানদের 'ঈদ্-উল্-ফিতর্' বা 'ঈদ', 'মহরম', 'শবে-বরাত'; বৌদ্ধদের 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা'-উৎসব; জৈনদের 'পরেশনাথ'-আরাধনা; খ্রীষ্টানদের 'বড়দিন'।

ঐতিহ্যমূলক সামাজিক উৎসব

সামাজিক উৎসব হিসাবে আর এক শ্রেণীর উৎসব-অনুষ্ঠান পলিত হয় এদেশে। সেগুলির উদ্ভব হয়েছে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তথা ঐতিহ্যকে কেন্দ্র ক'রে। যেমন, বাঙালী হিন্দুর 'বিবাহ'-অনুষ্ঠান। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, আর সেই কারণেই হয় বিশেষ উৎসবের আয়োজন। এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সমাবেশ ঘটে বাঙালীর ঘরে ঘরে। আত্মীয়তার সম্প্রসারণও ঘটে এই 'বিবাহ'-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তারপর আছে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বা 'ভাইফোঁটা'-র উৎসব। জন্ম ও মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে বাঙালী তার ঐতিহ্যের বশে আরও দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তা হ'লো 'অন্নপ্রাশন' আর 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান'। এতেও বাঙালীর ঘরে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের নিমন্ত্রণ হয়। পারস্পরিক আনন্দ ও সমবেদনা প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাঙালী তার সমাজ-জীবনে বেঁচে থাকে। ব্যক্তিগত আনন্দ ও দুঃখকে বাঙালী যেন সমবেতভাবে উপলব্ধি ক'রে তৃপ্ত হ'তে চায়।

উপসংহার

বাংলাদেশের এই বহুবিচিত্র সামাজিক উৎসবের ধারায় মাঝে মাঝে আজ যে-পরিবর্তন বা রূপান্তর লক্ষ্য করি, তার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বা সভ্যতার প্রভাব। বাঙালীর সমাজচেতনা আজ যেন লুপ্ত হ'তে চলেছে; নানাকারণে বাঙালী যেন আজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তার ফলে, বাঙালীর উৎসবগুলিতে আজ আর প্রাণের সাড়া নেই,

পূজানুষ্ঠানগুলিতে নেই অধ্যাত্মভাবের প্রকাশ—আছে শুধু জাঁকজমক আর বিত্ত-গরিমার বহিঃপ্রকাশ। অথচ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার বীজ। আজ আমরা যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি, তার অঙ্কুর তো এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই উঁকি দিচ্ছে। আমাদের উচিত সেই সত্যকে উপলব্ধি করা ; আর, সেই সঙ্গে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বিসর্জন দিয়ে সকল উৎসবে সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলা।

পশ্চিমবঙ্গের কুটীরশিল্প

বাংলাদেশ শিল্পকলার দেশ। চারুশিল্পই হোক্ আর কারুশিল্পই হোক, এদিক থেকে সারা ভারতবর্ষে বাংলাদেশের একটা স্বাতন্ত্র্য বা কৌলীন্য আছে। দেশ ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হ'লেও, এ-রাজ্যের সেই কৌলীন্য এখনও বজায় আছে।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে-কুটীরশিল্প বংশপরম্পরায় বিকাশলাভ করেছে, তার খ্যাতি আজও অম্লান, সেইটুকুই যেন তার গৌরব। পল্লী-বাংলার আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় ক'রে তুলতে কুটীর-শিল্পের সহযোগিতা যে কতখানি কার্যকরী হ'তে পারে দেশের লোক আজ তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছে।

পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ লোকই বাস করে গ্রামে। তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি ও কুটীরশিল্প। কোনো ক্ষেত্রে আবার দুটোই। কুটীরশিল্প যাদের পেশা, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের না-আছে তেমন কোনো কারখানা, না-আছে

পশ্চিমবঙ্গে কুটীরশিল্পের ঐতিহ্য

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কোনো সাজ-সরঞ্জাম। কারখানা বলতে তাদের সেই কুঁড়েঘর, নয়তো টিনের কোনো ছাউনি ; আর সাজসরঞ্জাম বলতে নিজেদেরই হাতেগড়া দেশী যন্ত্রপাতি। লোকবল বলতে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কিংবা পরিবারের অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন। কারিগরী বিদ্যায় সকলেই কিন্তু গুণী। কাজ করতে করতে তারা যে শুধু বংশের ধারা বজায় রেখে চলে তা নয় ; দক্ষ থেকে সুদক্ষ হয়ে ওঠে। যুগরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে নিত্য নতুন নকশায়, নতুন নতুন ছাঁচে তাদের হাতেগড়া জিনিস উপহার দেয়। 'কারিগর' ব'লে আমরা তাদের স্বতন্ত্র ক'রে রাখলেও, তারা 'শিল্পী'—জাতশিল্পী।

বছর পঞ্চাশ-ষাট আগেও এদেশের গ্রামগুলি ছিল স্বনির্ভর, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ছিল একটা সুসঙ্গতি বা পারস্পরিক সহযোগিতা। এক একটি শিল্পকে অবলম্বন ক'রে তখন এক একটি বিশেষ শিল্প-সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছিল। যেমন—তন্তুবায় বা তাঁতী, সূত্রধর বা ছুতোর, কর্মকার বা কামার, চর্মকার, মালাকার, কাঁসারী, শাঁখারী

প্রভৃতি। পুরুষানুক্রমে তারা নিজের নিজের শিল্পকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করত। সেকালের পল্লী-অঞ্চলে বিশেষত নিম্নবিত্ত লোকেদের মধ্যে অর্থের মাধ্যমে কেনাবেচার তেমন চল ছিল না। কৃষক ও গ্রামীণ-শিল্পীরা তখন পরস্পরের মধ্যে খাদ্যশস্য ও শিল্প-পণ্যের বিনিময় করত। কাঁচামালের জন্যও তখন কারি-গরদের দুশ্চিন্তা ছিল না, তাদের সে-চাহিদা কৃষকেরাই নানাভাবে পূরণ ক'রে দিত। দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য তখন সাধারণ গ্রামবাসীর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবার প্রয়োজন হ'ত না। তাঁতীর কাছ থেকে আসত পরনের কাপড়, বিনিময়ে তাঁতী পেত আহার্য-সামগ্রী—যেমন, চাল, ডাল, মসলা। কলুর বাড়ি থেকে আসত তেল, বিনিময়ে কলু হয়তো নিয়ে যেত কামারের কামারশালা থেকে দা বা কাটারি। কাঁসারী জোগাত কাঁসার বাসন-কোসন, মেয়েদের হাতে শাঁখা পরাত শাঁখারীরা। এইভাবে তাদের সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাগে দেশের পল্লী-অঞ্চলে তখন অর্থের একটা সমতা ছিল; এখনকার মতো আর্থিক জীবন তখন অসচ্ছলতার পথ ধ'রে এগিয়ে যায়নি।

অর্ধ-শতাব্দী আগেকার অবস্থা

এদেশের কুটীরশিল্প প্রথম ধাক্কা খেল যন্ত্রশিল্পের কাছ থেকে। যন্ত্রের দৌলতে উৎপাদনের পরিমাণ গেল বেড়ে, উৎপাদিত প্রতিটি শিল্পদ্রব্যে এল সমতা; সময় গেল সংক্ষিপ্ত হয়ে, কম সময়ে বেশী জিনিস যন্ত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাছাড়া হাতেগড়া জিনিসের তুলনায় কলে তৈরী জিনিসের দামটাও হ'লো কম। কলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের একজোড়া হাত আর পেরে উঠল না। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কুটীরশিল্প এইভাবে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। পল্লীর কারিগরেরা তখন জাত-ব্যবসা ছেড়ে মাঠে গিয়ে লাঙল ধরে, নয়তো অন্যত্র রুজি-রোজগারের চেষ্টা দেখে। ফলে পল্লীর আর্থনীতিক জীবনে একটা বিপর্যয় দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিল্প-বিপ্লবের শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আর এদেশে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বিদেশী শিল্পদ্রব্যের অবাধ আমদানিতে দেশীয় শিল্পগুলি গেল কোণঠাসা হয়ে; বহু ক্ষেত্রেই আবার সেগুলি প্রতিযোগিতার চাপে প'ড়ে লুপ্ত হয়ে গেল। দেশের কুটীরশিল্পের জায়গায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পগুলি। এইভাবেই দেশের বহু কুটীরশিল্প হয় গেল লুপ্ত হয়ে, নয়তো বা আধ-মরার মতো অবহেলিত পল্লীর কোণে বসে ধুঁকতে লাগল।

যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে কুটীরশিল্পের অবনতি

যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রসারকে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু সুনজরে দেখতে পারেননি। কারণ, তিনি জানতেন ভারতের আত্মা নগর-সভ্যতার বিলাস-প্রাচুর্যের মধ্যে বিরাজ করে না, তার ঠাঁই পল্লীর অন্তরেই। কৃষি-প্রধান ভারতের পল্লীগ্রামকে যদি আবার বাঁচাতে হয়, তাহ'লে অবলুপ্ত কুটীরশিল্পগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। কারণ, দেশের সেইসব শিল্প লুপ্ত হওয়ায় এবং অন্যদিকে জনসংখ্যার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের জমির উপর খুব বেশী চাপ পড়ছে। তাতে ক'রে আর্থনীতিক-সমস্যাও যেন ধীরে ধীরে জটিল হয়ে উঠছে। কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের মানুষ

যাতে সচেতন হয়ে ওঠে, সেইজন্যই তিনি ঘরে ঘরে 'চরকা' কাটার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'চরকা' আসলে কুটীরশিল্প তথা আত্মনির্ভরতারই প্রতীক।

কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও তার পুনরুদ্ধার

গান্ধীজীর সেই আহ্বানে আশানুরূপ সাড়াই পাওয়া গিয়েছিল। স্বদেশী যুগে আবার কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি দেশের মানুষ সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর একটি বিশেষ কারণে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগ পর্যন্ত ভারতের কোনো রাজ্যেই ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কুটীরশিল্পের প্রসারলাভ ঘটেনি। তদানীন্তন বিদেশী সরকারের সহানুভূতির অভাবই সেই কারণ। কিন্তু, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে দেশ স্বাধীন হবার পর। বড় বড় কলকারখানার পাশেও যে ছোট ছোট কারিগরী-কারখানার ঠাঁই হ'তে পারে, অর্থাৎ একই সঙ্গে ভারী ভারী যন্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্প যে অনায়াসে চলতে পারে দেশের চিন্তানায়কেরা সে-কথা বুঝতে পারলেন জাপান ও জার্মানীর দৃষ্টান্ত থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ দুটি দেশের ছোট ছোট শিল্প-সংস্থা বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেভাবে অপর্যাপ্ত শিল্পপণ্য উৎপাদন ক'রে দেশের চাহিদা মিটিয়েছে তা বিস্ময়কর। চেষ্টা করলে আমাদের দেশেও যে তা অসম্ভব নয় দেশের জাতীয়-সরকার তা স্বীকার ক'রে নিয়ে কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার, তার উন্নয়ন ও কুটীরশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রসারের দিকে মন দিলেন। দেশের লোকও আজ এগিয়ে এসেছে এই ব্যাপারে। গ্রামীণ শিল্পের আবার দর বাড়ছে, তার কদর করছে দেশের মানুষ। কুটীরশিল্পের সবচেয়ে বড় গুণ হ'লো তার বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য, যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যে মেলে না, মেলা সম্ভবও নয়। শিল্পরুচি-সম্পন্ন মানুষের কাছে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের তাই যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে।

মোটামুটি হিসাব ক'রে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে আজকাল প্রায় দশলক্ষ লোক কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পে নিযুক্ত আছে। বছরে প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ কোটি টাকা দামের জিনিসপত্র তৈরি হয় তাদের হাত দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের কুটীরশিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাঁতশিল্পের কথা। এখানকার তাঁতশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হ'লো শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, রাজবলহাট, ধনেখালি, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি। তাছাড়া, মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর আর মালদহে যে-সব রেশমী কাপড়-চোপড় তৈরি হয়, তাও হয় তাঁতে। তাঁতের তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদা যে আগেকার তুলনায় অনেক বেড়েছে সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মুর্শিদাবাদ-সিল্ক ও বিষ্ণুপুরের তসর-গরদের খ্যাতি আজ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশের বাজারেও এসব জিনিসের কদর বাড়ছে। হাতির-দাঁতের জিনিস পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রাচীন কুটীরশিল্প। গ্রামীণ শিল্পের দক্ষতা যে কতখানি উৎকর্ষতালাভ করতে পারে, সূক্ষ্মকারুকার্যসমন্বিত এইসব শৌখীন জিনিসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামে মুর্শিদাবাদের যে-সব হাতির দাঁতের জিনিস সযত্নে সংরক্ষিত আছে, বিদেশী বহু শিল্প-সমালোচকের কাছে সেগুলি শিল্পকলার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কুটীর-শিল্পের পরিচয়

চরমোৎকৃষ্ট নিদর্শন ব'লে স্বীকৃতিলাভ করেছে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পও পশ্চিমবঙ্গের আর একটি গৌরবের জিনিস। দেড়শ' বছরের ওপর এই শিল্পের খ্যাতি শুধু যে ভারতবর্ষেই সীমিত আছে তা নয়, সে-খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় পশ্চিমবাংলার মাটির পুতুল, মূর্তি ও মডেল অগণিত দর্শক ও সমালোচকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়েছে। কুমারটুলীর মৃৎশিল্প এবং বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের পোড়ামাটির জিনিসপত্রের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য কুটীরশিল্পের মধ্যে রয়েছে হাতে-তৈরী কাগজ, চামড়ার জিনিসপত্র, পেতল, তামা, কাঁসার বাসন-কোসন, ছুরি-কাঁচি-তালাচাবি, বাঁশের ও বেতের রকমারি জিনিস; মাতুর-শিল্প, শঙ্খ-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, বোতাম ও চিরুনি-শিল্প প্রভৃতি। এই জাতীয় বিভিন্ন কুটীরশিল্পে, যে-সব কাঁচামালের প্রয়োজন তারও খুব অভাব নেই এদেশে। উপযুক্ত পৃষ্টপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকলে এইসব শিল্প যে দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেকথাও অনস্বীকার্য।

কুটীরশিল্পের ভিত্তি দৃঢ় করতে কী করা দরকার

জাতীয়-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে আজ দেশের লুপ্তপ্রায় বহু কুটীর-শিল্পের যে পুনরুদ্ধার হয়েছে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করবার আছে; এই শিল্পের সম্প্রসারণে যে-সব বাধা ও অসুবিধা আছে সেগুলিকে যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় ততই মঙ্গল। প্রথমত, দেশের কারিগরেরা যে রকম অসহনীয় দুঃখ দারিদ্র্যময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিন কাটায়, সেই পরিবেশের উন্নতি করা দরকার। কারণ, আর্থিক অসচ্ছলতা শিল্পমনের একটা প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের কারিগরেরা যাতে কারিগরি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পায় এবং বিদেশের কারিগরি বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ রাখতে পারে তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেও যাতে আমাদের দেশের কুটীরশিল্পীরা যুগোপযোগী পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী হয় সে-রকমের শিক্ষাব্যবস্থাও চাই। কারণ, মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল, সেই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই কারিগরদের কাজ করে যেতে হবে, না হ'লে তাদের পরিশ্রম ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তে বাধ্য। কুটীরশিল্পে সাধারণত বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না; আর নিজেদের বাড়িতে ব'সেই পরিবারের অন্যান্য সকলের সাহায্য নিয়েই কারিগরেরা নানারকমের জিনিসপত্র তৈরি করতে পারেন। কিন্তু, আমাদের দেশের আর্থনীতিক দুরবস্থার দরুন সকলের পক্ষে সব সময় প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে, তাদের শরণ নিতে হয় মহাজন কিংবা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের, যাদের চক্রান্তে প'ড়ে হিতে বিপরীত হয়। কুটীরশিল্পীরা যাতে মূলধন ও কাঁচামালের ব্যাপারে ঐ শ্রেণীর অর্থগৃধ্নু লোকদের খপ্পরে না পড়ে সেদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সমবায়-সমিতির মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবেই তারা যাতে প্রয়োজন মতো অর্থসাহায্য কিংবা ঋণ পেতে পারে বর্তমানে তার ব্যবস্থা

হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই ব্যাপারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ শিথিল করবারও অবকাশ আছে। যে-ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে মনে হবে, সে-ক্ষেত্রে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কুটীরশিল্পীদের তৈরী পণ্যদ্রব্য যাতে সাধারণ বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রীত হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সুখের কথা এই যে, সরকার এজন্য যে-সব সমবায়-বিক্রয়-সমিতি গঠন করেছেন সেগুলির মাধ্যমে শিল্পীরা আজকাল তাদের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রয়ের অনেক সুবিধা পাচ্ছেন। বিক্রয়-ব্যবস্থার উপরেই তো উৎপাদনের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করে। এ-বিষয়ে দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতাও একান্ত আবশ্যক। জাপান-জার্মানী প্রভৃতি দেশে কুটীরশিল্পের প্রসারের জন্য আজকাল যেমন ছোটখাটো কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, এদেশেও ক্রমশ তার প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ, তাতে ক'রে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়বে, জিনিসপত্রের দর কমানো তেমনি সম্ভব হবে।

অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কুটীরশিল্প কি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে যে, তা সম্ভব নয়। কিন্তু, এ-কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষির উপরেই নির্ভরশীল। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক। কিন্তু, সেইসব কৃষক সারা বছর ধ'রে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকে না। তাদের সেই অবসর সময়ে তারা যদি কুটীরশিল্পের কাজে ব্যাপৃত হয়, তাহ'লে একদিকে তারা যেমন বাড়তি আয়ের পথ খুঁজে পাবে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু একই বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে কুটীরশিল্পই মানুষের বহুবিচিত্র রুচির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এবং তার চাহিদা মেটাতেও সক্ষম।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি প্রধানত নির্ভর করছে তার গ্রামীণ আর্থনীতিক উন্নতির উপরেই। সেই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিবিধান করতে হ'লে কুটীরশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। এ-বিষয়ে আজ দেশের সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ একটা সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক

পশ্চিমবঙ্গ একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য। যেমন ছিল অবিভক্ত বঙ্গের কৃষিপ্রধান রূপ, দেশ ভাগ হয়েও পশ্চিমবঙ্গের সে-রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দেশে কলকারখানার সংখ্যা হয়তো বেড়েছে, যন্ত্রশিল্পে হয়তো আগের চেয়ে অনেক বেশী

শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু কৃষি এখনও বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনের ভিত্তি। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক এখনও কৃষির উপরেই নির্ভরশীল,—তা সে প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর পরোক্ষভাবেই হোক। অর্থাৎ, কৃষিপ্রধান সমগ্র ভারতের যা অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গেরও প্রায় তাই। কর্মনিযুক্ততার দিক থেকে কৃষি যেমন সারা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা যাট জনের কাজ যোগায়, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে শতকরা সাতান্ন জনের কিছু বেশি কৃষিকর্মে নিযুক্ত। তফাত শুধু এইটুকু। পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ এককোটি তের লক্ষ একরের ওপর এবং আবাদযোগ্য যে অনাবাদী ও পতিত জমি এ-রাজ্যে প'ড়ে রয়েছে তার পরিমাণও বড় কম নয়, প্রায় সাতাশ লক্ষ একর। একথা বললে তাই অত্যুক্তি হয় না যে, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাগ্য অনেকখানি জড়িত।

ভূমিকা

বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, পঞ্চাশ-যাট বছর আগেও দেশবাসী এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়নি। তখন কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবার কোনো প্রয়োজনীয়তাও কেউ অনুভব করেননি। কারণ, অর্ধ-শতক আগেকার সেই বাংলাদেশে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হ'ত, তাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরোপুরি মিটিয়েও, অন্য প্রদেশকে কিছু উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যেত। বলা বাহুল্য, খাদ্যশস্য বলতে এখানে আমরা প্রধানত ধানের কথাই বলছি। কারণ, বাঙালীর প্রধান খাদ্যই হ'লো ভাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সময় থেকেই বাঙালীর সে ভাতে টান পড়েছে, চালের চোরাকারবার হয়েছে, দেশে মন্বন্তর পর্যন্ত ঘটেছে। বাধ্য হয়ে দেশে তখন খাদ্যদ্রব্যের রেশন-প্রথা প্রবর্তিত করতে হয়। কিন্তু সে-রেশন ব্যবস্থা এখন উঠে গেলেও চালের দাম আর কমলো না, দেশের অধিকাংশ লোককে এখনও সরকার-নিয়ন্ত্রিত ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে অপেক্ষাকৃত সুবিধা দরে চাল-আটা সংগ্রহ করতে হয়। রেশনের দৌলতে বাঙালী আজ গমজাত খাদ্যদ্রব্যেও কিছু-না-কিছু অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী-পরিবারে চাল না হ'লে আজও চলে না! অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি আজ একটা সমস্যায় পরিণত হবার প্রধান কারণ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেকার বাংলাদেশে কৃষির উপর লোকসংখ্যার এমন চাপ পড়েনি। তাছাড়া, তখনকার দিনে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল ব'লে আর্থনীতিক বিষয়ে একটা সমতাও ছিল। গ্রামীণ শিল্পের অবনতির ফলে, সে-সমতাও ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর আসে যুদ্ধ; সবশেষে দেশবিভাগের আঘাত। বাংলাদেশের যে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হ'লো প্রধানত সেই পূর্ব-বঙ্গের কয়েকটি জেলাতেই ছিল কৃষির প্রাধান্য। খুলনা-বরিশাল-দিনাজপুর জেলাই ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশের খাদ্যশস্য-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এই বিভিন্ন কারণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় যে ভাঙন ধরে তার জের এখনও চলেছে।

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেকার কৃষি ও বর্তমান সমস্যা

আগেই বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা সাতান্ন ভাগ কৃষিজীবী, অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অকৃষিজীবী হয়েও আবার শতকরা প্রায় ১২·৭৯ ভাগ লোক কৃষির উপরে নির্ভর ক'রে থাকে পরোক্ষভাবে।

পশ্চিমবঙ্গের চারশ্রেণীর কৃষিজীবী

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবীদের ভাগ করা যায় চারটি পৃথক্ শ্রেণীতে। যেমন—(১) যেসব জমির মালিক নিজেরা কৃষিকাজ করে না, অথচ জমির উপস্বত্ব ভোগ করে; (২) জমির মালিকানাস্বত্ব-বিশিষ্ট কৃষিজীবী ; (৩) ভূমিহীন কৃষক ; আর, (৪) সাধারণ কৃষি-মজুর। সংখ্যার দিক থেকে অবশ্য মালিকানাস্বত্ব-বিশিষ্ট কৃষিজীবীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাদের সংখ্যা—আশিলক্ষ তেইশ হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু, ভূমিহীন কৃষক ও সাধারণ কৃষি-মজুরের সংখ্যাও বড় কম নয়। এই দুই শ্রেণীর কৃষিজীবীর সংখ্যা হবে পূর্বোক্ত শ্রেণীর কৃষিজীবীর প্রায় অর্ধেক। আর, জমির মালিক হয়েও যারা নিজেরা কৃষিকর্মে নিযুক্ত নয়, সংখ্যায় তারা প্রায় দেড়লাখ। এই চারশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক ও সাধারণ কৃষি-মজুরের আর্থিক অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। কারণ, কৃষির সাফল্যের উপরেই ভূমিহীন কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে। বর্গা-প্রথা অনুসারে তারা অন্যের জমি কর্ষণ করে এবং তাতে ফসল ফলায়, শর্ত থাকে ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হবে ফসল কাটার সময়। যে-বছর ভালো ফসল হয় না, সে-বছর জমির মালিক ও বর্গাদারের (বা ভূমিহীন কৃষক) ভাগে যে ফসল আসে তাতে উভয়ের ক্ষতি হ'লেও ক্ষতির আঘাতটা বর্গাদারেরই বেশি লাগে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সেই কৃষক, তারই পরিশ্রমে জমি কর্ষিত হয়, ফসল ফলে। জমির মালিককে তো কায়িক কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, সে শুধু ভূমিহীন-কৃষক-বর্গাদারের পরিশ্রমজাত ফসলের উপর প্রথানুযায়ী অর্ধেক ভাগ বসায়। আমাদের দেশের ক্ষেত-মজুর বা কৃষি-মজুরদের অবস্থাও বড় শোচনীয়। তাদের পারিশ্রমিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে জমির মালিকদের মর্জির উপর। যে পরিমাণ তাদের পরিশ্রম করতে হয় তদনুপাতে তারা যে পারিশ্রমিক পায় না তা বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিককালে অবশ্য রাজ্যসরকার এই সব কৃষি-মজুরদের পারিশ্রমিকের সর্বনিম্ন একটা হার বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু সর্বত্র তা কার্যকরী হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার মতো লোকবল সরকারের হাতে নেই। এদেশে শুধু কৃষির উপরে নির্ভর করে যারা দিন কাটায়, তাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নিচে সে-কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের একজন কৃষি-মজুরের বার্ষিক আয় গড়ে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা, অর্থাৎ মাসে পৌনে চার টাকার মতো তার আয় হয় ক্ষেতমজুরি ক'রে। ফলে, দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী। আর, দারিদ্র্যের সেই ছিদ্রপথ ধ'রেই নানাবিধ রোগ এসে তাকে জর্জরিত ক'রে তোলে। তখন নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-সম্প্রদায়ের আর্থিক অবনতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি

কারণ। প্রথম এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা এখনও বহুক্ষেত্রেই অতি-পুরাতন প্রথাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। অশিক্ষিত কৃষকেরা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চাষ-পদ্ধতিকে মেনে নিতে হয় কুণ্ঠিত, নয়তো চিরাচরিত সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকেও তাদের তেমন একটা গরজ দেখা যায় না। তারা অল্পেই সন্তুষ্ট, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমবিমুখও বটে। দ্বিতীয়ত এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যেই বিরাট একটা গলদ রয়ে গেছে। বহু কৃষকের জমিই খণ্ড খণ্ড ভাবে এখানে-ওখানে ছড়ানো; এক লপ্তে বিস্তৃত জমি না-থাকার দরুন যান্ত্রিক-চাষ-অবাদের মস্ত অসুবিধা। তাছাড়া, এরকমের খণ্ড খণ্ড জমি থাকায় জমিরও অপচয়। তৃতীয়ত ভূমি-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইনের জটিলতা এবং এতকালের জমিদারী প্রথাও এদেশের কৃষক সম্প্রদায়কে নানাভাবে আর্থিক অসচ্ছলতার পথে ঠেলে দিয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের চক্রান্তে প'ড়ে এতকাল কৃষকেরা নানাভাবে শুধু নিগৃহীতই হয়ে এসেছে, নিজেদের পরিশ্রমের ফল অর্ধেকও ভোগ করতে পারেনি। সাম্প্রতিককালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হওয়ায় হয়তো তারা অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। এদেশের কৃষকদের আর্থিক অবনতির আর একটি কারণ গ্রাম্য-মহাজনদের কবলে প'ড়ে ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া। চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আর্থিক অভাব দূর করতে গিয়ে তারা ক্রমশ অধিকতর দারিদ্র্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং অশিক্ষা ও সহজাত কতকগুলি প্রবৃত্তির বশে মামলা-মকদ্দমা করতে গিয়ে দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌছায়। প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক, সেচের অসুবিধা, উন্নতশ্রেণীর বীজ ও সারের অভাব ইত্যাদি কারণেও এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত; আর তারই ফলভোগ করে কৃষকেরা।

কৃষক-সম্প্রদায়ের আর্থিক অবনতি ও তার কারণ

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক-জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য রাজ্যসরকার বহুরকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে সম্প্রতি যেভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসনীয়। ভুলত্রুটির জন্য হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ ব্যাহত হয়, কিন্তু সকলের সক্রিয় সহযোগিতা থাকলে মহৎ উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে না। এতকাল ধ'রে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকশ্রেণী যেভাবে জমিদার তথা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের কবলে প'ড়ে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে 'জমিদারী-প্রথা-উচ্ছেদ' যেন তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। রাজ্য-সরকার জমিদারী-প্রথার বিলোপ-সাধন ক'রে এদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছেন, ভবিষ্যতে একদিন তা 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-রূপেই অভিনন্দিত হবে। কারণ, দরিদ্র রায়ত, ভাগচাষী বা বর্গাদার এবং ভূমিহীন কৃষকেরাই হবে এখন জমির মালিক, সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হবে নিকটতর। তাছাড়া, নতুন ব্যবস্থায় কৃষকদের খণ্ডিত জমি একত্র করবার যেমন পরিকল্পনা আছে,

কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্য-সরকারের উদ্যম

তেমনি কৃষি-সমবায়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সুযোগ-সুবিধাও এদেশের কৃষকেরা পাবে। জমি যাতে অকৃষকদের হাতে না পড়ে, জমি-পুনর্বণ্টনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে যদি সরকারের দৃষ্টি সজাগ ও সতর্ক থাকে তাহ'লে অভীপ্সিত সুফল একদিন পাওয়া যাবেই। কৃষকেরা যাতে কৃষিকাজের জন্য আর মহাজনদের দ্বারস্থ না হয় সেজন্য 'সমবায়-ঋণদান-সমিতি' বহু আগেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তাছাড়া, 'ঋণ-সালিসী-বোর্ড' গঠন ক'রে পূর্ববর্তী প্রাদেশিক-সরকার এদেশের কৃষকদের যথেষ্ট উপকার ক'রে গেছেন। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের দিক থেকে আর যে-সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে আছে—ছোট-বড় সেচ-পরিকল্পনা, রাসায়নিক সার ও উন্নত শ্রেণীর শস্যবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা, বীজ-প্রবর্ধক কৃষিকেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা, পশু-সম্পদের উন্নয়ন, ফসলের অপচয় নিবারণ, কীটপতঙ্গ ও নানারকম রোগের হাত থেকে শস্যসম্পদ রক্ষা প্রভৃতি। কৃষকদের অশিক্ষা ও কু-সংস্কার যাতে দূর হয়, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতিতে এদেশের কৃষক সম্প্রদায় যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য কৃষি-গবেষণাগার ও কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপন ক'রেও দেশের জাতীয়-সরকার প্রভূত উপকার-সাধন করবার চেষ্টা করছেন। কৃষিজীবীদের এখন উচিত এই সব সুযোগ-সুবিধার অংশ গ্রহণ করা।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লীর উন্নতিবিধানের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় শিল্প-উন্নয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হ'লেও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজগুলি উপেক্ষিত হয়নি। গত দশবছরের এই চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কতখানি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হওয়াটাই বড় কথা নয়, আসল উদ্দেশ্য কতটা সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে সেইটাই বড় কথা। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে খাদ্য-শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি জেলায় তা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। কংসাবতী-পরিকল্পনার কাজ শেষ হ'লে আরও কয়েকটি জেলার চাষ-আবাদের কাজে সেচের আরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। চব্বিশ-পরগনা জেলার সোনারপুর-আরাপাঁচ অঞ্চলে যেভাবে বিস্তীর্ণ জলাভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে ফসল ফলানো হয়েছে নিঃসন্দেহে তা কৃষি-ব্যবস্থারই উন্নতি। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে আজ যথাযথ সার সরবরাহ ক'রে কৃষকদের জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবার কাজে সহায়তা করা হচ্ছে। কৃষকেরা আজ উন্নত শ্রেণীর শস্যবীজ ও সেচ-ব্যবস্থার সুবিধাও পাচ্ছে। এদেশের পল্লী-অঞ্চলে আজ যেন একটা নবজাগরণের আভাস দেখা যাচ্ছে, কৃষির উন্নতিসাধনে কৃষকেরা আজ যেন নতুন উৎসাহে ও উদ্যমে কাজ করতে বদ্ধ-পরিকর।

পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও একটি কাজ করা দরকার। সেটি হ'লো শিল্পের সম্প্রসারণ,—তা সে বৃহৎ শিল্পই হোক আর কুটীরশিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পই হোক। কারণ, শিল্পের যত প্রসার হবে, জমির উপরে বেকার জনসাধারণের চাপ ততই কম আসবে, আর কৃষকেরাও তাদের অবসর সময়ে কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের মাধ্যমে পরিপূরক আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এদেশের কৃষকেরা যাতে সচেতন হয়ে ওঠে, সেজন্য বিভিন্ন কৃষি-প্রদর্শনী ও যথোপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়। কৃষিব্যবস্থার অবনতিতে শুধু যে কৃষকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, তার প্রতিক্রিয়া দেশের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হ'লে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনই সম্ভব নয়।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা

পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার মধ্যে মালদহ-জেলার বিশেষ একটা স্থান আছে, বিশেষ ক'রে বাংলার গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিক থেকে। বাঙালী জাতির বহু অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জেলার ইতিহাসের সঙ্গে। ঐতিহাসিক গৌড়ের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছিল মালদহ জেলায়; বর্তমান মালদহ শহর বা ইংরেজবাজারের কয়েক মাইলের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ, বাংলাদেশের অতীত রাজধানীর বহু পুরাকীর্তি। গৌড়ের পথ ধ'রেই আর্য-সভ্যতা তার মননশীল ধারা নিয়ে জীবনধর্মী আর্যেতর সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

ভূমিকা

উত্তরে বিহারের পূর্ণিয়াজেলা আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-দিনাজপুর, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান, আর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়ার অংশ বিশেষ—এই সীমারেখার মধ্যে বর্তমান মালদহ-জেলার অবস্থিতি। নামেই জেলা, আসলে একটি মহকুমা মাত্র। কারণ, দ্বিতীয় কোনো মহকুমা নেই এখানে। আয়তনে মাত্র ১,৩৯২ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ন'লাখ সাঁইত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যাবে এই জেলার জাতি-বিন্যাসে। যেমন—মগধাশ্রয়ী মৈথিল ব্রাহ্মণ, আর আর্যেতর ভোটবর্মী রাজবংশী, কোচ, পালিয়া অথবা দ্রাবিড়গোষ্ঠীয় সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী। জাতিগত এই যুগ্মপ্রভাব এখানকার কথ্যভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। মালদহবাসী শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার সুরে কেমন যেন একটা দেহাতী টান, অথচ শুনতে খারাপ লাগে না। বিচিত্র অধিবাসীর বাস এই মালদহ জেলায়। জেলার উত্তর, পূব আর পশ্চিমাঞ্চলে যেমন হিন্দুর সংখ্যা বেশি, তেমনি মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্যে ছড়িয়ে

সীমা, আয়তন, জনসংখ্যা ও লোক-বৈচিত্র্য

তেমনি কৃষি-সমবায়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সুযোগ-সুবিধাও এদেশের কৃষকেরা পাবে। জমি যাতে অকৃষকদের হাতে না পড়ে, জমি-পুনর্বণ্টনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে যদি সরকারের দৃষ্টি সজাগ ও সতর্ক থাকে তাহ'লে অভীপ্সিত সুফল একদিন পাওয়া যাবেই। কৃষকেরা যাতে কৃষিকাজের জন্য আর মহাজনদের দ্বারস্থ না হয় সেজন্য 'সমবায়-ঋণদান-সমিতি' বহু আগেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তাছাড়া, 'ঋণ-সালিসী-বোর্ড' গঠন ক'রে পূর্ববর্তী প্রাদেশিক-সরকার এদেশের কৃষকদের যথেষ্ট উপকার ক'রে গেছেন। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের দিক থেকে আর যে-সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে আছে—ছোট-বড় সেচ-পরিকল্পনা, রাসায়নিক সার ও উন্নত শ্রেণীর শস্যবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা, বীজ-প্রবর্ধক কৃষিকেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা, পশু-সম্পদের উন্নয়ন, ফসলের অপচয় নিবারণ, কীটপতঙ্গ ও নানারকম রোগের হাত থেকে শস্যসম্পদ রক্ষা প্রভৃতি। কৃষকদের অশিক্ষা ও কু-সংস্কার যাতে দূর হয়, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতিতে এদেশের কৃষক সম্প্রদায় যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য কৃষি-গবেষণাগার ও কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপন ক'রেও দেশের জাতীয়-সরকার প্রভূত উপকার-সাধন করবার চেষ্টা করছেন। কৃষিজীবীদের এখন উচিত এই সব সুযোগ-সুবিধার অংশ গ্রহণ করা।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লীর উন্নতিবিধানের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় শিল্প-উন্নয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হ'লেও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজগুলি উপেক্ষিত হয়নি। গত দশবছরের এই চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কতখানি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হওয়াটাই বড় কথা নয়, আসল উদ্দেশ্য কতটা সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে সেইটাই বড় কথা। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে খাদ্য-শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি জেলায় তা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। কংসাবতী-পরিকল্পনার কাজ শেষ হ'লে আরও কয়েকটি জেলার চাষ-আবাদের কাজে সেচের আরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। চব্বিশ-পরগনা জেলার সোনারপুর-আরাপাঁচ অঞ্চলে যেভাবে বিস্তীর্ণ জলাভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে ফসল ফলানো হয়েছে নিঃসন্দেহে তা কৃষি-ব্যবস্থারই উন্নতি। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে আজ যথাযথ সার সরবরাহ ক'রে কৃষকদের জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবার কাজে সহায়তা করা হচ্ছে। কৃষকেরা আজ উন্নত শ্রেণীর শস্যবীজ ও সেচ-ব্যবস্থার সুবিধাও পাচ্ছে। এদেশের পল্লী-অঞ্চলে আজ যেন একটা নবজাগরণের আভাস দেখা যাচ্ছে, কৃষির উন্নতিসাধনে কৃষকেরা আজ যেন নতুন উৎসাহে ও উদ্যমে কাজ করতে বদ্ধ-পরিকর।

পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও একটি কাজ করা দরকার। সেটি হ'লো শিল্পের সম্প্রসারণ,—তা সে বৃহৎ শিল্পই হোক আর কুটীরশিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পই হোক। কারণ, শিল্পের যত প্রসার হবে, জমির উপরে বেকার জনসাধারণের চাপ ততই কম আসবে, আর কৃষকেরাও তাদের অবসর সময়ে কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের মাধ্যমে পরিপূরক আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এদেশের কৃষকেরা যাতে সচেতন হয়ে ওঠে, সেজন্য বিভিন্ন কৃষি-প্রদর্শনী ও যথোপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়। কৃষিব্যবস্থার অবনতিতে শুধু যে কৃষকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, তার প্রতিক্রিয়া দেশের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হ'লে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনই সম্ভব নয়।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা

পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার মধ্যে মালদহ-জেলার বিশেষ একটা স্থান আছে, বিশেষ ক'রে বাংলার গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিক থেকে। বাঙালী জাতির বহু অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জেলার ইতিহাসের সঙ্গে। ঐতিহাসিক গৌড়ের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছিল মালদহ জেলায়; বর্তমান মালদহ শহর বা ইংরেজবাজারের কয়েক মাইলের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ, বাংলাদেশের অতীত রাজধানীর বহু পুরাকীর্তি। গৌড়ের পথ ধ'রেই আর্য-সভ্যতা তার মননশীল ধারা নিয়ে জীবনধর্মী আর্যেতর সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

ভূমিকা

উত্তরে বিহারের পূর্ণিয়াজেলা আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-দিনাজপুর, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান, আর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়ার অংশ বিশেষ—এই সীমারেখার মধ্যে বর্তমান মালদহ-জেলার অবস্থিতি। নামেই জেলা, আসলে একটি মহকুমা মাত্র। কারণ, দ্বিতীয় কোনো মহকুমা নেই এখানে। আয়তনে মাত্র ১,৩৯২ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ন'লাখ সাঁইত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যাবে এই জেলার জাতি-বিন্যাসে। যেমন—মগধাশ্রয়ী মৈথিল ব্রাহ্মণ, আর আর্যেতর ভোটবর্মী রাজবংশী, কোচ, পালিয়া অথবা দ্রাবিড়গোষ্ঠীয় সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী। জাতিগত এই যুগ্মপ্রভাব এখানকার কথ্যভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। মালদহবাসী শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার সুরে কেমন যেন একটা দেহাতী টান, অথচ শুনতে খারাপ লাগে না। বিচিত্র অধিবাসীর বাস এই মালদহ জেলায়। জেলার উত্তর, পূব আর পশ্চিমাঞ্চলে যেমন হিন্দুর সংখ্যা বেশি, তেমনি মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্যে ছড়িয়ে

সীমা, আয়তন, জনসংখ্যা ও লোক-বৈচিত্র্য

আছে দক্ষিণাঞ্চলে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙালী আছে, তেমনি আছে মৈথিল ব্রাহ্মণ। মুসলমানদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে। একদল হ'লো সুন্নি-সম্প্রদায়ের মুসলমান, অন্যদল হানিফী-সম্প্রদায়ভুক্ত শেরশাবাদিয়া। লোকে বলে, শেরশাবাদিয়া মুসলমানেরা শের শাহের সৈন্যবংশোদ্ভূত। আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মু—এদের সম্মিলিত সংখ্যাও বড় কম নয়। সাঁওতালদের সংখ্যাই বাহাত্তর হাজারের উপর। তাছাড়া, পালিয়া, রাজবংশী, গণেশ, চাইমণ্ডল, ধানুমণ্ডল শ্রেণীর বহু লোক মালদহ জেলার জনবসতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। ব্যবসায়ের সূত্র ধ'রে বহু অ-বাঙালী, বিশেষ ক'রে রাজস্থানের অনেকে এখানে এসে বসবাস করছে কয়েক পুরুষ ধ'রে।

মালদহ-জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু সুন্দর-ই নয়, বৈচিত্র্যময় বলা যায় তাকে। মহানন্দা নদীটি যেন এ-জেলার মেখলাস্বরূপ। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এই নদীটি সমগ্র জেলাটিকে প্রায় সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে। মহানন্দার পূর্বদিককার অঞ্চলকে বলা হয় 'বরিন্দ্'-এলাকা, আর পশ্চিমদিককার অঞ্চল 'তাল' ও 'দিয়ারা' নামেই পরিচিত। গঙ্গার অন্যতম শাখা কালিন্দী আবার মহানন্দার পশ্চিম-তীরবর্তী অঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। 'তাল-অঞ্চল' কালিন্দীর উত্তরে, আর দক্ষিণে 'দিয়ারা'-এলাকা। 'তাল' ও 'দিয়ারা'-য় যেমন চোখে পড়বে সুবিস্তৃত শ্যামল সমতলভূমি, 'বরিন্দ্'-এলাকায় তেমনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে বন্ধুর গৈরিক প্রান্তর। জেলার দক্ষিণাঞ্চলই সবচেয়ে উর্বরা এবং প্রকৃতির অকৃপণ দানে ঐশ্বর্যময়ী। আম্রকুঞ্জ যেমন মালদহের শোভা ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করেছে, তেমনি তুঁত, শিমুল, পলাশ, লাক্ষা-র ঝোপঝাড়, বট, পাকুড়, শাল ও নিমের বন এ-জেলার প্রায় সর্বত্র। 'বরিন্দ্'-এলাকার অংশ-বিশেষ তো ঘন-জঙ্গলে পূর্ণ, আর, সেই সব জঙ্গলে চিতাবাঘ, বুনো হরিণ ও শূকরের প্রায়ই দেখা মেলে। এ-জেলার জলাভূমি ও বিল-অঞ্চলেও শিকারীদের শিকার মেলে—বিচিত্র সব পাখি, যেমন—লালশর, চখা, শিল্লি, রাঙাখুরিয়া, বনমোরগ ও কবুতর। প্রধানত মহানন্দা ও কালিন্দীর জলে পুষ্ট হলেও, পতিতপাবনী গঙ্গার স্নেহস্পর্শ লেগেছে এ-জেলার পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাছাড়া মহানন্দা থেকে বেরিয়ে এসেছে পুনর্ভবা ও টাঙ্গন, গঙ্গা থেকে যেমন উৎসারিত হয়েছে কালিন্দী, পাগ্‌লা ও ভাগীরথীর স্রোতধারা। এরই ফলে মালদহের মাটিতে আছে সবুজের আস্তরণ, সরস মাটির বুকে আছে বিচিত্র ফলমূল ও শস্যসম্ভার। এ-জেলার জল-হাওয়া মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, বিশেষ ক'রে হেমন্ত, শীত, বসন্তে। বৃষ্টিধারার মধ্যেও আছে সামঞ্জস্য, অর্থাৎ বর্ষণের আধিক্য যেমন নেই, তেমনি তার কার্পণ্যেরও অভাব। এ-জেলার জনস্বাস্থ্য সবচেয়ে ভালো 'দিয়ারা'-অঞ্চলে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলহাওয়া, নদ-নদী

বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান আধিপত্যের যুগে বহুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজধানী ছিল 'গৌড়'-এ। গৌড়ের গৌরবময় বহু স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে জেলার সদর-শহর ইংরেজবাজারের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। অষ্টম শতকে গৌড়ের খ্যাতি সুদূর

পঞ্জাব-কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অনেকের মতে গৌড়াধিপতি জয়ন্তই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা আদিশূর,—যে-আদিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্মের কৌলীন্য বজায় রাখতে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানকে এদেশে আনিয়েছিলেন। শূরবংশের এগারজন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করবার পর অষ্টম শতকের শেষদিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল-রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় গৌড়ে। গৌড়ের শ্রীবৃদ্ধির মূলেও ছিলেন সেই পালরাজারা। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হলেন—ধর্মপালদেব ও গোপালদেব। শৌর্যে, বীর্যে সেকালের বাঙালীরা যে কত বড় ছিল ধর্মপালদেবের ইতিহাসই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বাহুবলে তিনি প্রায় গোটা আর্যাবর্তই জয় ক'রে নিয়েছিলেন,—তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল সুদূর পঞ্জাব-কান্দাহার পর্যন্ত। এই ধর্মপালই জামালগঞ্জের কাছে পাহাড়-পুরে 'সোমপুর মহাবিহার' ও ভাগলপুরের কাছে 'বিক্রমশিলা মহাবিহার' স্থাপন করেন। মুঙ্গের ও নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ, আর পূর্ব-সমুদ্র থেকে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত ধর্মপাল-পুত্র দেবপালদেবের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই দুই রাজার রাজত্বকালেই দেশীয় শিল্পকলা ও ভাস্কর্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। দুঃখের বিষয়, পাল-রাজাদের রাজধানী সেই সুপ্রাচীন গৌড়ের আজ আর কোনো চিহ্ন-ই অবশিষ্ট নেই; বৌদ্ধযুগের পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন সেন-বংশীয় হিন্দু-রাজারা যাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের আমলে গৌড় তথা সারা বাংলাদেশে আবার নতুন ক'রে শ্রীলাভ করে, সাহিত্য ও শিল্পকলায় হয় তার বিস্ময়কর উন্নতি। সেন-রাজাদের কিছু কিছু স্মৃতি এখনও অস্পষ্টভাবে বিরাজ করছে মালদহ-জেলার মাটিতে। সেন-রাজাদের পর গৌড়ের যে ইতিহাস তা মুসলমান-আমলের বাদশাহী রাজত্বেরই ইতিহাস। সে-আমলে গৌড়, পাণ্ডুয়া ও আদিনায় তারা যে কীর্তি স্থাপন ক'রে যান, আজকের গৌড়-অঞ্চলে গিয়ে আমরা তারই ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করি। সেই সব পুরাকীর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আজও আমাদের শরীরে যেন বিস্ময়ের রোমাঞ্চ জাগে। গৌড়ের সিংহাসনে পাঠান-মোগল উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমানেরাই উপবেশন ক'রে গিয়েছেন। হোসেন-শাহী বংশের যে-সব সুলতান গৌড়ে রাজত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্-ই হলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গৌড়-নগর শ্মশানে পরিণত হয় এবং সেই থেকেই গৌড় ক্রমশ বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে স'রে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করে। সুপ্রাচীন গৌড়ে যে-সব ভগ্নাবশেষ আজও মহাকালের চক্রান্ত উপেক্ষা ক'রে টিকে আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো মুসলমান আমলের বড় সোনামসজিদ বা বারদুয়ারী, দখল্-দরওয়াজা, হার্বোল খাস, ফিরোজমিনার, লুকোচুরি-দরওয়াজা, কদম-রসুল, ঘুমটি-দরওয়াজা, চিকা মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোট সোনামসজিদ, একডালা দুর্গ প্রভৃতি। রামকেলিতে আছে শ্রীচৈতন্য-শিষ্য রূপ-সনাতনের স্মৃতিবিজড়িত রূপসাগর দীঘি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, শ্যামকুণ্ড, আদিনায়

অতীত-গৌরব ও পুরাকীর্তি

রয়েছে সুবিখ্যাত আদিনা-মসজিদ, আর পাণ্ডুয়াতে দেখা যাবে বড় দর্‌গা, ছোট দর্‌গা, কুতুবশাহী মসজিদ, এক-লাখী মসজিদ, সেলামী দর্‌ওয়াজা প্রভৃতি। বাস্তুবিদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন হ'লো গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনামসজিদ। একসময় এটি বাদশাহী দপ্তরখানা ছিল ব'লে অনেকের ধারণা। নানারকমের কারুকার্যখচিত দখল্‌-দরওয়াজাটিই একসময়ে ছিল গৌড়ের প্রধান প্রবেশদ্বার। এই তোরণপথে নাকি তিনটি বড় বড় হাতি সওয়ার নিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করত। গৌড়ের ফিরোজ-মিনারটিও বিশেষ ক'রে দেখবার মতো। চুরাশি ফুট উঁচু এই বিজয়স্তম্ভের ভিতরে তিয়াত্তর ধাপ-বিশিষ্ট ঘোরানো সিঁড়ি আছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের দিক থেকে এই সব মিনার, প্রাসাদ ও মসজিদ যে বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের অপূর্ব দক্ষতারই পরিচয় বহন ক'রে আসছে তা বলাই বাহুল্য।

অবিভক্ত বাংলায় মালদহ-জেলার যে বিস্তৃতি ছিল, র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ সাহেবের কলমের এক খোঁচায় তা কিছুটা সংকুচিত হয়ে এসেছে। পূর্বতন মালদহ-জেলার পাঁচটি থানা চ'লে গিয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানে। এখন যে দশটি থানা নিয়ে জেলার অস্তিত্ব তা হ'লো—ইংরেজবাজার, মালদহ, কালিয়াচক, হবিবপুর, রাতুয়া, মানিকচক, খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল আর বামনগোলা। সদর-শহর ইংরেজবাজার জেলার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরা পুরনো মালদহ-শহর থেকে এইখানে তাঁদের কুঠি উঠিয়ে আনেন। তাঁদের সেই পুরনো কুঠিবাড়িতেই এখন ঠাঁই পেয়েছে জেলার সদর-দপ্তরখানা ও আদালত। রেশমের আকর্ষণেই একদিন যেমন ইংরেজ বণিকেরা ইংরেজ-বাজারের মাটিতে শেকড় গেড়ে বসেছিলেন, তেমনি ওলন্দাজ ও ফরাসী ব্যবসায়ীরাও এখানে এসে বেশ কিছুদিন চুটিয়ে ব্যবসায় ক'রে গিয়েছেন। মালদহ-জেলার খ্যাতি প্রধানত তিনটি জিনিসের জন্য—গৌড-পাণ্ডুয়া-আদিনার পুরাকীর্তি, রেশমশিল্প ও আমের ব্যবসায়। এই সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য; তা হ'লো—মালদহের সুবিখ্যাত লোকসঙ্গীত 'গম্ভীরা'। মালদহের আম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতেই সুপরিচিত। শুধু ফজ্‌লী আমই নয়, গোপালভোগ, বৃন্দাবন, ল্যাঙ্‌ড়া, কিষেণভোগ, ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি বহুবিচিত্র সুমিষ্ট আমের ব্যাপক চাষ হয় এই জেলায়। প্রতি চার বৎসর অন্তর মালদহে যেন আমের প্লাবন আসে। আমের কথা বাদ দিলে, এই জেলার অন্যান্য কৃষিজাত সম্পদের মধ্যে রয়েছে রকমারি ধান, গম, যব, ছোলা, ডাল, তিসি, তিল, সরষে, আখ ও আলু। প্রতি একরে এ-জেলায় তিনশ' মণের উপরে আখ হয়। তাছাড়া, গমের উৎপাদন-প্রতিযোগিতাতে এ-জেলা কয়েক বছর সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কৃষিলক্ষ্মী মালদহ-জেলাকে নানাভাবে সুসমৃদ্ধ করলেও শিল্পলক্ষ্মী কিন্তু এ-বিষয়ে কিছুটা কার্পণ্য দেখিয়েছেন। বড়রকমের কোনো শিল্পসংস্থা নেই এ-জেলায়। তবে, কুটীরশিল্পের দিক থেকে, বিশেষ ক'রে রেশমশিল্পে মালদহ-জেলার খ্যাতি অনেকদিনের। বর্তমানে কাঁচা

আধুনিক মালদহ ও তার বৈশিষ্ট্য

রেশম উৎপাদন করাই হ'লো মালদহের প্রধান কুটীরশিল্প। সরকার থেকে পিয়াসবাড়িতে যে নার্শারি খোলা হয়েছে, সেখানে উন্নত জাতের রেশমকীট উৎপাদিত হয়। কালিয়াচক ও ইংরেজবাজার থানাই হ'লো জেলার প্রধান রেশমশিল্প-কেন্দ্র। তসর, গরদ ও মুগা জাতীয় কিছু কিছু রেশমবস্ত্রও তৈরি করে মালদহের রেশম-তাঁতীরা। আজকাল এই জেলায় প্রতি বছর গড়ে প্রায় তিনলাখ চল্লিশহাজার পাউণ্ড কাঁচা রেশম উৎপাদিত হয়। টাকার অঙ্কে তার দাম হবে এককোটি টাকার কিছু বেশি। লোক-সংস্কৃতির দিক থেকে মালদহ-অঞ্চলের 'গম্ভীরা'-গানেরও বিশেষ একটা মূল্য আছে। সমাজ-সংস্কারের দিক থেকেও এর প্রভাব বড় কম নয়। 'গম্ভীরা'-র সহজ ভাষা ও সরল সুরে স্বভাবতই সাধারণ লোকের মন আকৃষ্ট হয়, এবং সঙ্গীতের বাণী থেকে যে শিক্ষা তারা পায়, পরোক্ষভাবে তাই তাদের টেনে নিয়ে যায় সংস্কারের পথে। শিবের গাজনই হ'লো 'গম্ভীরা' গানের প্রধান উৎস। আধুনিককালের লোকগীতিকারদের হাতে প'ড়ে গানের সেই প্রাচীন রূপটি অনেকখানি বদলে গেলেও, মূল শিবস্তুতি এখনও সব গানের প্রধান অঙ্গ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন দেশের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যাপারের দুর্নীতি ও অন্যায়কে শ্লেষ ক'রেই 'গম্ভীরা'-গান রচিত হয়। এই সব গান অনেক ক্ষেত্রে আবার কবিগানের মতো মুখে-মুখেও রচিত হয়ে থাকে। 'গম্ভীরা' গান প্রধানত দু'রকমের— 'স্বদেশী' ও 'আলকাপ্'। চারণকবি মুকুন্দদাসের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক গানের মতোই একসঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে চলে 'স্বদেশী-গম্ভীরা'। আর, গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলন 'আলকাপ্-গম্ভীরা'-র।

উপসংহার

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে মালদহ-জেলায় যে-সব উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে, তাতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের কৃষি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, কুটীরশিল্প প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটলেও, এই জেলার কল্যাণশ্রী ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আরও অনেক উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। বিশেষ ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটলে এই জেলার সম্পদ যেমন বাড়বে, স্থানীয় অধিবাসীদেরও তেমনি আর্থিক জীবনে সচ্ছলতা আসবে। মালদহ-জেলার বিভিন্ন পুরাকীর্তি সু-সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। কারণ, ঐতিহাসিক এইসব স্মৃতিচিহ্নই বাঙালী জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাক্ষী।

পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পকেন্দ্র

ভারতবর্ষ আজ যে শিল্পসমৃদ্ধির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তার সূচনা হয় উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। কিন্তু, কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সেই প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়নি। বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা

মতো দেশের এখানে-ওখানে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা গ'ড়ে তুলেছেন। তারই ফলে কলকাতার আশেপাশে দেখা দিয়েছে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের কল-কারখানা; বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে গ'ড়ে উঠেছে কাপড়-তৈরির বড় বড় মিল, কানপুর-এলাকায় স্থাপিত হয়েছে তেলের কারখানা, জামসেদপুর পরিণত হয়েছে ইস্পাত-নগরীতে। ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণের ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় বিংশ-শতাব্দীতে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থনীতিক প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ। কিন্তু, দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ ক'রে তোলবার যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ইংরেজ-রাজত্বে তার অভাব ছিল। সুখের কথা এই যে, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে, দেশের জাতীয়-সরকার বিভিন্ন রাজ্যে নানাশ্রেণীর বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-সংস্থা স্থাপন ক'রে সমগ্র দেশের আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করবার কাজে দৃঢ়সংকল্প। শিল্প-সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে দেশের জাতীয় আয় যেমন বৃদ্ধি পায়, দেশবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগও তেমনি সম্প্রসারিত হয়।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চল বলতে এতকাল কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, খড়গপুরকেই বোঝাত। চা-শিল্পের দিক থেকে অবশ্য দার্জিলিং-জলপাইগুড়িকেও শিল্পাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কলকাতা-হাওড়ার শিল্পাঞ্চল যেমন প্রধান পাটশিল্পকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, আসানসোলের শিল্পাঞ্চল তেমনি কয়লা আর লৌহশিল্পের জন্য বিখ্যাত। আর খড়গপুরে শিল্পাঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটেছে রেলগাড়ির যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতি-কাজকে কেন্দ্র ক'রে। আর যে-সব শিল্পকে অবলম্বন ক'রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা কর্মমুখর হয়ে উঠেছে তার মধ্যে রয়েছে কাগজ, দিয়াশলাই, চিনি, কাচ, চীনেমাটি, ভেষজদ্রব্য, প্রসাধনদ্রব্য, বাস্তুবিত্যার যন্ত্রপাতি, কাপড়, তেল, গোলাবারুদ, সাইকেল, মোটরগাড়ি, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি। ভারত-সরকারের উদ্যোগে সাম্প্রতিককালে আসানসোলের নিকটবর্তী চিত্তরঞ্জনে স্থাপিত হয়েছে রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের বিরাট কারখানা, চিত্তরঞ্জনের নিকটবর্তী রূপনারায়ণপুরে সম্প্রসারিত হয়েছে টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার তৈরির ফ্যাক্টরি, আর আসানসোলের নিকটবর্তী দুর্গাপুরে আজ গ'ড়ে উঠছে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাতশিল্প-কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সম্প্রসারণের যে-ভূমিকা আজ দুর্গাপুর গ্রহণ করেছে তা যেদিন সফলতায় মণ্ডিত হবে, সেদিন আর দুর্গাপুরকে অতীতের পটভূমিকায় চেনা যাবে না; বর্ধমান-জেলার এক অপরিচিত ও অবহেলিত জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী-অঞ্চল দুর্গাপুর সেদিন শিল্পমহানগরীর বর্ণোজ্জ্বল রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে সকলের দৃষ্টিসম্মুখে। দুর্গাপুরকে শিল্পাঞ্চলে পরিণত করবার মূলে রয়েছে এই জায়গার অনেকগুলি সুবিধা। প্রথমতঃ, ইস্পাত-শিল্পের জন্য যে-সব কাচামাল প্রয়োজন সে-সবই রয়েছে এই জায়গার আশেপাশে,—বিশেষত আসানসোল-অঞ্চলের কয়লা-খনিগুলি বিহারের লৌহখনি ও চুনাপাথর দুর্গাপুর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দ্বিতীয়ত, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক

রোড্ ও ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রধান রেলপথ চ'লে গিয়েছে এই জায়গার কোল ঘেঁষে। দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার অন্তর্গত দুর্গাপুর সেতু-বাঁধটিও এখানে অবস্থিত। তার ফলে, মাল-সরবরাহ ও লোক-চলাচলেরও রয়েছে বিশেষ সুবিধা। এই সব কারণে, ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য-সরকার দুর্গাপুরকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের পরিকল্পিত কয়েকটি শিল্প-সংস্থা স্থাপনের জন্য। কেন্দ্রীয়-সরকারের উদ্যোগে ইস্পাত-কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই দুর্গাপুরে রাজ্য-সরকার-পরিচালিত একটি 'কোক-ওভেন প্ল্যাণ্ট' বা কোকচুল্লি স্থাপিত হয়। সেই কোকচুল্লিতে একদিকে যেমন কোক-কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে, তেমনি সেই কয়লার কার্বন-ক্রিয়া-সঞ্জাত যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে অদূর-ভবিষ্যতে তা সুবিস্তৃত পাইপের সাহায্যে কলকাতায় আনা হবে। সেই গ্যাস পেলে কলকাতার বাসিন্দারা কম খরচে তা গৃহস্থালীর কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া, ছোট ছোট কল-কারখানার ও অফিসবাড়ির কাজেও এই গ্যাস সুবিধাজনক হবে। কয়লার উনুনের পরিবর্তে এই গ্যাস ব্যবহার করতে পারলে শহরবাসীরা একদিকে যেমন নানা ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবেন, অন্যদিকে তেমনি অস্বস্তিকর ধোঁয়ার হাত থেকেও রক্ষা পাবেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার-পরিচালিত দুর্গাপুরের কোকচুল্লি-কারখানায় উপজাত শিল্পদ্রব্য হিসাবে আর যে-সব জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে আলকাতরা, ন্যাপথলিন, বেঞ্জিন, টোলিটিন, জাইলিন প্রভৃতি। তাছাড়া, কৃষিকাজের একটি মূল্যবান সার অর্থাৎ সালফেট অব্ অ্যামোনিয়াও উৎপাদিত হচ্ছে এই কারখানাতে। কিন্তু, বহুমুখী এই শিল্পকারখানাকে বিরাটত্বের দিক থেকে ম্লান ক'রে দিয়েছে, ভারত-সরকার পরিচালিত দেশের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত-কারখানাটি। ১৯৫৬-সালের প্রথম দিকে যখন হাজার হাজার শ্রমিক দশকোটি ঘনফুট মাটি কেটে ও সমান ক'রে সেই কারখানা স্থাপনের জন্য জমি তৈরি করছিল সেদিন হয়তো স্থানীয় অধিবাসীরা কল্পনাও করতে পারেননি যে, দুর্গাপুরের কী বিরাট পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে; সেদিন কে জানত যে, মাত্র চার বছরের মধ্যেই নিবিড় জঙ্গল ও অসমতল শস্যক্ষেত্রে ভরা দুর্গাপুরের সেই বিস্তীর্ণ ভূমি শিল্পবৈভবে গরীয়ান হয়ে উঠবে। ইস্পাত-কারখানার ভিত্তি রচনার জন্য গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে, কত-না বাস্তু-ভিটে ত্যাগ ক'রে গিয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ, প্রাণের চেয়েও প্রিয় ক্ষেত-খামারের মায়া কাটিয়েছে কৃষকেরা। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সেদিন ইস্পাত-শিল্প-কারখানার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ইস্পাত-নগরীর আদি ইতিহাসে তার মূল্য অনেকখানি। গ্রামবাসীদের মনে সেদিন এই ভরসা ও সান্ত্বনা ছিল যে, একদিন দুর্গাপুর-শিল্পকেন্দ্রই আনবে স্থানীয় অঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে নতুন ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা, যার ফলে শুধু তারাই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীই হবে উপকৃত। পারস্পরিক সেই সহযোগিতার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন গ্রাম আজ বিরাট এক শিল্প-কেন্দ্রের রূপ নিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে।

দুর্গাপুরের পরিচয়, কোকচুল্লি, ইস্পাত-কারখানা স্থাপন

'দুর্গাপুর স্টীল-প্রোজেক্ট' বা 'দুর্গাপুরের ইস্পাতশিল্প-পরিকল্পনা'টিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন তেরটি বিখ্যাত ব্রিটিশ-কোম্পানির সমবায়ে গঠিত 'ইস্কন' বা 'ইণ্ডিয়ান স্টীল কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানি অব্‌ ব্রিটেন।' একশ' আটত্রিশ কোটি টাকার এই ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন যে এটি ভারতের নব-উন্মেষিত শিল্প-ঐতিহ্যে ব্রিটিশ অবদানের সাক্ষ্য বহন করবে তা বলাই বাহুল্য। দুর্গাপুরের এই ইস্পাত-কারখানার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে; এখন চলছে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ, যে কাজ শেষ হবে ১৯৬১ সালে। আর, চতুর্থ পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ইস্পাত-কারখানাটি যেদিন পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে, 'ইস্কন'-এর নির্মাণকাজও সাঙ্গ হবে সেদিন। ভারতীয় পরিচালকদের হাতে কারখানাটিকে তুলে দিয়ে সেদিন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা বিদায় নেবেন বন্ধুর মতোই। ১৯৫৯-সালের নভেম্বর মাসে দুর্গাপুর ইস্পাত-কারখানার একনম্বর কোকচুল্লিটি প্রজ্বলিত হবার পর, প্রথম লৌহপিণ্ড উৎপাদিত হয় এখানে। এই কোকচুল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তারপর থেকেই কারখানার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম চুল্লিটি থেকে এখন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় তের হাজার টন লৌহপিণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ইস্পাত তৈরির ব্যবস্থা যতদিন না সম্পূর্ণ হয় ততদিন এইসব লৌহপিণ্ড যাতে না অব্যবহৃত থাকে সেজন্য কিছু কিছু লৌহ বাইরের কারখানায়, কিছু কিছু দেশের অন্যান্য ইস্পাত-তৈরির কারখানায় বিক্রি করারও ব্যবস্থা হয়েছে। আর, কিছু অংশ রপ্তানি করা হয় বিদেশে। এই কোকচুল্লির সঙ্গেই রয়েছে অন্যান্য উপজাত-শিল্পের কারখানা। সেগুলিতেও কাজ চলছে আংশিকভাবে। আপাতত, অ্যামোনিয়া সালফেট ও পিচ সিরোসোট উৎপাদন করা হচ্ছে এই কারখানায়। তাছাড়া, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্‌ উৎপাদনের কারখানাটিও চালু হয়েছে ইতিমধ্যে। উৎপাদিত সেই অ্যাসিডের বিক্রয়ও শুরু হয়েছে বাইরের ক্রেতাদের কাছে। এই রকম আরও কয়েকটি কোকচুল্লি ও উপজাতশিল্পের কারখানা নিয়ে যেদিন পরিকল্পনা মতো পূর্ণোদ্যমে কাজ চলবে, সেদিন থেকেই এই শিল্পকেন্দ্রের গুরুত্ব সকলে বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারবেন। দুর্গাপুরের এই শিল্পকেন্দ্রে ইতিমধ্যেই যে কয়লা-ধোতাগারটি স্থাপিত হয়েছে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে তার গুরুত্বও অনেকখানি। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে-সব কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ইস্পাত-উৎপাদনের কারখানা ও অন্যান্য সহযোগী কারখানা। ব্যাপকভাবে ইস্পাত-উৎপাদনের যে বিভিন্ন পর্যায় আছে সেগুলি সম্পূর্ণ হ'তে আরও কিছুদিন হয়তো সময় লাগবে। কিন্তু, ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে যেদিন এখানে প্রথম ইস্পাত উৎপাদিত হ'লো, সেদিনকার কর্মসাফল্যে উদ্দীপ্ত অসংখ্য শিল্প-শ্রমিকদের মনে এই আশাই জেগেছিল যে, সম্পূর্ণতার দিন আর বেশী দূরে নয়। দুর্গাপুর নির্মাণকার্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপিত রোলিং-মিলের সংলগ্ন জায়গাটিতে যে স্লিপার-নির্মাণযন্ত্র বসানো

ইস্পাত কারখানার পরিচয় ও তার ভবিষ্যৎ

হয়েছে তা থেকে প্রতি বছর প্রায় ষাট হাজার টন ওজনের ইস্পাত-স্লিপার তৈরি হবে, যে-স্লিপার ভারতের রেলপথের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে ১৯৬১-সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই এই কারখানায় একই সঙ্গে লৌহপিণ্ড ও ইস্পাত তৈরির কাজ চলে পুরোদমে, আর সেই সঙ্গেই সম্প্রসারিত হয় কারখানার অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগ। চতুর্থ পর্যায়ের কাজের মধ্যে প্রধানত রেলওয়ে হুইল ও অ্যাক্সেল কারখানা সম্পূর্ণ করবার দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে যেদিন 'দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট' পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সেদিন ভারতের শিল্প-ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পকেন্দ্রটি সেদিন নতুন করে ভারতের সমৃদ্ধি রচনা করবে।

দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্রে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা

দুর্গাপুরের শিল্পকেন্দ্রটি আজ কর্মমুখর। কর্মসংস্থানের যে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা এখানে রয়েছে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা সমাধানে তা বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কর্ম-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবারও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই যে অসংখ্য কর্মী বিভিন্ন শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে একদিকে যেমন আছে অদক্ষ শিল্প-শ্রমিক, তেমনি আছে দক্ষ শ্রমজীবী, ও বিশেষজ্ঞ কর্মীরা। কায়িক শ্রমিক থেকে শুরু ক'রে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, অর্গানাইজার, কেরানী, অফিসার, ইস্পাত-কারখানায় কাজ ক'রে চলেছেন। হাজার হাজার ভারতীয় যুবক আজ দুর্গাপুরের শিল্পকেন্দ্রে এসে নতুন জীবন আরম্ভ করেছেন। প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ক'রে শিক্ষানবিস হিসাবে এইসব তরুণ কর্মী হাতেকলমে জরিপের কাজে নামেন, তারপর অভিজ্ঞতালাভ ক'রে বিভিন্ন স্থায়ী কাজে নিযুক্ত হবার সুযোগ পান তাঁরা। তাঁদের পারিশ্রমিকও বেড়ে যায় তাঁদের পারদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে। 'ইস্কন'-কোম্পানি অসংখ্য ভারতীয় যুবককে কারিগরী শিক্ষায় নিপুণ ক'রে তুলতেও নানাভাবে সাহায্য করছেন। অনেক তরুণ শিক্ষানবিসকে আবার বিলেতের ইস্পাত-কারখানাগুলিতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যও পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু, একটা প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই উঠেছে যে, যে-সব কর্মী দুর্গাপুর-শিল্পকেন্দ্রে কাজ পাচ্ছেন তাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম কেন? বাঙালীর মধ্যে কি কর্মদক্ষ লোকের অভাব? না, কর্ম-নিযুক্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষমহলে একটা পক্ষপাতিত্বের মনোভাব আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ, কর্মপ্রার্থীদের বক্তব্য যেরকম, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষমহলের উত্তর তার বিপরীত। কায়িক পরিশ্রমে বাঙালী তরুণদের যে একটা সহজাত ঔদাসীন্য আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁদের এই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে যদি তাঁদের জায়গায় অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা এসে কাজ নেন, তাহ'লে সে দোষটা কার? তবে যে-সব কাজে বাঙালীর দক্ষতা আছে, যে-সব কাজে তাঁদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ, যে-রাজ্যে যে

শিল্প-সংস্থা গ'ড়ে ওঠে, তাতে যদি স্থানীয় লোকেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া যায় তাহ'লে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেও বাঙালী কর্মপ্রার্থীরা যাতে কর্মে নিযুক্ত হবার অগ্রাধিকার লাভ করেন, সেদিকেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত। তাছাড়া, দুর্গাপুরের এই শিল্পকেন্দ্রে বাঙালীদের বিভিন্ন ব্যবসায় যাতে সম্প্রসারিত হয়, সেদিকেও বাঙালী ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কারণ, তা না হ'লে, তাঁদেরই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তাঁদের কারবারের ভিত সুদৃঢ় ক'রে তুলবেন, তখন প্রাদেশিকতার ডিগির তুলে আন্দোলন করবার না থাকবে কোনো যুক্তি, না থাকবে কোনো সার্থকতা।

দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কর্মনিরত অসংখ্য কর্মী ও পরিচালকদের বাসস্থান-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট নগরীর রূপ ধারণ করছে দুর্গাপুর। সারি সারি অসংখ্য বাসভবন, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহের আধুনিক

উপসংহার

ব্যবস্থা, প্রশস্ত সড়ক, খেলাধূলার মাঠ ও পার্ক, চিকিৎসালয়, শিক্ষানিকেতন, যানবাহন, দোকানপাট, হাটবাজার, ডাকঘর—এক কথায় নগর-জীবনের অত্যাবশ্যক সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণতালাভ করছে ক্রমশ। আশা করা যায়, এইভাবেই একদিন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুর ভারতের অবশ্য-দ্রষ্টব্য অন্যতম শিল্পনগরীতে পরিণত হয়ে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হ'লো কল্যাণরাষ্ট্র গ'ড়ে তোলা। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পায়। জাতিধর্ম ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যদি দেশের

ভূমিকা

সকল মানুষ এই আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করতে পারে তবেই একদিন লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছান সম্ভব হবে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' গ'ড়ে তোলার যে স্বপ্ন অনেকে দেখেন, সে-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোলা খুব যে অসম্ভব, তা নয়। কারণ, আমাদের চোখের সামনেই পৃথিবীর কয়েকটি দেশ নিজেদের পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে সেইরকম সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ-ব্যাপারে একদিকে যেমন চাই সুপরিকল্পিত অর্থনীতি, অন্যদিকে তেমনি চাই দেশাত্মবোধ। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' বলতে বোঝায় দেশবাসীর উপার্জন ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতাবিধান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেই আমরা চাই এই আর্থিক সমতাবিধানের সংকল্পকে সফল ক'রে তুলতে। অনেকের মতে হয়তো তা সম্ভব নয়; কারণ, যে-সব

দেশে তা সম্ভব হয়েছে সে-সব দেশে গণতান্ত্রিকতার পথ ধ'রে সে-আর্থিক সমতা আসেনি, এসেছে রাষ্ট্রশক্তির চাপে কিংবা অন্যভাবে। কিন্তু, ভারতবর্ষ কোনোমতেই তার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ ক্ষুণ্ণ করতে সম্মত নয়। যাঁরা ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতি, অথবা বৃত্তিজীবী, তাঁরা যাতে ব্যক্তিগত লাভের ঊর্ধ্বে ব্যষ্টি ও সমাজের লাভকে স্থান দেন সেইরকম কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করাই এখন বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে দেশের লভ্য সম্পদ্ সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ ক'রে দেশকে অতি দ্রুত শিল্প-রূপায়ণের পথে অগ্রসর করা। সর্বাঙ্গীণ জনকল্যাণের এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতেই প্রয়োজন হয়েছে পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাগুলির। ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গও ইতিমধ্যে দু'টি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে কাজ ক'রে সুফল লাভ করেছে, অর্থাৎ কল্যাণের পথেই হয়েছে তার অগ্রগতি।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচি

সর্বভারতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কর্মসূচি রচিত হয়। সেই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয়-জীবনের মান-উন্নয়ন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থিক সমতা-বিধান। প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৫১-সালের এপ্রিল মাস থেকে এবং সেই কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫৬-সালের ৩১-এ মার্চ। প্রথম এই পরিকল্পনার কর্মসূচিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন তথা খাদ্যশস্য-বৃদ্ধির উপর। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাকেও কার্যকরী ক'রে তোলার ব্যবস্থা হয়। কারণ, কৃষির সঙ্গে সেচব্যবস্থার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল। সময়সূচি অনুযায়ী সে-কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৬১-সালের ৩১-এ মার্চ। দ্বিতীয় এই পাঁচ বছরের কর্মসূচিতে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় শিল্প-সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থাপনের উপর। কারণ, শুধু খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য থাকলেই চলে না, দেশের আর্থনীতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। আর, সেই কারণে শিল্পের প্রসার যেমন চাই, তেমনি চাই বেকার লোকদের দেশের বিভিন্ন কর্মসংস্থায় নিয়োগের ব্যবস্থা। শিল্পের প্রসার হ'লেই কর্মহীন মানুষদের কর্মসংস্থানের পথও হয় সুগম ও সুপ্রশস্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয় ৭২·২৫ কোটি টাকা; তার মধ্যে কেন্দ্রীয়-সরকার দিয়েছিলেন ৩০·৬০ কোটি টাকা এবং বাকী টাকা সংগ্রহ করেন রাজ্যসরকার। সমগ্র আর্থিক বরাদ্দের শতকরা ৩৮·৫০ অংশই ব্যয়িত হয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনের কাজে। বাকী টাকা খরচ হয় শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং সমাজসেবার বিভিন্ন কাজে। সমাজসেবার কর্মসূচির মধ্যেই ছিল চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার, আদিবাসী-কল্যাণ, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয় ১৫৩·৭০ কোটি টাকা। এই টাকার বৃহত্তম অংশ ব্যয়িত হয়েছে শিল্প-

সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের কাজে। কৃষি, সেচ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, বাসগৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কাজে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে সবক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত না হ'লেও প্রচুর।

বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণে সাফল্যের রূপ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা-কালে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সেই গুরুত্বের যে কিছু হানি হয়েছে এ-কথা বলা চলে না। কারণ, সামগ্রিকভাবে বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, বিগত এই দশবছরে দেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতি-পূরণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা হিসাবে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই ঝোঁকটা ছিল অল্পবিস্তর সমান। ১৯৫৭-৫৮ সালের বৃষ্টির স্বল্পতা ও ১৯৫৯-সালের বন্যায় দেশে যে-রকম খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যায়, সে-ঘাটতি পূরণের উপায় হিসাবে খাদ্যশস্য-বৃদ্ধির ব্যবস্থা না ক'রে কোনো উপায় ছিল না। সুখের কথা এই যে, খাদ্যশস্য-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন অনেকটা আত্মনির্ভর। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির আয়তন সীমাবদ্ধ ব'লে এখনও আভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, দৈবদুর্বিপাকে শস্যহানি তো আছেই। কিন্তু, এ-সব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে গত দশবছরে কৃষিবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় এখন এদেশের জমিতে ফসল ফলছে অনেক বেশী পরিমাণে এবং বহুরকম-পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কৃষিব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে আশাপ্রদ। গ্রামের কৃষকদের মধ্যে উন্নতজাতের বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করায় শস্যোৎপাদনে তাদের পরিশ্রম হয়েছে সার্থক। উন্নতধরনের কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য একমাত্র ১৯৫৯-সালেই এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এক হাজার প্রদর্শন-খামার খোলা হয়। তাছাড়া অনেক জায়গায় বীজ-খামার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকেরা আগেকার চেয়ে এখন অনেক বেশী সুবিধা পাচ্ছে। ২৪-পরগনা জেলার সোনারপুর-আড়পাঁচ অঞ্চলে যেভাবে তেইশ হাজার একর জলমগ্ন ভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে তাতে ফসল ফলানো হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা কৃষিব্যবস্থার উন্নতির পরিচায়ক। ময়ূরাক্ষী সেচ-পরিকল্পনার ফলে শস্যের যে অতিরিক্ত ফলন হয়েছে তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, এই পরিকল্পনার ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কৃষিজমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতি একরে প্রায় তের মণ পঁচিশ সের ক'রে অতিরিক্ত ধান ফলেছে। তাছাড়া দোফসলী জমিতে শীতকালে গম, আলু আর সরষের চাষও বাড়ানো গেছে সেচের সুবিধা পাওয়ায়। দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনার সাহায্যেও পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের কৃষকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর মতো কংসাবতী-নদীতেও যে-বহুমুখী-নদীবাঁধ-পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টা চলেছে তা সফল হ'লে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় খারিপ-শস্যের আট লক্ষ একর জমিতে এবং রবিশস্যের দেড়লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, গত দশ বছরে যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তোলা হয়েছে

তার সুফলও লাভ করেছে এই রাজ্যের কৃষকসম্প্রদায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচির সাহায্যে অন্যান্য যে-সব ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি; (২) পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৩) কল্যাণী উপনগর স্থাপন, বাসগৃহ-সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্ন ও মধ্য আয়ভোগীদের ঋণদান ও শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ; (৪) জলনিকাশ ক'রে পতিত-জমির পুনরুদ্ধার; (৫) বনসম্প্রসারণ ও বনসম্পদ-বৃদ্ধির উদ্যোগ; (৬) পল্লী ও শহর অঞ্চলে শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, সামাজিক-শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন; (৭) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ, পল্লী-এলাকায় চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার; (৮) হরিণঘাটা দুগ্ধ-উপনিবেশের সম্প্রসারণ; (৯) পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তন; (১০) সমবায়-সমিতিগুলির ব্যাপক উন্নতিসাধন; (১১) কুটিরশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা, (১২) উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন-সমস্যার আংশিক সমাধান; (১৩) দুর্গাপুরে কোকচুল্লি স্থাপন ক'রে কোক-কয়লা ও গ্যাসের উৎপাদন-প্রচেষ্টা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন উপজাত-শিল্পের প্রচলন; এবং (১৪) সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লী-এলাকার বহুমুখী উন্নতিসাধন। বর্ধমানে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণীতে একটি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ক'রে রাজ্যসরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিসুলভ মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবির পৈতৃক বাসভবনে 'টেগোর ইউনিভার্সিটি' নামে যে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তার সুফলও দেশের লোক ভোগ করবে একদিন। পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হ'লেও, বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কর্মহীন ব্যক্তির যে কর্মসংস্থাপনের সুযোগ-সুবিধা ঘটেছে তাও অস্বীকার করা যায় না। চিত্তরঞ্জন-রেলখানায়, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ-সংস্থায় এবং দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্রে গত কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক হাজার বাঙালী যুবকের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা

এই সকল উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও যখন দেখি আর্থনীতিক সংকটের কালো ছায়া দেশের আকাশ থেকে অপসারিত হয়নি, দুঃখ, দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্যের অভিশাপে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত জনসাধারণ নিপীড়িত, আশাবাদী মন তখন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দেশের খাদ্যশস্য-উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাজার-দর কেন কমে না, শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ সত্ত্বেও দেশের ছাত্র-সমাজের অধীত বিদ্যার মান কেন অবনতির দিকে যায় এবং ছাত্র-সমাজে দেখা যায় একটা ক্রম-বর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতার মনোভাব, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রেও কেন আজ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি, কিংবা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কেন সাধারণ লোকের সচ্ছলতা আসছে না—এসব প্রশ্ন স্বভাবতই মনে মনে জাগতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা কী কী এবং দূর করবার উপায়ই বা কী, সে বিষয়ে আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই গভীর

ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসংস্থায় অসংখ্য অবাঙালী কর্মে নিযুক্ত থাকায় বাঙালীদের কর্মসংকুলানে ব্যাঘাত ঘটছে ও এই রাজ্যের অর্থ অন্য রাজ্যে চ'লে যাচ্ছে ব'লেও একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও কি বাঙালীরা বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত নেই? মূল গলদগুলিকে এড়িয়ে যদি আমরা এইভাবে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোভাবে আচ্ছন্ন হই, তাহ'লে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পদে পদেই যে বিড়ম্বিত হব সে-কথা চিন্তা ক'রেও দেখি না। এর উপরে রাজনীতিক বাগ্‌জালে বিভ্রান্ত হয়ে যদি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ক'রেই চলি, তাহ'লে আমাদের লক্ষ্যপথে পৌঁছান কখনও সম্ভব হবে না। দেশের সকল স্তরের মানুষ যদি আজ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পারস্পরিক নিন্দাবাদ ও দলাদলি বিসর্জন দিয়ে পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়েও পশ্চিমবঙ্গ একদিন তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেই।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নতি বা অগ্রগতি হয়েছে তাকে আজ সামগ্রিক ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা, ব্যক্তিগত

উপসংহার

জীবনে সেই উন্নতির প্রভাব সব ক্ষেত্রে অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু, এমন দিনও আসবে যখন দেশের প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারবে। সামনেই রয়েছে আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বৃহত্তর কর্মসূচি—সেই কর্মসূচিকে সফল ক'রে তোলার চেষ্টাই হবে এখন আমাদের প্রধান জাতীয় কর্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ

প্রাচীন ভারতে মানুষের বসতি ছিল অরণ্য-পরিবেশ। বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত তপোবনভূমিতেই ভারতীয় সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সেই

ভূমিকা

সঙ্গে সভ্যতার বিবর্তনে এদেশের মানুষ অরণ্য-পরিবেশকে মনে করলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাকে অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান ক'রে মানুষ চ'লে এল তরুহীন উষরতার মধ্যে, নতুন নতুন উপনিবেশ রচনা করলে বনাঞ্চল নষ্ট ক'রে। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এইভাবে নগর-সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে, অরণ্য-জীবনের স্নেহাশীর্বাদকে অভিশাপ মনে ক'রে মানুষ যদৃচ্ছভাবে বনভূমির মূলোচ্ছেদ করেছে। অথচ, যে-কোনো দেশের পক্ষেই যে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বনভূমি থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয় আধুনিক জগতের মানুষ সেই সত্যকে যেন স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়েছিল। আজ তার সে-ভুল ভেঙেছে, মানুষ আজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বুঝতে পেয়েছে যে, বনসম্পদহীনতা, কিংবা বনসম্পদের অপ্রতুলতা, দেশের

উপর কিরূপ মারাত্মক প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্ম-প্রধান ও কৃষিনির্ভর দেশে বনসম্পদ যে অপরিহার্য সম্পদ সে-সত্যকে এতদিন পরে যেন আমরা নতুন ক'রে উপলব্ধি করছি। ১৯৫০ সাল থেকে তাই সারা ভারতে চলেছে বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান, যে-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ আজ সচেতন হ'য়ে উঠছে বৃক্ষরাজি ও অরণ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ সৃজনী ভূমিকা সম্পর্কে।

জাতীয় জীবনে বনসম্পদের গুরুত্ব

জাতীয় জীবনে বনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী। যে-দেশে বন নেই, সে-দেশে মানুষ বাস করতে পারে না। বৃক্ষলতাহীন বা বালুকাময় মরুভূমি মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী যেমন দেশের প্রয়োজনীয় অঙ্গ, বনও তেমনি। যে-দেশে পর্যাপ্ত বন আছে সে-দেশের মাটিও হয় সরস ও উর্বরা। কারণ, গাছের শিকড়, লতাগুল্ম, মাটির নিচেকার কীট-পতঙ্গাদির ছোট ছোট বাসস্থান, মাটির উপরকার পচা বা আধপচা ঝরাপাতার স্তর বৃষ্টির জলকে শুষে সঞ্চয় ক'রে রাখে। এই সঞ্চিত জলকণাই সারা বছর ধ'রে মাটির নিচে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, নদী-নালায় চলেছে প্রবাহিত হ'য়ে। বনের এই পরোক্ষ দানেই দেশের মাটি হয় নরম, আবহাওয়া হয় শীতল, প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা দেয় নয়নাভিরাম একটা শ্যামলিমা। ভূমির ক্ষয়-নিবারণে এবং বন্যা প্রতিরোধেও বনের অপ্রত্যক্ষ শক্তিও বিস্ময়কর। আর, প্রত্যক্ষভাবে বন থেকে আমরা পাই ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানির কাঠ, তাছাড়া ব্যবহারিক জীবনের আরও কত অমূল্য সম্পদ, যেমন—কাগজ-তৈরির বাঁশ, দিয়াশলাই তৈরির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, প্লাইউড্, রবার, তারপিন তেল, মধু, ধূপ, গঁদ, রজন, লাক্ষা, বিড়ি-তৈরির পাতা, ওষুধ-তৈরির অত্যাবশ্যক বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম-শিকড় প্রভৃতি। তাছাড়া, বনের পশুপাখি ও ফলমূল—সেও তো জীবজগতের অমূল্য সম্পদ্। জাতীয় জীবনে বনসম্পদের গুরুত্ব যে কতখানি এসব থেকেই তা বোঝা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির পরিচয় ও বনজাত-দ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ-সম্পর্কিত আলোচনার পটভূমিকায় সমগ্র ভারতের বন-সম্পদের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় লাভ করাও আমাদের প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের মোট ভূ-ভাগের মাত্র ২২·৩ শতাংশ বনাঞ্চল। আর, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৩৬ কোটি ২০ লক্ষের ভিত্তিতে জনপ্রতি গড়ে বনের আয়তন হ'লো ০·৫ একরের মতো। অর্থাৎ, প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির অপ্রতুলতা রয়েছে গোটা দেশ জুড়েই। ১৯৬১-সালের লোকগণনায় দেখা গেল যে, দেশের লোকসংখ্যা আরও প্রায় সাত কোটির মতো বেড়েছে। কাজেই, সেই বর্ধিত লোকসংখ্যার তুলনায় দেশের বনভূমির আয়তনের পরিমাপ যে আরও কমে গেল সে-কথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গও বন ও বনজাত দ্রব্যসম্ভারে একটি ঘাটতি এলাকা। এই রাজ্যের আয়তন যেখানে ৩৩,১৭৭ বর্গমাইল, সেখানে তার বনাঞ্চলের আয়তন হ'লো মাত্র ৪,৪০০ বর্গমাইল; অর্থাৎ রাজ্যের মোট আয়তনের ১৩·৪ শতাংশ। আর, বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে

মাথাপিছু গড়ে বনের আয়তন হ'লো ০'০৬ একর। আঞ্চলিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বনভূমিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(১) উত্তরাঞ্চলিক, (২) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলিক, ও (৩) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিক বনভূমি। সবচেয়ে মূল্যবান বনাঞ্চল বলতে উত্তরাঞ্চলিক বনগুলিকেই বোঝায়। এ-সব বন ছড়িয়ে রয়েছে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, ও কোচবিহার জেলার বিভিন্নাংশে। বড় বড় ও মূল্যবান শালগাছ প্রচুর জন্মায় উত্তরাঞ্চলের এই সব বনে। এই শালগাছের কাঠ যেমন শক্ত, তেমনি মজবুত। রেলপথের স্লিপার ও ঘরবাড়ি-তৈরির কাজে এই শালকাঠ বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর্থিক দিক থেকে মূল্যবান আর যে-সব গাছ উত্তরাঞ্চলের সমতল-বনভূমিতে মেলে, তা হ'লো জারুল, চিলুনি, শিশু, খয়ের, কাঁইজল, দেবদারু. মালাগিরি প্রভৃতি। আর পার্বত্য-বনভূমিতে দেখা যায় ওআলনাট, বার্চ, মেপল্ প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের গাছ। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলিক বনভূমি বলতে ধরা হয় মালদহ ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বন। এ-সব বনের বেশির ভাগই আম, জাম, কাঁঠালের বন। কিন্তু, বিস্তৃতি ও আর্থিক দিক থেকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার এই সব বন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর্থিক দিক থেকে যতটা না হোক্ আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিক বনাঞ্চল কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪,৫০০ বর্গমাইল পরিমিত বন-এলাকার ৭৬ ভাগই অধিকার ক'রে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিক বা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার বন। কিন্তু, এই সব জেলার বন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুন্নত। এ-সব বন থেকে সাধারণত জ্বালানি, গোলপাতা, বিড়িপাতা, মধু প্রভৃতি ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বনজাত দ্রব্য আর কিছু পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান তিনটি বনাঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য বার্ষিক বনজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়—৭২,১৪,০০০ ঘনফুট কাঠ; ৪,৪৫,০০০ টন জ্বালানি; ৪,০০০ টন কাঠ-কয়লা; ৬,০০০ মণ মধু ও ১,০০০ মণ মোম।

পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির অপ্রতুলতা আজ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যায়ভাবে জ্বালানি সংগ্রহ ও অসঙ্গতভাবে চাষ-আবাদের জন্য দার্জিলিঙ জেলার পার্বত্য-অঞ্চলের অনেক বন নষ্ট হয়েছে। আর তারই ফলে সেখানে মাঝে মাঝেই ভূমিক্ষরণ হয়, পাহাড়ে ধ্বস নামে; যার ফলে পথঘাট, বাড়িঘর বিনষ্ট হয়, যানবাহন-চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি প্রাণহানির সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যায়। শুধু যে এতেই বিপদ কেটে যায় তা নয়, বিপদ আসে অন্য পথ দিয়ে, নতুন রূপ ধ'রে। গাছপালা উৎপাটিত হ'লে শুধু মাটির পক্ষে সম্ভব নয় বর্ষার জলধারাকে অন্তরে সঞ্চয় ক'রে রাখা, তখন বর্ষার জল পার্বত্য-পথ বেয়ে সবেগে নেমে আসে সমতলভূমির দিকে, ক্ষীণকায়া নদীগুলিকে স্ফীত ক'রে প্লাবনের বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এই কারণেই উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে আজকাল প্রায়ই বন্যা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলেও বনভূমির স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে আজকাল প্রায়ই সুন্দরবন-এলাকায় বন্যার দরুন প্রচুর শস্যহানি ঘটে। বন্যা-প্রতিরোধে ঘন-বনভূমির শক্তি অপরিসীম।

বনভূমির অপ্রতুলতা ও তার সমস্যা

অথচ, সে-শক্তি কাজে লাগছে না বনাঞ্চল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন। সুন্দরবনের যে-অংশ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে তাতে ১,৬০০ বর্গমাইলেরও কিছু বেশী বন আছে সত্য, কিন্তু আগে এই এলাকাতেই বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী বন ছিল, আর তার গভীরতাও ছিল অধিক। সে-সময় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়বৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ-ক্ষমতা দেখিয়েছে সুন্দরবন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবনের বহু এলাকা জঙ্গলমুক্ত ক'রে তাতে খাদ্য-শস্য-উৎপাদনের জন্য চাষ-আবাদ করায় তার সে প্রতিরোধ-শক্তি আজ অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, ঐ এলাকায় কৃষি ও কৃষকেরা আজ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। সমুদ্র-সৈকত যেখানে বিস্তৃত, সেখানে গাছপালা না থাকলে সমুদ্রের বাতাস আর এক সমস্যার সৃষ্টি করে। সমুদ্রের বাতাস সৈকতের বালিকণা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিরাট বিরাট বালিয়াড়ির সৃষ্টি করে এবং পরে সেই বালিয়াড়ির বালি উড়ে গিয়ে আরও ভিতরের দিকে বাড়িঘর ও জমিজমা আবৃত ক'রে ফেলে, ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ আরও বেড়ে যায়। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ এইভাবে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী বিপদের কারণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লাল-কাঁকুরে-মাটি এলাকায়,—অর্থাৎ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বিশেষ বিশেষ অংশে। ক্রমাগত ভূমিক্ষরণের ফলে সেখানকার জমির উর্বরতা-শক্তি যাচ্ছে কমে ; আর, অনাবৃষ্টির ফলে সব এলাকায় ভালো চাষ-আবাদও যেমন হচ্ছে না, তেমনি আবার অল্পবৃষ্টিতেই অগভীর নদীগুলি দুকূল ছাপিয়ে উঠে প্লাবনের সৃষ্টি করছে। দীর্ঘকাল ধ'রে বনজঙ্গলের উপর যদৃচ্ছা অত্যাচার ও অমনোযোগের ফলে রাঢ়-অঞ্চলে আজ এইসব সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য আজ যেমন বিভিন্ন সেচ-বাঁধের প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করছেন, তেমনি ক'রে যদি বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কথা ভাবতেন তাহ'লে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। শস্যোৎপাদনের অজুহাতে বেপরোয়াভাবে বনজঙ্গল পরিষ্কার করায় কৃষিজমি হয়তো পাওয়া গেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলের অভাবে সেগুলি আজ পরিত্যক্ত। কৃষির সঙ্গে জঙ্গলের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অরণ্য যে কৃষির সহায়ক, সেই সত্যকে ভুলে আমরা আজ নিজেদের কত ক্ষতিই না ক'রে বসেছি। এই ক্ষতি বিশেষ ক'রে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন জনপদ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের ফলে শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর বিভিন্নাংশের বনভূমির অপ্রতুলতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

বনভূমির স্বল্পতাজনিত বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে বিশ্ব-বনসংস্থা আজ পৃথিবীর সর্বত্র বনজঙ্গল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজে মনোযোগ দিয়েছেন। ভারত-সরকারও আজ বনজঙ্গল উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহশীল।

বনজঙ্গল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা

প্রথমত, সমুদ্রোপকূলবর্তী বনসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যক আয়তনের কৃত্রিম বন সৃজন ও সংরক্ষণের কাজ পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ক'রে তাকে কার্যকরী ক'রে তোলার

চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নাংশেও আজ সেই নীতি অনুসারে কাজ চলেছে। মেদিনীপুর জেলার জুনপুট ও দীঘার সমুদ্র-সৈকতে যেমন কৃত্রিম ঝাউবন সৃষ্টি করা হচ্ছে, রাঢ়-অঞ্চলের লাল-কাঁকুরে-মাটি এলাকাতেও তেমনি কৃত্রিম বন সৃজন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যাতে না কেউ বেপরোয়াভাবে গাছপালা কাটতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন রাজ্য-সরকার। উত্তরবঙ্গের ও সুন্দরবনের বনভূমি যাতে আরও প্রসার লাভ করে, বনসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ যাতে সমৃদ্ধ হয়—সেজন্য নানাভাবে আজ চেষ্টা চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমি পশ্চিমবঙ্গের অমূল্য সম্পদ। ভূমিরক্ষণ ও বন্যা-প্রতিরোধে বনভূমির অত্যাশ্চর্য শক্তির কথা চিন্তা ক'রে কৃষির উন্নতিতে তার অমূল্য সহায়তার কথা মনে রেখে দেশের লোক যদি আজ সমবেতভাবে বনভূমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করে, তাহ'লে সে-সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। আর, তারই ফলে দেশের লোক অধিক পরিমাণে পাবে বনজাতদ্রব্য-সম্ভার, কৃষির হবে উন্নতি,—দেশের আর্থনীতিক সমস্যাও অনেকাংশে দূর হবে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা

প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে। আমাদের দেশে যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রথম চার বা পাঁচ বছরকে সাধারণত প্রাথমিক স্তর বলা হয়; আর তার পরের ছয় বা সাত বছরকে বলা হয় মাধ্যমিক স্তর। শিক্ষার বনিয়াদ পাকা ক'রে তুলতে যেমন প্রাথমিক স্তরের গুরুত্ব, মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব তেমনি তার বিকাশে। প্রাথমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হ'লে দেশের সর্বসাধারণ উপকৃত হয়, কিন্তু মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না হ'লে দেশে নেতৃস্থানীয় লোক তৈরি হয় না। দেশের প্রকৃত নাগরিক হয়ে দেশকে অভিষ্ট পথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দেশের ভাবীকালের মানুষদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারা যায় প্রধানত উন্নতধরনের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। তাই তো দেখতে পাই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনে কত-না পরিবর্তন, কত-না উৎসাহ ও উদ্যম। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই ভারতসরকার দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটি মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। আগে এদেশের এক এক প্রদেশে এক এক রকমের শিক্ষানীতি অনুসারে মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত। কোনো কোনো প্রদেশের শিক্ষানীতির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া গেলেও সমগ্র ভারতের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা একই নীতি অনুসরণ ক'রে

ভূমিকা—মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ

চলত না। তাছাড়া, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় এদেশের শিক্ষাধারার মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতিও ছিল। দেশের সেই মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন তাই অনেকগুলি সুপারিশ করেন। বলা বাহুল্য, এই সুপারিশ করতে গিয়ে তাঁরা যেমন শিক্ষাধারার উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন, তেমনি ভেবে দেখেছেন দেশের সমাজনীতি ও অর্থনীতি। কারণ, দেশের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির কাঠামোকে বাদ দিয়ে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই সুনির্দিষ্ট পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও আজ মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের সেই সুপারিশগুলি অনুসরণ ক'রে নতুন ধরনের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে। আর সুখের কথা এই যে, নতুন ধরনের এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই এ পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে অগ্রগামী।

মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে বর্তমানে যে সংস্কারমূলক কর্মসূচি অনুসৃত হচ্ছে তার বিশেষ দু'টি দিক আছে। বিদেশী শাসনের ফলে এবং অনেকাংশে আমাদের জাতীয়-চরিত্রের সাময়িক দুর্বলতার জন্য গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যখন আমাদের দেশে মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি, তখন সুদীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে মাধ্যমিক-শিক্ষার নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুফলগুলি এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়াই হ'লো বর্তমান শিক্ষা-কর্মসূচির প্রথম দিক। অর্থাৎ, শিক্ষার ব্যাপারে আমরা যেখানে যতটুকু পিছিয়ে পড়েছি সেখানে ততটুকু এগিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে সমান হবার চেষ্টা। দ্বিতীয় দিক হ'লো অন্যান্য দেশে যেমন এখনও নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলেছে, সে-ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের দেশেও চালিয়ে যেতে হবে। কারণ, তা না হ'লে আবার আমাদের পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যে নতুন চিন্তাধারা গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে সংক্ষেপে তা হ'লো এই : এমন একসময় ছিল যখন মনে করা হ'ত জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীদের চিন্তা এবং মননের ফলে জ্ঞানের যে ভাণ্ডার মানুষের আয়ত্তে এসেছে তাকে 'যেন তেন প্রকারেণ' শিক্ষার্থীদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়াই শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদ্‌দের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে নানা গবেষণার ফলে এই কথাই স-প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ জন্ম থেকেই শিক্ষালাভ করবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জোর ক'রে শিক্ষার্থীদের মগজে জ্ঞান ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা না ক'রে তাদের সামনে যদি জ্ঞান-আহরণের উপযুক্ত নতুন নতুন পরিবেশ রচনা ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লেই শিক্ষার্থীরা সহজাত প্রবৃত্তিবশে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর, সেই পথেই শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণতরভাবে সিদ্ধ হয়। আমাদের দেশে এতকাল ধ'রে পুঁথিগত বিদ্যার উপরেই জোর

মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

দেওয়া হ'ত সবচেয়ে বেশী, আর সে-বিদ্যা আয়ত্ত করতে হ'ত ছকে বাঁধা একটা নিয়মে। শিক্ষারীতির একটি সংকীর্ণ খাঁচার মধ্যে ছাত্রদের জোর ক'রে ঢুকিয়ে তোতাপাখির মতো এক ধরনের গতানুগতিক বুলি শিখিয়ে দেওয়াকেই মনে করা হত' উপযুক্ত শিক্ষাদান! অথচ, আমাদের প্যারিপাশ্বিক নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যে, দৈনন্দিন কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবন-ধারণের বিচিত্র পরিমণ্ডলের মধ্যে শিক্ষা-গ্রহণের যে কত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে আমরা যেন একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু, সেই সবের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সেগুলিকে তাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণীয় ক'রে তোলাই হ'লো প্রকৃত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কারণেই তাঁর 'তোতাকাহিনী' নামক গল্পে ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রচ্ছন্নভাবে অথচ অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং সেই শিক্ষা-পদ্ধতির অসঙ্গতিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজে তাঁর শান্তিনিকেতন-বিদ্যাশ্রমে তাই কোনোদিন ইংরেজ-আমলের শিক্ষাপদ্ধতিকে বরদাস্ত করতে পারেননি, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। শিক্ষালাভের উপযুক্ত পরিবেশ-রচনায় মানুষের জ্ঞান এবং কর্মের সকল দিকেই, সেইসঙ্গে মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সকল উপাদান ও রূপকেই যে কাজে লাগানো যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই চেষ্টাই করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী ও বিদেশের বহু চিন্তাশীল শিক্ষাবিদের নানারকম পরীক্ষা ও প্রচেষ্টালব্ধ সুফলকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে। এতদিনকার প্রচলিত শিক্ষাধারার সঙ্গে যারা পরিচিত, সেইরকম বহু শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে হয়তো এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত, এমন কি নিজেদের কর্মধারা ও চিন্তাধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে ক'রে তাঁরা এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না, কিন্তু অভ্যাসের ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থাই যে একদিন সকলের কাছে সমাদৃত হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে দেওয়াই আজকাল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের প্রধান কর্তব্য—এই সত্যকে মেনে নেওয়ার ফলে একথাও সংশ্লিষ্ট সকলে উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষার রীতি ও প্রকৃতি সকল ছাত্রের ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের হ'তে পারে না। একজন ছাত্র যে-রকম পরিবেশের মধ্য থেকে মনের খোরাক আহরণ ক'রে বিকশিত হয়ে ওঠে, অন্য জনের মনোবিকাশের অনুকূল পরিবেশ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে। কাজেই, একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকারের আয়োজন থাকা দরকার। আগে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সব ছাত্রকেই গুঁজে দেবার চেষ্টা করা হ'ত; তাতে যারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারলে তারা পাশ হয়ে গেল, যারা পারল না তারা রইল প'ড়ে। সেই সব বিফলকাম ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যেত নষ্ট হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা

উচ্চতর মাধ্যমিক-শিক্ষার বিষয়-গোষ্ঠী

'অপদার্থ' নাম নিয়ে সকলের কাছ থেকে অনাদর ও অবহেলাই কুড়িয়ে বেড়াত। কিন্তু, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একমুখী নয়, এখনকার মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে বহুমুখী পরিবেশ রচনার আয়োজন হয়েছে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'মাল্টিপার্পাস স্কুল' বা 'সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়'। এখানে শিক্ষালাভের যে বহুমুখী আয়োজন করা হয়েছে তাকে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি বিষয়গোষ্ঠীতে। যেমন—(১) হিউম্যানিটিজ বা কলাবিষয়ক-গোষ্ঠী ; (২) সায়েন্স বা বিজ্ঞানবিষয়ক-গোষ্ঠী ; (৩) টেক্‌নিক্যাল বা যন্ত্রবিদ্যা-বিষয়ক-গোষ্ঠী ; (৪) কমার্স বা বাণিজ্যবিষয়ক-গোষ্ঠী ; (৫) এগ্রিকালচারাল বা কৃষিবিষয়ক-গোষ্ঠী ; (৬) হোম-সায়েন্স বা গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক-গোষ্ঠী ; এবং (৭) ফাইন আর্টস বা চারুকলা-বিষয়ক-গোষ্ঠী। বিদ্যালয়ের অষ্টম মানের পাঠক্রম শেষ ক'রে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ রুচি-প্রবণতা অনুসারে এই বিষয়-গোষ্ঠীর যে-কোনো একটিকে অবলম্বন ক'রে মাধ্যমিক-শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা নিজেদের মনকে বিকশিত করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-বিদ্যালয়-গুলিতে এই বিভিন্ন বিষয়-গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের যে ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে তাই হ'লো এ-দেশের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর ও উন্নয়নের মূল কথা।

শিক্ষাব্যবস্থার এই রূপান্তরে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হবে সে-প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। সাধারণতঃ যে পরিবেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে বা যে-পরিবেশে তার শৈশব অতিবাহিত হয়, তার একটা প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে দাগ কাটে। একজন শিক্ষকের বা সাহিত্যিকের ছেলে পরিবেশ অনুযায়ী ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক বা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি একজন ইঞ্জিনিয়ারের ছেলের আকর্ষণ থাকে যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতি, কিংবা একজন চিত্রশিল্পীর ছেলেকে হয়তো দেখা যায় ছোটবেলা থেকেই রঙ-তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। পরিবেশ অনুযায়ী এক একজন ছেলের বা মেয়ের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রতি এই যে প্রবণতা তা নিতান্তই স্বাভাবিক। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে যে এর ব্যতিক্রম হয় না তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই হ'লো সাধারণ নিয়ম। কাজেই, চিত্রশিল্পীর ছেলে যদি চারুকলা বিষয়ে আগ্রহশীল হয় এবং যদি দেখা যায় শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে গিয়ে সে ঐ বিষয়েই নিজেকে বিকশিত করতে পারবে, তাহ'লে তাকে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য-বিষয়ক পাঠক্রম অধ্যয়ন করবার অযথা পরিশ্রমের মধ্যে না ফেলাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যে-সব বিষয় খুব বেশী জড়িত বা সাধারণ যে-বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যেক ছাত্রেরই মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের অষ্টম মান পর্যন্ত সে সেই বিষয়গুলি পড়বার সুযোগ পাবে। কিন্তু, যে-বিষয়ের সাহায্যে সে নিজেকে অধিকতর বিকশিত ক'রে তুলতে পারবে কেবলমাত্র সেই বিষয় সম্পর্কেই সে পড়াশোনা

শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশে সহায়তা

করবে নবম মান থেকে একাদশ মান পর্যন্ত। নির্দিষ্ট বিষয়ে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, হাতে-কলমে জ্ঞানার্জনও সে করতে পারবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১,৮০০ উচ্চ-বিদ্যালয়ের মধ্যে, ১৯৬০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, ৫২৫টি বিদ্যালয়ে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষানিকেতনগুলিতে যেমন কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি শিল্পাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারিগরী বিদ্যার উপর। বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে তেমনি স্বাভাবিক কারণেই গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান পড়াবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু, এই বিভিন্ন বিষয়গোষ্ঠীকে কেউ যদি ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ব'লে মনে করেন তাহ'লে ভুল হবে। কারণ, উচ্চতর মাধ্যমিক-বিদ্যালয়ের এই বিশেষ শিক্ষাধারা শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানার্জনের সোপান মাত্র, ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী জ্ঞানলাভ করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের আরও অগ্রসর হ'তে হবে—স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তাদের। অনেকের কাছে হয়তো মনে হবে যে, শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে যদি ছাত্ররা বিশেষ কোনো বিষয়-গোষ্ঠী অবলম্বন ক'রে পড়াশোনা করে, তাহ'লে তাদের মন একপেশে হ'য়ে যাবে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও বিকাশের সুযোগ হারাবে।

রূপান্তরিত শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য।

কিন্তু সে-আশঙ্কা অমূলক। কারণ, যে-বিষয় নিয়েই ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক না কেন, সকল ছেলের পক্ষেই অবশ্যপাঠ্য কতকগুলি বিষয় আছে। যেমন, কারিগরি-বিদ্যা একটি। কাঠের কাজই হোক, মাটির কাজই হোক বা তাঁতের কাজই হোক, কোনো-না-কোনো একটি হাতের কাজ শেখার উপযুক্ত বিষয় তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যের সন্ধান যেমন পাবে, তেমনি বুঝতে শিখবে কায়িক-পরিশ্রমের মর্যাদা। এইভাবে কৃষিজীবীদের ছেলেরা একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান এবং কৃষি-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ ক'রে পিতৃপিতামহদের জীবিকাকে আধুনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেত তাহ'লেই ভালো হ'ত সবদিক থেকে। কিন্তু, সে-কাজে অর্থের প্রয়োজন যেমন বেশি, সময়েরও তেমনি প্রয়োজন। বর্তমানে তাই ধাপে ধাপে এই সংস্কারকার্য চলেছে। তবে, সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই আশা পোষণ করেন যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক থানা-অঞ্চলে অন্তত একটি ক'রে উচ্চতর মাধ্যমিক তথা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এ-পর্যন্ত কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তা বিচার-সাপেক্ষ। কারণ, কতকগুলি মূল-ত্রুটি বা অভাব এখনও রয়ে গেছে। যে পাঠক্রম অনুসারে উচ্চতর এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই তার উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, গ্রন্থের অভাব, সাজসরঞ্জামেরও অভাব। শিক্ষক-শিক্ষণের

উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'লে হয়তো শিক্ষক পাওয়া যাবে, কিন্তু বর্তমান আর্থিক-সংকটের দিনে যদি তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না থাকে তাহ'লে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব চিরদিনই থাকবে। পল্লী-এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থাই করা হয়েছে, কিন্তু সেই সব ছাত্রাবাসে যারা থাকবে তাদের অভিভাবকদের পক্ষে ছাত্রাবাসের ব্যয়বহন করা সম্ভবপর হবে কিনা সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার। সবার উপরে, শিক্ষার যে পাঠসূচি নির্ধারিত হয়েছে তার জন্য গ্রন্থপাঠের অত্যধিক চাপ যদি কমানো না যায়, তাহ'লে মূল উদ্দেশ্য যে বহুলাংশেই ব্যাহত হবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার নতুন পদ্ধতিকে যদি সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন দূর করতে হবে, তেমনি করতে হবে জটিল পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন। শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনের সঠিক মূল্যায়ন করতে হ'লে তাদের সারা বছরের অনুশীলন যাচাই করাই যথেষ্ট, তার বদলে যদি শুধু বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরে নির্ভর করা হয় তাহ'লে সঠিক মূল্যায়ন যেমন হয় না, শিক্ষার্থীদের প্রতি তেমনি অবিচারও করা হয়। বর্তমানে আর একটি বিপদ দেখা যাচ্ছে, তা হ'লো ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পড়াশোনা সম্পর্কে তাদের একটা অনাসক্তির ভাব। এমন পরিবেশ আজ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ক'রে দেশের ছাত্রসমাজ এই সব দোষ ও দুর্বলতা পরিহার ক'রে ছাত্রজীবনকে তপস্যার জীবনরূপে গ্রহণ করতে পারে, অহেতুক রাজনীতিক মতবাদ ও আমোদ-প্রমোদের মোহে প'ড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে।

উপসংহার—বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ছাত্রসমাজ

পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ একটি গ্রামকেন্দ্রিক দেশ। নগরজীবনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে পল্লী-অঞ্চল ত্যাগ ক'রে শহরাঞ্চলের দিকে জনসমাগম বৃদ্ধি পেলেও, মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি ভাগ এখনও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। গ্রামাঞ্চলের সেই বৃহৎ মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের লক্ষ্য নিয়েই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা বা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও একদিন ভারতের অগণিত দরিদ্র গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সে-কথা স্মরণ রেখে, ১৯৫২-সালের ২রা অক্টোবর তাঁর জন্মতিথিতে সারা ভারতে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু ক'রে দেওয়া হয়। ভারতের উপেক্ষিত পল্লী-অঞ্চলকে প্রাণচঞ্চল ও অগণিত জনসাধারণের জীবন সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ক'রে তোলার এমন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে

ভূমিকা—সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা

ইতিপূর্বে আর কখনও এমন পরিকল্পনা রচিত হয়নি। গ্রামজীবনের মূল সমস্যাগুলিকে বেছে নিয়ে একদিকে সরকারী উদ্যম ও আর্থিক সাহায্য, অন্যদিকে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োগ ক'রে সেই সব সমস্যার সমাধানই হ'লো এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ভারত-সরকারের এই শুভ-প্রচেষ্টায় মার্কিন-সরকারের দানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, এই পরিকল্পনার কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোলার কাজে মার্কিন-সরকার গোড়া থেকেই যেমন বিশেষ আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছেন, তেমনি সহযোগিতা করছেন তাঁদের বিশেষজ্ঞদের এদেশে পাঠিয়ে দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার কর্মসূচি

সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে সারা ভারতে যেদিন প্রথম কাজ শুরু হয়, ১৯৫২-সালের সেই ২রা অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গেও সেই কাজের হয় সূত্রপাত। প্রথম উদ্যোগে এই রাজ্যে আটটি এলাকা বা আটটি 'ব্লক' বেছে নেওয়া হয়, এবং সেই সব ব্লকের অধীনে প্রায় দেড হাজার গ্রামের ৫৭৩ লক্ষ অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের কাজ শুরু করেন সরকারী কর্মচারীরা; তাঁদের সেই কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন পল্লীবাসীরাও, নতুন আশা ও উৎসাহ নিয়ে। প্রথম যে আটটি ব্লক স্থাপিত হয় তা হ'লো—২৪-পরগনার বারুইপুর ব্লক, বর্ধমানের শক্তিগড ও গুসকরা ব্লক, বীরভূমের আহমদপুর, মহম্মদবাজার ও নলহাটী ব্লক, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ব্লক, আর নদিয়ার ফুলিয়া-ব্লক। ক্রমে ক্রমে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাতেই ব্লক স্থাপিত হয় এবং একই কর্মসূচি অনুসারে প্রত্যেক ব্লকে গ্রামজীবনের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে। ১৯৬০-সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩৫টি সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়, এবং মোট ১৭,৩৬৫টি গ্রাম ও ৯৩ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক এই পরিকল্পনার আওতায় আসে। আশা করা যায়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রাম সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে, এমন কোনো গ্রাম থাকবে না যেখানকার বাসিন্দারা এর সুযোগ-সুবিধাগুলি না পাবেন। সেই সুযোগ-সুবিধা বলতে প্রধানত কৃষির উন্নতি, সেচব্যবস্থা, জলনিকাশ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, পানীয় জলের অভাব মোচন, কুটীরশিল্প তথা ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষালাভের সুবন্দোবস্ত, চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রসার, উপযুক্ত গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি। গ্রামই যখন দেশের ভিত্তি, তখন যাতে সেই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, তার উপর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ইমারত গ'ডে উঠতে পারে সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই কাজ চলেছে বছরের পর বছর।

পশ্চিমবঙ্গকে যদি 'সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য' ব'লে অভিহিত করা হয়, তাহ'লে অসঙ্গত হয় না। কারণ, সমস্যা এর একটি বা দু'টি নয়, অসংখ্য। প্রধান সমস্যা রাজ্যের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য। বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন যে-হারে সঙ্কুচিত হয়েছে, সে-হারে তার লোকসংখ্যা হ্রাস পায়নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ৭০০·২ জন লোকের বসতি। তাছাড়া এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার

শতকরা ২৫ জন যেখানে ১১৪টি শহরে বাস করে, যেখানে শতকরা ৭৫ জন বাস করে ৩৫,০৬৩টি গ্রামে। গ্রামাঞ্চলে অত্যধিক জনবসতির ফলে জমির উপরে যেমন তার চাপ পড়েছে, তেমনি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিস্তৃত কৃষিজমি। তাছাড়া পল্লী-অঞ্চলে ভাগচাষী ও কৃষিমজুরের সংখ্যাধিক্য ঘটায় গ্রামীণ অর্থনীতিতেও একটা সংকট দেখা দিয়েছে। অতি অল্প জমিতে অধিক লোকের নির্ভরতার সমস্যার সঙ্গে আবার নতুন একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—তা হ'লো পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন। এ যাবৎ চল্লিশ লক্ষেরও বেশি উদ্বাস্তু এসেছে পশ্চিমবঙ্গে, আর তার অধিকাংশই হ'লো কৃষিজীবী। বঙ্গবিভাগ শুধু যে উদ্বাস্তু-সমস্যারই সৃষ্টি করেছে তা নয়, সেই সঙ্গে আর্থনীতিক বিপর্যয়ও ডেকে এনেছে —বিশেষ ক'রে প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের ব্যাপারে। দেশ-বিভাগের আগে পাট-উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল পূর্ববঙ্গে, আর পাটজাত-দ্রব্য-প্রস্তুতের অধিকাংশ চটকলগুলিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে—হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত হুগলি নদীর দুই তীরে। দেশ-বিভাগের ফলে দেখা গেল, পূর্ববঙ্গে (বা পূর্বপাকিস্তানে) উৎপন্ন পাট পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না, হবার কোনো সুযোগও নেই সেখানে—দু'একটি চটকল ছাড়া; অন্যদিকে পাটের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। উৎপাদন-ক্ষমতা ও কাঁচামাল-সরবরাহের এই অসাম্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যাকে আরও তীব্রতর ক'রে তোলে, কেননা চাষীরা নগদ টাকার আশায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমিতে আরও বেশি ক'রে পাটচাষ শুরু করে। এর উপরে আছে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সমস্যা। অতিবৃষ্টির ফলে এদেশের নদনদীগুলি যেমন ধ্বংসাত্মক বন্যার সৃষ্টি ক'রে ফসল নষ্ট করে, অন্যদিকে তেমনি অনাবৃষ্টির ফলে চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা বিঘ্নিত হয়। জলনিকাশ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির অভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের ভাগ্য তাই এতকাল বর্ষার জলের কম-বেশির উপরেই নির্ভর করত। এই সব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজের বিভিন্ন সমস্যার-সমাধানে পরিকল্পনার গুরুত্ব

পশ্চিমবঙ্গে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বা হয়নি সে-তর্ক না তুলে, আমরা যদি স্মরণ রাখি যে, কয়েক শতাব্দী ধ'রে এদেশের পল্লী-অঞ্চলের জীবনযাত্রা-প্রণালী অপরিবর্তিতই রয়েছে এবং সেই সঙ্গে যদি এ কথাও মনে রাখি যে, কী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নয়নসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাহ'লে সমষ্টি-উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হবে না। যে-সমস্ত লক্ষ্য নিয়ে ও যে সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং যেমন ব্যাপকভাবে তার বাস্তব-রূপায়নের কাজ চলেছে—তার সবই সাফল্যের দ্যোতক। কিন্তু, আমরা যদি এই কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে না থাকি, এবং কার্যক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক কর্মী সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি তাহ'লে আমাদের হতাশ হবারও

কোনো কারণ নেই বা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা, সেই সঙ্গে সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া, রাতারাতি কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। নানাদিকে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, পল্লীগ্রামের জনসাধারণের মধ্যে আজ সমষ্টি-উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যসূচি বিশেষ একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকাদের সংস্পর্শে এসে পল্লীবাসীরা আজ আত্মনির্ভর হ'তে যেমন শিখেছে, তেমনি নিজেদের অভাব-অসুবিধাগুলি দূর করতে সরকারী সাহায্য দাবি করছে। সমষ্টি-উন্নয়নের মধ্য দিয়েই যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব সে মত কে তারা যেন আজ নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তারা আজ তাই ভালো বীজ চায়, রাসায়নিক সার গ্রহণ করে, জলনিকাশ ও জলসেচের সুবিধাগুলি পাবার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের শরণাপন্ন হয়। অশিক্ষিত বা নিরক্ষর কৃষকেরা আজ যখন নিজেদের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপারফসফেটের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করে, কিংবা যখন তাদের দেখা যায় গ্যামাক্সিনের সাহায্যে গাছপালা রক্ষা করছে, তখন কি এই কথাই মনে হয় না যে, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি গ্রহণ করতে তারা সচেতন। তাদের এই সচেতনতাবোধ তো উন্নয়ন-পরিকল্পনার মাধ্যমেই এসেছে। কৃষি, জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পশুরক্ষা, ক্ষুদ্রশিল্প, যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আজ যে কল্যাণকর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা প্রধানত সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপক কার্যসূচি অবলম্বন করেই সম্ভবপর হয়েছে। বিভিন্ন সমবায়-সমিতি গঠন ক'রেও গ্রামবাসীরা আজ নানাভাবে উপকৃত। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিজেদের অসুবিধাগুলি যাতে নিজেরাই দূর করতে পারে, সেজন্য গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলেছে, যাদের পক্ষে চাঁদা দেওয়া সম্ভব হয়নি তারা কাঁচামাল দিয়ে কিংবা শ্রমদান ক'রে নিজেদের পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করেছে। পল্লীবাসীদের মধ্যে আজ যখন এই আত্মনির্ভরতাবোধ জন্মেছে তখন আর নৈরাশ্যের কোনো কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য

এ-কথা অবশ্য সত্য যে, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা এই কয়েক বছরের মধ্যে পল্লীসমাজের যতখানি উন্নতি বা পরিবর্তন আশা করেছিলাম তা হয়নি। প্রথমত এর জন্য দায়ী বহুদিনের পুরানো সরকারী প্রশাসন-ব্যবস্থা। এখনও 'লালফিতা'-র মহিমায় অনেক কর্মসূচির বাস্তব-রূপায়ণে অযথা বিলম্ব ঘটে। প্রশাসনিক নতুন রীতি প্রবর্তন ক'রে সমস্ত কাজকে ত্বরান্বিত করাই আজ সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা বা দুর্বলতা হচ্ছে বাহ্য উন্নতির উপর লক্ষ্য এবং কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব। ব্লক-অফিস থেকে মাসে কত বেশী লোক কত বেশী রাসায়নিক সার নিচ্ছে, কিংবা কত বেশী বিদ্যালয়-ভবন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মিত হ'লো তার পরিসংখ্যান দিয়ে

কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতা ও সেগুলিকে অপসারণ করিবার উপায়

পল্লীসমাজের উন্নতি বোঝানো যায় না, কারণ সেটা বাহ্যিক উন্নতি বা পরিবর্তনের লক্ষণ মাত্র। আসল উন্নতির রূপ তখনই ফুটে উঠবে যখন দেখা যাবে রাসায়নিক সারে ও উন্নত বীজের সাহায্যে কৃষকেরা শস্যোৎপাদনের পরিমাণ অনেক গুণ বাড়িয়েছে, কিংবা নতুন বিদ্যাভবনে গ্রামের ছেলেমেয়েরা নিয়মিতভাবে পড়াশুনা ক'রে শিক্ষার সুযোগগুলি পূর্ণভাবে গ্রহণ করছে, অথবা পল্লীর জনস্বাস্থ্যরক্ষায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নিয়মিতভাবে কাজ ক'রে চলেছে। কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব দূর করতে হ'লে চাই উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থায় তাঁরা শিক্ষা পাবে পল্লীবাসীদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার উৎসাহ। সরকারী কর্মচারীরা যেখানে কৌলীন্য-মনোভাব বিসর্জন দিয়ে কাজ করতে পারেন সেখানেই তাঁদের সাফল্য দেখা যায়। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে শুধু সরকার-নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্মপ্রচেষ্টার উপরে নির্ভর ক'রে থাকলে চলে না, এ ব্যাপারে সর্বসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাও বিশেষভাবে কাম্য। আমাদের মধ্যে যাঁরা সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে হামেশাই সমালোচনা ক'রে থাকেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সেই কর্মসূচির দোষত্রুটি দূর করবার কোনো উপায় নির্দেশ করেন না। কিন্তু, নিছক বিরুদ্ধ-সমালোচনায় আসল কোনো কাজ হয় না, নিজেদের মধ্যে শুধু তিক্ততাই বাড়ে। সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময়ে সংগঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমষ্টি-উন্নয়ন সম্পর্কে যাঁদের দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই জানেন যে, সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ ধীরে ধীরে চলে। সর্বোদয়-আন্দোলনের অন্যতম নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এক জায়গায় বলেছেন—"দ্রুত সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ চলবে ব'লে যাঁরা আশা করেন, বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। সমষ্টি-উন্নয়নের সার কথা হ'লো সর্বসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগে চালাবার একটা মনোভাব সৃষ্টি। এই মনোভাব যেখানে সৃষ্টি হয় সেখানে সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হ'তে পারে। কিন্তু, আমাদের দেশে এই মনোভাবেরই অভাব। এই মনোভাব-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সময়, কর্মনিপুণতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি।"

কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় যে, সমবেত প্রচেষ্টা চালাবার মনোভাব সৃষ্টি করবার অন্যতম উপায় হ'লো উন্নয়নসূচি-রচনা ও সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার ভার সরকারী আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে বে-সরকারী গ্রামবাসীদের উপরেই ন্যস্ত করা। আর, সেই উদ্দেশ্যেই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বা পঞ্চায়েতী রাজ্যের সৃষ্টি। প্রথমদিকে সমষ্টি-পরিকল্পনার কর্মসূচিতে জনগণের সহযোগিতা-লাভের উপায় হিসাবে পঞ্চায়েতী-রাজের কল্পনা করা হয়।

পঞ্চায়েতী রাজ ও উপসংহার

পরে, তার রাজনীতিক তাৎপর্যও উপলব্ধি করেন দেশের নেতারা। পঞ্চায়েতী-রাজ-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার ও সমষ্টি-উন্নয়নসূচির মধ্যে একটা অত্যাবশ্যক সংযোগ থাকে। শেষ পর্যন্ত জনগণের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব নিহিত—এই নীতি যেখানে সমর্থিত হয় সেখানে সম্মিলিত-উদ্যোগ চালাবার মনোভাব সৃষ্টি হ'তেও দেরি হয় না। পল্লীসমাজের জনসাধারণ এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত

(সর্বনিম্ন স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান) থেকে লোকসভা পর্যন্ত তাঁদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যে যোগাযোগ, তার দ্বারাই আজ ভারতের সর্বত্র জাতীয় নীতি ও জাতীয় পরিকল্পনার ঐক্য সাধিত হচ্ছে। সমষ্টি-উন্নয়ন সূচির মাধ্যমে দেশবাসী আজ যেমন প্রশাসনিক ঐক্য ও উন্নয়নের সাধারণ ধাঁচ পেয়েছে, পঞ্চায়েতী রাজ্যের ফলে তেমনি পেয়েছে গ্রাম-উন্নয়ন-ব্লক ও জেলা পর্যায়ে একই ধরনের উন্নয়ন-কাজের পরিকল্পনার সুযোগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষদিকে পল্লী-পর্যায়ে উন্নয়নসূচি-রচনা এবং রূপায়ণের যথেষ্ট দায়িত্ব অধিকাংশ রাজ্যেই গ্রাম-পঞ্চায়েতদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই ব্লক-পঞ্চায়েত-সমিতি গঠিত হয়েছে, সেখানেই সমষ্টি-উন্নয়নসূচি-রচনা ও রূপায়ণ নিয়ন্ত্রণের ভার সেই সব সমিতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে পল্লীর জনসাধারণ নগদ অর্থ দিয়ে, শ্রমদান ক'রে ও অন্যান্যভাবে উন্নয়নসূচি রূপায়ণের জন্য যে রকম উৎসাহ দেখিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজেও দ্রুত একটা পরিবর্তন আসছে—যে-পরিবর্তনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা উন্নত সমাজ-জীবনের সুন্দর একটি রূপ দেখতে পাব। সেই আশাতেই আজ পল্লীবাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী উন্নয়ন-কর্মসূচির বৃহৎ যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি

ভূমিকা

পুরাকীর্তির মধ্য দিয়েই দেশের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বর্তমানকালের মানুষদের কাছে। পুরাকীর্তিগুলি যেন অতীতের সাক্ষী,—গৌরবময় অতীত ইতিহাসের ধারক ও বাহক। রোমের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ যেমন গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পায়, মিশরের পিরামিডগুলি যেমন মিশরের প্রাচীন গৌরবের জয় ঘোষণা করে, ভারতের অজন্তা-ইলোরার গিরিগুহাগুলি, তার অসংখ্য দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির এবং মসজিদও তেমনি ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সম্রাট্ শাহজাহানের 'তাজমহল' মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে আজও ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের গৌরবগাথা প্রচার ক'রে চলেছে, আকর্ষণ করছে সারা পৃথিবীর মানুষকে।

অতীতের যে-কোনো কীর্তিকেই পুরাকীর্তি নামে অভিহিত করা গেলেও, সাধারণভাবে পুরাকীর্তি বলতে আমরা 'এনসিয়েণ্ট মনুমেণ্ট'-গুলিকেই বুঝি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, স্তম্ভ প্রভৃতির সংখ্যা অনেক কম। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইট বা পোড়ামাটির কাজ হয়েছে, পাথরের ব্যবহার এদেশে ব্যাপকতা লাভ করেনি। প্রাকৃতিক বিরূপ আবহাওয়া ও দুর্যোগের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার যে শক্তি পাথরের থাকে, সে-শক্তি দেখা যায় না ইট বা পোড়ামাটির মধ্যে। তাই পাথরের তৈরী প্রাসাদ-দুর্গ-মন্দির যেমন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় অন্য কোনো উপাদানে তৈরী অট্টালিকা সে স্থায়িত্বের অধিকারী হয় না। দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজ রাজত্বে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ অন্যান্য প্রদেশের পুরাকীর্তিগুলিকে রক্ষা করবার জন্য যে যত্ন নিয়েছিলেন, সে-তুলনায় কোনো যত্ন-ই নেননি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভগুলি সম্ভবতো ঐ বিভাগের যথেষ্ট মনোযোগও আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু, প্রাদেশিক সরকারও যদি এ-বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ দেখাতেন, তাহ'লে হয়তো বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের বহু কীর্তিস্তম্ভ অবহেলা-অনাদরে নষ্ট হয়ে যেত না। অবশ্য, এ-বিষয়ে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও কিছুটা দায়িত্ব ছিল। তাঁরা যদি সংঘবদ্ধভাবে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদ করতেন তাহ'লে হয়তো বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'ত—অনাদরে অবহেলায় সেগুলি এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে থাকত না। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে-সব প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে তার অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ, সেগুলির কাছে গিয়ে পৌঁছুবারও উপযুক্ত রাস্তাঘাটের একান্ত অভাব। আশার কথা এই যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এ-বিষয়ে জাতীয়-সরকারের দৃষ্টি সজাগ হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পুরাকীর্তিগুলিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন রাজ্য-সরকার। সম্প্রতি একটি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগও স্থাপিত হয়েছে রাজ্য-সরকারের অধীনে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি-সমূহের স্বল্পতা

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভগুলির মধ্যে মালদহ জেলার গৌড়ে অবস্থিত প্রাচীন প্রাসাদ, মসজিদ ও মিনার এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে অবস্থিত মন্দিরগুলিই প্রধান। মালদহ জেলার সদর-শহর ইংরেজবাজার থেকে বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজধানী গৌড় মাইলদশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড়ের শেষ সীমানা অবশ্য ইংরেজবাজার-শহর থেকে চৌদ্দ মাইলেরও বেশি। বরাবর পাকা রাস্তা হয়েছে এখন। আর, প্রয়োজনীয় যানবাহনও পাওয়া যায় সেই প্রাচীন রাজধানীটি দেখে আসবার জন্য। বন্যার হাত থেকে রাজধানীটিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যে-যুগে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তা এখনও বর্তমান। এটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে সাত মাইল আর প্রস্থে প্রায় দু'মাইল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের সময় থেকেই (অর্থাৎ, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে) গৌড়নগরের ইতিহাস আরম্ভ। তারপর, দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দুধর্মাবলম্বী সেনরাজাদের রাজত্ব শুরু হয় গৌড়ে। সেনবংশের সেই আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায় একশ' বছরের মধ্যেই। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান রাজত্ব। প্রথমে পাঠান, পরে মোগলেরা আসে এদেশে।

গৌড়ের প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ

তাদের আধিপত্য চলে ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠদশক পর্যন্ত। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড়নগর পরিত্যক্ত হয়। সেই থেকে অতীতের স্মৃতিচিহ্নগুলিকে কোনরকমে বুকে আঁকড়ে ধ'রে জনহীন এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে গৌড। গৌড়ের পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে 'বড সোনামসজিদ' বা 'বারদুয়ারী'-কেই অনেকে গৌডের সর্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা ব'লে বর্ণনা করেন। ছোট ছোট ইট আর পাথরের খিলান দিয়ে তৈরী এই প্রাচীন মসজিদটি লম্বায় ১৮০ ফুট, আর চওড়ায় ৮০ ফুট। অনেকের ধারণা, একসময় এটি বাদশাহের দপ্তরখানা হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। 'দখল দরওয়াজা' বা 'বাইশগজী' একটি প্রাচীন ফটকও দেখবার মতো। এটি একসময় গৌড়-দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। এর প্রাচীরগাত্রে যে-সব কারুকাজ দেখা যায়, তা মুসলিম-স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আর একটি দ্রষ্টব্য কীর্তিস্তম্ভ হ'লো 'ফিরোজ মিনার'। ইটের তৈরী এই মিনার বা স্তম্ভটি ৮৪ ফুট উঁচু, আর এর ভিতরে রয়েছে ৭৩-ধাপবিশিষ্ট ঘোরানো সিঁড়ি। কেউ বলেন এটি একটি বিজয়স্তম্ভ, কেউ বলেন সংকেত-স্থান. আবার কেউ বলেন চেরাগদানি। সে যাই হোক, প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর আগেকার তৈরী এই মিনারের উপর থেকে গৌডের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ও রাজমহলের গিরিশ্রেণীর ধূসর শোভা নিরীক্ষণ করা যায়। গৌডের অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে রয়েছে—হাবেলি খাস (বা রাজপ্রাসাদ), লুকোচুরি-দরওয়াজা, কদম-রসুল মসজিদ, ঘুমটি-দরওয়াজা, চিকা মসজিদ, তাঁতীপাড়া মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ, সাগরদীঘি, কাঁচাগড়, লোহাগড, একডালা-দুর্গ, গৌড়েশ্বরীর মন্দির প্রভৃতি। গৌড়বঙ্গের অন্যতম রাজধানী পাণ্ডুয়াতেও অনেক মসজিদ ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আদিনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ, ও কুতুব আলমের দরগা। গৌড়-পাণ্ডুয়ার এই সব কীর্তিস্তম্ভে সেকালের ভাস্কর ও স্থপতিরা তাদের শিল্প-নৈপুণ্যের যে নিদর্শন রেখে গেছে—তা অত্যাশ্চর্য না হ'লেও অকিঞ্চিৎকর নয়। কোনো কোনো মসজিদে হিন্দু-আমলের ইট-পাথরও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় হিন্দু-স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব।

মালদহ জেলার গৌড় অঞ্চলে যেমন মুসলমান-আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে হিন্দু মল্লরাজাদের আমলে নির্মিত বহু মন্দির দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দিরে তাই পুরাণ-ভাগবত-বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনীর শিল্পরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, রাজা হাম্বিরের আমলের স্মৃতিচিহ্ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আজ অবলুপ্ত। এখন যে-সব কীর্তিস্তম্ভ চোখে পড়ে তার অধিকাংশই রাজা রঘুনাথ সিংহ ও তাঁর পুত্র বীর সিংহের আমলের। তাঁদের রাজত্বকালেই বিষ্ণুপুরের শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উন্নতির চরম সীমায় পৌছায়। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দির ও দীঘি (বাঁধ নামে পরিচিত)

বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি

রঘুনাথ সিংহের শাসনকালে (১৭-শ শতকের প্রথমভাগে) নির্মিত হয়। জোড়বাংলা, শ্যাম রায়, ও মদনগোপালের মন্দির বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোড়বাংলার গঠনরীতি যেমন অভিনব, এই মন্দিরগাত্রের কারুকাজগুলিও তেমনি চিত্তাকর্ষক। দুটি মন্দির পরস্পর-সংলগ্ন ব'লে এর নাম হয়েছে জোড়বাংলা ; আর, এর গঠনরীতিতে রয়েছে বাঁকুড়া-অঞ্চলের প্রচলিত পর্ণকুটীরেরই প্রভাব। কালো পাথরের সুবৃহৎ পঞ্চরত্ন-মন্দির, যা এখন মদনগোপালের মন্দির নামেই বিখ্যাত, সেরকমের বড় পঞ্চরত্ন-মন্দির বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই। এই শ্রেণীর মন্দির পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট ব'লেই বোধ হয় পঞ্চরত্ন-মন্দির নামে পরিচিত। রঘুনাথ সিংহের পৌত্র দুর্জন সিংহের অক্ষয় কীর্তি মদনমোহন-মন্দির। এই মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে যে-সব পৌরাণিক চরিত্র উৎকীর্ণ আছে, সেগুলি বাঙালী ভাস্করদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যেরই পরিচয় বহন করছে। মল্লরাজাদের আমলে বিষ্ণুপুরের দুর্গ ছিল সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। সেই দুর্গের কয়েকটি প্রবেশদ্বার বা তোরণ এবং ঐতিহাসিক দলমাদল কামান এখনও রয়েছে বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের সমাজ-জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের ভাবধারা যে অনুপ্রবেশ করেছিল তার পরিচয় আমরা পাই বিভিন্ন মন্দিরের গঠনরীতিতে ও ভাস্কর্যে। দ্বারকেশ্বর-তীরবর্তী শ্যামচাঁদের মন্দিরে যেমন জৈনধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সারেশ্বরের শিব-মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় শৈবধর্মের প্রভাব। শেষোক্ত এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন এবং উৎকলীয় ভাস্কর্য রীতিতে নির্মিত। শাক্ত এবং বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি মন্দিরের গঠনে ও ভাস্কর্যে। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভগুলির মধ্যে যেমন ইট-পাথর ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি পোড়ামাটির কারুকাজও রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। পোড়ামাটির কারুকাজ শুধু বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায় না, রাঢ়-বঙ্গের অনেক জায়গাতেই তার সাক্ষ্য মেলে। বিষ্ণুপুর-অঞ্চলের অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে বিখ্যাত—বৈষ্ণবযুগের বিখ্যাত রাসমঞ্চ, লালগড, গুমগড, পাথর দরজা (দুর্গতোরণ), লালবাঁধ প্রভৃতি।

অন্যান্য পুরাকীর্তি

আরও বহু প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু, প্রাচীনত্বের দিক থেকে সেগুলির গুরুত্ব অনেক কম। মুসলমান-আমলের অনেকগুলি কীর্তিস্তম্ভ ও ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায়। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ায় যেমন রয়েছে পাঁচতলা একটি মিনার, যার গঠনরীতিতে দিল্লীর কুতবমিনারের সাদৃশ্য আছে অনেকখানি। আর মুর্শিদাবাদে যে-সব প্রাসাদ, মসজিদ ও কবর রয়েছে তার বেশির ভাগই আলীবর্দী-সিরাজদৌল্লার স্মৃতি বহন করছে। হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হুগলি জেলার গড়-মান্দারণ, মহানাদ, চণ্ডীতলা, চুঁচুড়া, দ্বারবাসিনী, বংশবাটী প্রভৃতি জায়গায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। নবদ্বীপ অঞ্চলে তেমনি দেখতে পাওয়া যাবে বৈষ্ণবযুগের অনেক স্মৃতিচিহ্ন। আবার পশ্চিম-দিনাজপুরের বাণগড়-এলাকায় যেমন বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, সাম্প্রতিক কালের খননকার্যের ফলে তেমনি ২৪-পরগনা

জেলার চন্দ্রকেতুগড় বাংলাদেশের অতীত গৌরবের বিস্ময়কর একটি অধ্যায় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। প্রাচীন আমলের বহু মূর্তি ও তৈজসপত্রও পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। ভারতীয় সংগ্রহশালায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে এবং কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে সেগুলি। ইতিহাসে আগ্রহশীল ব্যক্তিরা এইসব পুরাকীর্তি থেকেই তাঁদের গবেষণা-কার্যের মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে থাকেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিসমূহ সংখ্যায় কম হ'লেও নগণ্য নয়। বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও সেগুলির বিশেষ একটা গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। সেই কারণেই, এই সব পুরাকীর্তির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ যদি এ-বিষয়ে তৎপর না হন তাহ'লে অধিকাংশই যে ক্রমশ ধ্বংসাবশেষ থেকে ধূলিকণায় পরিণত হবে তা বলা-ই বাহুল্য। রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কীর্তিস্তম্ভ ও ধ্বংসাবশেষের পরিচয়লিপি প্রণয়ন করাও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পরিচয়লিপির মধ্যেই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নিহিত থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন পুরাকীর্তি পরিদর্শনে যাতে দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে, সেজন্য উপযুক্ত রাস্তাঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। নতুন ক'রে খননকার্যও চালাতে হবে দেশের বিভিন্ন জায়গায়,—কারণ, কে বলতে পারে বাংলার ভূমিগর্ভ থেকে একদিন বহু প্রাচীন আরও এমন সব জিনিস উঠবে না যেগুলির মধ্যে থাকবে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা

পঞ্চায়েতী-রাজ ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা এক জিনিস নয়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার অর্থ স্থানীয় অসামরিক প্রশাসন-ব্যাপারে পল্লী-পঞ্চায়েতের অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ। আর পঞ্চায়েতী-রাজের অর্থ গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান-সমূহকে উন্নয়নমূলক সকল কাজের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ। কিছুদিন আগে পর্যন্তও পঞ্চায়েত ও অন্যান্য প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানকে জনগণের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সরকারী এজেন্সী ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। ফলে, সেগুলি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত না। সমষ্টি-উন্নয়নসূচির রূপায়ণে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গণসহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। এইভাবেই পঞ্চায়েতী-

ভূমিকা—পঞ্চায়েতী-রাজ ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা

রাজের ধারণা স্পষ্ট হয়। যাতে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় নীতি নির্ধারণ করতে পারে এবং স্থানীয় সর্বসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়, সেজন্য পঞ্চায়েতী-রাজে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পঞ্চায়েতী-রাজের আদর্শ অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শুধু যে পরিকল্পনা রচনা করেন তাই নয়, তাঁরা সমষ্টির মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের উন্নয়নসূচি রূপায়িত করেন। শেষ পর্যন্ত জনগণের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব নিহিত—এই নীতির মধ্যেই রয়েছে স্থানীয় সরকার ও সমষ্টি-উন্নয়নসূচির মূল। ক্ষুদ্র পল্লী-সমাজের জনগণ এবং গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে যোগাযোগ তা দ্বারা জাতীয় নীতি ও জাতীয় পরিকল্পনার ঐক্য সাধিত হয়। জেলা-পরিষদে বিধান-পরিষদ ও লোকসভার সদস্যদের প্রতিনিধি যাওয়ায়, জেলা-পরিষদ রাজ্য-বিধানসভা ও সংসদের মধ্যে স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পঞ্চায়েতী-রাজের এই দিক থেকে পূর্বতন স্থানীয়-স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল-বোর্ড) এবং পল্লী-ভারতে যে নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান (পল্লী-পঞ্চায়েত) স্থাপিত হচ্ছে এ দু'য়ের মধ্যেকার মূল পার্থক্য বোঝা যায়। সমষ্টি-উন্নয়নসূচির মাধ্যমে দেশ যেমন প্রশাসনিক ঐক্য ও উন্নয়নের সাধারণ ধাঁচ পেয়েছে, পঞ্চায়েতী-রাজের ফলে তেমনি পেয়েছে পল্লী, সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লক ও জেলা পর্যায়ে একই ধরনের সংগঠন-মূলক কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সুযোগ। সমগ্র দেশে পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার সূত্রপাত। আর, সারা ভারতে যাতে একই ধরনের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, কোথাও ইউনিয়ন-বোর্ড, কোথাও তালুক-বোর্ড, কোথাও পল্লী-পঞ্চায়েত এরকমের বিভিন্ন পল্লী-শাসন-প্রতিষ্ঠান না থাকে, সেজন্য ভারতীয় সংসদ যে আইন প্রণয়ন করেন তার ফলে আজ একই ধরনের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে পল্লী-ভারতের সর্বত্র।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে জনগণের বিধিবদ্ধ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিল' পাস হয় এবং ১৯৫৭-সালের জানুআরি মাসে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করলে সেই বিল পরিণত হয় আইনে। সেই আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ চলেছে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা কালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' গঠন করতে হবে। তদনুযায়ী প্রায় বিশ হাজার 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' ও তিন হাজার তিন শ' 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত' গঠিত হবার কথা। কিন্তু, ১৯৬০-সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র তিন হাজার পাঁচশ' একানব্বইটি গ্রাম-পঞ্চায়েত ও ছ'শ ছিয়াত্তরটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, ১৯৬৩-৬৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তার পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা সম্পর্কিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবে।

পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম কাজ হ'লো প্রত্যেক গ্রামে একটি ক'রে 'গ্রামসভা' গঠন করা। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রাজ্য-বিধানসভার ভোটার-তালিকায় যাদের নাম থাকবে তাঁদের প্রত্যেকেই গ্রামসভার সভ্য হবেন। ধরা যাক, কোনো এলাকায় এইভাবে কয়েকটি গ্রামসভা গঠিত হ'লো। তখন সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামসভার সভ্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত। একটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা হবে কমপক্ষে নয়জন আর উর্ধ্বপক্ষে পনের জন। গ্রাম-সভার সভ্যেরা নিজেদের মধ্য থেকেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচিত করবনে। নির্বাচনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক গ্রামসভার এলাকা কয়েকটি নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে এবং নির্বাচনের আগে প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের স্থানীয় সীমানা ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয় সরকারের স্বায়ত্তশাসনবিভাগের পক্ষ থেকে। কোন্ নির্বাচনক্ষেত্রে কতজন সভ্য নির্বচিত হবেন তাও পূর্বে ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন-প্রার্থীকে কোনো রকম ফী জমা দিতে হয় না, আর ভোটারেরা গোপন ব্যালট প্রথায় ভোট দেন। নির্বাচিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যরা তখন নিজেদের মধ্য থেকে একজন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করেন সেই অধ্যক্ষ বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ। গ্রামসভার কাজও চলে তাঁদের সভাপতিত্বে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্যকাল চার বৎসর। অর্থাৎ, চার বৎসর পরে নতুন ক'রে আবার নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যেমন গ্রামসভা ও গ্রাম-পঞ্চায়েত, তেমনি তার তৃতীয় স্তর হ'লো 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত'। কয়েকটি সংলগ্ন গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যেরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল-পঞ্চয়েতের সদস্য নির্বাচন করেন। অর্থাৎ, গ্রামসভা থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের উদ্ভব। প্রত্যেক গ্রামসভার প্রতি আড়াইশ' জন সভ্যপিছু একজন প্রতিনিধিকে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সদস্যরূপে নির্বাচিত করা হয়। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের নির্বাচনও হয় ব্যালট-প্রথায়, এবং অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সদস্যেরা তাঁদের মধ্য থেকে প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচন করেন। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভায় সেই প্রধান বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পূর্বেকার ইউনিয়ন-বোর্ডগুলিই বর্তমানে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের রূপ নিচ্ছে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার এই ত্রিমুখী কাঠামো বিচার করলে দেখা যায় যে, এর সঙ্গে সংসদীয় গঠনরীতির একটা মিল আছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যেমন প্রথমে গঠিত হয় বিধানসভা এবং বিধানসভার নির্দিষ্ট সদস্যদের ভোটে যেমন বিধান-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হন, তেমনি জনগণের দ্বারা গঠিত গ্রামসভার সভ্যরা গ্রাম-পঞ্চায়েত ও অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠনের অধিকারী। গণতান্ত্রিক নিয়মে সৃষ্ট এই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থাকে তাই স্বায়ত্তশাসনমূলক-ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যায়। আগে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে যেমন স্থানীয় ছোটখাটো বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির

পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর

জন্য ইউনিয়ন-বেঞ্চ ও ইউনিয়ন-কোর্ট গঠিত হ'ত, নতুন ব্যবস্থায় সেরকম দুটি ভাগ নেই। স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখন 'ন্যায়-পঞ্চায়েত'-এর উদ্ভব হয়েছে। রাজ্য-সরকারের অনুমতি নিয়ে এখন অঞ্চল-পঞ্চায়েত তার অন্তর্ভুক্ত গ্রামসভাগুলির মধ্য থেকে পাঁচজন সভ্যকে নির্বাচিত করে একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করতে পারেন। অর্থাৎ, এই পাঁচজনই হবেন ন্যায়-পঞ্চায়েত বা পল্লী-আদালতের বিচারক।

গ্রাম-পঞ্চায়েত স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হ'লো গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ যাতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই করতে পারেন তার সুযোগ দেওয়া। এতে ক'রে একদিকে যেমন আত্মসচেতনতার বোধ জন্মে, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমষ্টি-উন্নয়নের আগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত-আইনে গ্রাম-পঞ্চায়েতের বহুবিধ কাজের উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন—পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন; প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট তৈরি ও তার মেরামতের ব্যবস্থা; পুকুর ও সেচখাল ইত্যাদি খনন ও সংরক্ষণ; পতিত জমি পুনরুদ্ধার ক'রে তাতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা; বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ; প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গলকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা; রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ক'রে চলাচলের সুবিধা ক'রে দেওয়া; গবাদি পশুর চিকিৎসা ও উন্নতি প্রভৃতি। এ-সব ছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষ কাজের ভার রাজ্যসরকার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপরে ন্যস্ত করতে পারবেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও গ্রাম-পঞ্চায়েতকে দেওয়া হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা বা উন্নতির জন্য প্রাথমিক যে-সব কাজ, গ্রাম-পঞ্চায়েত তা নিজেদের খরচেই করবেন। মহামারী নিরোধের জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েতের জরুরী কতকগুলি ক্ষমতা থাকবে। সেই ক্ষমতা অনুসারে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই দূষিত জলাশয় থেকে জল নেওয়া বন্ধ ক'রে দিতে পারবেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য দরকার হ'লে, সরকারের অনুমতি নিয়ে, কর্মচারী নিয়োগ করাও চলবে। তবে প্রশাসনিক-ব্যবস্থার এবং অর্থাদি আদায় ও বণ্টনের অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের উপর। পঞ্চায়েত-আইন অনুসারে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের একটি অর্থভাণ্ডার থাকবে। সেই অর্থভাণ্ডারে জমা পড়বে সরকারী অর্থসাহায্য; ট্যাক্স, ফী বা কর ধার্য ক'রে যে-টাকা আদায় হবে তা; আর, চাঁদা, দান ও অন্যান্য সাহায্য। চৌকিদার-দফাদার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আছে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের। প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েতে সরকার-নিযুক্ত একজন সচিব বা সেক্রেটারি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য। সেই সচিব ও চৌকিদার-দফাদারের বেতন আসবে সরকার থেকে। তাছাড়া, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যও সরকার প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েতকে অর্থসাহায্য করবেন। ন্যায়-পঞ্চায়েত পরিচালনা, চৌকিদার-

গ্রাম-পঞ্চায়েত, অঞ্চল-পঞ্চায়েত ও ন্যায়-পঞ্চায়েতের কার্যাবলী

দফাদারদের বেতন ইত্যাদি বাবত যে খরচ হবে তার টাকা মজুত রেখে, অর্থভাণ্ডারের বাকী টাকা অঞ্চল-পঞ্চায়েত তার অধীন বিভিন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবেন তাদের বিভিন্ন কাজ চালাবার জন্য। সম্পত্তির মালিক ও ব্যবসায়ীদের উপর বাৎসরিক কর ধার্য করবার ক্ষমতা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আছে। তাছাড়া, যানবাহন রেজেস্ট্রীকরণ বাবতও তারা নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করতে পারবেন, যেমন পারবেন ন্যায়-পঞ্চায়েতে মামলা দায়ের করবার জন্য প্রদেয় ফী আদায় করতে। ন্যায়-পঞ্চায়েতে জরিমানার টাকা হিসাবে যা আসবে তাও জমা হবে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের অর্থভাণ্ডারে। পঞ্চায়েত-আইন অনুসারে কয়েক ধরনের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করার ক্ষমতা ন্যায়-পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ দোষী বা অপরাধী বিবেচিত হ'লে ন্যায়-পঞ্চায়েত তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই জেল দিতে পারবেন না। ন্যায়-পঞ্চায়েতে সীমাবদ্ধ কোনো মামলা অন্য কোনো বিচারালয়ের দ্বারা বিচার্য হবে না। যদি ঐ রকম কোনো মামলা অন্য আদালতে ওঠে তাহ'লে সংশ্লিষ্ট আদালত তা সংশ্লিষ্ট ন্যায়-পঞ্চায়েতের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন নিষ্পত্তির জন্য। কাজেই, দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ন্যায়-পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতা আছে। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত নিজ কর্তব্য-পালনের জন্য গ্রাম-সভার নিকট দায়ী থাকবেন। গ্রামসভার একটি বাৎসরিক আর একটি ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশন বসবে। বাৎসরিক অধিবেশনে গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রাম-সভার নিকট পরবর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরে যে কাজ হয়েছে এবং পরবর্তী বৎসরে যে কাজ হবে তার একটি বিবরণ পেশ করবেন। সকলের সম্মিলিত অনুমোদন অনুসারেই গ্রাম-পঞ্চায়েত তার বিভিন্ন কাজে অগ্রসর হবেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আছে। যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির এবং অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আলাদা আলাদা বাজেট তৈরি হবে, তথাপি একথা মনে রাখা দরকার যে, অঞ্চল-পঞ্চায়েত এবং তার সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিকে একটি প্রতিষ্ঠান ব'লেই গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি হবে একই অঞ্চল-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অঙ্গ বা শাখা। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই ভারতের সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার মূল কথা হ'লো পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা। আর, সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার মূল

উপসংহার

প্রেরণা ও দায়িত্ব হবে গ্রামবাসীর। সেই সঙ্গে অবশ্য সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতাও থাকবে। কিন্তু, মূল প্রেরণা ও উত্তম আসা চাই পল্লীবাসীদের তরফ থেকে। সমাজকল্যাণের মন্ত্র দিয়েই তাদের উদ্বুদ্ধ করবে পঞ্চায়েত। আশার কথা এই যে, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার সুফল দেখা গিয়েছে। কোনো কোনো ব্লকের পঞ্চায়েতরা এক বৎসরের মধ্যেই পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা তুলে ফেলেছেন

এবং সে-টাকা ঐ বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেছেন। এইভাবে যদি রাজ্যের সর্বত্র সম্মিলিত সহযোগিতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ চলে, তবেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা হবে সার্থক, গ্রামজীবনের হবে কল্যাণ।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী

ভূমিকা

ব্যবসা-বাণিজ্য-বিমুখ জাতি ব'লে বাঙালীর একটা অপবাদ আছে। সে অপবাদটা নেহাত অমূলক নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা চলেছে, বাঙালীর স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। বিরাট বিরাট কলকারখানা, বড় বড় আবাদ, খনিখাতের কাজ, বৃহদায়তন যৌথ-কারবার প্রভৃতির মাধ্যমে যে ব্যবসা-বাণিজ্য, বাঙালী সেখানে তার আধিপত্য বিস্তার ক'রে নেই। বাঙালী-চরিত্রের মধ্যে যেন একটা গলদ আছে, যার ফলে একদিকে তার যেমন বাণিজ্যানুরাগ নেই, অন্যদিকে তেমনি আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও তার শেষরক্ষা যেন করতে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়; কিন্তু স্বভাবধর্মে বাঙালী যেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিমুখ। মুষ্টিমেয় বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য অর্জন করলেও, বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্য-অনুরাগী জাতি বলা চলে না—যেমন বলা চলে রাজস্থানী, গুজরাটী, পার্শী, সিন্ধী প্রভৃতির বেলায়।

অতীতে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য

অতীতে একশ' বছর আগেও কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। বহু বিশিষ্ট বাঙালী তখন নানারকম শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে বড় কয়লা-খনির মালিক; তাছাড়া এ-কথাও হয়তো অনেকের জানা নেই যে এদেশে যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রবর্তন করেন একজন বাঙালীই। তার নাম শ্যামানন্দ সেন। জর্জ অকল্যাণ্ড নামে একজন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজের সঙ্গে যৌথভাবে তিনিই ভারতে প্রথম চটকল স্থাপন করেন। বাঙালীর জাহাজ সেকালে পণ্যদ্রব্যে বোঝাই হয়ে সাত সমুদ্র তের নদীতে পাড়ি জমাত এবং বিদেশের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধ'রেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাঙালীকে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিমুখ জাতি ব'লে কোনো অপবাদ দিতে পারেনি, তার অবকাশও ছিল না। কিন্তু, তার পর থেকেই ভাঙন শুরু হয়। দুর্ভিক্ষের অভিশাপে বাংলাদেশের আর্থনীতিক জীবনে দেখা দেয় চরম একটা সংকট। বিত্তশালী বাঙালীরা তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে স'রে এসে

জমিদারি কিনতে থাকেন—বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে তখন আধিপত্য বিস্তার করে রাজস্থানীরা।

নতুন ক'রে বাঙালী আবার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়। স্বদেশী-মন্ত্রের উদ্দীপনায় বাঙালী আবার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সংগঠনে মনোযোগী হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা ক্ষেত্রে বাঙালীরা তখন ছোট-বড় অনেক কারবার খুলে বসে। কিন্তু, ব্যবসা চালাবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায় ও মূলধনের অভাবে বহু বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যু ঘটে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেঁচে যায়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস', আর, নলিনীরঞ্জন সরকারের 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি'। জীবন-বীমা ও ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে আরও কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হ'লেও শেষ পর্যন্ত তাদের মালিকানা চ'লে যায় অ-বাঙালীদের হাতে। একটি বিষয়ে অবশ্য বাঙালীরা বহুকাল ধ'রেই আধিপত্য ক'রে আসছে ; তা হ'লো চা-শিল্পের ব্যবসায়ে। বর্তমান শতাব্দীর কিছু আগে ও পরে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স-অঞ্চলে এবং আসামে বহু বাঙালী চা-বাগান স্থাপন করেন এবং এখনও পর্যন্ত চা-এর ব্যবসায়ে বাঙালীদের আধিপত্য আছে। তাছাড়া বৃহদায়তন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন বাঙালীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু যেমন ইস্পাত-শিল্প স্থাপনে টাটা কোম্পানির চোখ খুলে দেন, ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায়েও তেমনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মার্টিন কোম্পানির অংশীদার হয়ে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু লাইট্ রেলওয়ে স্থাপন করেন, অন্যদিকে তেমনি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের কাজে ইঞ্জিনীয়ারিং শক্তির পরিচয় দিয়ে যৌথ-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ্ বৃদ্ধি করেন। রাজেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও একজন কৃতী শিল্পপতি। এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর মর্যাদা-ই বৃদ্ধি করেছেন। তাছাড়া নানারূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন ক'রে কর্মবীর আলামোহন দাস যেভাবে ভারতকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলবার পথনিদেশ করেছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ-শতাব্দীতে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ ও সাফল্য-লাভ

বাংলাদেশেই ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত এবং বিদেশী শিক্ষার প্রসারও প্রথম হয় এদেশে। শিক্ষিত বাঙালীরা তখন সহজেই ইংরেজদের অধীনে নানারকম চাকুরি জোটাতে পারত ব'লে, চাকুরির সূত্র ধ'রেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কেরানীগিরির মোহে যখন বাঙালীরা আচ্ছন্ন, অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা তখন বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ক'রে ক্রমশ সেখানেই আধিপত্য

বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করে। শিক্ষিত বাঙালীর ব্যবসায় বলতে তখন ওকালতি, না-হয় ডাক্তারি। এ-দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য সারা ভারতেই তার সুনাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, বাণিজ্যের আসর থেকে বাঙালীরা যেন ক্রমশ অন্তর্হিত হতে থাকে। বাংলার পল্লী-অঞ্চলে একরকম কুটিরশিল্পের প্রসার ছিল তাও ক্রমশ সংকুচিত বা অবলুপ্ত হয় সস্তা বিদেশীমালের আমদানিতে। ফলে, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কারিগরেরা শহরে এসে ভিড় জমায় বিদেশী-প্রতিষ্ঠান বা সরকারী সংস্থায় চাকরি নিতে। দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার হ'লে মাল-চলাচলের যখন সুবিধা হয়, অধিকসংখ্যক হাট-বাজার-বন্দর স্থাপিত হ'লে যখন বাণিজ্যের সুযোগ আসে, চাকুরির মোহে প'ড়ে বাঙালীরা তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিদেশীদের মূলধনে এদেশে ক্রমশ যখন বিভিন্ন যৌথ-কারবার স্থাপিত হয়, এবং অবাঙালীরা যখন সেই সব কারবারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে—বাঙালীরা তখনও নিদ্রিত! তারা ব্যবসায়ে অংশ-গ্রহণ করা অপেক্ষা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়াই যেন বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করে। বাঙালীদের এই দুর্বলতার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত, আর্থিক-সংকটে জর্জরিত সাধারণ বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করতে যেমন কুণ্ঠাবোধ করে, তেমনি তার প্রয়োজনীয় মূলধনেরও অভাব দেখা যায় বহু ক্ষেত্রেই। দ্বিতীয়ত, অধ্যবসায় ও অর্থনীতিজ্ঞানের অভাব। ক্ষতিস্বীকারের মধ্য দিয়েই যে একদিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় সে কথা জানা সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালী প্রাথমিক ক্ষতিস্বীকারে উৎসাহবোধ করে না! অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে অধিক দূর অগ্রসর হ'তে সে যেন ভয় পায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার অংশীদারদের স্বার্থপরতা ও অসাধুতায় যখন বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যেচ্ছুক অন্যান্য বাঙালীরা তখন প্রমাদ গণে, অসহায়বোধ করে নিজেদের। কেউ কেউ তখন গভীর হতাশায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ থেকে স'রে আসে। দেখেশুনে মনে হয়, বাঙালীর ধাতে যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সয় না।

বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তরায়

ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিড়লা-টাটার মতো বাঙালী শিল্পপতি কোথায়? বাঙালীর সাধনা এ-ক্ষেত্রে তাই সীমাবদ্ধ—একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কিংবা দোকানদারি-ব্যবসাতে বাঙালী আজ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে তা কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও, রাজস্থানী-গুজরাটী-পার্শীদের তুলনায় তারা যে অনেকটা পিছিয়ে আছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু, আরও একটা দিক আছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে অবস্থা ছিল, স্বাধীনতালাভের পর কি সে-অবস্থার কোনো উন্নতিই হয়নি? আগেকার তুলনায় বাঙালীরা কি আজ ব্যবসার প্রতি অধিক আগ্রহশীল নয়? দেশবিভাগের পর অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও কারিগর-শিল্পী পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নতুন ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছেন নিজেদের চেষ্টায় ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়।

অবাঙালী অধিকৃত পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রসর বিশেষ অর্থপূর্ণ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকে আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন। যে-সব ব্যবসায়ে বাঙালীরা আজ উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তার মধ্যে আছে—বস্ত্রশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্রশিল্প, চীনামাটি-শিল্প, চলচ্চিত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, পুস্তক-মুদ্রণ-শিল্প প্রভৃতি। বাঙালী-পরিচালিত অনেকগুলি কাপড়ের মিল যেমন এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তেমনি ভেষজ-দ্রব্য ও প্রসাধন-সামগ্রী তৈরির ব্যাপারেও বাঙালীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'বেঙ্গল-কেমিক্যাল,' 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল' ও 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র অগ্রগতি আজ বাঙালীদের মনে নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশের 'সুলেখা'-কালির আদর আজ সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও। 'বেঙ্গল পটারীজ'-এর তৈরী চীনামাটির দ্রব্যাদি, 'বেঙ্গল পেপার-মিল্'-এর কাগজ, বাংলাদেশের ছাপাখানার বই, প্রাচীরচিত্র প্রভৃতির উৎকর্ষতা সারা ভারতেই আজ স্বীকৃত। চলচ্চিত্র-শিল্পে বাংলাদেশের অগ্রগতি তো বিস্ময়কর। অনেক আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছে বাংলাদেশের ছায়াচিত্র। এ-যুগের বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত আর একটি ব্যবসায় সংস্থা 'সেন র‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া'। সাইকেল-প্রস্তুতের ব্যাপারে এই সংস্থা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য এযুগের প্রতিষ্ঠিত আর দুটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান—'ন্যাশন্যাল রবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি' ও 'সুর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড'। রেফ্রিজেরেটর তৈরি ও শীততাপনিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র প্রস্তুতে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বাঙালীমাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালীদের ব্যবসায়

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বাঙালী বিমুখ—এ অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক না হ'লেও বাঙালী যে আজ সেই অপবাদ দূর করবার জন্য সচেষ্ট, বাস্তবতার দিক থেকেই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যে-সব কারণে বাঙালীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করতে পারে না, সে-সব কারণ বিশ্লেষণ ক'রে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা যায়, তা হ'লে বাঙালী যে তার আর্থনীতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালীকে শেখাতে হবে শ্রমের মর্যাদা-জ্ঞান, তাকে দিতে হবে উপযুক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা,—সেই সঙ্গে বাঙালীর উদ্যমকে স্বীকৃতি দিতে হবে সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতার মাধ্যমে। তবেই, অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন একদিন-না-একদিন আসবেই।

উপসংহার

প্রবাসী বাঙালী

প্রবাসী বাঙালী বলতে আমরা তাঁদেরই বুঝি যাঁরা চাকুরি বা ব্যবসায়ের সূত্র ধ'রে বাংলাদেশ থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কিংবা ভারতের বাহিরে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে বসবাস করছেন। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এইরূপ বাঙালীর সংখ্যা বড় কম নয়। ভারতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখবার জন্য আজ যে সর্বভারতীয় একজাতিত্বের দাবি উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কাউকেই আর বাঙালী বা অ-বাঙালী বলা উচিত নয়—কিন্তু প্রাদেশিক নাম যতক্ষণ আছে, বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যখন আছে ততক্ষণ বাঙালী-অবাঙালীর প্রশ্ন উঠবেই। অখণ্ড ভারত যেমন সত্য, ভারতের মাটি ও তার মানুষের বৈচিত্র্যও তেমনি সত্য।

ভূমিকা

বাংলা ভাষাভাষী বহু লোক রয়েছেন আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক পরিধির সন্নিহিত ভারতের এই তিনটি অঙ্গ-রাজ্যে কয়েক শতাব্দী ধ'রেই বাঙালীরা বসবাস করছেন। বলতে গেলে তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে গেছেন ঐ সব রাজ্যের। ইংরেজ আমলের শেষ দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গেই ছিল এঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-আত্মীয়তার যোগসূত্র। আধুনিক কালে অবশ্য সে যোগসূত্র নানাকারণে শিথিল হয়ে এসেছে। আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের বহু প্রবাসী বাঙালী আজ বৈবাহিক সূত্রে ঐ সব অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছেন। মুখে বাংলা কথা বললেও, কথার টানে যেন অবাঙালী সুর! দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবাসী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা আরও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছেন গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে। মোগল আমলে কত বাঙালী বর্তমান উত্তর প্রদেশে, মধ্য-প্রদেশে বা পঞ্জাব অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলেন তার সঠিক হিসাব আজ পাওয়া না-গেলেও তাঁদের সংখ্যা যে নেহাত নগণ্য নয় সে-কথা সত্য। বিশেষ ক'রে কাশী, গয়া ও মথুরা-বৃন্দাবনে কিছুসংখ্যক বাঙালী পণ্ডিত সেই আমলেই গিয়েছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের পত্তন হয় বাংলাদেশে, এবং ১৯১১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে সেই সময় থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন আসতে সুরু করে এবং ক্রমশ চাকুরি ও ব্যবসায়ের সূত্র ধ'রে বাংলাদেশে অবাঙালীদের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী শিক্ষা ও আদবকায়দা বাংলাদেশের অধিবাসীরাই সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ব'লে ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁদের একটা আধিপত্য করবার সুযোগ আসে। সেই সুযোগেই বহু বাঙালী ব্যবহারজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও শিক্ষক উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চ'লে যান এবং ভূ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে সেই সব জায়গার স্থায়ী

বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালীর অবস্থান

বাসিন্দা হয়ে পড়েন। তারপর যখন দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তখন তো কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর বাঙালী কেরানী ও অফিসারে ছেয়ে যায়। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইংরেজী শিক্ষায় তখন বাঙালীরাই ছিল সারা ভারতে অগ্রণী। কাজেই ইংরেজ-সরকারের দপ্তরে প্রবেশ করবার যোগ্যতাও তাঁদের ছিল সবচেয়ে বেশি। এইভাবেই, উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও পঞ্জাবে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক কালে চলচ্চিত্র শিল্পের দৌলতে আবার বহু বাঙালী বোম্বাই-মাদ্রাজে গিয়ে বসবাস করছেন।

প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের যোগাযোগ

প্রবাসী বাঙালাদের সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। বহু শতাব্দী ধ'রে যাঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন, ভূ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন সেই সব অঞ্চলের, বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র বড়ই ক্ষীণ। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক থেকেও তাঁদের আজ বাঙালী ব'লে চিনে ওঠা মুশকিল। শুধু চিনতে পারা যায় তাঁদের বংশগত পদবিটুকু থেকে। না হ'লে চালচলনে, পোশাক-আশাকে এমন কি কথাবার্তায় আজ তাঁরা পুরো অ-বাঙালী। আর এক শ্রেণীর প্রবাসী বাঙালী আছেন, যাঁরা বহুকাল ধ'রে বাংলার বাইরে স্থায়িভাবে বসবাস করলেও বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আজও বিসর্জন দিতে পারেননি। তাঁদের চেষ্টাতেই ভারতের বিভিন্নাংশে গ'ড়ে উঠেছে সুস্পষ্ট একটি বাঙালীসমাজ—সে-সমাজ রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ। এই শ্রেণীর প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টাতেই ভারতের বিভিন্ন শহরে গ'ড়ে উঠেছে কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, বাঙালীটোলা, বাংলা-স্কুল, বেঙ্গলী-সোসাইটি প্রভৃতি। স্থানীয় সংস্কৃতি আদবকায়দা এঁরা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি, বাংলাদেশের সবই শ্রেষ্ঠ এ-ধারণাও এঁদের দৃঢ়, যদিও জানেন বাংলাদেশে ফিরে গেলে তাঁদের বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা আজ রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশের সঙ্গে এঁরা যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন বাঙালীয়ানার প্রতি আন্তরিক ও সহজাত শ্রদ্ধা-প্রীতির বশেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নাংশে তাঁদের অনেকের পৈতৃক বাসভূমি থাকায় বাংলাদেশের মাটির প্রতি টান তাঁদের এখনও কমেনি—বিভিন্ন ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে এসে তাঁরা বেড়িয়ে যান, আত্মীয়স্বজনের বিবাহ-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মেও তাঁদের আগমন ঘটে। আর যাঁরা সাময়িকভাবে প্রবাস-জীবন যাপন করেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ তো ঘনিষ্ঠ।

প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাত্রায় বর্তমানে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণ আছে। বহু ক্ষেত্রে শোনা যায়, প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছেন। যেমন পুরুষেরা ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে হয় পাজামা-আচকান পরছেন, নয়তো শার্ট-কোট-ট্রাউজার আচ্ছাদিত হয়ে সমাজে বিচরণ করছেন। কিন্তু,

পোশাক-আশাকের এই পরিবর্তনটা বড় কথা নয়। আসলে মনের দিক থেকে প্রবাসী বাঙালীরা কে কতদূর বাঙালীয়ানা বিসর্জন দিয়েছেন তার উপরেই পরিবর্তনের গুরুত্ব নির্ভর করে। বাংলাদেশে বাস ক'রেও কি আমাদের অনেকে আজ চলাফেরা ও কাজকর্মের সুবিধার জন্য ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার-পাজামা অবলম্বন করিনি? তবে, প্রবাসী বাঙালীরা যে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী পোশাক বিসর্জন দিয়েছেন তার একটা কারণ, তাঁদের মনে আজ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে যে, অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ধুতি-পরা বাঙালীকে আজকাল যেন কেউ আমলই দিতে চায় না। কিন্তু, সবক্ষেত্রেই এ-ধারণা ঠিক নয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'লো এই যে, প্রবাসী বাঙালী পুরুষদের মধ্যে অনেকে ধুতির মায়া কাটিয়ে উঠলেও, মেয়েরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাড়ির মায়া বিসর্জন দিতে পারেননি। বাঙালী মেয়েদের দেখাদেখি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহু জায়গায় মেয়েরা আজ শালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ি ধরেছেন। তাঁদের পরিধেয় শাড়ির পাড়ে, জমিনের কাজে ও রঙে এমন কি পরবার ধরনে পর্যন্ত বাঙালী প্রভাব সুস্পষ্ট। খাদ্য-বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, বাঙালীর প্রধান খাদ্য যে ভাত, তার জন্যে চালের সরবরাহ যদি পর্যাপ্ত না থাকে তাহ'লে বাঙালীকে বাধ্য হয়েই তার খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন করতে হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গমের আধিক্য থাকায় ঐ-সব অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীরা যদি গমকেই প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন তাহ'লে কি তাঁদের দোষ দেওয়া যায়? যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের লোকেরাও কি অবস্থার গতিকে গমজাত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি? তেমনি আবার বিপরীত প্রভাবও আছে। যেমন, প্রবাসী বাঙালীদের কল্যাণেই আজ সন্দেশ-রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টদ্রব্য বাংলাদেশের বাইরে বহু জায়গায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি প্রবাসী বাঙালীরা তাঁদের জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন, তাহ'লে সেটা সহনশীলতা ও ঔদার্যেরই পরিচায়ক। তবে যদি কেউ বাঙালী হয়েও অন্তরে অন্তরে বাঙালীয়ানাকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন, তাহ'লে সেটা আত্মমর্যাদা-হানিকর তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, প্রবাসে বাস ক'রেও পৃথিবীর কোনো দেশের লোকই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে চায় না।

প্রবাসী বাঙালীর জীবনযাত্রা—তার পরিবর্তন ও প্রভাব

বাঙালী যেখানেই বাস করুক না কেন, সে তার নিজস্ব মাতৃভাষা, শিক্ষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করবে—এই আদর্শ কাম্য। বাংলাদেশে যে বহুসংখ্যক অবাঙালী দুই শতাব্দী ধ'রে ঘর বেঁধেছেন, তাঁরা সামগ্রিক বাঙালী-সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে গেলেও তাঁদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি। এ নিয়ে কোনো অভিযোগ ওঠেনি, ওঠবার সঙ্গত কোনো কারণও নেই। যে-সব বাঙালী বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করছেন, তাঁরাও সেই রকম থাকবেন এ প্রত্যাশা করা নিশ্চয় অসঙ্গত নয়। আসামে লাঠালাঠি বা মারামারি ক'রে, কিংবা বিহারে সরকারী

প্যাঁচের কৌশলে এই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে অবদমিত ক'রে রাখা যাবে না। বাঙালীর ঘরোয়া সংস্কৃতি এবং বাইরের সংস্কৃতি অনিবার্য কারণেই পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে। যে-সংস্কৃতি বলবান, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যার যুগোপযোগী উপযোগিতা আছে, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব বেশি হবেই। প্রবাসী বাঙালীরা যেখানে নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে বসবাস করেন, সেখানে তাঁদের মর্যাদা কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হবে না। তাছাড়া, আর একটি বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে! তা হ'লো বাঙালীর 'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌'-এর দম্ভ। সাধারণত এই মনোভাবের জন্যই আজ বাংলার বাইরে বাঙালী-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া সর্বদাই কাম্য, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ যে অন্যের উপরে কিরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে কোনো বাঙালীর পক্ষেই তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কারণ, অহঙ্কারই পতনের মূল। বাংলার বাইরে যাঁরা বসবাস করবেন, তাঁদের উচিত হবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের মতোই বসবাস করা। স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করাও তাঁদের বাঞ্ছনীয়। কারণ, তার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। বরঞ্চ, অন্য একটি ভাষা শিক্ষা ক'রে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয় তাতে। অবাঙালীদের মধ্যে যাতে বাংলাভাষার প্রসার হয় পারস্পরিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে সে চেষ্টা করা উচিত।

বাংলাভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা রক্ষণ

বাংলাভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা শুধু যে বাংলাদেশ থেকেই বিস্তৃত হয়েছে তা নয়। এ-বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীদের দানও উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবাঙালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর (অধুনা 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন' নামে পরিচিত) মাধ্যমে যে চেষ্টা হয়েছে তার মূল্য অনেকখানি। বঙ্গ-সংস্কৃতির আর একটা দিক ক্রমশ সর্বভারতে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তা হ'লো বাংলা-দেশের চারুকলা ও সঙ্গীত। 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট'-এর সমাদর ভারতের সর্বত্র। এ-বিষয়ে প্রবাসী বাঙালী চিত্রশিল্পীদের দান অনেকখানি। শিল্পী দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, অসিত হালদার, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সকলেই প্রবাসী বাঙালী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর আজ ভারতের সর্বত্র। বহু অবাঙালী রবীন্দ্রসঙ্গীতের গোঁড়া ভক্ত, এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনের ব্যাপারেও আজ তাঁদের মধ্যে প্রবল একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ-ব্যাপারে প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যম ও সহযোগিতার কথাও অনস্বীকার্য। সম্প্রতি উত্তর ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়বার যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তার পিছনেও আছে প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টা। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা সর্বভারতীয় খ্যাতি বা প্রশংসালাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীঅরবিন্দ, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবি ও সংসদীয়-সদস্য হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের দান

বনফুল, গায়ক-কবি ও অরবিন্দশিষ্য দিলীপকুমার রায়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, সেতারবাদক রবিশঙ্কর প্রভৃতি। তাছাড়া, খ্যাতনামা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে প্রবাসে।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা যা ছিল, স্বাধীনোত্তর যুগেও তা হ্রাস পায়নি, বরং বলা যেতে পারে যে, দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে-সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়ছে। বর্তমানে যাঁরা ভাগ্যান্বেষণে বাংলার বাইরে পা বাড়াচ্ছেন, তাঁদের অনেকে যেমন সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধবেন না, তেমনি আবার অনেককেই অবস্থার বিপাকে প'ড়ে প্রবাসেই ঘর বাঁধতে হবে। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন আজ নিদারুণভাবেই সংকুচিত; তার উপরে এ-রাজ্যে অবাঙালীদের সংখ্যাও এত বেশি যে, কর্মক্ষম সমস্ত বাঙালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা এখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই, বাঙালী তরুণরা আজ কাজের সন্ধান পেলেই দেশত্যাগ করে বা করতে বাধ্য হয়। দেশবিভাগের ফলে যে অসংখ্য উদ্বাস্তু বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে আসেন, তাঁদের সকলের পুনর্বাসন এ-রাজ্যে সম্ভব হয়নি। তাই, সরকারী উদ্যমে ও ব্যক্তিগত চেষ্টাতে তাঁদের অনেককেই আজ বাংলার বাইরে আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং পরে আরও হবে। আন্দামান, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে যেমন বহু উদ্বাস্তু বাঙালী পুনর্বাসিত হয়েছেন, তেমনি 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার' মাধ্যমেও অনেক বাঙালীকে প্রবাসী হ'তে হবে।

প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি ও তার কারণ

প্রবাসী বাঙালীদের এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, বাংলার বাইরে বসবাস করার ফলে তাঁরা চিরদিন স্থানীয় অধিবাসীদের কৃপার পাত্র হয়ে থাকবেন। সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় হিসাবে এ-আশঙ্কা হয়তো তাঁদের মনে জাগতে পারে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে আসামে যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু, মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রবাসে যে-সব বাঙালী বসবাস করছেন বা করবেন তাঁদের কখনও অন্যের কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না, যদি তাঁরা নিজেদের উচ্চমন্যতার দম্ভ পরিহার ক'রে, স্থানীয় সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার মনোভাব দেখান। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যেমন প্রত্যেকের থাকা দরকার, তেমনি সমষ্টিগত একতাও প্রয়োজন। যে-রাজ্যে বাঙালী বাস করবে সে-রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকাও প্রয়োজন। প্রবাসী বাঙালীদের যেমন উচিত হবে স্থানীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু গ্রহণ, তেমনি নিজেদের সংস্কৃতি অন্যান্যদের মধ্যে বিস্তার করিয়ে দেওয়া। এতে ক'রেই একদিন গ'ড়ে উঠবে বলিষ্ঠ এক সর্বভারতীয় সংস্কৃতি, যে-সংস্কৃতির মাধ্যমে আসবে সর্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতি।

উপসংহার

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব

সুদীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাধনা এবং আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী তার বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছে, হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে ফাঁসির রজ্জু গলায় প'রে। অনেক অস্থির বজ্র বানিয়ে বাঙালী একদিন সাম্রাজ্যবাদের বুকে যে আঘাত হেনেছিল, সেই আঘাতেই শেষ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ। পরাধীনতার সকল লজ্জা ও গ্লানি থেকে দেশবাসী আজ মুক্ত। ভারতের এই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে-ইতিহাস, সে-ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছে বাংলা ও বাঙালীকে নিয়ে। কারণ, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব ও বাঙালীর আত্মাহুতির মূল্য যে অনেক।

ভূমিকা

একথা সত্য যে, বাংলাদেশের পলাশী-প্রান্তরেই একদিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। বোধহয় সেই কারণেই আবার স্বাধীনতা-অর্জনের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল এই বাংলাদেশেই। বাঙালীর ললাট পলাশীর কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত হয়েছিল ব'লেই বাঙালী চেয়েছিল সে-পাপের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত করতে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন মনীষী রামমোহন, যাঁর পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে ব্রিটিশ-শাসনমুক্ত ভারতের রূপ। উনবিংশ শতকের মুমূর্ষু পাণ্ডুর ভারতবর্ষে প্রথম প্রাণসঞ্চার করেছিলেন রাজা রামমোহন তাঁর জাতীয় আদর্শের মধ্য দিয়ে, তাঁর চিন্তাধারায় ও ক্রিয়াকলাপে। ইংরেজ জাতিকে ও তাদের শাসননীতির গূঢ় উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক হবে ব'লে রামমোহন উদ্যোগী হয়েছিলেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে প'ড়ে দেশবাসীর যে অধঃপতন ঘটেছিল তার জন্য রামমোহন একসময় অনুতপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দূরপ্রসারী লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। যাই হোক, তাঁর প্রেরণায় দেশবাসী ইংরেজী শিক্ষায় প্রবুদ্ধ হ'লো এবং বিলেতে আন্দোলন ক'রে তিনিই প্রথম এক আইন পাস করালেন যার ফলে দেশের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত হবার অধিকার জন্মাল। স্বাধিকার অর্জনে এই যে প্রচেষ্টা তার মূল্যও বড় কম নয়। বিলেতে তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পেয়ে ইংরেজ বুঝেছিল যে, তাঁর মতো পুরুষসিংহের আবির্ভাব যে-জাতির মধ্যে সম্ভব, সে-জাতিকে নির্বিবাদে দীর্ঘকাল দমিয়ে রাখা চলবে না। তাই, ভারতীয়দের সম্পর্কে তখন থেকেই সতর্ক হয়েছিল ইংরেজ-রাজশক্তি। রামমোহন ছিলেন যেন স্বাধীনতা-মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি প্রায়ই বলতেন, স্বাধীনতার বিরোধী জাতি পরিণামে কোনদিনই জয়লাভ করতে পারে না।

রাজা রামমোহনের প্রেরণায় স্বাধিকার অর্জনে দেশবাসীর উদ্যম

যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকেই তিনি পৃথিবীর মুক্তি-প্রয়াস ব'লে মনে করতেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি—এ-শিক্ষা আমরা পাই তাঁর কাছ থেকেই। 'রিফর্ম বিল' উপলক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছিলেন—'একে শুধু সংস্কারকামী ও প্রাচীনপন্থীদের সংগ্রাম বললে চলবে না, এ হ'লো স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম।' ইংরেজ-শাসনের গোড়ার দিকে যখন ভারতীয় সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির মুদ্রণ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, রামমোহন তখন তার বিরুদ্ধে শুধু স্বদেশে নয় ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টে পর্যন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য স্বাধীন ভারতে যে উদ্যম দেখা দিয়েছে, সেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তথা ভূস্বামীদের সম্পদ্-বৃদ্ধির প্রতিবাদও করেছিলেন সত্যদ্রষ্টা রামমোহন।

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহনের মতো একজন স্বাধীনতাপ্রিয় মনীষীর আবির্ভাবের ফলেই বাংলাদেশে রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ হয়। বাংলাদেশ যখন স্বাধিকার অর্জনে জেগে উঠল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি তখনও মোহঘুমে নিদ্রিত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে একদিকে যেমন রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ হ'লো, অন্যদিকে তেমনি বাংলাসাহিত্যেও পরাধীনতার বেদনাবোধ জ্বালাময়ী ভাষায় ফুটে উঠতে লাগল। বাঙালীর অন্তরে অন্তরে তখন দেখা দিল স্বাধীনতালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল শিক্ষিত বাঙালী। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল, তখন বাংলাদেশের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষের বজ্র নির্ঘোষ ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টেকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। বাঙালীরা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে লাগলেন ইংরেজ-শাসকবর্গের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে। ১৮৫১-সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হ'লো 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'—রাজা রাধাকান্ত দেব হ'লেন তার প্রথম সভাপতি, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক। ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী'-সভার ও 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে স্বদেশীভাব প্রচারের যে চেষ্টা চলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্যও কি কম? সে-সময় একদিকে যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের বিভিন্ন অতীত গৌরবকাহিনী লিখে জনসাধারণের মনে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর অনলবর্ষী লেখার প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করছিলেন। নীলচাষীদের নিরুপদ্রব অহিংস-প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনায় হরিশ্চন্দ্র যে স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন আজও তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্রমাগত লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, বড়লাট-ছোটলাটদের বুঝিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত যেভাবে নীলচাষীদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেছিলেন দেশবাসীর স্বাধিকার অর্জনে তার মূল্যও বড় কম নয়। নীল-

'তত্ত্ববোধিনী'-র আমলে স্বদেশী প্রচার : নীল-চাষীদের সংগ্রাম

চাষীদের এই আন্দোলন সফল করতে আর একজনের চেষ্টাও বিশেষভাবে স্মরণীয়,—তিনি হলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর 'নীলদর্পণ'-নাটক শুধু যে বঙ্গসমাজেই আলোড়ন তুলেছিল তা নয়, সেই আলোড়নের প্রতিক্রিয়া যে কত গভীর ও দূরপ্রসারী হ'তে পারে বিদেশী-সরকার তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজশক্তি অহিংস-প্রতিরোধের শক্তিকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে লর্ড ক্যানিং-এর আমলে বাংলাদেশেই। অহিংস-সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী-শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাংলাদেশ থেকেই নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রেরণা পেয়েছে সমগ্র ভারতের অধিবাসী। বাংলার রাজনীতি-চর্চায় উনংবিংশ শতকে যাঁরা বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার আর একটি স্মরণীয় ঘটনা 'হিন্দুমেলা'-র অনুষ্ঠান। এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকের মধ্যে স্বদেশী জিনিসের প্রসার ও সেই সঙ্গে স্বদেশী ভাবধারার সম্প্রসারণ।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে রাজনীতি চর্চা : 'হিন্দুমেলার' উদ্ভব : স্বদেশী প্রচার

পরবর্তীকালে জাতীয়-কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আমরা যে জাতীয় কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে পাই, তার গোড়াপত্তন ঘটে বাংলার এই 'হিন্দুমেলা' থেকেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা ব'লে যে একটি মেলার সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ ব'লে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম'। ভারতে স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠার দাবিও প্রথম ওঠে এই বাংলাদেশে। সে-দাবি উত্থাপন করেন বিখ্যাত রাজনীতিক কৃষ্ণদাস পাল। হিন্দুমেলার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের যে উন্মেষ ঘটে, পরে বঙ্কিমসাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাই ওঠে ব্যাপক হয়ে। বাঙালীর অস্থি-কঙ্কালের উপর ব্রিটিশ ভারতের বনিয়াদ গ'ড়ে উঠেছে—একথা শুনিয়ে তিনিই জাতিকে দিয়ে গেছেন মাতৃপূজার মহামন্ত্র—'বন্দেমাতরম্'। সে-মন্ত্রে শুধু বাংলাদেশ জেগে ওঠেনি, আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের নরনারী জেগে উঠেছে নবশক্তি অর্জন ক'রে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আরও অনেক বাঙালী সাহিত্যিক ও কবি, যেমন রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলা দেবী-চৌধুরানী প্রভৃতি তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। জাতীয় উন্মাদনা প্রসারের ব্যাপারে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দানও বড় কম নয়। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির নাটক জাতীয় ভাব প্রচারে যে বিশেষ সহায়তা করেছে সে-কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এদিক থেকে আরও পরবর্তীকালে চারণকবি মুকুন্দদাসের জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলির কার্যকারিতাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জাতীয় ভাবাধারার সম্প্রসারণে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই যে ভূমিকা গ্রহণ করে

ইংরেজশক্তি তার প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল ব'লেই বাঙালীর উপরে চলে তার কঠোর শাসন ও নিপীড়ন। কিন্তু বাঙালীর দেশপ্রেমকে বিদেশী সরকার কোনদিনই পর্যুদস্ত করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে দেখা দিল স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা। নব্যভারতের জাগরণ-মন্ত্রের ঋষিরূপে সমগ্র ভারত যেন তাঁকে স্বীকার ক'রে নিল। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনের মূলেও তো সেই বিবেকানন্দেরই আদর্শ। স্বামীজী দেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ না দিলেও, তিনি যে-সেবাধর্ম জনগণের মধ্যে বিস্তার ক'রে গেছেন, আধুনিক ভারতে গণজাগরণরূপে আমরা তো সেই মহৎ ধর্মেরই আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রে স্বামীজী একদিন জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন—'দুর্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ও ভেদাভেদ ত্যাগ ক'রে মহাযুগ-পরিবর্তনে সহায়তা কর।' একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, সত্যাদর্শ প্রচারে, অস্পৃশ্যতা বর্জনে ও সেবাধর্মে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপ্রবাহে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় জাতির নব-জাগরণ

এইভাবে জাতি যখন ক্রমশ সুসংবদ্ধ হ'লো, তখন দেখা দিল প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের খ্যাতনামা দেশনেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কংগ্রেসের মাধ্যমে চলতে লাগল স্বদেশী আন্দোলন। বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে দেখা দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও রাজনীতিক সভার মধ্যে তাঁরা দেশব্যাপী আলোড়ন তুললেন, প্রতিষ্ঠা করলেন, 'ভারতসভা'। বাগ্মী হিসাবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করলেন সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র। ১৯০৩-সালে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন লালমোহন ঘোষ। কংগ্রেস সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণ এবং স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের তূর্যনিনাদ সেদিন যে শাসকবর্গের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে বাগ্মী, দেশহিতপ্রাণ, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী লালমোহনের মতো কংগ্রেস-নায়কের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলেই ভারতে 'স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা'র প্রবর্তন হয়। এদিকে আবার জাতীয়তার নতুন ব্যাখ্যায় সকলকে আকৃষ্ট ক'রে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দির'কে কেন্দ্র ক'রে বাংলার বিপ্লবী শক্তি উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। একদিকে অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাসী কংগ্রেস-কর্মীদের আন্দোলন, অন্যদিকে সশস্ত্র-বিপ্লবে আস্থাবান দেশসেবকদের কার্যকলাপে বাংলাদেশে নতুন ক'রে এক উন্মাদনা জাগল। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যেও দেখা দিল দুই দল—দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী। দক্ষিণপন্থীরা

কংগ্রেসী-আন্দোলন ও বিপ্লবপন্থীদের আবির্ভাব

আপস-মীমাংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে চাইলেন, আর বামপন্থীরা চাইলেন আপসহীন সংগ্রাম।

১৯০২ সালে বাংলাদেশে 'শিবাজী-পূজার' যে প্রবর্তন হয় তাতে ক'রে বাঙালী ও মারাঠার মিলন ঘটে অন্তরে অন্তরে। এই উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী'-কবিতা অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল নতুনভাবে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিতা ও রচনার মাধ্যমে দেশবাসী যেভাবে প্রেরণা পেল, দেশের জাতীয় আন্দোলনে সেগুলি যেন দেখা দিল পরোক্ষ অথচ দুর্জয় শক্তিরূপে। রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে বারংবার আবির্ভূত না হয়েও দেশের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত ছিলেন, এবং আজীবন তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনেরই চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রতিটি রচনা বিদেশী সরকারকে তীব্রভাবে বিচলিত ও আঘাত করেছে। সরকারী প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেশের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মনেও তা গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। ১৯০৪-সালে যখন বাংলার সংস্কৃতিকে ও সংহতিকে চিরকালের মত খর্ব ক'রে দেবার মতলবে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করলেন, সারা বাংলাদেশে তখন যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯০৫-সালের ৭ই অগস্ট সমগ্র বাঙালী জাতি বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করে। সেই ঘোষণাকেই বিংশ-শতাব্দীর ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম ঘোষণা ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। দেশব্যাপী সেদিন এক অভূতপূর্ব সাড়া প'ড়ে যায়, রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের চিত্ত হয় বিক্ষুব্ধ। 'রাখী-বন্ধন'-এর ধুম প'ড়ে যায় বাংলার ঘরে ঘরে। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বর্তমান ভারতের ভাবগুরু রবীন্দ্রনাথের গান—'বাংলার মাটি, বাংলার জল,' ও 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই।' বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি দেশনেতারা। সেই ১৯০৫-সালেই বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে ওঠে চরকার গুঞ্জনধ্বনি, পরে যে-চরকাকে গান্ধীজী বিদেশী-শাসনের মূলোৎপাটনে অমোঘ অস্ত্র ব'লে বারবার ঘোষণা করেছিলেন। ১৯০৫-সালে খণ্ডিত বঙ্গের উভয় অঞ্চলে ছাত্র-দলন শুরু হ'লে রংপুরের ছাত্ররা একটি জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে তার যে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে তাও স্মরণযোগ্য। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জাতীয়-বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার গৌরবও বাংলাদেশের। পরে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদ বা জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় কলকাতায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির চেষ্টায়।

শিবাজী-উৎসব, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা, বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন ও বিদেশীবর্জন, জাতীয়-বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব যেমন অবিসংবাদিত সত্য, তেমনি সত্য তার বিপ্লব-সাধনা। রামমোহন থেকে শুরু ক'রে সুরেন্দ্রনাথ-অরবিন্দ পর্যন্ত যে-যুগ, সে-যুগের ইতিহাসে বাঙালীর নেতৃত্ব যেমন সারা ভারতকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত

করেছে, বাঙালীর বিপ্লব-সাধনাও তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে অন্যান্য প্রদেশবাসীর অন্তরে। বিপ্লবযুগের প্রথম বলি কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। একজন প্রাণ দেয় ফাঁসির মঞ্চে, অন্যজন ইংরেজের কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় আত্মহত্যার পথে। এই দুই নির্ভীক দেশকর্মীর বীরত্বকাহিনী আজও দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কারাগারে অনশনব্রতী যতীন দাসের মৃত্যুবরণ এবং প্রত্যক্ষসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বাঘা যতীনের স্বেচ্ছামৃত্যু—এই দুই ঘটনাই ভারতের তরুণশক্তিকে নতুন ক'রে যেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে আরও কত-না দেশকর্মী নিজেদের জীবন উৎসর্গ ক'রে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছেন। বাংলাদেশের এই বিপ্লবী সংগ্রাম একদিন যেভাবে সারা ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল, বিদেশী-সরকার যদি না তা কঠোর হস্তে দমন করতেন, তাহলে বোধকরি অনেক আগেই তাঁদের এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হ'ত।

বাঙালী বিপ্লবী-দলের কর্মসাধনায় দেশব্যাপী উন্মাদনা

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে,—আর, বাংলার নেতৃত্বেই হয়েছে সে-আন্দোলনের সূত্রপাত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়-সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করেছিল, স্বাধীন ভারতে আজকে আমরা তারই সুফল ভোগ করছি। ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস-সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকা মজুমদার, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার নায়কেরা অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গেই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকশিত আদর্শ তো মূর্তিময় হয়ে উঠেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ-অভিযানে। ভারতের বাইরে থেকে নেতাজীর সশস্ত্র অভিযান, আর দেশের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—এই দুই মহাশক্তির সম্মুখীন হয়েই ইংরেজ এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে বাধ্য হয়। পলাশীর প্রান্তরে একদিন স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, দিল্লীর লালকেল্লার শীর্ষদেশ রঞ্জিত ক'রে সেই স্বাধীনতা-সূর্য আবার উদিত হয়েছে। কিন্তু, দ্বিখণ্ডিত বাংলার মুখে কি সেই অরুণচ্ছটার দীপ্তি আনন্দের রেখা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে? ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত বাংলা আজ শুধু দ্বিখণ্ডিতই নয়, সমগ্র বাঙালীসমাজ আজ বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত। বাঙালীর জীবনে স্বাধীনতা যেন কোন প্রতিশ্রুতিই বহন ক'রে আনল না!

স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্বে বাঙালী মনীষা —উপসংহার

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক-সাহিত্য

বাংলা সংবাদপত্র তথা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যাদের কথা মনে পড়বে তাঁরা হলেন খ্রীষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায়।

ভূমিকা—খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের উদ্যম

এদেশে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন এবং সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরাই হলেন পথিকৃৎ। যে-যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে সংবাদপত্র তথা সাময়িক পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হয়, সে-যুগের বাংলাসাহিত্য-ভাণ্ডার কাব্যসম্পদে ঐশ্বর্যমণ্ডিত থাকলেও, গদ্যসম্পদে ছিল নিতান্ত দরিদ্র। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার মোহে বাঙালী তখন অন্ধ, অন্যদিকে পারসী ছিল রাজভাষা। ফলে, বঙ্গভাষাজননী তখন নিজের সন্তানদের কাছেই অবজ্ঞাত, অনাদৃত। কিন্তু, আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের চেষ্টাতেই শ্রীরামপুরে প্রথম বাংলাভাষার মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হ'লো। আর, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই যেন বাংলাদেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের নব-জাগরণ।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের প্রথম যুগের অবস্থা বিচার করতে গেলে অবশ্য নিতান্তই হতাশ হ'তে হবে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্য অনেকখানি। বাংলাভাষার প্রথম সাময়িক-পত্রিকা হ'লো উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে প্রকাশিত ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন'। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হবার মাসখানেকের মধ্যেই আবার সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের আকারে দেখা দিল 'সমাচার-দর্পণ'। যতদূর জানা যায়,—বাংলাভাষায় এই 'সমাচার-দর্পণ'-ই হ'লো প্রথম সংবাদপত্র। মার্শম্যান নামে সম্পাদক হ'লেও, এই সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন দেশীয় পণ্ডিতেরাই। এতে দেশবিদেশের খবরাখবরের সঙ্গে থাকত ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রথম যুগ

শ্রীরামপুর থেকে যে-সময় 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশিত হয়, সে-সময় কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তার নাম—'বাঙ্গাল গেজেটি' (বা 'বেঙ্গল গেজেট')। 'সমাচার-দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি'-র মধ্যে কোন্‌খানি আগে প্রকাশিত হয় তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ দুটি পত্রিকা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে যাই হোক, সম্পূর্ণভাবে বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বছরখানেক চলবার পর এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু ক্রমশ দেশে আরও নানা পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হ'তে থাকে। এই সব সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই শিক্ষিত বাঙালী সর্বপ্রথম গদ্যসাহিত্যের রসগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন; গদ্যসাহিত্য

সৃষ্টির দিকেও তখন একটা উৎসাহ দেখা যায় লেখকগণের মধ্যে। নতুন নতুন গল্প যেমন সৃষ্ট হ'লো, নতুন নতুন তথ্যও তেমনি পরিবেশিত হ'লো বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। ফলে, সাময়িক এইসব পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের চাহিদা বেড়ে গেল বিস্ময়করভাবে। মাসিক-পত্রিকার আকারে দেখা দিল 'পশ্বাবলী', 'জ্ঞানোদয়', 'বিজ্ঞান-সেবধি', 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি। আর, সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল—'সম্বাদ-কৌমুদী', 'সমাচার-চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত', সংবাদ-রসরাজ' প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা প্রয়োজন যে, তখনকার দিনেও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলি নিজেদের মধ্যে রেষারিষি ক'রে চলত। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র ধর্মীয় বা দলীয় মত প্রচারের বাহন ছিল ব'লে মতবিরোধ ও দলাদলি লেগেই থাকত; আর সেই কারণে, প্রথম যুগের বাংলা সাময়িক-সাহিত্য বিশেষ উন্নতিলাভও করতে পারেনি। ভাষার দিক থেকে অবশ্য 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'-র বিশেষ একটা স্থান ছিল। কারণ বাংলাগদ্যের জনক রাজা রামমোহন ছিলেন তার প্রধান লেখক। রামমোহনের বাংলাগদ্য বর্তমানকালের পাঠকদের কাছে সমাদৃত না হ'লেও সেকালে তাঁর রচিত গদ্যভাষাই ছিল বাংলা-সাধুভাষার আদর্শ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-ও ছিলেন সেকালের বঙ্গসাহিত্যের একজন দিক্‌পাল। গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাজেই, 'সমাচার-চন্দ্রিকা'-র সম্পাদকরূপে তিনি যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। লর্ড হেস্টিংসের আমলে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার উপর থেকে সরকারী বিধিনিষেধ রহিত হওয়ায় যেমন কলকাতায় একসঙ্গে অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, লর্ড আমহার্স্টের আমলে তেমনি অনেকগুলি কাগজ বন্ধ হয়ে যায়, লাইসেন্স-প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আত্মপ্রকাশ করে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'। বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকাখানির যে বিশেষ একটা স্থান আছে সে-কথা অনস্বীকার্য। প্রথমত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর মতো শক্তিশালী পত্রিকা সে-যুগে আর ছিল না, দ্বিতীয়ত 'সংবাদ-প্রভাকর'-ই বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

দৈনিক সংবাদপত্র : 'সংবাদ-প্রভাকর'

প্রথমে সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করলেও, কিছুদিনের মধ্যেই দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হয়। সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষা গদ্য-পদ্য রচনা বেশি থাকত ব'লে আমরা একে সাহিত্য-পত্রিকা আখ্যাও দিতে পারি। এই পত্রিকায় একাধারে যেভাবে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলত, অন্য কোনো পত্রিকাতে তেমনটা হ'ত না। তাছাড়া, সহজবোধ্য সরল ভাষার জন্য 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। ঈশ্বর গুপ্ত পদ্যে ও অক্ষয়কুমার দত্ত গদ্যে এই সাময়িক পত্রিকার বনিয়াদ সুদৃঢ় ক'রে তোলেন। সেকালের খ্যাতনামা লেখকমাত্রেই ছিলেন 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর লেখক। কবি রঙ্গলাল, নাট্যকার দীনবন্ধু ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি

অনেকেরই সাহিত্যচর্চার সুযোগ ঘটেছিল 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর মাধ্যমে। এর পর, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর যে-সব পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো—'সংবাদ-সুধাকর', 'সংবাদ-ভাস্কর', 'সংবাদ-গুণাকর', সংবাদ-বিষাদসিন্ধু', 'সংবাদ-সৌদামিনী', 'সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়ী' প্রভৃতি।

বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের দ্বিতীয়-যুগ শুরু হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে। স্বদেশী প্রচার ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রসারণে সেকালের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা সুবিদিত। 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসাবেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে। পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন সে-যুগের শক্তিশালী লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। নির্ভীক সম্পাদক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রকাশ থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্নতি শুরু হয়। সাহিত্যের আসরে গুরুগম্ভীর আসন নিয়ে এই পত্রিকা উচ্চ দর্শন, বিজ্ঞান ও নৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম লেখক। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলীর বিশেষ ক'রে তার লেখা স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহু-বিবাহ ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি, সেকালের বঙ্গসমাজে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে আর যে-সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে। বাংলাভাষায় প্রকৃতপক্ষে এখানিই হ'লো প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র। বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষার সারল্য ছিল এই পত্রিকাখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিত্তাকর্ষক সহজ ও সরল ভাষায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সমাজের রীতিনীতি, বিভিন্ন দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক বিবরণ যেমন পরিবেশন করে, তেমনি বাংলা গদ্য-ভাষার কী ক'রে সংস্কার ও উন্নতি করা যায় তারও পথ দেখায়। মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রথমে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন—কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিকল্পনায় ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায়; তার নাম—'সোমপ্রকাশ'। রাজনীতি বিষয়ে রীতিমত আলোচনা 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম শুরু হয়; সেদিক থেকে পত্রিকাখানির বিশেষত্ব যে অভিনব সেকথা অনস্বীকার্য। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও কিছুদিন এই পত্রিকা সম্পাদনা করে-ছিলেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রকাশন-স্থান ছিল ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতা। কিন্তু, বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও সেকালে অনেকগুলি সংবাদ-পত্রিকা তথা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত মফঃস্বল পত্রিকাগুলির মধ্যে নাম

সাময়িক সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও মফঃস্বলের পত্র-পত্রিকা

করা যায়—'মুর্শিদাবাদ সংবাদপত্রী', 'রঙ্গপুর বার্তাবহ', 'বর্ধমান চন্দ্রোদয়', 'সংবাদ-বর্ধমান', 'ঢাকা-প্রকাশ', 'ফরিদপুর-দর্পণ', 'ঢাকা-দর্পণ', 'পাবনা-দর্পণ' প্রভৃতির। এদের বেশির ভাগই ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

সাময়িক সাহিত্যের তৃতীয়-যুগ ধরা হয় বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' থেকে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চাঙ্গের এই মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে শক্তিশালী এক লেখকগোষ্ঠীর রচনাসম্পদ নিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সভ্যতা-গঠনে এই পত্রিকার উদ্যোগ অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন'-এ। তাছাড়া লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তৃতীয় যুগের আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্রিকা হ'লো—'ভারতী'। এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই কাগজের সম্পাদনা করেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর মতোই, বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, 'ভারতী' বিশিষ্ট এক স্থান অধিকার করে। ক্রমশ আর যে-সব সাময়িক-পত্রিকার উদ্ভব হয় সেগুলির মধ্যে খ্যাতি অর্জন করে —'সাধনা', 'সাহিত্য', 'সখা', 'যমুনা', 'বালক', 'মুকুল', 'মানসী', 'ভাণ্ডার', 'পরিচারিকা', 'বঙ্গবাণী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র,' 'উপাসনা,' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি। তৃতীয়-যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মাসিক-পত্রিকা 'সবুজপত্র' ও 'কল্লোল'। সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'সবুজপত্র' একেবারে যেন সবুজ রঙ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। সাহিত্যে আধুনিক কথ্যভাষার প্রচলন হয় এই 'সবুজপত্রের' মাধ্যমেই। সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) —যাঁর প্রত্যেকটি রচনাই পাঠকবর্গকে নতুনত্বের আস্বাদ দিয়ে তৃপ্তিদান করত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে আধুনিককালের খ্যাতনামা বহু লেখকই ছিলেন 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'কল্লোল' এল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রূপ নিয়ে, যে-রূপ প্রাচীনপন্থীদের কাছে শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি করল না, অনেকে রীতিমত আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'কল্লোল'-লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ছিলেন বয়সে নবীন এবং তাঁদের রচনায় স্বভাবতই যৌবনধর্মের উচ্ছ্বাস-প্রাবল্য ছিল। তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু যেমন ছিল নতুন, রচনার আঙ্গিকেও তেমনি তাঁরা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে এই তৃতীয়-যুগটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই তৃতীয় যুগেই হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ, কাজী নজরুল প্রমুখ সাহিত্যরথীদের বিস্ময়কর সাহিত্য-সৃষ্টি।

সাময়িক-সাহিত্যের তৃতীয় যুগ—'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী' 'সবুজপত্র' ও 'কল্লোল'

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা যেভাবে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেছে, বাংলা সংবাদপত্র কিন্তু ঠিক সেই গতিতে বিস্তারলাভ করেনি। শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই সে-যুগে ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুরাগী ছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে 'ইংলিশম্যান' নামে যে সংবাদপত্রটি আত্মপ্রকাশ করে সারা

ভারতেই ছিল তার চাহিদা। পরবর্তীকালে ঐ 'ইংলিশম্যান'-ই 'স্টেটসম্যান' নামে রূপান্তরিত হয় এবং আজও সেই 'স্টেটসম্যান'-পত্রিকা শিক্ষিতজনের নিকট সমাদৃত। স্বদেশীযুগে অবশ্য বাংলা সংবাদপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার' (প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজী), 'সম্মিলনী', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি। পরে ধীরে ধীরে দেখা দেয় 'দৈনিক বসুমতী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর' (নবপর্যায়) এবং আরও অনেক বাংলা খবরের কাগজ। বলা বাহুল্য, বাংলা সংবাদপত্র আজ বিশেষভাবে উন্নত এবং অনেক কাগজই জনমত-গঠনে বিশেষ শক্তিশালী। বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার এখন চতুর্থ-যুগ বা আধুনিক যুগ চলছে। মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গেও ঘটছে তাদের বিরাট পরিবর্তন; কিন্তু, দলীয় মতবাদের রেষারিষি চলছে এখনও। তবে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা আধুনিক যুগের কাগজগুলি ভোগ করছে সে-স্বাধীনতা পূর্বে এমন ব্যাপক ছিল না; বর্তমান যুগের সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে দেশবাসী যেমন রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তাধারায় আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, তেমনি সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি জোগাচ্ছে তাদের মনের বিচিত্র খোরাক।

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার আধুনিক যুগ

সংবাদপত্র তথা সাময়িক পত্র-পত্রিকা জাতীয় ভাবধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, জাতীয় সভ্যতারও প্রধান মানদণ্ড। কারণ, সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই একটা জাতির রাষ্ট্রনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই দলের মধ্যেই এদের আবেদন বিশেষ প্রভাবশীল। কারণ, অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং শিক্ষিত সমাজের অন্তরে বিভিন্নমুখী চেতনা ও বিচিত্র আনন্দরস সঞ্চার করাই হ'লো সাময়িক-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। এই দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক সাময়িক-সাহিত্য আজ যেন একটা সমস্যার সম্মুখীন। সাংবাদিকতার নিরপেক্ষ নীতি অনুসৃত হয় না ব'লে বর্তমানকালের অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্রই মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, এবং সাহিত্য-কণ্ডুয়ন-প্রীতি তথা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি অনুরাগবশত আগাছা-পরগাছার মতো অসংখ্য পত্র-পত্রিকার আবির্ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্র কণ্টকিত। সাংবাদিকতার নিরপেক্ষ নীতি এবং সৎসাহিত্য পরিবেশনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এদেশের সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকাগুলি পরিচালিত হয় তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

উপসংহার

বাংলাদেশের লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে আমরা বুঝি জনপদ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার যে অনাড়ম্বর অথচ স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি গানে, কবিতায়, গল্পগাথায় আত্মপ্রকাশ করে সেই প্রকাশ-মাধ্যম। কোনো জাতির সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে হ'লে সেই জাতির লোকসাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়। এই লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্যের উপরে ভিত্তি ক'রেই প্রত্যেক দেশে উচ্চতর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি বা প্রসারের ফলে মানুষের রুচি বদলালেও, দেশের পল্লী-সংস্কৃতিতে লোক-সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ উচ্চতর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না ব'লেই নিজেদের আত্মতৃপ্তির জন্য স্বধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। কোথাও বা সে-সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে মুখে মুখে, কোথাও বা পুঁথির পাতায়। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যেই তাই লোক-সাহিত্যের বিশেষ একটা স্থান আছে।

ভূমিকা

যতদূর জানা যায় বাংলা-সাহিত্যের জন্ম গানে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাপদগুলিই তার প্রাচীনতম নিদর্শন। তাছাড়া আছে কীর্তন-পদাবলী, বাউল-সঙ্গীত ও কবিগান। ছেলেভোলানো ছড়া, ডাক ও খনার বচন, যাত্রার পালা, ব্রতকথার মন্ত্র সবই যেন গানের সুরে ঝংকৃত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও গাথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের মানুষের সহজাত সঙ্গীতপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যেই যে সঙ্গীতের ধ্বনি ও সুর ঝংকৃত হয়ে চলেছে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের মন যেন তাতে স্বভাবধর্মেই সাড়া দেয়, আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় অপরূপ লৌকিক সাহিত্য। বাংলাদেশের মায়েরা যে যেখানেই থাকুক না কেন, ছড়া দিয়ে ছেলেমেয়েদের মন ভোলায়, ঘুম পাড়ায়। পল্লীবধূরা ধান ভানে ছড়া কেটে, ব্রত-পার্বণ পালন করে ছড়ার মন্ত্রে। এই জাতীয় অগণিত ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে জনপদ কবিদের গ্রাম্যভাষায় কিংবা জনপদ-কন্যা-বধূদের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে। পল্লী-বাংলার আর একটি অমূল্য সম্পদ ডাক ও খনার বচন ও বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন। কৃষি, খাদ্য, ধর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও মানবধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে-সব প্রবাদ-প্রবচন এদেশে গ'ড়ে উঠেছে আজও লোক তা বিস্মৃত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' পুস্তকের একজায়গায় লিখেছেন—"ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গে এক, পশ্চিমবঙ্গে আর এক হ'লেও ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার এমন পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না।" এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রত-পার্বণের ছড়াগুলি আমাদের পল্লীজীবনের সঙ্গে কেমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্যেরও বিশেষ প্রভাব

ছড়া, ব্রতকথা, ডাক ও খনার বচন, বিভিন্ন প্রবাদ বচন

পড়েছে বিভিন্ন ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে। ব্রতকথার ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীবধূ ও কন্যাদের যে বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, বাংলাদেশের অমূল্য লোকসঙ্গীত হিসাবেই তার স্বীকৃতি।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র পরলোক-গমন করেন। তাঁর মৃত্যুকাল থেকে আরম্ভ ক'রে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগ। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয় নাই, কারও মনে সেই প্রতিভা দেখা দেয়নি যা সাহিত্যকে চিরন্তন ক'রে রাখে। রাজসভা, চণ্ডীমণ্ডপ ও সদর তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের অক্ষম অনুকরণে অনুরণিত, উচ্ছৃঙ্খল আদিরসাত্মক কাব্যকাহিনীতে বাঙালীর জীবন তখন কলুষিত। কিন্তু, সেই অবসরে

কবিগান : তর্জা
পাঁচালি প্রভৃতি

একদল জনপদকবির আবির্ভাব হয়, কবিগান জন্মলাভ করে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। প্রথম প্রথম এই সব পল্লীকবি বৈষ্ণব-যুগ থেকে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমগীতির উপরে ভিত্তি ক'রেই নিজেদের গান বাঁধতেন, পরে সামাজিক বিষয়গুলিও তাঁরা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাঁচালি, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, দাঁড়া-কবিগান, বসা-কবিগান, টপ্পা, ঢপ-কীর্তন, কৃষ্ণ-যাত্রা, তুক্কগীত প্রভৃতি বহুবিচিত্র লোকসঙ্গীত কবিগানের অন্তর্ভুক্ত। নিধুবাবুর টপ্পা, দাশুরায়ের পাঁচালি, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রচলিত রূপ। কবিগানকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভবানী-বিষয়ক : শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত দুইই এর মধ্যে পড়ে। সাধারণত, আগমনী-বিজয়ার গানকেই এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। (২) রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বা সখী-সংবাদ : এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও বিরহ-সঙ্গীত, গোষ্ঠ-সঙ্গীত এবং সাধারণ প্রেম-গীতি। (৩) শ্লেষাত্মক গীতি : সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অনাচারের প্রতি শ্লেষ ক'রে যে-সব গান রচিত হয় সেগুলিকে ধরা যেতে পারে এই শ্রেণীর মধ্যে। (৪) খেউড় : এই শ্রেণীর গান নিছক গালাগালি ও বিদ্রূপের নামান্তর মাত্র। এই সব গানে যে অশ্লীলতা বা কদর্থ ভাষার প্রয়োগ হ'ত, তখনকার দিনের রসিকতার প্রধান অঙ্গই যেন ছিল তাই। বাংলাদেশে কবিগান সম্পূর্ণ বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চেষ্টায়। বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে তিনি এইসব জনপদকবির জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকরে'। বাংলাদেশের এইসব কবিগান-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গোঁজলা গুঁই, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, নিধুবাবু, দাশরথি রায়, এণ্টনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস প্রভৃতি। কবিগানের মধ্যে আগমনী-বিজয়ার যে আবেদন আছে তা একান্তভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। রাম বসুর 'কও দেখি উমা কেমন ছিলে ভিখারী হরের ঘরে'; দাশরথি রায়ের 'গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল'; কালী মির্জার 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী উমা নাকি বড় কেঁদেছে' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে যে বাৎসল্য-

রস ফুটে ওঠে তার যেন কোনো তুলনা নেই। কমলাকান্ত-ও এই জাতীয় 'উমাসঙ্গীত'-এর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য ও আকর্ষণ হ'ল মা-মেনকার মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। এর সঙ্গে মাতৃহৃদয়ের কাতরতাকে তুলনা করা যায় ব'লেই এই জাতীয় সঙ্গীতের এত মাধুর্য। আপাতদৃষ্টিতে বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন রসাশ্রিত কবিগানের সঠিক মূল্যায়ন না করতে পারলেও, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে অনেক কবিগানেই মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ কবিত্বের স্পর্শ আছে, রসানুভূতির ছোঁয়াচ আছে, প্রাণমন চঞ্চল ক'রে তোলবার চেষ্টা আছে।

বাংলাদেশে এতকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ থিয়েটার-সিনেমা প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত, যাত্রাগানই ছিল সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রধান মাধ্যম। লোকশিক্ষার দিক থেকেও সেকালে যাত্রা-কথকতার বিশেষ একটা আবেদন ছিল; চিরন্তন মানব-ধর্ম ও শাশ্বত সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে দেশের মানুষ চরিত্র-গঠনে অনুপ্রেরণা লাভ করত। সেকালে যাত্রাগান ও কথকতার প্রধান উপজীব্য ছিল রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ-ভাগবতের কাহিনী। সেইসব যাত্রার পালা ও কথকতার কাহিনী বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের বিশেষ একটি রূপ। পরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়েও অনেক পালাগান রচিত হয়। মোট কথা যাত্রা ও কথকতা যে একাধারে চিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম ছিল, তা সকলেই স্বীকার করেন। যুগ-পরিবর্তন ও রুচি-পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনও যে বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে যাত্রা ও কথকতার আসর বসে, তার প্রধান কারণ সাধারণ গ্রামীণ মানুষের সহজ আনন্দলাভ-প্রবৃত্তির কোনো বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি।

যাত্রাগান ও কথকতা

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'রও বিশেষ একটি মূল্য আছে। সাধারণত দেখা যায় যে বাংলাদেশের প্রাচীন-সাহিত্য প্রধানত ধর্মাশ্রয়ী। লৌকিক ধর্ম ও উপ-ধর্মের দ্বারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে যে-সব গান ও গাথা পরিচিত, সেগুলি যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব-মুক্ত। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনাই যেন অধিকাংশ গানের মুখ্য অবলম্বন। 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'-র মধ্যে পল্লীকবিদের যে রচনানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রেই তা উচ্চাঙ্গের। বিশেষত, সরল গ্রাম্য-কিশোরী কবি চন্দ্রাবতীর গীতি-কবিতা তো বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর কবিতায় মানবতার যে আবেদন আমরা লক্ষ্য করি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে সহজ ভঙ্গিমা দেখতে পাই তাতে ক'রে সমালোচক-মন স্বভাবতই শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্ববঙ্গগীতিকার অনেকগুলি উদ্ধার পেয়েছে, এবং প্রাচীন সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে সেগুলি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাতে ভুল নেই। লোকসাহিত্যের সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 'ভাসান'-গান, 'সারি'-গান, 'জারি'-গান এবং সর্বোপরি 'ভাটিয়ালী' সঙ্গীত-গুলির সাহায্যে। এইসব গানের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে নদীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পূর্বঙ্গগীতিকা'র বিশিষ্ট স্থান

পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লা ও কৃষকদের জাতীয় ভাবধারা। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই এ-সব গানের বিশেষ একটা মূল্য আছে।

বাংলাদেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কঙ্করময় লালমাটি-অঞ্চলে, অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গে একসময়ে আউল-বাউলের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখনও বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলে বাউল-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। এইসব বাউল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বভাবকবি। তাদের রচিত বাউল-গানের মধ্য দিয়ে মানবধর্মের যে সহজ ও সাবলীল রূপটি ফুটে ওঠে, সে-রূপের সাক্ষাৎ যেন ভারতের আর কোনোখানেই নেই। বাংলাদেশের বাউল-গান বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই যেন নিজস্ব সম্পদ। ভাবের গভীরতায় ও ব্যঞ্জনা-মাধুর্যে বাউল-সঙ্গীত বাংলার লোকসাহিত্যকে যেন বিশেষ এক সুষমায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছে। মধ্যযুগের মিস্টিক সাধক-সম্প্রদায় ও সুফীগোষ্ঠীভুক্ত কবিদের রচনার সঙ্গে যেন বাউল-গীতির অপূর্ব একটা সামঞ্জস্য আছে। বাউল-গানের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর অনেক গান বাউল-সুরে রূপায়িত ক'রে তুলেছেন।

বাউল-গানের সহজ ও সাবলীল রূপের আকর্ষণ

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের 'তুষু-গান' ও 'ভাদু-গান'-এর যেমন বিশেষ একটা আবেদন আছে, তেমনি আছে উত্তরবঙ্গের রংপুর-কোচবিহার অঞ্চলের 'ভাওয়াইয়া' বা চটকা'-সঙ্গীত। 'তুষু' ও 'ভাদু' গান প্রধানত লৌকিক ক্রিয়াকর্মকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু, 'ভাওয়াইয়া' বা 'চটকা' সঙ্গীতের অবলম্বন বহুবিচিত্র। তার মধ্যে যেমন সামাজিক সুখ-দুঃখের কথা আছে, তেমনি আছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের বিচিত্র প্রকাশ। কবিত্ব-মাধুর্যে 'ভাওয়াইয়া'-গান বহু ক্ষেত্রে সুসমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মালদহ-অঞ্চলের 'গম্ভীরা-গান'-এর উল্লেখও প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'গম্ভীরা' বিশেষ একটি স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই শ্রেণীর গান একদিকে যেমন ধর্মাশ্রয়ী, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-আশ্রয়ী। ভাব-ব্যঞ্জনাতেও 'গম্ভীরা'-গান বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'গম্ভীরা'-গান প্রধানত দুই শ্রেণীর—(১) স্বদেশী ও (২) আল্‌কাপ। স্বদেশী-'গম্ভীরা' অনেকটা মুকুন্দ দাসের জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের মতো, একসঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে চলে। আর গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেই আল্‌কাপ-'গম্ভীরা'র প্রচলন বেশী। শেষোক্ত শ্রেণীর 'গম্ভীরা'-গানে ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরই আধিক্য। তর্জা-জাতীয় গানের সঙ্গে তার বিশেষ মিল আছে।

রাঢ়-বঙ্গ, উত্তর-বঙ্গ ও মালদহ অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত

বাংলাদেশের লোকসাহিত্য বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রধান একটি অঙ্গ। বিচিত্র এই সাহিত্যের মাধ্যমেই পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন পেয়েছে আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি পেয়েছে শিক্ষা। জীবনদর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেমন আছে এই লোকসাহিত্যে, তেমনি আছে বাঙালী-মনের বিচিত্র রসানুভূতির সহজ ও সাবলীল প্রকাশ। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পেতে হ'লে তার লোকসাহিত্য অপরিহার্য।

উপসংহার

বঙ্গসংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য

জাতির মানস-প্রকৃতি, তার সমাজ-জীবনের ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি এবং বহুবিচিত্র সাধনার সম্মিলিত রূপকেই বলা যেতে পারে 'সংস্কৃতি' বা কৃষ্টি; ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'কাল্চার'। এই 'কাল্চার' বা 'সংস্কৃতি'র মধ্য দিয়েই জাতির প্রাণসত্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, উপলব্ধি করা যায় তার অগ্রগতি বা অবনতির স্বরূপতত্ত্ব। বাংলাদেশের সংস্কৃতির যে রূপটি আজ আমরা লক্ষ্য করি, তার একটা বিশেষত্ব আছে—আর সে-বিশেষত্বই বাংলাদেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে সারা ভারতে। বাংলার জলবায়ু, তার নিসর্গ-প্রকৃতি, ভাষা, শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা সব কিছু মিলিয়েই বাঙালীকে সার্বজনীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ক'রে তুলেছে। বাঙালীর এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সহস্রবর্ষের ভাবসাধনায় ও কর্মসাধনায়,—বিভিন্ন ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে।

ভূমিকা

বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভারতীয় আর্যের সংমিশ্রণে। এই মিশ্রণের পূর্বে, বঙ্গভূমিতে যারা বাস করত তারা যে অনার্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে আর্যসভ্যতার বিস্তার হয় উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার পথ ধ'রে এবং নবীন বাঙালী-জাতির উদ্ভব হয় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে। ঐতিহাসিকদের মতে বঙ্গসংস্কৃতির সূচনা হয় অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে এবং সুদীর্ঘ এই এগারশ' বৎসরের সাধনায় বাঙালী আজ বলিষ্ঠ এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙালীর এই সংস্কৃতি প্রধানত ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতাকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠলেও মুসলমান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে তাতে, বিশেষত মুসলমান রাজত্বে ও ইংরেজ-শাসনের কবলে প'ড়ে। তথাপি, বাঙালীর সংস্কৃতিকে হিন্দু-সভ্যতা-আশ্রয়ীই বলা উচিত। কারণ, এদেশের বর্তমান উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু-সভ্যতার স্পর্শ।

বাঙালী-জাতির উদ্ভব ও হিন্দু সভ্যতার প্রভাব

বৃহত্তর ভারতের যে সংস্কৃতি, বঙ্গসংস্কৃতিকে তার বিরোধী, কিংবা তা থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কথা বলা চলে না। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি যে হিন্দু-সভ্যতা বাঙালীর কৃষ্টি তো তাকে আশ্রয় ক'রেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তবে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গসংস্কৃতির যে একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। সে-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালীর চেহারায়, তার ভাষায়, পোশাক-পরিচ্ছেদে, খাদ্যে, সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে। নদীমাতৃক শস্যশ্যামলা বঙ্গপ্রকৃতির আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে বাঙালী হয়েছে স্বভাবকোমল ও শিল্পপ্রাণ, তার ভাষা হয়েছে মধুর, তার চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভাষা যেমন সংস্কৃত-ভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে, বঙ্গভাষাও তেমনি। কিন্তু, এইসব ভাষার মধ্যে বঙ্গভাষাই উন্নতিলাভ করেছে সর্বাধিক এবং সে-ভাষার মাধুর্য ও মিষ্টতা

সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য

স্বীকৃতিলাভ করেছে সর্বভারতীয় গুণিজনের দরবারে। আধুনিককালের বাঙালী পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদে সহসা কোনো স্বাতন্ত্র্য চোখে না পড়লেও, অধিকাংশ বাঙালী-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র হ'লো ধুতি-পাঞ্জাবি, কিংবা ধুতি-শার্ট। বাঙালী মেয়েরা অবশ্য আবহমানকাল থেকে শাড়ি ও স্বর্ণালঙ্কারকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। শাড়ি-পরিহিতা বাঙালী মেয়েদের সহজেই চেনা যায় বহুবিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ-ভূষিতা অন্যান্য নারীজাতির সমাবেশে। বাঙালী মেয়েদের এই শাড়ি ও শাড়ি-পরবার ধরন বিদেশী মেয়েদেরও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল, মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'লো ধান, আর সেইজন্যই ভাতই তার প্রধান খাদ্য। তাছাড়া, বাংলার জলহাওয়ায় ভাতই বিশেষ উপযোগী ব'লে বাঙালী আর অন্য খাদ্যের দিকে বিশেষ মন দেয়নি। বাংলাদেশের নদ-নদীতে ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় ব'লে বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় মাছের বিশেষ একটা স্থান আছে: 'তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' এই ব'লে কোনো এক বাঙালী কবির মুখ দিয়ে একদিন যে উক্তি বেরিয়েছিল তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। বাংলাদেশে, বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গে ধান যেমন হ'ত প্রচুর, দুধের উৎপাদন-পরিমাণও তেমনি ছিল পর্যাপ্ত। ফলে, দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য বিশেষ একটা স্থানলাভ করে বাঙালীর আহার্যে। 'দুধে-ভাতে' থাকার মর্মার্থ-ই হ'লো সুখে থাকা, সচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটানো। বাঙালীর সেই সচ্ছল অবস্থা যে একদিন ছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। এর পরে আসছে সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে বাঙালীর বিশেষত্বের কথা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের 'চর্যাপদ'-কে আশ্রয় ক'রে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে বাংলা-সাহিত্যের উদ্ভব হয়,—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তা, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির হাতে প'ড়ে সেই সাহিত্যের হয় পুষ্টিসাধন। তারপর, ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। চারুকলা ও কারুকলায় বাংলার যে ঐতিহ্য আছে, সর্বোপরি বাংলার লোকসঙ্গীতের যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য—বঙ্গসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় সে-সবের প্রভাবও অপরিসীম।

বিভিন্ন যুগের বঙ্গসংস্কৃতি: পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাব

যুগবিভাগের দিক থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাচীন-যুগের সংস্কৃতি, (২) মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও (৩) আধুনিক-যুগের সংস্কৃতি। প্রাচীন যুগ বলতে আমরা যেমন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুঝি, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তেমনি মধ্যযুগ ব'লে পরিচিত। বঙ্গসংস্কৃতির আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্ব থেকে। প্রাচীন-যুগের বঙ্গসংস্কৃতির যে-রূপ তার সঙ্গে সর্বভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির খুব বেশী পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে

অবশ্য একটা পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান-পতনে। কিন্তু সে-পরিবর্তনে বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। প্রাচীন-যুগে হিন্দু (বা ব্রাহ্মণ), বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে এদেশে যে সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল, তুর্কীবিজয়ের পর ইসলাম-ধর্ম তাতে রূঢ় একটা আঘাত হানলেও পর্যুদস্ত করতে পারেনি। মুসলমানেরা সুদীর্ঘকাল বাংলা-দেশে আধিপত্য করেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলার সংস্কৃতিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো গ্রাস করতে পারেনি। এদেশে মুসলমানেরা বরং অনেকাংশেই বাঙালীত্ব অর্জন করেছিল এবং হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানেরা এখনও সেই মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষক। বাংলা-দেশের উচ্চতর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবশ্য মুসলিম-সংস্কৃতির প্রভাব নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু, এদেশের লোকসংস্কৃতি যে গ'ড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতায় সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগের বঙ্গসংস্কৃতিতে অবশ্য বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারার অনিবার্য প্রভাবে। বঙ্গভূমির প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা যে অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশেই হয় ইংরেজ-রাজত্বের গোড়াপত্তন। কাজেই ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি যে বঙ্গসংস্কৃতিকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত ক'রে তুলবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

ইংরেজ-রাজত্বের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারা শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে যে-সর্বনাশের সূচনা করেছিল, কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী মনীষীর চেষ্টাতেই আবার বাঙালীর সে মোহঘুম ভেঙে যায়। তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে স্বদেশীযুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্যম স্মরণীয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটলেও, শেষ পর্যন্ত বাঙালী যে তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়নি তার জন্য সে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কারণ, বঙ্গসাহিত্যের এই দুই মহারথী, বাঙালীকে যেমন তার ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে সুমহান্ প্রাচীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনি এনে দেন স্বাধীনতার চিন্তা। বাঙালী শেষ পর্যন্ত তার সংস্কৃতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতেই বঙ্গসংস্কৃতি আধুনিক রূপ গ্রহণ করেছে, এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে।

বাঙালী মনীষীদের চেষ্টায় বঙ্গসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন

শৌর্যবীর্যে একদা বাঙালীজাতির যে সুনাম ছিল ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। এককালে বাঙালী যোদ্ধারা শত্রুর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে যেমন রক্ষা করেছে, বঙ্গগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তেমনি যোদ্ধার বেশে বহির্ভারত থেকে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী-শক্তির কবল থেকে স্বাধীন করতে। ধর্ম-সংস্কৃতির দিক থেকেও বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলাদেশ বৈষ্ণবধর্মের যেমন পীঠস্থান, তেমনি এদেশ থেকেই প্রচারিত হয়েছে রাজা রামমোহন, মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীও সারা ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলার মাটি থেকে। অন্যদিকে আবার বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক-সংস্কৃতির নবীন রূপ দেখিয়ে গেছেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উৎসবের অধিকাংশই আবার ধর্মাশ্রয়ী। যেমন—দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি। চারুকলা ও কারুকলায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের শিল্পকলা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বঙ্গসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গৌরব তার ভাব ও চিন্তার রাজ্যে। এদেশের নৈয়ায়িক, দার্শনিক, ভাবুক, কবি ও সাহিত্যিকেরা সেই প্রাচীনকাল থেকে দেশ-বিদেশে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত ক'রেছেন, রসের ধারা নিয়ে গিয়েছেন বহন ক'রে। শীলভদ্র, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বৌদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতেরা একদিন যেমন বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তেমনি আরও অনেক বাঙালী পণ্ডিত বহির্বিশ্বে বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব ঘোষণা করেন। কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাঙালী-প্রতিভার যে পরিপূর্ণ বিকাশ, সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও তা তুলনারহিত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাঙালী মনীষার জয়-জয়কার। বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশির মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের অবদান আজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃতিলাভ করেছে। আর, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই সারা ভারতে বিশেষ এক গৌরবময় স্থান অধিকার ক'রে আছে। এ-দেশের কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী গান পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতরসিকদেরও মুগ্ধ করেছে। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ যে পিছিয়ে পড়েনি তার উজ্জ্বল প্রমাণ তো বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ধ্রুপদী গায়কেরা। যন্ত্রসঙ্গীতের অনুশীলনেও বাঙালী শিল্পীরা যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম, তার প্রমাণ দিয়েছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যও আজ সর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট। শিক্ষিত ও সঙ্গীতানুরাগী ভারতীয় সমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ আদর। নৃত্যশিল্পে বাঙালী উদয়শঙ্কর যেমন আজ আন্তর্জাতিক কলাক্ষেত্রে শ্রদ্ধার পাত্র, বাংলাদেশের নাট্যশিল্প ও চলচ্চিত্রশিল্পও তেমনি সুখ্যাতি অর্জন করেছে ভারতে ও বহির্ভারতে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়ধারা যেমন ভারতীয় নাট্যশিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চিত্রপরিচালনা-পদ্ধতি আজ ভারতীয় চলচ্চিত্র-পরিচালকদের অনুপ্রাণিত করছে। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতিতেও বাঙালী মনীষার অবদান বড় কম নয়। তার প্রমাণ দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায় ও সুবোধকুমার মিত্র। পুস্তক-মুদ্রণ-শিল্প, ব্লক-নির্মাণ, কুটীর-শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে।

বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব : ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতিত্ব

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঙালীর প্রতিভার দান যে অপরিসীম, সে-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আজ। কারণ বাস্তবের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ক'রে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দেওয়ার কাজেও বাঙালীর কৃতিত্ব ও গৌরব অনেকখানি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্মনীতি সকল বিষয়েই বাঙালীর চিন্তাধারা ভারতবাসীকে চিরদিনই প্রগতির পথ নির্দেশ করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত, নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বিরাট একটা সংকটের মধ্য দিয়ে বাঙালীকে যেভাবে আজ অগ্রসর হ'তে হচ্ছে তাতে যদি তার বহুমুখী সাধনায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহ'লে তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, বাংলার শিক্ষিত তরুণসমাজে আজ যে অবাঙালীসুলভ সংস্কৃতির চিহ্ন ফুটে উঠছে তা যদি না দূর হয় তাহ'লে বাঙালী একদিন তার বৈশিষ্ট্য হারাতে বাধ্য। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, কথাবার্তায় শিক্ষিত তরুণ বাঙালী-সমাজ আজ যে বিজাতীয় মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে নিঃসন্দেহে তা জাতীয়-সংস্কৃতির পরিপন্থী। বাঙালীকে এ-কথা আজ ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের সুমহান্ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিই বাঙালীকে ভারতে ও ভারতের বাইরে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। বাঙালী যদি তার নিজস্ব ভাবধারায় অবিচল থাকে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারায়, তবে ঈর্ষাতুর অন্যান্য-প্রদেশবাসীর কোন চক্রান্তই তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

উপসংহার

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়

বিত্ত-বণ্টনের নীতি অনুসারে ভারতীয় সমাজ আজ প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উচ্চবিত্ত বা ধনী-সম্প্রদায়, (২) মধ্যবিত্ত বা মধ্য-আয়ভোগী সম্প্রদায়, এবং (৩) নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র-সম্প্রদায়। ধনতন্ত্র-শাসিত সমাজের এই যেন স্বাভাবিক রীতি। এরই ফলে একদিকে দেখা যায় ভোগবিলাসের প্রাচুর্য, অন্যদিকে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও অনেকে আবার হয়তো দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও ক'রতে পারে না। বিত্ত-বণ্টনের বৈষম্যেই সমাজে এই বিপরীতধর্মী দুই চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থায় যাদের দিন কাটে, তাদেরকেই আমরা বলি মধ্যবিত্ত। বিত্তকৌলীন্য যেমন তাদের থাকে না, তেমনি আবার দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর অভিশাপেও তারা অভিশপ্ত নয়।

ভূমিকা—মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার অংশীদার হিসাবে বাঙালী-সমাজেও এই তিন শ্রেণীর সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে জমিদার, শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ী যেমন উচ্চবিত্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে তেমনি কলকারখানার শ্রমিক মজুর,

সাধারণ কারিগর ও ভূমিহীন কৃষক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রের পর্যায়ে পড়ে। এই দুই শ্রেণীর লোককে বাদ দিয়ে সমাজের যে বৃহৎ অংশ তাকেই আমরা বলি মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়। এদের মধ্যেই পড়েন শিক্ষিত ও উপার্জনশীল অসংখ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়ার, সাধারণ ব্যবসায়ী এবং আরও অনেকে। জীবনযাত্রার মান, উপার্জন ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে এঁদের মধ্যে তারতম্য থাকলেও মনোগত ভাবধারার দিকে এঁদের মধ্যে একটা সমতা বিদ্যমান। মধ্য-আয়ভোগী হ'লেও এঁদের কাউকে যেমন বিত্তকৌলীন্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না, তেমনি আবার এঁদের সাধারণ শ্রমজীবীদের পর্যায়েও ফেলা চলে না। মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়-ই এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, শিক্ষায়-দীক্ষায়, জীবিকা-অর্জনের পন্থায় ও সংস্কৃতিতে সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছেন। সমাজ-সংগঠনে এঁদের প্রভাব তাই অপরিসীম। এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে আবার দুই স্তরে ভাগ করা যায়—(১) উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও (২) নিম্ন-মধ্যবিত্ত। বর্তমান অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যাঁদের বার্ষিক আয় ছয় হাজার টাকার উপরে, তাঁরাই পড়েন উচ্চ-মধ্যবিত্তের স্তরে এবং যাঁদের আয় তার নীচে, তাঁদেরকে বলা যায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত। অবশ্য আর্থিক এই সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে স্তরবিভাগের সঠিক মাপকাঠি নয়।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের পরিচয়

প্রাচীনকালের সমাজ-ব্যবস্থায় কিন্তু মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার ধনবণ্টনের রীতি অনুসারে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ 'ধনী' ও অন্যশ্রেণীর মানুষ 'দরিদ্র' ব'লেই পরিচিত হ'ত। সমাজে তখন জনসংখ্যার চাপ যেমন ছিল না, তেমনি কৃষিজমির আয়তনও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত। তখনকার সমাজ ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক, এখনকার মতো নাগরিক সভ্যতা তখন দেশবাসীকে বহুবিধ সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলেনি। ফলে, উচ্চ-আয়বিশিষ্ট মানুষেরা তখন 'ধনী'র মর্যাদা লাভ করতেন, আর নিম্ন-আয়বিশিষ্ট লোকেরা 'দরিদ্র' ব'লে পরিচিত হ'য়ে অসচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাত। বস্তুত, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ইংরেজ-আমলেই। ইংরেজ-রাজশক্তির স্বার্থান্ধ শাসননীতির ফলে এদেশের গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যেদিন বিপর্যয়ের মুখে পড়ল, নাগরিক সভ্যতা যেদিন এদেশের আবহাওয়াকে ক'রে তুলল বিষাক্ত, সেইদিন থেকেই সৃষ্টি হ'লো মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায়, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল জমির সঙ্গে। ধনী-সম্প্রদায় ছিলেন ভূ-স্বামী, আর দরিদ্র-সম্প্রদায় সেই ভূমিতেই শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা ক'রে কোনরকমে সংসার চালাত। কিন্তু, ইংরেজ-আমলে যে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠল, জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই রইল না। লর্ড কর্নওআলিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথায় যে জমিদারি-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো তাতে দেশের কৃষকেরা যেমন একদিকে ভূমিহীন কৃষক ও মজুরে পরিণত হ'লো অন্য-দিকে তেমনি উচ্চবিত্ত জমিদার-জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর, লর্ড মেকলের

ইংরেজ-আমলে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব

শিক্ষা-সংস্কারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গ্রাম-বাংলার এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরে এসে ভিড় করলেন, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীর ছাপ নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তেই যেন তাঁরা নগর-সমাজ সংগঠন করলেন। এঁরাই হ'লেন ইংরেজ রাজত্বে উদ্ভূত বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়।

ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে দেশে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হ'লো, তেমনি উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিত্ত-কৌলীন্যে দেশের ধনিকশ্রেণী সামাজিক মর্যাদা পেলেও, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হলেন কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই। দেশের সাধারণ মানুষের মনে তাঁরা যে সম্মানের আসনলাভ করেন তার পিছনে ছিল তাঁদের উচ্চশিক্ষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই বাংলাদেশ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা ভারতে মর্যাদালাভ করে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি—সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেশকে পরিচালিত করতে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক নেতারা যেমন এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন, তেমনি বাংলাদেশের বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর জন্ম মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ে। দেশের সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, স্বদেশী ভাবধারার উন্মেষ, জাতীয়-আন্দোলনের বিকাশ, রাজনীতিক চেতনার স্ফুরণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের দান যে অপরিসীম বাঙালী জাতির ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

সমাজজীবনের উন্নতিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দান

কিন্তু, বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছেন। এই সংকটের সূত্রপাত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই তা ওঠে চরমে। মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ পাশ্চাত্ত্যের যান্ত্রিক ও নাগরিক সভ্যতার অভিশাপে ক্ষতবিক্ষত। দেশের কুটীর-শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থার ভিত ভেঙে পড়ায় দেশের নিম্নবিত্তেরা ছুটল শহরে, ক্রমশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ে উন্নীত হ'লো তারা। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়তে লাগল দিন দিন। তার ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় চরম আর্থনীতিক সংকটের সম্মুখীন হ'লো। দেশ স্বাধীন হবার পরেও সে-সংকট পুরোপুরি কাটেনি। এখন বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে 'দরিদ্র-' আখ্যায় ভূষিত করলে খুব বেশী অযৌক্তিক হয় না। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আর এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে দেশবিভাগের ফলে। পূর্ববঙ্গের বাঙালী হিন্দু-সম্প্রদায় দেশত্যাগ ক'রে কিংবা উদ্বাস্তুরূপে পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করেছেন। সেখানে এতকাল যে-সব হিন্দু উচ্চবিত্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আজ উচ্চ-মধ্যবিত্তের পর্যায়ে পড়েছেন ; আর, যাঁরা ছিলেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত, তাঁদের বেশির ভাগই আর্থনীতিক পুনর্বাসন-সমস্যার মধ্যে প'ড়ে যথাক্রমে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের স্তরে

মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের সংকট ও তার কারণ

গিয়ে পৌছেছেন। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী আজ কালাতিপাত করছেন চরম অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে। কর্মসংস্থানের অভাব, যদৃচ্ছ কর্মচ্যুতির নোটিস, ক্রম-বর্ধমান বাজার-দর এবং কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছা ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ বিপর্যস্ত। ধনীদের জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করতে গিয়ে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বহুবিধ উপকরণের আকর্ষণে বাঙালী উচ্চ-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ও আজ নিজেদের কেমন যেন বিপন্ন বোধ করছেন। এঁদের বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেলেও, বহুবিধ কর ও ক্রমবর্ধমান বাজার-দরের চাপে প'ড়ে এঁরা যেন আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন না। উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থনীতিক ব্যবধান থাকলেও সামাজিক ব্যবধান বিশেষ নেই। ফলে, ধনী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অবিরাম তাঁদের যেন একটা প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই একই কারণে নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের চাকুরিজীবীরা নিম্নবিত্ত শ্রমিক-মজুরদের অপেক্ষা অধিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের অর্থ-বিপর্যয়ের আর একটি কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁদের স্বভাবধর্মাশ্রয়ী বিমুখতা। বাঙালীর ছেলেরা চাকরি জোটাতে গিয়ে যে উদ্যম ও পরিশ্রম করে—তার বদলে যদি সেই উদ্যম ও শ্রমশক্তি স্বাধীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে ব্যয় করত তাহ'লে অনেক আগেই তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারত। অ-বাঙালীরা এসে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, প্রধানত তাদের জন্যই আজ বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের দুর্গতি, এ-রকমের যুক্তি উত্থাপনের পিছনে ভাবাবেগ থাকতে পারে, কিন্তু সে-যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। কারণ, ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত ছিল বাঙালী তখন চাকুরির মোহে বিভ্রান্ত না হ'য়ে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পে অধিকতর মনোযোগ দিত তাহ'লে অ-বাঙালীদের পক্ষে এ-রাজ্যে এসে ঐ-সব ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের কোনো সুযোগই ঘটত না।

এ-কথা সত্য যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ'লে বাঙালী জাতিই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ই বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড। বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে তাই আজ বলতে হয় যে, যে-কোনো উপায়েই হোক বাঙালীর এই সংকট দূর করতে হবে। ধ্বংসের হাত থেকে

উপসংহার

মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় যদি আজ রক্ষা পেতে চান, তাহ'লে তাঁদের সাধ্যাতীত বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করতে হবে; ধনী আত্মীয়দের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী বৃত্তি গ্রহণের দিকে অধিকতর আগ্রহ দেখাতে হবে। নিজেদের আয়ের মধ্যেই যদি উচ্চ-মধ্যবিত্তেরা সন্তুষ্টচিত্তে সুখী-গৃহকোণ রচনা করতে প্রবৃত্ত হন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তেরা যদি কায়িক-পরিশ্রমে ভয় না পেয়ে উপার্জনের পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট থাকেন, তাহ'লে যে ভাঙন আজ দেখা দিয়েছে ভবিষ্যতে তা একদিন জোড়া লাগবেই। এক্ষেত্রে জাতীয়-সরকারেরও অবশ্য অনেকখানি দায়িত্ব আছে। সর্বস্তরের মধ্যবিত্তদের আয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলি যদি তাঁরা সুপরিকল্পিত উপায়ে বাড়াতে পারেন, বাসস্থান ও ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যসামগ্রী পাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাহ'লে যে-সমস্যার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে আজ চলতে হচ্ছে, সে-সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক পুনর্গঠন

ভারতের মানচিত্রে একদিন বঙ্গদেশের পরিবর্তে শুধু পশ্চিমবঙ্গের স্থান হবে সে-কথা কোনোদিন হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু, বাংলা ও পঞ্জাবের অনেকখানি অংশ বাদ দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। দেশবিভাগের সেই প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে চরম আর্থনীতিক সংকট, দেশের সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। অথচ, শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বাঙালী এখনও সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী; বাঙালীর সেই শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য রাজ্যবাসীর ঈর্ষার বস্তু। যে-আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই স্বাধীনতা-আন্দোলনে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে এবং আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাঙালীই ছিল তার সক্রিয় অংশীদার। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বহু বাঙালী রাজনীতিক নেতার সুদক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত হয়েছে সমগ্র দেশের জাতীয়-আন্দোলন। বাংলাদেশের কত তরুণ ও কিশোর হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে দেশের পরাধীনতার গ্লানি দূর করতে। অথচ, দেশ স্বাধীন হ'লেও, বাঙালী সেই স্বাধীনতার সুখস্পর্শ পেল না। তার বদলে লাভ করল সংকুচিত এক ভূ-খণ্ড, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু। পশ্চিমবঙ্গে তাই আজ যেমন সমস্যার অন্ত নেই, তার আর্থনীতিক বনিয়াদও তেমনি শিথিল হ'য়ে পড়ছে।

ভূমিকা—দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভব

পশ্চিমবঙ্গের সেই আর্থনীতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় ক'রে তুলতে না পারলে বাঙালী জাতির সমূহ বিপদ। দেশের সরকার ও চিন্তানায়কেরা আজ সেই কথাই বড় ক'রে দেখছেন এবং আশা করা যায় যে, সুপরিকল্পিত পুনর্গঠন-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক সংকট একদিন দূর হবে। কিন্তু যে-সব কারণে, পশ্চিমবঙ্গের এই আর্থনীতিক দুরবস্থা, এই প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, তাতে ক'রে পুনর্গঠন-ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে।

আর্থনীতিক অবনতির মূল কারণ

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক কাঠামো প্রধানত কৃষিকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি-জমির আয়তন যেমন কম, শস্যোৎপাদনের পরিমাণও তেমনি অপ্রতুল। কৃষিসমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এর উপরে আছে অতিবৃষ্টি-জনিত বন্যা, অনাবৃষ্টি-জনিত শুষ্কতা, সেচের সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থার নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি। ফলে, খাদ্যশস্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ আজও স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ-শিল্পের প্রসার নাই, খনিজ ও বনজ সম্পদেরও

বিশেষ অভাব। এদেশের বৃহৎ-শিল্প বলতে শুধু কয়লা, পাট ও চা। কয়লা-শিল্পের আয়তনও এই রাজ্যে সীমাবদ্ধ, পাটের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এখনও পূর্ববঙ্গের সরবরাহের উপরে নির্ভর করতে হয় এবং দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি-জেলার ডুয়ার্স-অঞ্চলে যে চা-বাগিচা আছে, আয়তনের দিক থেকে আসামের তুলনায় তা অনেক কম। বনজ-সম্পদের দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাট্‌তি এলাকা। তৃতীয়ত, বাঙালী স্বভাবত ব্যবসা-বাণিজ্যবিমুখ জাতি এবং যৌথব্যবসায়ে অর্থসামর্থ্য নিয়োগে বাঙালীর সাহস ও উৎসাহেরও বিশেষ অভাব। তদুপরি এদেশের বহু শিল্প-সংস্থা ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অ-বাঙালী মালিকানার অন্তর্ভুক্ত।

স্বাধীন ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আজ যে সংগঠনমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে, আর্থনীতিক পুনর্গঠনের তাই হ'লো ভিত্তি। খাদ্যশস্যে পশ্চিমবঙ্গকে স্বনির্ভর ক'রে তোলবার জন্য দু'টি পঞ্চবার্ষিক যোজনার মাধ্যমে যে-সব কাজ এ-পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে, তার সুফল আমরা যেন ক্রমেই উপলব্ধি করতে পারছি। স্বাধীনতা-লাভের সময় পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ যা ছিল, গত দশ বছরে তার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ফলে। খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন উন্নত চাষ-পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নত শ্রেণীর বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ ক'রে রাজ্যসরকার কৃষকদের সহায়তা করছেন। দুর্গাপুরে সম্প্রতি রাজ্য-সরকারের পরিচালনাধীনে যে 'কোক্‌চুল্লি-কারখানা' স্থাপিত হয়েছে, তাতে রাসায়নিক-সারের উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সেচের সম্পর্কও বিশেষ ঘনিষ্ঠ,—বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি যেখানে বৃষ্টির উপরেই নির্ভরশীল। পঞ্চবার্ষিক যোজনার মাধ্যমে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা, দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা ও কংসাবতী-জলাধার পরিকল্পনার রূপায়ণ পশ্চিবঙ্গের সেচ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনমূলক কাজ। বৃহৎ এই তিনটি সেচ-পরিকল্পনা ছাড়াও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনার কাজ গত কয়েক বছরের মধ্যে এদেশে সুসম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে, কৃষিব্যবস্থার যে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। 'গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা'-টি যেদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে, সেদিন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের উৎপাদন-পরিমাণ যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে সে-আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। মোট কথা, কৃষিবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ যাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারে সেজন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। জমিদারী-প্রথা রহিত হওয়ায়, বর্তমানে এই রাজ্যের কৃষকদের বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ বাস্তবে রূপায়িত হ'তে চলেছে। কৃষকেরাই এখন হবে জমির প্রকৃত মালিক। ভূমিহীন কৃষক আর যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্য-সরকার ভূমি-বণ্টন-ব্যবস্থার কাজে হাত দিয়েছেন। সমবায়-কৃষি-ব্যবস্থা (কো-অপারেটিভ্ ফার্মিং)-র প্রচলনের দিকেও কর্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহশীল।

আর্থনীতিক পুনর্গঠনে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন

আর্থনীতিক পুনর্গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হ'লো কর্মসংস্থান-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবহুল রাজ্যে কর্মসংস্থান-সমস্যার সমাধান রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু, কষ্টসাধ্য হ'লেও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে, না হ'লে আর্থনীতিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই। সমগ্র ভারতে পশ্চিমবঙ্গের জনবাহুল্যই সর্বাধিক। প্রতি বর্গমাইলে এখানে গড়ে সাতশ' লোকের বাস। এর উপরে আছে বহিরাগত জনসংখ্যার চাপ এবং ক্রমবর্ধমান জন্মহার। বিপুল এই জনসমষ্টির জীবিকা-সংস্থানের জন্যে তাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। সুখের কথা এই যে, সর্বভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্প সম্প্রসারণের দিকে রাজ্য-সরকার যেমন যত্নবান, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয়-সরকারও তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দাবি গ্রহণ ক'রে এই রাজ্যে কয়েকটি শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন-কারখানা, দুর্গাপুরের ইস্পাত-কারখানা, রূপনারায়ণপুরের কেব্‌ল-ফ্যাক্টরি এবং ইছাপুরের গোলাবারুদ উৎপাদনের কারখানা। শেষোক্ত কারখানা দুটি অবশ্য প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগেই স্থাপিত হয়েছে। সে যাই হোক্‌, এই সব শিল্প-কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে তাতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হচ্ছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় অন্যান্য যে-সব শিল্প-সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে আছে সেগুলি প্রধানত কাগজ, পাট, রং ও বার্নিস্‌, কাঁচ ও চীনামাটি, হোসিয়ারী, এনামেল, ভেষজ-দ্রব্য, চা, ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি, সাইকেল, মোটরগাড়ি, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত। এইসব শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বৃহৎ একটি অংশ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছে। সম্প্রতি, রাজ্য-সরকার শ্রম-নীতির সংস্কার ক'রে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের লোককেই দেশের বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কলিকাতা ও কোচবিহারের পরিবহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এই রাজ্যের বহু লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গে কাঁচামাল ও শিল্পশ্রমিকের অভাব নাই। সেই সঙ্গে যদি দেশের লোক কায়িক পরিশ্রমে আগ্রহশীল হয়ে এগিয়ে আসে, এবং কেরানীগিরি মোহ ত্যাগ ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ কারিগরী কর্মে আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে এদেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হবেই। জনসাধারণের ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যমের সঙ্গে যদি সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা থাকে, তাহ'লে আর্থনীতিক উন্নতির ব্যাপারে আমাদের নিরাশ হবার আর কোনো কারণই থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আর্থিক অবস্থাও এখন আশাব্যঞ্জক। কারণ, দেশের পরিধি সংকুচিত হ'লেও পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়-আয় এখন প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের অখণ্ড-বঙ্গের আয়ের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে-সব উন্নয়ন-সূচি গৃহীত হয়েছে

উপসংহার

তার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের গুরুত্বও বড় কম নয়। কারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে যে-জাতি যত বেশি উন্নত, সে-জাতির আর্থনীতিক বনিয়াদও তত দৃঢ় হয়।

বাংলার গ্রাম বনাম শহরের আকর্ষণ

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হ'লো তার গ্রাম। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, গ্রামই হ'লো ভারতের 'প্রাণধারার উৎসস্বরূপ'। শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছে গ্রামজীবনের মর্মমূল থেকে। শুধু অন্নের সংস্থান ক'রে নয়, মানবজীবনের বিভিন্ন ধারার বিকাশ-সাধনে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে দেশের পল্লী-অঞ্চল। পল্লীর নিসর্গ-প্রকৃতি, তার পশুপাখী; অরণ্য, নদ-নদী লৌকিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, নৃত্য, গীত, উৎসব—সবকিছুই মানব-মনে প্রভাব বিস্তার ক'রে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে চিন্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে। ভারতের গ্রামকে তাই বলা যায় ভারতের ধমনী, দেশের রক্ত যেন গ্রামেরই শিরায় শিরায় প্রবহমান। প্রাচীনত্বের দিক থেকে বোধকরি বাংলাদেশের গ্রাম ভারত-রাষ্ট্রের অন্য যে-কোনো প্রান্তের গ্রামের চেয়ে ঐতিহ্যশালী। বাংলার পল্লী-অঞ্চল বাঙালীকে শুধু অন্নই জোগায়নি, তার মানসিক ঋজুতাতেও সহায়তা করেছে অনেকখানি। বাঙালীর কৃষ্টি, সভ্যতা, শিক্ষা ও সামাজিকতার ক্রমবিকাশে বাংলাদেশের অগণিত গ্রাম যে প্রেরণা দিয়েছে তাকে বোধকরি জননীর সহজাত বাৎসল্য-রসের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। কিন্তু, পল্লীজননীর সেই স্নেহধারা উপেক্ষা ক'রে পল্লীবাসীরা আজ কেন শহরে গিয়ে ভিড় করছে সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও তাই।

ভূমিকা—গ্রামই ভারতের প্রাণকেন্দ্র

এদেশের শহরগুলি কিভাবে বর্ধিষ্ণু, শহরের আকর্ষণ কোথায়, শহরবাসীর পেশা কি, আর কিভাবেই বা তার পরিবর্তন ঘটছে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আয় কত, গ্রাম থেকে কত লোক শহরে আসে, বাসগৃহ-সমস্যা ও সমষ্টি-উন্নয়ন-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতিই বা কি, এসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা-কমিশন গত কয়েক বছর ধ'রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা-সংস্থার মারফত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সামাজিক-আর্থনীতিক সমীক্ষার কাজ চলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রাথমিক সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল শহরে পরিণত হয়েছে এবং কোনো কোনো শহর রূপান্তরিত হয়েছে মহানগরীতে। স্থানীয় বাণিজ্য ও বিপণনকেন্দ্র, প্রশাসনিক ও

বিভিন্নরূপী শহরের উদ্ভব ও সেগুলির আকর্ষণ

সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বৈদেশিক বাণিজ্য-কেন্দ্র আর শিল্পাঞ্চল ভেদে শহরের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং এক এক শহরের আকর্ষণও তাই হয় এক এক রকম। উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এদেশে যে-সব শহর গ'ড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই হ'লো বাণিজ্য ও বিপণনকেন্দ্র এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তারপর পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে-সব বাণিজ্য-কেন্দ্র আজ মহানগরীতে পরিণত হয়েছে সেগুলি। কিন্তু, এদেশের বেশির ভাগ শিল্প-শহরই সাম্প্রতিককালের। আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, বরোদা, ভূপাল, পুনা প্রভৃতি শহর গ'ড়ে ওঠবার মূলে রয়েছে প্রশাসনিক ও সংস্কৃতিক গুরুত্ব। আর, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের পত্তন হয় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই। পরে সেগুলি যেমন প্রশাসনিক-ব্যবস্থার দিক থেকে গুরুত্ব অর্জন করে, তেমনি শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়। জামসেদপুর শহর যেমন গ'ড়ে উঠেছে ইস্পাতশিল্পকে কেন্দ্র করে, তেমনি বিশাখাপত্তনম্ শহরের সৃষ্টি হয়েছে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পের মাধ্যমে। নবভারতে আবার তিনটি পল্লী-অঞ্চল বিরাট শিল্প-নগরীতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে ইস্পাত-শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে। সে-তিনটি হ'লো মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, উড়িষ্যার রাউরকেল্লা, আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর। এ-কথা সত্য যে, যে-সব জায়গায় নতুন শিল্প গ'ড়ে ওঠে, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য শহর গ'ড়ে উঠতে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় যে বেশির ভাগ শহরই সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হবে তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে পল্লী-অঞ্চলের প্রাচীন রূপেরও হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শহরের বিবিধ আকর্ষণে গ্রামত্যাগ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ততদিনই প্রাণবন্ত ছিল, যতদিন না আধুনিক সভ্যতার উনপঞ্চাশী বায়ু তাকে স্পর্শ করেছিল। কৃষিকেন্দ্রিক বাংলার গ্রামে যতদিন পল্লী-শিল্পের প্রসার ছিল, শহরের হাতছানি ততদিন পল্লীবাসীকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু, গ্রামীণ তথা কুটীরশিল্প যেদিন নানাকারণে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল, কৃষির উপরে যেদিন সাধারণ মানুষের চাপ পড়ল, পল্লীর ভিত্তিমূল যেন ন'ড়ে উঠল সেদিন। জীবিকা অর্জনের তাগিদে সেদিন পল্লীর সাধারণ মানুষ অন্তরে অন্তরে অনুভব করল শহরের আকর্ষণ। তাছাড়া, ইংরেজী শিক্ষায় যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেন জীবন-যাত্রা-নির্বাহের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশায় তাঁরাও গিয়ে ভিড় করলেন শহরে। কল-কারখানার মারফত আধুনিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ উপকরণ পেয়ে নগর-সভ্যতায় এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে, তার কাছে গ্রামের আকর্ষণ গেল কমে। শহরে শিক্ষালাভের সুবিধা, চিকিৎসালাভের সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুবিধা,—তার উপরে আছে ভোগবিলাসের উপকরণ; গ্রামের মানুষ তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার তাগিদ অনুভব করল বেশি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল শ্রীহীন হয়ে পড়ে আরও অনেকগুলি কারণে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, মহামারীর

প্রকোপ ও দুর্ভিক্ষ। ইংরেজ-আমলের সরকার সাধারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মন দেওয়ার চেয়ে রাজস্ব আদায়ের বিষয়েই তৎপর ছিলেন বেশি। তাঁদের সেই শাসন ও শোষণে পল্লীভারতে একদা যে-আর্তনাদ উঠেছিল সে-আর্তনাদে বিদেশী রাজশক্তির কর্ণ ছিল বধির। দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। ফলে, বহুদিন পর্যন্ত বাংলার পল্লী-অঞ্চলে বিরাজ করেছিল নিদারুণ একটা স্তব্ধতা, দেখলে যেন মনে হ'ত শ্মশানের প্রেতছায়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। ফলে, গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাদের যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না, তারা রইল প'ড়ে—আর, ভাগ্যান্বেষী ও সুবিধাবাদী পল্লীবাসীরা তখন গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভিড় করল।

কোনো শহরাঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্রগুলি যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি সেগুলি নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও ঋণদাতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে দেখা গেছে যে, গ্রামের ব্যবসায়ীদের কার্যপরিধি কৃষক'দের চেয়ে অনেক বেশি। নতুন কোনো ব্যবসাকেন্দ্র গ'ড়ে উঠলেই গ্রামের ব্যবসায়ীরা সেই নতুন শহরে উঠে যায়। এইভাবেই উনবিংশ শতকে ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদ প্রসারলাভ করেছিল। তাছাড়া, শিক্ষালাভের সুবিধাগুলি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্যান্য লোকেদের শহরবাসের প্রবণতা যে বেড়ে যায় সে কথা তো আগেই বলেছি। পল্লী-অঞ্চলের কোনো যুবক কিছু শিক্ষা বা কোনো বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন করলেই হয় শহরমুখী। এজন্য অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, পল্লী-অঞ্চল থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী বা সম্ভাবনাপূর্ণ প্রায় সব লোকই এইভাবে গ্রাম ত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাবের ফলেই গ্রামীণ বাংলা ক্রমশ একদিন দুর্বলতার শেষসীমায় গিয়ে পড়েছিল। গত শতকের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের যে-সব গ্রাম সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, সেগুলি আস্তে আস্তে বহির্জগতের নানা ঘটনা-প্রবাহের প্রভাবে প'ড়ে তাদের সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারিয়েছে। সেগুলির আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধরেছে ভাঙন। এর উপরে পল্লী-অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থনীতিক স্থিতিশীলতা ভূমিহীনদের একেবারে নিঃস্ব ক'রে দিয়েছে।

ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে পল্লী-সমাজের ভাঙন

পল্লী-সমাজের এই ভাঙন প্রতিরোধ করবার জন্যই একদিন মহাত্মা গান্ধী ও দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষকে পল্লীমুখী করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বদেশী যুগে আবার পল্লীতে পল্লীতে মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু, নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপক চেষ্টা সে-যুগে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর অধুনা পল্লী-অঞ্চলের উন্নয়ন ও পল্লীজীবনের পুনর্গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতির সংস্কার এবং কৃষি ভিন্ন অন্যান্য কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার হ'লেই

শহর ও পল্লীজীবনের বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন

পল্লীর অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে ব'লে অনেকেরই বিশ্বাস। তাছাড়া, শহর ও গ্রামের আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে-বৈষম্য রয়েছে সমবায়ের মাধ্যমে সে-বৈষম্য অপসারিত করাও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে পল্লীসমাজ ও পল্লীর অর্থনীতি শহরের আর্থনীতিক উন্নয়নের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে কি না সন্দেহ। কারণ, এর সঙ্গে মুখ্যত জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্ন। যতদিন না সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিচ্ছে ন্যায়নীতি, আর সেই সঙ্গে সুপরিকল্পিত ও সুদৃঢ় হচ্ছে আর্থনীতিক কাঠামো, ততদিন শহর ও পল্লীজীবনে বৈষম্যের সংঘাত দূর হওয়া সম্ভব নয় এবং পল্লী-অঞ্চল থেকে শিক্ষিত ও মেধাবী লোকের শহরে ভিড় করাও বন্ধ করা যাবে না।

সাম্প্রতিক কালে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লী-অঞ্চলকে উন্নত করবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে আশাবাদী মন স্বভাবতই তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। কারণ, সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন, আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাত্রা নির্বাহের যে-সমস্ত উপকরণ অত্যাবশ্যক, সেগুলি যদি গ্রামাঞ্চলেই সহজলভ্য হয়, তাহ'লে শহরের আকর্ষণ আবার স্তিমিত হয়ে আসবে। শহরের জীবনযাত্রায় যে-সব গলদ এতকাল আত্মগোপন করেছিল এবারে যখন তা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, তখন গ্রামে ফিরে যাবার কথাই যে সকলের মনে উঠবে তা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা-শহরগুলিকে উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে সেগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ-ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে তাহ'লেই পল্লী-এলাকার উন্নয়ন সহজসাধ্য হবে। আর সেই সঙ্গে শহর ও পল্লীর বৈষম্য ক্রমশ দূর ক'রে আনতে হবে পল্লী-অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ক'রে। বৃত্তিমূলক-শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, গ্রামীণ শিল্প—এই তিনটির যেদিন ব্যাপক প্রসার দেখা যাবে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এবং শহরের প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা যেদিন সফলতা লাভ করবে সেদিন আর পল্লীবাসী শহরের আকর্ষণে সাড়া দেবার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাবে না।

পল্লীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ : উপসংহার

জাতির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য

বর্তমানে ভারতের জনস্বাস্থ্য, বিশেষ ক'রে এদেশের শিশুদের স্বাস্থ্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বিশেষ নৈরাশ্যজনক। এর কারণ অনেক, যথা—দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস, পরিমাণ ও উৎকর্ষ উভয় দিক থেকে দেশের খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি, প্রতি বৎসর জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, ভেজাল-জনিত খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা হ্রাস প্রভৃতি। শেষের কারণটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে যারা অর্থ-উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে, বিশেষ ক'রে শিশুদের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশাতে যাদের হাত এতটুকু কাঁপে না তাদের মতো জাতির শত্রু আর নেই। মুখে আমরা অবশ্য এইসব দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু চোখের সামনে ভেজাল মেশাতে দেখলেও যখন হাঙ্গামার ভয়ে কর্তৃপক্ষের গোচরে তা আনি না কিংবা আনতে ভয় পাই, তখন পরোক্ষভাবে আমরাও কি দেশের সঙ্গে শত্রুতা করি না? 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' দু'জনেই তো সমান অপরাধী।

ভূমিকা—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও তার কারণ

পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে কোনো জাতিই বড় হ'তে পারে না। দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে মানুষ হয়তো টিকে থাকে, কিন্তু তাকে বেঁচে থাকা বলা যায় কি? মানুষ তখনই বেঁচে থাকে, যখন দেখা যায় তার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাচুর্য। দৈহিক শক্তি যেখানে দুর্বল, মানসিক শক্তিও সেখানে নিস্তেজ। দেহবল ও মানসিক বলে দুর্বল মানুষ তো জীবন্মৃতেরই সামিল। আমরা আজ যে-'নবভারত' গ'ড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখি, সে-'নবভারত' তো দুর্বল মানুষের দ্বারা গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। সমগ্র জাতিকে যদি না আজ পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা সবল ক'রে তোলা যায় তা'হলে কি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা কোনোদিনও সার্থকতা লাভ করবে? পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই তাই সচেতন হবার সময় এসেছে।

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, যে-সব খাদ্য খাওয়া হয় তার এবং জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-সংগঠনের মধ্যে, তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে এবং রোগ-প্রতিরোধক শক্তি ও দীর্ঘ-জীবনের মধ্যে একটা নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন কাজের উপযোগী শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়ার মত পর্যাপ্ত তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয় না। অথচ, একসময়ে আমরা এই সব দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম। তখন এদেশে শাক-সব্‌জি, ফল ও দুধের কোনো অভাব ছিল না। চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে—'যদি তুমি এক বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে ঘাস রোপণ কর; আর যদি তুমি দশ বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে বৃক্ষ-

পর্যাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যের অভাব সবল জাতি-গঠনের অন্তরায়

রোপণ কর; আর যদি একশ' বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে মানুষ রোপণ কর।' এই প্রবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ হ'লো জাতিকে যদি দীর্ঘস্থায়ী করতে হয় তবে তাকে সবল ক'রে তুলতে হবে। কাজেই, সুস্থ সবল নরনারীবিশিষ্ট জাতি গঠন করতে হ'লে আমাদের যে উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষ যত্নবান হ'তে হবে তা বলা-ই বাহুল্য। দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং কৃষিজমির পরিমাণ সীমিত এ-কথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না, এমন কোনো উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে পুষ্টিকর খাদ্য-সংগ্রহে দেশের মানুষ কোনো অসুবিধাবোধ না করে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-কাজ দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতির যারা ভবিষ্যৎ, সেই অগণিত শিশু ও কিশোর যাতে না পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনবিকাশের ভিত যদি আমরা সুদৃঢ় ক'রে তুলতে না পারি, তাহ'লে অনুশোচনার আর অন্ত থাকবে না।

চেষ্টা থাকলে, কোনো কাজই অসম্ভব নয়। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের নব নব বিস্ময়কর আবিষ্কার তো সেই কথাই আমাদের অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ নানাভাবে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে এবং শুধু প্রধান খাদ্যের নয়, স্বাস্থ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় রোগ-প্রতিরোধক খাদ্যের ঘাটতি পূরণও তাদের দ্বারা সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত দেশের নতুন ভূমি-সংস্কার-ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা এবং চাষের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে উত্তম সার ও বীজ ব্যবহার ক'রে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সুখের কথা এই যে দেশের জাতীয় সরকার আজ প্রয়োজনীয় তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যদ্রব্য দুধ, শাক-সবজি, ফল ও অন্যান্য রোগ-প্রতিরোধক খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রে সামগ্রিক খাদ্যসম্ভারে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। সরকারের এই চেষ্টার সঙ্গে যদি দেশবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা থাকে, তাহ'লে কোনো পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবার নয়। রোগ-প্রতিরোধক আহার্যবস্তু ব্যতীত আমাদের খাদ্য সম্পূর্ণ হয় না। উত্তম স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাই প্রয়োজন সুসমঞ্জস খাদ্য। সেই সুসমঞ্জস খাদ্যের পক্ষে যে-সমস্ত আহার্য প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্যই প্রধান। অন্যান্য আহার্যবস্তু হ'লো বিভিন্ন প্রকার ডাল, দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি প্রোটিনজাতীয় দ্রব্য এবং ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ও মিনারেল (খনিজ) দ্রব্যযুক্ত টাটকা শাক-সবজি ও ফল।

খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি ও সুসমঞ্জস খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিন-যুক্ত আহার্যবস্তু শুধু যে শরীরের পুষ্টিসাধন করে তা নয়, রোগ-প্রতিরোধে এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের অপরিসীম ক্ষমতা। চিকিৎসকেরা তাই আজকাল প্রথমেই লক্ষ্য করেন রোগীর দেহে কোন্ জাতীয় খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের অভাব। জনগণের বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের মধ্যে খাদ্যে অপুষ্টিজনিত নানা রোগ দেখা যায়। খাদ্যে 'ক'-খাদ্যপ্রাণের (ভিটামিন-'এ') অভাব ঘটলে নানারকম

চোখের রোগ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকেরা তখন সেই রোগ সারাতে 'ক'-খাদ্যপ্রাণযুক্ত ওষুধের প্রয়োগ ক'রে থাকেন। অথচ, প্রথম থেকে যদি 'ক'-খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্যবস্তু গ্রহণ করা যেত তাহ'লে তার প্রতিরোধ-শক্তিতেই চোখের অসুখ মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেত না। সবুজ ও সতেজ সবজি প্রভৃতি ক্যারোটিন-যুক্ত খাদ্যে 'ক'-খাদ্যপ্রাণ অধিকমাত্রায় থাকে, যেমন থাকে হলুদে ও কমলালেবু-রঙের সবজি ও ফলে। যেমন—কুমড়ো, গাজর, টম্যাটো, পাকা পেঁপে, আম, খেজুর, ডিমের কুসুম প্রভৃতি। গোরুর দুধেও এই 'ক'-খাদ্যপ্রাণ বর্তমান। শরীরে 'খ'-খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন-'বি') হ্রাস পাওয়ার খুব স্পষ্ট লক্ষণ হ'লো মুখে ও জিহ্বায় ঘা, মুখের কোণ ক্ষয় হয়ে যাওয়া। অপর লক্ষণ হ'লো শুষ্ক ও অমসৃণ ত্বক। দুধ, টাটকা সবজি, ফল প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য বাদ দিয়ে যারা শুধু কলে ছাঁটা চাল, অতিমাত্রায় পরিষ্কার ময়দা প্রভৃতি আহার্যবস্তু গ্রহণ করে তাদের মধ্যেই এই সব রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 'গ'-খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন—'সি') ঘাট্‌তির একটা খুব সাধারণ লক্ষণ হ'লো মাড়ী থেকে রক্ত পড়া—সাধারণ যা স্কার্ভি নামে পরিচিত। আর, 'ঘ'-খাদ্য-প্রাণের (ভিটামিন-'ডি') অভাব হ'লে অস্থির অপুষ্টিজনিত শীর্ণতা-রোগ দেখা দেয়। শিশুদের মধ্যে যেমন রিকেট-রোগ। রোজ আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলির মধ্যে যাতে এইসব খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকে সেদিকে একটু সতর্ক থাকলেই অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। টাট্‌কা শাক-সবজি সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক নয় এবং 'খ'-খাদ্যপ্রাণ রক্ষার সর্বোত্তম উপায় হ'লো খুব বেশি না-ছাঁটা চাল বা আতপ চাল যতটা সম্ভব কম জলে বা জলীয় বাষ্পের সাহায্যে রান্না করা। সবুজ আহার্যবস্তুও কম জলে বা বাষ্পে রান্না করলে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয় না। গোল আলুর খোসা না ছাড়িয়েই রান্না করা সমীচীন। এদেশে যে আমলা ফল পাওয়া যায় তাতে খুব বেশি পরিমাণেই 'গ'-খাদ্যপ্রাণ থাকে এবং তার দামও খুব কম। মরসুমী প্রত্যেক ফল-ই কিছু-না-কিছু প্রত্যেকেরই খাওয়া উচিত। দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় স্যালাডের ব্যবস্থা রাখলে 'গ'-খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটবে না। এই স্যালাড্ তৈরি করা খুবই সহজ। গাজর, বাঁধাকপির পাতা, টমাটো, শসা, বিট, মুলো ও লেটুস শাক প্রভৃতি মিশিয়ে যেমন স্যালাড্ তৈরি করা যায়, তেমনি করা যায় শসা বা মুলোর টুকরো দৈ-এর সঙ্গে মিশিয়ে। মাছের যকৃতের তেল ও ডিমের হলুদে অংশে 'ঘ'-খাদ্যপ্রাণ থাকে। কড্-লিভার অয়েল ও প্রাতঃকালীন সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি গায়ে লাগালেও 'ঘ'-খাদ্যপ্রাণের ঘাটতি অনেকাংশে দূর হয়। প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যদ্রব্যও আমাদের শারীরিক পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়ক।

খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্যবস্তু রোগ-প্রতিরোধক

সুসমঞ্জস খাদ্যগ্রহণে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হয় এবং রোগপ্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করা যায় সেকথা আজ কারও নিকট অবিদিত নয়। কিন্তু, প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে। অর্থের অপ্রতুলতা কিংবা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্য-সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ কিছুতেই আর

তাঁদের উপার্জনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছেন না। ফলে, জেনেশুনেই তাঁরা অসমঞ্জস আহার্যবস্তু গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, আর্থনীতিক এই অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাকে, তাহ'লে বরাদ্দ অর্থের মধ্যেই সে কিছুটা সুষম খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য-দপ্তর জনস্বাস্থ্য-রক্ষা সম্পর্কিত যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে শিশু ও প্রসূতিদের খাদ্য সম্পর্কে। এদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যাতে টিফিনের সময় বিদ্যালয় থেকেই খাদ্য-প্রাণ ও প্রোটিন-যুক্ত কিছু-না-কিছু আহার্যবস্তু পায় সে-বিষয়েও দেশের শিক্ষাবিভাগ আজ বিশেষ মনোযোগী। মহীশূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য-গবেষণাগার ভারতীয় শিশুদের এক বৃহত্তর অংশের উপযোগী শিশুখাদ্য উদ্ভাবন ক'রে যে পরীক্ষামূলক কাজ চালিয়েছেন তার ফল আশাপ্রদ হ'লে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে শিশুখাদ্য-উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। জাতির স্বাস্থ্য-রক্ষায় পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। যেমন ক'রেই হোক আজ আমাদের সেই শারীরিক পুষ্টিসাধনে অগ্রসর হ'তে হবে। এজন্য একদিকে যেমন দেশের খাদ্যসম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ করতে।

সুষম খাদ্যগ্রহণের অন্তরায়: উপসংহার

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ

ভূমিকা

'সমবায়'-কথাটির সহজ অর্থ একযোগে কাজ করা। অর্থাৎ, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে', কিংবা 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'—এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে-কাজ। প্রখ্যাত সমাজ-মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগাল দেখিয়েছেন যে, মানুষের মনে দলবদ্ধ হওয়ার যে সহজাত মনোবৃত্তি রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে, 'আবেদন'—যার অর্থ, মানুষ একা একা অসহায়বোধ করে ব'লে সে অন্যদের সঙ্গ কামনা করে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'সামাজিকতা' বা 'দলবদ্ধতা' যার অর্থ—মানুষ কেবল অপরের সঙ্গ-ই চায় না, সমষ্টিগত কার্যকলাপেও সে অংশগ্রহণ করতে চায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী যে ক'টি মূলগত আকাঙ্ক্ষা আছে, একযোগে কাজ করা তার মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মৌলিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই সমবায়-প্রথার জন্ম।

'সমবায় আন্দোলন'-এর ফলেই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 'সমবায় সমিতি' গ'ড়ে উঠেছে এবং ক্রমশই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে

পারছে দেশের মানুষ। সামাজিক-আর্থনীতিক বহু সমস্যার সমাধানে সমবায়-সমিতিগুলি যেভাবে তাদের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করেছে তা থেকেই সমবায়-আন্দোলনের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। সামাজিক বিষয়বস্তু সহ বিশেষ একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই আমরা তাই 'সমবায়'-আখ্যা দিতে পারি। আর্থনীতিক ও সামাজিক এই উভয় দিকেই প্রভাবিত করছে এর আদর্শবাদ। এর আর্থনীতিক আদর্শ-গুলির প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি বিভিন্ন ব্যবসায়, তার প্রণালী ও পরিচালনার উপর। আর, সামাজিক আদর্শগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সমবায়-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর, বিশেষত তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের উপর। সকলের সাধারণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বা স্বনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবসায়ী মনোভাব প্রবর্তনের এ হ'লো একটি বিশেষ উপায়। সদস্যদের সহযোগিতার উপরেই সমবায়-সঙ্ঘের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত এবং সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সঙ্ঘ নিজেদের কল্যাণের জন্যই কাজ ক'রে যায়।

সামাজিক ও আর্থনীতিক বিষয়ে 'সমবায়'-এর প্রভাব

সঙ্ঘবদ্ধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবায়-সঙ্ঘ বা সমবায়-সমিতির পার্থক্য আছে। ট্রাস্ট, কার্টেল প্রভৃতি অন্য সব সঙ্ঘ থেকে সমবায়-সমিতির পার্থক্য মূলত এই যে, সদস্যদের সাধারণ স্বার্থসাধন সমবায়-সমিতির মূল লক্ষ্য হ'লেও সমাজের অন্য সব মানুষের কোনোরূপ ক্ষতি ক'রে তা হয় না। সমবায়-সমিতির ব্যবসা গতানুগতিক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে চলে না, চলে কার্যকরী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই। সমবায়-প্রথার গভীরতর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির সমস্যাবলীর সমাধানে প্রকৃত পন্থা আবিষ্কার ক'রে এবং একদিকে আয়ের উৎস বৃদ্ধি ও অপরদিকে অযথা ব্যয় নিবারণ ক'রে উক্ত ব্যক্তিদের আর্থনীতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা। আরও প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমবায় হ'লো শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাগরিক সৃষ্টি করার এক সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ উপায়। সমবায়-আন্দোলনকে নৈতিক আন্দোলন হিসাবেও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কারণ, প্রকৃত সমবায়ীর লক্ষ্য হ'লো স্বনির্ভরতা, মিতব্যয়িতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতা। আনুগত্যের অভ্যাস এবং জীবন উন্নত ক'রে তোলার জন্য আর যে-সব মানবিক গুণ দরকার সেগুলিও অর্জন করা যায় সমবায়-নীতি অনুসরণ করলে। ব্যবসায়িক ও নৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সমবায় বয়স্ক-শিক্ষার এক কার্যকরী পরিকল্পনা।

অন্য সব সঙ্ঘ থেকে সমবায়-সমিতির পার্থক্য

পাশ্চাত্ত্য দেশে শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে ব্যষ্টির অর্থনীতি ও সামাজিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় আর্থনীতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সম্পর্ককে প্রয়োজনমত অদল-বদলের জন্যই সমবায়-প্রথার উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ—এই দু'টি বিপরীতমুখী বাদের মধ্যে মধ্যপন্থা হিসাবে তখন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে সমবায়। সমবায়-প্রথাকে তাই বিভিন্ন

আর্থনীতিক ব্যবস্থার সমন্বয় হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্থনীতিক গণতন্ত্র ব'লে যদি কোনো কিছু থাকে, তাহ'লে তা আছে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন সমিতির মধ্যেই। সামবায়িক সমাজের জন্য 'ওয়েন'-এর আন্দোলন প্রধানত প্রচলিত গোঁড়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং পুলিসী রাষ্ট্রের মতবাদের জন্যই প্রসারিত হ'তে পারেনি। কিন্তু সেই আন্দোলনের ফলে সমবায়-প্রথার মূল নীতিগুলির দিকে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। ঋণের মাধ্যমে কৃষি-অর্থনীতিতে সহায়তা দানের জন্য 'রাইফাইসেন'-পরিকল্পনা রচিত হ'লেও জার্মানীর অর্থনীতিতে বিভ্রান্তকারী পরিবর্তনের ফলে তা অনেকাংশে খর্বিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, সে-পরিকল্পনা কয়েকটি দেশের কৃষিজীবীদের আর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। সমবায়-আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা হোরেস্ প্ল্যাঙ্কেট উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর ব্যবসা ও উন্নততর জীবনযাত্রার যে লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন, আর্থনীতিক দিক থেকে তা গণতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থার দিকেই নিয়ে যাবে।

আর্থনীতিক গণতন্ত্রের বীজ

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ—পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা মানব-কল্যাণ। অর্থাৎ, সমবায়-সংস্থার প্রত্যেক সদস্য এই নীতি ও আদর্শ নিয়ে কাজ করবেন যাতে করে তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত উন্নতি হয় এবং সেই ব্যক্তিগত উন্নতিই সমষ্টিগত উন্নতিতে পরিণত হয়। সমবায়ীদের মধ্যে জাতি, আদর্শ, বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত কোনো মতবিরোধ থাকা উচিত নয়। যেহেতু পণ্যের ব্যবহারই সবকিছুর মধ্যে রয়েছে, সেজন্য পণ্য-ব্যবহারকারীদের সমবায়-সমিতির মধ্যেই এই সার্বজনীন নীতির সর্বাধিক প্রয়োগ হওয়া উচিত। সমবায়-প্রথার আর একটি মৌলিক নীতি হ'লো গণতন্ত্র। সর্বাধিক পরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যবসাগত নিয়ন্ত্রণের মানবীয়করণই হ'লো গণতান্ত্রিক আদর্শবাদের লক্ষ্য। সমবায়-সংস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই নীতি অনুসারে, অংশীদারী মূলধনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, সমবায়-সমিতির কার্য-পরিচালনা কালে কোনো সদস্যেরই একটির বেশী ভোট থাকে না এবং প্রক্সির দ্বারা ভোটদানও অনুমোদন করা হয় না। সেখানে কার্যকরী নীতির রূপায়ণে তাই ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগুরু অংশের মতামতই গৃহীত হয়। অবশ্য বিরোধী সংখ্যালঘু সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংযোগ স্থাপন ক'রে গৃহীত নীতির মূল্যায়নে তাঁদের সাহায্য করাও সংখ্যাগুরু সদস্যদের অন্যতম কর্তব্য। কর্মদক্ষতার জন্য কেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজন হ'লেও, গণতন্ত্রের খাতিরে সমবায়-সংস্থায় বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। সমবায়ের আর একটি মূলনীতি হ'লো—স্বাবলম্বন। কোনো ব্যক্তি একা যে-কাজ করতে পারেন না, যৌথব্যবস্থা অবলম্বনের যন্ত্র হিসাবে সমবায়-সমিতি যখন সে-কাজ করতে তাঁকে সাহায্য করে, তখনই সমবায়ের উপকারিতা সর্বাপেক্ষা অনুভূত হয়। বিশেষত, ব্যক্তিগত উৎপাদনের

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ—সার্বজনীনতা, গণতন্ত্র ও স্বাবলম্বন

উপায় সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলিকে সমবায়ের আওতায় উৎসাহিত করা উচিত। এই ঔচিত্যবোধ থেকেই কৃষি-সমবায়-নীতি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদরলাভ করেছে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে এই কৃষি-সমবায়-নীতির উপরে আজকাল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

সমবায়কে বলা হয়েছে—'স্বাবলম্বনের বৃহত্তর সংস্করণ'; অর্থাৎ, নিজের এবং অন্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো সমিতির সদস্যদের সমবেত প্রচেষ্টা। সমবায়ীরা সকলেই যেমন একদিকে সংগঠিত স্বেচ্ছামূলক কাজের অসীম কার্যকরী মূল্য স্বীকার করেছেন, তেমনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার উপর। সমবায়-সমিতির সদস্যদের মধ্যেই সামবায়িক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখার ফলে সমিতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি যে অব্যাহত আছে, এই বিষয়টিকে কয়েকজন সমবায়ী সমবায়-সমিতির মধ্যে অবাঞ্ছিত বা অনতিআগ্রহী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণত সদস্য-সমষ্টি-সমন্বিত সমবায়-সমিতির কোনো সুনিশ্চিত বাজার নেই এবং অ-সদস্যদের মধ্যে সমিতির কার্যকলাপ প্রসারিত করলে এর ক্ষমতা সুসংগঠিত করার একটি উপায় পাওয়া যাবে, এই যুক্তিতে ডঃ সি. আর. কে. সদস্য ও অ-সদস্য উভয়ের মধ্যেই সমিতির কার্যকলাপ প্রসারিত করা সমর্থন করেছেন। তাছাড়া, তিনি এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, সম্পূর্ণ সহযোগিতা অবাস্তব ও ব্যর্থ; বরং সমবায়-সমিতির মাধ্যমে আংশিক সহযোগিতাই সংগঠনটিকে শক্তিসঞ্চয় করতে সাহায্য করে। ক্রেতাদের সমবায়-সমিতিগুলির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মন্তব্যটি খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু উৎপাদনকারীদের সমবায়-সমিতিগুলির ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন-কাজের সঙ্গে সঙ্গে অ-সদস্যদের মধ্যে বিপণনকার্যের সম্প্রসারণও বিশেষ প্রয়োজন। মালিকানা বণ্টন, উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন আরম্ভ এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে মাল-বিপণন দ্বারাই সমবায়ের গণতান্ত্রিক অর্থনীতি সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। সমবায়-সমিতির মুনাফা-প্রবৃত্তি যাতে না প্রকট হয়ে ওঠে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, সেবা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধই যে-সমিতির আদর্শ ব'লে স্বীকৃতিলাভ করেছে, সে-সমিতির মুনাফা-প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। সমবায় দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি করতে গেলে রাজনীতিক নিরপেক্ষতাও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কারণ, রাজনীতিকদের দ্বারা সমবায়-আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই শুধু ব্যাহত করে না, এই আন্দোলনের মূল সুরেরও অবমাননা করে। কাজেই, সমবায়-সমিতিগুলি যদি ধর্মীয় ও রাজনীতিক নিরপেক্ষতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ সর্বসাধারণের অন্তরে সাড়া জাগাতে পারে।

স্বেচ্ছামূলক কাজের গুরুত্ব; সমিতির কার্যকলাপ; ধর্মীয় ও রাজনীতিক নিরপেক্ষতা

সমবায়-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ইংলণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। পরে এই আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের দেশগুলিতে। উনবিংশ শতকের

চতুর্থ দশকে ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম্‌ রাইফেনসেনের উদ্যোগে জার্মানীতেই সর্বপ্রথম 'সমবায়-ঋণদান-সমিতি' স্থাপিত হয়। আর তখন থেকেই সমবায়-নীতির আদর্শ বিশ্ববাসীর মনে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। রাইফাইসেনের সেই 'সমবায়-ঋণদান-সমিতি'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋণগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের কষ্টের লাঘব করা এবং পরোক্ষভাবে তাদের আর্থনীতিক উন্নতি-বিধান। প্রথম দিকে কৃষকদের মধ্যে সমবায়-সমিতি স্থাপনের উৎসাহ দেখা গেলেও, ক্রমশ সমাজের সকল স্তরেই বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলে। ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলনের উদ্ভব হয় অনেক পরে—উনবিংশ শতকের একেবারে শেষভাগে ; আর, সে-আন্দোলন সুদৃঢ় একটা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'সমবায়-সমিতি-আইন' নামে বিশেষ একটি আইনের মাধ্যমে। ১৯২২-সাল পর্যন্ত এদেশে কেবল রাইফাইসেন-উদ্ভাবিত 'সমবায়-ঋণদান-সমিতি' স্থাপনের সুযোগ ছিল। কিন্তু, এদেশেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি স্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান, তদানীন্তন বিদেশী-সরকার তা স্বীকার ক'রে নিয়ে নতুন একটি আইন পাস করেন, যার ফলে সারা দেশে আজ নানা শ্রেণীর সমবায়-সমিতির অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধমান প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষের সমবায়-সমিতিগুলি বিশেষ একটা সংকটের সম্মুখীন হয় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। কারণ দেশের আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তখন বিশেষ একটা মন্দার ভাব চলছিল। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আবার অবস্থার উন্নতি হয় এবং এদেশে সমবায়-আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানে সারা ভারতে প্রায় আড়াই লক্ষ সমবায়-সমিতি আছে এবং তার সদস্য-সংখ্যা প্রায় দু'কোটি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সব সমবায়-সমিতির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১২৫ কোটি টাকার উপর। গ্রাম্য-মহাজনের কবল থেকে এদেশের কৃষকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একদিন যে-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, এদেশে আজ তা শুধু কৃষকদেরই কল্যাণ করছে না, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আর্থনীতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেছে। গ্রামে গ্রামে সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আজ যেমন সঞ্চয়ের উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তেমনি সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ পেয়ে বহু ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারিত হচ্ছে এদেশে। সমবায়-সমিতিগুলি একদিকে যেমন পণ্য ও ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাহায্যদান করছে, অন্যদিকে তেমনি সেগুলির উপযুক্ত বিপণনের ব্যবস্থা ক'রে সমিতির সদস্যদের নিশ্চিন্ত করছে উপার্জনের দিক থেকে। এই সমবায়-প্রথার মাধ্যমেই ভারতবর্ষ আজ সমাজতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী।

ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রসার

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ আজ যদি সমগ্র জাতির অন্তরে পরিপূর্ণভাবে রেখাপাত করতে পারে, তা হ'লেই সমবায়-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে সার্থক। আজ শুধু কৃষি ও কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে আজ যদি আর্থনীতিক

বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহ'লে সমবায়-কর্মধারা গ্রহণই তার প্রকৃষ্ট উপায়। বিদেশী সরকার নিজেদের প্রয়োজনবোধে যে মধ্যবিত্ত-সমাজ গ'ড়ে তুলেছিল তারা যৌথ-কারবার বা যৌথ শিল্প স্থাপনের কোনো ক্ষমতাই অর্জন করতে পারেনি। সে-অক্ষমতা আজও যেন দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের অভিশাপ হয়ে আছে। সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিমাত্র উপায় পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সমবায়-পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গ'ড়ে তোলা।

সমবায়ভিত্তিক সর্বোদয়-সমাজ ঃ উপসংহার

ভারতে কৃষি-সমবায়

কৃষি-সমবায় ব'লে যে-কথাটা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, সেটা যে খুব নতুন কথা এমন নয়। তবে, আমাদের দেশে এখনও কৃষি-সমবায় (বা কো-অপারেটিভ ফার্মিং) ব্যবস্থা প্রসারলাভ করেনি ব'লে, কথাটা হয়তো অনেকের কাছে নতুন লাগছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর অনেক দেশই সমবায়-কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে যে পরিমাণ উপকার লাভ করছে তা দেখে এ দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে ভারতে ঐ কৃষি-সমবায়-প্রথার প্রবর্তন করলে কেমন হয়? ১৯৫৯-সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে,—যাতে বলা হয়েছে যে, ভারতের উন্নয়নমূলক সকল কাজের মধ্যে কৃষি-সমবায় প্রথাকেও গ্রহণ করতে হবে। কেউ বলেন কো-অপারেটিভ্ ফার্মি; কেউ বলেন সার্ভিস-কো-অপারেটিভ্ অর্থাৎ কৃষি-সমবায় বা সেবা-সমবায়। যে-নামেই অভিহিত করা যাক না কেন, আসল কথা হ'লো সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ। এই সমবায়-পদ্ধতির মূল কথা হ'লো পারস্পরিক সহযোগিতায় সকলের সেবা; কারণ ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ন যেখানে থাকে না, সেখানে তা সকলের সেবা বা কল্যাণের রূপ নিয়েই দেখা দেয়। কাজেই, সেবা-সমবায় বললেও অসঙ্গতি হয় না।

ভূমিকা—কৃষি-সমবায় না সেবা-সমবায়

সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ধারণা জাতির উপর হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ-কথা মনে করা উচিত নয়। কারণ, প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাতেই সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ সম্পর্কিত কর্মসূচির উল্লেখ ছিল। পল্লী-সংগঠনের কার্যকরী উপায় হিসাবে সমবায়-কৃষিব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনারও একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। কাজেই, জাতীয়-কংগ্রেস 'কৃষি-সমবায়'-প্রথা

গ্রহণের জন্য যে প্রস্তাব করেছেন, জাতীয়-সরকারও যে-প্রথার অনুমোদন করেছেন তা নতুন নয় বা জোর ক'রে চাপিয়ে দেবার কোনো ব্যবস্থাও নয়। তবে, কৃষি-সমবায় যাতে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে সেজন্য দেশের সরকার যে আজ বদ্ধপরিকর তা সত্য। একথা আজ সুস্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ আর রাষ্ট্রপ্রধান দেশগুলিতে প্রচলিত যৌথখামার-প্রথার মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু বিদেশে প্রচলিত যৌথখামার-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, যদিও কাগজেকলমে তাকে গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা ব'লেই দাবি করা হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে এক-একটি কৃষি-খামারে জমির পরিমাণ থাকবে পঞ্চাশ একর থেকে একশ' বা দু'শ একর পর্যন্ত। এত কম জমি নিয়ে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা আর কোনো দেশে হয়নি। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এক-একটি কৃষি-খামারে জমির পরিমাণ থাকে পাঁচ হাজার থেকে চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার একর পর্যন্ত। বিদেশী যৌথখামারগুলি আয়তনে এত বড় হওয়ার ফলে সেখানকার কৃষকেরা তাদের ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যন্ত্রের অঙ্গমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, বিদেশের যৌথখামারগুলির পক্ষে ব্যাপকহারে যান্ত্রিকীকরণ যেমন অপরিহার্য, ভারতের সমবায়-কৃষিখামারগুলির পক্ষে বেশী যন্ত্রপাতির ব্যবহার তেমন প্রয়োজন হবে না। যদিও যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-আবাদ করলে অনেক দিক থেকে অনেক সুবিধা, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা ক'রে বেশী যন্ত্রপাতির সাহায্য না-নেওয়াই বাস্তবসম্মত যুক্তি। কারণ, তা না হ'লে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, অর্থসমস্যায় জর্জরিত দেশের পক্ষে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

ভারতের কৃষি-সমবায় পরিকল্পনার সঙ্গে বিদেশের যৌথখামারের পার্থক্য

সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সুবিধাগুলি যদি ভারতীয় কৃষকদের সামনে ঠিকমত তুলে ধরা যায় তাহ'লেই তারা এই পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করার জন্য অধিক আগ্রহশীল হবে। পরিকল্পনা-কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীমন্ নারায়ণ সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের কমপক্ষে দশটি সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ করলে কৃষকের ও গবাদি পশুর কায়িক শ্রমের আরও সুষ্ঠু ও সঙ্গত প্রয়োগ সম্ভব হবে। (২) কৃষির উন্নয়ন, বিশেষত সেচের সুবিধা ও উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য সকল সম্পদ একত্র ক'রে প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। (৩) কৃষকেরা কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেমন জাপানী প্রথায় ধানচাষ, উন্নত শ্রেণীর বীজ, সবুজ ও পচাই সার, কীটবিনাশক দ্রব্য প্রভৃতি, আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে। (৪) কৃষিজাত দ্রব্যাদি সমবায়-বিক্রয়-সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করলে ফড়িয়াদের হাত থেকে রেহাই পাবে কৃষকেরা। (৫) পল্লীসমাজে এই সমবায়-পরিকল্পনার মাধ্যমেই স্থানীয় ও সমাজ-নেতা সৃষ্টি

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সুবিধা

সম্ভব হবে। (৬) এই ধরনের আর্থনীতিক সংগঠনের ফলে, বহু শিক্ষিত ও দক্ষ তরুণদের গ্রামেই বিভিন্ন কাজের জন্য গ্রহণ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি অন্নসংস্থানের জন্য তাদের আর শহরে ছুটতে হবে না। (৭) যে-সব দরিদ্র কৃষককে বর্তমানে ঋণদানের অনুপযুক্ত ব'লে বিবেচন করা হয় সমবায়-কৃষি খামারে যোগদানের ফলে তারাও প্রয়োজনীয় ঋণ এবং অন্যান্য সুবিধা পেতে পারবে। (৮) সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে কৃষির পরিপূরক নানারূপ গ্রামীণশিল্প ও আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপিত হবে এবং পল্লীর আর্থনীতিক ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি হবে। (৯) বহুসংখ্যক কৃষককে পৃথকভাবে সাহায্য করার চেয়ে কৃষকদের বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ এবং কারিগরী জ্ঞান দান করা সরকারের পক্ষে হবে অধিকতর সহজসাধ্য। (১০) তাছাড়া, কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান আরও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং সেগুলি হবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

কৃষি-সমবায়-প্রথার যাঁরা বিরুদ্ধ-সমালোচক, তাঁরা বলেন যে, সমবায়-কৃষিখামারে একবার যোগদান করলে কোনো কৃষকের পক্ষে আর বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। কিন্তু, পরিকল্পনা-কমিশনের মতে সে-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে, সমবায়-কৃষিখামারে যোগদান করার পর যে-কোনো কৃষককে বেশ কয়েক বছর ধ'রে নিজের উন্নতি-অবনতির ফলাফল পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু, কয়েক বছর পরে সে যদি দেখে যে, সমবায়-কৃষিখামারে যোগ দিয়েও তার সমস্যাবলীর কোনো সুষ্ঠু সমাধান হ'লো না, তা হ'লে অনায়াসেই সে সমবায়-খামার ত্যাগ করতে পারবে। তবে, খামারের কাজে যাতে না কোনো আকস্মিক অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেজন্য খামার ত্যাগের একমাস আগে তাকে এই মর্মে একটা নোটিশ দিতে হবে। তাছাড়া, তাকে যেমন তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তেমনি তার জমির উন্নয়নে সমবায়-কৃষিখামার যে-অর্থ ব্যয় করেছিল তাও পরিশোধ ক'রে যেতে হবে। খামারের সংহতি বজায় রাখবার জন্যই এই জাতীয় কিছু কিছু বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু এইসব বাধ্যবাধকতা পালনের পর খামারত্যাগেচ্ছু কৃষকের পক্ষে জমি ফিরে পাওয়া কিংবা সমমূল্যের অন্য কোনো জমি লাভে আর কোনো বাধা থাকবে না। সমবায়-কৃষিখামার প্রতিষ্ঠার সময় যে-চুক্তিপত্র রচিত হবে তারই শর্তাবলীর উপর যে এইসব ব্যবস্থা নির্ভর করবে তা বলা-ই বাহুল্য। এদেশে সমবায়-কৃষিখামার স্থাপনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর কৃষিখামার এদেশে গঠিত হবে না, স্থানীয় পরিস্থিতি ও কৃষকদের ইচ্ছানুসারেই এ-দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়-কৃষিখামার গ'ড়ে উঠবে। দেশের সর্বত্র অনতিবিলম্বে যাতে এই ধরনের কৃষি-সমবায়গুলি স্থাপিত হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সংস্কারমূলক সব ব্যবস্থাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে ; আর ভারতের সমাজগঠন ও আর্থনীতিক অবস্থার দিক থেকে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদই সর্বাপেক্ষা

সমবায় কৃষিখামার ও এদেশের কৃষক

উপযুক্ত। আশা করা যায়, এ-দেশের কৃষকেরা কৃষিকাজে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে স্বেচ্ছায় সমবায়-কৃষিখামার গঠন করবে। সমাজসেবী বা রাজনৈতিক কর্মী কারও পক্ষে জোর ক'রে দেশে সমবায়ভিত্তিক চাষ-আবাদ প্রবর্তনের কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত হবে না। শুধুমাত্র পরিমাণ ও সংখ্যার উপরে জোর না দিয়ে গুণের উপরেই জোর দিতে হবে। সরকারী সাহায্য লাভের জন্য এদেশে অনেক ভুয়া-সমবায়-কৃষিখামার গ'ড়ে উঠতে পারে ; হয়তো দেখা যাবে, শুধু কাগজে-কলমেই সেগুলির অস্তিত্ব আছে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এ-সব ব্যাপার যাতে না ঘটতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করতে হবে দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষকে।

দেশের কৃষিব্যবস্থার, সেই সঙ্গে কৃষকদের, উন্নতিসাধনের জন্যই আজ আমাদের সমবায়-চাষপদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এদেশের অধিকাংশ চাষের জমি আয়তনে সামান্য ব'লে কৃষির কাজে উপযুক্ত লাভ হয় না ; অথচ, জমি সামান্য হ'লেও সেই জমির পেছনেই চাষীকে তার পুরো সময় দিতে হয়, অর্থব্যয়ও করতে হয় যথেষ্ট। দরকারের সময় একটা কুয়ো কাটা কিংবা বলদ কেনবার মতো টাকাও থাকে না চাষীর হাতে। টুকরো টুকরো জমিতে হালের বলদকে ঠিকমতো খাটানোতেও চাষীরা অসুবিধা বোধ করে। কাজেই, এ-দেশের চাষীরা যদি সমবায়-কৃষিখামার গঠন করে, তাহ'লেই কেবল এইসব অসুবিধা দূর হ'তে পারে।

উপসংহার

এছাড়া, আরও অনেক কাজ, যেমন—সেচের জন্য পাম্প বসানো, জমি রক্ষার জন্য বাঁধ দেওয়া এবং একসঙ্গে অনেক পরিমাণ বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধপত্র ও চাষের সাজসরঞ্জাম সবই সহজলভ্য হ'তে পারে কৃষকদের সমবায়-সমিতি থাকলে। বলা বাহুল্য, ভারতে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সততা ও কর্মদক্ষতার উপর। সহযোগিতা হ'লো মানবজীবনের অপরিহার্য একটি গুণ—এই সহযোগিতার উপর যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, শুধুমাত্র তাঁরাই অন্যদের সমবায়-প্রথার দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন।

বনমহোৎসব

সৃষ্টির সেই আদিযুগে, পৃথিবী যখন নবীনা, সেদিন মানবসভ্যতা জন্ম নিয়েছিল আমাদের এই ভারতবর্ষের অরণ্যছায়ায়। অরণ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠতায় বেড়ে উঠেছিল সেই সর্বপ্রথম অমৃতপুত্রের দল। সেদিনকার ভারতে অরণ্যের মর্যাদা ছিল নিঃসন্দেহে অনতিক্রান্ত। বৃক্ষের প্রকৃত মর্যাদা জানতেন আমাদের মহান্ পূর্বপুরুষেরা—যাঁরা আমাদের সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাঁরা এই বৃক্ষের মধ্যে দেখেছিলেন

অনন্ত মাধুর্যের সমাবেশ। এই বৃক্ষের কাণ্ডে, পত্রে, পুষ্পে, ফলে তাঁরা মূর্ত দেখেছিলেন এক অসীম কল্যাণেচ্ছা। বসুন্ধরার অন্তরতম মণিকোঠা থেকে রূপ, রস, গন্ধ আহরণ ক'রে উন্নত মাথা তুলে দাঁড়াল সে—অনন্ত দ্যুলোকের দিকে। মানুষের রোগে দিল সে ওষধি, ক্ষুধায় দিল ফল, যজ্ঞসমিধ-রচনায় দিল কাষ্ঠ। তারই পত্রে বল্কলে রচিত হ'লো বেদগান, স্নেহ-অঙ্কে পুষ্ট হ'লো ঋষির তপোবন—আবার তারই পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত হ'লো মানবপ্রিয়ার দেহ, পদতল রঞ্জিত হ'লো তারই লাক্ষারাগে। সেদিনকার ভারতবর্ষে তাই বৃক্ষরোপণের একটি মহান্ সংজ্ঞা ছিল। গৃহীর কুটীরপ্রাঙ্গণ থেকে রাজপ্রাসাদের কুঞ্জবন পর্যন্ত সর্বত্র চলত বৃক্ষরোপণের উৎসবপালন।

ভূমিকা—প্রাচীন ভারতে বৃক্ষের মর্যাদা

তারপর এলো নতুন যুগ, নতুন সভ্যতা। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এই শ্যামল স্নেহাঞ্চলের অধিকারকে মানুষ একরকম জোর ক'রেই সংকুচিত ক'রে আনল। লুব্ধ, ক্ষুধার্ত দুই বাহু মেলে দিয়ে সে গ্রাস ক'রে চলল বনের পর বন। আজকের ভারতবর্ষ তাই অরণ্যসম্পদে রিক্তা। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে বন আমাদের কতবড় নিকট-আত্মীয়। আজ আমরা শিখেছি বনের অস্তিত্ব না থাকলে এই সভ্য জগৎ কোন্‌কালে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যেত। বিজ্ঞান আজ বলছে বন না থাকলে মাটির বুকে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে না। আর, বৃষ্টিপাতের অভাবে সন্নিহিত সুবিস্তৃত ভূখণ্ড যে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়, সে তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। মানুষ আজ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে—বনের বৃক্ষসম্পদ বন্যা প্রতিরোধ করে, ধ্বসে যাওয়ার হাত থেকে পাহাড়কে রক্ষা করে, বনের বৃক্ষরাজিই মানুষের সর্বব্যবহার্য কাষ্ঠের ভাণ্ডার। আজ তাই আইন ক'রে বনভূমি রক্ষা করতে হয়, দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হয় বৃক্ষরোপণে।

মানব-সমাজে বনভূমির সার্থকতা

অরণ্যসম্পদে রিক্ত আধুনিক সভ্যতার ভয়াবহ পরিণাম কিন্তু কবিগুরু ও সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের যুগোত্তর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন বৃক্ষরোপণের ব্রত গ্রহণ না করলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে, ধূমাবতীর গতি প্রতিরোধ করা যাবে না, সভ্যতা অবলুপ্ত হবে ধূলার সঙ্গে মিশে। শান্তিনিকেতনে তিনি তাই একদিন বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা করলেন আনন্দ-রস-সমৃদ্ধ চমৎকার এক নৃত্যগীত-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা এই উৎসব পালন ক'রে আসছে। ভারতবর্ষে সরকারীভাবে আজ যে 'বনমহোৎসব' পালিত হচ্ছে, এদেশে রবীন্দ্রনাথই তার সূচনা করেছিলেন একথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বৃক্ষরোপণের উৎসবকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিগুরুর কণ্ঠে একদিন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল -

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বনমহোৎসবের সূচনা

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।

ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ॥"

বৃক্ষের বিচিত্র শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে একসঙ্গে ব'লেছিলেন প্রবল, কোমল ও মোহন। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন—"মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল, ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হ'লো তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য।...সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।"

স্বাধীন ভারতে বনমহোৎসবের পরিকল্পনা ও বিদেশের প্রকল্প

ভারতে জাতীয় মহোৎসবরূপে বনমহোৎসব প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০-সালে। তারপর থেকে প্রতি বৎসরই ভারতের সর্বত্র এই উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। গত দশ বছরের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা মনে না ক'রে উপায় নেই যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বৃক্ষের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তোলার জন্য অনেক কিছুই করণীয় আছে। বস্তুত, বনমহোৎসব-অনুষ্ঠানের সময় সকলের আগ্রহ ও উৎসাহের গভীরতা এবং তার স্থায়িত্বসাধন অত্যাবশ্যক। এই বিষয়টিকে একটি অপরিহার্য আনুষ্ঠানিক আচার হিসাবে না দেখে এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক জাতীয় প্রচেষ্টারূপে দেখতে হবে যার লক্ষ্য—মানুষের পরিবেশ গঠনে বৃক্ষরাজি ও অরণ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা-সম্পর্কে সাধারণ লোকের অজ্ঞতার ফলে যে-অকল্যাণের উদ্ভব হয়েছে তার প্রতিকার-সাধন। দুই শতাব্দী পূর্বে জন এভেলিন লিখেছিলেন, "বৃক্ষের পরিবর্তে বরং স্বর্গ না থাকলেও আমাদের চলে।" তাঁর দেশের যে বহুসংখ্যক চারু ও কারু শিল্প বৃক্ষ ও অরণ্যজাত কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্যের অবিরত সরবরাহের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেগুলির উদাহরণ দিয়েই তিনি নিজ বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করেছিলেন। যাত্রাপথে নষ্ট হ'তে পারে, কাঠের মতো এমন কোনো গুরুভার দ্রব্য বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে আমদানির চেষ্টার মূর্খতার প্রতিও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এভেলিন সম্ভবতো কল্পনাও করতে পারেননি যে, দু'শ বছরের মধ্যেই তাঁর উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হবে। শত্রুদেশ কর্তৃক পরিচালিত অবরোধের ফলে আমদানি বন্ধ হ'তে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই ব্রিটিশ জনসাধারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, এ-কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে,

স্বদেশেই বিপুল অরণ্য-সম্পদ সৃষ্টি করা সবিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ব্রিটেনে অরণ্য-সৃজন, অরণ্য-সম্পদের সংরক্ষণ ও সংহতিসাধনের সুনির্দিষ্ট সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

বৃক্ষ ও বৃক্ষজাত দ্রব্যাদি বহুবিচিত্র উপায়ে মানুষের কাজে লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এক বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি সুদীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অরণ্য-অঞ্চলসমূহ অধিকারের চেষ্টা করেছিল। এই শ্রেণীর প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, খনিজ সম্পদের মতো একসময়ে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে, বিজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা দ্বারা সর্বদাই এর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। সাম্প্রতিক কালে বল্‌গাহীন প্রাকৃতিক শক্তির রোষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অরণ্যের উপযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বহুদেশের সরকারই ভূমি-সংরক্ষণ, পার্বত্য পর্যঙ্কসমূহে জলাধার সৃষ্টি, স্রোতস্বিনীসমূহের পলি-নিয়ন্ত্রণ, জলের উচ্চতা-সংরক্ষণ, আবহাওয়ার মৃদুতাসাধন, সম্প্রসারশীল বালিয়াড়িসমূহকে স্থানুকরণ এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজে বনভূমির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। প্রগতিশীল প্রত্যেক দেশেই আজ বর্তমান অরণ্যগুলিকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে নূতন ক'রে অরণ্যসৃজন, এই উভয় বিষয় সম্পর্কেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও যে-সব বন আছে সেগুলি যাতে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং নূতন নূতন অঞ্চলে যাতে বনভূমি রচিত হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বনমহোৎসব পালনের আয়োজন করা হয়েছে এদেশে। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্যই হ'লো বনসম্পদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ-সংরক্ষণ সম্পর্কে তাদের উৎসাহিত করা। আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি অল্প সন্দেহ নেই; কিন্তু এখনও যে-সকল বনভূমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে সেগুলির সংরক্ষণ সম্পর্কে যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তা হ'লে কোনো প্রতীক-অনুষ্ঠান, তা যতই কেন না চিত্তাকর্ষক হোক তার দ্বারা কোনো বৃহৎ ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করা চলে না।

বনভূমির গুরুত্ব ও বনমহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীন-ভারতে 'বনমহোৎসব'-অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে এ-যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা এ-প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে। ১৯৫০-সাল থেকে ১৯৬০-সাল—এই দশ বছরের বনমহোৎসবের ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের চারা লাগানো হয়েছিল আড়াই কোটির উপর এবং সেগুলির মধ্যে গাছ বেঁচেছে সওয়া কোটির মতো। অর্থাৎ, শতকরা পঞ্চাশটি চারা এই রাজ্যে বেঁচেছে। বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে, বৃক্ষসম্পদে দেশকে উন্নত করবার প্রচেষ্টায় এই কাজ সাফল্যজনক বৈকি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই হয়েছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৯৫০-সাল থেকে ১৯৫৮-সাল পর্যন্ত পরপর

বনমহোৎসবের সুফল: বৃক্ষরোপণের পর বৃক্ষের লালন-পালন

সাতবার এই জেলা 'রাজ্য বনমহোৎসব শীল্ড' পেয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক চারা বাঁচানোর জন্য। শিশুর জন্মের দিনটিতে খুব খানিকটা উৎসব-আনন্দ ক'রে তার পরদিন থেকে তার কথা যেমন ভুলে যাওয়া চলে না, তেমনি বন-মহোৎসবে একটি গাছকে আড়ম্বরসহকারে রোপণ ক'রে তার পর থেকে তার কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, বৃক্ষরোপণেই বন-মহোৎসবের দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং সেই দিনটি থেকেই রোপণকর্তার উপর দায়িত্ব এসে পড়ে সেই গাছটিকে সযত্নে পালন করবার। দুঃখের বিষয়, বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ লোকই বৃক্ষরোপণের বেলায় যে-উৎসাহ দেখান, পরে তাকে পালন করার বেলায় সে-উৎসাহ তাঁরা আর রক্ষা করেন না। ফলে, উৎসবের আসল উদ্দেশ্যটিই যায় ব্যর্থ হয়ে। গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে সেগুলিকে ঠিকভাবে পালন করা হয় না ব'লেই এদেশে বেশির ভাগ গাছ মারা পড়ে। বেঁচে থেকে কালে দেশের বৃক্ষসম্পদ বাড়ানো আর তাদের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। এ-বিষয়ে তাই সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে, সরকারী বনবিভাগ থেকে প্রতিবৎসরই নানারকম গাছের অসংখ্য চারা জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। তাছাড়া, কৃষি-বিভাগ এবং ভারতের বিভিন্ন উদ্ভিদ্-উদ্যান থেকেও নানারকম গাছের চারা ও কলম বিক্রি করার ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণ অনায়াসেই এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারেন। দেশের বনসম্পদের উন্নয়নে নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেমন বনভূমি সৃজন করার গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি শহরে ও গ্রামের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ-গাছড়া লাগানোর প্রয়োজনীয়তাও সকলের উপলব্ধি করা উচিত।

উপসংহার

শহর ও গ্রামের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে, পথের দু'পাশে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে এবং বাস্তুজমিতে কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা থাকেই। ঐ-সব জায়গায় বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করলে শুধু যে প্রয়োজনীয় ফলফুলই পাওয়া যাবে তা নয়, ঐসব জায়গার মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, সুশীতল ছায়া বিস্তার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তা নিশ্চিতরূপেই সহায়ক হবে। মোট-কথা, যেখানে যেমন গাছ দরকার তা লাগাতে হবে। অনুর্বর পতিত জমির কুশ্রীতা, বিস্তৃত অঞ্চলে ভূমিক্ষয়, কৃষিভূমির বালুকাকবলিত হওয়া—এ-সব বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য যেমন বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মানুষের জৈবিক, ব্যবহারিক ও আর্থিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে,—মানুষের গড়া পরিবেশকে ফুলফলে সুশোভিত ক'রে তার মানসিক আনন্দবিধান করতে। বৃক্ষরোপণকে তাই শুধু সাময়িক একটা উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন করা উচিত নয়, একে আমাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে—তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই মহোৎসবের সার্থকতা।

ভারতের আদমসুমারী

আদমসুমারী কথার অর্থ হ'লো লোকগণনা। সাধারণভাবে এতে মাথাগুনতি-ই বোঝায়। কিন্তু আধুনিককালে আদমসুমারী বলতে বোঝায় আরও অনেক কিছু। এ শুধু লোকগণনাই নয়, এ হ'লো জাতির সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংখ্যার বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা। আদমসুমারীর উৎস অতি প্রাচীন। 'আদমসুমারী' অর্থে ইংরেজীতে যে 'সেন্সাস' শব্দটি আমরা পাই, সে-শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের আমলে। সেই সময়েই সর্বপ্রথম দেশের জনসংখ্যা গণনার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা গণনার উল্লেখ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। প্রাচীনকালের আদমসুমারীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল করধার্য ও সামরিকবাহিনীর কাছে নাগরিকদের দায়িত্ব নিরূপণ। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যে, এইরূপ উদ্দেশ্যে লোকগণনার ব্যবস্থা সেকালে নিশ্চয়ই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই লোকগণনার এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে এর কোনো প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়নি। আদমসুমারীর মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দেশবাসীর অজ্ঞতাজনিত বিরূপতার জন্য এর বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার সৃষ্টি হয়। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আদমসুমারীর বিরুদ্ধতা করে এই কারণ দেখিয়ে যে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে দেবতার রোষ ও মহামারী দেখা দিতে পারে। ক্রমে সামরিক রাষ্ট্র থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দেশবাসী আদমসুমারীর যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করে, এবং কানাডার নোভাস্কোসিয়া প্রদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম আদমসুমারী গৃহীত হয়। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথা স্বীকৃতিলাভ করে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে আদমসুমারী প্রবর্তিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। আর, ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন হয় ব্রিটিশ আমলে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশের লোকগণনা ও আনুষঙ্গিক নানা তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে আদমসুমারী-ব্যবস্থার মাধ্যমে। আধুনিককালে আদমসুমারীর তথ্যাদিকে যাতে না কর-নিরূপণ কিংবা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেজন্য বিশেষ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে। লোকগণনার এই আধুনিক মাধ্যমে সংগৃহীত সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির তথ্যাদি কেবলমাত্র পরিসংখ্যানতত্ত্বের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভূমিকা—আদমসুমারীর সংজ্ঞা ও ইতিহাস

আদমসুমারী গৃহীত হ'লে কী কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সাধারণ লোকের মনে সে-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। জনকল্যাণব্রতী প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার জনগণের খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাদির জন্য যেমন নানা পরিকল্পনা করতে হয়, তেমনি অর্থও বরাদ্দ করতে হয় প্রয়োজন অনুসারে। জাতির সর্বাঙ্গীণ

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য যখন রাষ্ট্র-ই দায়ী, তখন তাকে একথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কিভাবে দেশের শিল্পশক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, জনগণের জীবনযাত্রার মান কিসে উন্নত করা যায়। রাষ্ট্রের পক্ষে এইসব কাজের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা তখনই করা সম্ভব হয়, যখন তার সম্মুখে থাকে জাতির বিবিধ প্রয়োজন, সমস্যার বিরাটত্ব জনসংখ্যার পরিমাণ, জনগণের প্রবণতা ও জনশক্তির সম্ভাব্যতার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য ও একমাত্র উপায়-ই হ'লো আদমসুমারী। স্বাধীন-ভারত আজ যে বিরাট আকারে পরিকল্পিত জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সে-দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে নির্ভরযোগ্য আদমসুমারীর তথ্যাদি শুধু মূল্যবানই নয়, অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে এ-যাবৎ দু'টি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা অনুসারে শুরু হবে আরও অনেক নতুন নতুন কাজ। এখন আমাদের তাই অতীতের কর্মকৃতির হিসাব নিয়ে ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে যাবে তাও জানতে হবে। ১৯৬১-সালে সারা ভারতবর্ষে যে আদমসুমারী গৃহীত হয় তাই হ'লো এদেশের দশম আদমসুমারী।

আদমসুমারীর প্রধান উদ্দেশ্য : জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে আধুনিক আদমসুমারীর সূচনা হয় ব্রিটিশ আমলে, ১৮৭১-খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে ১৯৪১-খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে লোকগণনা হয়, তার ভিত্তিতেই দেশবিভাগ হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। স্বাধীন-ভারতে প্রথম আদমসুমারী গৃহীত হয় ১৯৫১-সালে। অতীতের এইসব আদসুমারীর মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে একটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৮৮১-খ্রীষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ। ১৮৯১-খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৭৩ লক্ষে। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৩৪ লক্ষ বৃদ্ধি পায়। ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ, ৩১ কোটি ৫২ লক্ষ, ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ, ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ও ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি দশ বছর অন্তর এদেশের লোকসংখ্যা কমপক্ষে ২ কোটির মতো বেড়েছে, আর ১৯৩১-৪১ এই দশকের মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬২ লক্ষ। ১৯২১-খ্রীষ্টাব্দে যে লোকগণনা হয় তখন ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারপর ১৯৫১-সালে যে-লোকগণনা হয়, তাতে ভারতবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের কিছু বেশি (জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা বাদে)। আপাতদৃষ্টিতে, এই সংখ্যা পূর্বেকার তুলনায় কম মনে হ'লেও, আসলে কিন্তু তা আদৌ কম নয়। কারণ, ১৯৫১-সালের লোকগণনায় কেবল খণ্ডিত স্বাধীন-ভারতেরই জনসংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, পূর্বেকার অখণ্ড-ভারতের পরিচয় তাতে নেই। ১৯৬১-সালে যে আদমসুমারী গৃহীত

ভারতের বিভিন্ন আদমসুমারী ও সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য

হয় তাতে ভারতের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ কোটির মতো। আগে এদেশে মৃত্যুর হার অধিক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্প্রতিককালে সে-হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং এখন মৃত্যু-হারের তুলনায় জন্ম-হারই বেশি। ভারতীয় আদমসুমারী যেভাবে পরিচালিত হয় তাতে জনসংখ্যার হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে তার যে-সব মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলি মোটামুটিভাবে এই—জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার, পুরুষ ও নারীর পৃথক সংখ্যা, শহরবাসী ও পল্লীবাসীর পৃথক হিসাব, জীবিকাভেদে ও রাজ্য-ভেদে লোকসংখ্যা; সমগ্র ভারত ও বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন, শহর ও পল্লীর আয়তন; কৃষিজমি, পতিত জমি, বনভূমি ইত্যাদির পরিমাণ; জনবসতির ঘনত্ব; জন্ম-মৃত্যুর হার; শিক্ষিত ও নিরক্ষরের সংখ্যা; ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা; তাছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সংক্রান্ত বহুবিচিত্র পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি। ১৯৫১-সালের আদমসুমারীর মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে, স্বাধীন-ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের উপর, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর গড়ে ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়, জনবসতি প্রতি বর্গমাইলে ৩১২ জন, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১৬·৬ ভাগ, আনুপাতিক হারে প্রতি হাজার জন পুরুষের জায়গায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪৭ জন, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ বাস করে শহরে এবং বাকী গ্রামে, শহরের সংখ্যা যেখানে তিন হাজারের মতো, গ্রামের সংখ্যা সেখানে পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজারের বেশি, মোট আয়তন ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইলের মাত্র ৩৬ ভাগ আবাদযোগ্য, মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ ০·৭৫ একর, মোট ভূমি-এলাকার শতকরা ১১·৪ ভাগ বনভূমি, জন্মের হার যেখানে হাজার-করা ২৫·৪ জন, মৃত্যুহার সেখানে ১৩·৮। শুধু জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই সব তথ্য যে মূল্যবান ও অত্যাবশ্যক তা নয়, সাধারণজ্ঞান-সমৃদ্ধির জন্যও এ-সব তথ্য অপরিহার্য।

ভারতের এই আদমসুমারী পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক কার্যরূপে গণ্য। কাজটি যে কত বিরাট তা বোঝা যায় যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, সমগ্র মানবজাতির এক-ষষ্ঠমাংশ লোককে আমাদের গণনা করতে হয় এবং প্রতিটি ব্যক্তির খুঁটিনাটি তথ্যও সংগৃহীত হয় সেই সঙ্গে। ১৯৬১-সালে সমগ্র ভারতের লোকগণনার জন্য প্রায় দশ লক্ষ কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শুধু এইসব কর্মীর চেষ্টার উপরেই কিন্তু জনগণনার সাফল্য নির্ভর করে নি, প্রকৃত সাফল্য দেখা দেয় সর্বসাধারণের সহযোগিতা এবং গণনাকর্মে নিযুক্ত কর্মী ও জনগণের পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। উভয়পক্ষ যেখানে আদমসুমারীর নির্ভুলতা, গুরুত্ব ও পূর্ণাঙ্গ লোকগণনার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেখানেই উদ্দেশ্য হয়েছে সার্থক।

১৯৬১-সালের আদমসুমারী ও তার বিভিন্ন দিক

১৯৬১-সালের আদমসুমারীর জন্য যে প্রশ্নতালিকা প্রস্তুত করা হয়, তা থেকে যুগোপযোগী বহু তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রশ্নমালা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে ছিল পারিবারিক তথ্যাদি, চাষ-আবাদ ও পারিবারিক শিল্পাদি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি প্রশ্ন, অন্যভাগে ছিল ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা। এই আদমসুমারীর

আর একটি যে বিশেষত্ব ছিল তা হ'লো নির্দিষ্ট পাঁচশ' গ্রামে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও আর্থনীতিক পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো। আদমসুমারীর যে বিশদ বিবরণী প্রস্তুত হচ্ছে তাতে এই সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু তথ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে। আমাদের দেশের এই আদমসুমারীর গ্রহণ করার বৈধ ভিত্তি রচিত হয় '১৯৪৮-সালের সেন্সাস আইন' অনুযায়ী। এই আইনে নাগরিকদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, আদমসুমারীতে সংগৃহীত তথ্যাদি অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হবে, এমন কি কোনো আদালতেও এইসব তথ্য সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা উত্তর দেবার অভিযোগে 'সেন্সাস-আইন'-অনুসারে অভিযুক্ত করা হ'লে স্বতন্ত্র কথা। আইনত প্রত্যেক নাগরিক আদমসুমারীর বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু, অনুমোদিত প্রশ্নাবলী ব্যতীত দুরভিসন্ধিমূলক কোনো প্রশ্নই করতে পারবেন না গণনাকারী।

আদমসুমারী গ্রহণের যে ব্যাপক আয়োজন হয়েছিল তার সঙ্গে যদি দেশের সর্বসাধারণ, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ভুল ও যথাযথভাবে সরবরাহ ক'রে সহযোগিতা ক'রে থাকেন, তাহ'লেই নির্ভরশীল তথ্য সংগৃহীত হবে। অন্যথায় যে-তথ্য আমরা পাব, তার মধ্যে সত্যের অনেক ফাঁকি বা কারচুপি থেকে যাবারই সম্ভাবনা। ভারতে আদমসুমারীর সুন্দর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর দেশবাসী স্বেচ্ছায় ও অবৈতনিক ভিত্তিতে এই জাতীয় প্রচেষ্টায় এতকাল সহযোগিতা ক'রে এসেছেন। আইনের নির্দেশ কিংবা সরকারী হুমকিতে এই সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, জাতির পক্ষে আদমসুমারীর যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সত্য উপলব্ধির ফলেই জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতালাভ সম্ভবপর হয়েছে। গণতান্ত্রিক এই দেশে বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদ থাকলেও, আদমসুমারীর ব্যাপারে কোনো মতভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই সকল রাজনীতিক মতবিরোধ বর্জন ক'রে প্রত্যেকেরই উচিত আদমসুমারীর উদ্দেশ্য সার্থক ক'রে তোলা।

উপসংহার

মেট্রিক-পদ্ধতির প্রচলন

ভারতে প্রচলিত নানা ধরনের ওজন ও মাপের বদলে মেট্রিক-পদ্ধতির ওজন ও মাপের প্রচলনকে রীতিমত একটা বৈপ্লবিক সংস্কার বলা চলে। ১৯৫৬-সালে ভারত-সরকার ওজন ও মাপের মান সম্পর্কিত যে আইন পাস করেন সেই আইন অনুসারেই ১৯৫৮-সালের ১লা অক্টোবর থেকে মেট্রিক-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে এদেশে। কিন্তু, এতকালকার প্রচলিত ব্যবস্থাকে হঠাৎ যদি রাতারাতি পরিবর্তন করা হয়, সারাদেশে এবং সর্বক্ষেত্রে, তাহ'লে জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ ও অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে, সেই কথা মনে রেখে আইন পাস করবার সময় লোকসভায় স্থির হয় যে, ১৯৫৮-সাল থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে দেশবাসীকে

ভূমিকা—ভারতে মেট্রিক-পদ্ধতির প্রবর্তন

মেট্রিক-পদ্ধতির ওজন ও মাপের হিসাবে অভ্যস্ত ক'রে তোলা হবে এবং দরকার হ'লে এই সময় আরও বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এই পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় জনসাধারণ ক্রমশ এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন এবং পরিবর্তিত প্রথার সুবিধাগুলি উপলব্ধি করতে পারছেন। পৃথিবীর বহু দেশেই ওজন ও মাপের এই দশমিক-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনে এই পদ্ধতি প্রচলিত না থাকলেও সেখানে তা আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সেখানকার কারিগরী উন্নয়ন-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেও এই প্রথা জড়িত। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে ওজন ও মাপের এই নূতন পদ্ধতি গৃহীত হ'লেও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এই নিয়মেই ভারতীয় ওজন ও মাপের মান সংস্কার করবার প্রথম চেষ্টা চলে। ১৮৬৭-সালে তদানীন্তন ইংরেজ-সরকার এজন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং কর্নেল স্ট্র্যাচে নিযুক্ত হন তার সভাপতি। কর্নেল স্ট্র্যাচেই প্রস্তাব করেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ওজন ও মাপের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ফরাসী (মেট্রিক)-প্রথা প্রবর্তিত হোক এবং সেজন্য আইনের একটি খসড়াও তিনি তৈরি করেন। কিন্তু স্ট্র্যাচে-কমিটির বিভিন্ন সদস্য এবং ভারত ও ইংল্যাণ্ডের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁরা ইংলণ্ডীয় পাউণ্ড, ফুট প্রভৃতি প্রথার পক্ষেই মত দেন। ফলে স্ট্র্যাচের সেই মেট্রিক পদ্ধতি এদেশে সেদিন প্রবর্তিত হ'তে পারেনি। কিন্তু, মেট্রিক-পদ্ধতির সরলতা ও উপযোগিতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সে-প্রথা সানন্দে গ্রহণ করে। ভারতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা অবশ্য বরাবরই এই সংস্কারের পক্ষে ছিলেন, এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসানের পর, ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশন সেই মেট্রিক-পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে আজ কল্যাণকর একটা পরিবর্তন এসেছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় এই সংস্কার-সাধনের হয়েছে আরও একটা সুবিধা।

মেট্রিক-পদ্ধতির প্রাথমিক একক হ'লো 'মিটার'। পরস্পর-সংবদ্ধ এই প্রণালীতে দৈর্ঘ্য, তল, আয়তন, ধারণক্ষমতা বা পরিমাণের ক্ষেত্রে যেসব একক (বা ইউনিট) ব্যবহৃত হয়, সব সময়েই তার একটার সঙ্গে আর একটার দশমিক সম্পর্ক থাকবেই। একে তাই দশমিক-পদ্ধতিও বলা চলে। 'মিটার'-এর মান নির্ধারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে। 'মিটার'-এর সেই সঠিক মাপটা হচ্ছে প্লাটিনাম-ইরিডিয়ম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী একটা কাঠি, তার গায়ে 'মিটার'-এর দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা আছে। এই মাপকাঠিই সার্বজনীন মাপের আদর্শ এবং বিশেষ ধাতুতে তৈরী বলে আবহাওয়া দ্বারা এর কোনো পরিবর্তন হয় না। এই মাপকাঠিটি সংরক্ষিত আছে ফরাসী দেশের সেভ্রস্-এ অবস্থিত 'আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা'-য়। 'মিটার'-কে ক্রমিক হিসাবে দশ দিয়ে গুণ বা ভাগ ক'রেই তৈরি করা হয়েছে সামগ্রিক মেট্রিক-পদ্ধতি। এই পদ্ধতির গুণিতকগুলি হ'লো গ্রীকভাষার 'ডেকা' (দশগুণ), 'হেক্টো' (একশ' গুণ) এবং 'কিলো' (হাজার গুণ)। আর, ভগ্নাংশের এককগুলি ল্যাটিন 'ডেসি' (দশভাগের

মেট্রিক-পদ্ধতির স্বরূপ

একভাগ), 'সেন্টি' (একশ'ভাগের একভাগ) এবং 'মিলি' (হাজারভাগের একভাগ) নামে পরিচিত। অর্থাৎ, আমরা একদিকে যেমন পাই মিটার, ডেকামিটার, হেকটো-মিটার ও কিলোমিটার, অন্যদিকে তেমনি পাই মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার ও মিটার। মেট্রিক-পদ্ধতিতে গুণিতক ও ভগ্নাংশের জন্য এই ছয়টি শব্দ ছাড়া মূল একক ব্যবহৃত হয় 'মিটার' (দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে), 'লিটার' বা কিউবিক ডেসিমিটার (ধারণক্ষমতা বা ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে), 'কিউবিক মিটার' (পরিমাণের ক্ষেত্রে) 'গ্রাম' (ওজনের ক্ষেত্রে) 'স্কয়ার মিটার' (আয়তনের ক্ষেত্রে) এবং 'হেক্টেয়ার' বা 'স্কয়ার হেক্টো-মিটার (জমি-জরিপের ক্ষেত্রে)।

মিটারের ইতিকথা ও মেট্রিক-পদ্ধতির প্রবর্তন

মেট্রিক-পদ্ধতির উদ্ভব হয় ফরাসী দেশে, ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। পৃথিবীর দ্রাঘিমার যে পরিধি, তার এক-চতুর্থাংশের এককোটি ভাগের একভাগকে সে-সময় ওদেশে বলা হ'ত 'মিটার'। মেট্রিক-পদ্ধতিতে সেই 'মিটার'-ই হয় দৈর্ঘ্য-মাপের প্রাথমিক একক। সেই এককের মাপকাঠিই সর্বপ্রথম তৈরি করা হয় প্লাটিনাম-ইরিডিয়ম ধাতুর মিশ্রণে, ১৭৯৯-সালে। দৈর্ঘ্যের এককের এই মান-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও পরিমাণের এককও নির্ধারিত হয়। স্থির হয় যে, ওজন, পরিমাণ ও দৈর্ঘ্যের এককের মধ্যেকার সম্বন্ধ হবে অপরিবর্তনীয় এবং সুনির্দিষ্ট এক মিটারের এক-দশমাংশ লম্বা, চওড়া ও গভীর ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা ধরে, সেইটাই স্থির হয় ধারণক্ষমতার একক-মান—'লিটার'। ঐ ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা জল ধরে, তার সঠিক ওজনের নাম হ'লো 'কিলোগ্রাম,—সেইটাই হ'লো ওজনের একক-মান। কিলোগ্রামের যে আদর্শ-নমুনা তৈরি হ'লো, সেটা হচ্ছে প্লাটিনামের একটা নল—যার ব্যাস ৩৯ মিলিমিটার এবং উচ্চতাও ৩৯ মিলিমিটার। এই মেট্রিক-পদ্ধতি ১৭৯৯ সালে প্রবর্তিত হ'লেও, বিধিবদ্ধ প্রথা হিসাবে এর প্রচলন হয় ১৮৪০-সাল থেকে।

মেট্রিক-পদ্ধতির সুবিধা

সারা দেশের জন্য, এবং সমগ্র পৃথিবীরই জন্য, ওজন ও মাপের একটা সার্বজনীন পদ্ধতির প্রয়োজন এমনই অপরিহার্য যে, এ-বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট যে, ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে দশমিকের প্রবর্তন শুধু সুবিধাজনকই নয়, সুসংবদ্ধ ও প্রগতিশীলও বটে। প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির দুর্বলতা এই যে, এককগুলির মধ্যে কোনো সরল ও সমান আনুপাতিক সম্পর্ক নেই। 'মণ'-এর সঙ্গে 'সের'-এর যে আনুপাতিক সম্পর্ক, 'সের'-এর সঙ্গে 'ছটাক'-এর সে আনুপাতিক সম্পর্ক নয়। সম্পর্কের এই গরমিলের জন্যই ছড়ার মারফতে ছেলে-মেয়েদের ওজন-মাপের অঙ্কতালিকা মুখস্থ করানোর রেওয়াজ ছিল। শুধু ভারতে কেন প্রগতিশীল ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও এমন সব একক ব্যবহার করা হয় যাদের মধ্যে জটিল আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ষোল আউন্সে এক পাউণ্ড, আঠাশ পাউণ্ডে এক কোয়ার্টার, কিংবা বার ইঞ্চিতে একফুট, তিনফুটে একগজ, আর সতেরশ ষাট গজে এক মাইল। যদি প্রশ্ন করা হয় ষোল পাউণ্ডে এককোয়ার্টার, কিংবা তিনইঞ্চিতে

একফুট হ'লো না কেন, তার সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। এতকাল আমরা যে প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে রেখেছিলাম তার কারণ আর কিছুই নয়,—পুরাতনের প্রতি মোহ এবং নতুনের প্রতি অহেতুক একটা আতঙ্ক। অবশ্য আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। তা হ'লো—নতুন মাপ ও ওজনের প্রবর্তনের সঙ্গে সাময়িক যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি হবে সেগুলি জনসাধারণ মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে একটা সন্দেহ। কিন্তু দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাময়িক ছোট ছোট অসুবিধাগুলিকে আমাদের উপেক্ষা করতেই হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোক আউন্স-পাউণ্ড-হন্দর-টন প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, কাজেই অন্তত ওজনের ক্ষেত্রে সারা ভারতে সেই ইংলণ্ডীয় প্রথা বজায় রাখলে ক্ষতি ছিল কী? এ-কথা ঠিক যে, ওজনের ব্যাপারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওজন ও মাপের দশমিক-প্রথার মধ্যে যে আনুপাতিক সুবিধা আছে তা আমরা পেতাম না। তাছাড়া, দশমিক-মুদ্রাব্যবস্থাকে যখন আমরা সুবিধাজনক ব'লেই সানন্দে গ্রহণ করেছি, তখন দশমিকের উপর প্রতিষ্ঠিত মেট্রিক-পদ্ধতিকেও গ্রহণ করতেই বা কুণ্ঠিত হব কেন? দশমিক-মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশ ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য, মেট্রিক-পদ্ধতি তো আজ প্রায় অপরিহার্য-ই হয়ে পড়েছে। মেট্রিক-পদ্ধতির সুবিধার কথা সংক্ষেপে হ'লো এই যে, প্রাচীন-পদ্ধতিতে যে সুসঙ্গত অনুপাতের অভাব ছিল, সে অভাব এই পদ্ধতির মাধ্যমে দূর হয়েছে। এগুলিকে ছোট থেকে বড হিসাবে সাজালে যেমন দ্বিতীয়টি প্রথমটির দশগুণ, তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির দশগুণ হবে, তেমনি বড থেকে ছোট হিসাবে সাজালে দ্বিতীয়টি হবে প্রথমটির দশভাগের একভাগ এবং তৃতীয়টি হবে দ্বিতীয়টির দশ ভাগের একভাগ। এ-নিয়ম যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সুবিধাজনক হবে, তেমনি হবে বড়দের কাছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রথায় ওজন ও মাপের হিসাবনিকাশ করতে পারবে অতি সহজে। নয়া পয়সা এবং ওজন ও মাপের পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে একটা সরল সম্পর্ক না থাকায় কেনাবেচার ব্যাপারে বহু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তাই, ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে যদি সমগ্রভাবে দশমিক-প্রথা প্রবর্তিত হয় তাহ'লে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই হিসাবের জটিলতা থেকে মুক্তি পাবে। তাছাড়া বর্তমান জগতে কোনো দেশই বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক না রেখে পারে না; এই বাণিজ্যিক সম্পর্কে মেট্রিক পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক মাধ্যম।

মেট্রিক-পদ্ধতির প্রচলন যে বিরাট একটি সংস্কারকার্য তাতে সন্দেহ নেই। এই পদ্ধতিকে সমস্যা-জর্জরিত বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীর অঙ্গীভূত করতে হ'লে বহু জটিল-সমস্যারও সম্মুখীন হ'তে হবে। যেমন ওজন ও মাপের বিভিন্ন এককের নতুন বাটখারা ও মাপকাঠি ব্যাপকভাবে তৈরি করতে হবে এবং বাজারে প্রচলিত পুরানো বাটখারা ও মাপকাঠির বদলে সেগুলিকে ছাড়তে হবে একে একে। তাছাড়া, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যাতে এইসব ওজন ও মাপের সঙ্গে পরিচিত

হয়, বাটখারা মাপকাঠি প্রভৃতি ঠিকঠাক চিনতে শেখে, সেজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক প্রচারকাজ চালানো। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'লো, ভারতের নিভৃততম পল্লী-অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওজন ও মাপের মানদণ্ড সরবরাহ করা এবং ওজন ও মাপের ব্যাপারে যাতে না কাউকে ঠকাতে পারে সেজন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থা করা। এইসব কারণে যে বিলম্ব হবে তা পরিহার করা বোধ করি সম্ভবও নয়। সে-কথা স্মরণে রেখেই ভারত-সরকার সর্বপ্রথমে সরকারী-সংস্থায় মেট্রিক-পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন এবং অবস্থানুসারে ক্রমশ বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই প্রথা বলবৎ করা হবে ব'লে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রচলিত ওজন ও মাপের সঙ্গে নতুন ওজন-মাপের সঙ্গতি কতটুকু তা বোঝাবার জন্য রূপান্তর-তালিকা প্রস্তুত ক'রে সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থাও করেছেন ভারত-সরকার। তবে সবক্ষেত্রে যখন নতুন পদ্ধতি প্রচলিত হবে, তখন আর এই রূপান্তর-তালিকার কোনো প্রয়োজন ই হবে না, একমাত্র জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা ছাড়া। কারণ, সে-সময় মাইল-ই যখন আর থাকবে না তখন একমাইল যে ১·৬১ কিলোমিটারের সমান সে-কথা জেনে একজন সাধারণ লোক আর কী করবে? সে যদি মাইল, গজ, ফুট ভুলে গিয়ে মিটারের বিভিন্ন একককেই মনে রাখে, তাহ'লেই তার সুবিধা হবে বেশি। সমস্যা যে-সব আছে সেগুলির সমাধান করা আদৌ কষ্টকর হবে না, যদি সর্বস্তরের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে থাকে পারস্পরিক সহযোগিতা। একথা আমাদের আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মেট্রিক-পদ্ধতিই হ'লো হিসাব-নিকাশ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার সর্বোত্তম উপায়। কাজেই, দেশের শিল্পকারখানার মালিক, ধনিক, বণিক ও সর্বসাধারণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি এই দশমিক-পদ্ধতির প্রচলন করেন ততই মঙ্গল প্রগতিশীল এই দেশের পক্ষে।

মেট্রিক-পদ্ধতি প্রচলনের সমস্যা—উপসংহার

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা

বহু ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করেছে যেমন ক'রেই হোক তাকে সেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে। কারণ, পরাধীনতা একটা জাতির ভাগ্যে যে অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেয় তার কবল থেকে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষের মনুষ্যত্ব যায় হারিয়ে, পরের হাতের পুতুল হয়ে কোনোরকমে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় বাস ক'রে ভারতবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সেই অভিশাপের তীব্রতা কত গভীর ও বেদনাদায়ক। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাই আজ সমগ্র ভারতের

ভূমিকা—পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার উদ্ভব

অধিবাসী দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প। কারণ, দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রধান সহায়ক। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শক্তি যেদিন এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যায় সেদিন কোন্ ভারতবর্ষকে আমরা চোখের সামনে দেখি? প্রাচ্য-ভূখণ্ডের সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যশালী দেশ এই ভারতবর্ষ সেদিন অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণায় কাতর, খাদ্যাভাবে ও বেকার-সমস্যায় জর্জরিত, শিল্প-বাণিজ্যে পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলির তুলনায় কত-না অনগ্রসর। অথচ, ভারতে লোকবলের কোনো অভাব নেই, তার মৃত্তিকার অন্তরে বাহিরে সঞ্চিত রয়েছে কত-না অতুল সম্পদ। দেশের এই লোকবলকে যদি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা যায় এবং প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে যদি জাতীয়-আয় বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে সমৃদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যেই পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার অবতারণা। ১৯৫০-সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে 'পরিকল্পনা-কমিশন' গঠিত হয়, সেই কমিশনই পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কর্মসূচি রচনা করেন; এবং ১৯৫১-সালের এপ্রিল-মাস থেকে সেই কর্মসূচি অনুসারে সমগ্র ভারতে শুরু হয় নবভারত গঠনের বিরাট্ কর্মযজ্ঞ।

স্বাধীন-ভারতে আজ পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সংগঠনমূলক কাজ চলেছে, তার সূচনা কিন্তু পরাধীন ভারতেই হয়েছিল। ১৯৩৮-সালে যখন দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র তদানীন্তন জাতীয়-কংগ্রেসের সভাপতি, সেই সময় তাঁর উদ্যোগেই, কংগ্রেসের অন্যতম অধিনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে, একটি 'জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি' গঠিত হয়। সেই সমিতি যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনা করেন তার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মহীনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, চিকিৎসা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান এবং সর্বোপরি দেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠন-ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন। কিন্তু, জাতীয়-কংগ্রেসের পক্ষে পরাধীন-ভারতে সেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ সে-সুযোগ ঘটেছে এবং জাতীয়-সরকার আজ বদ্ধপরিকর উন্নয়ন-কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে দেশকে সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে। আধুনিক বিশ্বে পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার আদর্শ স্থাপন করে বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া। রাষ্ট্রপ্রধান রাশিয়ায় যেভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সেখানকার সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রাধীন, গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সেখানে দেশবাসীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না, রাষ্ট্রের নির্দেশেই সমগ্র জাতি সরকারের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সহযোগিতা করে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কিন্তু জনগণের উপরে এইরকম কোনো বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, এখানকার সমস্ত কাজ চলে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে। তাই, পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে

পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার গুরুত্ব

দেশের সমৃদ্ধি-লাভের যদি বিলম্ব ঘটে তাহ'লে তা অস্বাভাবিক হবে না। বিলম্ব হ'লেও, দেশবাসী তার কর্মযজ্ঞ থেকে বিরত হবে না। একটি, দু'টি বা তিনটি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ না ঘটে তাহ'লে আরও কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা রচনা ক'রে তদনুসারেই দেশোন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা অনুসারে যে-কাজ শুরু হয় ১৯৫১-সালের এপ্রিল-মাসে সেই কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫৬-সালের ৩১-এ মার্চ। এই প্রথম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য স্থির হয়েছিল দু'টি—(১) জাতির জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন, এবং (২) দেশবাসীর আর্থনীতিক বৈষম্য দূর করা। প্রথম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রথম-পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় কৃষিজ-দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির উপর। কারণ, এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা মূলত কৃষির উপরেই নির্ভরশীল; এখনও এদেশের শতকরা সত্তর জন অধিবাসী কৃষিজীবী। তাছাড়া, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা চিন্তা ক'রেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য-বৃদ্ধি ও কৃষি-উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেই সূত্রেই গুরুত্ব লাভ করে বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনা ও জলবিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন-কর্মসূচি। আধুনিককালের বিজ্ঞান-সম্মত সেচ-পরিকল্পনাগুলি শুধু যে নদী ও বন্যার জলকেই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, জলবিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের ক্ষমতাও নিহিত থাকে তার মধ্যে। কাজেই, একই সঙ্গে চলে জমিতে জলসেচ, কৃষি-কাজের অনুপযোগী বা ক্ষতিকর উদ্বৃত্ত জল-নিষ্কাশন বা নিয়ন্ত্রণ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে একাধারে আলোর ব্যবস্থা করা ও শিল্প-সংস্থা কার্যকরী ক'রে তুলতে সাহায্য করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেও কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। সেই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য থাকে যাতে না দেশের মুষ্টিমেয় ধনী বা শিল্পপতির হাতে উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলি এবং আর্থিক সঙ্গতি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে পড়ে। সেইজন্যই প্রয়োজন হয় সরকার-পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রে ক্রমিক সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বিস্তার। জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ, মৃত্যুকর ও বর্ধিত হারে আয়কর প্রভৃতি আদায়-ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য-সাধনেরই সহায়ক হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন-সূচি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য মোট আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছিল ২,০৬৯ কোটি টাকা। পরে ব্যয়ের পরিমাণ যখন নানাদিকে বর্ধিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই ব্যয়-বরাদ্দের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩৮৬ কোটি টাকায়। কিন্তু, পরিকল্পনার কার্যকাল উত্তীর্ণ হ'লে দেখা যায় যে, মোট ২,০১৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে পাঁচ বছরে। ব্যয়ের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তা থেকেই জানা যায় যে, মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ টাকাই ব্যয়িত হয়েছে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শস্যোৎপাদনের জন্য। কৃষির উপরে সর্বাধিক

গুরুত্ব আরোপ করা হ'লেও, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয়নি। বিদ্যুৎ-উৎপাদন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলব্যবস্থার উন্নতি, জাহাজ ও বিমান-চলাচল, বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সংবাদ-আদান-প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, শ্রমিক ও অনুন্নতদের কল্যাণ, পুনর্বাসন, সমাজ-উন্নয়ন, পল্লী ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার, বৃহৎ শিল্প-বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদির কাজেও প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হয়। প্রথম পরিকল্পনার মাধ্যমে, পাঁচ বছরের মধ্যে, যে যে বিষয়ে উন্নতি দেখা যায় সেগুলি হ'লো এই—কৃষিজাত উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা উনিশ ভাগ, আর শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন শতকরা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি, রেল-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতিসাধন, সেচ-পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণিত করা। যে-কয়টি বৃহৎ নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থা তথা কৃষি-ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কাজে হাত দেওয়া হয়, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্জাবের ভাক্‌রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা, উড়িষ্যার হীরাকুঁদ-পরিকল্পনা এবং পঞ্জাবের হারিকে পরিকল্পনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যেই তৃতীয় সেচ-পরিকল্পনাটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। এই সময়ের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন-নির্মাণ-কারখানা ও সিন্দ্রির রাসায়নিক সার-উৎপাদন-কারখানার উৎপাদনের লক্ষ্য সাধন, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ-নির্মাণশিল্পের অগ্রগতি এবং বহির্বাণিজ্যের প্রসারও পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার সাফল্য সূচিত করে। এই পাঁচবছরে দেশের জাতীয়-আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা সাড়ে সতের ভাগ, আর প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ঘটেছে। তাছাড়া, ডাক ও তার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি তথা নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস, ম্যালেরিয়া-উচ্ছেদ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরকম নানাবিধ উন্নতি দেখা গেলেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার যে-সব ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে তা হ'লো—বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ-বরাদ্দ সব ক্ষেত্রে আশানুরূপভাবে ব্যয় করা হয়নি, প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল, চিনি, স্নেহপদার্থ প্রভৃতির উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে তেমন জোর দেওয়া হয়নি, এবং উন্নত জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান যে কিছুটা উন্নত হয়েছে এবং আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের কাজও যে আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষভাবে দেশের চিরন্তন দারিদ্র্য হয়তো এখনও ঘোচেনি, কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই সমস্যার কিছুটা যে সমাধান হয়েছে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার ব্যয়, কর্মসাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার ফলে দেশের শিথিল আর্থনীতিক-বনিয়াদ সুদৃঢ়

হওয়ায় বৃহত্তর কর্মসূচি নিয়ে ভারত-সরকার তথা বিভিন্ন রাজ্য-সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ১৯৫৬-সালের এপ্রিল মাসে। এই দ্বিতীয়-পরিকল্পনার কার্যকাল ছিল ১৯৫৬-সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬১-সালের ৩১-এ মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় যে চারটি উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা হ'লো—(১) জাতীয় আয় প্রতি বছর শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি ক'রে জীবনযাত্রার আনুপাতিক মান-উন্নয়ন ; (২) মৌলিক ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে দেশকে শিল্পায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ; (৩) ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা , এবং (৪) দেশে ধনসম্পদ ও আয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তার সংকোচসাধন ক'রে আর্থনীতিক সমতা বিধানের চেষ্টা এবং সেই পথে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় জাতীয়-আয় বৃদ্ধির জন্য যে-সুপারিশ থাকে সেইজন্য শিল্পোন্নয়নের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় সর্বাধিক। এই সঙ্গে যাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্প্রসারিত করা হয় সেজন্যও পরিকল্পনা-কমিশন বিশেষভাবে সুপারিশ করেন। দ্বিতীয়-পরিকল্পনা-সময়ের মধ্যে প্রথম-পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলি যেমন হাতে নেওয়া হয়, তেমনি বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্প তথা পল্লীশিল্পের উন্নয়নের বিবিধ কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারত-সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকার। শিল্পোন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহ দেখানো হ'লেও দ্বিতীয়-পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, বাসগৃহ-নির্মাণ, শ্রমিক ও অনুন্নত-সম্প্রদায়ের কল্যাণ, পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজকেও উপেক্ষা করা হয়নি। তাছাড়া, এই পাঁচবছরের মধ্যে কৃষিকর্মের উন্নতি, সমাজ-উন্নয়ন, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে ও সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ব্যবস্থা থাকে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা-কমিশন যে অর্থ বরাদ্দ করেন, সেই বরাদ্দের পরিমাণ প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের দ্বিগুণেরও অধিক। সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ধার্য হয় ৪,৮০০ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যয়-পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় ২,৪০০ কোটি টাকার মতো। প্রথম দিকে বাজেটে যে ঘাটতির আশ্রয় নেওয়া হয় সেজন্য অনেকেই এই পরিকল্পনার সমালোচনা ক'রে বলেন যে, এইরূপ ঘাটতি অর্থব্যয়ের ঝুঁকি নিলে দেশে অর্থস্ফীতির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া বৃহৎ-শিল্পের প্রসারের ফলে পল্লীসমাজেও আর্থনীতিক সংকট দেখা দিতে পারে ব'লেও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল এ-আশঙ্কা সত্য নয়। দ্বিতীয়-পরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়নসূচি যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা সংগঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে সে-সত্য আজ আমরা যেন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছি। প্রথম-পরিকল্পনার আমলে জাতীয়-

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার ব্যয়, কর্মসাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি

আয় শতকরা এগার ভাগ বৃদ্ধির সংকল্প গ্রহণ করা হ'লেও, কার্যত সেই জাতীয়-আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় আঠার ভাগ। এই প্রসঙ্গে লোকসভার অন্যতম সদস্য শ্রী জি. ভি. সোমানীর এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, গত দশবছরে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয়-আয় শতকরা প্রায় বিয়াল্লিশ ভাগ বেড়েছে এবং মাথাপিছু সেই আয়-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা প্রায় ষোলভাগ। অবশ্য, ব্যয়ও বেড়েছে এই সময়ের মধ্যে; মাথাপিছু ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা প্রায় ষোলভাগ। অর্থাৎ, মাথাপিছু এদেশের লোকের আথিক লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় চারভাগ। সমগ্র দেশের বৈষম্যমূলক ধনবণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই সামান্য লাভ অনেকখানি। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় মৌলিক ও ভারী শিল্পের প্রসারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করায়, দ্বিতীয়-পরিকল্পনাকালের মধ্যেই তিনটি বৃহৎ ইস্পাত-শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়েছে তিনটি রাজ্যে—অর্থাৎ, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, উড়িষ্যার রাউরকেল্লা ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। এর ফলে ভারতীয় ইস্পাতশিল্প যেমন সম্প্রসারিত হ'তে পেরেছে, তেমনি কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে অসংখ্য লোকের। অন্যান্য খনিজ-শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রেও বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন ভারত-সরকার। দুইটি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে এ-পর্যন্ত যে-উন্নতি দেখা গেছে নিঃসন্দেহে তা উৎসাহ-ব্যঞ্জক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে এখনও আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। যেমন কৃষিজ-সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপরিহার্য রাসায়নিক সারের উৎপাদন-ঘাটতি এখনও দূর হয়নি। সিন্দ্রির সার-উৎপাদন কারখানায় যে-পরিমাণ রাসায়নিক সার এখন উৎপাদিত হয় তাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। রাজস্থান ও অন্ধ্রে যে দু'টি সার-উৎপাদন-কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালের মধ্যে তা কার্যকরী করা যায়নি। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও উৎপাদনের পরিমাণ এ-পর্যন্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। তাছাড়া, প্রশাসনিক-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে এবং কর্মীদের গাফিলতিতে অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক ক্ষতি ও ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু পরিকল্পনার ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে, এই ক্ষতি ও ব্যর্থতা তুচ্ছ। ক্ষতি ও ব্যর্থতার দিকটাকেই শুধু বড় ক'রে দেখলে চলবে না, সেই সঙ্গে লাভ ও সাফল্যের কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

স্বাধীন-ভারতে আজ যে সংগঠনমূলক কাজ চলেছে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে তার দিকে। আমরা কিভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাফল্য অর্জন করছি সকলেই আজ যেন তা সাগ্রহে লক্ষ্য করছে।

উপসংহার

আমাদের সংগঠনমূলক কাজকে সফল ক'রে তুলতে পৃথিবীর উন্নতিশীল বহু রাষ্ট্রই আমাদের সাহায্য করছে ঋণ দিয়ে, বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে ও যন্ত্রপাতি দিয়ে। কাজেই, ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাঁদেরও আনন্দলাভের যথেষ্ট

কারণ আছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে ধনতান্ত্রিক-রাষ্ট্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র যেমন আগ্রহশীল, কমিউনিস্ট-রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়াও তেমনি। ভারতও চায় মতবাদ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে তার মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় রাখতে। ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনার কতকগুলি নীতিগত বাধা-বাধকতা আছে। জনগণের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার উপরই প্রধানত নির্ভর করে এর সার্থকতা। কারণ, স্বৈরতন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধান দেশে যেখানে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা সেখানকার উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত, সেখানকার শাসকগোষ্ঠী তাঁদের ইচ্ছানুসারে যেমন আয়, সঞ্চয় ও লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে দিতে পারেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। ফলে, এদেশে পরিকল্পনার সাফল্য নাটকীয়রূপে দেখা দেয় না, সে-সাফল্য যেন আসে বিলম্বিত হয়ে। আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জনগণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা, সব কাজে তাদের পরিকল্পনা-সচেতন করা, প্রশাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজের দ্রুততা ও নিপুণতা। উন্নয়ন-মূলক কাজের মধ্যে রাজনীতিক কোনো মতবাদের প্রভাব পড়াও বাঞ্ছনীয় নয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা

১৯৬০-সালের ৫ই জুলাই ভারতের পরিকল্পনা-কমিশন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার যে খসড়া রূপরেখা প্রকাশ করেছেন তার অন্যতম প্রধান আদর্শ হ'লো স্বনির্ভরশীল উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া। স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের অর্থ আর কিছু নয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া যাতে উচ্চহারে আয় বৃদ্ধি পায়। দেশের পক্ষে এটা একটা সমস্যা। এই সমস্যার একটি প্রধান দিক হ'লো এই যে, প্রস্তাবিত অর্থ-বিনিয়োগের হারে উপযুক্ত মূলধনী মাল ও সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় বিনিয়োগের গতিধারা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমেই স্বনির্ভরশীল উন্নতি সম্ভবপর। একদিকে যেমন শিল্পায়ন ভিন্ন আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পেতে পারে না, অন্যদিকে তেমনি কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপক উন্নয়ন ভিন্ন শিল্প-বিপ্লবও সম্ভব নয়। এই কারণেই তৃতীয়-পরিকল্পনায় মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন-বৃদ্ধিরও সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া, তৃতীয়-পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন পরিকল্পনা-কমিশন। কারণ, উৎপাদন-বৃদ্ধিতে লোক-

ভূমিকা—
তৃতীয়-পরিকল্পনার লক্ষ্য

বলের ব্যবহার যেমন অপরিহার্য, তেমনি কর্মসংস্থানের প্রসারেই দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনায় যে-খসড়া রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, তৃতীয়-পরিকল্পনাকালে (অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল এই পাঁচ বৎসরে) জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ১০,২০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬,২০০ কোটি টাকা, আর ৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বে-সরকারী উদ্যোগে। তবে, আরও ১,০০০ কোটি টাকা সরকারী উদ্যোগে ব্যয়িত হ'তে পারে। তৃতীয়-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে জাতীয়-আয় প্রতিবছর শতকরা পাঁচ ভাগ অর্থাৎ পাঁচবছরে শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনার রূপরেখা

খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য হবে দশ কোটি থেকে ১০.৫ কোটি টন। সেই সঙ্গে, ইস্পাত-উৎপাদনের ও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের লক্ষ্য হবে যথাক্রমে এককোটি টন ও এককোটি আঠার লক্ষ কিলোওয়াট। বেকার-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ক'রে দেওয়া সম্পর্কেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে খসড়া-পরিকল্পনায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'লো দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে সমষ্টি-উন্নয়ন ও সমবায়-আন্দোলনের সম্প্রসারণ। তাছাড়া ছয় থেকে এগার বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, দেশের সকল পল্লী-অঞ্চলের ন্যূনতম সুখ-সুবিধার প্রচলন, যেমন—পানীয় জল-সরবরাহ, নিকটবর্তী প্রধান সড়ক বা রেল-স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ-সাধনকারী রাস্তানির্মাণ, বিদ্যালয়-ভবন ও পল্লী-গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতি কার্যসূচিও গ্রহণ করা হবে।

দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা রচিত হয়েছে। প্রথমত, একে ভিত্তি ক'রে সংসদ, বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা এবং সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ তৃতীয়-পরিকল্পনার আদর্শ ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। তাছাড়া উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য সাধন করতে হবে এবং তার জন্য আগামী কয়েক বৎসরে কী পরিমাণ জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, খসড়া রূপরেখায় তার আভাস পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, এই খসড়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলি এবং বিভিন্ন রাজ্য-সরকার চূড়ান্ত পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব আরও বিস্তৃতভাবে রচনার সুযোগ পাবেন। ১৯৬১-সালের প্রথম দিকেই ভারতীয় সংসদে তৃতীয়-পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে রচনা ক'রে পেশ করা হয় এবং সংসদ কর্তৃক যেভাবে তা গৃহীত হয় সেই অনুসারেই তার রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস থেকে।

পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখার প্রধান দু'টি উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় ১৯৫১-৫২ সালে। আর, ১৯৬০-৬১ সালে শেষ হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কাজ। এই দশ বছরে

ভারত দু'টি পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির বিভিন্নমুখী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনগণের শক্তি নিযুক্ত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছে। প্রথম থেকে এই কথা বলা হয়েছে যে, সুপরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উন্নত জীবনধারণের মান অর্জন করা নয়, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এমন এক সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাও গ'ড়ে তোলা—যেখানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ন্যায়বিচার থাকবে। এই আদর্শ নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের যে-ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ ক'রে এবং সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নির্দেশক নীতি অনুসারে আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য মূল সামাজিক ও বৈষয়িক নীতি নির্দিষ্ট ক'রে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই পরিকল্পনায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে সমষ্টি-উন্নয়ন আন্দোলন ও ভূমিস্বত্ব সংস্কারের কর্মসূচি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিকল্পনার এই লক্ষ্যের উন্নতি সাধন ক'রে দ্বিতীয়-পরিকল্পনায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন, অর্থ-বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এই পরিকল্পনায় একদিকে যেমন মৌলিক ও ভারী শিল্প স্থাপন ক'রে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, অন্যদিকে তেমনি আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ক'রে এবং আর্থনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা প্রতিরোধ ক'রে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রথম-পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৎসরে শতকরা ৩'৫ ভাগ হিসাবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৎসরে শতকরা ৪ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লে শুধু সরকারী বিবরণেই স্বীকৃত হয়নি, দেশবাসীও আজ তা উপলব্ধি ক'রতে পারছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্য

এখন তৃতীয়-পরিকল্পনায় সেই জাতীয় আয় বৎসরে যাতে শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তদনুসারেই পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছে। তৃতীয়-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে—(১) আগামী পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক শতকরা ৪ ভাগ হারে জাতীয় আয়-বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ-ব্যবস্থা এমনভাবে করা হবে যাতে পরবর্তী পরিকল্পনা-কালেও এই বৃদ্ধির হার অক্ষুণ্ণ থাকে; (২) খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং কৃষির উৎপাদন, শিল্প ও রপ্তানির চাহিদা-পূরণের মতো বৃদ্ধি করা, (৩) ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণের মতো মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ করা, যাতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশের নিজস্ব সম্পদের উপরে নির্ভর ক'রেই অধিকতর শিল্পায়নের চাহিদা মেটানো যেতে পারে; (৪) দেশের লোকবল যতদূর সম্ভব কার্যে নিযুক্ত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করা; (৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা এবং আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টন।

তৃতীয়-পরিকল্পনার প্রধান পাঁচটি লক্ষ্য

আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যই হ'লো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে (অর্থাৎ

Socialistic Pattern-এ) এমন সমাজ গঠন করা যেখানে সকল নাগরিকের বিচিত্র ও সমৃদ্ধিশালী জীবনে এবং তাদের নিজ নিজ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে পূর্ণ সুযোগ থাকবে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'—এই কথার অর্থ এই যে, সামাজিক নীতি নির্ধারণ ও আর্থনীতিক উন্নয়নে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধন, ব্যক্তিবিশেষের বা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থসাধন নয়। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলিকে এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যাতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের আয় ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে হ্রাস পায় ধনিকশ্রেণীর সম্পদ ও সুযোগ সুবিধাসমূহ। পরিকল্পনার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হ'লে সমগ্র ভারতীয় সমাজের যে বিশেষ রূপান্তর ঘটে তাতে সন্দেহ নাই।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠন

ভারতবর্ষের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে জনসংখ্যার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৫৮ কোটির মতো দাঁড়াবে। যে অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয় ও পণ্য ব্যবহারের মান খুবই নিচু, সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি হ'লে আর্থনীতিক উন্নয়নের গতি স্বভাবতই হ্রাস পায়। এইজন্যই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিকেই আবার অগ্রাধিকার দেওয়া হ'য়েছে। বস্তুত, তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'লো খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং শিল্প ও রপ্তানির চাহিদা মেটাবার মতো কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করা। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে ১,০২৫ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয়েছে। বে-সরকারী উদ্যোগেও প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে। তাছাড়া, বড় ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার জন্যও ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। পরিকল্পনা অনুসারে এই অর্থ যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়, তাহ'লেই আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। এদেশের কৃষকেরা প্রায়ই এই অভিযোগ করে যে তারা তাদের প্রয়োজনের সময় দরকারী জিনিসপত্র পায় না। সেজন্য সরকারী কৃষিবিভাগে আরও তৎপর হওয়া উচিত; চাষ-আবাদের ব্যাপারে কৃষকেরা যাতে সবরকমের সাহায্য ও সহযোগিতা পায় সেজন্য প্রশাসনিক-ব্যবস্থাগুলিকে আরও ত্বরান্বিত করা বাঞ্ছনীয়। তা না হ'লে উন্নয়ন-পরিকল্পনা ব্যর্থ হবেই। একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, যে অধিক কৃষি-উৎপাদন সমস্যার অর্থ পল্লী-অঞ্চলে অধিক অর্থ সরবরাহ সমস্যা নয়। একথা সত্য যে, এদেশের কৃষকেরা অবশ্যই ব্যাঙ্কিং ও সমবায়-এজেন্সির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণ পাবে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতালাভে সুষ্ঠু প্রশাসন ও সংগঠন-ব্যবস্থারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সমষ্টি-উন্নয়ন-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য-ই হ'লো কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সেজন্য সরকার স্থির করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শতকরা ৮০ ভাগ সময় ও শক্তি এই লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত হবে। এই লক্ষ্যসাধনের জন্যই কৃষি, সেচ, সমষ্টি-উন্নয়ন ও পশুপালন বিভাগগুলির মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ সাধন একান্ত আবশ্যক। একই

জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির অগ্রাধিকার

জমিতে বিভিন্ন সময়ে যাতে বিভিন্ন রকমের খাদ্যশস্য উৎপাদিত হ'তে পারে সেজন্য সরকার থেকে বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কৃষকদেরও উচিত সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা। পল্লী-অঞ্চলে আমাদের এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে কৃষক ও সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে খাদ্য-উৎপাদন এবং শ্রম-শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য দৃঢ় ইচ্ছা জন্মে।

স্বাধীন-ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যই পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার আয়োজন। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সকলের সমবেত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন যে কতখানি তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ত্রুটি-বিচ্যুতি সব কাজেই হয়; কিন্তু, সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বড় ক'রে না দেখে প্রতিটি ভারতবাসী যদি আজ সম্মিলিতভাবে কাজ ক'রে যায় তা হ'লে সাধনায় একদিন সিদ্ধিলাভ হবেই।

উপসংহার

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

দেশ স্বাধীন হবার পর, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যে-সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে কৃষি-বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলবার পরিকল্পনা শুধু অন্যতমই নয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হ'লেও এতকাল ধ'রে তার কৃষি-ব্যবস্থার যেমন কোনো উন্নতি হয়নি, তেমনি অগণিত কৃষকের অবস্থারও কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ, প্রতি বৎসর এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার উপর আছে দৈবদুর্বিপাকজনিত ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পুনরাবৃত্তি। দেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের দ্বারা ক্রমবর্ধমান দেশবাসীর অন্নসংস্থান যেমন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, তেমনি বন্যা, শুষ্কতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে শস্যহানি ও শস্যঘাটতি রোধ করা বিরাট একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই, দেশের চিন্তানায়কেরা একদিকে যেমন ভেবে দেখলেন যে, শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের প্রধান সমস্যার কোনো সমাধান হবে না, অন্যদিকে তেমনি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করলেন। দেশের নদীগুলির জলধারা যেভাবে বৃথা নষ্ট হয়ে যায় তাকে যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজে লাগানো যেত তাহ'লে দেশের প্রভূত উন্নতি হ'ত। নদীতে বাঁধ দিয়ে একদিকে যেমন বন্যারোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি নদী থেকে খাল কেটে নিয়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করাও সম্ভব। এই সব কথা চিন্তা ক'রেই ভারত-সরকার পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 'ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা'-ও

ভূমিকা—নদী উপত্যকা পরিকল্পনা

সেই রকমের একটি বহুমুখী নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনা; যদিও এই পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয় পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা রচিত হবার তিন বছর আগেই।

সেচ-ব্যবস্থার জন্য বছরের সব সময় নিয়মিতভাবে জলসরবরাহ-লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৪৮-সালে হয় এই পরিকল্পনার কর্মসূচির উদ্বোধন। সুখের কথা এই যে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আন্তরিক উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এই পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মশানজোড় নামক এক পার্বত্যভূমির সংকীর্ণ প্রবেশপথে ভীম-গর্জনে প্রবাহিত ময়ূরাক্ষী নদীর জলধারা আজ নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত। তারই ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তভূমি আজ উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল-উৎস যদিও বিহারে অবস্থিত, তথাপি এর দ্বারা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-জেলা, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড উপকৃত হবে ব'লে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের অংশবিশেষ এর দ্বারা উপকৃত হবে ব'লে পরিকল্পনাটিকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য বিহার-সরকারও নানাভাবে সহযোগিতা করেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সঙ্গে।

পরিকল্পনার উদ্বোধন ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ

বৃষ্টিধারাপুষ্ট এই পার্বত্য-স্রোতস্বিনী ময়ূরাক্ষীর উৎসমুখটি রয়েছে বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল-পরগনার মালভূমিতে। তারপর বক্রগতিতে অসমতল প্রস্তরাকীর্ণ এবং প্রাকৃতিক শোভাবিমণ্ডিত অঞ্চলের বুক বেয়ে ময়ূরাক্ষীর জলধারা নেমে এসেছে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সমতলভূমিতে এবং সেখানে ১৫৪ মাইল গতিরেখায় আপন অস্তিত্ব চিহ্নিত ক'রে ময়ূরাক্ষী নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে দত্তবাটীর কাছে ভাগীরথীতে। মশানজোড়ের উত্তরাঞ্চলে ৭১৮ বর্গমাইল স্থান এই ময়ূরাক্ষীর জলধারাসিঞ্চিত। বর্ষাকালে এই নদীর সর্বোচ্চ স্রোতগতি ছিল তিনলক্ষ কিউসেক। কিন্তু, বর্ষার পর জলপ্রবাহ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে পড়ত এবং ক্রমশ নদীটি যেত বিশুষ্ক হয়ে। ময়ূরাক্ষীর জলকে তাই এক বন্ধনবেষ্টনীর সাহায্যে আবদ্ধ ক'রে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্যেই মশানজোড়ে নির্মিত হয় সুবৃহৎ একটি জলাধার-বাঁধ। কলম্বো-পরিকল্পনার কর্মসূচি অনুসারে কানাডা-সরকার এই বাঁধ-নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করেন। সেই সাহায্যের কথা স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য মশানজোড়ের এই জলাধার-বাঁধের নামকরণ করা হয়—'কানাডা বাঁধ'। বীরভূম-জেলার সদর-শহর সিউড়ি থেকে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই বাঁধটি নির্মিত হয়েছে। কংক্রীটের তৈরী এই কানাডা-বাঁধের উচ্চতা হ'লো ১২৩ ফুট এবং সবচেয়ে গভীর জায়গায় অর্থাৎ মূলভিত্তি থেকে এর উচ্চতা ১৫৫ ফুট। আর, ২,১৭০ ফুট হ'লো এর দৈর্ঘ্য। এই বাঁধের সাহায্যে

পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ একটি জলাধার বাঁধ

খাদের দুই পাশের পাহাড় দু'টি হয়েছে সংযুক্ত এবং ২৭ বর্গমাইল জায়গা এক মনোরম বিস্তীর্ণ জলাধারে বা হ্রদে পরিণত হয়েছে। এই কৃত্রিম হ্রদের চারদিকে রয়েছে হরিণ, ভালুক ও বুনো পাখির আড্ডা,—সেই সঙ্গে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী আর সুগভীর বনভূমি। এই জলাধার-বাঁধটিই হ'লো ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ। এই বাঁধের রেডিয়েল-গেটগুলি দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বন্যার উদ্বৃত্ত জলরাশি, আর তিনটি উচ্চমাত্রা ও তিনটি নিম্ন-মাত্রায় স্লুইস্-গেটের সাহায্যে জলাধার থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেচকাজের জন্য। বাঁধের উপরে তৈরি করা হয়েছে যাতায়াতের উপযোগী প্রশস্ত একটি কংক্রীটের সেতু।

এই সেচ-পরিকল্পনার মূল-বাঁধটি নির্মিত হয়েছে সিউড়ি শহর থেকে দু' মাইল দূরবর্তী তিলপাড়ায়। ১,০১৩ ফুট দীর্ঘ এই সেতুবাঁধটির নাম—'তিলপাড়া-বারাজ'। সেচের জল সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই এই বাঁধটি নির্মিত হয়। এই বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৪৮-সালে, আর শেষ হয় ১৯৫১-সালের জুন মাসে। খরচ পড়ে ১'২২ কোটি টাকা। তিলপাড়া-বারাজের জলভাণ্ডারের পরিমাপ হ'লো ১,২৩৯ বর্গমাইল, আর, জলের সর্বোচ্চ স্রোতগতি হ'লো ২৯ লক্ষ কিউসেকের উপর। বাঁধটি পনেরটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য হ'লো ষাট ফুট ক'রে। তাছাড়া খালের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে আর যে-চারটি সেতুবাঁধ বা বারাজ নির্মিত হয়েছে, সেগুলি হ'লো 'বক্রেশ্বর-বারাজ', 'কোপাই-বারাজ', 'দ্বারকা-বারাজ' ও 'ব্রাহ্মণী-বারাজ'।

পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ

ময়ূরাক্ষী-নদীর উপরে যেমন দেওয়া হয়েছে তিলপাড়া-বারাজ, সেইরকম তার মূল খালটির উপরে নির্মিত হয়েছে বক্রেশ্বর বারাজ। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য হ'লো ৩০০ ফুট এবং এর অববাহিকা-অঞ্চলের পরিমাপ হ'লো ৫৮'৮ বর্গমাইল। এই বাঁধ তৈরি করতে খরচ পড়েছে সাড়ে আট লাখ টাকার উপর। কোপাই বা কোপবতী নদীটি হ'লো বীরভূম-জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের জলনিকাশের একটি প্রধান প্রবাহ। ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণপাড়ের খালগুলিতে জলসরবরাহের জন্য যে সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে তার মধ্যে এই কোপাই-বারাজটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কোপাই-সেতুবাঁধের জলভাণ্ডারের পরিমাপ হ'লো ৮২ বর্গমাইল। এই বাঁধটি তৈরি করতে যে অর্থব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ হবে পঁচিশ লক্ষ টাকারও বেশি। দ্বারকা-সেতুবাঁধটি নির্মিত হয়েছে ময়ূরাক্ষীর উত্তর পাড়ে একটি ছোট নদী দ্বারকার উপর। তার জলভাণ্ডারের পরিমাপ হ'লো ১১৭ বর্গমাইল। দ্বারকা নদীটি ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে মোটামুটিভাবে ময়ূরাক্ষীর সমান্তরাল স্রোতেই প্রবাহিত। এই নদীর উপরকার সেতুবাঁধটি তৈরি হয়েছে প্রায় আঠাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ময়ূরাক্ষীর উত্তরভাগে প্রবহমান ব্রাহ্মণী-নদীর উপরে যে সেতুবাঁধটি দেওয়া হয়েছে সেটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে চৌত্রিশ লক্ষ টাকার মতো। ব্রাহ্মণী-সেতুবাঁধের জলভাণ্ডারের পরিমাপ হ'লো ২৫৯ বর্গমাইল। ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার অন্তর্গত 'কানাডা বা মশানজোড় জলাধার-বাঁধ' এবং উল্লিখিত চারটি বারাজ বা সেতুবাঁধ ছাড়া, আর

একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে চন্দ্রভাগার পাকা জলনালীটি তৈরি ক'রে। ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণতীর থেকে কেটে বার করা প্রধান খালটি যেখানে চন্দ্রভাগা নদীকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে সেইখানেই নির্মিত হয়েছে এই পাকা-জলনালীটি (অ্যাকুইডাক্ট)। বাইশ ফুট চওড়া একটি রাজপথ-সেতুও নির্মিত হয়েছে এর উপরে। ফলে, এই জলনালীটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা। সামগ্রিক-ভাবে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার জন্য যে-টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার পরিমাণ ষোল কোটি টাকার কিছু বেশি।

বিবিধ উদ্দেশ্যসাধক: পরিকল্পনা : বিদ্যুৎ-সঞ্চারী-কেন্দ্র

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনাটিকে একটি বিবিধ-উদ্দেশ্যসাধক পরিকল্পনা ব'লেই অভিহিত করা যায়। কারণ, এই পরিকল্পনার দ্বারা শুধু যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে তা নয়, বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থাও হয়েছে। মশানজোড়ের মূল জলাধার-বাঁধেই নির্মিত হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ-সঞ্চারী কেন্দ্র। চারহাজার কিলোওআট বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনক্ষমতাবিশিষ্ট এই কেন্দ্র থেকে আপাতত দু'হাজার কিলোওআট বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং পরে প্রয়োজন অনুসারে এই সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এই বিদ্যুৎশক্তি প্রধানত গ্রাম ও শহরের বৈদ্যুতিকরণ, সেচকাজ ও শিল্প-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হচ্ছে। ১৯৫২-৫৩ সালের মধ্যে কানাডা থেকে গম আমদানির জন্য যে-অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল, এই বিদ্যুৎসঞ্চারী-কেন্দ্রের জন্য কানাডা-সরকার তা পৃথক ক'রে রাখেন এবং সেই অর্থ দিয়েই পরে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনা হয়।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার কার্যকরী হওয়ার ফলে সেচের যে-সব সুবিধা পাওয়া গেছে কৃষির উন্নতিতে তাই হ'লো প্রধান লাভ। তিলপাড়া-বারাজের দুই পাশের দু'টি মূল খাল দিয়ে প্রথম জলধারা প্রবাহিত হয় ১৯৫১-সালের জুলাই মাসে। এতে ক'রে এখন খারিপ-মরসুমে বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের ৬ লক্ষ একর জমিতে রবি-ফসলের মরসুমে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে জলসেচন করা যায়। আর এর ফলে অতিরিক্ত যে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে টাকার অঙ্কে তার মূল্য হবে প্রায় সওয়া আটকোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের এই উপকার ছাড়া,

সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে অতিরিক্ত ফলন—উপসংহার

কানাডা-বাঁধ বিহারের অংশ-বিশেষকেও উপকৃত করছে। কানাডা-বাঁধের একটি খালের সাহায্যে বিহারের সাঁওতাল পরগনায় খারিপ-মরসুমে কুড়ি হাজার একর এবং রবি ফসলের মরসুমে পাঁচ হাজার একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার মূল খাল ও তার শাখাগুলির মোট দৈর্ঘ্য হ'লো ২৪৪ মাইল এবং প্রশাখাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৯০ মাইল। এই পরিকল্পনার সেচ-ব্যবস্থায় ও জমিতে ভালো সার দেবার ফলে দেখা গেছে যে, প্রতি একরে এখন অতিরিক্ত প্রায় ১৪ মণ বেশী ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এ থেকেই ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা

দামোদর-নদ বিহারের পালামৌ পর্বত থেকে উৎসারিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব পথে ১৮০ মাইল প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবাংলার সমতলভূমিতে এসে প্রবেশ করেছে। তারপর, কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে হুগলি নদীতে গিয়ে মিশেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলার নরনারী দেখে এসেছে এর রুদ্রমূর্তি, বর্ষার জলে উচ্ছ্বসিত দামোদরের বুকে যখন ভয়াবহ প্লাবন জেগেছে শঙ্কাকুল নরনারী তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে ঈশ্বরের কাছে। একে পার্বত্য নদী তার উপরে বালির আনাগোনা বেশি; দামোদরের গভীরতা তাই কম। বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হ'লেই দামোদরে বান ডাকে, উত্তাল তরঙ্গমালায় দুই কূল প্লাবিত হয়ে জমি ডুবে যায়, ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়, ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ে, দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা থাকে না। সরকারী নথিপত্রে যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকেই জানা যায় যে, ১৭৩০ সাল থেকে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে বিভিন্ন আয়তনের বন্যা হয়েছে দামোদরে। তার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে সাংঘাতিক বন্যা হয়েছিল ১৯৪৩-সালে। সেই বন্যায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বহু জায়গা ভেঙে যায়, বড় বড় রেলপুল ভেসে যায় স্রোতের মুখে, ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়ার পথ যায় বন্ধ হয়ে। বিশেষত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সংকট সময়ে দেশরক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

ভূমিকা—দামোদরের পরিচয় ও বন্যা

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে দামোদরে বন্যার প্রতিরোধের প্রথম চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে পরবর্তী দু'শ বছরের মধ্যে অনেক চেষ্টা করা হ'লেও কোন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হবার পর, দামোদরের উন্মত্ত জলধারাকে সংযত ক'রে দেশের ও দশের কল্যাণকর কাজে লাগাবার জন্য বদ্ধপরিকর হন ভারত-সরকার। দামোদরের প্লাবন-সমস্যাটিকে চিরদিনের মত সমাধান করতে কৃতসংকল্প হয়ে ভারত-সরকার মিঃ ডব্লিউ এল্ ভুরডুইন নামে আমেরিকার এক বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারকে নিযুক্ত করেন। তিনি সমগ্র দামোদরের-উপত্যকাকে একক ধ'রে বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের এককালীন উন্নয়নের যে খসড়া-পরিকল্পনা রচনা করেন তা থেকেই দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা'-র উৎপত্তি। ভারত-সরকার মিঃ ভুরডুইনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার জন্য আমেরিকায় সুবিখ্যাত 'টেনেসী ভ্যালি অথরিটি'র কতকটা অনুকরণে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' (বা 'ডি. ভি. সি.') নামে একটি সংস্থা গঠন করেন ১৯৪৮-সালের জুলাই মাসে। সেই সংস্থা পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচিকে যেভাবে বাস্তব রূপ দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তা থেকেই সমগ্র দামোদর-উপত্যকার চিরন্তন রূপ আজ বিরাট এক পরিবর্তনের সম্মুখীন। দামোদর-উপত্যকায় আজ যেন যন্ত্রবিজ্ঞানের

পরিকল্পনার সূচনা ও মূল উদ্দেশ্য

এক মহাকাব্য রচিত হ'তে চলেছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে আর এই ধরনের কোনো বহুউদ্দেশ্যসাধক নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয়নি। যে-তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হয় তা হ'লো—বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদন, আর বিভিন্ন খাল কেটে নৌ-চলাচল ও কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা করা। সেদিক থেকে দামোদর-পরিকল্পনা যে দেশের আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করে তোলবার অন্যতম সহায়ক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

দশলক্ষ কিউসেক পরিমাপের একটি কল্পিত বন্যা প্রতিরোধ করতে যা যা দরকার তাকেই হিসাবের ভিত্তিস্বরূপ ধ'রে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, তিলাইয়া, দেওলবাড়ি ও মাইথন (দামোদর-শাখা বরাকর নদের উপর), বেরমো, আয়ার ও সোনালাপুর (দামোদর-নদের উপরে) এবং বোকারো ও কোনার-নদের উপর সবসুদ্ধ আটটি বাঁধ তৈরি করা হবে। আর, সেগুলির সঙ্গে থাকবে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনযন্ত্র বা হাইডেল। তাছাড়া থাকবে সিলমার দক্ষিণে একটি বারাজ, হাইডেলের জন্য বেরমোতে একটি নীচু বাঁধ, আর দেড়লক্ষ কিলোওআটের একটি তাপজ বিদ্যুৎকেন্দ্র।

পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রস্তাব—তিনটি সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

পরিকল্পনায় এ-প্রস্তাবও ছিল যে সবসুদ্ধ ৪৭ লক্ষ একর ফুট পরিমাপের একটি নিয়ন্ত্রিত জলাধার তৈরি করা হবে, ৭.৬ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে যাতে সেচ দেওয়া যায় সেজন্য করতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আর তিন লক্ষ কিলোওআট পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি যাতে উৎপাদন করা যায় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। মিঃ ভুরডুইন প্রস্তাবিত নৌ-চলাচল-ব্যবস্থা এবং উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে জল-সরবরাহও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, সমগ্র পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে খরচ পড়বে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু, সর্বশেষ হিসাব থেকে অনুমিত হয় যে পরিকল্পনার কাজ শেষ করতে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে। এই নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাটি তিনটি সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা—ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার, আর যে-দুটি অঙ্গরাজ্য এই পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হবে সেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই মহতী প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হ'লে প্রথম বৎসরেই সরকারের আয় হবে মোট খরচের শতকরা ছয় ভাগ। অথচ, আমেরিকার বিখ্যাত টেনেসী-উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার উনিশ বছর পরেও নাকি মোট খরচের মাত্র শতকরা চার ভাগ আয় হচ্ছে প্রতি বছর। সেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার সার্থকতা ও গুরুত্ব যে কতখানি তা সহজেই বোঝা যাবে।

তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেটহিলে একটি ক'রে বাঁধ-নির্মাণ, বোকারোতে একটি তাপজ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, প্রায় পাঁচশ' মাইল ১৩২ কিলোভোল্টের বিদ্যুৎ-পরিবহণ লাইন তৈরি, প্রয়োজনীয় সুইচ ও রিসিভিং স্টেশন স্থাপন, দুর্গাপুরে একটি সেতুবাঁধ বা বারাজ নির্মাণ এবং তৎসংক্রান্ত শাখাপ্রশাখা

সমেত ১,৫৬৪ মাইল দীর্ঘ সেচখাল কাটার সংকল্প নিয়ে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। তিলাইয়া-বাঁধটি নির্মিত হয়েছে দামোদরের উপনদ বরাকরের উপর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনযন্ত্র। আগাগোড়া কংক্রীটের তৈরী এই বাঁধের নির্মাণ-কাজ শুরু হয় ১৯৫০-সালের জানুআরি মাসে এবং ১৯৫৩-সালের ফেব্রুআরি মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই বাঁধ ও সংলগ্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন করলে পরিকল্পনার একটি বাস্তবরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। দুর্গাপুর-বারাজের ও তার সংলগ্ন খালগুলিতে সেচের প্রয়োজনে সারা বছর জল রাখবার জন্য যে-পরিমাণ জলের প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হচ্ছে এই তিলাইয়া-বাঁধ থেকেই। এখানকার বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রে যে-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে তা প্রথম সরবরাহ করা হয় বিহারের কোডারমা ও হাজারিবাগ শহর এবং নিকটবর্তী অভ্রখনিগুলিতে। পরে আরও অনেক অভ্রখনি, আশেপাশের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। পুরনো কোডারমা-সিংগ্রাওন সড়ক এই বাঁধের পিছনকার জলাধারে ডুবে যাওয়ায় তার জায়গায় পাটনা-রাঁচী ন্যাশনাল হাইওয়ে বা জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যুক্ত ক'রে সাতমাইল দীর্ঘ একটি নতুন রাস্তা ও ৫৫০ ফুট দীর্ঘ একটি সেতুও নির্মিত হয়েছে ডি. ভি. সি. দ্বারা। তিলাইয়া বাঁধের সঞ্চিত-জলরাশি থেকে এখন প্রায় একলক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনারে যে-বাঁধটি দেওয়া হয়েছে সেটি দামোদরের সঙ্গে কোনার-নদের সংযোগস্থলে ২৩ মাইল উজানে কোনার-নদের উপর নির্মিত। এই বাঁধের জলাধারে যে জল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা হয়েছে তার দ্বারা আরও একলক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া চলবে। এই বাঁধ প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে—দুর্গাপুরের খালগুলিতে জল সরবরাহ ক'রে উপত্যকার নিম্নভাগে সারা বছর সেচের ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, আর বোকারোর তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদনযন্ত্র শীতল করার জন্য প্রয়োজনীয় জলসরবরাহ। কোনার-বাঁধের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, এর মাঝের অংশে আছে নদীগর্ভে কয়েকটি দরজাযুক্ত কংক্রীটের গ্রাভিটি-টাইপ স্পিলওয়ে, যার উপর দিয়ে জল উপচে পড়ছে, আর দু'পাশে রয়েছে মাটির তৈরী বাঁধ। ১৯৫০-সালের অক্টোবর মাসে এই বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়, আর শেষ করতে সময় লাগে প্রায় চার বছর। এখানে যে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে তার জন্য হাইডেল-যন্ত্র বসানোর জন্য সাত মাইল দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হয়। এ থেকেই এই কাজের বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। দামোদর-পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের তৃতীয় বাঁধ হ'লো মাইথন-বাঁধ। এর কিছু অংশ তৈরি হয়েছে কংক্রীট দিয়ে আর বাকী অংশ মাটির। বন্যানিরোধ ও সেচশক্তিসম্পন্ন এই বাঁধের উচ্চতা হয়েছে ১৬২ ফুট, আর দৈর্ঘ্যে এটি ষোল হাজার ফুটের মতো। এই বাঁধের পিছনে যে কৃত্রিম হ্রদটি তৈরি হয়েছে তাতে জল সংরক্ষিত হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ একর ফুট। মাইথনের এই বাঁধে ভূগর্ভে ষাট হাজার কিলোওআট শক্তিসম্পন্ন যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র-বসানো হয়েছে তা

বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ

থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে প্রধানত আসানসোল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি এলাকায়। দামোদর-পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সর্ববৃহৎ বাঁধ হ'লো পাঞ্চেটহিল বাঁধ। দামোদর-বরাকরের সঙ্গমস্থলের প্রায় তিন মাইল উজানে দামোদরের উপরে এই বাঁধটি নির্মিত হয়েছে। এটিও কতকটা কংক্রীটের এবং কতকটা মাটি দিয়ে তৈরী। উচ্চতায় এটি ১৩৪ ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ২২,১১৫ ফুট। প্রাথমিক পর্যায়ে এর সঙ্গে ৪০ হাজার কিলোওআটের একটি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত দামোদর-নদে সবচেয়ে সাংঘাতিক যে-সব বন্যা হয়ে গেছে উপত্যকার নিম্ন অংশে সেই পরিমাপের বন্যা পাঞ্চেটহিল-বাঁধ ও মাইথন-বাঁধ সম্পূর্ণ রোধ করতে পারবে ব'লেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দুর্গাপুরে নির্মিত সেতুবাঁধটি এবং বোকারোতে স্থাপিত তাপজ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য অবদান। পরিকল্পনার অন্যান্য যে-সব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ হ'তে এখনও কয়েক বছর লাগবে। তবে আশা করা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যেই এই নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার অসমাপ্ত কর্মসূচি সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

দামোদর-পরিকল্পনার বিরাটত্ব যে কতখানি, আর তার আনুষঙ্গিক নানা শাখা-পরিকল্পনাই বা কতটা বিস্ময়কর, তা বোঝা যায় এই সব ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য জানলে। প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো আছে, অনভিজ্ঞতা বা অসতর্কতার ফলে হয়তো কয়েক ক্ষেত্রে অর্থেরও অপচয় হয়েছে.

উপসংহার

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেওয়ার মতো শক্তি ও সাহস ভারতবাসীর আছে। বহু-উদ্দেশ্যসাধক এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার ও শ্রমিকেরা যেভাবে বছরের পর বছর পরিশ্রম ক'রে চলেছেন নিঃসন্দেহে তা আমাদের শ্লাঘার বিষয়। এই পরিকল্পনা আজ সামগ্রিকভাবে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার পথে। এর ফলে শুধু যে বন্যানিরোধ, বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন, নৌ-চলাচল ও সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে তাই নয়, বিভিন্ন শিল্প-সংস্থাও আজ স্থাপিত হচ্ছে দামোদর-উপত্যকায়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বোকারোর তাপজ-বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিদ্যুৎ-কেন্দ্র। একদিন যে দামোদর ছিল সর্বনাশের প্রতিমূর্তি, কৃষকের 'দুঃখের নদী', আজ সেই দামোদর সুখ ও সমৃদ্ধির রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে সকলের চোখের সামনে। সুনিয়ন্ত্রিত দামোদর আজ দেশের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তার জলধারাকে যেভাবে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে ভবিষ্যৎ জাতি সেজন্য তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

রামায়ণ যাঁরা পড়েছেন দণ্ডকারণ্য নামটি তাঁদের কাছে অজানা নয়। বনবাস-যাপনের সময় শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যখন দণ্ডকারণ্যে যান তখনকার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন—

ভূমিকা—রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্য

"মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক-কানন-মধ্যে করিলেন গতি॥
আগে যান রঘুনাথ, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনক-তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন॥
ফল-পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত॥

রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ॥"

অর্থাৎ, সে-যুগে দণ্ডকারণ্য ছিল একটি রম্যস্থান; নিসর্গপ্রকৃতির রমণীয় পরিবেশে বনবাসের কষ্টও যেন ভুলে যেত মানুষ। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় এ-কথারও উল্লেখ আছে যে, তপশ্চর্যার জন্য বহু মুনি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস করতেন। রামায়ণ-যুগের সেই দণ্ডকারণ্য আজও রয়েছে, কিন্তু তার পৌরাণিক-রূপটি আর নেই। বর্তমান দণ্ডকারণ্যে যেখানে বুলডোজারের সাহায্যে জমি চাষ হয়, ট্রাকটরের সাহায্যে নতুন অনাবাদী জমিকে যেখানে আবাদযোগ্য ক'রে তোলা হচ্ছে, বাস্তবে সে দণ্ডকারণ্য নিশ্চয়ই অরণ্য নয়, আর বনবাসেরও অনুপযুক্ত নয়। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র যে-দণ্ডকারণ্যে বন্যপশু ও রাক্ষস পরিবেশে বনবাসের দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন, কলিযুগে সেই দণ্ডকারণ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তু নরনারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। উদ্বাস্তু নরনারীর পক্ষে এটা কিন্তু বনবাসযাত্রা নয়, অপূর্ব এক প্রাকৃতিক পরিবেশে নতুন এক বাঙালী-উপনিবেশ গ'ড়ে তোলার সুযোগ।

আধুনিককালের দণ্ডকারণ্যের আয়তন প্রায় আশি হাজার বর্গমাইল। মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণাংশ, উড়িষ্যার পশ্চিমাংশ এবং অন্ধ্র-রাজ্যের উত্তরাঞ্চল দণ্ডকারণ্য-সীমানার মধ্যে পড়ে। সুবিস্তৃত এই অঞ্চলে বনভূমি যেমন আছে, তেমনি আছে পাহাড়, নদনদী ও সমতল জমি। ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের সরকার কেন শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে দণ্ডকারণ্যকেই ঠিক করলেন, সে-প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাঁদের

মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা হয়তো দেশবিভাগ না হলে কোনদিনই নিজেদের জমিজমা ও ভিটেমাটি ত্যাগ ক'রে কোথাও যেতেন না। আর্থনীতিক কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক সেই ভিটেমাটির মায়া কাটিয়ে উদ্বাস্তুরা একবার যখন দেশত্যাগ করেছেন তখন তাঁদের একথা ভেবে দেখতে হবে যে, কোথায় বসবাস করলে তাঁদের আর্থনীতিক তথা বৈষয়িক পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব। পশ্চিম বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস করার সুবিধা আছে কিনা সেইটি সকলের আগে ভেবে দেখতে হবে। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যে-আয়তন হয়েছে সে-তুলনায় এখানকার জনবসতি যে খুব ঘন সে-কথা কারও অজানা নয়। এই জনসংখ্যার উপরে আবার উদ্বাস্তু-জনসংখ্যার চাপ। এ-পর্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। গত দশবছরে রাজ্য-সরকার ও উদ্বাস্তুদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এই ৩২-লক্ষ উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেরই মাথা গোঁজবার মতো জায়গা এ-রাজ্যে সংগৃহীত হয়েছে সত্য। কিন্তু, উপযুক্ত জমি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার অভাবে বহু উদ্বাস্তুকে পাঠাতে হয়েছে উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আন্দামান, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে। তা সত্ত্বেও, এখনও সরকারী শিবিরগুলিতে ২৩ হাজারেরও বেশী উদ্বাস্তু-পরিবার রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৮-হাজার পরিবারই কৃষিজীবী। তাছাড়া, সরকারী আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব উদ্বাস্তু রয়েছেন তাঁদের সংখ্যা হবে প্রায় ৪১-হাজার। কাজেই রাজ্যের বাইরে এমন কোনো জায়গায় এই সব উদ্বাস্তুদের পাঠাতে হবে যাতে ক'রে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত হ'তে পারেন। সেই কথা চিন্তা ক'রেই ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য-এলাকা নির্বাচিত করেন। কারণ, এখানে এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে যেগুলি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের, বিশেষ ক'রে কৃষিজীবী ও কারিগর-শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের, পুনর্বাসনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। প্রথমত দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, দণ্ডকারণ্যের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং কৃষিকার্যের উপযোগী জমিও সেখানে প্রচুর রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৪৫" ইঞ্চি থেকে ৭৫" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দণ্ডকারণ্য অঞ্চলেও বছরে গড়পড়তা বৃষ্টিপাত হয় ৫০" ইঞ্চি থেকে ৭০" ইঞ্চি। কাজেই, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ফলে দণ্ডকারণ্য-এলাকায় যে-পরিবেশের সৃষ্টি হবে তা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিকল্পনাগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা-রচয়িতারা এ-কথাও মনে করেন যে, যে-সব উদ্বাস্তু পরিবার, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা সৌরাষ্ট্রের পরিবেশে নিজেদের ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেননি, তাঁদের কাছেও দণ্ডকারণ্য অপছন্দের হবে না।

পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যের নির্বাচন

দণ্ডকারণ্যের সব এলাকাই কিন্তু ঠিক একই রকমের নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের পক্ষে ফরাসগাঁও অঞ্চলটি সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ, সেই এলাকাটি সমতল, এবং চাষবাসের কিছু কিছু চিহ্নও আছে সেখানে। ঐ-এলাকায়

আটটি আদর্শ গ্রাম স্থাপনের এক পরিকল্পনাও করেছেন দণ্ডকারণ্য-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া ঐ-সব গ্রামে যে-সব উদ্বাস্তু-পরিবার এসে বসবাস করছেন, তাঁরা যাতে নিয়মিত উপার্জনের সুবিধা পান, সেজন্য একটি বহুমুখী-খামার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর পরে কুণ্ডাগাঁও, জগদলপুর ও কোরাপুট। কুণ্ডাগাঁও একটি তহশীল এলাকা। আর, জগদলপুর হ'লো ছোট-খাটো একটি শহর। ছোট হ'লেও, শহরটি সুন্দর এবং তার রাস্তাঘাটও ভালো। বিভিন্ন আম্রকুঞ্জের চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জগদলপুরের বিভিন্ন এলাকায়। কোরাপুটও একটি শহরাঞ্চল এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশও বিশেষ মনোরম। প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় এই শহরটি অবস্থিত। আর, সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে শিলঙের আবহাওয়ারও বিশেষ একটা মিল আছে। কোরাপুটের আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল, তার মধ্যে চার হাজার বর্গমাইলে লোকের বসতি আছে। সেখানকার পাহাড় ও জঙ্গল-এলাকা বাদ দিলে যে দু'হাজার বর্গমাইল থাকে, সেখানে অনায়াসেই উদ্বাস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন-ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। সেখানে নদী আছে, নদীতে বাঁধ আছে, এবং সেই বাঁধের জল থেকে জলবিদ্যুৎ-শক্তিও উৎপাদিত হচ্ছে। শিল্প-সংস্থা গ'ড়ে তোলার পক্ষেও তাই কোরাপুট উপযুক্ত স্থান। বিভিন্ন শিল্পের যদি প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয় তাহ'লে কোরাপুট-এলাকায় যে-সব উদ্বাস্তু বসবাস করবেন তাঁদের আর্থনীতিক পুনর্বাসনেরও বিশেষ একটা সুরাহা হবে। পুনর্বাসনের দিক থেকে রায়-গড়া, মালকানাগিরি, নওরঙ্গপুর, ওমরাকোট প্রভৃতি স্থানও বিশেষ উপযুক্ত। রায়গড়ার জমি সমতল, সেখানে চিনির একটি কল আছে, আর আছে একটি ম্যাঙ্গানিজ-প্লাণ্ট। তাছাড়া, সেখানে আম জাম কাঁঠালের গাছ যেমন অনেক, চাষোপযোগী জমিও রয়েছে তেমনি প্রচুর। রায়গড়ার মতো মালকানাগিরি-উপত্যকা-এলাকাও চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কয়েকটি নদীও আছে ঐ এলাকায়, যেমন আছে নওরঙ্গপুরে। ধান ও তামাকের প্রচুর চাষ হয় মালকানাগিরি ও নওরঙ্গপুর অঞ্চলে। আর ওমরাকোট-এলাকা হরীতকীর জন্য বরাবরই বিখ্যাত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ হরীতকী চালান যায় ওমরাকোট থেকে।

পুনর্বাসনের উপযোগী দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন এলাকা

বাঙালীর একটা অপবাদ আছে ঘরকুণো ব'লে। কিন্তু, ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে বাঙালী চিরদিন গৃহকোণে আবদ্ধ হ'য়ে থাকবার মতো জাতি নয়। বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু আগেও বাংলাদেশের দুঃসাহসী তরুণেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। বাঙালীর ছেলেরাই দ্বীপময় ভারতে অর্থাৎ মালয়, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা ও বলিদ্বীপে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার পণ্য, বাংলার ধর্ম ও বাংলার সংস্কৃতি। সাম্প্রতিককালেও বহু বাঙালী উদ্বাস্তু সাগরপাড়ি দিয়ে এককালের আতঙ্কময় দেশ আন্দামান দ্বীপে গিয়ে চমৎকার এক উপনিবেশ গ'ড়ে তুলেছেন। বাঙালীর এই

উপনিবেশ-স্থাপনে বাঙালীদের উদ্যম তথা দণ্ডকারণ্য গমনে অনিচ্ছা

উপস্বত্ব ভোগের অযৌক্তিক সুযোগ পেল তাঁদের ঘরেই লক্ষ্মী রইলেন অচলা হয়ে। প্রজাদের পক্ষ নিয়ে দেশের লোকেরা মাঝে মাঝে আবেদন-নিবেদন কিংবা ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে ইংরেজ-সরকার হয়তো কৃষকদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কার্যত তাঁরা কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেননি। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এদেশে যে-সব ভূমি-আইন রচিত হয়েছে তার অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল জমিদারদের সুখ-সুবিধার দিকে, কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত কোনো দাবিই তাতে রক্ষিত হয়নি। কূটনীতিতে অভিজ্ঞ ইংরেজদের চক্রান্তে এদেশে তাই একদিকে যেমন বিত্তশালী জমিদারদের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল দারিদ্র্য-নিপীড়িত এক বৃহত্তর সমাজের।

বাংলাদেশেই ইংরেজ-রাজত্বের সূত্রপাত। কাজেই, 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত'-এর প্রথম আঘাত লাগে বাঙালীর বুকেই। কিন্তু, পরে সেই জমিদারি-প্রথা ক্রমশ বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-মাদ্রাজ এবং উত্তর-প্রদেশেও প্রচলিত হয়। বাংলাদেশে 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' প্রবর্তনের মূলে ইংরেজদের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে, সারা ভারতে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ আসবে কিনা। তাছাড়া, নানা যুদ্ধবিগ্রহে সে-সময় কোম্পানিকে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল ব'লে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল তাঁদের। জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তাঁরা তাই আর্থিক বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলেন। দেশশাসনের ব্যাপারেও তদানীন্তন জমিদারেরা বিদেশী-সরকারের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু, ইংরেজরা

মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্ভব ও কৃষকদের দুর্দশা

যখন ক্রমশ সারা ভারতে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেলেন, তখনই 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত'-এর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন। লর্ড কর্নওআলিস হয়তো ভেবেছিলেন যে, জমিদারেরা শুধু রাজস্ব আদায়েরই সহায়ক হবেন না, উপরন্তু জমির উন্নয়ন-সাধন ক'রে সংশ্লিষ্ট সকলের উপকার করবেন। কিন্তু, এদেশের জমিদারেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে শহরে গিয়ে ভোগবিলাসে মেতে থাকতেন। আর, সেই সুযোগে কর্মচারীরা প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। সরকারের কোষাগারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দেওয়া হ'লো কি না, জমিদারেরা শুধু তার খবর পেলেই নিশ্চিন্ত হতেন, জমি-উন্নয়ন কিংবা প্রজাদের দারিদ্র্য লাঘবের বিষয় নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। এর ফলে, জমিদার-কর্মচারীদের চক্রান্তে প'ড়ে প্রজাদের খাজনা বাদেও তহুরি, মঙ্গল-মাথট, রাজধুতি প্রভৃতি বাড়তি অনেক টাকা দিতে হ'ত। তাছাড়া, নানারকমের জরিমানা দেওয়া এবং কোনো-না-কোনো উপলক্ষ্যে জমিদারবাড়িতে কিংবা নায়েব-গোমস্তাদের সংসারে বেগারখাটাও যেন তাদের ভাগ্যে বরাদ্দ ছিল! জমিদারেরা হয়তো প্রজাদের মধ্যে পতিত, জলা কিংবা বুনো জমি খাজনায় বিলি ক'রে দিলেন, কিন্তু প্রজাদের চেষ্টায় যেই

সে-সব জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠল, অমনি তা তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ইচ্ছামতো খাজনায় নতুন ক'রে বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা করলেন। কৃষক-নিপীড়নের এও একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। বিলাতী পণ্যদ্রব্যে যখন এদেশের বাজার ছেয়ে যায়, তখন দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য চরম একটা সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষিকর্মের পরিপূরক পল্লীশিল্প ক্রমশ লোপ পেতে থাকলে দেশের আর্থনীতিক ভিতও শিথিল হয়ে পড়ে। বেকার শিল্পজীবী বা কারিগর-শ্রেণীর লোকেরা, ব্যবসায়ীরা ও স্বল্পবিত্তশালী সাধারণ লোকেরাও তখন ক্রমশ জমির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং জমিদার ও রায়তদের মধ্যে তাঁরা দেখা দেন নূতন এক সম্প্রদায়রূপে। তাঁরাই হন নূতন শ্রেণীর জমির মালিক বা মধ্যস্বত্বভোগী। জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারির অংশবিশেষ পত্তনি নিয়ে পত্তনিদার হ'লেও রায়তদের কাছে তাঁরা নতুন-জমিদারের মর্যাদালাভ করেন। এই শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীরাই এদেশে জোতদার, তালুকদার, মজুমদার, তরফদার প্রভৃতি নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার ভাগে চাষ করবার বন্দোবস্তও করেন। তারই ফলে সৃষ্টি হয় ভাগচাষী বা বর্গাদার-সম্প্রদায়ের। এইভাবে এদেশে একদিকে যেমন অ-কৃষক মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তেমনি ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যাধিক্যে গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদেশের কৃষকেরা এককালে জমিদারদের কাছ থেকে যত-না নিপীডন সহ্য করেছে, তার অনেক বেশী পীডন ও লাঞ্ছনা তাদের সহ্য করতে হয়েছে জোতদার-তালুকদার-শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথা অনুসারে ইংরেজ-সরকার দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে শুধু নির্দিষ্ট হারেই রাজস্ব আদায় করতে পারতেন, কিন্তু জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে যে-খাজনা আদায় করতেন তার একাংশও তাঁরা পেতেন না। জমিদারি-প্রথা কায়েম হওয়ার ফলে তাই এদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর লোকেরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হন।

ইংরেজ-রাজত্বে ভূমিস্বত্ব-আইনের নানারকম সংস্কার করা হলেও, জমিদারি-প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন সম্ভব হয়নি। কিন্তু, ক্রমশ রাজনীতিক-চেতনার উন্মেষে যে জনমত গঠিত হয়, তা এই বিলোপসাধনের পক্ষেই ছিল। তাই, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ভারতবর্ষে জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপক চেষ্টা চলে। গণতান্ত্রিক জাতীয়-সরকার তাই দেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সর্বাগ্রে জমিদারি-প্রথা রহিতের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা করেন।

জমিদারি-প্রথার বিলোপ-সাধন ও তার সুফল

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই এখন জমিদারি-প্রথা বিলুপ্ত। জমিদারদের চরম আর্থনীতিক সংকটের মধ্যে না ফেলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য-সরকার এখন জমিদারি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিয়েছেন এবং দরিদ্র-রায়ত, ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে জমি বণ্টন ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছেন। এখন থেকে কৃষকেরাই হবে জমির প্রকৃত মালিক ও সরকারের সঙ্গে স্থাপিত হবে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। এতকাল যাবৎ এদেশের

কৃষক-সম্প্রদায় জমিদারি-প্রথার মাধ্যমে যেভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়ে এসেছে জমিদারি-প্রথার বিলোপসাধন ক'রে দেশের জাতীয়-সরকার যেন সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। ১৯৫৩-সালের ১০ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভায় 'জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদ বিল'-টি উপস্থাপিত হয় এবং ১৯৫৫-সালের ১৪ই এপ্রিল (১৩৬২-বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) থেকে সেই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ফলে এ-রাজ্যে জমিদারি-প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই আইনের ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষকেরা ভূমিস্বত্বলাভ ক'রে উপকৃত হবেন, অন্যদিকে তেমনি সরকারী উদ্যোগে দেশের কৃষিব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে এবং রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত রাজস্ব পেলে সরকারের পক্ষে জাতিগঠনমূলক নানাবিধ পরিকল্পনা কার্যকরী করাও সহজবোধ হবে এখন।

এই প্রসঙ্গে, জমিদারদের সম্পর্কে একটা বিষয় উল্লেখ করারও প্রয়োজন আছে। জমিদারি-প্রথা প্রবর্তনের ফলে দেশে যে জমিদার-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাঁরা যে সব ক্ষেত্রেই দেশের অকল্যাণ করেছেন একথা মনে করা উচিত নয়। কারণ, বাংলাদেশের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে যে, এদেশের বহু জমিদার প্রজাহিতে বহু সৎকাজ করেছেন। এদেশের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য দেশহিতৈষী বহু জমিদার অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। দেশের চারুকলারও তাঁরা ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তবে জমিদারি-ব্যবস্থায় এদেশে কল্যাণের চেয়ে যে অকল্যাণই হয়েছে বেশি, সে-কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। এদেশে বিত্তবণ্টনের বৈষম্য মূলত এই জমিদারি-প্রথার জন্যই। আমরা আজ যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গঠনের দিকে চলেছি জামিদারি-প্রথার বিলোপসাধনে যে সে-কাজ ত্বরান্বিত হবার সুযোগ পেল, তা বলাই বাহুল্য।

উপসংহার

ভূ-দান আন্দোলন

ভারতবর্ষে যত রকমের আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে গান্ধীশিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবে প্রবর্তিত ভূ-দান আন্দোলনই বোধ হয় সবচেয়ে অভিনব। কারণ, এ-আন্দোলন নূতনতর এক বৈপ্লবিক চেতনায় সমাজকে অনুপ্রাণিত করার আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী একদিন যে সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, এই আন্দোলনের সাহায্যে আচার্য ভাবে সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। ভূ-দান আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু, অসহায় ও অবজ্ঞেয় ভূমিহীন কৃষকের প্রাণে নতুন ক'রে বাঁচবার আশা জাগিয়ে তুলেছেন। তিনিই

আমাদের মহাত্মা গান্ধীর মতো নতুন ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করলেও, আর্থনীতিক স্বাধীনতা যতদিন না অর্জন করতে পারছি, ততদিন সেই রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। গ্রামীণ অর্থনীতি যেদিন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, কৃষিপ্রধান ও গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ যেদিন খাদ্যসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা ও মানুষের মতো বাঁচবার বিবিধ মৌলিক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবে, সেদিনই হবে ভারতের আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন। আর, সেদিনই হবে আমাদের সত্যিকারের স্বরাজ-লাভ। এইজন্যই তিনি দেশবাসীর মনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করতে চেয়েছেন দেশবাসীকে। কারণ, বিত্তশালী মানুষেরা যদি না আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ থেকে কিছু কিছু রিক্ত ও সর্বহারাদের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছুক হয়, তাহ'লে এদেশের ধনবৈষম্য কোনোদিনই ঘুচবে না। আর সেই বৈষম্য দূর না হ'লে কোনোদিনই সর্বোদয়-সমাজ গঠিত হবে না। এদেশে আইন ক'রে মানুষকে হয়তো অনেক কাজ করতে বাধ্য করা যায়, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতার মধ্যে প'ড়ে মানুষ স্বভাবতই বিরূপ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রশক্তির উপর এবং আইনের ফাঁক ও ফাঁকি খুঁজে বেড়ায় অহরহ। তার ফলে, আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হ'য়ে পড়ে সে, স্বার্থপরতার মোহে আচ্ছন্ন হয় তার মন। আচার্য ভাবে তাই দেশবাসীকে সর্বোদয়-সমাজ সংগঠনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন—"স্বরাজ আমরা পেয়েছি। এখন সাম্যযোগ সংস্থাপনের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমি একেই বলেছি সর্বোদয়। আপনারা একে সাম্যযোগ বলতে পারেন, সর্বোদয়ও বলতে পারেন, যে-নামে আপনাদের অভিরুচি।...আমার এ-কাজে আমি সকলেরই সহযোগিতা কামনা করছি। এই বিপ্লবের কাজে আপনারা আত্মনিয়োগ করুন। আমি চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে চাই, ঘটাতে চাই কর্মপন্থায় বিপ্লব।" ভূ-দান আন্দোলনের মাধ্যমে আচার্য বিনোবা ভাবে সেই বিপ্লবেরই সূচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"যার কিছু নেই তাকে তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে, অন্ন থেকে, ভূমি থেকে, শ্রম থেকে, বুদ্ধি থেকে অধিকারের ভিত্তিতেই কিছু কিছু দাও।" বিনোবার এই ভূ-দান আন্দোলন চায় জীবনমূল্যের আমূল পরিবর্তন-সাধন করতে। ভূ-দানের প্রথম লক্ষ্য তাই হৃদয়ের পরিবর্তন, পরে জীবনধারার পরিবর্তন এবং তারপর সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন। ভূ-দানের আহ্বানকে তাই ভিক্ষা বলা যেমন উচিত নয়, ভূ-দানকে তেমনি দান-খয়রাত বলাও অসমীচীন। ভূ-দান হ'লো ভূমিহীন মানুষের মৌলিক অধিকার-অর্জনে সহায়তা করার নূতন মন্ত্র।

ভূমিকা—সর্বোদয়-সমাজ গঠনের চিন্তা

স্বাধীন-ভারতে সমাজ-পুনর্গঠনের কাজে গান্ধীজীর আদর্শ কিভাবে সফল ক'রে তোলা যায় তারই একটা উপায় খুঁজে বের করতে বিনোবাজী কিছুকাল দিল্লীতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাটান। সেই সময় তিনি যে-পরিকল্পনা জাতীয়-সরকারের নিকট উপস্থাপিত করেন তা গৃহীত না-হওয়ায় ভগ্নহৃদয়ে তিনি মালাবার-অভিমুখে

যাত্রা করেন। তারপর সেখান থেকে যান তেলেঙ্গানায় সর্বোদয়-সম্মেলনে যোগ দিতে। তেলেঙ্গানায় তখন কম্যুনিস্টদের প্রচারকার্যের ফলে এক অভাবনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। বিনোবাজী সেই সময় উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে শান্তি-অহিংসার বাণী প্রচার করতে থাকেন। হায়দ্রাবাদের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে পরিভ্রমণের সময় জনকয়েক ভূমিহীন হরিজন এসে তাঁর কাছে কিছু জমি ভিক্ষা চায়। সান্ধ্যপ্রার্থনার সময় আচার্য ভাবে বিত্তবানদের উদ্দেশ ক'রে সেই ভূমিহীন হরিজনদের কিছু জমি দিতে আহ্বান জানান। অপ্রত্যাশিতভাবেই সেদিন তিনি এক জমিদারের কাছ থেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া পেলেন। হরিজনদের প্রয়োজন ছিল আশি একরের মতো জমি। কিন্তু, আচার্য পেলেন একশ' একর। অন্তত একজন ভূ-স্বামীর হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পেরেছেন ব'লে বিনোবাজী মনে মনে খুশী হলেন সেদিন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫১-সালের ১৮ই এপ্রিল। সেই ঘটনা থেকে আচার্য ভাবে সমাজ-পুনর্গঠনের যে উপায় খুঁজে পান তা থেকেই হয় তাঁর ভূ-দান যজ্ঞের সূত্রপাত। তখন থেকে তাঁর মুখে শুধু এক কথা—"ভূমিহীনদের জন্য ভূমিদান কর। ভূ-দান যজ্ঞে যে যেমন পার আহুতি দাও। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে গিয়ে মনে রেখো যে, ভূমি ব্যক্তিবিশেষের নয়, ভূমি সমগ্র সমাজের।" বিনোবাজী যখন তেলেঙ্গানায় তখন রাজধানী দিল্লী থেকে জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিশনে সমাজ-পুনর্গঠন সম্পর্কে তার অভিমত জানাবার জন্য এক আহ্বান আসে। বিনোবাজী তখন পদব্রজেই দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাত্রাপথে তিনি তাঁর ভূ-দান-মন্ত্র প্রচার ক'রে যাবেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে। এইভাবে দিল্লীতে পৌছুতে তাঁর যে দু'-মাস সময় লাগে তার মধ্যে তিনি বিভিন্ন জায়গার ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে ভূমিহীনদের জন্য প্রায় বার হাজার একর ভূমি সংগ্রহ করেন। বিনোবাজীর আবেদন বিত্তশালীদের মর্মমূলে গিয়ে পৌছেছিল ব'লেই ভূ-দান যজ্ঞে তাঁরা উদ্বৃত্ত ভূমিদান করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। দিল্লীর কাজ সমাপ্ত ক'রে বিনোবাজী আবার বেরিয়ে পড়েন তাঁর সুপরিকল্পিত 'ভূ-দান-যজ্ঞ পরিক্রমা'-য়। ১৯৫২-সালের সেপ্টেম্বর-মাস পর্যন্ত ভূ-দান যজ্ঞের মাধ্যমে জমি সংগৃহীত হয় প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ একর আর, ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় বাহাত্তর হাজার একর জমি আইনসম্মতভাবে একশ হাজারেরও বেশি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কত অল্প সময়ের মধ্যে বিনোবাজীর ভূ-দান আন্দোলন সাফল্যলাভ করে।

ভূ-দান আন্দোলনের সূত্রপাত ও তার সাফল্য

একটা প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই জাগতে পারে যে, আইন ক'রে সরকার যখন জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদসাধন করেছেন, তখন আর ভূ দান আন্দোলনের প্রয়োজন কি? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সে-প্রয়োজনীয়তা আর নেই; কিন্তু জমিদারি-প্রথা রহিত হ'য়ে গেলেই কি ভূমিহীনরা এত সহজে এবং তাদের প্রয়োজনমতো জমি পাবে? আইন জারী ক'রে কি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করানো যায়? ভূ-দান

আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক বিপ্লবের যে ইঙ্গিত আছে সে-বিপ্লব কি কখনও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সম্ভব হ'তে পারে? জমিদারি-প্রথা রহিত হবার সম্ভাবনা দেখেই দেশের বড় বড় বহু জমিদার নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে জমি ভাগ ক'রে দিয়ে শুধু আইনকেই ফাঁকি দিতে চাননি, ভূমিহীন অসংখ্য মানুষের মৌলিক-অধিকার অর্জনের দাবিকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিনোবাজীর আন্দোলনে কিন্তু অঘটন ঘটেছে, বিত্তশালীরা স্বেচ্ছায় তাঁকে জমি দান করেছেন ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবার জন্যে। জমিদারি-উচ্ছেদ-আইনে ক্ষতিপূরণ-লাভের যে ব্যবস্থা আছে, এ-ক্ষেত্রে সে ক্ষতিপূরণও তাঁরা চাননি। বিনোবাজীর চারিত্রক মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা দেশের এক বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ-কামনায় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আইনের দ্বারা যা এতদিন সম্ভব হয়নি, বিনোবার বাধ্যবাধকতাহীন আহ্বানে তাই অতি সহজে কার্যকরী হয়েছে।

জমিদারি-উচ্ছেদ আইন ও ভূদান-যজ্ঞের পার্থক্য

শুধু ভূমি-বণ্টন ক'রেই কি দেশের অগণিত ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার সমাধান করা যাবে—এও একটা প্রশ্ন। এ-সম্পর্কে বিনোবাজী নিজেই বলেছেন যে, শুধু ভূমি বণ্টন ক'রেই সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হবে না সত্য, কিন্তু এই আন্দোলনই ভূমির সমবণ্টনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। 'দান'-কথাটি সম্পর্কেও তিনি বলেছেন যে, শঙ্করাচার্য যেমন 'দান' অর্থে সমবিভাজন বুঝেছিলেন, তিনিও তাই মনে করেন। ভূ-দানে ভূ-গ্রহীতারও অমর্যাদার কোনো হেতু নেই। কারণ এ-পৃথিবীতে ভূমির উপর প্রত্যেক মানুষেরই একটা ন্যায্য বা মৌলিক অধিকার আছে। সমাজের কতকগুলি লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, আর কতকগুলি লোক চিরন্তন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে—এ কখনই মানবিক ধর্ম হতে পারে না। জলের ও বাতাসের মালিক আমি এবং টাকা না দিলে কাউকে আমি জল-বাতাস ব্যবহার করতে দেব না এ-রকম দাবি কেউ কখনও করতে পারে না। জল ও বাতাসের মতোই বেঁচে থাকবার জন্য ভূমিতেও মানুষের মৌলিক অধিকার আছে। স্বার্থপর একদল মানুষের দুরভিসন্ধিতে আজ দেশের বেশির ভাগ মানুষ এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ফলে সামাজিক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রতিবাদও করেনি, নীরবে দুঃখবরণ করেছে কিংবা ভাগ্যকে দিয়েছে অভিশাপ। পরাধীনতা-মুক্ত দেশে, আজ সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই আচার্য বিনোবা ভাবে শুরু করেছেন তাঁর ভূ-দান আন্দোলন। জমি যাঁদের আছে তাঁদের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ ক'রে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়াই ভূদান-যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য হ'লেও বৃহত্তর লক্ষ্য হ'লো মানব-হৃদয়ে প্রেম ও অহিংসার ভাব জাগিয়ে তুলে নূতন এক ধর্মচক্র প্রবর্তন। আধুনিককালের যান্ত্রিক-সভ্যতার ফলে মানুষ যেন ক্রমশ তার

মানুষের মৌলিক অধিকার অর্জনে ভূ-দান আন্দোলনের সার্থকতা

সুকুমার বৃত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছে, নৈতিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চলেছে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সর্ববিধ উপকরণ আহরণ করতে। অথচ, সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হ'লে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতিও সম্ভবপর নয়। এই সত্য যাতে আজ সকল মানুষ সমভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বিনোবাজী সেই দিক থেকেই তাঁর ভূদান-আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই আন্দোলনের অভিনবত্ব আজ বিশ্ববাসীকেও চমৎকৃত করেছে, আধুনিক-বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তাশীল মানুষেরাও এই আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

ভারতবর্ষ গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৬-ভাগই আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। অথচ, ভারতের প্রতি ছয়জন কৃষিজীবীর মধ্যে একজন ক'রে কৃষক ভূমিহীন! এই অসম ভূমিবণ্টনের ফলে এদেশের গ্রামীণ-সমাজের এক বৃহত্তর অংশ দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত। আমরা আজ যে সর্বোদয় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখি, অথবা সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি—তা যদি সার্থক ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে ভূ-দান আন্দোলনের গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যার যে-জমি আছে বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের খাতিরেই তাকে তা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু জমির দখল ত্যাগ করানো সহজসাধ্য নয়। মানুষ অন্নদান করতে পারে, বস্ত্রদান করতে পারে কিন্তু ভূমিদান করতে বললেই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এর জন্য তাই প্রয়োজন জনমত গঠন বা নৈতিক চেতনার নব-উন্মেষ। মানুষের মনে নৈতিক চেতনার উন্মেষ করতেই আচার্য বিনোবা আজ ভূ-দান আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের আন্দোলন তাই আজ বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে।

উপসংহার

বেকার-সমস্যা

উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গ'ড়ে তোলার জন্য সারাদেশ আজ কর্মমুখর। দেশের দিকে দিকে গ'ড়ে উঠছে নতুন নতুন কল-কারখানা, বড় বড় ইমারত, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য রূপ দেওয়া হচ্ছে বিরাট বিরাট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার; রাস্তাঘাটের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, যানবাহনের সংখ্যাও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছর; সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে শোনা যাচ্ছে, নবজীবনের স্পন্দন। কিন্তু, শুধু কতকগুলো ইমারত ও কল-কারখানা স্থাপনে অথবা নদী-বাঁধ নির্মাণে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হ'লো তা দিয়ে কোনো পরিকল্পনার সাফল্য যাচাই করা যায় না। সেই ইমারতের তলায় যে-

ভূমিকা

মানুষ বাস করে, কল-কারখানার শেডের নীচে যে হাজার হাজার শ্রমিক খেটে খায়, অথবা নদীবাঁধে নিয়ন্ত্রিত জলধারায় যে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও গ্রামবাসীর জীবনধারা প্রবাহিত হয়, তাদের সামগ্রিক কল্যাণ কতটুকু সাধিত হয়েছে বা হ'তে পারে তারই মাপকাঠিতে পরিকল্পনার প্রকৃত মূল্য যাচাই হ'তে পারে। সেদিক থেকে একটা বৃহৎ পরিকল্পনা কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের সমাজ-জীবনে কত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে বা দিতে পারে, তার পরিমাপই যে সেই পরিকল্পনার সাফল্য বা অ-সাফল্য বিচারের প্রধান কষ্টিপাথর সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে স্বাধীন-ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেলেও, তার বেকার-সমস্যার যে আজও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি সে-কথা পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার রচয়িতা পরিকল্পনা-কমিশনও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন।

বেকার-সমস্যার গুরুত্ব

ভারতবর্ষে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ, ১৯৬১-সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে হবে প্রায় দেড় কোটি। এই দেড কোটি বেকার কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং পল্লী-অঞ্চলের কর্মক্ষম স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়েই ধরা হয়েছে। উপার্জনহীন ঐ সব লোকের সংখ্যা ধরলে এদেশের বেকার-সংখ্যার পরিমাণ যে আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে তা বলাই বাহুল্য। দেশের আর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে বেকার বলতে শুধু তাদেরই ধরা হয়েছে যারা কর্মক্ষম এবং বর্তমানে প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, অথচ যাদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। উপরে বর্ণিত হিসাবে ১৯৬১-সালের মধ্যে এরূপ বেকারের সংখ্যা যে আরও পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে যাবে তাতেই এদেশের ক্রম-বর্ধমান বেকার-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, গুরুতর এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার সচেতন আছেন এবং সেজন্য কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা যদি আশানুরূপভাবে রূপায়িত হয়, তাহ'লে বড়জোর হয়তো আশি লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু, অবশিষ্ট সত্তর লক্ষ লোক তখনও বেকার থেকে যাবে, তাতে তো সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। কাজেই এই বেকার-সমস্যা শুধু যে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সকলেই আজ এই সমস্যা নিয়ে বিশেষ বিব্রতবোধ করছেন।

বেকারের-সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ

এদেশে বেকার-সমস্যার মূলে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। অনেকের মতে প্রধান কারণ হ'লো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক বাড়ে। কিন্তু, সে তুলনায় নতুন কর্মসৃষ্টির কোনো সুযোগই এদেশে নেই। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ক'রে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু, সে-বিষয়ে যখন মতদ্বৈধ আছে, তখন সেদিক দিয়ে না গিয়ে দেখা যেতে পারে বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হবার কারণ কি এবং তার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব। অনেকের মতে শ্রমজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়াই বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে শ্রমিক বা শ্রমেচ্ছুক মানুষ তখনই বেকার হয় যখন কর্মসংস্থার মালিক তাকে কাজ দিতে অস্বীকার করে বা অক্ষম হয়। মালিকের পক্ষে কাজ দিতে অস্বীকৃতি বা অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সাধারণত একজন শ্রমিক যে-পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারে, তার চেয়ে বেশী জিনিস উৎপাদনে শ্রমিকের আগ্রহের অভাব। আবার এই আগ্রহের অভাবের মূলে রয়েছে শ্রমিকের পক্ষে কর্মচ্যুত হবার আশঙ্কা। অর্থাৎ, বর্ধিত হারে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি না পেলেই উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ হ'তে থাকে, আর তার ফলে শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়। উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ হবার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এর পিছনে হয় রয়েছে ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, নয়তো ক্রয় করার অনিচ্ছা। অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে আবার সেই বেকারত্বের প্রশ্নেই আসতে হয়। মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই জাগতে পারে যে, যে-দেশে কাঁচামাল ও কর্মক্ষম মানুষের অভাব নেই সে-দেশে এমনটা ঘটে কেন? এর কারণ খুঁজে বের করাও খুব শক্ত নয়। সাধারণত, জনসাধারণ তাঁদের উপার্জনের পুরো টাকাই ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য আয় করেন না, অথবা নিজেরা সঞ্চয়োপযোগী দ্রব্যের জন্যও সে টাকা ব্যয় করেন না। এই টাকা যদি সঞ্চয়োপযোগী দ্রব্যের জন্য ব্যাঙ্কের মারফত কোনো উৎপাদক কর্তৃক ব্যয়িত হয়, তবে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন যে বেড়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, ক্রেতার অভাব বা ক্রয়ের অনিচ্ছার দরুন বর্ধিত ভোগ্যপণ্যদ্রব্য অবিক্রীত থেকে যাবার সম্ভাবনা কিন্তু পুরোপুরিই থেকে যায়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ—যেমন কোনো ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের জন্যও ব্যয়িত হয় না—তেমনি ব্যয়িত হয় না কোনো সঞ্চয়োপযোগী দ্রব্যের জন্য, অর্থাৎ, অর্থ থাকা সত্ত্বেও তা কোনো কাজেই ব্যয়িত না হয়ে অফলপ্রসূভাবে পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে,—আর সেইজন্যই শ্রমিক ও কাঁচামালের যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয় না এবং জনসংখ্যার বেশ একটা মোটা অংশ বেকার থেকে যায়।

এইভাবে যে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় তার অনেকটাই দূর হ'তে পারে, যদি বহির্বিশ্বে রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রসার হয়। কিন্তু সাধারণত ধনতান্ত্রিক দেশে সে-দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় সরকারের উপর। আর, এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেকারের সংখ্যা বেশি থাকতে বাধ্য। তাই আজ একদিকে বেকার একেবারে নেই ব'লে, যেমন সোভিয়েট রাশিয়া গর্ব করে ;—অন্যদিকে তেমনি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়িয়েছে ব'লে সেখানকার প্রেসিডেন্ট করেন গভীর উদ্বেগ-প্রকাশ। ভারত নামে সমাজতান্ত্রিক দেশ হ'লেও, এখনও এখানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠেনি। কার্যত, ভারতকে এখনও ধনতান্ত্রিক দেশ বললে কোনো ভুল হয় না। কারণ, এদেশের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরে এখনও পুঁজিবাদীদের আধিপত্য বেশি। আগেই বলা হয়েছে যে, সঞ্চয়-তহবিলে যদি মোটা টাকা আটকে থাকে, তাহ'লে বেকারের সংখ্যা

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেকারের সংখ্যাধিক্য

দিন দিনই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। এদেশের বিত্তবানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হ'লেও, জাতীয় আয়ের অধিকাংশই যায় তাঁদের পকেটে। এদিকে আবার আয়ের তুলনায় ভোগ্যপণ্যের দরুন তাঁদের ব্যয়ের পরিমাণও নগণ্য। ফলে, প্রতিনিয়তই তাঁদের সঞ্চিত তহবিলের আয়তন বর্ধিত হ'তে থাকে। নানা কারণে, তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের কোনো কাজে আসে না। পুঞ্জীভূত এই অর্থ যদি যথাযথভাবে শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত হ'ত তাহ'লে দেশের এই প্রচুর কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় কোনমতেই ঘটতে পারত না। এই কারণেই, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ধনবণ্টনের বৈষম্য ক্রমশই বাড়তে থাকে; আর, তারই ফলে জটিল হয়ে ওঠে দেশের বেকার-সমস্যা।

দেশে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের কাটতি কম বা সীমাবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক লোক যে বেকার থেকে যায় এই সত্য আজ অর্থনীতিবিদ্‌রা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছেন। কাটতি কম বা সীমাবদ্ধ হবার দরুন উৎপাদকেরাও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হন। কারণ, অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবিক্রীত অবস্থায় মাল রেখে ক্ষতিস্বীকার করার মতো ক্ষমতা ক'জন ব্যবসায়ীর থাকা সম্ভব? মাল বিক্রি হোক বা না হোক সে দিকে দৃষ্টি না রেখে দেশের সকল উৎপাদকই যদি ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে যেত, তাহ'লে হয়তো বেকার-সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যাই থাকত না। কিন্তু সে-রকম আশা করা শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বাস্তবজ্ঞানবহির্ভূত। এই কারণেই অনেকে মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যম ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায়

সরকার যদি উৎপাদকের অবিক্রীত পণ্যদ্রব্য কিনে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহ'লে সেই ভরসাতেই তাঁরা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে পারেন। আর তারই ফলে বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জিনিস কিনতে গেলে সরকারের হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসান হবে, কিন্তু সে-লোকসানটা তাঁরা উসুল করে নিতে পারেন বিত্তবানদের উপরে নানাবিধ কর ধার্য করে। তাতে করে ধনবৈষম্যমূলক সমস্যারও কিছুটা সমাধান হওয়া সম্ভব। সরকার এমন ব্যবস্থাও করতে পারেন যাতে বৃহদায়তন কলকারখানাগুলি তাদের প্রয়োজনীয় ছোটখাটো কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-সংস্থাগুলি থেকে কিনতে বাধ্য হয়। তাতে ক'রে একদিকে যেমন দেশের ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার হবে, অন্যদিকে তেমনি বহু লোক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঐ-সব শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত হ'তে পারবে। অনেকের মতে সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকার-সমস্যা সমাধানের এই হ'লো প্রধান নীতি। একথা সত্য যে, পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র দেশে আজ যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তার ফলে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বেড়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু যে-মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন অনেক লোকেরই আর কাজ করবার প্রয়োজন থাকে না। ফলে, পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার কর্মসংস্থানের যে সুযোগ এনে দেন, তা হয় সাময়িক।

কাজেই, বেকার-সমস্যার সুষ্ঠু কোনো সমাধানও হয় না। এই কারণেই অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন যে, সকল বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যখন সরকারী পর্যায়ে সম্ভবপর নয়, তখন বে-সরকারী পর্যায়ে বেকারদের কাজ দিতে হ'লে বিভিন্ন কলকারখানায় ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো ভিন্ন গত্যন্তর নেই। উৎপাদন বাড়্‌লেই বিক্রির যে-সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধানের দায়িত্ব অবশ্য সরকারকেই নিতে হবে। কারণ, সরকারের পক্ষেই দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য বহির্ভারতে রপ্তানি করা সম্ভব। তার ফলে, শুধু যে বেকার-সমস্যারই সমাধান হবে তা নয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথও হবে সুপ্রশস্ত। সরকার যখন ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য 'স্টেট ট্রেডিং-কর্পোরেশন' বা 'রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা' গঠন করেছেন, তখন বহির্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সরকারের পক্ষে একটি 'এক্সপোর্ট ট্রেডিং-কর্পোরেশন' বা 'রপ্তানি বাণিজ্য-সংস্থা' গঠন করাও এমন কিছু শক্ত নয়। এই শ্রেণীর একটি সংস্থা গ'ড়ে তোলার একটা উপকারিতাও আছে। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী যেভাবে খারাপ বা ভেজাল মাল বিদেশে রপ্তানি ক'রে ভারতের সুনাম নষ্ট করেছেন, সরকারী 'রপ্তানি বাণিজ্য-সংস্থা' গঠিত হ'লে সেরকম অঘটন ঘটবারও আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

উপসংহার

বেকার-সমস্যা সমাধানে কোনো একক প্রচেষ্টা ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মালিক, শ্রমিক ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্মিলিত এক চুক্তি-সম্পাদন। তিন পক্ষ যদি এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মালিকের কর্তব্য হবে যথাসম্ভব বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা, শ্রমিককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নির্ধারিত মজুরিতেই এবং মজুরি বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনোরকম অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা চলবে না; এবং সরকারের কাজ হবে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন-দ্রব্য ক্রয় বা বণ্টনের ব্যবস্থা করা, সেই সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে শ্রমিকেরা তাঁদের উপার্জিত অর্থে অন্ততপক্ষে মোটা ভাত, মোটা কাপড় সংগ্রহের কোনো অসুবিধাবোধ না করে। এই সঙ্গে যদি দেশের লোক ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা চিন্তা ক'রে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হয় তাহ'লে বেকার-সমস্যা সমাধানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সহায়ক হবে।

ভারতের গ্রন্থাগার

ঠিক কবে থেকে এদেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সূচনা হয়, তার সঠিক কোনো হদিশ আমরা পাই না। এ-বিষয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে। বৈদিক যুগে সম্ভবতো কোনো সাধারণ-গ্রন্থাগার এদেশে ছিল না। কারণ, ইতিহাস-ই বলে যে, বৈদিক-যুগের গ্রন্থাদি প্রধানত শ্রুতির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—ব্যাপকভাবে লিখিত গ্রন্থপ্রকাশের কোনো ব্যবস্থা সে-যুগে হয়নি। বৌদ্ধযুগেও হয়েছিল কিনা সে-বিষয়েও ইতিহাস কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় না। বৌদ্ধযুগের নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা তক্ষশীলা-বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, ঐ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত গ্রন্থের কোনো সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ছিল কিনা সে-বিষয়ে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা কিংবা গবেষকরা আজও কোনো সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেননি। নালন্দা অথবা তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিপত্রের হয়তো কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু গ্রন্থাগার বলতে আমরা যা বুঝি, সে রকমের কোনো গ্রন্থাগার তখনও হয়তো গ'ড়ে উঠতে পারেনি।

ভূমিকা

সম্ভবতো বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগেই এদেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। আর, বিভিন্ন মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সব প্রাচীন পুঁথিপত্রের ভাণ্ডার। যেটুকু তথ্য ও প্রমাণ আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাই, তা থেকেই জানা যায় বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের মন্দির-গ্রন্থাগারগুলি শুধু পণ্ডিত ও পুরোহিতরাই ব্যবহার করতেন না, সেইসব গ্রন্থাগার সাধারণের জন্যও উন্মুক্ত থাকত। কাজেই, সেগুলি যে সাধারণ-গ্রন্থাগার বা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরিরই সমগোত্রীয় ছিল সে-কথা বললে বোধকরি অত্যুক্তি বা অসঙ্গত হবে না। শুধু যে মন্দিরেই এ-জাতীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল তা নয়, বিভিন্ন মঠেও সে-যুগে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের এইসব মঠ-মন্দিরই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোটবড় বিভিন্ন কেন্দ্র।

ভারতে গ্রন্থাগার স্থাপনের সূচনা

শোনা যায় শঙ্করমঠে বিরাট একটি গ্রন্থাগার ছিল। মহাত্মা শঙ্কর নিজে সেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। গ্রন্থাগারিক ছাড়াও আরও কয়েকজন কর্মচারী ছিল সেই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে। তাঁরা যেভাবে পুঁথিপত্রের তালিকা রচনা করতেন, যেভাবে তার হিসাব রাখতেন তার মধ্যে বেশ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-ই পালিত হ'ত। প্রাচীন ভারতের মঠ-মন্দিরে অবস্থিত সেই সব সাধারণ-গ্রন্থাগারের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল সে-ইতিহাসও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। বিভিন্ন কালে, যেভাবে বিদেশীদের বা বিধর্মীদের আক্রমণে এদেশের বিভিন্ন মঠ-মন্দির ধ্বংস হয় তাতে ক'রে যে গ্রন্থাগারগুলিও নষ্ট হয়ে যায় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাগারসমূহ

সোমনাথ-মন্দির, বিশ্বনাথ-মন্দির, কামাক্ষা-মন্দিরে যে ভয়াবহ আক্রমণ চলে তার ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত। ভারতের পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে এইভাবে আরও যে কত মঠ-মন্দির বিধর্মীদের আক্রমণে কলঙ্কিত হয় তার ইয়ত্তা নেই। তবে সব ক্ষেত্রেই যে মঠ-মন্দিরে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি একবারে নষ্ট হয় তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো, আক্রমণের সম্ভাবনা দেখেই মন্দিরের পুরোহিতেরা গ্রন্থাদি কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আবার আক্রমণকারীরা পুঁথিপত্র লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। মন্দির-পুরোহিতেরা যেসব মূল্যবান পুঁথি সরিয়ে ফেলেন, পরবর্তীকালে কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে তার কিছু-না-কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের ইতিহাস থেকেই এ কথা জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম হ'লো সাগাই। সেই সাগাই গ্রামে স্তম্ভ-সমন্বিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে কানাড়া ভাষায় খোদাই-করা একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, ঐ মন্দির একাদশ শতকের মাঝামাঝি কোনো সময়ে নির্মিত হয়। আর, ছয়টি গ্রন্থাগার ছিল ঐ মন্দিরে। কিন্তু সেই গ্রন্থাগারগুলি কেমন ছিল, কিভাবে পরিচালিত হ'ত আর শেষ পর্যন্ত সেগুলির পরিণামই বা কী হ'লো সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো আলোকপাত করতে পারেননি।

মুসলমান আমলের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে অনেক নবাব-বাদশাই তাঁদের নিজেদের দেশে তাঁদের প্রাসাদে গ্রন্থাগার স্থাপন করতেন। দেখাদেখি দরবারের অনেকেও নিজেদের বাড়িঘরে গ্রন্থাগার রেখে নিজেদের পদগৌরবের পরিচয় দিতেন। অর্থাৎ বাড়িঘরে একটা লাইব্রেরি রাখা যেন সেকালের দরবারী সভাসদ্ রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে একটা কর্তব্য ছিল। ঐ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তাঁরা যেন নিজেদের কৌলীন্য প্রচার করতে চাইতেন, বিশেষ ক'রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা স্থাপনের ক্ষেত্রে। ভারতেও যেন তাঁরা সেই ঐতিহ্য বহন ক'রে এনেছিলেন। সাজাহান-পুত্র দারার বিরাট একটি লাইব্রেরি ছিল দিল্লীতে। দারা নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি। দেশ-বিদেশের বহু পুঁথিপত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন—বিশেষ ক'রে ধর্মগ্রন্থ। যে-বাড়িতে দারার সেই গ্রন্থাগার ছিল এখন সেখানে দিল্লীর পলিটেক্‌নিক্ স্থাপিত হয়েছে। দারার সংগৃহীত সেই সব প্রাচীন পুঁথিপত্র যে কোথায় গেল তার কোনো হদিশ আমরা পাই না। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে এদেশে যেমন মন্দির-গ্রন্থাগারের প্রচলন হয়েছিল, মুসলমান আমলে তেমনি হয়েছিল প্রাসাদ-গ্রন্থাগারের। এদেশে মুসলমান ও হিন্দু রাজন্যবর্গ এইভাবে বহু গ্রন্থাগারের পত্তন করেন। ঊনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারাই বজায় ছিল এদেশে। কিন্তু পাবলিক-লাইব্রেরি বা সাধারণ-গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায়, তখনও পর্যন্ত তা গ'ড়ে ওঠেনি। রাজন্যবর্গের প্রাসাদ-গ্রন্থাগারের অনেকগুলি আবার ইংরেজ আমলে লুণ্ঠিত হয়। টিপু সুলতানের প্রাসাদ-গ্রন্থাগারের যেসব পাণ্ডুলিপি লুণ্ঠিত হয় তার কিছু কিছু আসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইংরেজ-সরকারের দান হিসাবে। বেশির ভাগ পাণ্ডুলিপি অবশ্য চালান

মুসলমান আমলের প্রাসাদ-গ্রন্থাগার

যায় বিলেতে। ঐসব পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই অনেক মূল্যবান তথ্যসংবলিত। মুসলমান আমলে ভারতে ছাপা বইয়ের প্রচলন হয়নি। কাজেই, সে-যুগের লাইব্রেরিতে যেসব বই ছিল তার অধিকাংশই হাতে-লেখা পুঁথি।

ইংরেজ আমলেই এদেশে ছাপা-বইয়ের প্রচলন হয় এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ-গ্রন্থাগারও গ'ড়ে উঠতে থাকে। সর্বপ্রথম কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই রকমের তিনটি পাবলিক-লাইব্রেরির গোড়াপত্তন হয় ইংরেজ পণ্ডিত ও সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগে। 'ক্যালকাটা লাইব্রেরি'টি ছিল 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (বর্তমানে শুধু 'এশিয়াটিক সোসাইটি')-এর একটি অঙ্গ। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর উদ্যোগে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' স্থাপিত হয়। স্যার জোন্স একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হয়ে তিনি এদেশে আসেন। নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে ভারতবাসীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কল্যাণে তিনি এই যে প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে তোলেন সেজন্য এদেশের শিক্ষিতমাত্রেই চিরকাল তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। শোনা যায়, স্যার জোন্স হুগলীর তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব বাড়িটি তৈরি হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তখনও কিন্তু সোসাইটির লাইব্রেরিটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। সেটি উন্মুক্ত হয় কয়েক বছর পরে। বোম্বাই লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক একটি গ্রন্থাগার হিসাবে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই লাইব্রেরির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ের সাহিত্য-সমিতি। এই সমিতি 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র বোম্বাই শাখা নামেই একসময়ে পরিচিত ছিল। কিন্তু, বোম্বাই লাইব্রেরির প্রথম যুগে সেখানে কোনো ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার ছিল না। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি এই অবস্থার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু, প্রতিবাদে কোনো ফল হ'লো না দেখে তাঁরা স্বতন্ত্র একটি পাবলিক-লাইব্রেরি স্থাপনে উদ্যোগী হন। তারই ফলে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পীপল্‌স্ লাইব্রেরি অব বম্বে'। পূর্বোক্ত লাইব্রেরিটি অবশ্য পরে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। মাদ্রাজ-লাইব্রেরিটিও গ'ড়ে উঠে মাদ্রাজের সাহিত্য-সমিতির একটি শাখা হিসাবে ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি। ইউরোপীয় কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সহধর্মিনীরাই ছিলেন এই লাইব্রেরির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের চাহিদা ছিল অবসর-বিনোদনের উপযোগী সাহিত্য—যথা গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। তাই ঐ জাতীয় বই-ই বেশী সংগৃহীত হয় মাদ্রাজ-লাইব্রেরিতে।

ইংরেজ আমলে সাধারণ-গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতের কয়েকটি বড় বড় শহরে, জাদুঘরের সঙ্গেও গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে এই জাতীয় যে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এখনও তা বর্তমান আছে। লাহোর অবশ্য এখন আর ভারতের অন্তর্ভুক্ত

নয়। এই সব গ্রন্থাগারে জাদুঘরের উপযোগী গ্রন্থাদিই বেশী পরিমাণে সংগৃহীত হয়। শুধু যে জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ ও গবেষকরাই এইসব লাইব্রেরি ব্যবহার করতেন তা নয়, বাইরের লোকও এখানে এসে পড়াশোনা করতেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন, তখন ভারতের রাজধানী কলকাতায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির মতো কোনো গ্রন্থাগার নেই লক্ষ্য করেন। ফলে প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'—স্বাধীনতা লাভের পর যার নাম হয়েছে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যেসব লাইব্রেরি তাতে যুক্ত হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ-গ্রন্থাগার বা পাবলিক-লাইব্রেরির পর্যায়ে সেগুলি পড়ে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যেই ঐ সব গ্রন্থাগারের ব্যবহার সীমাবদ্ধ.

জাদুঘরের সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন—ন্যাশনাল লাইব্রেরি

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞান-বিস্তারের সম্ভাবনা যে বিরাট ও ব্যাপক, সর্বকালে ও সর্বদেশে তা স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের যে নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে জাতির পক্ষে তা বিশেষভাবেই কল্যাণকর। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জাতীয়-সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা। ১৯৪৮-সালে মাদ্রাজে, তারপর আরও কয়েকটি রাজ্যে 'গ্রন্থাগার আইন' পাস হয়েছে। এই আইনের বলে গ্রন্থাগার-কর ধার্য ক'রে রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাবে। যে-সব রাজ্যে এই জাতীয় আইন নেই, সে-সব রাজ্যের সরকারও কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে নেই। কার্যত প্রত্যেক রাজ্য-সরকারই গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি ক'রে কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার বা স্টেট লাইব্রেরি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারের পরিচালনাধীনে আবার প্রত্যেক জেলায় গ'ড়ে উঠছে একটি ক'রে জেলা-গ্রন্থাগার। সেই জেলা-গ্রন্থাগারের অধীনে আবার পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক-গ্রন্থাগার। প্রত্যেক গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীরা যাতে গ্রন্থাগারের সুবিধাগুলি পায় সেজন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে বই পাঠাবারও ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ-গ্রন্থাগার স্থাপন ক'রেও বিভিন্ন রাজ্যসরকার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সুবিধা সম্প্রসারিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৪-সালে ভারত-সরকার 'ডেলিভারি অব বুক্‌স্ (পাব্‌লিক লাইব্রেরি) অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করায় কলকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অনুরূপ দু'টি গ্রন্থাগার ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই ও পত্রপত্রিকা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলকভাবেই সংগ্রহ করতে পারছে। ১৯৬১-সালের মধ্যে দিল্লীতে যে 'কেন্দ্রীয় জাতীয়-গ্রন্থাগার' স্থাপিত হবার আয়োজন চলেছে, সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার তারই অধীনে পরিচালিত হবে। গ্রন্থাগার-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে যেভাবে সাফল্যলাভ করছে তা থেকেই আমরা আশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি ক'রে গ্রন্থাগার দেখতে পাব।

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য—উপসংহার

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি

ভূমিকা

যে-কোনো দেশের অধিবাসীই তার নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা গর্বের ভাব পোষণ করে। মানবজাতির এ একটা স্বাভাবিক ও সহজাত ধর্ম। ভারতবাসী হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমরা এইরকম গর্বের ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। সমগ্র এশিয়া-ভূখণ্ডে ভারত ও চীনের সংস্কৃতিই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রধানত, ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই এই দুই মহাদেশের সংস্কৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়।

দূর-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি

ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিলেই আমরা দেখতে পাব যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের সংস্কৃতি পৃথিবীর যে-সব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া—এমন কি চীন-ও। এই প্রসঙ্গে অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার নামও এসে পড়ে। কিন্তু, শেষোক্ত দেশগুলিতে যে-সময় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, সে-সময় এশিয়ার পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায়, তারা সভ্যতার দিক থেকে অনেকটা পিছনে প'ড়ে ছিল। তাছাড়া, ভারত থেকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত করা ততটা দুঃসাধ্য ছিল না যতটা দুঃসাধ্য ছিল হিমালয় অতিক্রম ক'রে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া ও চীনে যাওয়া। ফলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি যত সহজে বিস্তার লাভ করে, তত সহজে কিন্তু উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রসার লাভের সুযোগ পায়নি। ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প ও দর্শনেই শুধু প্রভাব বিস্তার করেনি, তাদের সমাজ-জীবনকেও অনেকটা প্রভাবান্বিত করে। আর, ধর্মের দিক থেকে হীনযান বৌদ্ধ-মতবাদ যে এইসব দেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, সে-কথা তো আজ আর অবিদিত নেই।

উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি

উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরনের। আগেই বলেছি, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতোই চীন মহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও সুপ্রাচীন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার পূর্ব পর্যন্ত, চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদিকে পূর্ব তুর্কীস্থান থেকে শুরু ক'রে জাপান, অন্যদিকে সাইবেরিয়া থেকে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই, উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি যেদিন অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়, সেদিন তাকে চৈনিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হ'তে হয়। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান এই দুই মহাদেশের মধ্যে তাই কোনোদিন সাংস্কৃতিক বিরোধ দেখা দেয়নি; বরঞ্চ, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই দুই দেশ বড় হয়ে উঠেছিল, বিশেষ

ক'রে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রে। মহাযানপন্থী বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা যেদিন হিমালয় অতিক্রম ক'রে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছিলেন, সেদিন তাঁদের প্রচারিত ভারতীয় দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় মতবাদের প্রতি ঐ সব দেশের অধিবাসীরা কোনো বিরূপাচরণ করেন নি। ফলে, বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও চীন ভূ-খণ্ডে। খ্রীষ্টীয় শতকের বহু পূর্ব থেকেই এইভাবে চৈনিক সভ্যতায় প্রভাবান্বিত দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটতে থাকে।

চীনের হান্-বংশীয় সম্রাট্ মিং তি একদিন স্বপ্নে অমিতাভ বুদ্ধের যে অসামান্যতা অনুভব করেছিলেন, তার ফলেই তিনি যে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ ক'রে চীনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন—সে কাহিনী আজ আর অবিদিত নেই। চীন মহাদেশের লোয়্ আং নামক একটি জায়গাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সাংস্কৃতিক-মঠের নাম দেওয়া হয়েছিল—'শ্বেতাশ্ব'। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে যে দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীন মহাদেশে সর্ব-প্রথম পৌঁছেছিলেন, তাঁরা এই মঠেই বাস করতেন। এখানে ব'সেই তাঁরা চীনা ভাষায় বহু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং চীন জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রয়াস পান। এর পরে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু ভারতীয় ও চৈনিক পণ্ডিত একসঙ্গে ব'সে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে বিরাট চীন-ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করেন দুই দেশের সাংস্কৃতিক মিলন-ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। অনুবাদের মাধ্যমেই এইভাবে চীন-ভারতের জনগণ দুই দেশের দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। বিরাট এই সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে যাঁদের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন—কুমারজীব, পরমার্থ, বোধিরুচি, হিউয়েন-সাং, ই-চিং ও দানপাল। এইভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে চীন মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়। আর লক্ষ লক্ষ চীন নরনারী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। ভারতের একটি ধর্ম এইভাবে এশিয়ার একটি সুসভ্য দেশে আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী চীনের জনগণকে এক নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। আর, এই পথেই ভারত ও চীনের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে একটা প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। চীনের তুং-হুয়াং, য়ুন-কাং, লংমেন ও মাইচি-সানের বিরাট বিরাট গ্রন্থাগারে এখনও সেই প্রাচীন চীন-ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, হিমালয়ের উত্তরভাগের সুবিস্তৃত ভূ-খণ্ডে যেসব বৌদ্ধবিহার আজও দাঁড়িয়ে আছে, সেসব পীঠস্থান শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র তাই নয়, প্রাচীন ভারতের বিরাট এক ঐতিহ্য সংরক্ষিত রয়েছে ঐ-সব মঠে ও মন্দিরে। প্রায় ৩৬২ খ্রীঃ অব্দে চীনদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলে। প্রতিবেশী

চীন-মহাদেশে ভারতীয়-সংস্কৃতির বিস্তার

এক চীন-শাসক উত্তর কোরিয়ার রাজা পিয়েং য়াং-এর কাছে বুদ্ধের এক মূর্তি পাঠান। সেইসঙ্গে তাঁর কয়েকজন পুরোহিতকেও পাঠান বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে। উত্তর কোরিয়ার রাজা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধমূর্তি গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে প্রভাবান্বিত হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেষ্টাতেই উত্তর-কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। আর, কয়েক শতকের মধ্যে কোরিয়ার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ব্যবসায় ও ধর্মানুষ্ঠানে দেখা দেয় বিরাট এক পরিবর্তন। শুধু চীন থেকেই স্থপতি, ভাস্কর, ব্যবসায়ী ও পুরোহিতদের সমাগম হয় না, সুদূর পারস্য, তিব্বত ও ভারতবর্ষ থেকেও তাঁরা আসেন কোরিয়ায়। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সেই সব প্রাচীন নিদর্শন এখনও কোরিয়ার বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি যেমন সাক্ষ্য দেয় হিন্দুধর্মের, তেমনি বৌদ্ধধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ, মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি থেকে। কোরিয়ায় বৌদ্ধ-সাহিত্যের যে-সব প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের সূচনা হয় ৫৫২ খ্রীঃ অব্দের কোনো এক সময়। কোরিয়ার এক রাজা জাপানের দরবারে এক দূত পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমেই সভ্যতার উচ্চতর অঙ্গ হিসাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পক্ষে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে এতদিন যেভাবে চীন মহাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিল ছিল, তাতে ক'রে তাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা কঠিন বা দুঃসাধ্য হয়নি। বরং, বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত সুরটি তাদের হৃদয়তন্ত্রে এমন গভীরভাবে গিয়ে আঘাত করে যে, তা অতি সহজেই বৌদ্ধধর্মকে মেনে নেয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে জাপানের চিন্তাশীল যে দুইজন সমাজ-সংস্কারক, অর্থাৎ, দেন্‌গ্যো দাইশী ও কোবো দাইশী, তেন্‌দাই ও শিঙ্গন নামে যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, প্রকৃতপক্ষে তা ভারতীয় বৌদ্ধ মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রায় বারোটি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে যাঁরা ধ্যান ও ভক্তিকে প্রাধান্য দেন, তাঁদের অনুগামীরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া চীনা ত্রিপিটকের আধুনিক জাপানী সংস্করণও এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। চীনা ত্রিপিটকের ওপরে ভিত্তি ক'রেই জাপানী বৌদ্ধধর্ম গ'ড়ে উঠেছে। জাপানী ভাষায় প্রকাশিত এইরকম একখানি ত্রিপিটক গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে—তাইশো। জাপানের একদল পণ্ডিতের উদ্যোগে ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের সূচনা ও সংস্কৃতির প্রসার

সংস্কৃত-ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যের যে পাণ্ডুলিপি গত শতাব্দীতে ভারতের বাইরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা তালপাতায় লেখা। ঐ মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে জাপানের হোরিউজীর মন্দিরে। সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটি বছর

কয়েক আগে বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও, একে এখনও বৌদ্ধ শিল্পকলার একটি বিশেষ সংরক্ষণাগার হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

বহির্ভারতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন নিদর্শন

তাছাড়া জাপানের শিল্প ও ধর্ম কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তার সাক্ষ্য তো বহন করছে ক্যোতো শহরের অসংখ্য বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, নারার বিরাট বুদ্ধমূর্তি, আর বিখ্যাত তোদিজী-মন্দিরের ঘণ্টা। নারার বুদ্ধমূর্তিটি নির্মিত হয় ৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে। আর, এইটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তি।

সময়ের হিসাব থেকে বিচার করলে, এর পরেই যে-দেশটি ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তা হ'লো তিব্বত। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় বিরাট এক ব্যবধান রচনা করেছিল এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে। কিন্তু সেই হিমালয়কে অতিক্রম ক'রেই ভারতের ধর্ম-প্রচারকেরা গিয়েছিলেন তিব্বতে এবং সেখানে ভারতীয় ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিরও প্রচার ক'রে এসেছেন। তিব্বতের প্রথম সম্রাট স্রোন্‌বৎসান্‌-গাম্‌-পো সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে একজন তিব্বতীয় দার্শনিক পণ্ডিতকেও পাঠিয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই পণ্ডিতের নাম থন্‌-মি-সাম্‌ভোটা। তিব্বতে সে-সময় কোনো বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল না। থন্‌-মি-সাম্‌ভোটা যাতে ভারতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত ক'রে

তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

তিব্বতীদের জন্য কোনো বর্ণলিপি উদ্ভাবন করতে পারেন, এবং একটি তিব্বতী ব্যাকরণ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন—তিব্বতের সম্রাটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাই। তাঁর এই উদ্দেশ্যের পিছনে ছিল একটা বিশেষ মনোভাব। তিনি চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশগুলিকে তিব্বতী ভাষায় প্রকাশ ক'রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে। থন্‌-মি তাঁর এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় তিব্বতী বর্ণলিপি উদ্ভাবিত হয় এবং তিনিই প্রথম তিব্বতী ব্যাকরণ রচনা করেন। কালক্রমে, তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপক প্রচার হয়, তার পিছনে তাঁর চেষ্টা অনেকখানি। তিব্বতী ভাষায় তিনি কয়েকখানি বোধিগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের বিকাশে দু'জন ভারতীয়ের নামও এই প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন—গুরু পদ্মসম্ভব ও অতীশ। পদ্মসম্ভব কাশ্মীর থেকে তিব্বত যান অষ্টম শতাব্দীতে। সেখানে গিয়ে তিনিই প্রথম ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরে একটি বিরাট বৌদ্ধমঠ স্থাপন করেন। আর অতীশ একজন বাঙালী বৌদ্ধ-পণ্ডিত, যাঁর খ্যাতি অম্লান হয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাসে। এক বৌদ্ধ পরিব্রাজকরূপে ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে যান। সেখানে সুদীর্ঘ তের বছর ধ'রে তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপনা ক'রে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিব্বতেই তিনি দেহত্যাগ করেন, এবং লাসা থেকে কুড়ি মাইল নীচের দিকে ন্তেতাং-এ এখনও তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পাওয়া যায়। তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলি আকৃতি ও গঠন-আঙ্গিকের সঙ্গে ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা কিংবা ওদন্তপুরীর বৌদ্ধবিহারগুলির

বিশেষ মিল আছে। তাছাড়া, তিব্বতে যেসব বহু-প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তা থেকেই বোঝা যায় তিব্বতের সঙ্গে ভারতীয় সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ।

এবারে মঙ্গোলিয়ার কথা। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এই ভূ-খণ্ডেও একদিন মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পদার্পণ করেছিলেন এবং তাঁদের চেষ্টাতেই মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে ভারতের একটা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে। এই ব্যাপারে তিব্বতের একটি বৌদ্ধমঠও বিশেষ সহায়তা করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধধর্ম সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করে নি। সে যাই হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়ার আল্‌তান্ খাগান যখন তিব্বতের তৃতীয় দালাই লামাকে নিজের ধর্মগুরু ব'লে স্বীকার ক'রে নেন, তখন থেকেই মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মঙ্গোলিয়ার বহু পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন ক'রে বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী মঙ্গোলিয়ান ভাষায় প্রচার করেছেন। ভারতীয় পুঁথি-পুরাণের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। মঙ্গোলিয়ার বহু পণ্ডিত যেভাবে শাস্ত্রগ্রন্থাদির অধ্যাপনা করেন তার সঙ্গে যদি বারাণসীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর অধ্যাপনা-ভঙ্গিমার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তাহ'লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বোধ করি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি।

মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—উপসংহার

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন

ভূমিকা

ইংরেজ-রাজত্বে ভারতে রাষ্ট্রভাষা ব'লে কোনো কিছু না থাকলেও, সরকারী-ভাষা হিসাবে ইংরেজিরই ছিল প্রাধান্য এবং উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি-ভাষাই স্বীকৃতিলাভ করেছিল এদেশে। দেশ স্বাধীন হবার পর কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিদেশী ভাষাকে আজ আর সরকারী-ভাষা হিসাবে কিংবা শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করতে অনেকেই নারাজ। আজ তাই প্রয়োজন হয়েছে এমন একটি রাষ্ট্রভাষার, যে-ভাষা ভারতের সকল অধিবাসীর পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে-ভাষায় সরকারী কাজকর্ম চলবে। রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমেই দেশের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব ব'লেও অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন্দ্রীয়-সরকার ইতিমধ্যেই হিন্দী-কে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং ধীরে ধীরে হিন্দী-ই যাতে বিদেশী ইংরেজী-ভাষার স্থান গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ব্যাপকভাবে হিন্দী-প্রচারের ব্যবস্থাও হয়েছে।

হিন্দী বনাম ইংরেজীর বিতর্কে মাতৃভাষা যেন ক্রমশই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। কিন্তু, এরকমটা যেমন হবার কথা নয়, তেমনি হওয়া উচিতও নয়। রাষ্ট্রভাষা যাই হোক না কেন, শিক্ষার বাহন মূলত মাতৃভাষাই হবে,—কারণ তাই হ'লো বাস্তবসম্মত যুক্তি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সর্বপ্রথম যে-ভাষা শিক্ষা করে, চিন্তার জগতে আজীবন সেই ভাষাটিই হয় তার প্রধান সম্বল। আর, সাধারণত সকলেরই ভাষাজ্ঞানের ঐ প্রধান সম্বলটি মাতৃভাষা হওয়ার জন্য পরবর্তী জীবনের সকল চিন্তাই ঐ ভাষা দ্বারা পরিচালিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম বর্জন ক'রে কাউকে যদি অন্য কোনো ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করতে বাধ্য করা হয়, তাহ'লে পদে পদেই হয় বিড়ম্বনা। এতে শুধু অযথা মানসিক পরিশ্রমই হয় না, সময়েরও অযথা অপব্যয় হয়। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন সে-বিষয়ে কোনো দেশেই কোনো মতভেদ নেই।

মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন

কিন্তু সমস্যা হ'লো বহুভাষী এই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে। শাসনকার্যের দিক থেকে সুবিধাজনক হবে মনে ক'রে ব্রিটিশ-সরকার একদিন যে ইংরেজী-ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ এখনও সে-ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছে। কারণ, দু'শ বছরের ঐতিহ্য রাতারাতি বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের কয়েকটি ভাষাও যখন সমৃদ্ধ, তখন আর কেন বিদেশী ভাষার জের টেনে চলা? এক হিসাবে এ-যুক্তিও বিশেষ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু, সমস্যা হ'লো ভারতের কোন্ ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেব? ভারতের চোদ্দটি ভাষা প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে তার মধ্যে হিন্দীভাষাই ভারতের অধিকাংশ লোকের মৌখিক ভাষা। কিন্তু, আর্যাবর্তে হিন্দী-ভাষা সু-প্রচলিত হ'লেও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দীর তেমন প্রচলন নেই। তাছাড়া, ভারতের এক এক অঞ্চলের কথ্য-হিন্দীও এক এক রকম। হিন্দী-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করাতে তাই বিভিন্ন রাজ্যে একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে। সে যাই হোক, ভারত-সরকার স্থির করেছেন যে, দেশের শাসনকার্য-সম্পাদনে এবং সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনে সুবিধাজনক হবে ব'লে সংস্কৃতানুগ হিন্দীভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিতে হবে। তবে, বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী-ভাষা হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, সর্বভারতীয় প্রসাশনিক কাজে হিন্দী-ভাষা যেমন ইংরেজী-ভাষার স্থলাভিষিক্ত হবে, তেমনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজে হিন্দী অথবা আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত থাকবে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের সরকারী-ভাষা হবে হিন্দী এবং বাংলা; উড়িষ্যার সরকারী-ভাষা হবে হিন্দী এবং ওড়িয়া, অন্ধ্রের সরকারী-ভাষা হবে হিন্দী এবং তেলেগু। মোট কথা, ইংরেজিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্জন করতে হবে; কি প্রশাসনিক কাজে, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে। সারা ভারতে হিন্দী-ভাষা যাতে দ্রুত প্রসার-

রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দীর প্রচলন

লাভ করে সেজন্য কেন্দ্রীয়-সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন। রাষ্ট্রভাষা-প্রসার-সমিতিগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এ-কাজে ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহ'লে শিক্ষার ক্ষেত্রেই তার ভিত্তি রচনা করতে হবে। কারণ, ইংরেজিও ঠিক এইভাবে শিক্ষা-নিকেতনের পথ ধ'রে ভারতীয়-সমাজে একদিন প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। কিন্তু, সবভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দী-কে কোনোমতেই শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রত্যেক রাজ্যে শিক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে সেই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। হিন্দীকে অবশ্য মধ্যশিক্ষা-পর্যায়ের অন্যতম আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রভাষা যখন হিন্দী-ই, তখন প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীর পক্ষে হিন্দীভাষা শিক্ষা না করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হিন্দী জানা না থাকলে সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রে সেটা প্রধান একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা, শিক্ষার বাহন-রূপে আঞ্চলিক মাতৃভাষাকে গ্রহণ না ক'রে কোনো উপায় নেই।

শিক্ষার বাহন-রূপে আঞ্চলিক মাতৃভাষা

দেশের একদল কিন্তু ইংরেজি-ভাষাকে বর্জন করতে নারাজ। তাঁদের মতে হিন্দী-ভাষা এমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি যাতে ক'রে সে-ভাষা ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে। তাঁরা বলেন, যতদিন না হিন্দী-ভাষা সু-সমৃদ্ধ হচ্ছে ততদিন ইংরেজি-ভাষাই সরকারী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে চালু থাকুক। মুখে তাঁরা এ-কথা বললেও মনে মনে কিন্তু ইংরেজি-ভাষারই গোঁড়া সমর্থক। তাঁদের মতে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপেও আঞ্চলিক মাতৃভাষা কার্যকরী নয়। হিন্দী বনাম ইংরেজির বিতর্ক এমন একটা মোড় নিচ্ছে যাতে ক'রে এই ধারণাই আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন ইংরেজি শেখা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার কথা উঠছে এবং ইংরেজী না শিখলে আমাদের চরম সর্বনাশ হবে। কিছুটা ঐতিহাসিক কারণে, তাছাড়া কতকগুলি অস্বাভাবিক ও সঙ্কীর্ণ অভ্যাসের ফলেও এই রকমের ধারণা এখনও কিছু কিছু রয়েছে যে, মাতৃভাষার উপরে আমরা কখনই পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না। মাতৃভাষার কার্যকারিতার প্রতি অনাস্থা সম্প্রতি কোনো কোনো মহলে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও যেন তার ব্যতিক্রম নেই! রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রমুখ মনীষীরা পঞ্চাশ বছর ধ'রে মাতৃভাষাকে ন্যায্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে মহৎ চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন সে-চেষ্টা পরিত্যক্ত না হ'লেও তাকে উপেক্ষা করার একটা ঝোঁক আজকাল দেখা যাচ্ছে। জাতির পক্ষে এই মনোভাব আদৌ কল্যাণকর নয়।

মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করার মনোভাব

ইংরেজি-ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ-ভাষা। ইংরেজী-সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তাছাড়া, ইংরেজি শেখার যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কোনো মহলে সংশয় নাই। তবে এদেশের লোকের পক্ষে কতটা ইংরেজি শেখা প্রয়োজন এবং সম্ভব, সে-প্রশ্ন এড়িয়ে মনগড়া একটা আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরে চাপালে ফল

কখনও ভালো হ'তে পারে না। কিছুকাল পূর্বে একজন কানাডা-দেশীয় কোনো বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ছয় থেকে এগার বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের পক্ষে সহজে এবং ভালোভাবেই ইংরেজি শেখা সম্ভব। কিন্তু এদেশের 'নিখিল ভারত প্রাথমিক-শিক্ষা পর্ষদ্' বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশেষ ধরনের 'মডেল স্কুলে' মেধাবী শিশুরা হয়তো কানাডা-দেশীয় ঐ বিশেষজ্ঞের পদ্ধতিতে ইংরেজি সহজেই শিখতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সেই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখা ও শেখানো সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইংরেজি কতটা শেখা উচিত ও সম্ভব এবং কাদের পক্ষে সম্ভব, এই গুরুতর প্রশ্ন বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতেই হবে এমন ধুয়া ধ'রে থাকলে শক্তির অযথা অপচয় ঘটবে। এমন অপচয় এতকাল ধ'রেই চ'লে এসেছে। এখন আবার নতুন করে দেশশুদ্ধ ইংরেজি-নবিস তৈরির জন্য পণ্ডশ্রম করা সঙ্গত হবে না। প্রথমত, দেশশুদ্ধ-লোকের পক্ষে ইংরেজি শেখা কখনও সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, যত লোক দায়-সারা গোছের ইংরেজি শেখে, তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োজনের অভাবে ইংরেজি প্রায়ই ভুলে যায়। কথা উঠেছে যে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার জন্য ইংরেজি শেখা প্রয়োজন। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও কিছু লোককে ভালমতো ইংরেজি শিখতেই হবে। মোটামুটি ভাবে এ-দুটিই সঙ্গত যুক্তি। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা আমাদের মাতৃভাষায় প্রবাহিত করার চেষ্টা অবহেলিত হবে কেন? গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ইংরেজির উপরে নির্ভর ক'রে থাকার ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে পারলে মাতৃভাষাতেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সহজ ও প্রশস্ত করা সম্ভব। প্রথম যখন প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তখন অনেক ইংরেজি-নবিস রব তুলেছিলেন যে, এ-ব্যবস্থা কখনও কার্যকরী হবে না। এখন কিন্তু তাঁদের সে সন্দেহ দূর হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও বি-এ ও বি-টি পর্যন্ত অনেক বিষয়ে বাংলায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-গ্রহণ চলেছে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি, ধারণা, প্রকাশ-ক্ষমতা ইত্যাদির মান ক'মে গেছে ব'লেও কোনো অভিযোগ শোনা যায় না। কাজেই, ভাষা হিসাবে ইংরেজি কিংবা রাষ্ট্রভাষা হিন্দী নির্দিষ্ট পরিমাণে শেখা প্রয়োজন হ'লেও, শিক্ষার বাহন প্রত্যেক স্তরেই আঞ্চলিক মাতৃভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজি-ভাষা বনাম মাতৃভাষা

কোনো দেশেই বিদেশীভাষাকে কখনও শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয় না। বহুভাষী দেশে যেখানে রাষ্ট্রভাষা এক কিংবা একাধিক, সেখানে হয় রাষ্ট্রভাষা না হয় আঞ্চলিক ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হ'লেও এখনও সে-ভাষা দেশের সকল অঞ্চলে প্রসার বা সমাদর

লাভ করেনি। যতদিন না হিন্দীভাষা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষারূপে দেখা দিচ্ছে ততদিন প্রত্যেক রাজ্যেই যে সরকারী-ভাষা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা গৃহীত হবে সে-কথা বলা বাহুল্য। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ইংরেজি শিক্ষার অভিমানকে প্রশয় দিয়ে মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির সংকল্প শিথিল করা কখনই উচিত নয়। উপসংহার

বাংলা উপন্যাস ও

ভূমিকা

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর, দেশে গদ্য রচনায় ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু, উনবিংশ শতকের এই প্রারম্ভ-কালে সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টির বিশেষ কোনো উদ্যোগ ছিল না। প্রয়োজনের কড়া তাগিদে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীরা একদিকে যখন পাঠ্যপুস্তকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি হুগলীর মিশনারী-সম্প্রদায় ধর্মবিষয়ক পুস্তক প্রকাশে ব্যস্ত। নিছক সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয় অনেক পরে। বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগেই গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু, সে-সাহিত্য সার্থক রূপ পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই।

বাংলা-উপন্যাসের সূচনা

উপন্যাস বলতে আমরা যে বিশেষ শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্য বুঝি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারা থেকেই আমাদের দেশে তার উদ্ভব। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করবার আগে টেকচাঁদ ঠাকুর, ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে তৎকালীন বঙ্গসমাজে বেশ একটা সাড়া জাগিয়ে তুলে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বইখানিকে 'বাংলা-সাহিত্যের আদি উপন্যাস' বলে অভিনন্দিত করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল,' বাংলা-সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ হ'লেও, এতে উপন্যাসের মৌলিকতা কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে তা বিবেচনার বিষয়। অসৎ সঙ্গে পড়ে ও সামাজিক দুর্নীতির ফলে ধনী-পরিবারের এক আদুরে ছেলে কিভাবে অধঃপাতের শেষ সোপানে গিয়ে পৌছল, প্যারীচাঁদ তারই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে, সৎচরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি ভালোমন্দের বিচার করেছেন, সমাজ-সংস্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি তাঁর এই বইতে তেমন স্পষ্টতা লাভ করেনি। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই লক্ষণগুলি কোথাও তেমন জোরালো নয়। তবে ভাষার দিক থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল' অভিনবত্বের দাবি রাখে, এবং গল্প হিসাবেও এর একটা আবেদন আছে। তাছাড়া, ব্যঙ্গরচনার সার্থক নিদর্শনরূপেও আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'কে অভিনন্দিত করতে পারি।

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হ'লেও, উপন্যাসের বীজ যে এতে সুপ্ত ছিল, সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। অনেকে আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস,' 'নববিবি-বিলাস' প্রভৃতির মধ্যেও উপন্যাসের লক্ষণ দেখিতে পান। কিন্তু, সমালোচকের দৃষ্টিতে বই দু'খানি সাহিত্যের মর্যাদা লাভের কোনো যোগ্যতাই রাখে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কেউ যে প্রকৃত উপন্যাস রচনা করেছেন তার কোনো প্রমাণ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। বিদ্যাসাগরমশাই সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী বই থেকে বহু অনুবাদ করেছেন এবং সাহিত্য হিসাবেও সেগুলির মধ্যে কয়েকখানি যে সার্থকতা লাভ করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু, মৌলিক কোনো উপন্যাস-রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনুবাদের ছায়া পড়লেও তাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সে-কথা সত্য এবং উপন্যাসের লক্ষণগুলিও কিছু কিছু স্পষ্ট। এর পরেই অসাধারণ কবি-প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে। ইতিহাসের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে এই জাতীয় উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যাকে রোমান্স নামে অভিহিত করা হয়, 'দুর্গেশনন্দিনী'ও সেই ধরনের রচনা। এরপর একে একে 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারানী', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলি সবই উপন্যাস এবং সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) কাল্পনিক (বা রোমান্সধর্মী); (২) ঐতিহাসিক ও (৩) সামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত এবং উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠপুরুষ। ফলে, তাঁর রচনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব স্বভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়-বস্তুর মধ্যে বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত পরিচয় সুস্পষ্ট নয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি অসাধারণ বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্তু বাংলার নিজস্ব সম্পদ। সে-রসবস্তু কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশীয় ভাবে বিকৃত হয়ে ওঠেনি। নরনারীর প্রণয়-বৈচিত্র্য তাঁর উপন্যাসের প্রধান একটি বিশেষত্ব। এজন্য, এদেশে তিনি 'Scott of Bengal' নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাংলাভাষায় এটিই প্রথম রোমান্স—ইংরেজী রোমান্স-এর বাঁধা আদর্শে রচিত। কেবল 'মৃণালিনী'র কল্পনা-মূলে সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেম দেখা দিয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'ও রোমান্স। কিন্তু তার মধ্যে এদেশের আদর্শ আছে, সৌন্দর্য আছে, কল্পনা আছে। প্রকৃতপক্ষে 'কপালকুণ্ডলা' যেন বঙ্কিমের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তারপর সামাজিক সমস্যা ও চরিত্র-নীতির প্রেরণায় রচিত তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। 'চন্দ্রশেখর' ও

'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই একই প্রেরণার ফল। 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ'-এ দেশাত্মবোধ, 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম'-এ ধর্মসমস্যা, 'রজনীতে' মনস্তত্ত্ব এবং ইন্দিরা'তে শুধু কাহিনী-রচনার আনন্দ দেখতে পাই। কোনোরূপ নৈতিক সমস্যা নেই এমন উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের খুবই কম। তাঁর যে যে উপন্যাসে স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম বা নীতির প্রেরণা আছে, সেগুলিতেই যেন তাঁর কল্পনা চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। চারিত্রিক মহিমায় এবং ঘটনাবিন্যাসের চাতুর্যে সেগুলি নাটকীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে সমগ্রভাবে তাঁর রচনাবলীর আলোচনা করতে হবে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে একদিকে যেমন আছে আদর্শবাদ অন্যদিকে তেমনি আছে বস্তুতান্ত্রিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই নিছক আদর্শবাদী লেখক বলা চলে না। দ্বিতীয়ত তিনি একজন কবি। রচনা গদ্য হ'লেও কাব্যরসের ফল্গুধারা তাঁর রচনায় প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। যেখানে নায়িকার বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা—বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে কল্পনাবিলাস, অন্যদিকে সৌন্দর্যসৃষ্টি --এই হ'লো তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিশেষত্ব। তৃতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ'-এ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই। শুধু উপন্যাসেই নয়, বঙ্কিমের প্রায় সবরকম রচনাতেই এই গুণটি আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও, তিনি আদৌ অনুকরণকারী ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করলেও, কোথাও তিনি নিজের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হ'তে দেননি। পাশ্চাত্ত্য উপকরণকে তিনি নিজস্ব প্রতিভায় স্বকীয় ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে আখ্যানভাগ ও ঘটনাবিপ্লবের চেয়ে অন্তর্বিপ্লব ও ভাবের সংঘাতই যেন বহুগুণে প্রকট হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে যে অভিনব মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সজীব ক'রে রেখে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

বাংলা উপন্যাস-রচনায় ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পাতাটি অধিকার ক'রে না থাকলেও সেই ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায় যে তাঁকে নিয়েই রচিত তা বলাই বাহুল্য। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় বলেছেন: "রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রসার পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃতসাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান করাইয়া, তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্তব্যবোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে,

তাঁহারা যে কার্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।" তাঁর উপন্যাস আজ ক্লাসিক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। আজও তা বাংলা-সাহিত্যের লেখকদের নানাভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। রচনানৈপুণ্যে, উদ্ভাবনী-শক্তিতে, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি সত্য সত্যই বাংলার সাহিত্য-সম্রাট্। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—"বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও রাজ-রাজেশ্বর"।

উপসংহার

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বঙ্গজননী রত্নগর্ভা। কত জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর জন্ম হয়েছে এই বাংলাদেশে। বাংলার এই মহান্ সন্তানেরা শুধু যে বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করেছেন তা নয়, সর্বভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের যে অসামান্য দান তারই সাহায্যে ভারতবর্ষ আজ নিজেকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। উনবিংশ শতকের নবজাগরণ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে যে কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'যাঁরা অতীতের জড়-বাধা লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগর-মহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগামী ছিলেন।" প্রকৃতপক্ষে একটা যুগের পরিবর্তন-ক্ষণে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী উদ্যম যেভাবে বাঙালীজাতির আত্মবিকাশে সহায়তা করেছিল তা বিস্ময়কর। এই কারণেই তাঁকে যুগপুরুষ ব'লে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে স্বভাবতই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।

ভূমিকা

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের জন্ম উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮২০ খ্রীঃ অব্দ), মেদিনীপুর-জেলার এক নিভৃত গ্রাম বীরসিংহে। সে-যুগে ইংরেজী-শিক্ষার সবে চল হয়েছে রাজধানী কলকাতায়, কিন্তু গ্রামীণ সমাজে তখনও সংস্কৃত-শিক্ষার প্রাধান্য। সমাজের স্তরে স্তরে তখনও প্রাচীন সংস্কার ও বর্ণকৌলীন্যের আভিজাত্য। বিদ্যাসাগর-মহাশয় যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-পরিবারেও এই সংস্কার ও কৌলীন্য বজায় ছিল দৃঢ়ভাবে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু, এমন পরিবেশ ও এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেও বিদ্যাসাগর যে কিভাবে নিজেকে সর্বসংস্কারমুক্ত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন সে-কথা চিন্তা করলে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। নিজের দৃঢ়সংকল্পে অটুট থেকে এবং মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিভাবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে সর্ববিষয়ে বড় হওয়া যায় বিদ্যাসাগরের

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

সমগ্র জীবনের ইতিহাসই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সোনার চামচ মুখে ক'রে তাঁর জন্ম হয়নি এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই। অথচ, সেই দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য কোনো অবস্থাতেই তাঁর মানসিক বলকে পরাভূত করতে পারেনি। বালক-বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন পড়াশোনার জন্য, সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন ক'রে অধিক রাত্রে পাঠে মনোনিবেশ করেছেন, আলোর অভাবে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বই হাতে নিয়ে, গ্যাসের আলোকে নিজের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করেছেন পুঁথির পাতা উল্‌টে। এইভাবেই তিনি সংস্কৃত-কলেজিয়েট স্কুলের প্রতি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন। শুধু সংস্কৃতেই তিনি পণ্ডিত হননি, বাংলা, ইংরেজি, এমনকি হিন্দীভাষাতেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। জ্ঞানলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে শিক্ষার ক্ষেত্রে জয়পত্র এনে দিয়েছিল এবং তরুণ বয়সেই, বাংলার পণ্ডিত-সমাজ, তাঁকে 'বিদ্যাসাগর'-উপাধিতে ভূষিত ক'রে সম্মানিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর-মহাশয় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকরূপে। পরে তদানীন্তন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান-অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছিল এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র মনে-প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলার প্রতিটি ধূলি-কণার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সংযোগ। বাংলার প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন নাগরিক সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন তিনি। পুরাতনের যা কিছু ভালো, মহৎ ও উদার, তার সঙ্গে নতুনের যা আরও ভালো, মহত্তর ও বেশী উদার এই দুয়ের মধ্যে অপূর্ব এক সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এক জায়গায় লিখেছেন—"অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য-জাতি-সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল; শুধু বাল্যজীবনটা কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই, নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া, দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।” বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরশক্তি, লোকহিতৈষিতা বাঙালীজাতির আদর্শস্বরূপ। তাঁর স্বকীয়-বৈশিষ্ট্য এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ-দ্বারা পরকীয়-বৈশিষ্ট্য গ্রহণের কোনো প্রয়োজনই তাঁর হয়নি। পাশ্চাত্য চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যা-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় সে-সমস্তই তাঁর নিজস্ব কিংবা বংশগত। তার জন্য তাঁকে কখনও বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির কাছে ঋণী হ'তে হয়নি।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের পাণ্ডিত্য যে সাগরের মতোই বিরাট ও গভীর ছিল সে-কথা আজ নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। সংস্কৃত কলেজ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষে তিনি ছিলেন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ। এই শিক্ষক-জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা তুলনাহীন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এক জায়গায় লিখেছেন—“লোকে তাঁহাকে সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়াই জানে, আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষত ফরাসীদেশ-প্রসিদ্ধ কোমৎ-দর্শন বিষয়ে সর্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর-মহাশয় উঠিয়া গেলে মিত্র-মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন: ‘বাবারে, একটা giant, দেখলে কেমন বুদ্ধি-বিদ্যায় দৌড়, মানুষটার যেমন heart, তেমনি head।’…বিদ্যাসাগর-মহাশয় মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।” দেশে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অপরিসীম। তাঁর আন্তরিক চেষ্টাতেই বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারের পথ সুগম হয়। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারেও তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টা বড় কম ছিল না। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন ডেভিড্ হেয়ার। কলিকাতায় ‘বিদ্যাসাগর কলেজ’ (তদানীন্তন ‘মেট্রোপলিটান-কলেজ’)-প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের অন্যতম মহৎ কীর্তি। বহু পাঠ্যগ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ সহায়তা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর সেই ‘বাল্যপাঠ’, ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’, ‘সীতার বনবাস’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ প্রভৃতি গ্রন্থ শুধু যে সেকালেই সমাদর লাভ করেছিল তা নয়, একালেও তার আদর আছে। বাংলা-গদ্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা তিনি। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর থেকেই উন্নত বাংলা-গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ। শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি’-স্থাপন।

পাণ্ডিত্য—দেশের শিক্ষা-বিস্তারে উৎসাহ ও উদ্যম

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা আজও সকলের কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে মনে হয়। একে তিনি ছিলেন সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তান, তার

উপরে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কাজেই, তাঁর মতো একজন লোক যে, এদেশে বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তনে অগ্রণী হবেন সে-কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন অবাক লাগে। কিন্তু, বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েও বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কারমুক্ত এক উদার পুরুষ। বালবিধবাদের দুঃখ দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি মনে করেন যে, এমন কোনো সঙ্গত কারণ নেই যাতে এইসব বালবিধবা চিরকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটাবে। তিনি তাই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। দেশাচারকে উপেক্ষা ক'রে তিনি সেদিন যে-ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে তাঁকে অনেক বাধা ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারও সাধ্য হয়নি দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বালবিধবার বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে যে-পত্র লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন—"আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।" এই সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বলেছিলেন,—"সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়কার কথা জানেন, তাঁরা জানেন যে, তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ ক'রে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলার পথ প্রস্তুত ক'রে গেছেন।"

সমাজ-সংস্কারক রূপে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি তাঁর লোকহিতৈষিতায়। কত দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবার যে তাঁর কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এ-বিষয়ে তিনি সত্যিই ছিলেন 'দয়ার-সাগর'। বাইরে থেকে তাঁকে বজ্রের মতো কঠোর মনে হ'লেও, অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। পরদুঃখকাতরতা তথা মানবিক-করুণাই ছিল তাঁর চারিত্রিক ভূষণ। সেই সঙ্গে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ ও দেশপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। বিদ্যাসাগরের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তিরও কোনো তুলনা নাই। তাঁর কাছে মাতাপিতাই যেন ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা—অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর। বাঙালীর সমাজ জীবনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রভাব অনেকখানি। তাঁর কাছে আমাদের যেন ঋণের অন্ত নাই। আমরা যদি আজ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনাদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি, তাহ'লে শুধু যে সেই ঋণশোধ হবে তা নয়, জাতীয়-জীবনে আত্মবিকাশের প্রকৃত পথও খুঁজে পাব।

লোকহিতৈষিতা—উপসংহার

মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে যখন বাঙালী-সমাজ পাশ্চাত্ত্যের উদগ্র ভোগস্পৃহার আবর্তে প'ড়ে স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে চলেছিল, বাঙালীর ধর্মজীবনে যখন শুরু হয়েছিল ভাঙনের পালা—তখন সেই ভাঙনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন রাজা রামমোহন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন নতুন ক'রে সংকটের সম্মুখীন, সেই সংকট-মুহূর্তে আবার এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্য বিবেকানন্দ যেন সেদিন আর্য সংস্কৃতির ক্রমবিলীয়মান ভাবধারার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় মোহগ্রস্ত হয়ে বাঙালী যেদিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাতে বসেছিল, জাতির সেই সংকটমুহূর্তে এই জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—'উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত।' তাঁদের সামনে তিনি তুলে ধ'রেছিলেন নিষ্কাম কর্মযোগের মহান্ আদর্শ। মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই যে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায় রামকৃষ্ণের সেই বাণীকে তিনি যে শুধু প্রচার করেছিলেন তা নয়, নিজের কর্মজীবনের মধ্য দিয়েই সেই বাণীকে তিনি সত্যে পরিণত ক'রে গিয়েছিলেন।

ভূমিকা

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে একদিন স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হবে তা যেমন পরিবারের কেউ কল্পনা করতে পারেননি, নরেন্দ্রনাথ নিজেও সে-রকম বাসনা কোনদিন মনে স্থান দেননি। শৈশবে তিনি ছিলেন দুরন্ত-প্রকৃতির এবং ধর্মবিষয়েও তাঁর কোনো অনুরাগ ছিল না। স্বাস্থ্যচর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল ব'লে দেহখানিকে মজবুত ক'রে তুলেছিলেন কিশোর-বয়স থেকেই। তাছাড়া, তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, সুদর্শন, তীক্ষ্ণধী ও পরিশ্রমী। সকলেই জানত নরেন্দ্রনাথ বড় হয়ে পিতার মতো বড় উকিল হবে, কিংবা ব্যারিস্টার। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। সত্য-লাভ কিংবা সত্য-দর্শনের একটা আকাঙ্ক্ষা বাল্যাবধি তাঁর অন্তরে যেন সদাজাগ্রত ছিল। কলেজে পড়বার সময় থেকে সেই আকাঙ্ক্ষা যেন প্রবলতর হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ ক'রে একদিকে তিনি যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার ধর্মীয় নেতাদের কথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। কিন্তু কোনো ধর্মনেতাই তাঁর মনের সেই কৌতূহলকে যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করতে পারেননি। ছাত্রজীবনে তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক ও বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনের

সন্ন্যাস-জীবনের সূচনা

সংস্পর্শে আসেন এবং তারই ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ আস্থা জন্মে। কিন্তু, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর যে চিরন্তন প্রশ্ন তার সদুত্তর তিনি যেমন ব্রাহ্মনেতাদের কাছ থেকে পান না, তেমনি ভারতের বহু সাধুসন্তও হার মেনে যান তাঁর যুক্তিতর্কের কাছে। অবশেষে, দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক নিরক্ষর-ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ যেদিন তাঁকে দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন—'আমি তাঁর দেখা পেয়েছি, তোমাকেও দেখাতে পারি।' —সেদিন যেন এক মন্ত্রমুগ্ধতার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মন থেকে সংশয়ের কালোমেঘ দূরে স'রে গেল এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেদিন তাঁকে যোগবিভূতি দান করলেন সেদিন থেকেই শুরু হ'লো নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসজীবন। আর, সেদিন থেকে জাতির সম্মুখে মানব-মন্ত্রের উদ্গাতারূপে দেখা দিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যাই যে-কোনো জাতির পক্ষে বিশেষ একটা সমস্যা। মানবমনের সুকুমারবৃত্তি, সংস্কৃতির যা মূলাধার, তা বিপন্ন হ'লে জাতীয় জীবনধারার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে। পরাধীনতার দুঃখসহ গ্লানিভারে অবনত এই জাতি আত্মানুভূতির পৌরুষ-মহিমা হারিয়ে ব্যর্থ সংস্কার-মোহে যেভাবে নিজেকে ও সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি ও সমাজকে জড়িয়ে ফেলেছে, তার ভয়াবহ পরিণাম স্বামীজী অনেক আগেই যেন উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের মধ্যেই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবসেবাই যে ঈশ্বরসেবা, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই বিশ্বাস যেন জাতির অন্তর থেকে অবলুপ্ত হয়। এই অবস্থা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

নর-নারায়ণের সেবায় দেশের তরুণ-সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ

"The poor, the trodden, the ignorant, let them be your God"— অর্থাৎ, 'দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ, এরাই হোক তোমাদের ঈশ্বর।' মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যেমন 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' এই ভাব হয়েছিল, স্বামীজীও তেমনি নর ও নারায়ণের মধ্যে অভেদ কল্পনা করতেন। এই নরনারায়ণের সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম ব'লে মনে করতেন। এইজন্যই তিনি দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সমাজে তথাকথিত নিম্নস্তরের প্রতি হৃদয়হীন আচরণে স্বামীজী সর্বদাই মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করতেন। ক্ষুদ্র আচারগণ্ডী রচনা ক'রে কেবল কয়েকজন মানুষের মতো বেঁচে থাকবে, আর তার ফলে অবহেলিতরা দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে—এরূপ অবস্থা তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হ'ত। দুঃখ ক'রে তিনি প্রায়ই বলতেন—"তাদের সহানুভূতি করে, তাদের দুঃখে সান্তনা দেয় দেশে এমন কেউ নাই রে। এই ছাখ্-না হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে শত শত পারিয়া খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নে তারা কেবল পেটের দায়ে খ্রীষ্টান হয়।" শুধু বাঙালী সমাজ নয়, একসময় ভারতীয় সমাজই অস্পৃশ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল। বর্ণ-কৌলীন্যের সংস্কারে সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা যেভাবে বৃহত্তর এক

সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাতে আর যাই হোক মানবিক-ধর্ম রক্ষিত হয়নি। অথচ, সমাজকে যদি বড় হ'তে হয়, উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয় তাহ'লে তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষদেরও বাদ দেওয়া চলে না। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে, দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন প্রয়োজন। আর, সে-কাজে সমাজের একদলকে দূরে সরিয়ে রাখা কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। স্বামীজী তাই বলতেন—"আমরা কি মানুষ?—নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর,—আমরা দিনরাত তাদের কেবল বলছি ছুঁসনে ছুঁসনে! দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুংমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা মার লাথি। ইচ্ছে করে তোর ছুৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। স্বামীজীর মতে সমাজের এই স্তরের মানুষের জাগরণই ছিল প্রকৃত জাগরণ। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে তাই তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। নরনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি স্থাপন করেন এক মিশনারী প্রতিষ্ঠান, যার নাম—'রামকৃষ্ণ মিশন'। ঐ মিশনের হাজার হাজার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী আজ যেভাবে স্বামীজীর জনসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা ভারতে ও ভারতের বাইরে অবহেলিত ও দুর্গতজনের সেবা ক'রে চলেছেন আমাদের সকলের কাছেই তা গৌরবের বিষয়।

হরিজন আন্দোলনের মূলে স্বামীজীর আদর্শ

বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করলেও, কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো বিরূপতা ছিল না। সর্বধর্মসমন্বয়ের উদ্গাতা মহর্ষি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য হয়ে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছিলেন যে, মানবপ্রেমই শ্রেষ্ঠধর্ম এবং ঈশ্বর-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। শূদ্র হোক, চণ্ডাল হোক, মুচি মেথর মুদ্দফরাস হোক, তারা সকলেই যে মানুষ এবং একই স্রষ্টার সৃষ্টি, আমাদের তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠরা যখন তা ভুলে যায়, অথচ মুখে বলে—'যত্র জীবস্তত্রশিবঃ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম',—তখন স্বভাবতই তাদের ভাণ্ডামি প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্বামীজীর কাছে এই ভণ্ডামি প্রকট হয়ে উঠেছিল ব'লেই তিনি দেশের তরুণ সমাজকে মানবিক ধর্মে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনে এই তরুণেরা যখন আত্মনিয়োগ করবে তখন আর ছুৎমার্গের বালাই থাকবে না। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর সেই বিশ্বাস আজ সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। তাঁর আদর্শের প্রভাব যে সারা ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কংগ্রেসকর্মীদের হরিজনসেবার মধ্য দিয়েই আমরা তার পরিচয় পাই। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনের মূলেও যে স্বামী বিবেকানন্দেরই ভাবধারা ছিল সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। স্বামীজীর অকাল-তিরোভাব না হ'লে এই কাজের মধ্য দিয়েই তিনি অনেক আগে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রাণপুরুষ, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মধারার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে এই সত্য উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট ছিলেন যে, সমাজের সর্বস্তরের

মানুষের সংস্কারসাধন ভিন্ন সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। এইজন্যই তিনি শুধু ভারতবাসীকে নয়, বিশ্ববাসীকেই উদার প্রেমধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর এই মানবপ্রেম পাশ্চাত্যদেশের বিদগ্ধ সমাজকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। বহু মার্কিন নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মার্গারেট নোব্‌ল 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিতি লাভ ক'রে যেভাবে স্বামীজীর আদর্শকে সফল ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

বিশ্বের মানব-সমাজে স্বামীজীর ভাবসাধনার প্রভাব—উপসংহার

মনীষী রোঁমা রোঁল্যা ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। দেশ-বিদেশে মানবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে স্বামীজী যেভাবে তাঁর দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করেন ভারতের ইতিহাসে তা অপূর্ব এক অধ্যায়ের সংযোজনা করে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই ত্রিধারার সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন নবীন ভারত গঠন করতে, যে-ভারতবর্ষের সমাজচেতন মানুষেরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলতে পারবে—"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" মানবপ্রেমের সঙ্গে তিনি যেভাবে দেশপ্রেমের আদর্শকে সংযুক্ত ক'রে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিশ্ব-ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। স্বামীজীর সাধনা আত্মমগ্ন সন্ন্যাসীর স্বীয় নির্বাণলাভের কোনো সাধনা ছিল না। জনগণের মুক্তিকামনাই ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। এই মুক্তি বলতে তিনি একদিকে যেমন বুঝতেন পরাধীনতার নাগপাশ থেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানবচেতনার মুক্তি। জাতির প্রত্যেক মানুষের উন্নতির পথ খুঁজে বের করাই ছিল তাঁর সাধনার আদর্শ। মানুষের মধ্যেই তিনি দিব্যচেতনায় ভগবত্তার নব-উদ্বোধন করেছিলেন।

স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি বা সাহিত্যিক। কিন্তু শুধু এইটুকু ব'লে তাঁর পরিচয় দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সঙ্গতও নয়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সমাজ-সংস্কারক এবং সর্বোপরি তিনি স্বদেশপ্রেমিক। ভারতবর্ষের মাটি, জল, বাতাস সব-কিছুর সঙ্গে তাঁর যেমন একটা মমতার সম্পর্ক ছিল, তেমনি ছিল এ-দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি। এ-দেশে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে তিনি গভীরভাবে সেই সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না থাকলেও, সেই আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে কখনও দূরে সরিয়ে রাখেননি,—

যখনই প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই তাতে সাড়া দিয়েছেন, দেশ-নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনীতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, ব্রিটিশ-সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর বিভিন্ন রাজনীতিক চিন্তাধারার বিশেষ একটা রূপ ফুটে ওঠে তাঁর বিভিন্ন রাজনীতিক-প্রবন্ধে ও ভাষণে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর শৈশবেই। সিপাহী-অভ্যুত্থানের মাত্র চার বৎসর পরেই তাঁর জন্ম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার তখন শুধু যে ধনে-মানে ও বিদ্যাবুদ্ধিতেই কলকাতার সমাজে অভিজাত ছিলেন তাই নয়, দেশের নারীশিক্ষার প্রসার, সমাজ-সংস্কার এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম আন্দোলনেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা। ঠাকুর-পরিবারের উদ্যোগেই বাংলাদেশে 'হিন্দুমেলা'-র উদ্ভব। আর, সে-মেলার প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল স্বদেশী ভাবধারার প্রচার, তথা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতাদি ললিতকলার চর্চা, শারীরিক অনুশীলন প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালক। কিন্তু, 'হিন্দুমেলা'-র বিভিন্ন কাজকর্মে তিনি সেই বয়সেই যোগ দিয়েছিলেন পরিবারের অন্যান্য কিশোর তরুণদের দেখাদেখি। এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাবলম্বন ও দেশপ্রীতির যে পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা তাঁর উত্তরজীবনে প্রত্যক্ষ করি, তা প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবেরই সুফল। বঙ্গভঙ্গ-রদ-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা থেকেই দেশবাসী তাঁর স্বাদেশিকতার পূর্ণ পরিচয় লাভ করে। এই সময় তিনি কংগ্রেস-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য প্রতিষ্ঠায় 'রাখীবন্ধনে'র আয়োজন করেছেন, জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনা ক'রে ও গেয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশবাসীকে। বাংলাদেশের অখণ্ডতার সমর্থনে এবং জাতীয়-ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সময় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

স্বাদেশিকতার উন্মেষ—হিন্দুমেলা : বঙ্গভঙ্গ-বাদ আন্দোলন

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥"

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এই-সব রচনা যে দেশবাসীর স্বদেশ-চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল বোধহয় তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক অতুলনীয়

সঙ্গীতগুলি। যেমন—'আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালোবাসি'; 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'; 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'; 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না'; 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী'; 'আমি ভয় করব না ভয় করব না'; 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'; 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'; 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান'; 'আমাদের যাত্রা হ'লো শুরু এখন, ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার'; 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে'; 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'; 'আগে চল্, আগে চল্, ভাই'; 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'; 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি'; 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'; 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'; 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'; 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'; 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—' প্রভৃতি। ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে যখন সেই ঐতিহ্য নষ্ট হয়, আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হ'তে থাকে ভারতবাসী, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করবার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন—"আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না—জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন হইয়া বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস ব্রতধারী।" ইউরোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির তুলনায় সনাতন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উন্নত ও শ্রেয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সে-কথা যেমন ক'রে উপলব্ধি করিয়েছেন তেমন ক'রে বোধহয় আর কেউ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, ইউরোপ কর্মকেই বড় ক'রে দেখেছে, কিন্তু ভারত মানুষকে লঙ্ঘন ক'রে কর্মকে প্রাধান্য দেয়নি। তিনি বলেছেন,—"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ-সম্পত্তি একলার নহে, আমাদের দান-ধ্যান, অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার।" ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের পার্থক্য এইখানেই, আর এইখানেই তার মহত্ত্ব। কবির স্বদেশপ্রীতিই যে কবিকে এমন ক'রে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত ক'রে তুলেছে সে-কথা না বললেও চলে।

রচনার মাধ্যমে স্বদেশী ভাবধারার প্রচার

স্বদেশের অপমান-বেদনা, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, তীব্র অনুভূতিতে, মর্মজ্বালায়

রবীন্দ্রনাথকে বারবার যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, প্রত্যেক সংকটকালে তিনি যেভাবে তার স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার তুলনা আর কোনো দেশের আর কোনো কবির জীবনে পাওয়া যায় কি না তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তিনি নিজের দেশের কোনো অপমানকে, মনুষ্যত্বের কোনো অবমাননাকেই কোনোদিন সহ্য করতে পারেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন ইংরেজরা নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপরে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, গুলী ক'রে হত্যা করেছিল অসংখ্য ভারতীয়কে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন গর্জে উঠেছিলেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। তিনি যেভাবে সেদিন তাঁর 'নাইট'-উপাধি প্রত্যাখ্যান ক'রে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ-শক্তির সেই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী কোনোদিনই তা ভুলতে পারবে না। মিস্ র‍্যাথবোনের ভারতবিদ্বেষী খোলা চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত প্রত্যুত্তর এবং হিজলীর বন্দীশিবিরে আবদ্ধ দেশীয় যুবকদের উপর ইংরেজ-পুলিসের গুলীচালনার বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময়ী প্রতিবাদও অবিস্মরণীয়। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি অন্তরের টান না থাকলে এমনটা কখনও সম্ভব হ'ত না।

'নাইট'-উপাধি ত্যাগ: ইংরেজের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে মনুষ্যত্বের ন্যায্য অধিকার ব'লে সমর্থন করেছেন। বিদেশী-শাসনের ফলে ভারতের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব তিনি দিয়েছেন তাঁর 'সভ্যতার সংকট'-প্রবন্ধে। তিনি সেই প্রবন্ধের একজায়গায় বলেছেন—"অন্নবস্ত্রপানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।" সেই প্রবন্ধেরই শেষদিকে তিনি আবার লিখেছেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?" ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যে অত্যাবশ্যক সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর একাধিক রাজনীতিক ভাষণে ও প্রবন্ধে। ইংরেজ-শাসনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন: "leave us alone to our destiny, let us solve our own problems in the light of experiments and efforts and necessary sufferings." রবীন্দ্রনাথ ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে যেমন বরাবর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন, তেমনি ইংরেজ-শাসনের প্রতিটি অন্যায় ও অবিচারের তীব্র সমালোচনা করেছেন; কিন্তু স্বাধীনতা-অর্জনের উপায় সম্পর্কে দেশের রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য ছিল। কংগ্রেসী-আন্দোলন সম্পর্কে মাঝে মাঝে তিনি যে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, অনেকে হয়তো তাতে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু, তাঁর প্রত্যেকটি

ইংরেজ-শাসনের সমালোচনা ও স্বাধীনতা দাবি

সমালোচনাই ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি আত্মশক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতেন সর্বাধিক। স্বাধীনতা-লাভের জন্য সর্বস্বপণকারী বাঙালী তরুণদের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা থাকলেও, তিনি কখনও সন্ত্রাসবাদের পথকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলতেন যে, সে-পথ ভ্রান্ত ; কারণ সন্ত্রাসবাদ মনুষ্যত্বকে যেভাবে নষ্ট ক'রে দেয়, তেমনি ক'রে বুঝি আর কিছুতে করে না। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির বিকাশের জন্য চেষ্টা করাই ছিল স্বাধীনতা-অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম সংকীর্ণ নয়, মানবতার আদর্শের সঙ্গে তা গভীরভাবে যুক্ত। উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনোদিনই সমর্থন করেননি ; কারণ, তাঁর মতে উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি হয়। তিনি বলতেন—"humanity is greater than nationality,' অর্থাৎ জাতীয়তার চেয়ে মানবতা অনেক বড়। কিন্তু যে-জাতীয়তার মধ্যে সুস্থ দেশপ্রেমের ধারণা নিহিত থাকে, মানুষের মনে ভালোবাসা ও ঐক্যের ভাব জাগিয়ে তোলে যে-জাতীয়তা, রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। আসলে, তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা ও মানবতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত তার জাতীয় সংহতি গ'ড়ে তুলুক। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি স্থাপনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতেন সবচেয়ে বেশি। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছিলেন। গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার মধ্যে তিনি যেন নিজের জীবনাদর্শকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। স্বদেশসেবার কর্মপন্থা নিয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশের নেতাদের মতান্তর ঘটেছিল সন্দেহ নেই। তিনি একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমর্থন করতে পারেননি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে। কিন্তু, ভারতবাসীর পরাধীনতার অভিশাপ যে একদিন গান্ধীজীর মানবিক কর্মসূচির মাধ্যমে সফল হয়ে উঠবে, ভারতবাসী আত্মশক্তিতে হবে বলীয়ান এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল। এইজন্যই বোধহয় তিনি গান্ধীজীকে 'মহাত্মা'—আখ্যায় ভূষিত ক'রে একদিন বলেছিলেন—"মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি ক'রে আজ তাঁকে স্মরণ করতুম না।....মরব তবু মারব না এবং এই ক'রেই জয়ী হব—এই একটা মস্ত বড় কথা, একটা বাণী।....ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে ; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি ক'রে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।" মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের মর্মোপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, তাঁর বাণী ভারতবাসীর দেশাত্মবোধে ও স্বাধীনতা-অর্জনের পথনির্দেশে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। শ্রদ্ধাভরে তিনি তাই রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'গুরুদেব।'

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ধারণা, গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা—উপসংহার.

শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক ও সাধক জীবন

বিপ্লব-যুগের প্রধান ঋত্বিক হয়েও, অরবিন্দ ঘোষ কি ক'রে সাধকজীবনে প্রবেশ করলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে শ্রীঅরবিন্দে পরিণত হলেন অনেকের কাছেই সেটা যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসা। এই মহাপুরুষের বিচিত্র ও অলোকসামান্য জীবন-ইতিহাস শুধু 'বিস্ময়করই নয়, তুলনাহীনও বটে। উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন সে-সময় ভারত তথা সমগ্র বিশ্বেই যেন একটা নবজাগরণের সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। নতুন কল্পনা, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, স্বাধীনতালাভের অদম্য বাসনা সে-সময় বাঙালীর জীবনে নতুন এক যুগের সূচনা করেছে। অপরদিকে, সেকালে ম্যাট্‌সিনির স্বাধীনতা-মন্ত্রে ইতালীও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে ইউরোপে। এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণেই অরবিন্দের আবির্ভাব।

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। একদিকে ছিলেন তাঁর মাতামহ, বাংলার নবযুগের অন্যতম প্রবর্তক, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক ঋষি রাজনারায়ণ বসু, অন্যদিকে ছিলেন তাঁর পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারায় যিনি ছিলেন অভ্যস্ত। অরবিন্দের জীবন শুরু হয় পিতার আদর্শ ও ভাবধারাকে কেন্দ্র ক'রেই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় প্রথম জীবনে তিনি পুরোদস্তুর সাহেবই হয়ে উঠেছিলেন, এমন কি দীর্ঘকাল বিলাতে থাকার ফলে বাংলাভাষাও তিনি একরকম ভুলে যান। কিন্তু সাহেব হয়ে দেশে ফিরলেও, অরবিন্দের মন কখনও দেশচ্যুত হয়নি। মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের আদর্শ বোধ করি পরোক্ষভাবে তাঁর মধ্যে বিরাট এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। দেশমাতৃকার সেবার মনোভাব নিয়েই তিনি দেশে ফিরেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে বিদেশীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, দেশে ফিরে তেমনি ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিশেষভাবে অনুশীলন ক'রে প্রাচ্য চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ক'রে ফেলেন। প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শ তাঁকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল যে, বরোদায় অধ্যাপনা করতে করতেই তিনিই নিজেকে নিয়ে যান কৃচ্ছ্রসাধনার পথে। কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর জীবন বিলাস্-ব্যসনবর্জিত।

পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও দেশাত্মবোধের আদর্শ

১৯০৫-সালে যখন বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের তূর্যনিনাদ ভারতভূমিকে প্রকম্পিত ক'রে তোলে, বাংলার সেই আহ্বান শুনে অরবিন্দ আর সুদূর বরোদায় স্থির হয়ে থাকতে পারেননি। স্বদেশী আন্দোলনের বিরাট প্লাবনে বাংলার তরুণসমাজ তখন উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠেছে, জাতীয়তাবোধের তীব্র নেশায় দেশবাসী তখন আচ্ছন্ন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ ক'রে অরবিন্দ এলেন কলকাতায় এবং নতুন এক কর্মজীবন শুরু হ'লো তাঁর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় পরে তিনি সে-পদ পরিত্যাগ করলেও, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে অন্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন, স্বদেশসেবার মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করতে হ'লে ত্যাগ ও নিদারুণ দুঃখ বরণ করতে হবে এবং সেজন্য উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে সমগ্র দেশবাসীকে। স্বাধীনতালাভের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান হওয়া, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার বর্জন ক'রে স্বদেশী শিল্পের প্রসার। ১৯০৬-সালে কংগ্রেসে যোগদান করলেন তিনি, তারপর 'বন্দেমাতরম্'-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি দেশবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হ'তে। সে-সময় কংগ্রেসের নেতারা যেভাবে বিদেশী-সরকারের দরবারে 'আবেদন-নিবেদন-এর থালা' বহন ক'রে ফিরছিলেন অরবিন্দের তা আদৌ মনঃপূত হয়নি, তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐ-পথে স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোনো কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। 'বন্দেমাতরম্'-এর জাতীয়ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধাবলীতে সে-সময় জাতির চিত্ত, বিশেষত তরুণসমাজের অন্তর, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবার জন্য এগিয়ে আসেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে। ১৯০৮-সালে ইংরেজের হাতে গ্রেফ্‌তার হবার পূর্ব পর্যন্ত অরবিন্দ যেভাবে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করেন, সারা ভারতেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাদের সহযোগিতায় তিনি কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্টতর ক'রে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। অরবিন্দ যেভাবে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বাংলার জাতীয়দলকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন তাতে ক'রে মধ্যপন্থী কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে তাঁর দলের সংঘর্ষ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও লাল-বাল-পাল প্রমুখ নেতৃবর্গ (অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশনেতা) কংগ্রেসের চরমপন্থী-দল ব'লে অভিহিত হন।

বৈপ্লবিক জীবনের সূচনায় 'বন্দেমাতরম্'-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা : চরমপন্থী দল

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন অরবিন্দই। সন্ত্রাসবাদ-আন্দোলনের সঙ্গে অবশ্য তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু, কলিকাতার মুরারিপুকুরবাগানে খানাতল্লাসি করতে গিয়ে পুলিস যখন বোমার কারখানা আবিষ্কার করে তখন তারা এই সন্দেহই করে যে, অরবিন্দ প্রকাশ্যে জাতীয়দলের নেতৃত্বও করলেও, গোপনে গোপনে বিপ্লববাদীদের সাহায্য করেন। সেই সন্দেহের সূত্রেই অরবিন্দ বন্দী হয়ে ইংরেজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই কারাবাসের

কারাবাস ও জীবনের পরিবর্তন

জীবনই অরবিন্দের মনে বিরাট এক পরিবর্তন আনে এবং তিনি ক্রমশ ভগবচ্চিন্তার আকর্ষণ অনুভব করেন। বোমার মামলায় অভিযুক্ত ক'রে ইংরেজ-পুলিস অরবিন্দকে রাজদ্রোহী প্রমাণিত করবার বহু চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ওকালতিতে ধোপে টেকেনি। এক বৎসর পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে দুঃসহ কারাজীবন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এর পর কিছুকাল তিনি সরকারের দমননীতি ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং তাঁর সম্পাদিত 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে।

কারাবাসকালে অরবিন্দের মানসিক যে পরিবর্তন ঘটে, তার ফলেই ক্রমশ তিনি ধর্ম-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তার মধ্যে তিনি আর তখন যেন কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক রাজনীতিক ভাষণেই বলেছিলেন :"আর আমি বলি না যে জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতনধর্ম নিয়ে এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই বিকাশলাভ করে। যখন সনাতনধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়। আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হ'ত তাহ'লে সনাতনধর্মের সঙ্গে এ-জাতিটাও ধ্বংস হ'ত। সনাতনধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা।"

সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তার মধ্যে অভেদ-কল্পনা

অনেকের বিশ্বাস, ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে নির্বিঘ্নে বৈপ্লবিক কর্মধারা পরিচালনার জন্য অরবিন্দ ফরাসী-শাসিত পণ্ডিচেরীতে চ'লে গিয়েছিলেন। কিন্তু, সে-বিশ্বাস সত্য নয়। কারণ, কারাবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, মানুষ যতদিন না আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে ততদিন বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে স্বাধীনতা অর্জন তো দূরের কথা, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাই সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না। কাজেই, এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে, যার সাহায্যে মানুষ নিজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। অতএব, এ-জন্য নির্জন-সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধক-জীবন যাপন করতেই অরবিন্দ ১৯১০-সালের ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে গিয়ে পৌছান এবং সাধকজীবন শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা হলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয়কুমার নাগ, সৌরীন বসু, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি। ১৯১৪-সালে, প্রথম, বিশ্বযুদ্ধের আগে, জাপান থেকে আসেন মঁসিয়ে পল ও মাদাম মীরা রিচার্ড অরবিন্দের যোগসাধনার কথা শুনে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে, তাঁরা ফিরে যান জন্মভূমি ফ্রান্সে। ১৯২০-সালে তাঁরা আবার ফিরে আসেন এবং মঁসিয়ে পল কিছুদিন পরে স্বদেশে ফিরে গেলেও, মাদাম রিচার্ড শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে স্থায়িভাবেই পণ্ডিচেরীতে থেকে যান। ১৯২৬-সালে শ্রীঅরবিন্দ মগ্ন হন গভীর ধ্যানে ও নির্জন তপস্যায়। বলা বাহুল্য, এর বহু আগেই তিনি যোগসাধনায় নিরত হয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে

পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন ও যোগসাধনা

পৃথিবীর নানাদেশ থেকে বহু লোক পণ্ডিচেরীতে স্থাপিত অরবিন্দ-আশ্রমে এসে যোগ দেন। আশ্রমবাসীর দেখাশোনা ও আশ্রম-পরিচালনার ভার তখন গ্রহণ করেন মাদাম রিচার্ড। সেই থেকেই তিনি সকলের কাছে শ্রীমা ব'লে পরিচিতা।

১৯২৬-সালের ২৪-এ নভেম্বরকে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি-দিবস বলা হয়। কারণ এই শুভদিনটিতেই তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা সাফল্যলাভের পথ খুঁজে পায় এবং মানবজাতির মুক্তির জন্য যাতে পৃথিবীতে অতি-মানসের অবতরণ সিদ্ধ হয় সেজন্য তিনি লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে গিয়ে সুগভীর ও শক্তিশালী এক ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। নিজের যোগসাধনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন,—"আমরা যে যোগসাধনা করি তা শুধু আমাদের জন্যই নয়, তা বিশ্বমানবের জন্য; তার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুক্তি নয়। যদিও মুক্তি যোগের একটি অত্যাবশ্যক বিধান। এই যোগসাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো মানবজাতির মুক্তি, ব্যক্তিগত আনন্দ নয়। পরন্তু পৃথিবীর উপরে ভাগবত আনন্দ নামিয়ে আনা—সংসারে স্বর্গরাজ্য বা আমাদের সত্যযুগ নামিয়ে আনাই এর উদ্দেশ্য।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনা দ্বারা যে দৈবশক্তি লাভ ক'রে ব্যক্তিগত উন্নতিবিধান করেছিলেন, সেই সাধনা-র পথই হ'লো বর্তমান যুগের মানুষের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ—এ-কথা আজ অরবিন্দ-অনুরাগীমাত্রেই স্বীকার করবেন। শ্রীঅরবিন্দ যে অতি-মানস অবতরণে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। সাধারণ লোকের কাছে সেই সিদ্ধির প্রকৃত অর্থ রহস্যাবৃত হ'লেও কেউ যদি শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত পথে ব্যক্তিগত উন্নতি কামনায় যোগসাধনায় নিরত হয়, তাহ'লে তার জীবনেও অতি-মানস স্তরে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। আর এইভাবে বর্তমান মানবজাতি যদি মুক্তির উপায় খুঁজে পায়, তাহ'লে বিবদমান এই পৃথিবীতে শান্তি, সুখ ও আনন্দ বিরাজ করতে বাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন,—"যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎকর্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে জগতের উন্নতির দিন আরব্ধ হয়েছে এবং ধর্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী।"

সাধনায় সিদ্ধিলাভ : মানবজাতির মুক্তিই সাধনার লক্ষ্য

শ্রীঅরবিন্দ যোগী, ঋষি, অলৌকিক তাঁর চিন্তাদৃষ্টি, তাঁর কর্মধারা সাধারণ স্থূলভাবে সহসা ধরা দেয় না, সূক্ষ্মস্তরে পাওয়া যায় তাঁর সৃজনীশক্তির অভ্রান্ত স্পর্শ। বৈপ্লবিক-চিন্তাধারার অন্যতম দেশপ্রেমী নায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ব'লে উঠেছিলেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের লহো নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।................
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে

রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-নিবেদন : উপসংহার

পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

সেই শ্রীঅরবিন্দকে আবার যোগীপুরুষ হিসাবে দর্শন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েওছেন।...আমার মন বললে ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালবেন।...কোনো খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শক্তির উজ্জ্বল আভা।" মানবজাতির মহামিলনের জন্য ভারতের নব-অভ্যুদয়ে তাঁর ঐশী শক্তির প্রভাব কতখানি, আজ আমরা তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পারলেও ভাবীকাল দেবে তার পূর্ণ বিবরণী, সেইদিন জানা যাবে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর আদর্শ

বর্তমান যুগের পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী যেন বিস্ময়কর এক ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের আসুরিক শক্তিতে মত্ত হয়ে পৃথিবীর একদেশ যখন অন্যদেশকে চোখ রাঙায়, একে অপরের উপর আধিপত্য করে, সারা পৃথিবীই যখন হিংসায় উন্মত্ত, গান্ধীজী তখন প্রমাণ

ভূমিকা

করেন অহিংসার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আর নেই; প্রেম ও মৈত্রীর সাহায্যেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করা যায়—সেজন্য মরণাস্ত্রের কোনো প্রয়োজন হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মুর্খ-বিদ্বানের ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা।...কত পীড়া কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন, কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কতবার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেননি কখনো, রাগ করেননি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হ'লো কিন্তু জবরদস্তিতে নয়; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন।"

শুধু অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে কেমন ক'রে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব—মহাত্মা গান্ধী তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা দ্বারা বিশ্বজগৎকে তাই দেখিয়ে

গেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কেউ কখনও শোনেনি যে, বিনাযুদ্ধে কোনো দেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীই ইতিহাসের সেই অলিখিত অধ্যায় রচনা ক'রে গেছেন। মহাত্মাজীর এই বিস্ময়কর শক্তির মর্মোপলব্ধি ক'রে সুভাষচন্দ্র একদিন শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন—"সংকটজনক মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ অথবা আইন-অমান্য-আন্দোলনের অভিনব পদ্ধতি নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। মনে হ'লো, স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং ভগবান যেন তাঁকে পাঠিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে সমগ্র জাতি তাঁর পতাকাতলে সমবেত হ'লো।...মনে হ'লো ভারতের জয় সুনিশ্চিত। ...১৯২০-সালে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন অস্ত্র নিয়ে যদি আবির্ভূত না হতেন, তাহ'লে ভারতকে আজও হয়তো অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকতে হ'ত। এ-কথার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নাই। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবদান অপূর্ব, অতুলনীয়।"

স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর অভিনব পদ্ধতি

গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় দক্ষিণ-আফ্রিকাতে। কোনো এক ভারতীয় কোম্পানির মামলার ভার নিয়ে ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু, ব্যারিস্টারি যত-না করলেন তার চেয়ে শতগুণ বেশি করলেন সেখানকার ব্রিটিশ-সরকারের নানাবিধ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দা অশ্বেতকায় ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ-সরকার যে-সব মানবতা-বিরোধী আইন বলবৎ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করেন গান্ধীজী। তিনি যে-আন্দোলন সেখানে শুরু করেন, তারই নাম 'সত্যাগ্রহ। সত্যের প্রতি যে ঐকান্তিক আগ্রহ তাকেই তিনি বলেছিলেন, 'সত্যাগ্রহ'। নাটালের ব্যবস্থা-পরিষদ স্থানীয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে-সব অন্যায়ের সূত্রপাত করেন গান্ধীজী সেগুলিকে বলেন মানবতা-বিরোধী। আর, যা-কিছু মানবতা-বিরোধী সেগুলিকে কখনই 'সত্য' ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। গান্ধী বললেন, ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটের অধিকার নাটালবাসীরা যেমন পাবে, তেমনি পাবে নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়েরাও। কারণ, তাই হ'লো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। এই 'সত্যে'· আগ্রহী হয়ে ব্যারিস্টার গান্ধীজী একটি অভিনব গণ-আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম আন্দোলন ব্যর্থ হ'লেও, নাটাল-প্রবাসীরা যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন ঐক্যবদ্ধ হ'তে পেরেছিল সেইটাই সত্যিকারের লাভ। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে গান্ধীজী নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে 'নাটাল-ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' স্থাপন করেন। ভারতবর্ষ থেকে যে-সব শ্রমিক-মজুর চুক্তি-প্রথায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করতে যেত, তাদের বলা হ'ত 'গিরিমিটিয়া' নাটাল-গভর্নমেণ্ট এই 'গিরিমিটিয়া ভারতীয়দের' উপর মাথাপিছু প্রায় তিনশ'-পঁচাত্তর টাকা ক'রে বাৎসরিক একটা কর ধার্য করেন। এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে 'নাটাল-

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন চালান, তাও 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের ফলে কর একেবারে উঠে না গেলেও অনেক পরিমাণে তা হ্রাস পায়। তিনশ'-পঁচাত্তর টাকার জায়গায় কর ধার্য হয় মাত্র পঁচাত্তর টাকা। 'সত্যাগ্রহ'-আন্দোলনের যে-বীজ একদিন গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকায় বপন করেছিলেন, সে বীজ তিনি একদিন ভারতেও নিয়ে এসেছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার কাজ শেষ ক'রে গান্ধীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তার অনেক আগেই ভারতে 'জাতীয় কংগ্রেস' স্থাপিত হয়েছিল। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন গান্ধীজীকে। তিনিই তাঁকে ভারতবর্ষে এসে ইংরেজ-রাজশক্তির বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ-আন্দোলন' চালাবার পরামর্শ দেন। পুরো একটি বছর গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেন এবং ইংরেজ-শাসনে ভারতবাসী কিভাবে পদে পদে বিড়ম্বিত ও নিপীড়িত হচ্ছে তা উপলব্ধি করেন। এই সত্যোপলব্ধি থেকেই গান্ধীজী পরাধীন মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন এবং দেশবাসীর সামনে একটা বলিষ্ঠ আদর্শ তুলে ধরতে নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেন দেশসেবায়। ব্যক্তিগত সর্বস্বখ বিসর্জন দিয়ে গান্ধীজী সেই থেকে নিলেন 'অর্ধনগ্ন ফকির'-এর বেশ এবং আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর 'সত্যাগ্রহ-আশ্রম'। সেটা ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের মে-মাসের শেষ দিককার কথা। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ' গান্ধীর জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। বিহারের একটি জায়গা—চম্পারণ। সেখানকার কৃষকদের উপর নীলকুঠির সাহেবরা যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাত গান্ধীজী তারই বিরুদ্ধে বিরাট এক গণ-আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজ-সরকার গান্ধীজীর সেই নেতৃত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং স্থানীয় কৃষকদের উপরে নীলকুঠি সাহেবদের অন্যায় জুলুম অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে, তিনি যে-সব আন্দোলন পরিচালনা করেছেন বা তাঁর আদর্শে এই ধরনের যে-সব আন্দোলন এদেশে পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলিকেই ব্যাপক অর্থে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' বলা যেতে পারে। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"সত্যাগ্রহীর পক্ষে সময়ের কোনরূপ সীমানির্দেশ নাই। তার দুঃখবরণের ক্ষমতারও সীমা নাই। তাই সত্যাগ্রহে পরাজয় ব'লে কোনো কথা নাই। আমি জীবনের মূল্য কম দেই ব'লেই যে আমি হাজার হাজার লোকের স্বেচ্ছামৃত্যুকে উৎসাহদান করি তা নয়; পরন্তু আমি জানি এতে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে অল্পসংখ্যক জীবন বলি দিয়েই ফল পাওয়া যায়। অধিকন্তু, যারা জীবন দান করে, তারা গৌরবান্বিত হয় এবং তাদের আত্মত্যাগের জন্য পৃথিবীর নৈতিক অভ্যুন্নতিও সাধিত হয়।···আমি ভারতবাসীর কাছে আত্মত্যাগের সুপ্রাচীন এবং সুমহান্ নীতি উপস্থাপিত করতে সাহসী হয়েছি—কারণ, সত্যাগ্রহ ও তা থেকে উদ্ভূত অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—দুঃখবরণ-নীতির নতুন নাম।"

মহাত্মা গান্ধী এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে যেভাবে অহিংস গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ক'রে ইংরেজ-রাজশক্তির নিদ্রাহরণ করেছিলেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে তা

একটা পরম বিস্ময়ের বিষয়। অনেকে আবার এই অহিংসা-নীতির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁদের কাছে মহাত্মার অহিংসা-নীতি ছিল দুর্বলতা বা নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর মাত্র। কিন্তু, যাঁরা তাঁর অহিংসা-নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, অহিংসার নীতি কোনোরকম নিষ্ক্রিয়তা নয় এবং অহিংসা-ই জগতের সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল শক্তি। হিংসামূলক অস্ত্রের দ্বারা মানুষকে যে-কোনো মুহূর্তে পরাভূত করা যায় সত্য; কিন্তু, সেই পরাভব চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, মানুষ আবার সেই অন্যায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু, অহিংসা-মূলক অস্ত্রের দ্বারা মানুষের মনের যে পরিবর্তন ঘটানো যায় তা স্থায়িত্বলাভ করে। হিংসা মানুষকে ক্রমশ হিংস্র ক'রে তোলে, অপরদিকে অহিংসা মানুষের মনে আনে শান্তি। অহিংসা'-র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন—"আমার অহিংসা-নীতিতে একথা নাই যে, বিপদ দেখে এবং প্রিয়জনকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর। হিংসা ও ভীরুর মতো পলায়নের মধ্যে আমি ভীরুতা অপেক্ষা হিংসাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি। অন্ধ লোককে সুন্দর দৃশ্য দেখতে প্রলুব্ধ করবার মতো আমি ভীরুর কাছে অহিংসা-নীতি প্রচার করতে পারি না। অহিংসাই চূড়ান্ত বীরত্ব।

অহিংসা-নীতি

গান্ধীজীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল—অহিংসা প্রচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। এ আদর্শ এমন কিছু নতুন আদর্শ নয়। যুগ যুগ ধ'রে পৃথিবীর মহামানবেরা এই মহান্ আদর্শই প্রচার ক'রে গিয়েছেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য থেকে শুরু ক'রে এ-যুগের রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, সকলেই ছিলেন অহিংসার পূজারী এবং মৈত্রীর মন্ত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সকলেই চেয়েছিলেন মানবজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। গান্ধীজী অতীতের সেই মহাপুরুষদের আদর্শকে বাস্তব-সত্যে রূপ দেবার জন্যই সাধনা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর সমগ্র জীবনই একখানি শান্তি-উপনিষদ। দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা, নোয়াখালি, বিহারের অঞ্চলবিশেষ এবং দিল্লীতে তিনি যেভাবে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তার যেন কোনো তুলনা হয় না।

শান্তি-প্রতিষ্ঠায় উদ্যম

মহাত্মা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের স্বাধীনতা তখনই সার্থক ব'লে বিবেচিত হবে, যখন এদেশের দীনতম ব্যক্তিও মনে করতে পারবে যে এদেশ তারই দেশ; এই দেশ গ'ড়ে তুলতে প্রত্যেকের অভিমতই হবে কার্যকরী। গান্ধীজীর ভাষায়—"সেই ভারতবর্ষে উঁচু-নীচু ব'লে কোনো শ্রেণী থাকবে না। সেই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রেখে বাস করবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোনো বালাই থাকবে না। নারীপুরুষ সকলেই সেখানে সমান অধিকার ভোগ করবে—সেই হ'লো আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ।" ভারতবর্ষকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এক দেশে পরিণত করবার জন্য তিনি যে-সব কাজে হাত

জাতিগঠনে-উদ্যম উপলক্ষ্যে

দিয়েছিলেন বা যে-সব কাজের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেগুলি হ'লো—সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য বর্জন, খাদি ব্যবহার, কুটীর-শিল্পের প্রসার, গ্রামোন্নয়ন, বুনিয়াদী-শিক্ষাব্যবস্থা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিসাধন, রাষ্ট্রভাষার ব্যাপক প্রচলন, আর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণ, কৃষক ও শ্রমিকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, আদিবাসী-কল্যাণ প্রভৃতি। অহিংসা-আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী একদিকে যেমন পরবশতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-সংগঠনমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে চেয়েছিলেন দেশবাসীর দারিদ্র্য, পরনির্ভরতা ও নানারকম দুর্নীতি ও কু-সংস্কার দূর করতে। গান্ধীজী বলতেন—"তোমরা স্বাধীন হ'তে চাও, তবে আত্মনির্ভর হও; কারণ আত্মনির্ভরতাই চোদ্দ-আনা স্বাধীনতা।" এই আত্মনির্ভরতার জন্যই তিনি চরকার উপরে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। চরকা তাঁর কাছে ছিল কুটীর-শিল্পের প্রতীক, শ্রমের প্রতীক। চরকা ও খদ্দরের মধ্য দিয়ে তিনি সারা দেশে যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার মূলে ছিল দেশপ্রেম এবং আত্মনির্ভরতার আদর্শ। এই আদর্শই আমাদের আজ শক্তিশালী ক'রে তুলেছে।

জাতীয়-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র

ভূমিকা

ভারতবর্ষের জাতীয়-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের কীর্তি শুধু অতুলনীয় নয়, বিস্ময়কর। তাঁর কর্মজীবন পরিপূর্ণভাবেই নিয়োজিত ছিল এই বিরাট সংগ্রামে। এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল পরস্পর-বিরোধী দুই পথে—অহিংস গণ-আন্দোলনে এবং সশস্ত্র বিপ্লবে। আশ্চর্যের বিষয়, জাতীয়-সংগ্রামের এই উভয়-পথেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব জনগণচিত্তে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন,—সুভাষচন্দ্র যেমন সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব ক'রে 'দেশগৌরব'-আখ্যায় অভিনন্দিত হন, অন্যদিকে তেমনি বহির্ভারতে আজাদী সেনাদল গঠন ক'রে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ক'রে পরিচিত হন 'নেতাজী' ব'লে। তারুণ্য-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্রের মতো প্রবল গতিময় জীবন কেবল এদেশে বা একালে নয়, সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে। এঁরা নিজের মধ্যে যেন একটা ঝটিকা-কেন্দ্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন; এদের চারপাশের হাওয়া কখনো শুব্ধ হতে পারে না, নিয়ত তাতে ঝঞ্ঝার বেগ সঞ্চারিত হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র সে-ঝড়ে নিজে আন্দোলিত হয়েছেন এবং সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলিত

করেছেন। তাঁর নিজের ভিতরে হৃদয়াবেগের যেমন সীমা ছিল না, তেমনি বাইরে অপরের মধ্যে হৃদয়াবেগের প্লাবন বহাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

কর্মজীবনে অনলস কর্মী

সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময়, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন তিনি। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকেই যেন তাঁর জীবনে সংগ্রামের আরম্ভ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাস ক'রে তিনি বিলেতে যান এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের জন্য গৃহীত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু, ভারতবর্ষে সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যেভাবে ইংরেজ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল তরুণ সিভিলিয়ান সুভাষচন্দ্রের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি তাই ইংরেজসরকারের অধীনে চাকুরি করেন নাই, প্রবল দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন জাতীয়-সংগ্রামে। মহাত্মাজীর নির্দেশে তিনি যান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে এবং তাঁকেই তাঁর রাজনীতিক-জীবনের গুরু ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সকল কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়েছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামে। এর মধ্যে বিশ্রামলাভের কোনো সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি, পরাধীন-ভারতের মুক্তিচিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাকে তিনি প্রশ্রয়ও দেননি কখনও।

দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভারতের জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতি—সে তো বৈদান্তিকেরই নীতি। বেদান্ত যেমন ধর্মবিশেষ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন না—কোন্ পথে স্বল্প সময়ে সুনিশ্চিতরূপে মোক্ষলাভ করা যায়, তারই বিবেচনা করে—সে রাজনীতি তেমনই হিংসায় ও অহিংসায় প্রভেদ বিচার করা অপেক্ষা যে-পথে স্বল্পসময়ে সুনিশ্চিতরূপে স্বাধীনতালাভ করা যায়, সেই পথই অবলম্বন করে। সুভাষচন্দ্র সেই রাজনীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব পরাধীনতার অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করা, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে অতীতের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্য, তিনি স্বয়ং যখন যুদ্ধের পথে ভারতকে মুক্ত করতে প্রয়াসী, তখনও অহিংস-সংগ্রামের নেতা, ভারতে গণজাগরণের অধিনায়ক, গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অভ্যন্তরে যেভাবে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল প্রভৃতি দেশনেতাদের জাতীয়-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় যদি তিনি বহির্ভারত থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারেন, তাহ'লে ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন হবে ত্বরান্বিত। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই দূরদর্শিতার জন্যই ব্রিটিশ-শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল দেশীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। ব্রিটিশ-সরকার বুঝেছিলেন যে, যে-দুর্বার গতিতে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছেন, তার খবর যদি ভারতীয়দের কানে গিয়ে পৌছয়, তাহ'লে অকস্মাৎ সারা ভারতে যে গণবিক্ষোভ দেখা যাবে তাতে চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে ইংরেজ-রাজশক্তিকে। ব্রিটিশ-সরকার তাই যুদ্ধজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো সংবাদ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারিত হবার সুযোগ পর্যন্ত দেননি। ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন পূর্ণ সচেতন।

নেতারূপে জনপ্রিয়তা

জাতীয়-কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই, সুভাষচন্দ্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ইংরেজ-সরকার। বারবার তাঁকে তাঁরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পাঠিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছেন পর্যন্ত, কিন্তু তাঁর মনোবলকে কখনও তাঁরা ক্ষুণ্ণ করতে পারেননি। স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হ'লেও সুভাষচন্দ্র দেশসেবার কাজ থেকে কখনও অবসর গ্রহণ করেননি—তাঁর আদর্শ ছিল "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" কংগ্রেসের নেতারূপে কাজ করতে করতে যখনই কোনো বিষয়ে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছে, তখনই তিনি তা ব্যর্থহীনভাষায় প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেসের আপস-মনোভাবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন ব'লেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে তাঁকে সরে আসতে হয় এবং নতুন রাজনীতিক-দল গঠন করেন তিনি। দেশের তরুণশক্তির কাছে তিনি ছিলেন বিরাট্ এক আদর্শের প্রতিমূর্তিস্বরূপ, তাই আসমুদ্রহিমাচল বিরাট এই দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। পর পর দু'বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এমন কি গান্ধীজীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, তিনি অসংখ্য ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী ডাঃ পট্টভিসীতারামাইকে পরাজিত ক'রে কংগ্রেস-অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হবার গৌরব অর্জন করেছেন। এ নিয়ে তিনি হয়তো একদল কংগ্রেসী নেতার বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর মতামতকে কংগ্রেস সেদিন উপেক্ষা করতে পারেনি।

সশস্ত্র-সংগ্রামের মনোভাব

সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করার যে-মনোভাব শেষ বন্দীদশায় সুভাষচন্দ্রের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল, তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদলের অধিনায়ক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন দেশবন্ধু-সহকর্মী তরুণ সুভাষচন্দ্র। তাঁর পরিধানে সেদিন ছিল 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং'-এর সামরিক পরিচ্ছদ এবং সম্পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতেই তিনি পরিচালিত করেছিলেন তাঁর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে। দেশের প্রবীণদল ও বিজ্ঞজন প্রথম সামরিক কায়দায় সৃষ্ট সেই কংগ্রেস-ভলান্টিয়ার্সদের কুচকাওয়াজ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তার তাৎপর্য সেদিন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। সামরিক পদ্ধতিতে যেভাবে শৃঙ্খলা আনা সহজসাধ্য হয়, তরুণদলকে সুসংগঠিত করা যায়, সেদিকটা তাঁরা যেন ইচ্ছে ক'রেই ভুলে গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রূপ করেছিলেন সেদিন। এমন কি গান্ধীজী পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সেই কার্যকলাপকে 'ছেলেখেলা' ব'লে

উপহাস করেন। কিন্তু, অবিচলিত চিত্তে সুভাষচন্দ্র সেদিন তাঁর কর্তব্য-সম্পাদন ক'রে যেভাবে দেশের তরুণসমাজে শৃঙ্খলার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার পরিণাম হয়েছিল দূরপ্রসারী। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল বরাবরই। কারণ, তিনি জানতেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অহিংস অসহযোগের মতো কার্যকরী পন্থা আর নেই। কিন্তু, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল যেভাবে অহিংস উপায়ে দেশকে স্বাধীন করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সময়ের অপব্যবহার হচ্ছিল ব'লেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবার পক্ষপাতী; তাছাড়া, বিদেশী-সরকারের সঙ্গে আপস-রফার মনোভাবকেও তিনি সমর্থন করতে পারেননি। ইংরেজ-শাসনের ফলে দেশ যেভাবে ক্রমাবনতির পথে এগিয়ে চলেছিল, তাতে দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর কাম্য। আপস-রফায় পথে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শক্তি যে একদিন সত্যিই দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে সুভাষচন্দ্র কখনই তা বিশ্বাস করতেন না। সম্ভবতো একথা-ও সত্য যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি না তাঁর আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতের দিকে এগিয়ে আসতেন, তাহ'লে যে-স্বাধীনতা আজ আমরা লাভ করেছি, সে-স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হ'ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠে, সুভাষচন্দ্র তখনই ইংরেজ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে চরমপত্র দেবার জন্য দেশবাসী তথা কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, সেই হ'লো উপযুক্ত সময়। কিন্তু, কংগ্রেসের তরফ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে, সুভাষচন্দ্র সেদিন দেশের বামপন্থী সংগ্রামীশক্তিকে বহিঃশক্তির সাহায্যে দুর্জয় ক'রে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করেন। সুচতুর ইংরেজ-সরকার বিপদের সম্ভাবনা দেখেই সুভাষচন্দ্রকে বন্দী ক'রে রাখেন স্বগৃহে। কিন্তু, সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে উধাও হলেন তিনি, চ'লে গেলেন জার্মানীতে। দেশ দরিদ্র, দেশবাসীর অস্ত্রব্যবহারও নিষিদ্ধ—সেই অবস্থায় যে-সব দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত তাদের সাহায্য গ্রহণ ক'রে দেশকে স্বাধীন করা সুবিধাজনক ব'লেই বিবেচিত হয়েছিল তাঁর কাছে।

জাপান থেকে অভিযান শুরু

জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্র গেলেন জাপানে, সেখানে রাসবিহারী বসুর সহায়তায় গ'ড়ে তুললেন এক বিরাট সেনাদল। যে-সব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল, জাপান-সরকার তাদের সমর্পণ করলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে; দেশকে স্বাধীন করবার সংকল্প গ্রহণ ক'রে তারাও সানন্দে মেনে নিলে তাঁর নেতৃত্ব, পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে অভিবাদন জানালে 'নেতাজী' বলে। সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে দূর প্রাচ্যের ভারতীয়েরা দলে দলে এগিয়ে এলো তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে। আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' ধ্বনিতে যেদিন পূর্ব-ভারতের ইম্ফল-প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হ'লো, আন্দামানে উড়ল জাতীয়-পতাকা, ইংরেজশক্তি সেদিন ভীতি-বিহ্বল। মিত্রশক্তি-গোষ্ঠীর সাহায্যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'লেও, সুভাষচন্দ্রের কীর্তিকলাপ যেদিন ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে, সেদিন আনন্দোৎসবে ভারতবাসীর

নতুন রূপ দেখে মনে মনে তাঁরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়'-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বও তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে ইংরেজ-সরকার শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই বাধ্য হলেন। দেশ স্বাধীন হ'লো ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হ'লো। কিন্তু, স্বাধীন ভারত ফিরে পেল না তার বীরপুত্রকে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তিনি বুঝি চিরদিনের মতোই রয়ে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুসারী—উপসংহার

জাতীয়-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কথা চিন্তা করলে, সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের কথাই মনে পড়ে বারবার। তিনি আসলে ছিলেন কর্মযোগী বিবেকানন্দের অনুসারী। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও জীবনাদর্শ ই তিলে তিলে তাঁর জীবনকে সংগঠিত করেছে। বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনা একদিকে যেমন সুভাষচন্দ্রের মনে দেশকে স্বাধীন করবার প্রেরণা জুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর জনসেবা রূপ দিয়েছে তাঁর ত্যাগধর্মের। রাজা রামমোহন ও বিবেকানন্দের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে ঐতিহ্য ও সমন্বয়বাণী যুগান্ত থেকে প্রসারিত হয়ে এসেছে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই ধারারই বাহক। বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবার মূলে রয়েছে গভীর অধ্যাত্মবাদ এবং সেই অধ্যাত্মবাদই তাঁর মানবতা ও মানসিক প্রমূল্যের ভিত্তি রচনা করেছিল। বিবেকানন্দের সেই মানবতার রাষ্ট্রতাত্ত্বিক প্রকাশকেই আমরা বলতে পারি গণতন্ত্রবাদ। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র একদিন বলেছিলেন : "যে-গণতন্ত্র বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন সেই গণতন্ত্রই দেশবন্ধু দাশের লেখায় ও কার্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারায়ণ বাস করেন তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা চাষ ক'রে, কঠিন পরিশ্রম ক'রে দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হয়েও যাঁরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোক জ্বালিয়ে রেখেছেন।" সুভাষচন্দ্রের এই মানবতাবোধই তাঁকে ভারতবর্ষের জনমানসে স্থায়ী আসন দিয়েছে। জাতীয়-সংগ্রামের মূলে তিনি যে প্রেরণা দিয়েছেন মানবতা ও দেশাত্মবোধই তার ভিত্তি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ আজও তাই লক্ষ লক্ষ তরুণ মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা ক'রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—"বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।...আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই; মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।...তোমার এই পবিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।...আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।" চোখ বুজলে আজও আমরা দেখতে পাই সেই সুভাষচন্দ্রকে যিনি দুঃসাধ্যের সাধনায় দুর্গমের পথে এক দুঃসাহসী পরিব্রাজক, কণ্ঠে যাঁর দুঃখ-জয়ের দুর্বার পিপাসা, চক্ষে যাঁর স্বর্ণসূর্যবিম্বিত দিগন্তের স্বপ্ন; মর্মে যাঁর অতীতের মহৎ ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরে ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশাকে প্রতিষ্ঠিত করার কঠোর সংকল্প। ভারতের জাতীয়-সংগ্রামের সেই মহান্ অধিনায়ক আমাদের চিরস্মরণীয়।

মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ'-কে সাধারণত মহাকাব্য আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের যে-সব লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'মেঘনাদবধে' সেই সব লক্ষণ পুরোপুরি নেই। অথচ, মহাকাব্য ছাড়া এমন আর কোনো সংজ্ঞা নেই যা দিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে অভিহিত করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে রামায়ণ-মহাভারতকে নিয়ে। আমাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতও মহাকাব্য, আবার 'মেঘনাদবধ'ও মহাকাব্য। অথচ, রামায়ণ-মহাভারত যে-শ্রেণীর মহাকাব্য, মেঘনাদবধ সে-শ্রেণীর মহাকাব্য নয়। কাজেই, মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি কি তাই আমাদের দেখতে হবে সবার আগে।

ভূমিকা

মহাকাব্য, এই নামেই তার স্বরূপত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই শ্রেণীর কাব্যের পরিধি ক্ষুদ্র নয়, তা যেমন মহৎ, তেমনি বিরাট। মহাকাব্য নদীর কলোচ্ছ্বাস নয়—সমুদ্রের গর্জন। তা কবি-মনের ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র নয়,—তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিণতি। মোটামুটিভাবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে পুরাণের অন্তর্গত কোনো প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতা, কোনো সংকুলজাত ব্যক্তি, যশস্বী ক্ষত্রিয় নৃপতি অথবা চন্দ্রসূর্যের মতো কোনো উচ্চরাজবংশচরিত অবলম্বনে ছন্দে রচিত যে-কাব্যকাহিনী তাই মহাকাব্য পদবাচ্য। আশীর্বচন, মঙ্গলাচরণ বা বস্তুনির্দেশের পর কাব্যারম্ভ হয়। এই কাব্যের নায়ককে হতে হয় 'ধীরোদাত্তগুণ-সমন্বিত', অর্থাৎ তার চরিত্র হবে মহৎ এবং সর্বগুণসমন্বিত। কমপক্ষে আটটি সর্গে মহাকাব্য রচিত হবে এবং সর্গগুলি হবে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব। প্রত্যেক সর্গে থাকবে পরবর্তী সর্গের আভাস এবং মহাকাব্যের পটভূমি হবে স্বর্গমর্ত্য-পাতাল প্রসারী। এক বা বিভিন্ন ছন্দে রচিত হবে সর্গগুলি। প্রধানত বীর, করুণ, আদি, শান্ত এই চারটি রসের সমন্বয়ে বা পৃথকভাবে হবে তাদের প্রাণসঞ্চার। গৌণভাবে অন্যান্য রসেরও আবির্ভাব হ'তে পারে। প্রসঙ্গক্রমে এতে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, স্বর্গমর্ত্য-পাতালের বিবরণ এবং প্রকৃতির রূপবর্ণনাও থাকবে। মহাকাব্যের ভাষাও হবে বিষয়বস্তু ও নায়কের মতোই বলিষ্ঠ, প্রাঞ্জল ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক। বিষয়বস্তুর প্রধানতম বিষয়কে অবলম্বন ক'রেই হবে প্রত্যেক সর্গের নামকরণ। নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই হবে মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি। মহাকাব্য একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। সেই সঙ্গে ধর্মনীতিও অলক্ষ্যে এর সঙ্গে বিজড়িত থাকে। ইতিহাস, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় মহাকাব্যের পাতায় পাতায়। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য হলো National Literature বা জাতীয় সাহিত্য। একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, বীরত্ব-সাধনা, ত্যাগ-মহত্ত্ব তার মহাকাব্যে সুস্পষ্ট আকারে প্রতিফলিত হয় এবং একটি সমগ্র দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণসমূহ

একাধারে কাব্য ও ইতিহাস

মহাকাব্যে রূপলাভ করে। কোনো ক্ষুদ্র অবস্থা বা ক্ষুদ্র মুহূর্তকে নিয়ে নয়, সাময়িক অনুভূতি, উত্তেজনা বা সংকীর্ণতাকে নিয়ে নয়, দেশ-কাল-পাত্রে পরিব্যাপ্ত ঘটনা ও ভাবকে অবলম্বন ক'রে মানব-মনের সম্মুখে কবি তাঁর সৃষ্টিকে চিরকালের সামগ্রী ক'রে তোলেন। মহাকাব্যের এই শাশ্বত রূপই তার বিশেষত্ব, তাতেই মহাকাব্যের সার্থকতা। আমাদের দেশের ব্যাস-বাল্মীকি প্রাচীন ভারতের সাধনার বিভিন্ন ধারাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রকৃতির মূল সাধনা ও ধর্ম, এই প্রাচীন মহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, একটি প্রাচীন মহাজাতির ইহকালের আশা, পরকালের আকাঙ্ক্ষা, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-মূর্তিটি পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন তাঁদের দুই মহাকাব্যে—রামায়ণে ও মহাভারতে। পাশ্চাত্ত্য ভূ-খণ্ডের মহাকাব্য তেমনি—হোমারের 'ইলিয়ড্'। গ্রীক আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'এপিক'।

মহাকাব্য ও এপিক

নামে ভিন্ন হ'লেও 'মহাকাব্য' ও 'এপিক' সমধর্মী; যদিও তাদের প্রকৃতিগত লক্ষণ সর্বাংশে এক নয়। অ্যারিস্টটল বলেন যে, এপিক আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত বর্ণনাত্মক এক কাব্য। তাতে বিশিষ্ট কোনো নায়কের জীবনকাহিনী অখণ্ডরূপে একই ছন্দের সাহায্যে কীর্তিত হয়। এপিকে যে সমস্ত চরিত্র নিয়ে কারবার তারা যদি বীর, মহৎ, ক্ষমতাশালী বা বিশেষ গুণসম্পন্ন না হয় তাহ'লে এপিকের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। অ্যাবারক্রম্বে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"A story with the epic purpose could not proceed at all, unless it were expressed in persons big enough to support it." ইতিহাসের সঙ্গে এপিকের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই ব'লে গল্পাংশের জন্য যে প্রতিপদেই ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। এপিক-রচয়িতা শুধু ঐতিহাসিক পটভূমিকাটুকু গ্রহণ ক'রে কল্পনার সাহায্যে সমস্ত আখ্যানভাগটি নিজের মনের মতো ক'রে লিখতে পারেন। এপিকের চরিত্র ঐতিহাসিক হয়েও ইতিহাসের একটিও কাজ না করতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও এমন অনন্যসাধারণ মহোচ্চ গুণাবলী থাকবে, যার সঙ্গে লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যা অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর, এবং হৃদয়কে যা প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব যদি রচনানৈপুণ্যের চাতুর্যে বর্ধিত না হয় তাহ'লে এপিকের মর্যাদা নষ্ট হয়। এপিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো তার নাটকত্ব। নাটকীয়ভাবে কাহিনীর সূত্রপাত হবে, ঠিক যেমন হয়েছে মেঘনাদবধ-কাব্যে বীরবাহুর প্রসঙ্গ নিয়ে। অ্যারিস্টটল গল্পাংশকে বাদ দিয়ে কাব্যান্তর্গত চরিত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে চরিত্রগুলির যদি নাটকীয় অভিনয় না থাকে তাহ'লে 'এপিক' শুধু অদ্ভুত উপন্যাসেই পর্যবসিত হয়। "The personages in an Epic are made individual by their dramatic conduct and their speeches in various circumstances." মহাকাব্যের মতো এপিকের পটভূমিও স্বর্গমর্ত্যপাতালপ্রসারী। তাই প্রয়োজন অনুসারে 'এপিক-রচয়িতারা' তাতে অতিলৌকিক বা অলৌকিক কিছুর সন্ধান দেন।

কিন্তু তা এপিকের গৌণ লক্ষণ। ঘটনাবর্তের জটিলতা তাতে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে থাকবে বহুবিধ চরিত্রের সমাবেশ—তাই বর্ণনার মধ্য দিয়ে যাতে একটি অখণ্ড শিল্পসঙ্গত সৌন্দর্যবোধ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে, কবিদের সেইদিকে থাকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। প্রাচ্য মহাকাব্যের মতোই পাশ্চাত্ত্য এপিকের ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন ওজস্বী এবং অলঙ্কারবহুল। তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচ্যমতে যা মহাকাব্য, পাশ্চাত্ত্য মতে তাই এপিক। তবে সংস্কৃতের আলঙ্কারিকেরা কতকগুলি সংস্কার বজায় রেখেছেন, গ্রীক আলঙ্কারিকেরা সে বিষয়ে উদার মত পোষণ করেছেন। মহাকাব্যের নায়কের মতো এপিকের নায়ককে যে দেবচরিত্র কিংবা কোনো উচ্চরাজবংশোদ্ভূত ব্যক্তি কিংবা কোনো নৃপতি হ'তে হবে এমন কোনো সংস্কার গ্রীক আলঙ্কারিকদের ছিল না। কিন্তু তাঁরা বলেছেন যে, এপিকের নায়ককে বীর হ'তে হবে। মাইকেলের মেঘনাদবধ-কাব্য গ্রীক এপিকের আদর্শে রচিত ব'লে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে নায়কের আসন অধিকার করতে পারেননি, কিন্তু অনার্য-বংশোদ্ভূত রাবণ ও মেঘনাদ সেই মহোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এপিক

হোমারের ইলিয়ড্ এবং ব্যাসের মহাভারত উভয়কেই আমরা এপিক বলতে পারি। কিন্তু আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলা যায়—Authentic Epic। এই শ্রেণীর এপিক বা মহাকাব্যে জাতির সহস্রবর্ষের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন যেন আমরা অনুভব করি। এই জাতীয় মহাকাব্যের পর্যায়ে কালিদাসের 'রঘুবংশ' কিংবা ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', কিংবা মাঘের 'শিশুপালবধ', কিংবা মাইকেলের 'মেঘনাদবধ-কাব্য'—কোনটাই পড়ে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকেই আমরা অনায়াসে এপিক শ্রেণীর মহাকাব্য ব'লে অভিহিত করতে পারি। এই জাতীয় মহাকাব্য বা এপিককে বলা যেতে পারে Literary Epic। সাহিত্যের দিকটাই এই জাতীয় মহাকাব্যের প্রাণবস্তু। ভার্জিলের 'ইনীড'; ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলীভারড', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' প্রভৃতিকেও এই শেষোক্ত পর্যায়ে ফেলা যায়।

মেঘনাদবধ-মহাকাব্য

মেঘনাদবধ-কাব্যকে মহাকাব্য বিশেষণে মর্যাদা দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত। কিন্তু, এপিক যে হিসাবে মহাকাব্য, সেই হিসাবে আমরা মেঘনাদবধ-কাব্যকেও মহাকাব্য আখ্যায় অভিহিত করতে পারি। এ-কথা সত্য যে, মাইকেল প্রতীচ্য আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ব'লে, মেঘনাদবধ-কাব্যকে তিনি পাশ্চাত্ত্য-এপিকের ছাঁচেই রূপ দিয়েছেন। তাই এতে এপিকের লক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। নাটকীয়ভাবেই মেঘনাদবধ-কাব্যের আরম্ভ হয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ করেছে সেই নাটকীয় ভাবের সূচনা। তাছাড়া রাবণের চরিত্রও সম্পূর্ণ নাটকীয়। এই কাব্যে মূল-ঘটনা ইন্দ্রজিৎ-বধ। মাইকেল হেক্টরবধের আদর্শে ইন্দ্রজিতের নিধন ও তার শ্মশানকৃত্যেই কাব্যের সমাপ্তিরেখা টেনেছেন। ইন্দ্রজিৎ অনার্যবংশোদ্ভূত, কাজেই, সে মহাকাব্যের নায়ক-পদবাচ্য নয়। কিন্তু, মধুসূদন তাকে বীররূপে অঙ্কিত করেছেন,—সে Epic

hero-র মর্যাদা লাভ করেছে। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের কাছে তাই রাম-লক্ষ্মণ দেব-চরিত্র হয়েও নিষ্প্রভ। হয়তো এতে পুরাণকে উপেক্ষা করা হয়েছে,—ঐতিহাসিকতা বা traditional truth-কেও মানা হয়নি, কিন্তু এপিক-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। নর-বানর প্রভৃতি মর্ত্য-জীবের পাশে ইন্দ্র, বারুণী, লক্ষ্মী, শঙ্কর, পার্বতী, মায়া, মদন, রতি প্রভৃতি দেবতারা দাঁড়িয়ে তাঁদের সহযোগিতায় ঘটনাবলীকে পরিণতির পথে পরিচালিত করেছেন। এ সমস্তই এপিক-লক্ষণাক্রান্ত। ছন্দের গাম্ভীর্যে এবং শব্দ-যোজনার পারিপাট্যেও এপিক-মহিমা অনেকাংশেই বজায় আছে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে।'

মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'লেও, বাংলার মাটিতেই তাঁর জন্ম। ভাবপ্রবণ বাঙালী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে তাই তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

'মেঘনাদবধ'-এ লিরিকের সুর—উপসংহার

তাই এপিক-মেঘনাদবধ-কাব্যের জায়গায় জায়গায় তাঁর লিরিক-উচ্ছ্বাস সু-পরিস্ফুট। সীতা-সরমার কথোপকথনে, প্রমীলার চরিত্রে, চিত্রাঙ্গদার বিলাস, এমনকি রাবণের চরিত্রেও সেই গীতিকাব্যের সুরটি আমরা লক্ষ্য করি। যে যে অংশে গীতিকবিতার মাধুর্য ফুটে উঠেছে, মেঘনাদবধ-কাব্যের সেই সেই অংশই হয়েছে চমৎকার। মাইকেলের সংকল্প ছিল 'বীর রসে ভাসি' বীররসাত্মক কাব্য রচনা করবেন। কিন্তু বীর-রস শেষ পর্যন্ত করুণ-রসে পর্যবসিত হয়েছে। গ্রীক পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে কবি বঙ্গরঙ্গভূমে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু অভিনয় করেছেন শেষ পর্যন্ত বাঙালীর। বিদ্রোহী হয়েও তিনি বাংলার মর্ম এবং বাঙালীর ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। মাইকেল মধুসূদনের কবিকৃতি এইখানেই সার্থকতা লাভ করেছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের পাঠকসমাজে শরৎচন্দ্র 'দরদী কথাশিল্পী' নামে পরিচিত। এই 'দরদী' বিশেষণটি হয়তো আরও বহু সাহিত্যিকের নামের পূর্বে বসানো চলে, কিন্তু যে-ভাবে তা শরৎচন্দ্রকে বিশেষিত করে তার বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে।

ভূমিকা

সাহিত্যের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র যে সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে বাংলাদেশের ঘরোয়া-কাহিনী বিবৃত করেছেন, যে-ভাবে এদেশের অবহেলিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রতিহিংসার ছবি এঁকেছেন, তার মধ্য দিয়ে এই সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শরৎচন্দ্র মূলত মানবপ্রেমিক। মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ না থাকলে মানুষের হাসি-কান্নায়, দুঃখ-সুখের রূপ বিশ্বাসযোগ্যরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের এই দরদ ছিল ব'লেই তাঁর আঁকা প্রতিটি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের

দুঃখে পাঠক ফেলেছে চোখের জল, তাদের আনন্দে তৃপ্তি পেয়েছে সে। পাঠকের মনকে এইভাবে আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন ব'লেই শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠক-সমাজে 'দরদী কথাশিল্পী'-রূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে দুইজন অসামান্য প্রতিভাধর কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরা হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে হ'লে তাঁর পূর্বসূরী এই দুই সাহিত্য-স্রষ্টার সাহিত্যকৃতিকেও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, এই দুই অসামান্য প্রতিভার রশ্মিছটায় উদ্ভাসিত বঙ্গসাহিত্য-গগনে শরৎচন্দ্র কোন গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এতে ক'রে তাই বোঝা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তাছাড়া সার্থক বাংলা-উপন্যাসের সূচনাও করেন তিনি। ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি যে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করে-ছিলেন তাঁর সময়কার পাঠকদের কাছে তা সম্পূর্ণ অভিনব। তাড়া, তখনকার আদর্শবাদী-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুনত্বের সন্ধান দেওয়ায় তাঁর প্রতি সকলেরই বিশেষ একটা দৃষ্টি পড়েছিল। অবশ্য, সমাজের প্রচলিত রীতিকেই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ ক'রে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বঙ্কিমচন্দ্র যে মাধুর্যপূর্ণ কবিত্বময় ভাষায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস রচনা করেছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে-সময় তার কোনো তুলনাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রাজরাজেশ্বর'। কি ভাষায়, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি ঘটনা-সংস্থাপনে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। উপন্যাসের দিক থেকে বলেই বঙ্কিমসাহিত্যকে মূলত কাব্যধর্মী বা রোমান্সধর্মী বলা যায়। আদর্শবাদও তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার যখন উপন্যাসে নিতান্তভাবেই দীন, বঙ্কিমচন্দ্রই তখন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের সাহায্যে তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাব হ'লেও, তাঁরা কেউই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু, অনন্যসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী হয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মূলত কবি হ'লেও, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্ব-সাহিত্যে তা দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের জীবনকে অবলম্বন ক'রেই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়েছিল মধ্যবিত্ত-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র রূপ। তাছাড়া, তিনি যে-ভাবে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে-ভাবে নিজস্ব আদর্শে তাঁদের হৃদয়বৃত্তি বিচার করেছেন, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী সংস্কার-মুক্ত এবং বাস্তবধর্মী। ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করলেও, কথাসাহিত্যের দরবারে তিনি যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন সে-বিষয়ে সকলেই একমত।

শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশে রেডিও ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের অধিকাংশ মানুষই আজ যেন বেতার-সচেতন। কিন্তু এদেশের শতকরা ৭৫-জন মানুষই বাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং শহর-পল্লী নির্বিশেষে দেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতে বেতার-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কতদূর সার্থকতালাভ করেছে এবং সেই সম্প্রসারণ কাজের সঙ্গে যে-সব সমস্যা জড়িত তার গুরুত্ব কতখানি, তা সহজেই বোঝা যাবে।

পল্লী-অঞ্চলে বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের গুরুত্ব

গণজীবনে বেতারের প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে, ভারতের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে বেতার ব্যবস্থা যাতে প্রসারলাভ করে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি। পল্লীর যাঁরা সম্পন্ন মানুষ, অর্থাৎ একটা রেডিও কেনবার সামর্থ্য যাঁদের আছে, তাঁরা যাতে রেডিও ক্রয় করেন এবং তার যথাযথ ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে তাঁদের উদ্যোগী ক'রে তুলতে উপযুক্ত প্রচারকার্যের প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি। অর্থাৎ, বাড়িতে রেডিও থাকলে কী কী সুবিধা হ'তে পারে কিভাবে অতি সহজেই রেডিও ব্যবহার করা যায়, কোথায় কিভাবে ঐ রেডিও পাওয়া যায় এবং তাতে খরচই বা কত পড়ে, কোথায় কিভাবে রেডিওর লাইসেন্স করতে হয় ইত্যাদি তথ্য পল্লীবাসীদের সুস্পষ্টভাবে জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, পল্লীতে এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম হবার কথা নয়, যাঁরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরিচয়ের সংকোচের জন্যই এদিকে অগ্রসর হন না। তাছাড়া, যাঁরা দরিদ্র তাঁরা যাতে বেতারযন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য পরিকল্পনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার প্রথমে দুই-তিনটি গ্রামের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে, পরে প্রতি গ্রামের একটি কেন্দ্রীয় জায়গায় এবং আরও সম্ভব ও সুবিধা হ'লে প্রতি গ্রামের সুবিধামতো দুই-তিনটি জায়গায় বেতারযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সুখের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিককালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন এবং পল্লীর জনসাধারণের সুবিধার্থে কম খরচের 'কমিউনিটি রেডিও লিসনিং সেট' সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন উন্নয়ন-ব্লকে এই জাতীয় 'সমষ্টি-বেতার-শ্রবণ-যন্ত্র' আজকাল প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। পল্লীতে পল্লীতে বেতারযন্ত্র স্থাপিত হ'লেই যে সবকিছু করা হ'লো এরূপ ধারণা করা উচিত নয়। সেই বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে পল্লীবাসীদের উপযোগী সবরকম অনুষ্ঠানসূচি প্রচারিত হচ্ছে কিনা সে-বিষয়েও কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। বেতার মারফত আজকাল হিন্দীভাষা শিক্ষাদানের যে-রকম ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনিভাবেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিরক্ষর পল্লীবাসীদের উপযুক্ত একটি পাঠক্রম নির্ধারিত ক'রে তা যদি প্রচার করা হয় তাহ'লে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে যে তা বিশেষ সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, পল্লী-সংবাদ পরিবেশনের জন্যও সপ্তাহে অন্তত একটি সময় নির্দিষ্ট রাখা যেতে পারে। পল্লীবাসীদের কাছে পল্লী সংবাদের গুরুত্ব অনেকখানি। পল্লীবাসীদের জন্য প্রচারিত

সংবাদ, কথিকা, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতির ভাষা সহজ ও সরল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সাধারণভাবে সমগ্র গণজীবনের নৈতিক মানের আদর্শ উঁচু ক'রে তোলার ব্যাপারে 'আকাশবাণী'র মাধ্যমে কার্যকরী কী কী ব্যবস্থা হ'তে পারে সে-বিষয়েও আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে। কারণ, সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক জীবনের মান ইতিমধ্যেই যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়।

উপসংহার

পল্লী-অঞ্চলে বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মতোই ভারতের প্রতিটি শিক্ষায়তনে যাতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র স্থাপিত হয় জাতীয়-সরকার সে-বিষয়েও আজ সচেতন হয়ে উঠেছেন। এটা আশা ও আনন্দেরই বিষয়। কারণ-শিক্ষায়তনই ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষার্থীরা যাতে বেতারযন্ত্র মারফত পাঠ্যবিষয়-সংক্রান্ত এবং পাঠ্যবিষয়-বহির্ভূত নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়, আধুনিককালে তার ব্যবস্থা করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই নয়, বাস্তবসম্মত। আনন্দের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানলাভ তার কার্যকরী ব্যবস্থা রেডিও আর টেলিভিশনের মাধ্যমেই সহজসাধ্য। টেলিভিশন-ব্যবস্থা যতদিন না সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠছে ততদিন বেতারযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

সেনেট হাউসের প্রেতাত্মার নিজস্ব কাহিনী

ভূমিকা

আমি কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত সেনেট হাউস। প্রেতাত্মার মতো আমি আজ ঘুরে বেড়াচ্ছি তোমাদের আশেপাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী-উৎসব যেদিন শেষ হ'লো কর্তৃপক্ষেরা সেদিন ঠিক করলেন আমার বদলে নতুন এক সেনেট হাউস তাঁরা চান, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমি নাকি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। কিন্তু, বয়স আমার তখন চুরাশি বছর হ'লেও, আমি যে কতখানি শক্ত ও সমর্থ ছিলাম সে-কথা আর কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক আমি জানি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী। কী ক'রে যে, বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ আমাকে বাতিল ক'রে দেবার কথা ভাবতে পারলেন আমি আজও তার সঠিক কারণ খুঁজে পাইনি। অথচ কলকাতায় এমন অনেক বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে, বয়সের দিক থেকে যারা আমার চেয়ে অনেক বড। যেমন রাজভবন, টাউনহল, কিংবা পার্কস্ট্রীটের ঐ এশিয়াটিক-সোসাইটির বাড়ি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেই তাদের জন্ম। অথচ, আমি জন্ম নিয়েছি উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে, অর্থাৎ ১৮৭২-সালে—আমিই সবার আগে বাতিল হয়ে গেলাম! কথাটা চিন্তা করতে গেলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। উঃ, কী ভয়ঙ্কর সেই

দিনগুলি, শাবল-গাইতির কল্যাণে যখন আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছি, বুকের পাঁজর আমার ভেঙে গেছে। আমাকে ওরা ওভাবে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে একেবারেই কণ্ঠরোধ করলে না কেন ভগবান! অমন অপঘাতে কেন যে আমার মৃত্যু হলো—সেকথা আজও আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে, আমার সেই অন্তিম অবস্থায় তারা যে মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলে আমি তা জানি। আমাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরাট ও সুমহান এক ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছিল তোমরা হয়তো শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা স্মরণ করবে, আমার জায়গায় যে নতুন সেনেট হাউস একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে তার দিকে তাকিয়ে তোমরা হয়তো আমার জন্য নীরবে দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করবে। কিন্তু, যা হবার, তা তো হয়ে গেছে, সেজন্য আর দুঃখ ক'রে লাভ কি? কালের পরিবর্তনে, প্রয়োজনের খাতিরে, এমনি ক'রেই তো পুরাতনকে স'রে যেতে হয়, জায়গা ক'রে দিতে হয় নবীনকে। আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার আগে আজ তাই তোমাদের শোনাতে বসেছি আমার আত্মকাহিনী—শোনাতে বসেছি এই আশায় যে, তোমরা আমার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারবে, স্মরণের মণিকোঠায় হয়তো বা স্থান দেবে, আমার প্রতি স্নেহ ও করুণার বশেই; চিরশূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে সেই তো হবে আমার সান্ত্বনা।

স্মরণযোগ্য আত্মকথা।

১৮৫৭-সালের জানুআরি মাসে যখন কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না। সে-সময় কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসী ছিলেন বড়লাট। তিনি একটি হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে সেনেটের সভা মেডিক্যাল-কলেজের সভাগৃহে বসতে পারে। কিন্তু, সেখানে সেনেটের কোনো সভা বসেছিল কিনা সে-খবর আমার জানা নেই। সাধারণত, প্রথম কয়েক বছর সেনেটের সভা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য মিটিং ভাইস-চ্যান্সেলার বা রেজিস্ট্রারের বাড়িতে কিংবা সরকারী দপ্তরখানা রাইটার্স বিল্ডিংসে বসত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা চেয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য তাঁরা যে বিরাট জমি কিনে রেখেছিলেন সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করা হোক। কিন্তু যে-কারণেই হোক প্রেসিডেন্সী কলেজের সীমানার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সে-সময় সেনেটের সভানুষ্ঠানের সমস্যা ছাড়া আরও এক সমস্যা ছিল ছাত্রদের পরীক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে। জায়গার অভাবে, ১৮৬৬-সালে একটি অসমাপ্ত ডাকঘরের বাড়িতেই বাধ্য হয়ে পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হয়। কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের যে প্রথম থেকেই বাড়ি তৈরি করবার কথা মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু, তার বাধা ছিল অনেক। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ছ' মাসের মধ্যেই সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে

সেনেট হাউস প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা।

সে-সময় এ-সব কাজে টাকা খরচ করবার মতো অবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিলাতে কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কেউ কেউ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সে যাই হোক, ১৮৬২-সালের গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ ও তদানীন্তন রেজিস্ট্রারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান ক'রে একটি রিপোর্ট দিতে বলেন। তাঁরা জানান যে, কলুটোলা স্ট্রীটের কাছে মেডিক্যাল-কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের যে জমি আছে তারই কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। সেই বছর জুন মাসে সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভায় গৃহনির্মাণের প্রস্তাব পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হয়। ঠিক হয় সেই নতুন বাড়িতে সেনেট ও অন্যান্য সভাসমিতির জন্য যেমন নির্দিষ্ট সভাকক্ষ থাকবে, তেমনি থাকবে গ্রন্থাগার, রেজিস্ট্রারের দপ্তর, মহাফেজখানা, ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের জায়গা ইত্যাদি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লো বটে, কিন্তু তা কার্যকরী করার জন্য তখনকার সরকারী মহলে কোনো তৎপরতা দেখা গেল না। প্রায় দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৬৪-সালে বড়লাট লর্ড লরেন্স, ছোটলাট সিসিল বীডন এবং ভাইস্-চ্যান্সেলার হেনরি সাম্‌নার মেইন প্রেসিডেন্সী কলেজের দক্ষিণ দিকের জায়গা ঘুরে দেখে ঠিক করলেন যে, সেই জায়গাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের পক্ষে প্রশস্ত। ব্যস্, তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল সেনেট হাউস তৈরির কাজ, অর্থাৎ আমার জন্মের সূচনা দেখা গেল সেই বছর।

সেনেট হাউসের জন্ম

আমার জন্মের জন্য আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ তখনকার সরকারী ইঞ্জিনীয়ার গ্রেন্‌ভিল-সাহেবের কাছে। কারণ, তিনিই আমার রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন চমৎকার এক নকশা এঁকে। ভারত-সরকার সে-সময় আমার সূতিকাভূমি অর্থাৎ জমির জন্য ৮১,৬৬০ টাকা এবং আমার জন্ম ১,৭০,৫৬১ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খরচ হয়ে গেল অনেক বেশী। বাড়ি ও জমি মিলিয়ে মোট খরচ হ'লো ৪,৩৪,০০০ টাকা। আজকের দিনে এই খরচ যে প্রায় কুড়ি লক্ষে গিয়ে দাঁড়াত সে-কথা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারবে। প্রথমে ঠিক ছিল যে, ১৮৬৮-সালের মধ্যেই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাকে গ'ড়ে তুলতে সময় লাগে আরও চার বছর। ১৮৭২-সালের শেষদিকে আমার জন্ম হয়। আর, আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ ক'রে নেওয়া হয় পরের বছর মার্চ মাসে সমাবর্তনের সময়। সেদিন যারা আমাকে দেখেছিল তাদের চোখে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, তারা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি যে, ইঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যার সাহায্যে কোনো অট্টালিকার এমন প্রশান্ত-গম্ভীর রূপ দেওয়া সম্ভব।

আমার যখন জন্ম হয় সে-সময় আমার পারিপার্শ্বিক রূপ কিন্তু একালের মতো এমন সুন্দর ছিল না। আমার উত্তরে ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং পূবদিকে ছিল গোলদীঘি। কিন্তু আমার ও কলুটোলা স্ট্রীটের মাঝের জায়গায় অনেকদিন পর্যন্ত ছিল একটা নোংরা বস্তি আর বাজার। সেদিকে তাকিয়ে গা আমার ঘিন্‌ঘিন্

ক'রে উঠত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার আক্ষেপ দূর হয়, ঐ জায়গায় পরে দুটো বাড়ি ওঠে—পশ্চিমে ওঠে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, আর দক্ষিণে আশুতোষ বিল্ডিং।

সেনেট হাউসের পরিচয়

যত বাড়িই উঠুক, সবাই কিন্তু আমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে এবং রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে গেলেই সবিস্ময়ে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যায় আমাকে দেখতে। সকলের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল আমার ঐ উঁচু উঁচু থামগুলি আর প্রশস্ত সিঁড়ি। আমার ভেতরকার হলঘর দৈর্ঘ্যে ছিল ২০০ ফুট, আর প্রস্থে ছিল ৬০ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণ দিককার বারান্দা দু'টিও ছিল ২০ ফুট ক'রে চওড়া। ধীরে ধীরে আমাকে সাজানো হয় নানাভাবে; শিক্ষক-ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলের স্নেহে, ভালোবাসায় আমি লালিত-পালিত হই। আমার পূবদিককার বারান্দায় যেদিন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্মর-মূর্তি স্থাপিত হ'লো, সেদিন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কারণ, অমন মনীষার মূর্তি যে আমি বুকে ক'রে রাখতে পারব সে তো ছিল আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার একটি ঘরে বহুদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছিল; কত-না অধ্যাপক, ছাত্র, জ্ঞানী, গুণী ও মনীষার পায়ের ধুলো পড়ত আমার প্রকোষ্ঠে, অলিন্দে, সভাগৃহে। পশ্চিমদিককার একটি ঘরে যেখানে সিণ্ডিকেটের সভা বসত, পরে সেখানে আশুতোষ-মিউজিয়ম স্থাপিত হয়, এবং সিণ্ডিকেটের সভা বসতে থাকে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের দোতলায়।

আমার প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বাংলাদেশের সকল বরেণ্য সন্তানই আমার সভাগৃহে পদার্পণ করেছেন। দেশে যাঁরা বিখ্যাত তাঁরা সবাই কোনো না-কোনো সময়ে সেনেটের সভাক্ষেত্রে বক্তা বা শ্রোতার আসন গ্রহণ করেছেন। ১৯১৩-সালে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন, এবং তার

মনীষীদের স্মৃতি-বিজড়িত সেনেট হাউস

দশ বছর পরে আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরশুভার্থী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কবিগুরু আবার এখানে এসে 'সাহিত্যের পথে' নামে কয়েকটি অমূল্য বক্তৃতা দিয়ে যান। সেইসব স্মৃতি মনে পড়লেই বুক আমার আনন্দে ও গর্বে ভ'রে ওঠে, মৃত্যুর পরেও যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাই। কবিগুরু আরও কয়েকবার তাঁর পদধূলি দিয়েছেন আমাকে। বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তানদের মৃতদেহ আমার সামনে নিয়ে আসবার একটা রীতিও ছিল সেকালে। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এভাবে আমাকে সম্মানিত করা হ'লেও বাংলামায়ের কৃতী সন্তানদের বিয়োগ-ব্যথায় মন আমার ভেঙে পড়ত, অশ্রুসজল চোখে আমি তাই কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি গোলদীঘির ঐ জলের দিকে তাকিয়ে। বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তানরা আমাকে যেমন নানাভাবে স্নেহসিক্ত ও গৌরবান্বিত করেছেন, ভারতের বহু মনীষী এমন কি বহির্ভারতের অনেক জ্ঞানী ও গুণী আমার দরবারে এসে আমাকে করেছেন ধন্য।

আমার জন্ম হয়েছিল প্রধানত ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ এবং সমাবর্তনের জন্যই ;

সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজেও যাতে আমি লাগতে পারি তারও ব্যবস্থা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি সুখীই হয়েছিলাম। প্রাচীন গ্রীক রীতিতে আমার বহিরঙ্গ গঠিত হ'লেও অন্তরঙ্গে আমি সম্পূর্ণ ভারতীয়। অনেকের হয়তো মনে পড়বে—

উপসংহার

আমার সভাকক্ষের পেছন দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি জিনিস ছিল। সেটি কী, তোমরা তা জান কি? আর কিছু নয়, শব্দপ্রক্ষেপণযন্ত্র। সেকালে তো মাইকের এমন দৌরাত্ম্য ছিল না, কাজেই ঐ যন্ত্রটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মাইক্রোফোন যেদিন এলো সেদিন ঐ যন্ত্রটিকে সরিয়ে নেওয়া হ'লো আমার কক্ষ থেকে। একসময় শুধু পরীক্ষাগ্রহণ ও সমাবর্তন-উৎসবের জন্যই আমার সভাকক্ষ ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু, স্বাদেশিকতার বন্যায় যখন দেশ ভেসে যায় তখন আমার বড় ইচ্ছা হ'ত সেই উন্মাদনার গৌরবময় অংশ নিতে। অথচ কর্তৃপক্ষ কোনো রাজনীতিক সভা করবার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে দিতে আদৌ রাজী ছিলেন না; কারণ তাতে ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরপেক্ষ নীতি এবং পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা ছিল। কলেজ স্কোয়ার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে উত্তেজনা যতই প্রবল হোক, সেনেট হলের ভিতরে সে-যুগের রাজনীতিক সভা কিংবা প্রবন্ধপাঠ সম্ভব ছিল না। কিন্তু, পরবর্তীকালে আমার সেই কৌলীন্য বজায় থাকেনি। বিপ্লবের উন্মাদনা আমার সমাবর্তনসভাকেও স্পর্শ ক'রে গিয়েছে। ১৯৫৬ সালে সেনেটের এক সভায় বাংলা-দেশের বিহারভুক্তির বিরুদ্ধে জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিই শুনেছিলাম আমি। আমার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সেই বোধহয় শেষ বড় সভা। কত কথাই না আজ মনে পড়ছে, সুখদুঃখের কত বিচিত্র অনুভূতিই না আমাকে আচ্ছন্ন করছে থেকে থেকে। যন্ত্র-দানবের রূঢ় আঘাত নিষ্পেষিত করেছে আমাকে, অপঘাতে মৃত্যু ঘটেছে আমার। নতুন সেনেট হাউসকে তোমরা হয়তো বরণ ক'রে নেবে সানন্দেই, পরলোকে এসেও আমার আত্মা শান্তি পায়নি, এখনও আমি ভুলতে পারিনি সেই রূঢ় আঘাতের দিনগুলি। প্রেতের মতো অশরীরী আমি আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে। তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ— তোমরা আমাকে ভুলো না, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দিয়ো না আমাকে।

পল্লবশীল

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের বহুবিধ বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের জীবনধারায় যে বিরাট পরিবর্তন এনেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান যে আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে প্রতিনিয়তই আমরা তা উপলব্ধি করছি। বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ আমাদের জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বহুরকম ব্যবস্থা হয়েছে; আমরা পেয়েছি

বাষ্পীয় শকট, জাহাজ, বিমান, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং আরও কত কি। বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ দেশবিদেশের দূরত্ব গেছে কমে, পৃথিবীর মানুষ আজ সময় ও দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ উপগ্রহ তৈরি করেছে এবং উদ্যোগ করছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার। কিন্তু, বিজ্ঞানের সব কিছুই সুখের হয়নি। বিজ্ঞান একদিকে যেমন বর ও অভয় দান করেছে, অন্যদিকে তেমনি দিয়েছে অভিশাপ। বিজ্ঞানের মন্ত্রবলেই মানুষ যেমন একদিকে নিজেকে দৈবীশক্তিতে শক্তিমান ক'রে তুলেছে অন্যদিকে তেমনি আবার আয়ত্ত করেছে দানবীয় শক্তি। বিষাক্ত গ্যাস, অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি যেদিন আবিষ্কৃত হ'লো মানুষের অস্বাস্থ্যকর, স্বার্থপ্রণোদিত, প্রতিযোগিতামূলক বুদ্ধি সেদিন তাকে ঠেলে দিল ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে, বিশ্বশান্তি সেদিন হ'লো বিঘ্নিত। বিশ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে দু'টি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। সেই দুই যুদ্ধে পৃথিবীর কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কত-না জাতীয়-সম্পদ্ বিনষ্ট হয়েছে এবং কত সমৃদ্ধ স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানকে পরাভূত করতে গিয়ে মার্কিন সামরিক শক্তি যেভাবে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাশিকি শহর দু'টিকে অ্যাটম বোমার সাহায্যে বিধ্বস্ত করেছে যে-কোনো সুসভ্য জাতির পক্ষেই তা কলঙ্কস্বরূপ। পারমাণবিক শক্তির সেই ভয়াবহ পরিণাম আজও আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি ; সে-কথা চিন্তা করলে শান্তিকামী মানুষ মাত্রেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

ভূমিকা—বিজ্ঞানের অপব্যবহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লো এবং জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব বজায় রাখবার শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘও স্থাপিত হ'লো। কিন্তু, যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হ'লো না আজও। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনও চলেছে অস্বস্তিকর একটা স্নায়ুযুদ্ধ। ইন্দোচীন, জার্মানী, এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনও পুরোপুরি শান্তি স্থাপিত হয়নি। নতুন ক'রে আবার অশান্তি শুরু হয়েছে আফ্রিকায়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখনও প্রবল মন-কষাকষি চলেছে এবং ভয়াবহ মরণাস্ত্র তৈরির ব্যাপারে এখনও দুই দেশ উদ্যোগী। পৃথিবীর এই দুই দেশ সামরিক অস্ত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের রাজনীতিক আদর্শ ও আত্মরক্ষার খাতিরে এক এক দেশের পক্ষাবলম্বন করছে। পৃথিবী যেন ভাগ হয়ে গেছে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটে, অর্থাৎ সোভিয়েট-ব্লক এবং মার্কিন ব্লকে। এক এক শক্তিগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হয় অনাক্রমণ-চুক্তি করছে, নয়তো বা সামরিক-জোট পাকিয়ে তুলছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আতলান্তিক সামরিক-চুক্তিতে। এই চুক্তির মূলে রয়েছে তাদের রাশিয়ার আক্রমণভীতি এবং কম্যুনিজম সম্প্রসারণের আতঙ্ক। পৃথিবীর কোনো ধনতান্ত্রিক দেশই রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়। অপরদিকে

স্নায়ু-যুদ্ধের ফলে অস্বস্তিকর অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক, বিশেষত কম্যুনিজম আদর্শে পরিচালিত, রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে ভয় করে এবং সেজন্য তাদের মধ্যেও একটা গভীর সঙ্ঘবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে রক্তক্ষয়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ অবাঞ্ছিত একটা স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

এশিয়ার শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠী সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে আমন্ত্রণ জানায় আতলান্তিক-চুক্তির অনুরূপ একটি অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে। কিন্তু, ভারত, ব্রহ্মদেশ, ও ইন্দোনেশিয়া সে-আহ্বানে সাড়া দেয় না। কারণ, বুঝতে পারে যে, শান্তির নামে পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিকেরা এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অশান্তির সৃষ্টি করতে চাইছেন। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি চিরদিনই নিরপেক্ষ, কোনোরূপ সামরিক-গোষ্ঠীতে যোগ দিতে ভারত বরাবরই অনিচ্ছুক। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া যেমন ভারতের মিত্র, ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি তার বন্ধু। তাছাড়া এশিয়ার শান্তিরক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রশক্তি কেন যে অহেতুক মাথা ঘামাবে ভারত সে-কথাও বুঝে উঠতে পারে না। ভারত বলে, এশিয়ার শান্তি এশিয়ার বিভিন্ন দেশই রক্ষা করবে, তার জন্যে ইউরোপের চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই, ইউরোপ শুধু নিজেদের শান্তিই বজায় রাখুক। শেষ পর্যন্ত, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিয়ে পাকিস্থান, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-সন্ধি-প্রতিষ্ঠান' বা SEATO-তে যোগ দেয়। সামরিক শক্তিজোট স্থাপন ক'রে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়, ভারতের মতো ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়াও সে-কথা উপলব্ধি করে বলেই উক্তি সন্ধি-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়নি। তাছাড়া, এশিয়ার অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রও এই জাতীয় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত সামরিক-জোট থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে।

সামরিক-জোটে যোগ দিতে ভারতের অনিচ্ছা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করেছে অহিংস গণ-আন্দোলনের পথে, রক্তক্ষয়ী কোনো সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নয়। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত সম্রাট্ অশোকের শান্তি-নীতি এবং সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর মৈত্রীর আদর্শে স্বাধীন ভারতবর্ষকে প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে যেমন আভ্যন্তরীণ সকল সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট, তেমনি বিবদমান এই পৃথিবীতে পারস্পরিক মৈত্রী স্থাপনে প্রয়াসী। ভারত বিশ্বাস করে রাষ্ট্রনীতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর যে-কোনো দেশ ইচ্ছা করলেই অপর দেশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারে এবং পারস্পরিক সেই সদিচ্ছা, প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমেই পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর ক'রে দেওয়া যায়। এই আদর্শে বিশ্বাস রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন তাঁর **'পঞ্চশীল'** বা স্থায়ী শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুশীলযোগ্য পঞ্চনীতি।

শান্তি-স্থাপনে ভারতের আগ্রহ

আজকের পৃথিবীতে 'পঞ্চশীল' নতুন মনে হ'লেও, কথাটি অতি পুরাতন। আড়াই হাজার বছর আগে মহাশান্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নৈতিক চরিত্র সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে 'দশশীল' নির্দিষ্ট করেছিলেন, শ্রীনেহেরু 'পঞ্চশীল' তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। বুদ্ধদেবের সেই 'দশশীল' হ'লো—(১) পাণাতিপাতা বেরমণী শিক্ষা-পদং ; অর্থাৎ, প্রাণিবধের চেতনা, বধের উপক্রম এবং বধ এ-সমস্তই গুরুতর অপরাধ, অতএব প্রাণিহত্যা করো না। (২) আদিন্নদানা বেরমণী শিক্ষাপদাং ; অর্থাৎ, পরের দ্রব্য অপহরণ যেমন অপরাধ, তেমনি অপহরণের চিন্তা বা উপক্রমও অপহরণের সামিল, অতএব চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করবে। (৩) কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, অব্রহ্মচর্যমূলক বাসনাকে জয় করতে শিখবে, কারণ ধর্মাচরণের পক্ষে তা প্রবল বিঘ্নস্বরূপ। (৪) মুসাবাদা বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, মিথ্যাভাষণ কখনও করবে না। (৫) সুরামেরেযমজ্জ-পদাদটঠানা বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য ও পিষ্টকজাতীয় আসব ধর্মাচরণকারীদের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। (৬) বিকাল ভোজনা বেরমণী শিক্ষাপদং, অর্থাৎ, অসময়ে ভোজনের ফলে আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা প্রভৃতি দোষ ঘটে ব'লে ব্রহ্মচর্য-পালনে সেগুলি ব্যাঘাত ঘটায়, তাই অকালে ভোজন-বিরতি শিক্ষা করা উচিত। (৭) নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্মন বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ ব্রহ্মচারীদের পক্ষে উচিত নয়। (৮) মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনটঠানা বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, পুষ্পমাল্য, আতর জাতীয় সুগন্ধি ও অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণে অকুশল চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় ব'লে ঐরূপ কোনো শোভাবর্ধনের চেষ্টা করা অনুচিত। (৯) উচ্চাসয়ন-মহাসয়না বেরমণী শিক্ষাপদং, অর্থাৎ, পুরুষের মুষ্টিহাতের একহাত উঁচু কোনো পালঙ্কে বা ব্রহ্মচারীর অযোগ্য কোনো বিলাসশয্যায় শয়ন করা গর্হিত। (১০) জাতরূপ-রজতপ্‌গটিপ্‌গহণা বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, সোনারুপা, টাকাপয়সা প্রভৃতি গ্রহণ না করাই শিক্ষণীয়। বুদ্ধদেবের এই 'দশশীল' ব্রহ্মচারীদের নৈতিক চরিত্রশুদ্ধির জন্যই রচিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীনেহরু তাঁর 'পঞ্চশীল' রচনা করেছেন ভিন্ন এক উদ্দেশ্যে। বুদ্ধদেবের প্রথম শীল-ই সম্ভবতো তাঁকে এই পঞ্চনীতি-নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, বুদ্ধের প্রথম নির্দেশই হ'লো প্রাণিহত্যা-বিরতি শিক্ষণীয়। এই প্রাণিহত্যার মনোভাবই তো রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূলে।

বুদ্ধদেবের দশশীল ও শ্রীনেহরুর পঞ্চশীল

শ্রীনেহরু 'পঞ্চশীল'-এর উদ্গাতা হ'লেও এই শব্দটি এ-যুগে প্রথম ব্যবহার করেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণ। ১৯৪৫-সালে যখন ইন্দোনেশিয়া জাপ-আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখনই তিনি 'পঞ্চশীল' অনুসরণের সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর সেই 'পঞ্চশীল' ছিল—(১) জাতীয়তা সংরক্ষণ ; (২) আন্তর্জাতিক সখ্যতা স্থাপন ; (৩) প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ; (৪) সামাজিক ন্যায়নীতি অনুসরণ ; এবং (৫) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। শ্রীনেহরু-প্রবর্তিত 'পঞ্চশীল'-এর সূত্র আমরা পাই

আধুনিক 'পঞ্চশীল'-এর উদ্ভব ও তার স্বরূপত্ব

তিব্বত সম্পর্কে ১৯৪৫-সালে সম্পাদিত ভারত-চীন চুক্তির মধ্যে। সে-সময় কিন্তু 'পঞ্চশীল'-কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৫৪-সালের ২৮-এ জুন তারিখে চীন থেকে প্রচারিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন্ লাইয়ের এক যুক্ত বিবৃতিতে। সেই থেকে বিশ্ববাসী জেনে আসছে যে, আধুনিক কালের 'পঞ্চশীল'-এর প্রবর্তক চু-এন্ লাই। বিশ্বশান্তিরক্ষার সহায়ক পন্থা হিসাবেই এই পঞ্চনীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এই পঞ্চনীতি হ'লো—(১) দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব পোষণ; (২) অনাক্রমণ; (৩) কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা; (৪) পারস্পরিক সমতাবিধান ও উপকারসাধন; এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

পঞ্চশীলের এই স্বরূপতত্ত্ব যে সম্পূর্ণ নতুন তা নয়। কারণ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিঘোষিত সনদের মধ্যেই এই জাতীয় নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, যে-সময় ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ প্রবলতর হ'য়ে উঠে বিশ্বশান্তি নিশ্চিতরূপে বিঘ্নিত হবার উপক্রম হয়েছিল, ঠিক সেই সময় নেহরু-চু-এন্ লাই বিঘোষিত এই 'পঞ্চশীল' বিশ্ববাসীকে নতুন ক'রে শান্তিস্থাপনের ইঙ্গিত দেয় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় আণবিক-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশ এই পঞ্চনীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পৃথিবীর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই পঞ্চনীতিই ১৯৫৫-সালের এপ্রিল মাসে 'বান্দুং সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবার মূলে ছিল। প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও এই 'পঞ্চশীল'-ই যে পরোক্ষভাবে জেনেভায় উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রেরণা জুগিয়েছিল সে-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এ-কথা আজ সুস্পষ্ট যে, 'পঞ্চশীল'-এর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকার জন্যই কম্যুনিস্ট-পন্থী রাশিয়া, চীন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অ-কম্যুনিস্ট ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অনাক্রমণের জন্য যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের কাছে শান্তি ও মৈত্রীই বড় কথা, সামরিক-চুক্তির কোনো প্রয়োজনই সেখানে দেখা দেয় না। সামরিক-চুক্তির মধ্যে যুদ্ধের যে-আশঙ্কা বা যুদ্ধ-জয়ের যে মনোভাব নিহিত থাকে 'পঞ্চশীল'-এর উদ্গাতা ও সমর্থকেরা ও সে-আশঙ্কা ও সে-মনোভাব বর্জন ক'রেই চলতে চান।

'পঞ্চশীল'-এর প্রভাব

যে শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে নেহরু-চু-এন্ লাইয়ের 'পঞ্চশীল' রচিত হয়েছিল আজ কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে চলেছে। তিব্বতে মহা অশান্তির সৃষ্টি ক'রে চীন যেদিন তিব্বতের সর্বময় কর্তা দালাই লামাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করলে এবং ভারত দিলে তাঁকে আশ্রয়, চীন-ভারতের শাশ্বত মৈত্রীতে সেদিন থেকেই ফাটল ধরল। শান্তিকামী ভারতের মনে রূঢ়ভাবে আঘাত হেনেছে চীন তার পরবর্তী কার্যকলাপে, ভারতের সীমান্তবর্তী দু'টি অঞ্চল সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে অধিকার ক'রে। মুখে আজও চীন

উপসংহার

'পঞ্চশীল'-এর কথা বলে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সেই অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইচ্ছা নেই। এই রূঢ় আচরণ সত্ত্বেও ভারত কিন্তু চীনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে কম্যুনিস্ট চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে ন্যায়সঙ্গত দাবি উত্থাপন করে। এখানেই ভারতের উদারতা ও মহত্ত্ব। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায় এই উদার নীতি একতরফা হওয়ায় বিবদমান বিশ্বে ভারত কিভাবে ও কতদিন পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারবে ?

বিশ্বশান্তি ও ভারত

ভূমিকা—সংগ্রাম ও শান্তি

সংগ্রাম ও শান্তি মানবমনের দুই তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপ্রণোদিত প্রতিযোগিতার বশে মানুষের মন যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, সেই উত্তেজনা যখন প্রশমিত হয়, সংগ্রামের বিধ্বংসী পরিণাম লক্ষ্য ক'রে মানুষ যখন আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তখনই তার মনে জাগে শুভবুদ্ধি এবং তখনই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে শান্তি স্থাপনের জন্য সম্রাট্ অশোকের জীবনেতিহাস-ই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যৌবনের প্রারম্ভে যে-অশোকের মনে মানবিকতা লোপ পেয়েছিল, যে-অশোক প্রভুত্বের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ছিলেন অভ্যস্ত, সেই অশোকের চোখের সামনে যেদিন ভেসে উঠল সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণামের ছবি, তাঁর কানে যেদিন পৌঁছল ভগবান তথাগতের উপদেশবাণী, সেদিন তিনি শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। চণ্ডাশোক পরিণত হলেন ধর্মাশোকে। এই ভাবেই পৃথিবীতে একদিকে যেমন সংগ্রামের দুন্দুভি বেজে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি শোনা যায় শান্তির আহ্বান।

দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর বয়স হয়েছে অনেক এবং সভ্যতার পথে পৃথিবীর মানুষ এগিয়েও গেছে অনেক দূরে। কিন্তু, ক্ষমতার লোভ, স্বার্থের মোহ, প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা সুসভ্য মানবজাতিকে এখনও রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আশা করা গিয়েছিল যে, পৃথিবীতে আর রক্তক্ষয়ী কোনো সংগ্রাম ঘটবে না, শুভবুদ্ধিতে প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন করবে। কিন্তু, প্রথম যুদ্ধের অবসানের পর বিশ বছর পার হ'তে-না-হ'তেই সারা পৃথিবী আবার যুদ্ধে মেতে উঠল, কয়েক বছর ধ'রে মানুষের দানবীয়-শক্তি প্রভুত্ব করল মানবিক শক্তির উপর। তারপর, বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত পরমাণু-বোমা দ্বারা শক্তিমদমত্ত মার্কিন সামরিক-বাহিনী যেদিন জাপানের দু'টি শহর নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে, শান্তিকামী মানব-সমাজ সেদিন আতঙ্কে শিউরে উঠল। পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হ'লো শান্তির আহ্বান। সে-যুদ্ধ বন্ধ হ'লো এবং জীবনযাত্রা

হ'য়ে এলো স্বাভাবিক। কিন্তু, সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়েও ভয়াবহ যে স্নায়ু-সংগ্রাম, আজও তার অবসান হয়নি। শক্তিশালী বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বিশ্বশান্তি-স্থাপনের আওয়াজ উঠলেও, ভিতরে ভিতরে তারা যে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রস্তুতি ক'রে চলেছে, শান্তিকামী বিশ্ববাসীর আতঙ্ক সেইখানেই এবং সেইজন্যই আজ বারংবার বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি উঠছে, এশিয়া ও ইউরোপের কোনো কোনো রাষ্ট্র আজ সেজন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টাও ক'রে চলেছে। মানবসভ্যতাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহ'লে স্থায়ী-শান্তি স্থাপনের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পৃথিবীর মানুষ যখন সভ্যতার স্পর্শলাভ করেনি তখনকার মানবিক-দ্বন্দ্বের কারণ আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু, আধুনিক জগতের মানবসমাজ যেখানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সভ্যতার চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে ব'লে দাবি করে, সেখানে কেন এই হানাহানি, দানবীয় শক্তির আশোভন আস্ফালন? সমাজবিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান অসীম লোভ, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্বের দম্ভ এবং বিশেষ সমাজ-আদর্শের গোঁড়ামি পৃথিবীতে এখনও যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জীইয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিজ্ঞানের অশুভ আবিষ্কারগুলি। এই পৃথিবীতে এতদিন ধ'রে যে-সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের শক্তিসুখ উপভোগ ক'রে এসেছে, গণজাগরণের ফলে আজ তাদের সেই প্রভুত্ব সংকুচিত হ'তে বসেছে; মানুষের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবিকে আজ আর কেউ অবদমিত ক'রে রাখতে পারছে না। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আজ মনে মনে ক্ষুণ্ণ, এবং সেই চিত্তক্ষোভের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে আজ তারা সামরিক-জোট পাকিয়ে পৃথিবীতে এক অস্বস্তিকর স্নায়ু যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নানা শক্তিতে সমৃদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আজ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে দল পাকাচ্ছে এবং পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের অছিলায় পৃথক পৃথক সামরিক-গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ আর সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদ, এই দুই আদর্শবাদ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী, সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষাবলম্বন করছেন তাঁরা; আর যাঁরা সাম্যবাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে চান এবং ধনতন্ত্রবাদের প্রতিই যাঁদের পক্ষপাতিত্ব তাঁদের আকর্ষণ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কয়েকটি রাষ্ট্র কেবল নিজেদের নিরপেক্ষতার আদর্শে অবিচল থেকে এই দুই শক্তিগোষ্ঠীর কোনোদিকেই ভিড়ছেন না; অথচ বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে চলেছেন উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গেই। এইরূপ রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত অন্যতম।

আদর্শের বিরোধিতায় পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর --।

বিবদমান এই আধুনিক বিশ্বে স্থায়ী-শান্তি সম্ভব কিনা এবং কিভাবে সেই শান্তি স্থাপন করা যায় শান্তিকামী মানুষমাত্রেরই কাছেই আজ তা বিরাট এক প্রশ্ন। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লীগ্ অব্ নেশনস্' গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত প্রবল মতবিরোধিতায় সেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভেঙে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর অনুরূপ একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গ'ড়ে উঠেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্'। পৃথিবীতে স্নায়ু-যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলনের সেতু রচনা করতে এই সংস্থা অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে আজ অশান্তির কালোছায়া বিরাজ করছে। ইন্দোচীনে এখনও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ বাধে, মহাচীন তার ক্ষমতালোলুপ দৃষ্টি দেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর, মধ্যপ্রাচ্যে মাঝে মাঝেই আত্মশক্তির বিস্ফোরণ ঘটে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে মিলন ঘটে না, নবজাগ্রত আফ্রিকায় তো অশান্তির অগ্ন্যুৎপাত লেগেই রয়েছে। শান্তিস্থাপনের জন্য নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেও সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো সন্ধি হচ্ছে না, উভয় রাষ্ট্রের মরণাস্ত্রের উৎপাদন ও পরীক্ষার কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিস্থাপনই যদি আজ লক্ষ্য হয় তাহ'লে অযথা সামরিক-শক্তি কেন বৃদ্ধি করছ এ-প্রশ্ন যদি আজ কোনো রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় তা হ'লে সে সোজাসুজি ব'লে বসবে—শান্তিই আমরা চাই; কিন্তু পররাষ্ট্র কর্তৃক যদি আক্রান্ত হই, তাহ'লে আত্মরক্ষা করতে হবে তো? সেইজন্যই আমরা সামরিক-শক্তি বৃদ্ধি করছি। অর্থাৎ, যুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও যায়নি এবং 'আত্মরক্ষা'-র নামে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই আজ সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তথাকথিত 'অনাক্রমণ-চুক্তি'-র মূলেও এই মনোভাব।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অশান্তির কালোছায়া

কিভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যায় নিরপেক্ষ স্বাধীন-রাষ্ট্র ভারতবর্ষ কিন্তু তার উপযুক্ত পথনির্দেশ করছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে অন্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে যখন ভারতবাসী হত্যার লীলায় মেতে উঠেছিল, তখন মহাত্মা গান্ধীই তাঁর প্রেম ও অহিংসার জাদুমন্ত্রে বিবদমান মনুষ্যত্বকে শান্ত করেছিলেন। আণবিক অস্ত্রের নির্মাণ ও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলেই যে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কথা কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারে না। কিন্তু এ-কথা সকলেই বলতে পারে যে, মানুষের মন থেকে যেদিন হিংসা ও বিদ্বেষ চিরতরে লোপ পাবে সেদিন শান্তি বিরাজ করবে স্থায়িভাবেই। মহাত্মা গান্ধী সেই উপদেশ ও শিক্ষাই দিয়ে গেছেন ভারতবাসীকে এবং ভারত আজ সেই প্রেম ও অহিংসার মন্ত্রে মানুষের মনে শুভবুদ্ধির চেতনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট। কোরিয়ার অশান্তি দমনে, সুয়েজ-সংকট সমাধানের চেষ্টায় ভারতের উদ্যম যে কতখানি কার্যকরী হয়েছে ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। পৃথিবীতে আজ যে অশান্তিকর অবস্থা চলেছে তা দূর করতে হ'লে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপনই আজ অত্যাবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী নেহরু যেমন এ-কথা একাধিকবার বলেছেন, জগতের শান্তিকামী মানুষমাত্রেই তেমনি সে-কথার গুরুত্ব অন্তরে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এ-বিশ্বাস আসবে কেমন ক'রে? মানুষের মনের মহৎ গুণাবলীর উন্মেষেই কেবল এরূপ বিশ্বাস-স্থাপন সম্ভবপর। যতদিন না মানবসমাজ চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে

বিশ্বশান্তি স্থাপনে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ

অহিংসা ও পারস্পরিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে ততদিন স্থায়ী বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞান মানুষকে জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে প্রলুব্ধ করলেও, মানুষ যদি বিজ্ঞানের সকল দানকে পারস্পরিক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে অন্তরের তাগিদ অনুভব করে তাহ'লে বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই শান্তি-স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা করতে পারবে না। পরমাণু-শক্তিকে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে সেই শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি যদি তা সমগ্র মানব-সমাজের উন্নতিবিধানে ব্যবহার করে তাহ'লে একদিকে যেমন সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হয়, অন্যদিকে তেমনি তার ধ্বংসাত্মক রূপ বিকাশেরও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতবর্ষ চিরদিনই শান্তিকামী। যুগ-যুগ ধ'রে ভারতের মহাপুরুষেরা শান্তির বাণী বহন ক'রে নিয়ে গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ভারতবর্ষ কখনও পররাষ্ট্র গ্রাস করতে অগ্রসর হয়নি, বরঞ্চ সেই মনোভাব যাতে বিশ্ববাসীর মন থেকে মুছে যায় সেজন্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে সকলকে। শান্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছে ভারতবর্ষ থেকেই এবং সে-বাণী পূর্ব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষকে একদিন প্রবুদ্ধ করেছে শান্তিকামী হ'তে। এ-যুগে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও মানবপ্রেমের আদর্শও মানুষকে নতুন ক'রে শান্তিকামী হ'তে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে 'পঞ্চশীল' অনুশীলনের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ যদি তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, এবং সেইভাবে কাজ করে তাহ'লে বিশ্বশান্তি স্থাপন এমন কিছু কঠিন নয়। সেই 'পঞ্চশীল' হ'লো—(১) দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ; (২) অনাক্রমণ; (৩) কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্রিক ব্যাপারে অপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা; (৪) পারস্পরিক সমতা ও উন্নতি সাধন, এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শান্তির এই সুমহান্ আদর্শে অবিচল ব'লেই ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে। কম্যুনিস্ট রাশিয়া চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যেমন তার মৈত্রীর ভাব বজায় আছে, তেমনি আছে অ-কম্যুনিস্ট আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। শান্তি কামনা করে ব'লেই ভারত ঔপনিবেশিকতার অবসান চায়, মুক্তি কামনা করে সমগ্র মানব-জাতির। বর্তমান পৃথিবীতে সামাজিক অসাম্য থাকা সত্ত্বেও, মানুষ যদি শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়, তাহ'লে শান্তিস্থাপন অসম্ভব নয়। সেই কথাই ভারত তার আচার ও আচরণে প্রমাণিত করতে চলেছে।

বিশ্বশান্তি-রক্ষায় ভারতের আগ্রহ ও উদ্যম

সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা স্নায়ুযুদ্ধ কোনো অবস্থাতেই মানুষের কল্যাণসাধন করতে পারে না। যত দিন যাচ্ছে, যত নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই মানুষ সেই চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করেছে যে, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, বিদ্বেষ ও হিংসার শান্তি নেই। অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ অবলম্বন করা ভিন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বর্তমান মানবসমাজের রক্ষা পাবার আর

উপসংহার

কোনো পথ-ই নেই। মানুষ যতদিন না বিদ্বেষবর্জিত অন্তরে অপর মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে ততদিন পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কা দূর হবে না। প্রেম ও অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করতে পারলেই প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বশান্তি এবং সেই পথেই গ'ড়ে উঠবে আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান নূতন এক মানবসমাজ।

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী

১৯৬১-সালের ৮ই মে (বাংলা ১৩৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ) থেকে রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয় এদেশে। শুধু বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতেই অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বাংলাদেশের বা ভারতের কবি ছিলেন তা নয়, তিনি যে সত্যই বিশ্ব-কবি এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন দেখি বিশ্ববাসী মেতে উঠেছে রবীন্দ্র-বন্দনায়, রবীন্দ্র-প্রতিভাকে অভিবাদন জানাতে আজ সংঘবদ্ধ হয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ, তখন স্বভাবতই আনন্দে বুক ভ'রে ওঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা ও মানব-মৈত্রীর আদর্শই সকল দেশের মানুষকে প্রবুদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথকে আপনজন ব'লে ভাবতে এবং সেই কারণেই দিকে দিকে দেখা দেয় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবের আয়োজন। এ-কথা সত্য যে, এই মহোৎসব পালন না করলেও রবীন্দ্র-মহিমা কোনোদিন কোনো দেশে ক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ, রবিরশ্মির মতোই রবীন্দ্রনাথের দান বিশ্বজাগতিক কল্যাণে চিরকাল নিয়োজিত হবে। যে চিরকালীন সাহিত্য তিনি রেখে গেছেন তাই তাঁকে পৃথিবীতে অমরতা দান করেছে।

ভূমিকা

উনবিংশ শতকের নবজাগরণ-সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। পৃথিবীর আর কোনো মানুষের মধ্যে প্রতিভা ও মনীষার এমন প্রাচুর্য দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশ ও বাঙালীর পরম সৌভাগ্য যে, তিনি বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত বাঙালীর শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং তাঁর কবি-প্রতিভাকেই তাঁকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু, বাংলাসাহিত্যের এমন কোনো বিভাগই নেই যেখানে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি নেই। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোট-গল্পে, সংগীতে, প্রবন্ধে, এমন কি পত্র-সাহিত্য ও শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বিকাশ ঘটেছে।

কবির বহুমুখী প্রতিভার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ও উপনিষদের দিব্যানুভূতিকে যেভাবে নতুন ভাষায়, নতুন ভঙ্গিতে ও নতুন ছন্দে রূপ দিয়েছেন, যেভাবে তাঁর সাহিত্য বিশ্বমানবধর্মের প্রচার

করেছে পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। 'সোনার তরী', 'বলাকা', 'পূরবী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বিশ্বমানবের যে ব্যাকুলতা ও আদর্শের প্রকাশ, 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিটি কবিতায় বিশ্বজনীন যে আবেদন, যুগে যুগেই তা বিশ্বজনের চিত্ত হরণ করবে। তাঁর 'মানসী', 'চিত্রা', 'মহুয়া', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে মানবমনের যে বিভিন্ন অনুভূতি ষ্ফূর্তিলাভ করেছে, তাও চিরন্তন। তাঁর 'নবজাতক', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'নৈবেদ্য', 'পত্রপুট', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কাব্যও নব নব ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য-প্রতিভাই শুধু বিকশিত হয়ে ওঠেনি, মানব-মনের সৌন্দর্যবোধ, প্রেমানুভূতি, রহস্যচিন্তা প্রভৃতি বিস্ময়করভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যেমন তাঁর সমাজ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে তাঁর দার্শনিক-চিন্তাধারা ও মানবিক আদর্শ। ভাবের চাতুর্যে ও রচনা-মাধুর্যে তাঁর রূপক ও নৃত্যনাটকগুলির কোনো তুলনা বিশ্বসাহিত্যে নেই। বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তিনি এক নূতন ধারার প্রবর্তক। তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, সুগভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও রসজ্ঞতা। তাঁর রাজনীতিক প্রবন্ধাবলী একসময় সারা বিশ্বের চিন্তাশীল-সমাজে বিশেষ এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ, দিব্যানুভূতি ও বিশ্বমানবতার মহান্ আদর্শের সুস্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন কবিতায়, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও চিঠিতে। কবিগুরুর এই দেশাত্মবোধ, দিব্যানুভূতি ও বিশ্বমানবতাই তাঁকে মহান্ ক'রে তুলেছে, অমরতার শুভাশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছে তাঁকে।

রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদর্শ ও তাঁর প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা

এযুগের মহামনীষীদের মধ্যে যাঁরা সমগ্র বিশ্বের প্রতিভূহিসাবে মানবজগতে পরিভ্রমণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান বিশিষ্ট; বহির্জগৎকে অন্তর্লোকে আনবার সাধনায় যাঁরা জীবন কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের মানুষকে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্কে তিনি যেমন নিকটতম ক'রে পেয়েছেন, পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষকেও তিনি তেমনি অপরিসীম মূল্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস।
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সর্বমানবের দুঃখবেদনার যে নিখুঁত প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যে দূরদৃষ্টি দেখতে পাই,

মানুষের অগণিত সমস্যা সম্বন্ধে যে নিবিড় সহানুভূতির স্পর্শ পাই, এককথায় মানুষের অন্তর্জগতের অন্তরঙ্গ পরিবেশের যে বিপুলভাষ্য তাঁর বিরাট কীর্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে কোনো একক মানুষকে আশ্রয় ক'রে তা প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া, মানুষের দুঃখবেদনার বিফলতাকে, মানুষের আশা-আনন্দের সফলতাকে, তিনি যেমন গভীর ও ব্যাপক ক'রে দেখেছেন তেমন ক'রে আর কেউ দেখেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রদর্শন, যে-দর্শন চিরকালের মানুষকে তার যে-কোনো সমস্যার সমাধানে পথনির্দেশ করতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার অনুভূতি সুগভীর এক বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবনের পরমব্রত মানবমৈত্রীতে পরিণত হয়েছে। শৈশব থেকেই মানবমৈত্রীর কবিত্বময় অনুভূতি ছাড়াও, নানা প্রবন্ধে তিনি যখনই স্থানীয় কোনো সমস্যার আলোচনা করেছেন, তখনই তাকে বিশ্বমানবের বিরাট ভূমিকায় স্থাপন না ক'রে তার তৃপ্তি হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি শুধু যে তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ছিল তাই নয়, তিনি ধনী-দরিদ্র এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরম মূল্য দেবার প্রয়াসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মানব-প্রীতি বিশ্ববাসীকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ যখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও সরকার একযোগে মিলিত হ'য়ে শতবার্ষিকী-উৎসব পালন করছেন, মন তখন স্বভাবতই আনন্দে ভ'রে ওঠে। বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বকবির মূল্য যে ফুরিয়ে যায়নি এ থেকেই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে উৎসবসূচি পালিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাদির অনুবাদ ক'রে প্রকাশ ও প্রচার, রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও চিত্রের প্রদর্শনী প্রভৃতি। ভারত-সরকার এই সম্পর্কে যে কার্যসূচি গ্রহণ করেন তাও এই রকমের। বিভিন্ন রাজ্য-সরকার যেভাবে উৎসব উদ্‌যাপন করেন, তার মধ্যে আরও অনেক জিনিস আছে। রবীন্দ্রভবন নির্মাণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি যেমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত কোনো কোনো রাজ্যের রবীন্দ্রশতবার্ষিকী-কমিটি, আঞ্চলিক-ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুবাদ ক'রে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। পশ্চিমবঙ্গের শতবার্ষিকী-কমিটিও এ বিষয়ে এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল—সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দান, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সুলভ-সংস্করণ প্রকাশ, তাঁর আঁকা ছবি, রচনার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনী, ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রবিষয়ক কোনো-না-কোনো প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন, কবির বিভিন্ন নাটকের অভিনয়, তাঁর প্রতিকৃতি ও মর্মরমূর্তি স্থাপন প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার কবির চারটি কবিতা অবলম্বন ক'রে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন এবং ভারত-সরকারের

শতবার্ষিকীর কার্যসূচি

প্রয়োজনায় তোলা হয় কবির জীবনী-সম্পর্কিত একটি দলিলচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই স্থানীয়-কমিটি-নির্ধারিত উৎসব-সূচি অনুসারে রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় এবং সেই উৎসবের জের এখনও সম্পূর্ণ থামেনি।

এ-বিষয়ে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বড় কম ছিল না। কারণ, ছাত্রসমাজের কাছে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে, রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী-উৎসব এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান পালন করেছে। কাজেই, রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকীর গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তীর উৎসব একটা হুজুগে পরিণত হয়েছিল সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী যাতে নিষ্ঠা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয় সে-বিষয়ে অনেকেই পূর্বাহ্লেই সতর্ক হননি। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই গেছে ব্যর্থ হয়ে। প্রত্যেক বৎসরই এদেশে রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব। এ-বিষয়ে কোনো একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে-কথা বলা হয়েছিল: "পাড়ায় পাড়ায় তাঁহার নামে সভা-সমিতি ও উৎসব হইতেছে, ঘরে ঘরে তাঁহাকে ধূপ-দীপ ও ফুল-পল্লবে পূজা করা হইতেছে, কিন্তু এই বহু-ব্যাপ্ত রবীন্দ্র-পূজার মধ্যে আড়ম্বরের অংশ যতটা, উপলব্ধি ও অনুধাবনের অংশ ততটা নয়। তা' নয় বলিয়াই কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে-নিবন্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পরিব্যাপ্ত যে রবীন্দ্র-সাহিত্য, তাহার দিকে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা শুধু গান ও নৃত্যনাট্যকেই রবীন্দ্র-পরিচিতির শ্রেষ্ঠতম উপকরণ করিয়া তুলিতেছি।...এত বড় মহানেতা খুব কম জাতির ভাগ্যেই জন্মায়—সেদিক হইতে আমাদের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না, কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারকে আমরা যদি শুধু নাচিয়া-কুঁদিয়া ব্যর্থ হইতে দিই তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কাছে একদিন আমাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।" বর্তমান ছাত্রসমাজ যেন মনে রাখেন যে, যে রবীন্দ্রসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির পরিবেশেই তাঁরা তাঁদের ছাত্রজীবন শুরু করেছেন, ভবিষ্যতের কর্মজীবনেও তার প্রভাব থাকবে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। কাজেই, শতবার্ষিকী-উৎসবের মতো একটি জাতীয়-গৌরবসূচক উৎসব উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তাঁদের উচিত ছিল সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করা, নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করা তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা। রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি না ক'রে, তাঁর গ্রন্থাদি পাঠ না ক'রেই, যাঁরা রবীন্দ্র-পূজার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা শুধু যে রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন তা নয়, নিজেদের মনুষ্যত্বকেও শ্রদ্ধা করেননি তাঁরা। অবশ্য এ-সব কথা সমগ্র ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ ক'রে বলা নয়—শুধু যাঁরা হুজুগে মেতে উৎসবের অঙ্গহানি করেছিলেন, এ-সব কথা তাঁদের লক্ষ্য ক'রে বলা। ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রধান কর্তব্য হবে রবীন্দ্রজন্ম-

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী ও ছাত্রসমাজ

শতবার্ষিকী উৎসবের মতো উৎসব এমনভাবে পালন করা যাতে ফাঁক বা ফাঁকি না থাকে। রবীন্দ্রনাথের মর্মর-মূর্তি স্থাপনে উৎসাহী না হ'য়ে ছাত্রসমাজ যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগী হয়ে রবীন্দ্র-পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয় সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, তাহ'লেই কবিগুরুর প্রতি তাঁদের প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করা হবে।

উপসংহার

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী শুধু ভারতবাসীর কাছেই আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বিশ্ববাসীর কাছেই তা বিশেষ তাৎপর্যমূলক একটা উৎসবরূপে দেখা দিয়েছে। এই উৎসবকে যাঁরা সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন তাঁদের প্রধান কর্তব্যই ছিল—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির সম্যক্ আলোচনা ও তার সঙ্গে আত্মিক-যোগ স্থাপন। সেই সঙ্গে মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়কে, তাঁর পরিপূর্ণ মানবমূর্তিটিকে সর্বজনগোচর ক'রে তোলাও অনেক ক্ষেত্রে উৎসব-কর্তাদের অন্যতম কর্তব্য ব'লেই বিবেচিত হয়েছিল। কারণ, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির চেয়ে কোনো অংশেই ছোট ছিলেন না। সেই মানুষ রবীন্দ্রনাথ কোনো অতি-মানব নন, তিনি ছিলেন দুঃখ-শোকে অবিচলিত, কর্তব্যে সুদৃঢ়, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ, স্নেহ-প্রেমে দীপ্ত পরিপূর্ণ এক আদর্শ পুরুষ। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে যেমন বাদ দেওয়া যায় না, রবীন্দ্রসাহিত্য ও মানুষ রবীন্দ্রনাথও তেমনি অখণ্ড এক সত্তা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ

ভূমিকা—'লীগ্ অব্ নেশনস্'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল 'লীগ অব্ নেশনস্' বা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, বিবদমান জাতি—সমূহের মধ্যে সালিসি এবং পৃথিবীর অনগ্রসর জাতির উন্নতিবিধানের সংকল্প নিয়েই 'লীগ্ অব্ নেশনস্' তার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু, কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখা গেল সদস্য-জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভাব দেখা দিয়েছে, শক্তিশালী কোনো কোনো জাতি লীগের আদর্শ মেনে চলতে চাইছে না।—অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাশিয়া সেদিন 'লীগ্ অব্ নেশনস্'-এর বিরোধী এক সংস্থা গ'ড়ে তোলে। তার নাম দেওয়া হয় 'কমিণ্টার্ন' বা 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল'। রাশিয়া সেদিন এই অভিযোগ করেছিল যে, 'লীগ্ অব্ নেশনস্' আসলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের উপনিবেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্যই তার উদ্ভব। রাশিয়া স্পষ্টই সেদিন বলেছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যাতে অনগ্রসর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপর নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে শোষণের সুবিধা পায় 'লীগ্ অব্ নেশনস্' যেন সেই ব্যাপারেই উৎসাহী। রাশিয়া তথা 'কমিউনিস্ট

ইন্টারন্যাশানাল'-এর এই অভিযোগ যে মিথ্যা নয় ক্রমশই তা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে দিন দিন জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে, শুরু হয়েছে গৃহবিবাদ। তারপর 'লীগ্ অব্ নেশনস্'-কে উপেক্ষা ক'রে যেদিন স্বৈরতান্ত্রিক ইতালী ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব অর্জনের লোভে, আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) আক্রমণ ক'রে বসল, স্পেনে শুরু হ'লো গৃহবিবাদ এবং যুদ্ধ বাধল চীন-জাপানের মধ্যে সেদিন আর 'লীগ্ অব্ নেশনস্'-এর কোনো সার্থকতাই রইল না, ধীরে ধীরে একদিন তা লোপ পেয়ে গেল। কয়েক বৎসরের ব্যবধানে আবার যখন বিশ্বযুদ্ধ বাধল, তখন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষমাত্রেরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আবার প্রয়োজন হ'লো এমন এক সম্মিলিত-সংস্থার, যে-সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার শান্তি স্থাপনের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণাম যে কী ভয়াবহ হ'তে পারে, জাপানের দু'টি শহরের উপরে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে, পৃথিবীর মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে, এবং সেই কারণেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ক'রে অনুভূত হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা 'ইউ.এন্.ও.'-র (United Nations Organisation) সূচনা হয় স্যান্-ফ্রান্সিস্কোতে ১৯৪৫-সালের জুন মাসে, বিশ্বের পঞ্চাশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধতায়। সেই রাষ্ট্রসমূহ সেদিন এক সনদে (the Charter of United Nations) স্বাক্ষর ক'রে এই মর্মে সংকল্প ঘোষণা করেন যে, যে মহাযুদ্ধ তাঁদের জীবদ্দশায় দুই দুই বার নিয়ে এসেছে অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশা, সেই সর্বনাশা মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কবল থেকে তাঁরা তাঁদের অনাগত বংশধরদের রক্ষা করবেন, অর্থাৎ, পৃথিবীতে আর কোনো যুদ্ধ তাঁরা হ'তে দেবেন না। সেই সঙ্গে তাঁরা এ-কথাও ঘোষণা করেন: "মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবতার মূল্যবোধে আমরা উদ্বুদ্ধ হব; নরনারী এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতির সমান অধিকারে বিশ্বাসী আমরা এমন পরিবেশ-রচনায় যত্নবান হব যেখানে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র ও আইনসমূহের বাধ্যবাধকতা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হবে এবং ন্যায়বিচার পাবে সকলে। বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার সুমহান্ ব্রত গ্রহণ করব, অনুসরণ করব শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ। এইসব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমরা সহনশীল মনোভাব অবলম্বন ক'রে সুপ্রতিবেশীর মত শান্তিতে বসবাস করব এবং ঐক্যবদ্ধ হব আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে। এই আদর্শে আমরা আস্থাশীল যে, মানুষের কল্যাণসাধন ব্যতীত আমরা কখনও বলপ্রয়োগে প্রয়াসী হব না এবং সকল জাতির সামাজিক বিকাশসাধন ও আর্থনীতিক অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনায় ব্রতী হব।" এই সুমহান্ সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পঞ্চাশটি স্বাধীন রাষ্ট্র সেদিন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করেন তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৪৫-সালের ২৪-এ অক্টোবর। সেই থেকে প্রতি বৎসর সারা বিশ্বে ২৪-এ অক্টোবর

রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সনদ ও সঙ্ঘের উদ্বোধন

দিনটি 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা-দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর-দপ্তর এখন নিউইয়র্কে স্থাপিত এবং এর সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭টিতে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ-পত্রে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আর, যে-সব নীতির উপরে সঙ্ঘের মূল ভিত্তি সংক্ষেপে তা হ'লো এই: সঙ্ঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্র হ'লো সার্বভৌম অধিকার ও সম-মর্যাদাসম্পন্ন। সনদ-পত্রের শর্তানুসারে সকলেই বিশ্বস্তভাবে তাঁদের বাধ্যবাধকতা পালনে প্রতিশ্রুত। বিশ্বশান্তি ও ন্যায়বিচার অক্ষুণ্ণ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল নীতি ও বিভিন্ন বিভাগ

রেখে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের বিরোধের মীমাংসা, সনদের আদর্শবিরোধী সর্বপ্রকার তৎপরতা পরিহার এবং পররাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বাধীনতা-হরণের ভীতি-প্রদর্শন কিংবা সেজন্য বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকার সংকল্প। সনদপত্রের শর্তানুসারে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি কোনো দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহ'লে সঙ্ঘের সকল সদস্য সেই রাষ্ট্রবিরোধী দেশকে সাহায্যদানে বিরত থাকবে। সঙ্ঘ-বহির্ভূত দেশগুলিও যাতে সনদপত্রের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার ব্যবস্থা করবে এবং শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। যে-কোনো শান্তিকামী দেশ যদি সনদপত্রের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সম্মত হয় এবং দায়িত্বপালনের উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়, তাহ'লে সেই দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যতালিকাভুক্তির অধিকার লাভ করবে। কঠোর দারিদ্র্যের নিপীড়নে পৃথিবীর যে অর্ধেক মানুষ প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে তাদের দুঃখমোচন ও কল্যাণসাধনে ব্রতী রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্নমুখী ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই সকল ক্ষেত্রেই তার তৎপরতা সম্প্রসারিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও তার সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে কারিগরী সাহায্যদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারেই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। সনদপত্র অনুসারে যে ছয়টি মূল বিভাগে এই বিশ্ব-সংস্থা বিভক্ত, তা হ'লো—(১) সাধারণ পরিষদ; (২) নিরাপত্তা পরিষদ; (৩) আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ; (৪) অছি পরিষদ; (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয়; এবং (৬) সচিবালয়।

সাধারণ পরিষদ হ'লো রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল আলোচনা-সংস্থা এবং বিশ্বসমাজ-সংগঠন আদর্শের সোপানস্বরূপ। সাধারণত, প্রতি বছর এই বিভাগের একবার অধিবেশন হয়। সনদ-পত্রে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ করার এবং

সাধারণ পরিষদের সংগঠন ও কার্যধারা

অন্যান্য বিভাগের ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করবার অধিকার এই মূল বিভাগটির আছে। রাজনীতিক, সমাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনই হ'লো সাধারণ-পরিষদের উদ্দেশ্য। ১৯৫০-সালে এই পরিষদ এক শান্তি-সংরক্ষণ কমিশন এবং এক সম্মিলিত-ব্যবস্থা-অবলম্বন-কমিটি

গঠন করে। কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি যখন নিরাপত্তা-পরিষদের বিবেচনাধীন থাকে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে সাধারণ-পরিষদের সুপারিশ-ক্ষমতা থাকে না। ঐ নিরাপত্তা পরিষদে যখন কোনো বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা চলে তখন সে-বিষয় নিয়ে সাধারণ-পরিষদে আলোচনা হ'তে পারে, কিন্তু নিরাপত্তা-পরিষদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ না হ'লে সে-বিষয়ে সুপারিশ করবার কোনো ক্ষমতা সাধারণ-পরিষদের নেই। কিন্তু, নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে যদি কোনো বিষয়ে মীমাংসা সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সাধারণ-পরিষদের এক জরুরীকালীন বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। সাধারণ-পরিষদ সদস্য-তালিকাভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ভোট দেবার অধিকার থাকে। সঙ্ঘের সকল বিভাগকে সাধারণ-পরিষদের কাছে বার্ষিক বিবরণী পাঠাতে হয় এবং ঐ সকল বিবরণী সম্পর্কে সাধারণ-পরিষদের সদস্যেরা বিচার-বিবেচনা ক'রে থাকেন। নিরাপত্তা-পরিষদের ছয়জন অস্থায়ী সদস্য, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের আঠারজন সদস্য এবং অছি-পরিষদের সমস্ত সদস্য সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণ-পরিষদ এবং নিরাপত্তা-পরিষদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোটগ্রহণ দ্বারা আন্তর্জাতিক-আদালতের বিচারক-মণ্ডলীর মনোনয়ন হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি-জেনারেলও সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত আয়-ব্যয় বরাদ্দ বা বাজেট অনুমোদনের দায়িত্ব সাধারণ-পরিষদের। এই বিভাগই সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যয়বরাদ্দ স্থির ক'রে দেয়। বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা বাবত অর্থেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যয়নির্বাহ হয়। তাছাড়া অর্থ-সংগ্রহের অন্যান্য সূত্র হ'লো রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মচারীদের বেতনের উপর ধার্য আয়কর, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাকটিকিট বিক্রয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুস্তকাদি প্রকাশ, উদ্বৃত্ত সম্পত্তি বিক্রয় এবং বাড়িভাড়া দিয়ে অর্থপ্রাপ্তি। বিভিন্ন দেশের সরকার স্বেচ্ছায় যে অর্থ দান করেন তাও হ'লো রাষ্ট্রসঙ্ঘের আয়ের অন্যতম সূত্র। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ অনুন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কারিগরী ব্যবস্থায় বিনিযোগ করা হয়।

নিরাপত্তা-পরিষদের সংগঠন ও কার্যধারা

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা-পরিষদ মোট এগারজন সদস্য নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে পাঁচজন হ'লো স্থায়ী এবং বাকী ছয়জন অস্থায়ী। যে-পাঁচটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্য সেগুলি হ'লো—ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন (কুওমিণ্টাং)। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে অব্যহিত পরবর্তী নির্বাচনে পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার অধিকার তাদের থাকে না। পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব মূলত এই সংস্থার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। নিরাপত্তা-পরিষদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে ও কার্যকরী করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যেরা সম্মত হয়েছেন সনদপত্রের শর্তানুসারেই। নিরাপত্তা-পরিষদের প্রত্যেক সদস্য একটিমাত্র ভোটের অধিকারী। কার্যপরিচালন-পদ্ধতি ছাড়া অন্য যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পাঁচটি স্থায়ী সদস্য সমেত সাতটি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি—

সূচক ভোটের প্রয়োজন। একে বলা হয় প্রধান শক্তিবর্গের মতৈক্য ব্যবস্থা—চলতি কথায় যাকে বলা হয় 'ভিটো'-ক্ষমতার সুবিধা। কার্যক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী-সদস্য যদি ভোটদানে বিরত থাকেন, তাহ'লে তা ভিটো-ক্ষমতা প্রয়োগ ব'লে বিবেচিত হয়। কোনো বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্য-রাষ্ট্রের তা সেই রাষ্ট্র স্থায়ী-সদস্যই হোক বা অস্থায়ী-সদস্যই হোক্ ভোট-গ্রহণের সময় ভোটদানের অধিকার থাকে না। পদ্ধতিগত প্রশ্নের নিষ্পত্তির সময় যে-কোনো সাতটি সদস্যের সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন হয়। বিশ্বশান্তি-সংরক্ষণ ও ত্বরায় ব্যবস্থা-অবলম্বনের খাতিরে যে-কোনো সময় এবং সদর-কার্যালয় ব্যতীত অন্যত্রও নিরাপত্তা-পরিষদের বৈঠক বসতে পারে। সনদপত্রের শর্তানুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্র শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা-পরিষদকে সামরিক ও অন্যান্য সুবিধা-দিতে প্রতিশ্রুতি। ১৯৫২-সালে সাধারণ-পরিষদ, নিরাপত্তা-পরিষদের সদস্যদের নিয়ে নিরাপত্তা-পরিষদের অধীনে একটি নিরস্ত্রীকরণ-কমিশন গঠন করে। ১৯৫৯-সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যকে এই কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাধারণ-পরিষদের নিয়মাধীন আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এমন এক উন্নততর বিশ্ব সংগঠনের প্রয়াসী যেখানে থাকবে সুখ, সমৃদ্ধি, স্থায়িত্ব ও ন্যায়বিচার। আন্তর্জাতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানীতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সম্পর্কে এই পরিষদ বিচার-বিবেচনা ও সুপারিশ করবার অধিকারী। মানব-অধিকার এবং সকলের মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সুপারিশ করাও হ'লো এই পরিষদের কাজ। আঠারটি সদস্য রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত এই পরিষদের ছ'টি সদস্যরাষ্ট্র প্রতি তিন বৎসরের জন্য সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। সাধারণত বছরে দু'বার এবং প্রয়োজনমতো আরও কয়েকবার এই পরিষদের বৈঠক বসে।

অন্যান্য বিভাগের পরিচয়

আন্তর্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার কর্মতৎপরতার সংহতি-সাধন করাও আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের-সনদপত্র অনুসারে এক অছি-শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক যে-সকল অঞ্চল এই ব্যবস্থাধীনে সংস্থাপিত হয়, সেই সকল অঞ্চলের শাসন-পরিচালনা করেন এই অছি-পরিষদ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে, রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও শিক্ষানীতিক প্রশ্ন সম্পর্কে নিরাপত্তা-পরিষদ অছি-পরিষদের মতামত ও সাহায্য গ্রহণ ক'রে থাকে। ১৯৫৭-সালের এপ্রিল মাসে অছি-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দটিতে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল বিচারসংস্থা। নেদারল্যাণ্ডের 'দি হেগ' নামক স্থানে এই বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিচারালয়ের পনেরজন বিচারপতি পৃথক্ পৃথকভাবে নিরাপত্তা-পরিষদ ও সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হন। আইনগত বিরোধ সম্পর্কে রায়দান ছাড়াও এই বিচার-সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। সাধারণ-পরিষদ অন্যান্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন আইনসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে এই

আন্তর্জাতিক-বিচারালয় মতামত প্রকাশ ক'রে থাকে। আর, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সবপ্রকার প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করার জন্যই সচিবালয় স্থাপিত হয়েছে। এটি হ'লো রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ষষ্ঠ মূল বিভাগ। সঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার কার্য-পরিচালন-ব্যবস্থায় সাহায্য করা এবং সেগুলির নীতি ও কর্মব্যবস্থার তদারক করাই হ'লো সচিবালয়ের কাজ। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন সেক্রেটারি-জেনারেল। নিরাপত্তা-পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক এই সেক্রেটারি-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৬-সালে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রিগ্‌ভেয়েলীকে পাঁচ বছরের জন্য এই পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি পায় আরও তিন বছর। ১৯৫২-সালের শেষদিকে তিনি পদত্যাগ করলে সুইজারল্যাণ্ডের স্টেট হ্যাগ্‌ হ্যামারশিল্ড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং সেই থেকে তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সার্থকতা যে মূলত সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্য তাঁদের মতিগতির উপরেই আজ সবকিছু নির্ভর ক'রে আছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়েই বড় রকমের কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারছে না। সাধারণ-পরিষদে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ সংখ্যাধিক্যের জোরে মাঝে মাঝে দুরভিসন্ধি-মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বটে, কিন্তু রাশিয়া 'ভেটো'-প্রয়োগ ক'রে তা নাকচ ক'রে দেয়। রাশিয়া ও রাশিয়ার সমর্থনকারী বহু দেশের সিদ্ধান্তও এইভাবে মাঝে মাঝে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি সদস্য-রাষ্ট্রের ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই মত-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ-যাবৎ যে-সব কাজ করেছে তার মূল্য বড় কম নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় 'দি পেগিং আইন' অনুসারে উপনিবেশ-কারী ভারতবাসীকে সম্পত্তি-ক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারত সেই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের একটি প্রস্তাবে সে-সময় ভারতের অভিযোগ ও কার্যকরী সুপারিশ সমর্থিত হয়। প্যালেস্টাইন, কোরিয়া ও ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বর্তমানে স্বাধীন কঙ্গো-রাষ্ট্রে শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর, এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বিশেষভাবে সাহায্য করছে ভারত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রশংসনীয় উদ্যম

শান্তিরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একদিকে যেমন প্রশংসনীয় কাজ করেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার তেমনি দিয়েছে ব্যর্থতার পরিচয়, ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতান্ত্রিক-সরকারের সঙ্গে ডাচ-সাম্রাজ্যবাদীদের সংঘর্ষের কোনো প্রতিকারই রাষ্ট্রসঙ্ঘ করতে পারেনি। মিশর ও হাঙ্গেরিতে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে তা আদৌ শ্লাঘার বিষয় নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুটি শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স, সেই সঙ্গে ইস্রাইল যেভাবে মিশর আক্রমণ ক'রে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালায় এবং সোভিয়েট রাশিয়া

যেভাবে হাঙ্গেরিতে গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য যে তাতে ব্যাহত হয়েছে সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কমিউনিস্ট চীনকে অস্বীকার ক'রে কুওমিণ্টাং চীনকে সদস্যপদে রাখার মূলেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোনো যুক্তি নাই। এই সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও কিন্তু রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা সকলে বিশেষভাবে স্বীকার করেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তার প্রয়োজনীয়তা

কারণ, বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে হ'লে, অনুরূপ একটি আন্তর্জাতিক-সংস্থা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পথ আজ খোলা নেই। সাধারণ-পরিষদে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চেভ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে পারেন, শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ হ'তে পারে কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা কেউই অস্বীকার করেন না।

যুদ্ধের পরিণাম যে ভয়াবহ এবং যুদ্ধের দ্বারা কখনও যে শান্তি স্থাপিত হয় না দু'টি বিশ্বযুদ্ধই পৃথিবীর মানুষকে সেই শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা থেকেই বিশ্ববাসী আজ স্থায়ী-শান্তির জন্য ব্যাকুল। ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, সোভিয়েট রাশিয়া সমর্থন জানিয়েছে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে। রাশিয়ার মতো মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্তত নীতিগত ভাবেও নিরস্ত্রীকরণ-প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে সেই নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী হ'তে পারে, আদর্শগত বিরোধের জন্য আজও তার কোনো মীমাংসা হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যের আজ উচিত সে-বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা করা। কারণ, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব-গ্রহণই আজ বিশ্বশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোনো কাজই ব্যর্থ হ'তে পারে না এবং বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাই আজ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

উপসংহার

সাহিত্যের ধর্ম বা প্রকৃতি

কোনো জিনিসের সংজ্ঞা নির্দেশ করায় মুস্কিল আছে। প্রশ্ন দাঁড়ায় সংজ্ঞা থেকে জিনিস, না জিনিস থেকে সংজ্ঞা। বর্তমানকালের মানুষ সংজ্ঞা থেকে জিনিস হয়তো তৈরি করতে পারে; কিন্তু মানুষ যেদিন সর্বপ্রথম সংজ্ঞার সৃষ্টি করেছিল সেদিন নিশ্চয় তার সামনে কোনো জিনিস ছিল, তা না হ'লে সেই জিনিস সম্বন্ধে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাত না এবং তার পক্ষে সেই জিনিসের স্বরূপতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হ'ত না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আগে সৃষ্টি, তারপরে তার নামকরণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই কথা। অর্থাৎ, আগে সাহিত্যের সৃষ্টি, পরে তার সংজ্ঞা। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। আদিমযুগেও

ভূমিকা

সাহিত্য ছিল, কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপত্ব সম্পর্কে কোনো মতবাদ তখনও গ'ড়ে ওঠেনি। সে-মতবাদ অনেক পরের। প্রত্যেক যুগেই আবার সে-মতবাদ বা সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মতবাদ যখন তৈরি হয়, মতভেদেরও সৃষ্টি হয় তখনি। সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে সেই রকম মতভেদ থাকলেও, সাহিত্যের মূল কথাটি নিয়ে কিন্তু বিশেষ কোনো মতদ্বৈততা নেই।

সাহিত্যের সেই মূল কথাটি কী? অর্থাৎ, সাহিত্যের স্বরূপ কী, তার ধর্ম বা প্রকৃতি বলতেই বা আমরা কী বুঝি? এককথায় সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া নেহাত কথার কথা নয়। 'সহিত' এই শব্দটি থেকেই 'সাহিত্য'-কথাটির উদ্ভব। তাহ'লেই বোঝা যাচ্ছে যে, অন্তত দু'টি জিনিস আছে। তা না হ'লে উভয়ের মধ্যে 'সাহিত্য' হবে কী ক'রে? এই দুটো জিনিস হচ্ছে দুটি হৃদয় বা মন। একটি দান করে, অন্যটি গ্রহণ করে, একটি বক্তার, অন্যটি শ্রোতার। একটি হ'লো কবিচিত্ত, অন্যটি পাঠকচিত্ত। এই উভয়ের মধ্যে যে-জিনিসটি মিলন ঘটায় তাই হ'লো সাহিত্য। একে তাই বলা হয়েছে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'। এ জিনিসটি আর কিছু নয়—'রস'। এই রসের সৃষ্টি না হলে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য নিছক কথা নয়, আনন্দের অভিব্যক্তি।

সাহিত্যের মূলকথা

সাহিত্যের প্রধান কাজ, অর্থাৎ তার ধর্ম বা প্রকৃতিই হ'লো সৌন্দর্যসৃষ্টি। অবশ্য, এই মতবাদের আজ পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক কালের সাহিত্য-রচনায় এমন অনেক জিনিস স্থান পায় যা সুন্দর নয়, অথচ মনকে তা বিশেষ এক রকমের রসের সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি—'আনন্দ'। তিনি বলেছেন—"সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সুন্দরকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।" সেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো' নাটকে নায়িকা ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যুতে করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রসগ্রাহী মন তা থেকেই আনন্দ আহরণ করেছে। বাস্তবের ক্ষেত্রে যা দুঃখজনক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই আবার আনন্দরসে পরিণত হ'তে পারে। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির কাব্যরচনার ভিত্তি তো এক দুঃখজনক ঘটনাই। কিন্তু অন্তর্জগতে বহির্বিশ্বের এই বেদনাটুকু যে অনির্বচনীয় আনন্দে পরিণত হয়েছিল তা থেকেই কবি-কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং, ত্বমগমশাশ্বতীসমা। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্‌॥" কবির অন্তর্লোকের এই আনন্দকে সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো শক্ত। পণ্ডিতেরা কবিমনের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে বলেছেন—'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।' এ আনন্দ একমাত্র আস্বাদ করাই যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ লীলাজগতের সৃষ্টিই হয় সাহিত্যে।

সৌন্দর্য ও আনন্দ

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে—সত্যম্‌, জ্ঞানম্‌, অনন্তম্‌। মানবাত্মারও সেই রকম তিনটি স্বরূপাবস্থা কল্পনা ক'রে বলা হয়েছে—আমি আছি,

আমি জানি, আমি প্রকাশ করি। এই তিনটিকে নিয়েই একটা অখণ্ড সত্য। অনন্ত জিজ্ঞাসার ভাণ্ডার থেকে মানুষ যখন কোনো-না-কোনো রহস্যের সন্ধান পায়, তখন তাকে প্রকাশ করবার জন্যেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে। হৃদয়ের রসনাভূতিকে মানুষ কখনো তার মনে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না; তাকে মুক্তি না দিয়ে তার যেন কোন উপায় নেই। এই মুক্তি থেকেই তার আনন্দানুভূতি রূপ পরিগ্রহ করে সাহিত্যে, ঠিক যেমন করে সঙ্গীতে, চিত্রে, সকলরকম শিল্পকলায়। মানুষ তার সকল কাজের মধ্যেই নিরন্তর নিজেকে প্রকাশ ক'রে চলেছে, অন্তরের আবদ্ধ আনন্দকে দিচ্ছে মুক্তি। জীবনধারণের পক্ষে 'আছি' ও 'জানি' যতখানি সত্য, ঠিক ততখানি সত্য 'প্রকাশ করি'। সাহিত্যের ধর্ম বা প্রকৃতির মধ্যেও সেই সত্য নিহিত রয়েছে। রূপদক্ষ শিল্পী যদি তাঁর অন্তরের সমস্ত আনন্দ নিঙড়ে তার প্রকাশ-কে রূপ দিতে সক্ষম হন, তাহ'লে সেই প্রকাশ হয় কালজয়ী। আর, যে-সাহিত্য কালজয়ী হয়, তাই সার্থক সাহিত্য।

আনন্দ-রসের প্রকাশে সাহিত্য-সৃষ্টি

তাই সাহিত্যকে আমরা যদি বলি 'আনন্দস্য পুত্র', তাহ'লে তা অযৌক্তিক হবে না। শুধু সাহিত্য কেন, সবরকমের শিল্পকলার সৃষ্টিই হয় আনন্দ থেকে। কিন্তু, এ-আনন্দ শুধু যে প্রয়োজনের আনন্দ তা নয়, অপ্রয়োজনের আনন্দও বটে। জগতের লোকের কাছে যা অপ্রয়োজন, সাহিত্য-শিল্পীর কাছে তাই হয়তো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যেমন, যে-কোনো আধারেই জল পান করা যাক না কেন তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হবে। তথ্যের দিক থেকে এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু, একটি নক্সা-কাটা সুন্দর কাঁচের গেলাসে জল পান করার যে-আনন্দ, সে-আনন্দ সাধারণ একটা টিনের গেলাসে পাওয়া যায় না। শিল্পরুচিসম্পন্ন মন কিন্তু ঐ আপাত-অপ্রয়োজনীয় নক্সা-কাটা কাঁচের গেলাসটিকেই খুঁজে বেড়াবে। শিল্পী বা সাহিত্য-স্রষ্টার কাছে এই ধরনের অপ্রয়োজনের আনন্দই বড় সত্য। তথ্যের উপরে জোর না দিয়ে সাহিত্যকারেরা তাই সত্যের উপরেই জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাই সাহিত্যের সত্য বাস্তবের সত্য না-ও হতে পারে। ভগবান বুদ্ধের নামে অনাথপিণ্ডদ যেদিন শ্রাবস্তী নগরের পথে পথে ভিক্ষা ক'রে চলেছিলেন সেদিন হীরামুক্তা-মনিমাণিক্য তিনি অনেক কিছুই পেয়েছিলেন, কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিতে সে-সব কিছুই স্থান পায়নি। অথচ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে ভিক্ষুক বালিকা তার জীর্ণবসনখানি ভগবান তথাগতের নামে দান করেছিল, সেই ভিক্ষুককন্যার সে-দান অনাথপিণ্ডদ সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে বলেছিলেন—এই প্রভুর যোগ্য দান। এই ভাবটিকে যখন কাব্যে ফুটিয়ে তোলা হ'লো, তখন ভিখারিণীর দানটিই প্রতিভাত হ'লো কাব্যের দিক থেকে চরম সত্যরূপে। তথ্যের দিক থেকে এ-কথা মানতেই হবে যে, বাস্তব জগতের কোনো ভিক্ষারিণীই ঐভাবে তার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র দান করতে পারে না। কিন্তু সত্যের জগতে, রসের জগতে, ভিখারিণীর ঐ জীর্ণবসনখানি যেন থেকেও নেই। তর্ক ক'রে এই সত্যকে হয়তো বোঝানো সম্ভব নয়,

প্রয়োজনের আনন্দ ও সাহিত্যের সত্য

কিন্তু সাহিত্যের সত্য একেই বলে। তথ্যকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনে সত্যের স্বাদ এনে দেওয়াই সাহিত্য বা আর্টের ধর্ম। এই স্বাদ হ'লো অসীমের স্বাদ,—অর্থাৎ সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। অনন্তের আস্বাদ আছে ব'লেই সাহিত্য বা শিল্পকলা সুন্দর মনে হয়, অন্তর্লোকে তা অনির্বচনীয় এক আনন্দ এনে দেয়।

ব্রহ্মা যেমন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, মানুষও তেমনি সৃষ্টি করেছে সাহিত্য। সাহিত্যের জগৎ সৃষ্টিরই জগৎ। উপনিষদে যেমন দেখতে পাই, বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং নিজেকে বহুধা বিভক্ত ক'রে তাদের মধ্যে নিজের সত্তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন, সাহিত্যেও তেমনি দেখি যে, সাহিত্যকার নিজেকে বহুর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে চান। আমি যাকে ভালোবাসি, সে আমার কাছে এত প্রিয় বা আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে কেন? তার কারণ, আমি যে তার মধ্য দিয়েই নিজেকে খুঁজে পাই। সে-ও আমাকে ভালোবাসে, কারণ আমার মধ্য দিয়ে সে-ও তো নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। এই যে মনের মিলন বা ভাবের মিলন—এ-মিলন সৃষ্টিই তো সাহিত্যের প্রকৃতি। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা বেদনা অনুভব করি, তাদের আনন্দে পাই তৃপ্তি—এই যে সহৃদয়-ভাব, এই ভাবটিই হ'লো সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। যেখানে এই সহৃদয়তার স্পর্শ নাই সাহিত্য সেখানে ব্যর্থ।

সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেকে
ব

সাহিত্যকে সংক্ষেপে তাই আমরা একরকমের সৃষ্টি বলতে পারি, যার ভিত্তি হ'লো আনন্দ। অর্থাৎ, আনন্দকে আশ্রয় ক'রেই সাহিত্যের জন্ম। এর প্রধান ধর্ম বা প্রকৃতি হ'লো হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া। সাহিত্যের অন্যতম ধর্ম হ'লো অসীমের রসাস্বাদন। আর, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের অনুভব করি ও বিশ্বপ্রকৃতি অস্তিত্বের স্বাদ পাই ব'লে সাহিত্য আমাদের এত আনন্দ দান করে। জীবন-ধারণের পক্ষে সাহিত্য নিছক বিলাস নয়। কারণ, শুধু বিলাস হলে এতকাল ধরে সাহিত্য সৃষ্ট হ'ত না, নিত্য-নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির বাসনাও মানুষ এতদিনে ত্যাগ করত। আর এ-কথাও সত্য যে, সাহিত্য বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ নয়। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত থাকে, কবি বা সাহিত্যিক তাকে সংহত ক'রে পাঠকের মনের সহজ-গ্রহণের যোগ্য ক'রে তোলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সাহিত্য বা মিলন ঘটাতে পারে ব'লেই 'সাহিত্য'-এর 'সাহিত্য'-নাম সার্থক।

রাহংসপউ

বাংলা কাব্যসাহিত্য

সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের মতে বাংলাভাষার আদিযুগ খ্রীষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের আরম্ভ। তার প্রমাণ মিলবে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন-সংকেত সমন্বিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে। কিন্তু, সেই চর্যাপদাবলীর ভাষাকে পুরোপুরি বাংলাভাষা ব'লে চিনে নিতে যেন কষ্ট হয়। সে যাই হোক, বাংলাভাষার আদিযুগের কাব্য-সাহিত্য হিসেবে 'চর্যাপদাবলী'-র স্থান এখন সুনির্দিষ্ট। এই যুগের সাহিত্য-নিদর্শন হিসাবে আর যে-সব পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', 'নাথগীতিকা', 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' এবং 'ময়নামতীর গান' বা 'গোপীচাঁদের গান'। আধুনিক রসবিচারে এই সব কাব্য-কাহিনীর মূল্য যথেষ্ট না হলেও, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এদের একটা বিশেষ স্থান আছে।

ভূমিকা—আদিযুগের কাব্যসাহিত্য

এর পর মধ্যযুগ। এই মধ্যযুগের সীমা নির্ধারিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। আসলে কিন্তু পঞ্চদশ-শতাব্দী থেকেই বাংলা-ভাষা ক্রমোন্নতিমূলক সাহিত্যের পথ ধ'রে অগ্রসর হয়েছে। এই যুগের বাংলাসাহিত্য প্রধানত গীতিকবিতা ও আখ্যানমূলক কাব্যের আকারেই আত্মপ্রকাশ করে। আর, এই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-নিদর্শন হ'লো বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বন ক'রে বারোটি খণ্ডে বিস্তৃত এই কাব্যকাহিনীর অনেক জায়গায় কবি যে কল্পনা-শক্তি ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা উপেক্ষণীয় নয়। ছন্দে, অলঙ্কারে ও রসঘন ভাবের মাধুর্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অনেক পদই শ্রীমণ্ডিত। মধ্য-যুগের আদিপর্বে বা আদি-মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের আর যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় তার সবই কাব্য বা কবিতা। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-অনুবাদ, মালাধর বসুর 'কৃষ্ণায়ণ' (বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়') এবং কানা হরিদত্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল'। এর পর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে-যুগ, সে-যুগকে আমরা জানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগ বা মধ্যযুগের শেষ পর্ব ব'লে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই বাংলাসাহিত্যের সুস্পষ্ট একটা ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়; এবং এই যুগে রচিত সমধুর বৈষ্ণব-পদাবলী বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া এই সময়কার শাক্ত-পদাবলী ও অনুবাদিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেরও বিশেষ একটা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচনায় একাধারে ভক্তিরস ও কাব্যরসের যে সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় তার কোনো তুলনা হয় না।

মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য

যুগ যুগ ধ'রে এখনও তাঁদের রচিত সেই সব গীতিকবিতা বাংলার রস-পিপাসু জনসাধারণকে আনন্দ দিয়ে আসছে। তাঁদের রচনা কালজয়ী, সেই কারণে কবি হিসাবে তাঁরাও আজ অবিস্মৃত। এই যুগে ভক্তকবি রামপ্রসাদ ও আরও কয়েকজন শাক্ত-কবি কালীকীর্তন-বিষয়ক যে-সব পদ রচনা করেন সেগুলির মধ্যেও রচয়িতাদের যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, যে-সব মঙ্গলকাব্য (যেমন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি), অনুবাদ-গ্রন্থ ও চৈতন্য-জীবনী এ-যুগে প্রকাশিত হয়, কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিও যথাযোগ্য স্থানলাভের অধিকারী। এই যুগের শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় যে বাস্তবতার সুর সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল তা থেকেই কাব্য-সাহিত্যের ধারা পরিবর্তন যে আসন্ন তা কিছুটা যেন উপলব্ধি করতে পারা যায়।

সন্ধিযুগের কবি ভারতচন্দ্র

বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটা বিপ্লবের সূচনা দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। পলাশী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে আসে একটা নবজাগরণ বা বিদ্রোহের ভাব। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে কবি ভরতচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। কারণ, ভারতচন্দ্রকেই আমরা বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সংযোজক হিসাব ধ'রে থাকি। একহিসাবে তিনিই সন্ধিযুগের কবি। অস্তগামী ও উদয়োন্মুখ দুই যুগের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি ভারতচন্দ্রে পরিস্ফুট। তিনিও মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু, দেবমাহাত্ম্য প্রচারই তাঁর কাব্যে সর্বস্ব হয়ে দেখা দেয়নি, সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে মর্ত্যমানব।

কবিগান

ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে চলেছে কবিওয়ালাদের যুগ। নবযুগের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে এঁদের গানে। এইসব কবিওয়ালা, পাঁচালীকার ও টপ্পা-রচয়িতাদের গানে ও কবিতায় প্রধানত পাওয়া যায় রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী। কিছু কিছু শ্যামা-সঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়ার গান এবং নিছক প্রেমসঙ্গীতও তাঁরা রচনা করেছিলেন। কিন্তু, কবিগানের রাধাকৃষ্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখস মাত্র, তাদের পেছনে উঁকি দিয়েছে বাস্তব নরনারীর রক্তমাংসের মূর্তি। রসবিচারে কবিগানের মূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও (বিশেষত, টপ্পাজাতীয় কবিগানের রুচিবিকারের জন্য), কবিওয়ালারাই যেন সর্বপ্রথম সাহিত্যে মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হয়েছেন। সাহিত্যের দিক থেকে কবিগানের বিশেষত্ব এইখানেই। কবিগান-রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—হরু ঠাকুর, রাম বসু, রঘুনাথ দাস, রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রভৃতি।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা কাব্যসাহিত্য যেন একটা নতুন দিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল। এ-কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে গুপ্তকবির স্থান কবি হিসাবে যতটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবেই তিনি ততটা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। তবে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ধর্ম, নীতি, সমাজ, ঋতু, প্রেম ও সমসাময়িক অনেক ঘটনাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা হয়তো গুপ্তকবির প্রতি সুবিচার করতে পারব না। কিন্তু ছড়া জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি যে সেকালে বিশেষ পরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেই আমরা খাঁটি দেশীয় ধারার শেষ কবি ব'লে অভিহিত করতে পারি। কারণ, পাশ্চাত্ত্যের মত্ত হাওয়ায় যখন এদেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছে, তখন যে-সব কবি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের রচনায় আর দেশীয় ধারা পুরোপুরি বজায় থাকেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবশিষ্যরূপে কাব্যসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজ কবিদের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর রচনায় পরিস্ফুট না হলেও খাঁটি দেশীয় ধারা থেকে তিনি কিছুটা বিচ্যুত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে, তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক-কাব্য রচনার প্রবর্তক। তাঁর 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও 'কাঞ্চীকাবেরী' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-যুগে বাংলাসাহিত্যের আসরে বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার প্রবর্তক। অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর) ছন্দে কাব্য রচনা ক'রে তিনি যে শুধু বাংলা কাব্যের রূপ বদ্‌লে দিয়েছিলেন তা নয়, তাঁর চিন্তাধারার বলিষ্ঠতায় ও প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে বাংলা কাব্যসাহিত্য যেন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য' থেকে শুরু ক'রে 'মেঘনাদবধ-কাব্য', 'বীরাঙ্গনা-কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' প্রত্যেকটিতেই আমরা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাই। মহাকাব্যের সুর যেমন ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'মেঘনাদবধ-কাব্যে', তেমনি তাঁর 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' গীতি-কবিতার অপূর্ব মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত। ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এক 'মেঘনাদবধ-কাব্য'ই মধুসূদনকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। পাশ্চাত্ত্যের 'সনেট্'-এর আদর্শে রচিত তাঁর 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী'-ও বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার দিশারী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে আর যে-দু'জন কবি নিজেদের রচনা-নৈপুণ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র প্রধানত মধুসূদনকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্য ক্রমশই যেন বিস্মৃতির কবলে আত্মগোপন করছে। তার কারণ বোধ হয় কবির ভাবপ্রকাশের দৈন্য ও ছন্দের কৃত্রিমতা। অমিতাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা

করতে গিয়ে তিনি যেন মধুসূদনের আর্টকে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেননি। 'বৃত্রসংহার-কাব্য'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর 'ছায়াময়ী', 'আশা-কানন' ও 'দশমহাবিদ্যা'ও উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের কাব্যের ভিতর দিয়ে যে জিনিসটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে তা হ'লো তাঁর স্বদেশ-প্রীতি। হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পরেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের আবির্ভাব। তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। নবীনচন্দ্রের মধ্যে মহাকাব্যের বিরাট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যের অভাবে তিনি সে-বিষয়ে সফলকাম হতে পারেননি। তথাপি, কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনায় তিনি যে অসামান্য এক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া মনুষ্যত্বের জয়গানে তাঁর কাব্য মুখর। তাই, অসংখ্য দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র বাংলা 'কাব্যসাহিত্যে' বিশিষ্ট এক স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

এই যুগেই স্বতন্ত্র এক ভাবধারা নিয়ে কবি বিহারীলালের আবির্ভাব। তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে যে নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথেই তার পূর্ণ পরিণতি। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' শৈশবে রবীন্দ্রনাথের উপর যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায় কবির 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-য়। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না, ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল এবং তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও তেমনি অস্পষ্ট,—কিন্তু কবি-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই তাঁর কাব্যের অসাধারণতা। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে আরও কয়েকজন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনেশচরণ বসু, গোবিন্দ দাস (ভাওয়ালের কবি), যোগীন্দ্রনাথ বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতির।

বিহারীলাল

এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলা কাব্যের চরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। তিনি যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই তাঁকে মহাকবিরূপে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নব নব ভাবলহরীর সঙ্গে বহুবিচিত্র ছন্দের ও অলঙ্কারের অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত তাঁর অজস্র কবিতা ও গান পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দরের বাণী, সেই সঙ্গে দিয়েছে অমৃতলোকের সন্ধান, উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবতার আরাধনায় আত্মস্থ হ'তে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বহুবিচিত্র রূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই। প্রকৃতির রহস্য-চেতনা ও মানবতার বোধ রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতা ও গানের প্রভাব সমগ্র বাংলা-সাহিত্যকে আজ এমনভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগের কবি

রেখেছে যে, রবীন্দ্রোত্তর কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি নতুন কোনো বাণী শোনানো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তাঁর গানের বাণীও সর্বজনের, সর্বকালের ও সর্বদেশের। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে অবস্থান ক'রে আর যে-সব কবি অল্পবিস্তর মৌলিকত্ব দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন. মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি। ছন্দোবৈচিত্র্যে সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা এবং দেশাত্মবোধক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কাজী নজরুলের কবিতাবলী বাংলা কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি—উপসংহার

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিশেষত বর্তমানকালের বাংলা কাব্যসাহিত্য যে নতুন ধারায় গ'ড়ে উঠেছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ঐতিহ্যের বিশেষ মিল নেই। সাম্প্রতিক কালের কবিরা যেন রবীন্দ্রযুগের কাব্যরীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে পাশ্চাত্ত্য কাব্য-রীতির অন্ধ অনুকরণ করতে অধিকতর যত্নশীল। ছন্দের বন্ধন থেকে এঁরা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন, দুর্বোধ ভাবের বন্ধনে আবার বন্দী করেছেন কাব্যলক্ষ্মীকে। তবু, এঁদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ঐতিহ্যের অধিকারী এবং নিজেদের প্রতিভার আলোকে কাব্য-সাহিত্যকে নতুন এক ধারায় পরিপুষ্ট করেছেন তাঁরা হলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এঁদের কবিতায় সমাজচেতনা যেমন একদিকে স্বীকৃতিলাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি এঁরা এক ভাববলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা উপন্যাস

ভূমিকা

গদ্যসাহিত্য তথা কথাসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট রূপ হ'লো উপন্যাস। উপন্যাসও গল্প, কিন্তু সাধারণ গল্প থেকে তার পার্থক্য অনেকখানি। উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের কিছুটা যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-মিল বহিরঙ্গের দিক থেকে যতটা, অন্তরঙ্গের দিক থেকে ততটা নয়। উপন্যাসের পটভূমি হয় বিস্তৃত এবং এক বা একাধিক জীবনের সুবিস্তৃত ইতিহাসই হ'লো তার উপজীব্য। উপন্যাসে একদিকে যেমন বহুবিচিত্র চরিত্রের ভিড় থাকে, তেমনি থাকে জীবনের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রতিহিংসার বিভিন্নমুখী পরিচয়। বাংলাভাষায় ঠিক এই শ্রেণীর কথাসাহিত্যের রচনা-ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। এদেশে গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ইংরেজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে; অর্থাৎ, ১৮-শ শতকের একেবারে

শেষভাগে। আর, সার্থক গদ্যরচনার ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় আরও অনেক পরে; অর্থাৎ, ১৯-শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশক থেকে। উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত হয় আরও কিছুকাল পরে।

অনেকের মতে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও বইখানিকে 'বাংলা-সাহিত্যের আদি উপন্যাস' ব'লে অভিনন্দিত করেন। এই উপন্যাসে প্যারীচাঁদ বহু-বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে যেভাবে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনা-নৈপুণ্য। প্রধানত রচনার সারল্য ও সরসতার জন্যই বইখানি সেকালে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক রসবিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে অনেকেই হয়তো কুণ্ঠিত হবেন, কিন্তু উপন্যাসের বহু লক্ষণ যে উক্ত গ্রন্থে বিদ্যমান সে-কথা অনস্বীকার্য।

প্রথম বাংলা উপন্যাস

বাংলাদেশে উপন্যাস-রচনার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। ইংরেজী 'নভেল' অর্থে আমরা যে 'উপন্যাস' বুঝি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারা থেকেই এদেশে তার উদ্ভব, এবং বঙ্কিমচন্দ্রই সার্থক বাংলা-উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন— 'বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও রাজ-রাজেশ্বর।' প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কথাসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। তিনি উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'লেও, নিজের মৌলিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্তু বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী'। এই উপন্যাসের বলিষ্ঠ অথচ কবিত্বময় ভাষা, বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ও ঘটনা-সংস্থাপনের চাতুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশক্তির প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করে, এবং স্বভাবতই তিনি পাঠকচিত্ত জয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ঐতিহাসিক উপন্যাস, ও (২) সামাজিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে, সেই সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে, তিনি যে-সব উপন্যাস রচনা করেন সেগুলি হ'লো— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম'। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধেরও সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় শেষোক্ত উপন্যাস চারখানিতে এবং ধর্মসমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম' গ্রন্থে। তাঁর যে-সকল গ্রন্থ সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে সেগুলি হ'লো — 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারানী', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অধিকাংশের মতে 'কপালকুণ্ডলা'-ই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ও কল্পনার যে অপূর্ব বিকাশ এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় তা তুলনাহীন। কপালকুণ্ডলার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র যে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব। তাছাড়া এই উপন্যাসে একদিকে যেমন আছে ঘটনা-সংস্থাপনের চমৎকারিত্ব, অন্যদিকে তেমনি আছে কাব্যরসের মাধুর্য। 'কপালকুণ্ডলা'-কে সামাজিক-উপন্যাসরূপে চিহ্নিত না ক'রে কাব্যসুষমামণ্ডিত কাল্পনিক উপন্যাস বলাই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সামাজিক-উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সার্থক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এই দুটি উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণেও বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শবাদী লেখক হ'লেও, বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিকতাকে কোথাও উপেক্ষা করেননি। তাঁর রচনায় তাই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে আর যাঁরা উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই প্রভাব শুধু যে ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় তাই নয়, বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী। রমেশ-চন্দ্র মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে চারখানি ঐতিহাসিক, আর দু'খানি সামাজিক। 'বঙ্গবিজেতা'-ই রমেশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঘটনার জটিলতায়, এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রই যথার্থভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। রচনার এই দুর্বলতা তিনি অবশ্য বহুল পরিমাণেই কাটিয়ে উঠেছেন তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণে'। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাভঙ্গির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, রমেশচন্দ্রের যে দু'খানি উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হ'লো—'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা'। তাঁর সামাজিক উপন্যাস দুটির নাম—'সংসার' ও 'সমাজ'। এ দুটি উপন্যাসে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা প্রকাশ না পেলেও, সমাজ-চিত্র অঙ্কনে তিনি যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না।

রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস

এই প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের সমকালীন বা তাঁর পরবর্তী কয়েকজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের নাম করাও প্রয়োজন। তাঁরা হলেন যোগেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' প্রভৃতি উপন্যাস সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করে। স্বর্ণকুমারী দেবীই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিক

কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যেমন অসামান্য, কথাসাহিত্যেও ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে বাংলা উপন্যাসের ধারা যেন এক নতুন গতিপথ লাভ করে। বঙ্কিমী ভাষার জটিলতা থেকে তিনি বাংলাভাষাকে যেমন মুক্ত করেন, বাংলা

উপন্যাসকে তেমনি করেন বাস্তবধর্মী ও মনস্তত্ত্বমূলক। ভাবের দিক থেকে, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও রসসমৃদ্ধ ভাষার দিক থেকে, চরিত্র সৃষ্টি ও নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে উপন্যাস কিভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিণত হতে পারে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার পথপ্রদর্শক। ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে তাঁর 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ' যেমন তাঁর অসাধারণ রচনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, তেমনি তাঁর সামাজিক ও রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়' উপন্যাস। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। ছোটগল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসও সে-যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। যেমন—'রত্নদীপ', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুর কৌটা', 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি। তাঁর রচনায় যে আন্তরিকতা ছিল তাই যেন উপন্যাসিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। কিন্তু, উপন্যাস রচনা অপেক্ষা তিনি ছোটগল্প রচনাতেই অধিকতর মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস

উনবিংশ শতকের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলাসাহিত্যের আসরে ঔপন্যাসিক হিসাবে অসমান্য খ্যাতি অর্জন করেন, বিংশ শতকের প্রথম দিকে তেমনি খ্যাতিলাভ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য এই দুইজন ঔপন্যাসিকের দানেই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের যে ধারা একদিন রবীন্দ্রনাথ এদেশে এনেছিলেন, সেই ধারার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র যেভাবে বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনকে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা অতি সহজেই পাঠকচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র বঙ্গসমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার যে অন্তরঙ্গ রূপটি তাঁর সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ একটি শিল্পীমন। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো তাঁর সহজ ও সাবলীল ভাষা, চিত্তস্পর্শী কথোপকথনের ভঙ্গি, মানবমনের নিবিড় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা, বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি তাঁর দরদ। শিশু ও কিশোর-চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং নারীসমাজের মর্মবেদনা উদ্ঘাটনে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর—'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'দেনা-পাওনা,' 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস', বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ', 'বামুনের মেয়ে', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন'। শরৎচন্দ্রের মানবপ্রীতিই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের প্রধান ভিত্তি। পাপকে তিনি ঘৃণা করলেও, পাপীকে কখনও তিনি ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে রাখেননি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে আর যাঁরা উপন্যাস রচনা ক'রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অনুরূপা দেবীর 'মা', 'পোষ্যপুত্র', নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিস্নান', সীতা দেবীর 'পরভৃতিকা' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

আধুনিক কালের উপন্যাস ও উপসংহার

পরবর্তী যুগে বা অধুনিক কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা নিজস্ব প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের বিভিন্ন রচনায় তাঁরা হলেন—'পথের পাঁচালী'-র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি' ও 'ধাত্রীদেবতা'-র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জঙ্গম'-এর বনফুল, 'বেদে'-র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'মহাপ্রস্থানের পথে'-র প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি। বাংলা উপন্যাস আজ ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর। বহু নবীন ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রতিভার যে স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা করা যায় যে, বাংলা উপন্যাসের বলিষ্ঠ ঐতিহ্য কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হবে না, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু বাংলা উপন্যাসই নিজস্ব গুণে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্য

বাংলাসাহিত্যে গদ্য-রচনায় প্রকৃত অনুশীলন যেমন শুরু হয় উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে, নাটক-রচনার সূত্রপাতও তেমনি হয় সেই যুগে। এদেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্বে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো নাটক রচিত হয়নি। নাট্যশালা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই নাটক-রচনা বিষয়ে এদেশের সাহিত্য-রচয়িতারা অল্পবিস্তর মনোনিবেশ করেন। প্রাচীনকালে এদেশের সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম যেমন ছিল কবিগান, তেমনি ছিল যাত্রাগান। চৈতন্যযুগেও যাত্রার অনুরূপ পালাগানের অভিনয় হ'ত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্য-পদ্য-সংলাপ সংবলিত যাত্রাগানের এক অবিচ্ছিন্ন যুগ। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনায় যখন এদেশে নাট্যশালা স্থাপিত হয় এবং বাংলা-নাটকের অভিনয় হ'তে থাকে, তখন স্বভাবতই শহরাঞ্চলে যাত্রাগানের কদর কমে আসে। শিক্ষিত-সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাত্রাগান তখন প্রধানত পল্লী-অঞ্চলের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজে নিজের অস্তিত্ব কোনোমতে টিকিয়ে রাখে।

ভূমিকা

বাংলাদেশে নাটক-রচনার যে-ইতিহাস আমরা পাই তার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের যাত্রাপালা বা পাঁচালির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এদেশে নাটক-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারার আদর্শে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের অবসর-বিনোদনের জন্য প্রথম যে নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তার নির্মাতা ছিলেন লেবেডফ নামক জনৈক রাশিয়ান। তাঁরই উদ্যোগে ঐ রঙ্গালয়ে কৌতুকরসাশ্রিত দু'খানি ইংরেজ নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয় এবং বাঙালীরা সেই প্রথম পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকে রচিত বাংলা-নাটকের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও কয়েকটি নাট্যশালা স্থাপিত হ'লে মৌলিক বাংলা-নাটক রচনার উদ্যোগ চলে।

প্রথম নাট্যশালা স্থাপন ও অনুবাদ-নাটকের অভিনয়

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদার পাশ্চাত্ত্য নাটকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে-নাটকটি রচনা করেন তার নাম—'ভদ্রার্জুন'। বাংলাভাষায় রচিত এই নাটকটিকেই প্রথম মৌলিক রচনা বলা যায়। মহাভারতের সুভদ্রাহরণ উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে এই নাটকটি রচিত হয়, এবং এর দৃশ্যবিভাগও গঠিত হয় ইংরেজী নাটকের আঙ্গিকে। উল্লিখিত বৎসরে আর একখানি মৌলিক নাটক রচিত হয়, তার নাম 'কীর্তিবিলাস'। নাট্যকার—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। বাংলাভাষায় 'ভদ্রার্জুন' যেমন প্রথম মিলনান্তক নাটক, প্রথম বিয়োগান্তক নাটক তেমনি 'কীর্তিবিলাস'। রচনা রীতির দিক থেকে অবশ্য উভয় নাটকেই বিশেষ দুর্বলতা ছিল। ফলে কোনো নাটকই অভিনীত হবার সুযোগ লাভ করেনি। এর ছয় বছর পরে, বাংলার তৎকালীন সমাজ-জীবন, বিশেষত কৌলীন্য-প্রথার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ক'রে তুলতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে যে-নাটক রচনা করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তা সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়। সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-ই এদেশে প্রথম অভিনীত মৌলিক বাংলা-নাটক। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রামনারায়ণ তাঁর এই নাটকে যথেষ্ট রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পরে তিনি 'নবনাটক' নামে আরও একখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন। সে-নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-নাটকের পর বাংলাভাষায় যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, তা হ'লো অসামান্য প্রতিভাধর মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'। এই নাটকের মধ্য দিয়েই যে এদেশে প্রথম সার্থক বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নাট্যরচনার প্রথম যুগ

বাংলা-নাটকের প্রথম-যুগের প্রথম-পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে। আর, সেই যুগের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ হয় সেই উনবিংশ শতকেরই পঞ্চম দশকে। এই পর্বে মাইকেল মধুসূদনের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলা নাট্য-

সাহিত্যের ভিত্তি হয় সুদৃঢ়। একমাত্র রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক ব্যতীত মধুসূদন-পূর্ববর্তী যুগের নাটকগুলিকে নাটক না ব'লে অভিনয়োপযোগী খণ্ডকাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নাটকের পক্ষে যে-সব লক্ষণ অপরিহার্য, অর্থাৎ বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব, চরিত্রচিত্রণের বৈচিত্র্য এবং ঘটনা-সংঘাত, মধুসূদনের নাটকেই সর্বপ্রথম সেই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক এই তিন শ্রেণীর নাটকই তিনি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেন। শর্মিষ্ঠা (১ ৫৮ খ্রীঃ) যেমন তাঁর প্রথম পৌরাণিক-নাটক, তেমনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর দ্বিতীয় নাটক হ'লো 'পদ্মাবতী' (১৮৬০ খ্রীঃ)। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রীঃ) একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই 'কৃষ্ণকুমারী'-ই সর্বপ্রথম সার্থক 'ট্রাজেডি' বা বিয়োগান্তক নাটক। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের পূর্বে মধুসূদন আর যে-দুটি নাটক রচনা করেন, সে-দুটিকেই বলা যেতে পারে সামাজিক-নাটক বা প্রহসন। এই নাটক দুটির নাম—(১) 'একেই কি বলে সভ্যতা'; আর (২) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০ খ্রীঃ)। এই প্রহসন দুটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুসূদনের বাস্তবতা বোধ ও মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের যে অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় সে-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে তার একান্তই অভাব ছিল।

মাইকেল মধুসূদন ও বাংলা নাটক

'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হবার পর, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী সামাজিক নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রীঃ) আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশী নীলকরদের অমানুষিক প্রজা-পীড়নের কাহিনী অবলম্বন ক'রে রচিত এই নাটক সে-যুগে যে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসের পাতায় তা উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে। 'নীলদর্পণ' শুধু দীনবন্ধুর এক অপূর্ব নাট্য-সৃষ্টিই নয়, তৎকালীন বঙ্গদেশের একখানি বাস্তবধর্মী সমাজচিত্র। দীনবন্ধুর এই নাটক দিয়েই সেকালের প্রথম সাধারণ নাট্যশালা 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয়েছিল। নাট্যরসসৃষ্টিতে দীনবন্ধুর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রীঃ)-নাটক একখানি উচ্চাঙ্গের প্রহসন-জাতীয় সাহিত্যের নিদর্শন। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩ খ্রীঃ) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রীঃ), 'লীলাবতী' (১৮৬৭ খ্রীঃ); 'জামাইবারিক' (১৮৭২ খ্রীঃ); 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩ খ্রীঃ)। দীনবন্ধু মিত্রের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসুর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্থান বিশিষ্টতাপূর্ণ। নাটক ও নাট্যশালার সঙ্গেই যেন তাঁর সমগ্র জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার, গীতিকার, নট ও নাট্য-পরিচালক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ শুরু হয় গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই, অর্থাৎ উনবিংশ-

শতকের ষষ্ঠ-দশকে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অসংখ্য নাটক রচনা ক'রে তিনি নাট্যকার হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী হন। তাঁর নাটকাবলীর, মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'সীতার বনবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'জনা', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীর-কাশিম', 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি। বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র এককভাবেই একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

গিরিশচন্দ্রের নাটক

গিরিশ-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো উজ্জ্বল, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় তিনি গিরিশ-প্রতিভাকেও অনেকাংশে ম্লান ক'রে দিয়েছিলেন। নানা দিক থেকে বিচার করলে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম-ভাগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। প্রহসন ও সামাজিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক অনেক নাটকই তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর নাট্যপ্রতিভার সম্যক্ বিকাশ দেখা যায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেই। বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশের স্বদেশী-আন্দোলন যে তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাটকগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য– 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'নূরজাহান', 'দুর্গাদাস', 'প্রতাপসিংহ', 'সিংহল-বিজয়', 'সীতা', 'ভীষ্ম', 'পরপারে', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম'। শেষোক্ত নাটক দু'টি উচ্চাঙ্গের প্রহসন। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল একদিকে যেমন শাশ্বত মানবধর্মের জয়গান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি পরাধীন জাতির মনে নবীন আশার সঞ্চার করেছেন স্বাধীনতার বাণী প্রচার ক'রে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো তাঁর আবেগপূর্ণ ও কবিত্বময় সংলাপ। তাছাড়া, নাটকের চরিত্র-চিত্রণে, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে এবং পাত্রপাত্রীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও তিনি অসামান্য রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে আরও দু'জন নাট্যকারের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁরা হলেন—রসরাজ অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ। অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁর সহকর্মী। তাঁর অধিকাংশ নাটকই ছিল ব্যঙ্গরসাত্মক বা প্রহসন। যেমন—'বাবু', 'খাসদখল', 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' প্রভৃতি। আর, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের সম-সাময়িক। আরব্য-উপন্যাস জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে তিনি যে-সব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য থাকায় নাট্য-জগতে সেগুলি সহজেই সমাদৃত হয়। যেমন—'আলিবাবা', 'আলাদিন', 'কিন্নরী'

অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক

প্রভৃতি নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনা-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পৌরাণিক নাটক 'বভ্রূবাহন' ও 'নরনারায়ণ'-এ। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে অধিকতর সাফল্যলাভ করে—'প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার' ও 'আলমগীর'।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। শুধু অপরিসীম নয়, অসামান্য। নাট্যরচনায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সে-রকম প্রতিভার স্পর্শ সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী গতানুগতিক ধারায় রচিত হয়নি, সে-সব নাটকের আঙ্গিকও প্রচলিত নাট্যরীতি থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন। তাঁর 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'বাঁশরী', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটক রূপক-নাটকের পর্যায়ভুক্ত। প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায় এই সব ভাবসমৃদ্ধ নাটক। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গীতিনাট্যের মধ্যে তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নৃত্যনাট্যের মধ্যে তেমনি জনপ্রিয় তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি। এই শ্রেণীর ভাবসমৃদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যেই তা দুর্লভ। সাধারণ নাট্যশালায় তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গরসাত্মক ও কৌতুকরসাশ্রিত নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেমন—'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা'। রবীন্দ্রনাথের আর একখানি জনপ্রিয় নাটক হ'লো 'বিসর্জন'। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত এটি একটি কাব্যধর্মী নাটক।

সাম্প্রতিক কালের নাটক—উপসংহার

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলাভাষায় খুব বেশী ভালো নাটক রচিত হয়নি। সাধারণ নাট্যশালায় বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন নাট্যাবলীর অভিনয় হয়েছে। এই শতকের দ্বিতীয়-দশকে কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু, নাট্যরচনায় তাঁরা প্রধানত গিরিশ-চন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি। পরবর্তীকালে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ ও পৌরাণিক নাটক রচনায় মন্মথ রায় কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন সন্দেহ নাই। বিশেষত 'একাঙ্ক-নাটক' রচনায় মন্মথ রায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেন। সাম্প্রতিককালে সমাজ-সচেতন মানুষের আশা-আকাজ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে-সব নাটক রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়াতার' এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন ক'রে উচ্চাঙ্গের নাটক রচনার এখনও বিশেষ অবকাশ আছে।

বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। অরণ্যচারী আদিম মানব-সমাজ সহজাত জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই একদিন সভ্যতার আলোক আবিষ্কার করে। ক্রমে সেই আলোক-স্পর্শে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং সভ্যতার ধাপে ধাপে চলতে থাকে তাদের অভিযান। সুসভ্য মানব-সমাজের সেই অভিযান এখনও চলেছে অব্যাহত গতিতে। এই অভিযানের মূলে রয়েছে মানুষের বস্তুজাগতিক জ্ঞান, যাকে আমরা অভিহিত করেছি বিজ্ঞান নামে। বস্তুজাগতিক এই জ্ঞানের দুটি দিক আছে। একটি হ'লো মানুষের চিন্তার জগতে বস্তুতত্ত্বের রহস্য আবিষ্কার; অন্যটি বাস্তব জগতে সেই আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন নতুন ব্যবহারিক দ্রব্যের উদ্ভাবন। এই দুইয়ের সাধনাই অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। এই সাধনাকেই আমরা বলি বিজ্ঞানচর্চা। কৌতূহলী মানুষ চায় বস্তুজগতের সকল রহস্য ভেদ করতে। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই বিজ্ঞানচর্চায় যত্নবান হয়েছে সুসভ্য মানব-সম্প্রদায়।

ভূমিকা

বিজ্ঞান-কে আমরা নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন—রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীর-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, খনি-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, নদী ও সমুদ্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি। বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগ আবার বিশেষ বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজনে নিত্য নতুন শাখায় ক্রমশই বিভক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমা যাচ্ছে বেড়ে, অনাবিষ্কৃত বহু তথ্যই আজ তার অধিগত। মানুষের কাছে আজ আর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কোনো রহস্যই বিস্ময়কর নয়, বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিকে সে আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বারা দমন বা দূরীভূত করতে সমর্থ। বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আজ সৌরজগতের ও গ্রহনক্ষত্রের বিস্তৃত খবর রাখে, আণবিক শক্তির আবিষ্কার ক'রে সে যেন আজ দৈবীশক্তিতেই বলীয়ান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এখন সভ্যতার চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে। তাছাড়া, সুসভ্য মানুষ আজ চায় তার সমগ্র জীবনের কর্মধারাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করতে। এই বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের প্রয়োজনীতা অনুভব ক'রে অধুনা কলাবিদ্যার অন্তর্গত বহু বিদ্যাকেই বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলা হয়েছে। তদনুসারে, সমাজবিজ্ঞান থেকে শুরু ক'রে সঙ্গীত-বিজ্ঞান, নৃত্য-বিজ্ঞান, এমন কি রন্ধন-বিজ্ঞান পর্যন্ত নিত্য নতুন শব্দ ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাজেই, প্রাচীনকালের মতো একালে আর সহজ উপায়ে বিজ্ঞান-শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের দান যে অপরিসীম আমরা তার প্রমাণ পাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে। বাষ্পশক্তির আবিষ্কারে তৈরি হ'লো

রেলগাড়ি। আর, সেই সঙ্গে মানুষের ভ্রমণের অসুবিধা যেমন দূরে গেল, তেমনি পৃথিবীর দূরত্ব-ও গেল কমে। এ-বিষয়ে জেমস্ ওআট্ আবিষ্কৃত স্টীম-এঞ্জিন মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দান। বাষ্পশক্তির সাহায্যে শুধু যে রেলগাড়িই চললো তা নয়, চললো স্টীমার এবং অনেক কলকারখানা। পরে বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারে মানুষের বহুবিধ অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যই গেল দূর হয়ে। সভ্য-মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করবার সুযোগ পেল এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেই। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে, বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের মাধ্যমে দূরকে অতি সহজে নিকট ক'রে আমরা আজ যে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করছি সে তো বিজ্ঞানেরই বিস্ময়কর দান। গ্রামোফোন আবিষ্কারের পর আমরা পেলাম রেডিও, তারপর সিনেমা ও টেলিভিশন। তারে ও বেতারে আজ আর দূরত্ব ব'লে কোনো কিছু নেই, ঘরে ব'সে অবসর-বিনোদনের সহজ উপায়ও এনে দিয়েছে সেই বিদ্যুৎশক্তি। বিমানের সাহায্যে মানুষ আজ অতি কম সময়ে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে ; রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে আজ শরীরের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষের চোখে, ফলে চিকিৎসার হয়েছে অনেক সুবিধা। বিজ্ঞানচর্চার ফলেই আমরা দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সুখ-সুবিধার উপকরণগুলি আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছি সে-কথা অবিসংবাদিত সত্য। আণবিক শক্তির সাহায্যে আজ মানবকল্যাণের ক্ষেত্রও হয়েছে প্রশস্ততর।

বিজ্ঞানের দান

বর্তমান জগতের সকল সভ্যজাতিই আজ বিজ্ঞানকে এক বিশেষ আশীর্বাদ ব'লে মেনে নিয়েই বিজ্ঞানের অনুশীলনে তৎপর হয়েছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ যখন নতুনতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্পর্শ লাভ করে, বিজ্ঞানকে সে তখন আশীর্বাদরূপে গণ্য না ক'রে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ উন্নতির এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, যে-ব্যাধি একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর নামান্তর ব'লে পরিগণিত হ'ত, আজ সে-ব্যাধি মানুষের কাছে আর বিভীষিকা ব'লে মনে হয় না। বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তিকে মানুষ আজ বহুবিধ কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মানকে করেছে উন্নত, দ্রুতগামী বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে সময়কে করেছে সংক্ষিপ্ত, সেই সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্বও দিয়েছে বিস্ময়করভাবে কমিয়ে। সংক্ষেপে, মানবজাতির কল্যাণসাধনে, তথা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার আজ নিয়োজিত। তথাপি চোখের সামনে যখন যুদ্ধের বিভীষিকা ভেসে ওঠে, মন তখন স্বভাবতই বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং প্রশ্ন জাগে—'বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ ?' এ-প্রশ্নটি বহুদিন ধ'রেই দেশে-বিদেশে তর্ক ও রচনার অন্যতম বিষয় ব'লে গণ্য হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটিকে শুধু একদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে চলবে না ; বিজ্ঞানের কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয় দিক থেকেই বিচার ক'রে দেখতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এ-যাবত যে-সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির

বিজ্ঞান—আশীর্বাদ, না অভিশাপ

কার্যকারিতা যখন দেখি, তখন বিজ্ঞানকে অভিশাপ ব'লেই মনে হয়। কিন্তু, একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই এটা আমরা বুঝতে পারব যে, দোষটা ঠিক বিজ্ঞানের নয়, দোষটা বিজ্ঞানের সেই আবিষ্কারকে বিধ্বংসমূলক কাজে লাগানোর চেষ্টাতে। ধ্বংস-শক্তিসম্পন্ন ডাইনামাইট দিয়ে পাহাড়ের বুকে সুড়ঙ্গ তৈরি ক'রে রেলপথ বসিয়ে যখন মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম হয়, তখন কি কেউ ডাইনামাইটকে অভিশাপ ব'লে গণ্য করে? রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কতরকম বিষ-ই না আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই বিষ-প্রয়োগে মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু, সেই বিষ যখন বিভিন্ন ঔষধে প্রযুক্ত হয়ে মানুষের উপকার করে, তখন কি রসায়ন বিজ্ঞানের ভালো দিকটা আমরা উপলব্ধি করি না? আণবিক-শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞান-অনুশীলনের এক বিরাট সাফল্য। কিন্তু যখন দেখি আণবিক বোমার আঘাতে একটি জনপদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কত মানুষ বীভৎসজনকরূপে বিকলাঙ্গ হয়ে রইল জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত, তখন আর আণবিক-শক্তির আবিষ্কারকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করতে মানুষের মন কিছুতেই রাজী হয় না। অথচ, এই আণবিক-শক্তিকেই আবার এমনভাবে মানব-কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে ক'রে বর্তমান মানব-সভ্যতার পক্ষে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যুগ অতিক্রম ক'রে এক অভিনব সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যুগে পদার্পণ করা সম্ভব। কাজেই, বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই অভিশাপ নয়, অভিশাপ হ'লো সেই আবিষ্কারকে বিধ্বংসমূলক বা মানবতাবিরোধী কাজে লাগানোর অপচেষ্টা। বিজ্ঞানীরা আজ মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কার্য থেকে বিরত হ'তে পারছেন না রাষ্ট্র-শক্তির চাপে। ফলে, বিজ্ঞানের অকল্যাণকর দিকটাই যেন অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে। স্থির মস্তিষ্কে বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, দোষটা বিজ্ঞানের নয়, দোষ মানুষের অন্তর্নিহিত পাপবুদ্ধির।

মানবসভ্যতাকে যদি এই পাপবুদ্ধির কবল থেকে মুক্ত করতে হয়, তাহ'লে যে জিনিসটি সবচেয়ে প্রয়োজন তা হ'লো—ধর্মসাধনা। বিজ্ঞান-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যদি ধর্মসাধনাতেও প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে বিজ্ঞানের অশুভ দিকটা সহজেই দূরীভূত হ'তে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে মনে হ'লেও, আসলে প্রত্যেকটি হ'লো পরস্পরের পরিপূরক। ধর্ম-সাধনায় মনে যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তা থেকেই মানুষ বিজ্ঞানের অশুভ আবিষ্কারের পরিকল্পনাকে মন থেকে দূর করতে পারে। মানবসভ্যতাকে যদি আজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহ'লে সকল রাষ্ট্রশক্তির উচিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। তবেই মানুষ, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাহায্যে, জীবনে প্রকৃত সুখভোগের স্পর্শলাভ করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার

সুপ্রাচীন যুগের ভারতীয় প্রজ্ঞাবান্ ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে, পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-অপরমাণু দ্বারা গঠিত এবং সেই অণু-পরমাণু বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। এ-কথাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে সর্বদাই প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। কিন্তু আর্য ঋষিদের সেই বিশ্বাসের মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না।

ভূমিকা

অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুকাল পরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে সেই বিশ্বাসই বাস্তব সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারশ' বছর আগে স্বনামধন্য দার্শনিক ডিমক্রিটাস এই অণু বা 'অ্যাটম' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তুই অবিভাজ্য কতকগুলি কণা বা অণু-পরমাণুর সমষ্টি। ডিমক্রিটাসের পর এপিকিউরাস এবং আরও কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিক এ-বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। কিন্তু মানবসমাজে ক্রমশ প্লেটো ও এরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের, এবং খ্রীষ্টান তত্ত্বজ্ঞানীদের চিন্তাধারার প্রভাব এতই প্রবল হয় যে, পরবর্তীকালের দার্শনিকেরা ডিমক্রিটাস ও এপিকিউরাসের বস্তুবাদী চিন্তাধারা পরিত্যাগ ক'রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্যপথে পরিচালিত করেন। ফলে, বিজ্ঞান-জগতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অণু-পরমাণু সংক্রান্ত সকল তথ্য-ই অবহেলিত অবস্থায় থাকে, বিজ্ঞানীরা আর সে বিষয় নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন না।

কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন বৈজ্ঞানিক ডাল্টনের অণু-পরমাণু সংক্রান্ত তথ্যগুলি বাস্তব সত্যের মর্যদা লাভ করলো, পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের টনক যেন নড়লো সেদিন। বিজ্ঞানজগতে তখন আবার নতুন ক'রে একটা সাড়া জাগলো, পরমাণবিক শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। জানা গেল যে, অণু বা অ্যাটম আকারে বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে, এবং বৃহত্তম অণুগুলিকে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা সম্ভব নয়। কাজেই, ক্ষুদ্রতম অণু যে কত ক্ষুদ্র হ'তে পারে তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। বস্তুজগতের সবচেয়ে লঘু বা হাল্কা পদার্থ হ'লো হাইড্রোজেন বাষ্প। সেই বাষ্প যে ধরনের অণু দিয়ে গঠিত, মনে হয় সেগুলিই সবচেয়ে ক্ষুদ্র অণু। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় যে-পরিমাণ হাইড্রোজেন বাষ্প থাকতে পারে, তা বিশ কোটিরও বেশী অণু দিয়ে গঠিত।

ডাল্টনের অণু-সংক্রান্ত তথ্য

এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অবিরাম এক দুরন্ত গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উত্তাপের ফলে ঘূর্ণনের এই অবিশ্রান্ত গতিবেগ যেন আরও বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের ধারনা, অণুগুলি অবস্থাবিশেষে পাঁচ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার ফুট বেগে দ্রুত আবর্তিত হয়। কিন্তু, খুব বেশী ঠাণ্ডায় উত্তাপ যখন হিমবিন্দু থেকে ২৭৩° ডিগ্রী নিচে নেমে যায়, অণুগুলির গতিবেগ তখন আর থাকে না, সেগুলি তখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে

অণু-পরমাণুর স্বরূপ

আসে। অবশ্য, হিমবিন্দু থাকে অত নিচে উত্তাপকে নামিয়ে আনা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তা সম্ভব হ'লে, কিংবা কোনো বস্তুর অণু-পরমাণুগুলি স্থির হয়ে থাকলে, সেই বস্তুর বস্তুত্বই আর থাকত না। মোটকথা, এই তথ্য আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল বস্তুই অণু-পরমাণুর সমষ্টি এবং অণুর গতিবেগের দ্রুততার উপরেই তাদের গুণ, রূপ ও শক্তির বিভিন্নতা নির্ভর করছে। তাছাড়া, অণুগুলিকে ওজনের দিক থেকেও ভিন্নরূপে পাওয়া যায়। যেমন, হাইড্রোজেন বাষ্পের অণুগুলি সবচেয়ে হাল্‌কা আর ইউরেনিয়াম ধাতুর অণুগুলি হ'লো সবচেয়ে ভারী।

পরমাণবিক শক্তির এই যে আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম। কারণ, আমরা জানি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও বিস্ফোরক শক্তির সাহায্যে আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত যানবাহন ও কল-কারখানা চলছে। এই সব যানবাহন ও কলকারখানার যন্ত্রপাতিকে যদি আণবিকশক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহ'লে একদিকে সেগুলির গতিবেগ যেমন অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাবে, তেমনি অতি কম সময়ে বেশী দূরে যাওয়া যাবে এবং বেশী জিনিস উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ, আণবিক শক্তিকে যদি মানব-কল্যাণে ব্যবহার করবার উপায়গুলি আজ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহ'লে মানবসভ্যতা যে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যুগ অতিক্রম ক'রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে, মানুষের জীবনযাত্রা হবে আরও সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার কিছু কিছু লক্ষণ আমরা যে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পারছি তা নয়। কারণ, এ-যুগের জেট-বিমান ও রকেটগুলির প্রচণ্ড গতিবেগ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, মহাশূন্যে অভিযানের যে চেষ্টা এ-যাবত সাফল্যলাভ করেছে সেগুলির মূলেও রয়েছে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার।

মানবকল্যাণে আণবিক শক্তির ব্যবহার

কিন্তু মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হবার বাসনা যেদিন থেকে মানুষের মনে জেগেছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে শক্তির অপব্যবহার। রাষ্ট্রশক্তির চাপে বাধ্য হয়েই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন আণবিক ও পরমাণবিক বোমা। মেক্সিকোর কুমেরু প্রান্তরে যেদিন আণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সেদিন সেই বিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণামের কথা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেদিন ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি শহর দুটির ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলেন, তার পরদিন বিশ্ববাসী সভয়ে শুনলো সেই বোমা বিস্ফোরণের পরিণাম-কাহিনী। আণবিক বোমার সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেদিন মুহূর্তের মধ্যেই জাপানের ঐ শহর দু'টি লোকজন ঘরবাড়ি সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় যে সব নরনারী দৈবক্রমে আত্মরক্ষা করে, তারাও সেই বোমা-বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তার ফলে বীভৎস ভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত। সমগ্র বিশ্বে আজ তাই আণবিক শক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠিত হয়েছে।

আণবিক বোমা ও তার ভয়াবহ বিস্ফোরণ-শক্তি

শান্তিকামী মানুষমাত্রেই আজ পৃথিবীর দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে আবেদন জানাচ্ছে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে পরমাণবিক বোমা-বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ করতে। পৃথিবীতে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরমাণবিক বোমা সম্পর্কে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটেনি, এবং পাশ্চাত্ত্যের বহু রাষ্ট্রই আত্মরক্ষার দোহাই তুলে নিজেদের প্রতিরক্ষা-সংস্থাকে সুসজ্জিত ক'রে রেখেছেন পরমাণবিক মরণাস্ত্রে। হিরোশিমা ও নাগাসিকি শহর দুটিতে যখন আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, সে-সময় সেই বোমা বহন করা হয়েছিল বিমানে ক'রে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে, এখন আর পরমাণবিক বোমা বহন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সাম্প্রতিক কালে যে ধরনের পরমাণুশক্তিসম্পন্ন মরণাস্ত্র তৈরি হয়েছে সেগুলি এক রাষ্ট্রের যে-কোনো জায়গা থেকে অন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুর উপর অনায়াসেই নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে ইউরেনিয়াম ধাতুই ব্যবহৃত হয়। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঐ ধাতুর অণুগুলি সবচেয়ে ভারী। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফলে বহুসংখ্যক অণুতে যে ভাঙন ঘটানো হয় তার বিস্ফোরণশক্তি যেমন প্রচণ্ড, তেমান ভয়াবহ। একথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় যে, পাঁচ-ছয়টি আণবিক-বেমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের মতো বড় বড় শহরগুলিকে কয়েক মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা সম্ভব। পরমাণবিক শক্তিকে যদি এইভাবে অপব্যবহার করা হয় তাহ'লে মানবসভ্যতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহার

আজ যখন দেখি পরমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার একটা সুস বদ্ধ চেষ্টা চলেছে, তখন এ-কথা আমরা ভাবি না যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের শক্তি কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কারণ, যে-শক্তি দিয়ে পৃথিবী থেকে রকেট ছুঁড়ে উপগ্রহকে পৃথিবী পরিক্রমায় নিযুক্ত করা হচ্ছে, সেই শক্তিকে যদি মারণাস্ত্রে ব্যবহার করা হয় তাহ'লে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হ'তে পারে। মানুষের মধ্যে আজ যে-দানবীর শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে যদি না দমন করা যায় তাহ'লে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পরমাণবিক শক্তির অপব্যবহার না ক'রে আজ তাই সকল রাষ্ট্রের উচিত সেই শক্তিকে শুধু মানবকল্যাণের কাজে লাগানো।

মহাশূন্যে অভিযান

ছেলেবেলায় গুরুজনেরা বলতেন—মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। সে-কথার তাৎপর্য সেই বয়সে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড় হয়ে যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারলাম, তখন বুঝলাম মানুষের শক্তি কতখানি। জ্ঞানের অনুশীলনে আর বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষ আজ যেন দৈবশক্তির অধিকারী। শূন্যপথে যেদিন মানুষের হাতে-গড়া বিমানখানি সাফল্যের সঙ্গে প্রথম উড়েছিল, সেদিনকার বিস্ময় আজ আর নেই। আজকের বিস্ময় অতি দ্রুতগতি-সম্পন্ন রকেট ক'রে পৃথিবীর মানুষকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে সুস্থ দেহে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। মানুষের হাতে-গড়া উপগ্রহ আজ মহাশূন্যে পৃথিবী পরিক্রমা ক'রে চলেছে, পৃথিবীর রকেট গিয়ে পৌঁছুচ্ছে চাঁদে এবং ভবিষ্যতে নতুন ধরনের ব্যোমযানে চড়ে পৃথিবীর মানুষ যাতে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে পারে তার জন্যে চলেছে বিরাট প্রস্তুতি। কাজেই, এ-কথা আজ মানতেই হবে যে, চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। ভূমিকা

স্থলপথে ও জলপথে চলবার সর্বপ্রকার যানবাহন তৈরি ক'রেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি, আকাশপথে দ্রুতগতিতে চলবার বাসনায় সে তৈরি করেছে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যোমযান বা বিমান। কিন্তু শুধু চলাতেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, শূন্যপথে বিচরণ করতে গিয়ে তার কৌতূহল জাগে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে। চাঁদের স্বরূপতত্ত্ব কী, মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকতে পারে কি না, শুক্র-গ্রহের মধ্যেই বা কী আছে এ-সব তথ্য জানতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন অনন্তকালের এক কৌতূহল বিরাজ করছে। তাই দিনরাত গবেষণা চল্‌লো কী ক'রে পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে এড়িয়ে মহাশূন্যে অভিযান চলানো যায়। সাধারণ বিমানের পক্ষে দশ-বারো মাইলের বেশি উঁচুতে ওঠা সম্ভব নয় দেখে, বিজ্ঞানীরা অনেক দিনের সাধনায় তৈরি করলেন রকেট। হাউই যেমন সোঁ ক'রে আকাশে উঠে যায়, শক্তিশালী রকেটও তেমনি সোজা শূন্যপথে কয়েক শ' মাইল উঠে যেতে পারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। এক পর্যায়ে একটি রকেটকে যখন আকাশপথের অনেক দূর পর্যন্ত তোলা সম্ভব হয়নি, বিজ্ঞানীরা তখন আবিষ্কার করলেন বহুপর্যায়ের রকেট। এতে ক'রেই আজ পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত চাঁদে রকেট পাঠানো সম্ভবপর হয়েছে। এ-ব্যাপারে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা যে-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমান বিশ্বে তা এক মহাবিস্ময়কর সাধনা ব'লেই অভিনন্দিত হচ্ছে। রকেট-নির্মাণ

পৃথিবী ও মহাশূন্য সম্পর্কে অজ্ঞাত বিবিধ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭-সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞানবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। সেই উপলক্ষে পৃথিবীর বহু

দেশের বিজ্ঞানীরা একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে যে-আলোচনা করেন তা থেকেই মহাশূন্যে অভিযানের পরিকল্পনাটি রূপ নেয়। এ-বিষয়ে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা সর্বাগ্রে ঘোষণা করেন। তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের চেষ্টা চলছে এবং রকেটের সাহায্যে সেই উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে পৃথিবী-পরিক্রমা করানো হবে। এতে ক'রে মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরের তথ্যাদি সংগৃহীত হবে ব'লে মার্কিন-বিজ্ঞানীরা আশা পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, ঐ উপগ্রহে এমন সব যন্ত্রপাতি থাকবে যা হবে স্বয়ংক্রিয় এবং তারাই পৃথিবীতে আকাশমার্গের বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছে দেবে। আমেরিকায় যখন এ-বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে এবং পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যখন সম্মিলিত হ'তে চলেছেন আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞানবর্ষের উদ্‌যাপন উপলক্ষে, সেই ১৯৫৭-সালের অক্টোবর মাসেই সোভিয়েট-রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা সকলকে বিস্ময়ে হতবাক্ ক'রে দিলেন মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বা একনম্বর স্পুটনিক পাঠিয়ে। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৭-সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই উপগ্রহটিকে রাখা হয়েছিল বহুপর্যায়ের একটি রকেটের শীর্ষদেশে। বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে উপগ্রহটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রকেট থেকে এবং নিজের কক্ষপথে অবস্থান ক'রে সে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার ক'রে আবর্তিত হ'তে থাকে মাত্র দেড়ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। কাজেই এর গতিবেগ যে কত তীব্র ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। রাশিয়া তথা পৃথিবীর এই প্রথম উপগ্রহটি পৃথিবী ছাড়িয়ে ৫৬০ মাইল উঁচুতে উঠে, ঘণ্টায় প্রায় আঠারো হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরেছে প্রায় দু'মাস ধ'রে। এই স্পুটনিক থেকে স্বয়ংক্রিয় বেতার মারফত অনেক সংকেতিক খবরও পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানীদের কাছে সেই খবরের মূল্য অনেক। ভাবলে অবাক লাগে যে, বিজ্ঞানের অনুশীলন এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই কতখানি এগিয়ে গেছে।

মহাশূন্যে অভিযানের উদ্যোগপর্ব

মহাশূন্যে অভিযানের এই প্রথম চেষ্টা সাফল্যলাভ করাতে বিজ্ঞানজগতে যেন একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হ'লো। মার্কিন-বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরা কিছু করবার আগেই রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক আকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'লো ঠিক এক মাস বাদেই। প্রথম স্পুটনিকের চেয়ে দ্বিতীয় স্পুটনিকের আকার হ'লো আরও বড় এবং অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে ধাতব আধারে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিলে তার অবস্থা কেমন হয় তা দেখবার জন্যে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় স্পুটনিকের মধ্যে জীবন্ত একটি কুকুরকেও বসিয়ে দিয়েছিলেন। কুকুরটির নাম লাইকা। ইতিহাসের পাতায় আজ তার নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে এই কারণে যে, লাইকা-ই মহাশূন্যচারী প্রথম প্রাণী। দ্বিতীয় স্পুটনিকটি আকাশপথে প্রায় ৯৪০ মাইল উঁচুতে উঠে দেড়ঘণ্টা থেকে সামান্য কয়েক

রাশিয়ার দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

মিনিট বেশী সময় নিয়ে একবার ক'রে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। প্রায় চারমাস ধ'রে এই কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশমার্গে বিচরণ ক'রে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবার সময় ঘন বায়ুস্তরের সংঘর্ষে এসে একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু, এতে ক'রে বিজ্ঞানীরা যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে।

১৯৫৮-সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র তার কৃত্রিম উপগ্রহ 'আল্ফা ১৯৫৮'-কে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দিক থেকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আর তেমন কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারেন না। কারণ, রাশিয়া থেকে ইতিপূর্বেই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে নিজেদের কক্ষপথে থেকে সাফল্যের সঙ্গেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। রাশিয়া থেকে আকারে ও ওজনে সবচেয়ে বড় তৃতীয় স্পুটনিকটি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৮-সালের ১৫ই মে। এবার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন এই উপগ্রহটিকে নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনতে এবং সেইজন্য তৃতীয় এই স্পুটনিকের আকার ও প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এরপর রাশিয়ার একটি রকেট একদিন তীব্রগতিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদে গিয়ে ঠেকে এবং সেই রকেটে রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা চাঁদের অপর পিঠের ছবি পাই।

রাশিয়ার তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের জন্য রাশিয়া ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র আজ পর্যন্ত যে-সব চেষ্টা ক'রে এসেছে তা শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেনি, চিন্তাশীল কোনো কোনো মহলে আতঙ্কেরও সৃষ্টি করেছে। কারণ, যে-দেশ বিজ্ঞানের সাহায্যে মহাশূন্যে নির্ভুলভাবে কৃত্রিম উপগ্রহদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাতে সক্ষম, সে-দেশ তো মহাশক্তিশালী মারণাস্ত্রেরও অধিকারী। শুধু তাই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার যে আকাশচুম্বী দম্ভ দেখা দিয়েছে, তা যদি মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধ'রে একদিন মারণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয় তা হ'লে মানব সভ্যতার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা এক মহাবিপর্যয়ই ডেকে আনবে। তাই, মহাশূন্যে অভিযানের এই সব চেষ্টাতে পৃথিবীসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেও শান্তিকামী চিন্তাশীল মানুষদের মনে জেগেছে আজ সন্দেহ ও আতঙ্ক।

চিন্তাশীল মানুষের মনে সন্দেহ ও আতঙ্ক

বিজ্ঞানজগতের সর্বাধুনিক বিস্ময় হ'লো মহাশূন্যে মানব-অভিযান। ইতিপূর্বে যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাকে এবার সাফল্যের সঙ্গেই কাজে লাগালেন রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। রাশিয়া থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত একটি মহাশক্তিশালী রকেটে চ'ড়ে যেদিন তরুণ সৈনিক গ্যাগারিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে অক্ষত দেহে আবার ফিরে এলেন সেদিনই আমরা বুঝতে পারলাম যে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার যে চেষ্টা বিজ্ঞানীরা এতদিন ধ'রে ক'রে আসছেন ভবিষ্যতে তা একদিন সাফল্যমণ্ডিত হবেই। মহাশূন্যে মানব-

উপসংহার

অভিযানের যে-ইতিহাস একদিন সবিস্তারে লেখা হবে তাতে আমেরিকার প্রতিরক্ষাবাহিনীর অন্যতম কর্মী সেফার্ডের নামও উজ্জ্বল অক্ষরে দেখা যাবে। কারণ, মহাশূন্যে বিচরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বিতীয় মানুষ হলেন তিনি। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার যে-সংকল্প পৃথিবীর মানুষ আজ গ্রহণ করেছে তা যেদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে, সেদিন আমরা সৌরপরিমণ্ডলের এমন বহু তথ্যই জানতে পারব যা আমাদের কাছে চিররহস্যাবৃত।

[**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** এই খণ্ডের কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য আমরা কয়েকজন লেখকের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী এস. এম. রঙ্গনাথন, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, বিমল রায়, অমিয়কুমার সেন, অতুল সুর, শচীন্দ্রলাল ঘোষ, কল্যাণ বসু, ডঃ রাধা করুনাদ, বিচিত্র দত্ত, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষ ঘোষ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসু, অনিল রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অমল হোম, বীরেন্দ্রনাথ গুহ, বিনয় ঘোষ, মন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীমন্ নারায়ণ। তাছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধের উপকরণের জন্য কেন্দ্রীয়-সরকার, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকের এবং স্থানীয় কয়েকটি সংবাদপত্রের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ রইলাম।]

রচনা-বিতান

[তৃতীয় খণ্ড]

ব্যাকরণ
ও
রচনাশৈলী

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভূমিকা প্রকরণ

॥ সাধুভাষা ও চলিতভাষা ॥

বাংলায় সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য প্রধানত ক্রিয়াপদে। যেমন—

(১) **সাধুভাষার বাক্য :** অতিথিরা জলে **ভিজিয়া আসিলেন**।

(২) **চলিতভাষার বাক্য :** অতিথিরা জলে **ভিজে এলেন**।

এমন একসময় ছিল যখন সাধুভাষা ব্যতীত সাহিত্য রচিত হইত না। কিন্তু, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে কথ্যভাষা (বা চলিতভাষা) একদিন সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, সেই কথ্যভাষাই আধুনিক-কালে সাহিত্য-রচনার প্রধান বাহন হইয়া উঠিয়াছে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) প্রমুখ সাহিত্যরথীদের উদ্যোগ ও পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধুভাষা বলিতে আমরা সাধারণত ভাষার একটা মার্জিত রূপকেই বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ, যে-ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার অধিক, এবং যে-ভাষার ক্রিয়াপদে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। **তৎসম শব্দ** আর কিছুই নয়, বাংলাভাষায় গৃহীত **অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ**। আর, ক্রিয়াপদে নির্দিষ্ট বিভক্তি বলিতে বুঝায়—ই, ইতেছি, ইয়াছি, ইতেছিলাম, ইলাম, ইতেছ, ইয়াছ, ইয়াছিলে, ইলে, ইতেছে, ইয়াছে, ইয়াছিল, ইল, ইতাম, ইতে, ইত, ইব, ইবে প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি। কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতেই এই জাতীয় ভাষার স্বরূপতত্ত্ব বুঝা যাইবে। যেমন—

(ক) "ঋষি রাজার দুরভিপ্রায় শ্রবণে স্বীয় আশীর্বাদবাক্যের বৈয়র্থ-পরিহারের নিমিত্ত রাজাকে কন্যাপ্রদান করিলেন। রাজা নবোঢ়া বধূকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া রাজধান্যভিমুখে চলিলেন।" —বিদ্যাসাগর

(খ) "ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গো-গণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুইখণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সুকুসুম পুষ্পবৃক্ষসকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে।" —বঙ্কিমচন্দ্র

(গ) "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত।" —রবীন্দ্রনাথ

এই তিনটি উদ্ধৃতি হইতে বাংলা সাধুভাষার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহাতে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর-মহাশয় সংস্কৃতানুগ বাংলাভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত-শব্দের (তৎসম-শব্দের) যেমন আধিক্য, তেমনি সন্ধি ও সমাসের। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তৎসম-শব্দের বাহুল্য ঘটিলেও, তিনি বাক্-ভঙ্গিমায় অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া আসিয়াছেন। আর, সেই সরলতা যেন রবীন্দ্রনাথেই অধিক পরিস্ফুট। আধুনিককালের সাধুভাষা যে আরও সহজ ও সরল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সরলতা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ হইতেই শুরু হইয়াছে।

এবারে, চলিতভাষার প্রসঙ্গে আসা যাক। চলিতভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার অনেক কম। উহাতে অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম (যেমন—ছেদ্দা<শ্রদ্ধা), তদ্ভব-শব্দ (যেমন, কাজ<কার্য), দেশী (যেমন—কয়লা, গয়লা, খড়, ঢেঁকি) ও বিদেশী (যেমন—আতর, আবাদ, বাহাদুর, মার্কা, কলেজ, চেয়ার, টেবিল) শব্দেরই আধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং সন্ধিযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহারও যতদূর সম্ভব কম হয়। আর, যে সমস্ত ক্রিয়া-বিভক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা একান্তই কথ্যভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি। কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতে এই ভাষার স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন—

(ক) "এখনো প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকি আছে। তারপরে শান্তিনিকেতন। আমার কেবলি মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি। যে-পর্যন্ত না পৌঁছই, সে-পর্যন্ত বেদনা।" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) "তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।" —প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)

(গ) "মাইলখানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে, আমি। সে আমাকে দেখে প্রথমটা খুব বকলে, তারপর আমি কি ক'রে এসেছি শুনে হেসে ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। এতদূর এসে আর তো ফিরতে পারি নে।" —শরৎচন্দ্র

চলিতভাষা হইতে সাধুভাষা

সামান্য রদ-বদলের ফলেই আবার, এই চলিতভাষাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। যেমন—

(ক) এখনো প্রায় তিন সপ্তাহের (হপ্তার) পথ বাকি আছে। তাহার পরে (তারপরে) শান্তিনিকেতন। আমার কেবলি মনে হইতেছে (হচ্ছে) যে, সূর্যাস্তের

দিক হইতে (থেকে) সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করিয়াছি (করেছি)। যে-পর্যন্ত না পৌঁছিতে পারি (পৌঁছাই), সেই পর্যন্তই (সে-পর্যন্ত) বেদনা।

(খ) তোমরা চাও পৃথিবীকে (দুনিয়াকে) জয় করিবার (করবার) বল, আমরা চাই পৃথিবীকে (দুনিয়াকে) ফাঁকি দিবার (দেবার) ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

(গ) মাইলখানেক গিয়া (গিয়ে) কি জানি কেন হঠাৎ নয়ন পিছনে চাহিয়া (চেয়ে) দেখে, আমি। সে আমাকে দেখিয়া (দেখে) প্রথমটা খুব বকিল (বকলে), তারপর আমি কি করিয়া (ক'রে) আসিয়াছি (এসেছি) তাহা শুনিয়া (শুনে) হাসিয়া (হেসে) ফেলিল (ফেললে)। বলিল (বললে)—"চলো ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।" এতদূর আসিয়া (এসে) আর তো ফিরিতে (ফিরতে) পারি না (পারি নে)।

সাধুভাষা হইতে চলিতভাষা

আবার কিছু-না-কিছু পরিবর্তনের ফলে সাধুভাষার রচনাকেও অনায়াসে চলিত-ভাষায় রূপান্তরিত করা চলে। যেমন, বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের উদ্ধৃত-রচনা হইতে (ক) ঋষি রাজার মন্দ অভিপ্রায় (দুরভিপ্রায়) শুনে (শ্রবণে) নিজের (স্বীয়) আশীর্বাদ-বাক্যের বিরোধিতা (বৈয়র্থ) দূর করবার জন্য (পরিহার নিমিত্ত) রাজাকে কন্যা দান (কন্যাপ্রদান) করলেন (করিলেন)। রাজা নবপরিণীতা (নবোঢ়া) বধূকে নিজের সঙ্গে নিয়ে (সমভিব্যাহারিণী করিয়া) রাজধানীর দিকে (রাজধান্যভিমুখে) চললেন (চলিলেন)। সেইরকম, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে—(খ) ফটক দিয়ে (দিয়া) ঘাসবিহীন (তৃণশূন্য) সুন্দরভাবে তৈরী (সুনির্মিত) এক লাল রঙের (রক্তবর্ণ) চওড়া (প্রশস্ত) পথে যেতে (যাইতে) হয়। পথের দু'পাশে (দুই পার্শ্বে) দু'খণ্ড জমি (দুই খণ্ড ভূমি), নরম নরম (কোমল) নতুন ঘাসে ছাওয়া (কোমল তৃণবিশিষ্ট), গবাদি পশুর সানন্দে ঘুরে বেড়াবার জায়গা (গো-গণের মনোরঞ্জন)। তার মাঝে মাঝে (তাহাতে মধ্যে মধ্যে) গোল ক'রে লাগানো (মণ্ডলাকারে রোপিত) ফুলের গাছ (পুষ্পবৃক্ষসকল), রঙবেরঙের (বিচিত্র) ফুলে আর পাতায় (পুষ্পপল্লবে) কেমন শোভা পাচ্ছে (পাইতেছে)। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে—(গ) মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেউ (কেহ) যদি এমনি ক'রে (এমন করিয়া) বেঁধে (বাঁধিয়া) রাখতে (রাখিতে) পারত (পারিত) যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ ক'রে (করিয়া) থাকত (থাকিত), তবে সেই নীরব মহাশব্দের সঙ্গে (সহিত) এই পুস্তকাগারের তুলনা হ'ত (হইত)।

বাংলা সাধুভাষা বা মার্জিতভাষার যে-রূপ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের কালে প্রচলিত ছিল, তাহা এ-যুগের সাহিত্যে আর চলে না। এমন কি বঙ্কিমী-যুগের সাধুভাষাতেও এখন আর সাহিত্য রচিত হয় না। আধুনিককালের বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে সাধুভাষার প্রচলন দেখি তাহার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা। তাহাতে অপ্রচলিত তৎসম-শব্দের ব্যবহার কম, সন্ধিযুক্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দেরও আধিক্য নাই। উপরন্তু, আধুনিক কালের সাহিত্যিকগণ চলিতভাষাতেই সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী। তাঁহারা তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দাবলীর সহিত নানারকমের উচ্চারণ-বিকৃতি হইতে উদ্ভূত শব্দের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন যাহার ফলে আধুনিক চলিত-ভাষায় চমৎকার একটা সাবলীলতা আসিয়াছে। মোটকথা, এখনকার সাধুভাষা ও চলিতভাষায় যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা প্রধানত 'সাধু' ও 'চলিত' ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগে।

সাধুভাষা ও চলিতভাষার ক্রিয়া-পদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
করিল	কর্‌ল'	বলিল	বল্‌ল'	চলিল	চল্‌ল'
কাঁদিল	কাঁদ্‌ল'	চাহিল	চাইল'	আসিল	এলো
করিলে	কর্‌লে	বলিলেন	বল্‌লেন	হাসিলেন	হাসলেন
চাহিলাম	চাইলাম, চাইলেম, চাইলুম	খাইলাম	খেলাম, খেলেম, খেলুম	কিনিলাম	কিনলাম, কিনলেম, কিনলুম
কাঁদিতেছে	কাঁদছে	খাইতেছ	খাচ্ছ	আসিতেছি	আসছি
ধরিয়াছে	ধরেছে	গাহিয়াছ	গেয়েছ	লিখিয়াছি	লিখেছি
ভাসিতেছিল	ভাসছিল	বলিতেছিলে	বলছিলে	খাইতেছিলাম	খাচ্ছিলাম
রাঁধিত	রাঁধত	আসিতে	আসতে	করিতাম	করতাম
চাহিবে	চাইবে	হারাইবে	হারাবে	কিনিব	কিনব
চাহিয়া বসিল	চেয়ে বসল'	ভাসিয়া	ভেসে	বেড়াইয়া	বেড়িয়ে
		চলিলে	চললে	ফিরিব	ফিরব

এইরকম পরিবর্তনই সাধুভাষা ও চলিতভাষার মূল পার্থক্য। ক্রিয়া-বিভক্তির এই পরিবর্তন কিন্তু যথেচ্ছভাবে হয় না, তাহারও একটা নিয়ম আছে। শব্দের উচ্চারণ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিব। একটি কথা

এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধুই হউক, আর চলিতই হউক—যে ভাষায় গদ্য-সাহিত্য রচিত হইবে তাহাতে যেন উভয় ভাষার সংমিশ্রণ না ঘটে। রচনার দিক হইতে উহা গুরুতর অপরাধ। যেমন—(ক) অকস্মাৎ বাজের ন্যায় শকুন্তলার মস্তকের উপরে ভেঙ্গে পড়িল। কিংবা—(খ) বাঙালীর ঘরে ধান্য ছিল, ঘরের গাই দুগ্ধ দিত, জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য ছিল। এক্ষেত্রে লিখিতে হইবে—(ক) অকস্মাৎ বজ্রের ন্যায় শকুন্তলার মস্তকের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিংবা—হঠাৎ বাজের মত শকুন্তলার মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়ল। (খ) বাঙালীর ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, পুকুরে প্রচুর মাছ ছিল। কিংবা—বাঙালীর গৃহে ধান্য ছিল, গৃহের গাভী দুগ্ধ দিত, জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য ছিল।

অনুশীলনী

(১) সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য উদাহরণসহ বঝাইয়া দাও।

(২) কয়েকটি ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ লিখ।

(৩) চলিতভাষায় রূপান্তরিত কর—"কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্বত-পথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্বতীয় বরাহ-শার্দুলও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্বত অতিক্রমে সমর্থ নহে। তেজসিংহের হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা। সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্য জন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত। প্রায় একপ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া, তেজসিংহ অবশেষে একটি পর্বততলে উপস্থিত হইল।" (রমেশচন্দ্র দত্ত)

(৪) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর—"ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সারা বন অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে দৃষ্টি আর চলে না। মহারাজ যে বৃক্ষ আশ্রয় করবেন মনে করেছিলেন, তার নিচে এসে কত কী ভাবতে লাগলেন। এমন সময় দূরে যেন আলো দেখা গেল। মহারাজ কুতূহলী হয়ে সেইদিকে দেখতে লাগলেন।" (প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়)

(৫) চলিতভাষায় রূপান্তরিত কর:—"শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা। এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি আবরিত হইবে। তুষার-নদীর উপর দিয়া উর্ধ্বে আরোহণ করিলাম। এই নদী নামিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর-স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। এই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।" (জগদীশচন্দ্র বসু) [বাংলা প্রথম-পত্র, উ. মা. পরীক্ষা, ১৯৬০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ

১। বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টিকেই বলা হয় **শব্দ**। আর এক একটি শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে আলাদা আলাদা যে ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়, উহারাই এক একটি **বর্ণ**। শব্দকে তাই বর্ণের সমষ্টিও বলা যায়। যেমন—'রাজা' একটি শব্দ। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—র্+আ+জ্+আ এইগুলি। তেমনি—'ব্যাকরণ' একটি শব্দ। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে যে-সকল বর্ণ পাওয়া যায়, তাহা হইল—ব্+য্+আ (=ব্যা)+ক্+অ (=ক)+র্+অ (=র)+ণ্+অ (=ণ)।

বর্ণ দুই শ্রেণীর—**স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ**।

যে-সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাহাদের বলা হয় **স্বরবর্ণ**; অর্থাৎ, **অ, আ, ই, ঈ,** উ, ঊ, **ঋ**, এ, ঐ, ও, **ঔ**। [বাংলায় ৠ ও ৯-এর ব্যবহার হয় না বলিয়া স্বরবর্ণের তালিকা হইতে তাহাদের বাদ দেওয়া চলে।] এই স্বরবর্ণ আবার দুই রকম—**হ্রস্বস্বর** ও **দীর্ঘস্বর**।

অ, ই, উ, ঋ,—এইগুলি **হ্রস্বস্বর,** কারণ ইহাদের উচ্চারণে সময় লাগে কম। আর যাহাদের উচ্চারণে সময় বেশি লাগে সেই **আ, ঈ,** ঊ, এ, ঐ, ও, **ঔ—দীর্ঘস্বর**।

ব্যঞ্জনবর্ণ কিন্তু স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না। যেমন—'ক' উচ্চারণ করিতে 'ক্'-এর সঙ্গে 'অ'-এর স্বরধ্বনিটির প্রয়োজন হয়। তেমনি—'খ'= খ্+অ ; 'গ'=গ্+অ ; 'ঘ'=ঘ্+অ ইত্যাদি। **শব্দের শেষে থাকিলে অবশ্য ইহাদের হসন্ত উচ্চারণ হয়**। যেমন—চাক্ ; রাখ্ ; ভাগ্ ইত্যাদি। বাংলায় **ব্যঞ্জনবর্ণ** ৩৫টি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ব ; শ, ষ, স, হ, ং, ঃ।

উচ্চারণ অনুসারে বর্ণের শ্রেণীবিভাগ :

স্পর্শবর্ণ · **ক হইতে ম** পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলা হয়। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার কোনো-না-কোনো অংশের সহিত কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত কিংবা ওষ্ঠের স্পর্শ হয়। উচ্চারণের স্থান অনুসারে স্পর্শবর্ণ পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। যেমন—

(১) **ক-বর্গ** — ক, খ, গ, ঘ, ঙ ;
(২) **চ-বর্গ** — চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ;
(৩) **ট-বর্গ** — ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ ;
(৪) **ত-বর্গ** — ত, থ, দ, ধ, ন ;
(৫) **প-বর্গ** — প, ফ, ব, ভ, ম।

উষ্মবর্ণ : **শ, ষ, স, হ**—এই চারিটি বর্ণকে বলা হয় উষ্মবর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে।

অন্তঃস্থবর্ণ : **য (য়), র, ল, ব**—এই চারিটি বর্ণকে বলা হয় অন্তঃস্থবর্ণ। কারণ, উচ্চারণে এই বর্ণ কয়টি স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তর্বর্তী বা স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী।

অনুনাসিক-বর্ণ : **ঙ, ঞ, ণ, ন, ম**—এই পাঁচটি বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা সানুনাসিক বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে নাসিকার কিঞ্চিৎ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (ম্ বা ন্-এর বিকারে ং-ও ব্যবহৃত হয় অনেক ক্ষেত্রে।)

অযোগবাহ-বর্ণ : **ং, ঃ**—এই দুইটি বর্ণকে বলা হয় অযোগবাহ-বর্ণ। কারণ, ইহারা না স্বর, না ব্যঞ্জন। ইহারা যখন যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থানই ইহাদের উচ্চারণ-স্থান। [ং (অনুস্বার) আসলে ম্ বা ন্-এর বিকার, যেমন র্ বা স্-এর বিকার ঃ (বিসর্গ)।]

অঘোষবর্ণ : **বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স**। ইহাদের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যহীন বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না। অপর নাম—**শ্বাসবর্ণ**।

ঘোষবর্ণ : **বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ, হ এবং স্বরবর্ণগুলি**। ইহাদের উচ্চারণ গাম্ভীর্যপূর্ণ বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের স্বরতন্ত্র বিশেষভাবে স্পন্দিত হয়। ঘোষবর্ণের অপর নাম **নাদবর্ণ**।

অল্পপ্রাণ-বর্ণ (বা ধ্বনি) : **বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তঃস্থবর্ণ**। ইহাদের উচ্চারণে শ্বাসবায়ু কম লাগে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মহাপ্রাণ-বর্ণ (বা ধ্বনি) : **বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্মবর্ণ**। ইহাদের উচ্চারণে শ্বাসবায়ু বেশি লাগে, তাই এইরূপ নাম।

	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অনুনাসিক
ক-বর্গ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ-বর্গ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-বর্গ	ট	ঠ	ড (ড়)	ঢ (ঢ়)	ণ
ত-বর্গ	ত	থ	দ	ধ	ন
প-বর্গ	প	ফ	ব	ভ	ম
অন্তঃস্থবর্ণ	×	×	য, র, ল, ব	×	×
উষ্মবর্ণ	×	শ, ষ, স	×	হ	×

·**স্বরবর্ণগুলিকে ঘোষবর্ণও বলা যায়।**

উচ্চারণের স্থানভেদে বর্ণগুলিকে আরও কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

কণ্ঠ্যবর্ণ : অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ (অন্য মতে ক-বর্গের বর্ণকে জিহ্বামূলীয় বর্ণও বলা হয়।)

তালব্যবর্ণ : ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু, অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণ করিতে জিহ্বা তালু স্পর্শ করে।

মূর্ধন্যবর্ণ : ঋ, ট, ঠ, ড, (ড়), ঢ (ঢ়), ণ, র, ষ—কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান মূর্ধা, অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণ করিতে গেলে জিহ্বার অগ্রভাগ হঠাৎ উল্টাইয়া মূর্ধা স্পর্শ করে।

দন্ত্যবর্ণ : ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান দন্ত, অর্থাৎ এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল স্পর্শ করে।

ওষ্ঠ্যবর্ণ : উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। এই সকল বর্ণের উচ্চারণে অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া বদ্ধ মুখের নিশ্বাসবায়ু ত্যাগ করিতে হয়।

কণ্ঠ্যতালব্যবর্ণ : এ, ঐ। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু।

কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ : ও, ঔ। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ।

দন্তৌষ্ঠ্যবর্ণ : অন্তঃস্থ ব। কারণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ।

[ঁ **চন্দ্রবিন্দু আলাদা কোনো বর্ণ নয়।** উহা অনুনাসিক উচ্চারণের চিহ্নমাত্র। চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত প্রত্যেক বর্ণেরই অনুনাসিক উচ্চারণ হইয়া থাকে।]

২। *শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ*

ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার—**স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি**।

যে-ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টই উচ্চারিত হয়, এবং যে-ধ্বনির সাহায্যেই অন্য ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব তাহাই **স্বরধ্বনি**। যেমন—অ, আ, ই, এ প্রভৃতি। অন্যদিকে, এই স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত যে-সকল ধ্বনির উচ্চারণ অসম্ভব, তাহাই **ব্যঞ্জনধ্বনি**। যেমন—'ক'-ধ্বনি উচ্চারণ করিতে গেলেই 'ক্-এর সহিত 'অ'-স্বরধ্বনির প্রয়োজন হয়। তেমনি—কা=ক্+আ ; কি=ক্+ই ; কী=ক্+ঈ ; কু=ক্+উ ; কূ=ক্+ঊ ; কৃ=ক্+ঋ ; কে=ক্+এ , কৈ=ক্+ঐ ; কো=ক্+ও ; কৌ=ক্+ঔ।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ :

অ : ইহার আসল উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ 'অ' (ইংরেজী au)-রূপেই উচ্চারিত হয়। **যেমন—অনেক, অমর, অমল, অবাক প্রভৃতি।** কিন্তু, অ-কারের সংবৃত

উচ্চারণও আছে। উহা ও-ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন—অতি (উচ্চারণে—ওতি); ঘড়ি (উচ্চারণে—ঘোড়ি); বসু (উচ্চারণে—বোসু) প্রভৃতি। এই ও-ধ্বনি হওয়ার একটা নিয়মও আছে। সাধারণত দেখা যায়, পরের অক্ষরে ই-ধ্বনি, উ-ধ্বনি, বা র-ফলা, য-ফলা, ঋ-ফলা, কিংবা ক্ষ-ধ্বনি, জ্ঞ-ধ্বনি থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ হয় 'ও'-এর মত। যেমন—

পরের অক্ষরে ই-ধ্বনি—অতি (ওতি), ঘড়ি (ঘোড়ি), রবি (রোবি)।

" " উ-ধ্বনি—বসু (বোসু), বলুন (বোলুন), হনুমান (হোনুমান)।

" " র-ফলা—ভ্রমণ (ভ্রোমণ), ব্রজ (ব্রোজ)।

" " য-ফলা—পদ্য (পোদ্য), বধ্য (বোধ্য), সত্য (সোত্য)।

" " ঋ ফলা—কর্তৃকারক (কোর্তৃকারক)।

" " ক্ষ-ধ্বনি—বক্ষ (বোক্ষ), লক্ষ (লোক্ষ), যক্ষ (যোক্ষ)।

" " জ্ঞ-ধ্বনি—যজ্ঞ (যোজ্ঞ)।

অবশ্য, সবক্ষেত্রেই যে এ-নিয়ম খাটে তাহা নয়। যেমন—শ্রম, অক্ষ, ভক্ষণ, অজ্ঞ প্রভৃতি।

যেখানে 'অ' অন্ বা না অর্থে শব্দের গোড়ায় বসে সেখানে অ-ধ্বনি সাধারণত বিবৃত, অর্থাৎ 'অ'-এর মতই উচ্চারিত হয়। যেমন—অনবরত, অসহায়, অকূল, অধীর, অস্থির প্রভৃতি। বাংলায় সাধারণত শব্দের শেষ অ-কারের উচ্চারণ নাই। অর্থাৎ, ঐ অ-ধ্বনি হসন্ত-উচ্চারণের মত শোনায়। যেমন—জল (জল্), ফল (ফল্), হাত (হাত্), ঘট (ঘট্), কাঠ (কাঠ্) প্রভৃতি। তবে, ক্ষেত্রবিশেষে আবার ও-ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন—বড় (বড়ো), ছোট (ছোটো), ভাল (ভালো), মত (মতো), প্রভৃতি। শব্দের শেষে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে শেষ-অ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। যেমন—দন্ত, অঙ্গ, ভক্ত, সুপ্ত, ছন্দ, দুগ্ধ, বর্ম প্রভৃতি। ই-কারের পরে 'য়' থাকিলে এবং এ-কারের পরে প্রত্যয়ের 'য়' থাকিলে সেই 'য়'-র অ-ধ্বনির উচ্চারণ 'অ'-এর মতই শোনায়। যেমন—প্রিয়, দেয় (যাহা দিতে হইবে), বিধেয় প্রভৃতি। কিন্তু, অন্যত্র হসন্ত-ধ্বনি হয়। যেমন—বিজয়, বিনয়, নিদয়, নিচয় প্রভৃতি। 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ অ-ধ্বনি বিবৃত, অর্থাৎ স্পষ্টই 'অ'-ধ্বনি শোনা যায়। যেমন—কৃত, নত, রক্ষিত, ইপ্সিত, আনন্দিত প্রভৃতি। কিন্তু, বিশেষ্য হইলে 'ত' বা 'ইত'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ-'অ' হসন্তভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন—সঙ্গীত (সঙ্গীত্), বিহিত (বিহিত্), রক্ষিত (রক্ষিত্, পদবি অর্থে) প্রভৃতি। শব্দের শেষে যদি 'ঢ়' বা 'হ' থাকে, তাহা হইলে উহাদের উচ্চারণে 'অ'-ধ্বনি স্পষ্টই শোনা যায়। যেমন- গাঢ়, নিগূঢ়, দৃঢ়, স্নেহ, বিবাহ, সন্দেহ প্রভৃতি। 'তর', 'তম' প্রত্যয়ান্ত

শব্দের শেষ 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ 'অ'-ধ্বনিই সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। যেমন—প্রিয়তর, প্রিয়তম ; মহত্তর, মহত্তম প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ পদেও 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ সুস্পষ্ট। যেমন—রণতরী (কিন্তু, রণ = রণ্) ; জলযোগ (কিন্তু, জল = জল্) ; ফলভোগ (কিন্তু, ফল = ফল্)।

আ ঃ বাংলায় 'আ'-ধ্বনির উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী father শব্দের আ-ধ্বনির মত। ইহার নিজস্ব উচ্চারণ ধরা পড়ে আপন, গাড়ি, পাতা, বাবা, কাকা প্রভৃতি শব্দে। এই জাতীয় উচ্চারণে 'আ'-এর উচ্চারণ দীর্ঘ নয়। কতকটা দীর্ঘ উচ্চারণ শোনা যায় আসিল, আগত, আমরণ, গাহিল প্রভৃতি শব্দের আ-ধ্বনিতে। 'আ'-এর বিকৃত উচ্চারণ মেলে আইজ (আ'জ), কাইল (কা'ল) প্রভৃতি শব্দে। শোনায় অনেকটা 'আই'-এর মত।

ই, ঈ ঃ বাঙালীদের উচ্চারণে সাধারণত 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার-এর ধ্বনিগত কোনো পার্থক্য শোনা যায় না, এক কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে ছাড়া। আমরা সাধারণত উভয় ক্ষেত্রেই ই-ধ্বনির ব্যবহার করি। কিন্তু, প্রীত, গীত, নীত, অধীত প্রভৃতি ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের উচ্চারণে ঈ-ধ্বনি সুস্পষ্টভাবেই দীর্ঘ হয়।

উ, ঊ ঃ ই, ঈ-এর মত এক্ষেত্রেও আমরা সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ করি না। কিন্তু, তৎসম বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের 'ঊ'-ধ্বনি দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হয়। যেমন—দূর, পূত, পূজিত, ভূষিত। উ-কারের উচ্চারণ বিকৃত হইলে ও-কারের মত শোনায়। যেমন—উপরে (ওপরে), উঠ (ওঠ), উড়ে (ওড়ে) প্রভৃতি। চলিত-ভাষায় আজকাল ওপরে, ওঠ, ওড়ে এই জাতীয় বানানই ব্যবহৃত হইতেছে।

ঋ ঃ বাংলায় ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ হয় 'রি'-এর মত। যেমন—ঋষি (রিষি), তৃণ (ত্রিণ), পৃষ্ঠ (পিষ্ঠ), কৃষি (ক্রিষি) প্রভৃতি।

এ ঃ এ-কারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ইংরেজী lake-শব্দের 'a'-র মত, অর্থাৎ খাঁটি 'এ'-ধ্বনি। কিন্তু, বিকৃত হইলে এ-ধ্বনি শোনায় 'অ্যা'-ধ্বনির মত। যেমন—খেলা (খ্যালা), কেমন (ক্যামন), এক (অ্যাক), দেখ (দ্যাখ) প্রভৃতি। অবিকৃত 'এ'-ধ্বনি আছে একদা, একটি, বেলা (নাম বুঝাইলে), মেঘ, দেনা, দেখিল প্রভৃতি শব্দের এ-কারে। [পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে কিন্তু 'একদা-ই' হয় 'অ্যাকদা', 'মেঘ' হয় 'ম্যাঘ', 'দেশ' হয় 'দ্যাশ' !]

ঐ ঃ ইহা একটি যৌগিক-স্বর (diphthong)। অর্থাৎ, বিবৃত 'অ' (ও) এবং 'ই' পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারিত হইলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি করে 'ঐ' হইল সেই যৌগিক স্বরধ্বনি। যেমন—কৈ (কোই = ক + ওই) ; দৈ (দোই = দ + ওই) ; মৈনাক (মোইনাক), ঐক্য (ওইক্য) প্রভৃতি।

ও ঃ বাংলায় ও-কারের উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী boat শব্দের oa-এর মত। যেমন—ওল, ওষুধ, গোল, রোজ, শোক, কোলাহল শব্দের 'ও'-ধ্বনি। [পূর্ববঙ্গের স্থানবিশেষে ও-কারের বিকৃত উচ্চারণও শোনা যায়। উহা 'উ'-ধ্বনির মত। যেমন—'ঝোল' হয় 'ঝুল', 'কোটি' হয় 'কুটি', লোক' হয় 'লুক', 'চোর' হয় 'চুর'!]

ঔ ঃ ঐ-কারের মত ইহাও একটি যৌগিক-স্বর। বিবৃত 'অ' (ও) এবং 'উ' পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারিত হইলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি করে 'ঔ' হইল সেই যৌগিক স্বরধ্বনি। যেমন—ঔষধ (ওউষধ), বৌদি (বোউদি), গৌতম (গোউতম), মৌচাক (মোউচাক) প্রভৃতি।

যৌগিক-স্বরধ্বনি (সন্ধ্যক্ষর) ঃ ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যৌগিক-স্বরধ্বনির নাম দিয়াছেন **সন্ধ্যক্ষর**। ঐ এবং ঔ ছাড়াও, বাংলাভাষায় আরও কতকগুলি যৌগিক-স্বরধ্বনি আছে। যেমন—ইয়ে = ই + এ (লাফিয়ে); ইয়া = ই + আ (করিয়া); এয়া = এ + আ (খেয়া); অও = অ + ও (নও) প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ঃ

ক, খ, গ, ঘ, ঙ ঃ 'ক'-এর উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে 'গ'-এর মত শোনায়, অর্থাৎ অল্পপ্রাণ-ধ্বনি হয় মহাপ্রাণ-ধ্বনি। যেমন—শাক্ = শাগ্ ; বক্ = বগ্ ; কাক্‌মারী = কাগ্‌মারী। ক্ষ (ক্ + ষ্)-এর উচ্চারণ বাংলায় 'ক + খ'-এর মত। যেমন—বৃক্ষ = ব্রিক্‌খ (আমরা বৃক্‌ষ বলি না), রক্ষা = রক্‌খা (আমরা রক্‌যা বলি না)। অনেক ক্ষেত্রে আবার শুধু 'খ'-এর মতই উচ্চারিত হয়। যেমন—ক্ষেত্র = খেত্র, ক্ষয় = খয়, ক্ষোভ = খোভ, তীক্ষ্ণ = তিখ্‌ণ। 'খ'-এর উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষায় 'ক'-এর মত শোনায়। অর্থাৎ, মহাপ্রাণ-ধ্বনি হয় অল্পপ্রাণ-ধ্বনি। যেমন—চোখ = চোক, শাঁখ = শাঁক, চরখা = চরকা প্রভৃতি। 'ঘ'-এর উচ্চারণও তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে 'গ'-এর মত হয়। যেমন—বাঘমারী = বাগমারী, বিঘা = বিগা, মেঘনা = মেগনা। 'ঙ'-র উচ্চারণ 'উঅ'-এর মত। অথচ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উহা অনুস্বারের (ং) মত উচ্চারিত হয়। যেমন—রঙ = রং, বাঙলা = বাংলা, শঙ্কর = শংকর প্রভৃতি।

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ঃ 'চ' একটি অঘোষ-ধ্বনি। জিহ্বা ও তালুর ঘর্ষণে ইহার উচ্চারণ হয় বলিয়া ডক্টর সুনীতিকুমার এই ধ্বনির নাম দিয়াছেন **ঘৃষ্টধ্বনি**। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'চ' অনেক ক্ষেত্রে 'ছ'-এর মত শোনায়। যেমন—মাচা = মাছা, বাচা মাছ—বাছা মাছ। আবার, পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষায় 'ছ' অনেক ক্ষেত্রে 'চ'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—বলছি = বলচি, করেছি = করেচি, শুনছ = শুনচ ; পৌছান = পৌচান। 'জ'-এর উচ্চারণ দুই রকমের। একটি সাধারণ তালব্য উচ্চারণ (ইংরেজী j-এর মত) অন্যটি দন্ত্য-তালব্য (ইংরেজী z-এর মত)। 'ঝ'-এর

উচ্চারণ কথ্যভাষায় অনেক ক্ষেত্রে 'জ'-এর মত হয়। যেমন—ঝাঁঝ = ঝাঁজ, সাঁঝ = সাঁজ প্রভৃতি। 'ঞ'-র উচ্চারণ 'ইঅ'-র মত। সাধারণত চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-র সাহায্যেই আমরা 'ঞ'-র উচ্চারণের কাজ সারি। যেমন—মিঞা = মিয়াঁ, গোসাঞি = গোসাঁই প্রভৃতি।

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ঃ ট-বর্গের পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ ঈষৎ উল্টাইয়া যায় বলিয়া ইহাদের **প্রতিবেষ্টিত-ধ্বনি** বলা হয়। 'ঠ'-এর উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ 'ট'-এর মত। যেমন—হঠাৎ = হটাৎ, কোঠাবাড়ি = কোটাবাড়ি। সেইরকম, পূর্ববঙ্গায় উচ্চারণে 'ঢ' অনেক সময় 'ড'-এর মত শোনায়। যেমন—ঢাকের বাদ্যি = ডাকের বাদ্যি। বাংলায় 'ণ'-কারের উচ্চারণ 'ন'-এর মতই। অথচ, বিশুদ্ধ 'ণ'-ধ্বনি হইল অনেকটা 'ড়ঁ'-র মত। ('ড়' ও 'ঢ়' আসলে 'ড' ও 'ঢ'-এর অন্য চেহারা।) ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা মূর্ধাকে তাড়িত করে বলিয়া ইহাদের বলা হয় **তাড়নজাত-ধ্বনি**। পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে 'র'-এর বদলে 'ড়'-ধ্বনি শোনা যায়। যেমন—তড়কাড়ি (তরকারি), দড়্ (দর)। আবার পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'ড়' একরকম নাই বলিলেই চলে। যেমন—ঘোড়ার গাড়ি = ঘোরার গারি, ঘরভাড়া = ঘরভারা, বাড়ি = বারি, শাড়ি = শারি। 'ঢ়' আসলে 'ড়+হ'। সাধারণত ইহা স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। কিন্তু, ক্ষেত্রবিশেষে 'আষাঢ়' হয় 'আশার', 'মূঢ়মতি' হয় 'মূরমতি'!

ত, থ, দ, ধ, ন ঃ 'ত' ও 'থ'-এর বিকৃত উচ্চারণ যেমন আছে, তেমনি আছে 'ধ'-এর। উচ্চারণ-বিকৃতিতে পূর্ববঙ্গে 'কতকগুলি' হয় 'কথকগুলা' (কথক্‌গুলান্), আর পশ্চিমবঙ্গে 'কথাবার্তা' হয় 'কতাবাত্রা', 'মাথাধরা' হয় 'মাতাধরা'। সেইরকম 'ধ'-এর উচ্চারণও অনেক ক্ষেত্রে 'দ'-এর মত শোনায়। যেমন—সাধ = সাদ, অবাধ = অবাদ।

প, ফ, ব, ভ, ম ঃ বর্গীয় 'ব' অনেক ক্ষেত্রে যেমন 'ভ'-এর মত শোনায়, তেমনি 'ভ' শোনায় 'ব'-এর মত। যেমন—ব্যবহার = ব্যাভার, নিভাও = নিবাও। পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে 'ম'-এর উচ্চারণ আবার 'ব'-এর মত হয়। যেমন—নামা = নাবা, আম = আঁব, তামা = তাঁবা। পূর্ববঙ্গে যেমন ক্রিয়াপদের 'ব' হয় 'ম'+উ (মু)। অর্থাৎ, খাব = খামু, যাব = যামু, করব = করমু!

য, র, ল, ব ঃ 'য'-র প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ 'ইঅ' (y)-এর মত। সম্ভবত, ইহার সেই প্রাচীন উচ্চারণ নির্দেশ করিবার জন্যই বাংলায় 'য়'-বর্ণের আমদানি হইয়াছে। বাংলা উচ্চারণে 'য' ও 'জ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। তবে য-ফলা যুক্ত অক্ষরে 'ইঅ'-ধ্বনি কিছুটা পাওয়া যায়। যেমন—বাচ্য =

বাচ্‌ইঅ, বধ্য = বধ্‌ইঅ। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে আবার য-ফলা যে-বর্ণে যুক্ত হয়, উচ্চারণে তাহার দ্বিত্ব-রূপ মেলে। যেমন—দিব্য = দিব্‌বো, পথ্য = পথ্‌থো, তুল্য = তুল্‌লো প্রভৃতি। 'র'-ধ্বনিকে **কম্পনজাত-ধ্বনি** বলা হয়। কারণ, জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া দন্তমূলে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করিলে 'র'-ধ্বনির উৎপত্তি হয়। আর, 'ল'-ধ্বনিকে বলা হয় **পার্শিক-ধ্বনি**। কারণ, ইহার উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের দুই দিক দিয়া শ্বাসবায়ু নির্গত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে, বিকৃত উচ্চারণের ফলে 'ল' হয় 'ন'। যেমন—লাউ = নাউ, লেবু = নেবু, লঙ্কা = নঙ্কা, লুচি=নুচি, লেপ = নেপ। বাংলায় বর্গীয়-'ব' আর অন্তঃস্থ-'ব'-এর মধ্যে উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য নাই। অন্তঃস্থ-'ব'-এর প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজী w-এর মত। আহ্বান, জিহ্বা, বিহ্বল প্রভৃতি শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে অন্তঃস্থ-'ব'-এর ধ্বনি কিছুটা কানে আসে। কিন্তু, বিকৃত উচ্চারণের ফলে 'আহ্বান' হয় 'আব্‌ভান', 'জিহ্বা' হয় 'জিব্‌ভা', 'বিহ্বল' হয় 'বিব্‌ভল'। অন্তঃস্থ-'ব' সাধারণত 'ব-ফলা'-রূপেই অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হয়; স্পষ্টরূপে কোথাও ইহা উচ্চারিত হয় না।

শ, ষ, স, হ ঃ উচ্চারণে শিস্‌-দেওয়ার মত ধ্বনি উঠে বলিয়া শ, ষ, স-ধ্বনিকে বলা হয় **শিস্‌ধ্বনি**। বাংলায় তালব্য, মূর্ধন্য ও দন্ত্য এই তিন প্রকারের উষ্মবর্ণের মধ্যে উচ্চারণগত কোনো স্বাতন্ত্র্য নাই। আমাদের উচ্চারণে সব এক, অর্থাৎ 'শ' (ইংরেজী sh)। তালব্য 'শ'-এর বিকৃত উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় র-ফলা ও ঋ-ফলা যুক্ত হয় 'শ'-এ। যেমন—শ্রী, শৃঙ্খল, শ্রবণ প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে উচ্চারিত রূপ যেন 'স্রী', 'সৃঙ্খল', 'স্রবণ'-এর মত। তবে শত, শান্ত, পোশাক, শরীর প্রভৃতি শব্দে তালব্য উচ্চারণ ঠিকই থাকে। 'ষ'-এর কিছুটা বিশুদ্ধ উচ্চারণ এখনও পাওয়া যায় বর্ষা, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দে। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা তালব্য 'শ'-এর মত উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'স'-এর উচ্চারণ-বিকৃতি হামেশাই শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে 'সপ্তাহ' যেমন হয় 'হপ্তা', তেমনি পূর্ববঙ্গে 'সকল' হয় 'হকল'! 'হ'-এর সহিত য-ফলা যুক্ত হইলে উহা 'জ্‌ঝ'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—সহ্য = সজ্‌ঝ, দাহ্য = দাজ্‌ঝ প্রভৃতি।

যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঃ

দুই বা তাহার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনিকে অনেক ক্ষেত্রে একত্র করিয়া লিখিবার একটা রীতি আছে। যুক্তভাবে লেখা হয় বলিয়া এইরূপ অক্ষরকে বলা হয় **যুক্তাক্ষর**। যেমন—(দুই বর্ণের যুক্তাক্ষর) ঃ ক্ক, ক্ট, ক্ত, ক্ন, ক্ম, ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ষ, ক্স ; খ্য ; গ্‌গ, গ্দ, গ্ধ, গ্ন ; ঘ্ন, ঘ্র ; ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ ; চ্চ, চ্ছ, চ্ঞ, চ্য, চ্ব ; জ্জ, জ্ঝ, জ্ঞ, জ্য, জ্র, জ্ব ; ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ ; ট্ট, ট্ম, ট্য, ট্র ; ঠ্য ; ড্য, ড্র ; ঢ্য ; ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ণ্ন, ণ্য, ণ্ব ; ত্ত, ত্থ, ত্ব,

ত্ম, ত্য, ত্র ; থ্য, থ্ব ; দ্গ, দ্দ, দ্ধ, দ্ম, দ্র, দ্ব ; ধ্ন, ধ্য, ধ্ব ; ন্ত, ন্ম, ন্দ, ন্ধ, ন্ন, ন্ব ; প্ত, প্স, প্র ; ফ্র ; ব্জ, ব্দ, ব্ধ, ব্ব, ব্ভ, ব্য, ব্র, ব্ল ; ভ্য, ভ্র ; ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম, ম্য, ম্র, ম্ল ; য্য ; র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, র্চ, র্ছ, র্জ, র্ঝ, র্ত, র্থ, র্দ, র্ধ, র্প, র্ব, র্ভ, র্ম, র্শ, র্ষ, র্স, র্হ, ; ল্ক, ল্গ, ল্ট, ল্প, ল্ব, ল্ম, ল্য ; শ্চ, শ্ন, শ্ম, শ্য, শ্র, শ্ল, শ্ব ; ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্ণ, ষ্ম ; স্ক, স্খ, স্ট, স্ত, স্থ, স্ন, স্ম, স্ফ, স্য, স্র, স্ব ; হ্ন, হ্ণ, হ্ম, হ্য, হ্র, হ্ল ও হ্ব।

(দুই-এর অধিক ব্যঞ্জনবর্ণে গঠিত যুক্তাক্ষর) ঃ ক্ত্র, ক্ষ্ম, চ্ছ্র, চ্ছ্ব, জ্জ্ব, ঠ্য, ণ্ড্র, ত্ত্য, ত্র্য, ত্ত্ব, ত্ম্য, স্থ্য, স্ত্ব, ন্ত্য, ন্দ্য, ন্ত্র, ন্ধ্য, ন্দ্র, ষ্ঠ্য, ষ্ণ্য, দ্ধ্ব, র্ধ্ব প্রভৃতি।

ক্ষ ঃ ইহার মধ্যে দুইটি বর্ণ আছে—'ক্+ষ্'। এই 'ক্ষ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ মেলে হিন্দীতে। যেমন—ভিক্ষা = ভিক্‌ষা। বাংলায় কিন্তু ইহার উচ্চারণ 'ক্‌খ'-এর মত। অর্থাৎ, ভিক্ষা = ভিক্‌খা। **জ্ঞ ঃ** ইহা 'জ' ও 'ঞ' এই দুইটি বর্ণের যুক্তরূপ। আধুনিক বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'গ্‌গঁ'-এর মত। অর্থাৎ, বিজ্ঞ = বিগ্‌গঁ, যজ্ঞ = য্‌গগঁ। **হ্ম ঃ** ইহা হ্+ম্। বাংলায় ইহার উচ্চারণ ঠিক উল্টা। অর্থাৎ, ম্+হ। যেমন—ব্রহ্ম = ব্রম্‌হ, ব্রাহ্মণ = ব্রাম্‌হণ। **ক্ম ঃ** ক্+ম। বাংলায় উচ্চারণ করিতে 'ক্ম' হয় 'ক্‌ক'। যেমন—রুক্মিণী = রুক্‌কিনী। **ত্ম ঃ** ত্+ম। ইহার সঠিক উচ্চারণ 'ত্‌ম্', কিন্তু বাঙালীর উচ্চারণে 'ত্‌ত' যেমন—মহাত্মা = মহাত্‌তা। **ম্ম ঃ** ম্+ম। অনেকে ইহার বিকৃত উচ্চারণ করিয়া বলে 'ন্ম'। যেমন—সম্মান = সন্মান, সম্মুখ = সন্মুখ। **ঞ্চ ঃ** ঞ+চ। উচ্চারণে হয় 'ন্‌চ'। যেমন—অঞ্চল = অন্‌চল। **ঞ্জ ঃ** ঞ+জ। উচ্চারণে কিন্তু হয় 'ন্‌জ'। যেমন—মঞ্জু = মন্‌জু, রঞ্জন = রন্‌জন্। **ত্ব ঃ** ইহা 'ত্' ও 'ব্'-এর মিলিত রূপ। সঠিক উচ্চারণ 'ত্‌উঅ', কিন্তু বাংলায় উচ্চারিত হয় 'ত্ত' (ত্‌ত) রূপে। যেমন—স্বত্ব = সত্‌ত। **দ্ব ঃ** দ্+ব্। ইহার অবিকৃত ও বিকৃত দুই রূপই আছে। যেমন—উদ্বেল = উদ্‌বেল ; কিন্তু, বিদ্বান্ = বিদ্দান। **ল্ব ঃ** ল্+ব। ইহার সঠিক উচ্চারণ বাংলায় নাই। যেমন—'বিল্ব' বলিতে আমরা 'বিল্‌ল'-ই বলি, 'বিল্‌উঅ' বলি না। **ষ্ম ঃ** ষ্+ম। বাংলা উচ্চারণে 'শ্‌শ'। যেমন—গ্রীষ্ম = গ্রীশ্‌শ। **হ্ল ঃ** হ্+ল। উচ্চারণ হয় ঠিক বিপরীত। যেমন—আহ্লাদ = আল্‌হাদ, প্রহ্লাদ = প্রল্‌হাদ। **হ্ন হ্ণ ঃ** 'হ্ন' হইল হ্+ন ; আর, 'হ্ণ' হইল হ+ণ। উচ্চারণে কিন্তু পরবর্তী ধ্বনিই আগে আসে। যেমন, জাহ্নবী = জান্‌হবী ; পূর্বাহ্ণ = পূর্বাণ্‌হ। **হ্ব ঃ** হ্+ব্। বাংলায় ইহার সঠিক উচ্চারণ কিছুটা মেলে আহ্বান, জিহ্বা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে। কিন্তু, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'হ্ব'-এর উচ্চারণ হয় 'ব্‌ভ'-এর মত। যেমন—বিহ্বল = বিব্‌ভল, জিহ্বা = জিব্‌ভা। **ক্ষ্ম ঃ** ইহা তিনটি বর্ণের যুক্তরূপ। অর্থাৎ, ক্+ষ্+ম্।

বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ক্খ'-এর মত। যেমন—লক্ষ্মী = লক্খী। (হিন্দীতে কিন্তু সঠিক 'লক্ষ্মী'-ই উচ্চারিত হয়।)

যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট যে-সকল শব্দ বাংলায় আছে, তাহাদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে একটা জিনিস স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, ফলা-জাতীয় যুক্তাক্ষর বা যুক্তবর্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব হইয়া উচ্চারিত হয়। যেমন—য-ফলা বিশিষ্ট যুক্তাক্ষর : ক্য, গ্য, চ্য, ত্য, দ্য, ম্য প্রভৃতি। ক্য=ক্ক (বাক্য = বাক্ক); গ্য = গ্গ (ভাগ্য = ভাগ্গ); চ্য = চ্চ (বাচ্য = বাচ্চ); ত্য = ত্ত (সত্য = সত্ত); দ্য = দ্দ (পদ্য = পদ্দ); ম্য = ম্ম (সাম্য = সাম্ম)। সেইরকম, ম-ফলা বিশিষ্ট যুক্তাক্ষর : ক্ম, ত্ম প্রভৃতি। ক্ম = ক্ক (রুক্মিণী = রুক্কিণী); ত্ম = ত্ত = (আত্মা = আত্তা); ষ্ম = শ্শঁ (গ্রীষ্ম = গ্রীশ্শঁ)। বর্ণের বিন্যাস থাকে একরূপ, আর উচ্চারণ হয় ভিন্নরূপ,—তাহার উদাহরণ মিলিবে হ্ম, হ্ল, হ্ন ও হ্ণ-এর উচ্চারণে। যেমন—হ্ম = হ্ম (কিন্তু, উচ্চারণে ম্হ। যেমন—ব্রহ্মা = ব্রম্হা); হ্ল = হ্ল্ (কিন্তু, উচ্চারণে ল্হ। প্রহ্লাদ = প্রল্হাদ); হ্ন = হ্ন (কিন্তু, উচ্চারণে ন্হ। যেমন—বহ্নি = বন্হি); হ্ণ = হ্ণ (কিন্তু উচ্চারণে ন্হ। যেমন—অপরাহ্ণ = অপরান্হ)।

একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ঃ

'অ'-কারের ধ্বনি দুইটি—(১) বিশুদ্ধ 'অ'-ধ্বনি এবং (২) 'ও'-ধ্বনি। যেমন—অমল, অনেক, অজয়, অসীম, অনন্ত শব্দের 'অ'-ধ্বনি; এবং, অতি (ওতি), তবু (তোবু), রবি (রোবি), শরীর (শোরীর) প্রভৃতি শব্দের 'ও'-ধ্বনি। **এ ঃ** এই স্বরবর্ণেরও দুইটি ধ্বনি প্রচলিত—(১) বিশুদ্ধ 'এ'-ধ্বনি, ও (২) 'অ্যা'-ধ্বনি। যেমন—একদা, দেখিল, খেলিও, মেঘ, দেশ প্রভৃতি শব্দের বিশুদ্ধ 'এ'-ধ্বনি; এবং একলা (অ্যাকলা), দেখা (দ্যাখা), খেলোয়াড (খ্যালোয়াড), কেন (ক্যানো), যেমন (য্যামন) প্রভৃতি শব্দের 'অ্যা'-ধ্বনি। **'ঞ'**—ইহার ধ্বনিও দুইরকমের। যখন, 'ঞ' তখন 'ইঁঅঁ'-ধ্বনি। যেমন—ভুঁইঞা = ভুইঁআঁ। কিন্তু, যখন অন্য কোনো বর্ণের পূর্বে বসে তখন 'ন'-ধ্বনি। যেমন—ঞ্চ (চঞ্চল = চন্চল); ঞ্ছ (বাঞ্ছা = বান্ছা); ঞ্জ (সঞ্জয় = সন্জয়); ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝা = ঝন্ঝা) প্রভৃতি যুক্তাক্ষর। **'য'**—ইহার উচ্চারণ কোথাও 'জ'-এর মত, কোথাও 'য়' (ইঅ)-এর মত, আবার কোথাও পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন-ধ্বনির মত। যেমন—**জ ঃ** যত (জত), যদি (জদি), যাদুকর (জাদুকর); **য় ঃ** নিযোগ (নিয়োগ), প্রযোগ = (প্রয়োগ); পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের মত—কল্য = কল্ল (এখানে 'ল'-এর মত), সত্য = সোত্ত (এখানে 'ত'-এর মত), বাচ্য = বাচ্চ (এখানে 'চ'-এর মত) ইত্যাদি। **'শ', 'ষ', 'স'**—ইহাদের প্রচলিত উচ্চারণ 'শ' (sh)

-এর মত। কিন্তু, কখনও আবার 'স' (s)-এর প্রকৃত উচ্চারণের মত। যেমন—ষণ্ড, **সকল** প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে তালব্য 'শ'-ধ্বনি ; এবং শ্রম, বিস্তর প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে দন্ত্য 'স'-ধ্বনি।

বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি ঃ

বাংলায় ই, ঈ , উ, ঊ ; জ, য ; ণ ; শ, ষ, স এবং ক্ষেত্রবিশেষে অ, য় বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনিগত কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। যেমন—কবি ও **বীর** ; মধু ও বধূ ; **জাম, যাম** ; **নদী** ও ; **শেষ, শসা, সবিশেষ** ; **অলক**, নিয়ম প্রভৃতি শব্দে।

ধ্বনি-লোপ ঃ

বাংলায় শব্দের **শেষ 'অ'-ধ্বনি সাধারণত লোপ পায়**। যেমন—'জল' উচ্চারণ করিতে 'জল+অ' হয় না, হয় জল্। তেমনি, দাঁত্, কাজ্, সরস্, মহিম্, সরোবর্ প্রভৃতি। 'ব'-ফলা, 'ম'-ফলার উচ্চারণে সাধারণত **'ব', 'ম' ধ্বনি লোপ পায়**। যেমন—'অশ্ব' বলিতে 'অশ্‌ব' হয় না, হয় 'অশ্‌শ'। তেমনি—শ্বাস=শাস ; পক্ক=পক্‌ক ; স্বত্ব=সত্‌ত প্রভৃতি। 'আত্মা' বলিতে 'আত্‌মা' না বলিয়া আমরা সাধারণত 'আত্‌তাঁ'-ই বলি। তেমনি—শ্মশান=শশান, রশ্মি=রশ্‌শিঁ; ভস্ম=ভস্‌সঁ ; গ্রীষ্ম=গ্রীশ্‌শঁ ; ছদ্ম=ছদ্‌দঁ প্রভৃতি। র, হ প্রভৃতির উচ্চারণে কখনো কখনো **'র্', 'হ্'-ধ্বনি লোপ পায়**। যেমন—করছি=কচ্ছি ; যাহা=যা প্রভৃতি।

ধ্বনি-পরিবর্তন ঃ

বাংলায় শব্দ-উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি আছে। সেই নিয়মে উচ্চারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, অনেক বর্ণের ধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এবারে সে-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে—

(ক) **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ঃ** উচ্চারণের সুবিধার জন্য, অনেক সময় যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করিয়া উহাদের মধ্যে স্বরধ্বনি যোগ করিবার রীতিকেই বলা হয় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন—রত্ন>রতন (অর্থাৎ, 'রত্‌ন'=রত্‌+**অ**+ন= রতন)। সেইরকম—যত্ন>যতন, জন্ম>জনম, কর্ম>করম্, ভক্ত>ভকত, স্পর্শ> পরশ্ (প্রথম 'স' লুপ্ত)। প্রীতি>পিরীতি (অর্থাৎ, পির্+**ঈ**+তি)। সেইরকম—হর্ষ>হরিষ (হর্+**ই**+ষ), স্নান>সিনান্ (স্+**ই**+না+ন)। মুক্তা>মুকুতা (মুক্+**উ**+তা)। সেইরকম—লুব্ধ>লুবুধ (লুব্‌+**উ**+ধ), মুগ্ধ>মুগুধ (মুগ্‌+**উ**+ধ)। গ্রাম>গেরাম (গ+**এ**+র্+আ+ম)। সেইরকম—গ্রাস>গেরাস, গ্লাস>গেলাস।

বিস্তৃত উদাহরণ ঃ

(**অ-আগমে**) ধরম (ধর্ম), করম (কর্ম), মরম (মর্ম), গরজন (গর্জন), নিৰ্জন (নিরজন), দরশন (দর্শন), দরদ (দর্দ।), স্বরগ (স্বর্গ), মরত (মর্ত), বরষা (বর্ষা), ধৈরজ (ধৈর্য), পূরব (পূর্ব), গরব (গর্ব), জনম (জন্ম), স্বপন (স্বপ্ন), লগন (লগ্ন), চন্দর (চন্দ্র), মন্তর (মন্ত্র), যতন (যত্ন), রতন (রত্ন), উতপল (উৎপল), ভকতি (ভক্তি), মকতি (মুক্তি), শকতি (শক্তি); (**আ-আগমে**) পরাণ (প্রাণ), তরাস (ত্রাস), গরাস (গ্রাস); (**ই-আগমে**) বরিষণ (বর্ষণ), হরিষ (হর্ষ), তিরপিত (তৃপ্ত), সিনান (স্নান), মিত্তির (মিত্র), চিত্তির (চিত্র), ছিরি (শ্রী), ফিলিম (ফিল্ম); (**উ-আগমে**) মুকুতা (মুক্তা), লুবধ (লুব্ধ), মুগুধ (মুগ্ধ), ভুরু (ভ্রূ), বরুশ (ব্রুশ), ফ্লুট (ফ্লুট), বুলু (ব্লু); (**এ-আগমে**) বেকত (ব্যক্ত), ধেয়ান (ধ্যান), গেরাম (গ্রাম), গেরাস (গ্রাস), ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ), গেলাস (গ্লাস); (**ও-আগমে**) শোলোক (শ্লোক), মোরগ (মুর্গ) প্রভৃতি।

[স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে। যেমন—(১) 'সদাই **ধেয়ানে** চাহে মেঘপানে'—চণ্ডীদাস। (২) 'নয়ন না **তিরপিত** ভেল'—বিদ্যাপতি। (৩) 'পরিমলে **লুবধ** সুরাসুর ধাবই'—গোবিন্দদাস। (৪) 'কার্তিক মাসেতে হইল হিমের **জনম**'—মুকুন্দরাম। (৫) '**দরশন**-হেতু দিয়া আছে চক্ষু-জ্যোতি'—সৈয়দ আলাওল। (৬) 'ইন্দ্র করে **পুষ্পবরিষণ**—রামেশ্বর ভট্টাচার্য। (৭) '**শবদে শবদে** বিয়া দেয় যেই জন'—মাইকেল মধুসূদন। (৮) 'কি সাহসে আবার বা রোপিব **যতনে**'—মাইকেল মধুসূদন। (৯) ফেরে দ্বারে দোবারিক, ভীষণ-**মূরতি**'—মাইকেল মধুসূদন। (১০) 'তুষিলা রাক্ষসে **ভকত**-বৎসল তুমি'—মাইকেল মধুসূদন। (১১) 'শুনি ঋষিকুল **হরষ**বিষাদে মুগ্ধ'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১২) 'থাকেন আপন ভাবে আপনি **মগন**'—বিহারীলাল চক্রবর্তী। (১৩) 'প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ **রতনে**'—নবীনচন্দ্র সেন। (১৪) 'প্রতিজ্ঞা **পূরণ** তব অবশ্য হইবে'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (১৫) 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও **শকতি**'—রবীন্দ্রনাথ। (১৬) 'সাগর-জলে **সিনান** করি'—রবীন্দ্রনাথ। (১৭) '**মরমে** মরিয়া থাকি আপনার মনে'—চিত্তরঞ্জন দাশ। (১৮) 'পাবি **পরসাদ** প্রেয় দেবতার'—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯) 'মাগো আমার **শোলোক**-বলা কাজলাদিদি কই'—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। (২০) 'ভুলি সাগর—তার **মুকুতায়** গেঁথে রাখি গলার মালায়'—কুমুদরঞ্জন মল্লিক।]

সম্প্রকর্ষ বা মাত্রা-সঙ্কোচঃ এই রীতিতে একটি স্বরধ্বনি লোপ পায়, এবং তাহাতে মাত্রা সঙ্কুচিত হইয়া পাশাপাশি অবস্থিত দুই ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া যায়।

যেমন—ভগিনী>ভগ্নী ; প্রেতিনী>প্রেত্নী (পেত্‌নী) ; বলিলেন>বল্‌লেন প্রভৃতি।

স্বরসঙ্গতি : শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বরধ্বনির মধ্যে উচ্চারণগত একটা সঙ্গতি স্থাপনের রীতিকেই বলা হয় **স্বরসঙ্গতি**। এই রীতিতে চলিতভাষায়, কখনো বা সাধুভাষায়, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দের অন্তর্গত অন্য স্বরধ্বনির উচ্চারণ বদলাইয়া যায়। যেমন—'দেশী' শব্দ হইতে স্বরসঙ্গতির প্রভাবে উদ্ভূত **দিশি** (দেশী) শব্দ। এখানে, 'দেশী'-শব্দের পরবর্তী ঈ-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'এ'-ধ্বনির 'ই'-তে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সেইরকম - হিসাব>**হিসেব** ; নিকাশ>**নিকেশ** ; চিনে>**চেনে** ; শুনা>**শোনা** ; বুনা>**বোনা** ; রাতে>**রেতে** ; ইচ্ছা>**ইচ্ছে** ; বুড়া>**বুড়ো** ; খুড়া>**খুড়ো** ; ধূলা>**ধুলো** ; পড়ুয়া>**পড়ো** ; ভুলুয়া>**ভুলো** প্রভৃতি।

অপিনিহিতি : শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকিলে, সেই 'ই' বা 'উ' তাহাদের উচ্চারণের সময় আসিবার পূর্বেই, অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির আগে, যদি উচ্চারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই উচ্চারণরীতিকেই বলা হয় **অপিনিহিতি**। (এই উচ্চারণরীতি পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষার একটি বৈশিষ্ট্য।) যেমন—'আজি' শব্দ হইতে উদ্ভূত '**আইজ**' শব্দ। এখানে 'আজি' উচ্চারণ করিতে আগে 'আ', পরে 'জ' এবং সবশেষে 'ই' উচ্চারণ না করিয়া আগে 'আ' পরে 'ই' এবং সবশেষে 'জ' উচ্চারণ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ, আ+জ্‌+ই=আ+ই+জ্‌।) সেইরকম—**কাইল**<কালি (কা+ল্‌+ই=কা+ই+ল্‌) ; **রাইখ্যা**<রাখিয়া (রা+খ্‌+ই+য়া=রা+ই+খ্‌+য়া) ; **সইত্য**<সত্য (স+ত্‌+ই+য়=স+ই+ত্‌+য্‌) **কাইব্য**<কাব্য (কা+ব্‌+ই+য্‌=কা+ই+ব্‌+য্‌) ; **জাউল্যা**<জালুয়া জা+ল্‌+উ+য়া=জা+উ+ল্‌+য়া) প্রভৃতি।

অভিশ্রুতি : অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' বা 'উ' আগে উচ্চারিত হয়, ক্ষেত্রবিশেষে তাহাই আবার পূর্ববর্তী অক্ষরের 'অ' বা 'আ' কিংবা অন্য কোনো স্বরের পাশে বসিয়া একটা যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে। তাহার ফলে, 'অ' বা 'আ'-র পাশে 'ই' বসিয়া 'এ' বা 'ও' এবং 'অ' বা 'আ'-এর পাশে 'উ' বসিয়া 'ও'-ধ্বনিতে পরিণত হয়। শব্দোচ্চারণের এই বিশেষ রীতিকেই বলা হয়—**অভিশ্রুতি**। এই উচ্চারণরীতি পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার একটা বৈশিষ্ট্য। যেমন—**রেখে**<রাইখ্যা<রাখিয়া। সেইরকম—**ব'লে**<বইল্যা<বলিয়া ; **ক'রে**<কইরা <করিয়া ; **ব'লব**<বইল্‌ব<বলিব ; **চ'লব**<চইল্‌ব<চলিব ; **এসে**<আইস্যা< আসিয়া ; **নেচে**<নাইচ্যা<নাচিয়া প্রভৃতি।

স্বরাগম : (অর্থের পরিবর্তন না করিয়াও, উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে একটি স্বরধ্বনির আগম হয়। সেই উচ্চারণরীতিকেই বলা হয় **স্বরাগম**। যেমন—**অপর্যাপ্ত**<পর্যাপ্ত ; **আস্পর্ধা**<স্পর্ধা ; **ইস্কুল**<স্কুল ; **ইস্টেশন**<স্টেশন প্রভৃতি (এইভাবে, বিভিন্ন বর্ণাগমও হইয়া থাকে। যেমন—পুরুষ্ট<পুষ্ট ; নানান<নানা ; সীমানা<সীমা ; হাতল<হাত ; ধনুক<ধনু ; ভরাট<ভরা প্রভৃতি।)

সমীভবন : শব্দের মধ্যস্থ বর্ণকে পরবর্তী বর্ণে রূপান্তরিত করার নাম **সমীভবন**। ইহাকে একপ্রকারের মৌখিক ব্যঞ্জনসন্ধিও বলা যাইতে পারে। যেমন—**ধম্ম** (ধরম্ = ধম্ম) ; **কম্ম** (কর্ম = কম্‌ম) **গপ্প** (গল্প = গপ্‌প) ; **চন্নন** (চন্দন=চন্নন) ; **কান্না** (কাঁদ্‌না = কান্‌না) প্রভৃতি। সেইরকম—বট্‌ঠাকুর (বড়্‌ঠাকুর) ; ঘরকন্না (ঘরকর্‌না) ; বজ্জাত (বদ্‌জাত) ; পাঁস্‌সের (পাঁচ্‌সের) ; নাজ্জামাই (নাত্‌জামাই) প্রভৃতি। ['সমীভবন'কে 'সমীকরণ'ও বলা হয়।]

বিসমীভবন : যে উচ্চারণরীতিতে শব্দমধ্যস্থ একজাতীয় দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির রূপান্তর ঘটে তাহাকে বলা হয় **বিসমীভবন**। যেমন—**নাঙল**<লাঙল (এখানে দুইটির 'ল'-র মধ্যে একটি 'ন'-তে পরিবর্তিত হইয়াছে) ; **শরীল**<শরীর প্রভৃতি। ['বিসমীভবন'-কে 'বিসমীকরণ'-ও বলা হয়।]

বর্ণ-বিপর্যয় : কথাভাষায় অনেক সময়, উচ্চারণ-শৈথিল্যে, শব্দ-মধ্যস্থ ব্যঞ্জনবর্ণের যে স্থান-পরিবর্তন ঘটে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে **বর্ণ-বিপর্যয়**। যেমন—**রিস্‌কা**<রিক্সা ; **বাস্ক**<বাক্স ; **বাসাতা**<বাতাসা ; **বানারসী**<বারাণসী ; **ডান্‌লা**<ডাল্‌না ; **আন্‌লা**<আল্‌না ; **তরোয়াল**<তলোয়ার ; **পিচাশ**<পিশাচ ; **মুটুক**<মুকুট প্রভৃতি।

বর্ণচ্যুতি : যেখানে পর পর একই বর্ণ কিংবা একজাতীয় বর্ণের সমাবেশ ঘটে, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহাদের একটিকে বিচ্যুত বা বিলোপ করা হয়। এই উচ্চারণরীতিকেই বলা হয়—**বর্ণচ্যুতি**। যেমন—**বড়দা**<বড়দাদা ; **মেজদা**<মেজদাদা ; **বৌদি**<বৌদিদি ; **ছোট্‌কা**<ছোটকাকা ; **মু'খানি**<মুখখানি প্রভৃতি।

বর্ণদ্বিত্ব : কথ্যভাষায় অনেক সময়, উচ্চারণের সুবিধার জন্য, শব্দমধ্যস্থ কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ করা হয়। উচ্চারণের এই রীতি **বর্ণদ্বিত্ব** নামে পরিচিত। যেমন—**ছোট্ট**<ছোট ; **বড্ড**<বড (ড় = ড) ; **সব্বাই**<সবাই ; **সক্কালবেলা**<সকালবেলা ; **একত্তি**<একরতি ; **কিপ্পন**<কিপণ<কৃপণ ; **পাক্কা**<পাকা প্রভৃতি।

অপশ্রুতি ঃ ধাতুর স্বরপরিবর্তনকে কেহ কেহ **অপশ্রুতি** এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন—'দিশ্' ধাতু হইতে 'দেশ' (ই=এ) ; 'বুধ্' ধাতু হইতে 'বোধ' (উ=ও) ; ইহ>ঐহিক (ই=ঐ) ; ঋষি<আর্ষ (ঋ=আর্) ; 'যজ্' ধাতু হইতে 'ইষ্ট' (য=ই), 'বপ্' ধাতু হইতে 'উপ্ত' (ব্=উ) প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। বর্ণ কয় প্রকার এবং কী কী ?

২। ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ এবং মহাপ্রাণ-বর্ণ ও অল্পপ্রাণ-বর্ণের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৩। যৌগিক স্বরধ্বনি কাহাকে বলে ? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪। শিস্ধ্বনি, তাড়নজাত-ধ্বনি, প্রতিবেষ্টিত-ধ্বনি বলিতে কী বুঝায় ?

৫। উচ্চারণস্থান নির্ণয় করিয়া কোন্টি কোন্ বর্ণ তাহা লিখ : ই, উ, ঋ, ণ, ম, য, ক্ষ।

৬। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে 'অ'-কার ও 'এ'-কারের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে ?

৭। তালব্য বর্ণ, উষ্মবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ ও অনুনাসিক বর্ণ কোন্গুলি ? ঐরূপ নাম কেন হইয়াছে ?

৮। একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ও বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি—তাহাদের উদাহরণ দাও।

৯। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর :—
বিপ্রকর্ষ, সম্প্রকর্ষ, সমীভবন, বিসমীভবন, স্বরাগম, স্বরসঙ্গতি, বর্ণবিপর্যয়, বর্ণদ্বিত্ব, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি।

১০। টীকা লিখ :—
কান্না, এসে ; বাসাতা ; বৌদি ; তিরপিত ; পেনেটি ; ইস্ক্রুপ ; মরম ; গইত্ত ; ওতুল।

৩। সন্ধি

দুইটি বর্ণের পরস্পর মিলনের নাম—**সন্ধি**। মিলনের এই নিয়মে কখনও দুইটি বর্ণ একত্র হয়, ফলে কখনও একটি বর্ণ লোপ পায়, কখনও বা অন্য বর্ণের প্রভাবে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন—(১) দেব+আলয়=দেবালয় ; (২) নিঃ+রস=নীরস ; (৩) বি+ছেদ=বিচ্ছেদ প্রভৃতি।

বাংলা সাধুভাষায় যে-নিয়মে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাহা প্রধানত হয় সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই। চলিতভাষায় সন্ধি-প্রবণতা কম হইলেও, ক্ষেত্রবিশেষে যে-সন্ধি হয় তাহা কখনও হয় সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে, কখনও বা তাহার নিজস্ব বিশেষ একটা পদ্ধতিতে। প্রথমে, আমরা সংস্কৃত-সন্ধির আলোচনা করিয়া, পরে বাংলা-সন্ধির রীতি-প্রকৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃত-সন্ধির সহিত তাহার পার্থক্য কী তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত সন্ধি

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, সন্ধি তিন প্রকার—(১) **স্বরসন্ধি**, (২) **ব্যঞ্জনসন্ধি** ও (৩) **বিসর্গসন্ধি**। আসলে, বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

(ক) স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনের নাম—**স্বরসন্ধি**। (অর্থাৎ, সন্নিহিত দুইটি স্বরবর্ণ মিলিয়া যখন একটি স্বরবর্ণে পরিবর্তিত হয় তখনই আমরা তাহাকে স্বরসন্ধি বলিতে পারি।) যেমন—

(১) অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **আ**-কার হয়। ঐ আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + অ = আ ··· নীল + অম্বর = নীলাম্বর

অ + আ = আ ··· চরণ + আশ্রিত = চরণাশ্রিত

আ + অ = আ ··· মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ

আ + আ = আ ··· বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

সেইরকম : হিম + অদ্রি = হিমাদ্রি ; নর = অধম + নরাধম ; অদ্য + অবধি = অদ্যাবধি ; কাল + অন্তক = কালান্তক ; চরণ + অরবিন্দ = চরণারবিন্দ ; দেব + অনুগ্রহ = দেবানুগ্রহ ; পর + অন্ন = পরান্ন ; স্বদেশ + অভিমুখে = স্বদেশাভিমুখে ; শত + অব্দ = শতাব্দ ; স্থল + অভিষিক্ত = স্থলাভিষিক্ত ; সর্ব + অপেক্ষা = সর্বাপেক্ষা ; হিম + আলয় = হিমালয় ; কমল + আসন = কমলাসন ; দশ = আনন = দশানন ; চন্দ্র + আনন = চন্দ্রানন ; সলিল + আবর্ত = সলিলাবর্ত ; বিবেক + আনন্দ = বিবেকানন্দ ; চিত্ত + আকর্ষক = চিত্তাকর্ষক ; উৎসব + আদি = উৎসবাদি , পরম + আগ্রহ = পরমাগ্রহ ; পাঠ + আগার = পাঠাগার ; গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার ; বাষ্প + আকুল = বাষ্পাকুল ; নীল + আকাশ = নীলাকাশ , মহা + অরণ্য = মহারণ্য ; মহা + আশয় = মহাশয় ; শ্রদ্ধা + আস্পদ = শ্রদ্ধাস্পদ ; শঙ্কা + আতুর = শঙ্কাতুর ; কারা + আগার = কারাগার ; দিবা + আকর = দিবাকর ; সদা + আনন্দ = সদানন্দ প্রভৃতি।

(২) ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয়। সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ ... কবি + ইন্দ্র = কবীন্দ্র

ই + ঈ = ঈ ... পরি + ঈ = পরীক্ষা

ঈ + ই = ঈ ... যোগী + ইন্দ্র = যোগীন্দ্র

ঈ + ঈ = ঈ ... সতী + ঈশ = সতীশ

সেইরকম : রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ; মণি + ইন্দ্র = মণীন্দ্র ; অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট, অতি + ইব = অতীব ; প্রতি + ইত = প্রতীত ; অতি + ইত = অতীত ; অগ্নি + ঈশ্বর = অগ্নীশ্বর ; ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ ; গিরি + ঈশ = গিরীশ ; কবি + ঈশ = কবীশ ; নীতি + ঈশ = নীতীশ ; শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র ; সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ; যোগী + ঈশ্বর = যোগীশ্বর ; শ্রী + ঈশ = শ্রীশ প্রভৃতি।

(৩) উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয়। সেই ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ ... কটু + উক্তি = কটূক্তি

উ + ঊ = ঊ ... লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি

ঊ + উ = ঊ বধূ + উক্তি = বধূক্তি

ঊ + ঊ = ঊ ... ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব

সেইরকম : মরু + উদ্যান = মরূদ্যান ; সু + উক্তি = সূক্তি ; সাধু + উত্তম = সাধূত্তম ; গুরু + উপদেশ = গুরূপদেশ , বিধু + উদয় = বিধূদয় ; বধূ + উৎসব = বধূৎসব প্রভৃতি।

(৪) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয়। সেই এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ ... নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র

অ + ঈ = এ ... দেব + ঈশ = দেবেশ

আ + ই = এ ... যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

আ + ঈ = এ ... রাজা + ঈশ্বর = রাজেশ্বর

সেইরকম : দেব + ইন্দ্র দেবেন্দ্র ; রণ + ইন্দ্র = রণেন্দ্র ; সত্য + ইন্দ্র = সত্যেন্দ্র ; উপ + ইন্দ্র = উপেন্দ্র ; স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা ; পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু , নব + ইন্দু = নবেন্দু ; গণ + ঈশ = গণেশ ; পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর ; ভুবন + ঈশ্বর = ভুবনেশ্বর ; বঙ্গ + ঈশ্বর = বঙ্গেশ্বর ; ভব + ঈশ = ভবেশ ; সুর + ঈশ = সুরেশ ; মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র ; রাজা + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র ; রসনা + ইন্দ্রিয় = রসনেন্দ্রিয় ; রমা + ঈশ = রমেশ ; সীতা + ঈশ = সীতেশ ; মহা + ঈশ = মহেশ প্রভৃতি।

(৫) অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়। সেই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও ... সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়

অ + ঊ = ও ... চল + ঊর্মি = চলোর্মি

আ + উ = ও ... মহা + উৎসব = মহোৎসব

আ + ঊ = ও ... গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

সেইরকম : চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয় ; ভাগ্য + উদয় = ভাগ্যোদয় ; কাব্য + উদ্যান = কাব্যোদ্যান ; বিবাহ + উপলক্ষে = বিবাহোপলক্ষে ; বোধ + উদয় = বোধোদয় ; হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ ; নীল + উৎপল = নীলোৎপল ; পাঠ + উদ্ধার = পাঠোদ্ধার ; পর + উপকার = পরোপকার ; দিব্য + উন্মাদ = দিব্যোন্মাদ ; জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস ; রণ + উৎসব = রণোৎসব , তীর + উপরি = তীরোপরি ; স্নিগ্ধ + উজ্জ্বল = স্নিগ্ধোজ্জ্বল ; প্রথম + উক্ত = প্রথমোক্ত ; নর + উত্তম = নরোত্তম ; নাম + উল্লেখ = নামোল্লেখ ; দেব + উত্তর = দেবোত্তর ; দেব + উদ্দেশে = দেবোদ্দেশে ; শূন্য + উদ্যান = শূন্যোদ্যান ; ষোড়শ + উপচার = ষোড়শোপচার ; এক + ঊনবিংশতি = একোনবিংশতি ; নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া ; বিদ্যা + উদয় = বিদ্যোদয় ; দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব ; কথা + উপকথন = কথোপকথন ; মহা + উপকার = মহোপকার ; গঙ্গা + উদক = গঙ্গোদক প্রভৃতি।

(৬) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **অর্** হয়। অর্-এর র্ (́) রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায় এবং অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = অর্ (অ + র্) ... দেব + ঋষি = দেবর্ষি

আ + ঋ = অর্ (অ + র্) ... রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

সেইরকম : উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ ; অধম + ঋণ = অধমর্ণ ; মহা + ঋষি = মহর্ষি প্রভৃতি। কিন্তু কাতর অর্থে ঋত শব্দ পরে থাকিলে হয় **আর্**। আ, পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ (́) রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন—শীত + ঋত = শীতার্ত ; হিম + ঋত = হিমার্ত ; ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত ; পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত ; বেদনা + ঋত = বেদনার্ত প্রভৃতি।

(৭) অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয়। সেই ঐ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + এ = ঐ ... সর্ব + এব = সর্বৈব

অ + ঐ = ঐ ... মত + ঐক্য = মতৈক্য

আ + এ = ঐ ... সদা + এব = সদৈব

আ + ঐ = ঐ ... মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

সেইরকম : জন + এক = জনৈক ; এক + এক = একৈক ; ষড় + ঐশ্বর্য = ষড়ৈশ্বর্য ; অতুল + ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য ; তথা = এবচ + তথৈবচ প্রভৃতি।

(৮) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয়। সেই ঔ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ ... কণ্ঠ + ওষ্ঠ = কণ্ঠৌষ্ঠ

অ + ঔ = ঔ ... চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য

আ + ও = ঔ ... মহা + ওষধি = মহৌষধি

আ + ঔ = ঔ ... মহা + ঔষধ = মহৌষধ

সেইরকম : বনৌষধি ; পরমৌষধ প্রভৃতি।

(৯) ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ই-ঈ স্থানে য হয় ; সেই য্ য-ফলারূপে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + অ = য্ ... আদি + অন্ত = আদ্যন্ত

ই + আ = য্ ... অতি + আচার = অত্যাচার

ই + উ = য্ ... প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার

ই + এ = য্ ... প্রতি + এক = প্রত্যেক

ই + ঔ = য্ ... অতি + ঔৎসুক্য = অত্যৌৎসুক্য

ঈ + অ = য্ ... নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

ঈ + আ = য্ ... মসী + আধার = মস্যাধার

ঈ + উ = য্ ... নদী + উপকণ্ঠ = নদ্যুপকণ্ঠ

সেইরকম : অতি + অন্ত = অত্যন্ত ; অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ ; প্রতি + অন্ত = প্রত্যন্ত ; প্রতি + অক্ষ = প্রত্যক্ষ ; প্রতি + আশা = প্রত্যাশা ; প্রতি + অহ = প্রত্যহ ; প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর ; প্রতি + আদেশ = প্রত্যাদেশ ; প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন ; প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন ; পরি + অন্ত = পর্যন্ত ; পরি + অবেক্ষণ = পর্যবেক্ষণ ; পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা ; বি + আঘাত = ব্যাঘাত ; বি + অসন = ব্যসন ; গতি + অন্তর = গত্যন্তর ; অভি + উদয় = অভ্যুদয় প্রভৃতি।

(১০) উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে উ-ঊ স্থানে ব্ হয়। সেই ব্ ব-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উ + অ = ব্ ... সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ

উ + আ = ব ... সু + আগত = স্বাগত

উ + ই = ব্ ... অনু + ইত = অন্বিত

উ+আ=ব্ ··· বধূ+আনয়ন=বধ্বানয়ন

উ+এ=ব্ ··· অনু+এষণ=অন্বেষণ

সেইরকম : মনু+অন্তর=মন্বন্তর ; পশু+অধম=পশ্বধম ; পশু+আচার=পশ্বাচার ; মধু+আচার্য=মধ্বাচার্য ; মনু+আদি=মন্বাদি প্রভৃতি।

(১১) ঋ-কারের পর ঋ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঋ-স্থানে র্ হয়। সেই র্ র-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ+অ=র্ ··· পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি

ঋ+আ=র্ ··· পিতৃ+আদেশ=পিত্রাদেশ

ঋ+উ=র্ ··· মাতৃ+উপদেশ=মাত্রুপদেশ

সেইরকম : পিতৃ+অনুগ্রহ=পিত্রনুগ্রহ ; পিতৃ+আলয়=পিত্রালয় প্রভৃতি।

(১২) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী এ-স্থানে **অয়্** ; ঐ-স্থানে **আয়্**, ও-স্থানে **অব্** এবং ঔ-স্থানে **আব্** হয়।

এ+অ=অয়্ ··· নে+অন=নয়ন

ঐ+অ=আয় ··· গৈ+অক=গায়ক

ও+অ=অব্ ··· পো+অন=পবন

ঔ+অ=আব্ ··· পৌ+অক=পাবক

সেইরকম : শে+অন=শয়ন ; নৈ+অক=নায়ক ; ভো+অন=ভবন ; গো+এষণা=গবেষণা ; পৌ+অক=পাবক ; নৌ+ইক=নাবিক ; ভৌ+উক=ভাবুক প্রভৃতি।

নিপাতনে সিদ্ধ : কোনো নিয়ম অনুসারে সন্ধি না হইয়া যখন অন্যভাবে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন ঘটে, তখন সেইরূপ সন্ধিকে **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি** বলা হয়। এখানে নিপাতনে সিদ্ধ কয়েকটি স্বরসন্ধির উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে—

সম+অর্থ=সমর্থ ; কুল+অটা+কুলটা ; গো+অক্ষ=গবাক্ষ ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; স্ব+ঈর=স্বৈর ; অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিনী ; প্র+এষণ=প্রেষণ ; মনস্+ঈষা=মনীষা ; শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন ; সীমন্+অন্ত=সীমন্ত ; বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ প্রভৃতি।

(খ) ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের মিলনকে বলা হয়—**ব্যঞ্জনসন্ধি**। (অর্থাৎ, সন্নিহিত দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের, কিংবা, একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি স্বরবর্ণের যখন মিলন ঘটে তখনই আমরা তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলিতে পারি।) যেমন—

(১) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব, হ্ পরে থাকিলে **বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ** হয়।

দিক্+অন্ত=দিগন্ত ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত ষট্+আনন=ষড়ানন

জগৎ+ঈশ=জগদীশ অপ্+জ=অব্জ

সেইরকম: দিক্+ঈশ=দিগীশ; দিক্+দর্শন=দিগ্দর্শন; বাক্+ঈশ্বর=বাগীশ্বর; বাক্+দেবী=বাগ্দেবী। ষট্+ঋতু=ষড়ঋতু; বাক্+ধারা=বাগ্ধারা; দিক+বিজয়ী=দিগ্বিজয়ী; প্রাক্+জ্যোতিষ=প্রাগ্জ্যোতিষ; উৎ+ভব=উদ্ভব; তৎ+ভব=তদ্ভব; উৎ+যম=উদ্যম; তৎ+রূপ=তদ্রূপ; উৎ+ঘাটন=উদ্ঘাটন; তৎ+অনন্তর=তদনন্তর; তৎ+অবধি=তদবধি; জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর; জগৎ+ইন্দ্র=জগদিন্দ্র; সৎ+গুরু=সদ্গুরু; সুপ্+অন্ত=সুবন্ত প্রভৃতি।

(২) ন্ অথবা ম্ পরে থাকিলে **বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ** হয়।

জগৎ+নাথ=জগন্নাথ দিক্+মণ্ডল=দিঙ্মণ্ডল

চিৎ+ময়=চিন্ময় ষট্+মাস=ষণ্মাস

সেইরকম: দিক্+নির্ণয়=দিঙ্নির্ণয়; বাক্+ময়=বাঙ্ময়; দিক্+নাগ=দিঙ্নাগ; মৃৎ+ময়=মৃন্ময়। জগৎ+মাতা=জগন্মাতা; ষট্+নবতি=ষণ্ণবতি প্রভৃতি। [বিকল্পে, 'দিঙ্নাগ' হয় 'দিগ্নাগ', 'দিঙ্নির্ণয়' হয় 'দিগ্নির্ণয়'।]

(৩) স্বরবর্ণের পর ছ্ থাকিলে **ছ্ স্থানে চ্ছ** হয়।

মুখ+ছবি=মুখচ্ছবি বি+ছেদ=বিচ্ছেদ

সেইরকম: তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া; আ+ছাদন=আচ্ছাদন; এক+ছত্র=একচ্ছত্র; রাজ+ছত্র=রাজচ্ছত্র; আলোক+ছটা=আলোকচ্ছটা প্রভৃতি।

(৪) চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে **ত ও দ্ স্থানে চ্** হয়।

চলৎ+চিত্র=চলচ্চিত্র উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ

বিপদ্+চিন্তা=বিপচ্চিন্তা তদ্+ছবি=তচ্ছবি

সেইরকম: শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র; সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র; উৎ+চারণ=উচ্চারণ; বৃহৎ+ছিদ্র=বৃহচ্ছিদ্র প্রভৃতি।

(৫) জ্ বা ঝ্ পরে থাকিলে, **ত্ ও দ্ স্থানে জ্** হয়।

উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল তদ্+জন্য=তজ্জন্য কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা

সেইরকম: সৎ+জন=সজ্জন; বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল; যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন প্রভৃতি।

(৬) ল্ পরে থাকিলে **ত ও দ্ স্থানে ল্** হয়।

উৎ + লিখিত = উল্লিখিত　　　　তদ্ + লীলা = তল্লীলা

সেইরকম : উৎ + লাস = উল্লাস ; উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন ; বিদ্যুৎ + লেখা = বিদ্যুল্লেখা প্রভৃতি।

(৭) শ্ পরে থাকিলে, **ত্ ও দ্ স্থানে** চ্, এবং **শ্ স্থানে** ছ্ অর্থাৎ, উভয়ে মিলিয়া **চ্ছ** হয়।

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস　　　　চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি

সেইরকম : উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ; তদ্ + শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ প্রভৃতি।

(৮) হ্ পরে থাকিলে, **ত্ স্থানে দ্** এবং **হ্ স্থানে ধ্** অর্থাৎ, উভয়ে মিলিয়া **দ্ধ** হয়।

উৎ + হত = উদ্ধত　　　　তদ্ + হিত = তদ্ধিত

সেইরকম : উৎ + হার = উদ্ধার ; উৎ + হৃত = উদ্ধৃত ; জগৎ + হিতায় = জগদ্ধিতায় প্রভৃতি।

(৯) ট্ বা ঠ্ পরে থাকিলে, **ত্ বা দ্ স্থানে ট্** হয়, এবং ড্ বা ঢ্ পরে থাকিলে, **ত্ স্থানে ড্** হয়।

তদ্ + টীকা + তট্টীকা　　　　বৃহৎ + ঠক্কুর = বৃহট্ঠক্কুর

উৎ + ডীন = উড্ডীন　　　　বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা

(১০) ষ্-কারের পর ত্ বা থ্ থাকিলে, **ত্ স্থানে ট্** এবং **থ্ স্থানে ঠ** হয়।

বৃষ্ + তি = বৃষ্টি　　　　আকৃষ্ + ত = আকৃষ্ট　　　　ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ

সেইরকম : কৃষ্ + তি = কৃষ্টি ; দৃষ্ + তি = দৃষ্টি ; প্রবিষ্ + ত = প্রবিষ্ট ; তুষ্ + ত = তুষ্ট প্রভৃতি।

(১১) য্, র্, ল্, ব্, হ্, শ্, ষ্, স্ পরে থাকিলে **ম-স্থানে অনুস্বার** হয়।

সম্ + যত = সংযত　　　　সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন　　　　সম্ + বাদ = সংবাদ

সম্ + শয় = সংশয়　　　　সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা

সেইরকম : **স্বয়ম্ + বরা = স্বয়ংবরা** ; প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা ; সম্ + সার = সংসার ; সম্ + হার = সংহার ; কিম্ + বা = কিংবা ('কিম্বা' নয়), বশম্ + বদ = বশংবদ ; বারম্ + বার = বারংবার প্রভৃতি।

(১২) স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত **ম-স্থানে অনুস্বার অথবা** যে-বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই **বর্গের পঞ্চম বর্ণ** হয়।

সম + কলন = সংকলন, সঙ্কলন　　সম্ + চয় = সঞ্চয়　　সম্ + গীত = সংগীত, সঙ্গীত

সেইরকম : সম্‌+কল্প=সংকল্প সঙ্কল্প ; সম্‌+চালন=সংচালন, সঞ্চালন ; কিম্‌+চিৎ=কিঞ্চিৎ ; বসুম্‌+ধরা=বসুন্ধরা ; সম্‌+ধান=সন্ধান ; শাম্‌+ত=শান্ত ; সম+তাপ=সন্তাপ , সম্‌+মান=সম্মান ; গম্‌+তব্য=গন্তব্য প্রভৃতি। [কিন্তু—সম+কার=সংস্কার ; সম্‌=কৃত=সংস্কৃত ।]

(১৩) বর্গের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা শ্‌, ষ্‌, স্‌ পরে থাকিলে **বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ** হয়।

হৃদ্‌+কমল=হৃৎকমল ক্ষুধ্‌+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা

সেইরকম : বিপদ্‌+কাল=বিপৎকাল ; আপদ্‌+কাল=আপৎকাল ; ক্ষুধ্‌+পীড়িত=ক্ষুৎপীড়িত প্রভৃতি।

(১৪) 'উৎ'-উপসর্গের পর 'স্থা' ও স্থনভ্‌' ধাতুর **'স'-কারের লোপ** হয়।

উৎ+স্থান=(উৎথান) উত্থান উৎ+স্তম্ভন=(উৎতম্ভন) উত্তম্ভন

সেইরকম : উৎ+স্থিত=উত্থিত, উৎ+স্থাপিত=উত্থাপিত প্রভৃতি।

(১৫) 'সম্‌' ও 'পরি' উপসর্গের পর 'কৃ'-ধাতু থাকিলে উপসর্গের পর **'স্‌'** বা **'ষ'-এর আগম** হয়।

সম্‌+কৃত=সংস্কৃত পরি+কৃত=পরিষ্কৃত

সম্‌+কার=সংস্কার পরি+কার=পরিষ্কার

নিপাতনে সিদ্ধ : নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে—

আ+চর্য=আশ্চর্য ; আ+পদ=আস্পদ ; বন+পতি=বনস্পতি ; বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি ; তৎ+কর=তস্কর ; হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র ; পর+পর=পরস্পর ; গো+পদ=গোষ্পদ ; পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি ; দিব্‌+লোক=দ্যুলোক ; ষট্‌+দশ=ষোড়শ প্রভৃতি।

(গ) বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সহিত পরবর্তী স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের নাম—**বিসর্গ সন্ধি**। যেমন—

(১) (র্‌-জাত বা স্‌-জাত) বিসর্গের পরে চ্‌ বা ছ থাকিলে, **বিসর্গ স্থানে শ্‌** হয়।

নিঃ+চল=নিশ্চল শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ

সেইরকম : নিঃ+চয়=নিশ্চয় ; দুঃ+চিন্তা=দুশ্চিন্তা ; নিঃ+চিন্ত=নিশ্চিন্ত ; নিঃ+ছিদ্র=নিশ্ছিদ্র প্রভৃতি।

(২) (র্‌-জাত বা স্‌-জাত) বিসর্গের পরে ট্‌ বা ঠ্‌ থাকিলে, **বিসর্গ স্থানে ষ্‌** হয়।

নিঃ+ঠুর=নিষ্ঠুর ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার

(৩) (র্-জাত বা স্-জাত) বিসর্গের পরে ত্ বা থ্ থাকিলে **বিসর্গের স্থানে স্** হয়।

দুঃ + তর = দুস্তর   সুঃ + থ = সুস্থ

সেইরকম : ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ ; মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ; নভঃ + তল = নভস্তল ; অধঃ + তন = অধস্তন প্রভৃতি।

(৪) অ-কারের পরবর্তী স্-জাত বিসর্গের পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ থাকিলে **বিসর্গ ও তাহার পূর্ববর্তী অ-কার উভয়ে মিলিয়া ও-কার** হয়।

মনঃ + ভাব = মনোভাব   মনঃ + মোহন = মনোমোহন

মনঃ + রমা = মনোরমা   মনঃ + হরণ = মনোহরণ

বয়ঃ + বৃদ্ধি = বয়োবৃদ্ধি   সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত

সেইরকম : মনঃ + যোগ = মনোযোগ ; সরঃ + বর = সরোবর ; মনঃ + লোভা = মনোলোভা ; মনঃ + রঞ্জন = মনোরঞ্জন ; তপঃ + বল = তপোবল ; তপঃ + ধন = তপোধন ; পুরঃ + হিত = পুরোহিত ; তেজঃ + ময় = তেজোময় ; ছন্দঃ + লিপি = ছন্দোলিপি ; ততঃ + অধিক = ততোধিক (এখানে পরবর্তী 'অ'-কারের লোপ হইয়াছে) প্রভৃতি। [কিন্তু, **মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট ; বয়ঃ + প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত** ।]

(৫) অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, **অ-কারের পরবর্তী বিসর্গের লোপ** হয়।

অতঃ + এব = অতএব   শিরঃ + উপরি = শিরউপরি*

(৬) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য্, র্, ল, ব্, হ্ পরে থাকিলে র্-জাত **বিসর্গ স্থানে র্** হয়।

পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন   পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত   অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত

অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী

(৭) অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে বিসর্গ থাকিলে, এবং সেই বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ থাকে, তাহা হইলে **বিসর্গ স্থানে র্** হয়।

নিঃ + মল = নির্মল   নিঃ + আকার = নিরাকার

নিঃ + অবধি = নিরবধি   নিঃ + গত = নির্গত

দুঃ + গম = দুর্গম   দুঃ + লভ = দুর্লভ

---

* ['শিরোপরি' শব্দটি ব্যাকরণসম্মত না হইলেও প্রচলিত।]

আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ মুহুঃ = মুহু = মুহুর্মুহু

সেইরকম : দুঃ + দম = দুর্দম, দুঃ + মদ = দুর্মদ ; দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ; দুঃ + অন্ত = দুরন্ত ; দুঃ + গতি = দুর্গতি ; নিঃ + ঝর = নির্ঝর ; নিঃ + গমন = নির্গমন, দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা ; জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ময় ; জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র ; চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন ; দ্বিঃ + আগমন = দ্বিরাগমন প্রভৃতি।

(৮) র্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে যে র্ হয় তাহার **লোপ** পায় এবং তাহার ক্ষতিপূরণ হিসাবেই যেন **পূর্বস্বর দীর্ঘ** হয়।

নিঃ + রোগ = নীরোগ নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস = নীরস নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ জ্যোতিঃ + রেখা = জ্যোতীরেখা

(৯) ক, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে **অ-কার বা আ-কারের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে স্** হয় এবং **অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে** হয় ষ্।

নমঃ + কার = নমস্কার বহিঃ + কার = বহিষ্কার

পুরঃ + কার = পুরস্কার পরিঃ + কার = পরিষ্কার

ভাঃ + কর = ভাস্কর পুঃ + কর = পুষ্কর

ব্যতিক্রম

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট ; শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া ; অধঃ + পাত = অধঃপাত, অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ প্রভৃতি।

(১০) স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকিলে **বিকল্পে বিসর্গের লোপ** হয়।

নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ, নিস্তব্ধ অন্তঃ + স্থ = অন্তঃস্থ, অন্তস্থ

নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ, নিস্পন্দ

নিপাতনে সিদ্ধ : নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ—

মনঃ + ঈষা = মনীষা

বাংলা সন্ধি

বাংলাভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য : তৎসম শব্দে যেরূপ সন্ধি হয়, খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধির সেরূপ বাহুল্য নাই। সে-কালের লেখকেরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে তাঁহাদের রচনায় সন্ধিযুক্ত শব্দের যেরূপ ব্যবহার করিতেন, একালের লেখকেরা তদ্রূপ করেন না, তাহারা বরং সন্ধিযুক্ত শব্দাবলী যতদূর সম্ভব পরিহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু, সন্ধিযুক্ত এমন বহু শব্দ বাংলায় যেভাবে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া

আসিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে এড়াইয়া চলিবারও উপায় নাই। সেগুলি এখন গোটা শব্দরূপেই পরিচিত। উহার মধ্যে বর্ণে বর্ণে কোনো মিলন ঘটিয়াছে কিনা কেহ আর সেকথা চিন্তা করেন না। যেমন—নমস্কার, দুর্গম, অন্তর্গত, জগন্নাথ, বসুন্ধরা, উদ্যম, উদ্ভব, বিদ্যালয়, হিমাচল, যথেচ্ছা, নাবিক প্রভৃতি শব্দ। কিন্তু, সন্ধিযুক্ত এমন অনেক তৎসম শব্দ আছে যেগুলি আধুনিক কালের বাংলাভাষায় একরূপ অচল। যেমন—ভূর্দ্ধ, নদ্যম্বু, নদ্যুপকণ্ঠ, বধ্বানয়ন, মাত্রুপদেশ, তচ্ছবি, বৃহচ্ছিদ্র, তল্লীলা, সম্যাল্লাভ, বৃহদ্রথ, বিপদ্ধেতু প্রভৃতি।

সাধুভাষায় সন্ধি যতটা সুনিয়মে চলে, বাংলা চলিতভাষায় সে-নিয়ম বড়ই শিথিল। উচ্চারণের প্রয়োজন অনুসারে কথ্যভাষায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের গড়া একটা নিয়মে সন্ধি করিলেও লেখার সময় সেই সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহার করি না। যেমন—

চাষ+আবাদ = চাষাবাদ (লেখার সময় লিখি চাষ-আবাদ)
পাঁচ+শ = পাঁচশ (,, ,, ,, পাঁচশ')
ভর+দিন = ভদ্দিন (,, ,, ,, ভরদিন)
কর+তাল = কত্তাল (,, ,, ,, করতাল)
ঘোড়ার+ডিম = ঘোড়াড্ডিম (,, ,, ,, ঘোড়ার ডিম)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে, বাংলা শব্দেও (অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধতৎসম, কিংবা তৎসম ও দেশী বা বিদেশী শব্দে) কিছু কিছু সন্ধি হয়। যেমন-

(১) **অ + অ = আ**···বাপ + অন্ত = বাপান্ত ; পছন্দ + অনুসারে = পছন্দানুসারে ;
মত + অন্তর = মতান্তর ; আইন + অনুসারে = আইনানুসারে ;
অপর + অপর = অপরাপর ; অনেক + অনেক = অনেকানেক ;
নিয়ম + অনুগ = নিয়মানুগ

অ + আ = আ · পোস্ট + আপিস = পোস্টাপিস
গ্যাস + আলোক = গ্যাসালোক
আপন + আপন = আপনাপন
হিসাব + আদি = হিসাবাদি

আ + অ = আ···কলিকাতা + অভিমুখে = কলিকাতাভিমুখে

(২) **ই + ঈ = ঈ** ···বিজনি + ঈশ্বরী = বিজনীশ্বরী

ঈ + ঈ = ঈ ···দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর

(৩) **অ + ঈ = এ** ···যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী
ইংলণ্ড + ঈশ্বরী = ইংলণ্ডেশ্বরী

আ + ঈ = এ ···ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী

(৪) **অ+ ে=ও**···চিতোর+উদ্ধার=চিতোরোদ্ধার

(৫) **বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ—**

মাগ্+না=মাঙ্না ; কাঁদ্+না=কান্না ; রাঁধ্+না=রান্না

বাংলার নিজস্ব নিয়মে যে-ধরনের সন্ধি হয়, নিচে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যেমন—

অ+এ=এ···বার+এক=বারেক   অর্ধ+এক=অর্ধেক

দশ+এক=দশেক   আর+এক=আরেক

অ+ই=ই···যখন+ই =যখনি   আমার+ই=আমারি

'অ'-কারের লোপ···যাইতে+আছে=যাইতেছে, খাইতে+আছে=খাইতেছে

'ইতে'-স্থানে চ্ এবং পরবর্তী 'আ' লোপ ··· যাইতে+আছে=যাচ্ছে, খাইতে+আছে=খাচ্ছে।

'ট'-স্থানে **'ড়'** ···ছোট+দা=ছোড়দা

'ড়'-স্থানে **'ট'**···বড়+ঠাকুর=বট্ঠাকুর

'ত'-স্থানে **'চ্'**···সৎ+চাষী=সচ্চাষী (প্রয়োগ খুবই কম)

'দ্'-স্থানে **'জ'**···বদ্+জাত=বজ্জাত

'ত'-স্থানে 'চ' ও 'স্'-স্থানে 'ছ'···কুৎ+সিত=কুচ্ছিত, বৎ+সর=বচ্ছর

[এইভাবেই, পাঁশ্সের (পাঁচ+সের), চাট্টি (চার+টি), ডাগঘর (ডাক+ঘর); মাস্সাই (মাস্টার+মশাই), হাদ্ধরা (হাত+ধরা) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু, কথ্যভাষা ছাড়া এ-জাতীয় শব্দের ব্যবহার নাই।]

সংস্কৃত ও বাংলা সন্ধির পার্থক্য : সংস্কৃতে সন্ধি প্রধানত হয় সম-বর্ণের প্রভাবে, কিন্তু বাংলায় যে সন্ধি হয় তাহার উদ্দেশ্য উচ্চারণের সুবিধা। সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে বাংলায় সবক্ষেত্রে সন্ধি করিতে গেলে কিম্ভূতকিমাকার শব্দসৃষ্টির সম্ভাবনা। যেমন—

কচু+আলু+আদা=কচ্বাল্বাদা!

তুমি+আসিলে=তুম্যাসিলে!

ভাত+আন=ভাতান!

সেতার+আওয়াজ=সেতারাওয়াজ!

এরূপ শব্দসৃষ্টি বাংলাভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাংলাভাষার কেবল তৎসম শব্দেই সন্ধি-প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়, অন্য ক্ষেত্রে ইহা বিরল বলিলেই চলে। এমন কি 'সন্ধ্যালোক' জাতীয় শব্দ প্রয়োগ না করিয়া এ-যুগে আমরা যেন 'সন্ধ্যার আলোক' জাতীয় বিচ্ছিন্ন শব্দ-ব্যবহারেরই পক্ষপাতী।

অনুশীলনী

১। বাংলা সন্ধির বৈশিষ্ট্য কোথায়? সংস্কৃত সন্ধির সহিত উহার পার্থক্য কি?

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—

(১) কান্না, বৃষ্টি, অর্ধেক, বজ্জাত, বাপান্ত, ছোড়দা, যাইতেছে, আমারি।

(২) রসাস্পদ, একাধিপতি, সরোবর, নিদ্রাবেশে, আত্মোৎসর্গ, সদ্যোজাত, মনোমোহন স্বাগত, বাচস্পতি, চলচ্চিত্র, তেজোময়, উড্ডীন, দ্যুলোক, প্রত্যাদেশ, শীতার্ত।

৩। ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর, এবং কেন ভুল তাহা লিখ—

লজ্জাস্কর, মনরঞ্জন, দুরাবস্থা, সম্মান, দুরাদৃষ্ট, ততধিক, মনোকষ্ট, অত্যাধিক, ইতিমধ্যে, কিম্বা, পশ্বাধম, শতছিদ্র, যশলাভ, মনযোগ, বয়োকনিষ্ঠ।

৪। ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান

বাংলায় সাধারণত 'ণ' ও 'ষ'-এর আলাদা কোনো উচ্চারণ হয় না। বাংলায় আমরা 'ণ'-কে 'ন'-রূপেই উচ্চারণ করি, যেমন করি 'শ', 'ষ'-র ক্ষেত্রে। সে-হিসাবে বাংলাভাষার ধ্বনিবিচারে ণত্ব-বিধান বা ষত্ব-বিধানের হয়তো কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাংলাভাষা তৎসম (অবিকৃত সংস্কৃত)-শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তাই সেই সকল শব্দের বানানে আমাদিগকে সংস্কৃত-ব্যাকরণের বিধানই মানিয়া চলিতে হইবে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে মূর্ধন্য 'ণ' বসাইবার নিয়মকে বলে **ণত্ব-বিধান,** আরমূর্ধন্য 'ষ' বসাইবার নিয়মকে বলে **ষত্ব-বিধান।**

ণত্ব-বিধান

(১) ঋ, র এবং ষ—এই তিনটি বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—ঋণ, রণ, কৃষ্ণ, তৃণ, ঘৃণা, স্বর্ণ, কর্ণ, বর্ণ, বিষ্ণু, সহিষ্ণু প্রভৃতি।

(২) ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের কোনো একটির পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় অথবা প-বর্গীয় বর্ণ, য, ব, হ এবং অনুস্বার (ং) থাকিয়া যদি তাহার পর দন্ত্য 'ন' থাকে, তাহা হইলে সেই দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—শ্রবণ, অর্পণ, কৃপণ, করুণা, ঘোষণা, পাষাণ, রুক্মিণী, গৃহিণী, ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মণ, বৃংহণ, চরণ, শরণ, মরণ, রুগ্‌ণ, আরোহণ, ম্রিয়মাণ, ভ্রাম্যমাণ প্রভৃতি।

[কিন্তু, ঋ, র, ষ এবং শেষ 'ন'-এর মধ্যে অন্য কোনো বর্ণ থাকিলে, কিংবা সমাসবদ্ধ সমাসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না; অর্থাৎ দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন—দর্শন, বিসর্জন, অর্চনা, রচনা, প্রার্থনা, মূর্ধন্য, দুর্নাম, সর্বনাম, অর্জুন, শত্রুঘ্ন, হরিনাম প্রভৃতি।]

(৩) ট-বর্গীয় বর্ণের সহিত সর্বত্র মূর্ধন্য 'ণ' বসে। যেমন—বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, কণ্ঠ, দণ্ড, মুণ্ড, গণ্ডার প্রভৃতি।

(৪) প্র, পরি, নির্—এই সকল উপসর্গের পরে 'ন' থাকিলে তাহা মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—প্রণতি, প্রণাম, প্রণয়, প্রণীত, প্রণিপাত, প্রণিধান; পরিণাম, পরিণতি, পরিণত, পরিণীতা; নির্ণয়, নির্ণীত প্রভৃতি।

(৫) প্র, পূর্ব, পরা, অপর—এই সকল শব্দের পরে 'অহ্ন' (<অহন্) শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। (কিন্তু, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক প্রভৃতি শব্দের 'অহ্ন' দন্ত্য 'ন'। সেইরূপ, চিহ্ন, বহ্নি, জাহ্নবী প্রভৃতি।)

(৬) অয়ন্ শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়—পর, চন্দ্র, উত্তর, নার প্রভৃতি শব্দের পরে। যেমন—পরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, উত্তরায়ণ, নারায়ণ।

(৭) 'নখ'-শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য হয় 'শূর্প'-শব্দের পরে। যেমন—শূর্পণখা।

(৮) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—অণু (ক্ষুদ্রাংশ অর্থে) রেণু, স্থাণু, বেণু, বাণী, বীণা, বিপণি, বণিক, বাণিজ্য, পণ, পুণ্য, গণ, গণ্য, লাবণ্য, চাণক্য, কল্যাণ, কণিকা, নিপুণ, গৌণ, ফণী, শোণিত প্রভৃতি।

[তৎসম-শব্দ ব্যতীত 'ণ'-এর এইসব নিয়ম বাংলায় মানা হয় না। যেমন—(১) বাংলা ক্রিয়াপদে 'র'-এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' না বসিয়া দন্ত্য 'ন'-ই বসে—করেন, পড়েন, ধরুন, করুন প্রভৃতি। (২) তদ্ভব-শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' না বসাইয়া, 'ন'-ই বসানো হয়—কান (<কর্ণ); সোনা (<স্বর্ণ); রানী (<রাজ্ঞী); কাঁকন (<কঙ্কণ) প্রভৃতি। (৩) বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও দন্ত্য 'ন' প্রয়োগ করা হয়—কোরান, জার্মান, ট্রেন, কানিশ, দূরবীন, গভর্নর প্রভৃতি। (তবে অনেকে এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এইসব ক্ষেত্রে মূর্ধন্য 'ণ' বসান।) (৪) খাঁটি বাংলা শব্দে দন্ত্য 'ন'-ই প্রয়োগ করা হয়, অকারণে মূর্ধন্য 'ণ' প্রযুক্ত হয় না—ধরন, ঝরনা, পরনের কাপড়, গড়ন প্রভৃতি।]

ষত্ব-বিধান

(১) অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ এই সকল বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন—বর্ষা, ঋষি, হর্ষ, মুমূর্ষু, জিগীষা, চিকীর্ষা, শুশ্রূষা, ভবিষ্যৎ, শ্রীচরণেষু,

কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি। (কিন্তু, 'স্যাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন—অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ প্রভৃতি।)

(২) উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরবর্তী ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন—অভিষেক, প্রতিষেধক, নিষেধ, নিষিদ্ধ, বিশেষ, পরিষদ্, বিষম, বিষণ্ণ, বিষাদ, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত, সুষমা, প্রতিষ্ঠান, অধিষ্ঠান, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি। (**ব্যতিক্রম**—সুস্থ, বিসর্জন, পরিস্ফুট, অনুস্বার, বিসর্গ, অনুসরণ, বিস্ময়, অনুসন্ধান, বিসদৃশ, অভিসার প্রভৃতি।)

(৩) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' বসে। যেমন—মেষ, বৃষ, ঋষি, ভাষা, ভূষা, শেষ, বিশেষ, ভাষণ, শোষণ, ভীষণ, বিভীষণ, আষাঢ়, তুষার, ষণ্ড, ষড়ানন, ষষ্ঠী, রোষ, প্রদোষ, শ্লেষ, ঈষৎ, ঔষধ, মূষিক, দ্বেষ, পৌষ, মহিষ, পাষাণ, বিষাণ, প্রভৃতি।

[বাংলা-ভাষায় যে-সকল বিদেশী-শব্দ আসিয়াছে, উপরের নিয়মে তাহাতে অকারণে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ, বিদেশী-শব্দে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম খাটানো যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন—জিনিস, পোশাক, স্টেশন, মাস্টার, স্টল, স্ট্যাম্প প্রভৃতি।]

অনুশীলনী

১। ণত্ব-বিধান কাহাকে বলে? উদাহরণসহ দুইটি প্রধান সূত্র লিখ।

২। ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়—তাহার পাঁচটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর।

৩। কারণ নির্দেশপূর্বক শুদ্ধ কর :—

অপরাহ্ন, শুশ্রূসা; দুর্ণাম; মুমূর্স; আরোহন; ভূমিষাৎ; ভাসণ; আস্পদ; গৃহিনী; পুণ্য; বারানসী; শূর্পনখা, ম্রিয়মান; বানিজ্য; শ্লেশ।

৪। কোন্ বানানটি শুদ্ধ?—

রুগ্ন—রুগ্ণ; ভ্রাম্যমান—ভ্রাম্যমাণ; চিহ্ন—চিহ্ন; অভিষেক—অভিসেক মূর্ধন্য—মূর্ধণ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পদ-প্রকরণ

১। পদের প্রকারভেদ

বাক্যে ব্যবহৃত ও অর্থযুক্ত প্রত্যেক শব্দই এক একটি পদ। শব্দ যখন বিভক্তি-যুক্ত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে পদ বলা হইয়া থাকে। (অন্যভাবে বলা যায় যে, বিভক্তি-যুক্ত প্রাতিপদিক বা ধাতু-ই পদ নামে পরিচিত। বস্তু বা ব্যক্তির শব্দসঙ্কেত যখন বিভক্তিহীন অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে বলে প্রাতিপদিক ; আর বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূলকেই বলে ধাতু।) যেমন—সমর কলিকাতায় যাইতেছে। এই বাক্যের তিনটি শব্দই পদ। কারণ, 'সমর'-শব্দের সহিত 'অ'-বিভক্তি, 'কলিকাতা'-শব্দের সহিত 'য়'-বিভক্তি এবং 'যা'-ধাতুর সহিত 'ইতেছ' বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

পদ পাঁচ প্রকার—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া**।

বিশেষ্য ঃ যে-পদে কোনো কিছুর নাম বুঝায় তাহাকে বলে—বিশেষ্য। যেমন—রবীন্দ্রনাথ (লোকের নাম) ; মানুষ (জাতির নাম) ; সমিতি (সমষ্টির নাম) ; জল (বস্তুর নাম) ; দয়া (গুণের নাম) ; গমন (ক্রিয়ার নাম) প্রভৃতি।

বিশেষ্যকে ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** ; (২) **জাতিবাচক বিশেষ্য** ; (৩) **বস্তুবাচক** (বা উপাদানবাচক)-**বিশেষ্য** ; (৪) **সমষ্টিবাচক-বিশেষ্য** ; (৫) **গুণবাচক** (বা ভাবাত্মক)-**বিশেষ্য** ; এবং (৬) **ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য**।

সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য ঃ যে বিশেষ্যে কোনো বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির নাম বুঝায় তাহাকেই বলে সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য। যেমন—তাজমহল (স্মৃতিসৌধের নাম) ; মহাত্মা গান্ধী (ব্যক্তির নাম) ; ভারতবর্ষ (দেশের নাম) ; দিল্লী (স্থানের নাম) ; হিমালয় (পর্বতের নাম) ; ব্রহ্মপুত্র (নদের নাম) ; বাইবেল (ধর্মগ্রন্থের নাম) প্রভৃতি।

জাতিবাচক-বিশেষ্য ঃ যে-বিশেষ্যে এক শ্রেণীর বা এক জাতির সকল প্রাণী বা বস্তুকে বুঝায় তাহাই জাতিবাচক-বিশেষ্য। (অর্থাৎ, ইহাতে কোনো প্রাণী বা বস্তুর জাতিগত নাম প্রকাশ পায়।) যেমন—মানুষ, গোরু, নদী, পাখি, কীট, পতঙ্গ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, চীনা, জাপানী, ফরাসী, কবি, লেখক, গায়ক, ঘর, বাড়ি, বই প্রভৃতি।

বস্তুবাচক (বা উপাদানবাচক)-**বিশেষ্য** : যে-বস্তুকে কোনো সংখ্যায় গণনা করা যায় না, অখণ্ডভাবে যাবতীয় পরিমাণ নির্দেশ করা যায়, সেইরূপ বস্তুকে যে-বিশেষ্য প্রকাশ করে তাহাই বস্তুবাচক (বা উপাদানবাচক)-বিশেষ্য। যেমন—জল, ফল, ফুল, চাল, দুধ, তেল, কাগজ, কলম, মাটি, কাঠ, লোহা প্রভৃতি। [কারণ, জল বলিতে যাবতীয় জল, ফল বলিতে যাবতীয় ফল, ফুল বলিতে যাবতীয় ফুলকেই বুঝায়। যদি বলি 'গঙ্গাজল', কিংবা 'আপেল', কিংবা 'গোলাপ'—তাহা হইলে উহারা হইবে সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য। কারণ, উহারা যথাক্রমে বিশেষ নদীর জল, বিশেষ কোনো ফল এবং নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর ফুলকেই বুঝাইতেছে।]

সমষ্টিবাচক-বিশেষ্য : যে-বিশেষ্যে জাতিবাচক কোনো প্রাণী বা বস্তুর একটি সমষ্টি বা সমবায় বুঝায় তাহাকে বলে সমষ্টিবাচক-বিশেষ্য। যেমন—ঝাঁক, রাশি, শ্রেণী, দল, সমূহ, মণ্ডল, মণ্ডলী, গুচ্ছ, সংঘ, সমিতি, জাতি, সম্প্রদায়, সভা, জনতা, স্তবক, গোছা, সমাজ প্রভৃতি।

গুণবাচক (বা ভাবাত্মক)-**বিশেষ্য** : যে-বিশেষ্যে কোনো কিছুর গুণ, ভাব, বা অবস্থা বুঝায় তাহার নাম গুণবাচক (বা ভাবাত্মক)-বিশেষ্য। যেমন—শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য, প্রৌঢ়ত্ব, সৌন্দর্য, ঔদার্য, কোমলতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, নম্রতা, উগ্রতা, সাধুতা, দয়া, বিনয়, সখ্য, সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা, ক্ষমতা, দাক্ষিণ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য, লঘুতা, গুরুত্ব, দৈর্ঘ্য, গাম্ভীর্য, লাবণ্য, সৌজন্য, দুরন্তপনা, বাবুয়ানা, বাহাদুরি, চালাকি প্রভৃতি।

ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য : যে-বিশেষ্যে কোনো কাজের নাম বুঝায় তাহাকে বলে ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য। যেমন—শয়ন, ভোজন, গমন, প্রস্থান, আগমন, দর্শন, শ্রবণ, হাসা, কাঁদা, চলা, বলা, খাওয়া প্রভৃতি।

[সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য ব্যতীত আর সকল বিশেষ্যকেই বলা যায় **সামান্য-বিশেষ্য**। কিন্তু, ঐ সামান্য-বিশেষ্যের সহিত কোনো নির্দেশবাচক চিহ্ন (যেমন, টি, টা, খানা, খানি) যোগ করিলে উহারা হয়—**বিশেষ-বিশেষ্য**। যেমন—মানুষটি, ছাগলটা, সাহসটা, কাগজখানা, কাপড়খানি প্রভৃতি।]

বিশেষণ

বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, সংজ্ঞা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম বিশেষণ। যেমন—**বিখ্যাত** কবি ; **মেঘলা** দিন ; **একশ** টাকা ; **দশহাতি** ধুতি ; **চলতি** বছর ইত্যাদি।

বিশেষণ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—(১) **নাম-বিশেষণ** ; (২) **ক্রিয়া-বিশেষণ** ও (৩) **বিশেষণীয় বিশেষণ**।

নাম-বিশেষণঃ অর্থাৎ বিশেষ্যের সাধারণ-বিশেষণ। এই জাতীয় বিশেষণকে আবার অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **গুণবাচক বিশেষণ**ঃ (যে বিশেষণে বিশেষ্যের সঠিক গুণ প্রকাশ পায়) যেমন—**লাল** ফুল। **ভালো** ছেলে। **কুৎসিত** চেহারা। **ভাজা** মাছ। **টাটকা** খবর।

(২) **উপাদানবাচক-বিশেষণ**ঃ (বিশেষ্য কোন্ উপাদানে গঠিত যে-বিশেষণ তাহা প্রকাশ করে) যেমন—**বেলে** মাটি। **মেটে** হাঁড়ি। **কাঁসার** বাসন। **কাঠের** বাড়ি। **কাগজের** ফুল। **সোনার** হার।

(৩) **অবস্থাবাচক বিশেষণ**ঃ (যে-বিশেষণ বিশেষ্যের সঠিক অবস্থার পরিচয় দেয়) যেমন—**গরিব** মানুষ। **পয়সাওয়ালা** লোক। **ঘুমন্ত** শিশু। **পড়ন্ত** রোদ। **বাসী** কাপড়। **ফুটো** কলসী।

(৪) **সংখ্যাবাচক-বিশেষণ**ঃ (যে-বিশেষণ বিশেষ্যের নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করে) যেমন—**পাঁচটি** ছেলে। **একটি** মেয়ে। **দুই** টাকা। **বারো** মাসে, **তেরো** পার্বণ।

(৫) **পরিমাণবাচক-বিশেষণ**ঃ (যে-বিশেষণে বিশেষ্যের সঠিক কোনো পরিমাণ বুঝা যায়) যেমন—**কম** কাজ। **বেশী** দিন। **দ্বিগুণ** পরিশ্রম। **দশসের** আলু। **তিনভরি** সোনা।

(৬) **পূরণবাচক-বিশেষণ** (বা ক্রমবাচক-বিশেষণ)ঃ (যে-বিশেষণ বিশেষ্যের নির্দিষ্ট কোনো স্থান প্রকাশ করে) যেমন—**প্রথম** ছেলে। **মধ্যম** পাণ্ডব। **কনিষ্ঠ** পুত্র। **বিংশ** শতাব্দী। **সাতই** শ্রাবণ।

(৭) **সর্বনামীয়-বিশেষণ** (বা নির্দেশবাচক-বিশেষণ)ঃ (বিশেষণরূপে যে-সর্বনাম-পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসে) যেমন—যে ছেলে। **এই** বাড়ি। **সেই** দিন। **কোনো** কাজ। **তেমন** মানুষ। **আমার** টাকা।

(৮) **প্রশ্নবাচক-বিশেষণ**ঃ (প্রশ্নসূচক কোনো পদ যখন বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়) যেমন—**কী** বই? **কোন্** বাড়ি? **কত** লোক? **কেমন** মেয়ে?

(৯) **অব্যয়বাচক-বিশেষণ**ঃ (বিশেষণ-রূপে যে-অব্যয় বিশেষ্যের পূর্বে বসে) যেমন—**হঠাৎ** বাবু। **আকস্মিক** বিপদ। **তদানীন্তন** রাজ্যপাল। **সাক্ষাৎ** যম। **উপরি** পাওনা। **বাড়তি** কাজ।

(১০) **সংজ্ঞাবাচক-বিশেষণ**ঃ (যে-বিশেষণে বিশেষ্যের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রকাশ করে) যেমন—**ঢাকাই** পরোটা। **কটকী** শাড়ি। **ভারতীয়** ছাত্র। **কাবলী** জুতা।

(১১) **ধ্বন্যাত্মক-বিশেষণ** ঃ (ধ্বন্যাত্মক-শব্দ যখন বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়) যেমন—**গন্‌গনে** আগুন। **চট্‌পটে** মেয়ে। **কড়্‌কড়ে** ভাত। **নড়্‌বড়ে** দাঁত।

(১২) **কৃদন্ত-বিশেষণ** ঃ (কৃদন্ত-শব্দ দ্বারা গঠিত যে-বিশেষণ) যেমন—**বাড়ন্ত** গড়ন। **চলন্ত** ট্রেন। **ভীত** লোকটি। **পরিশ্রান্ত** শ্রমিক। **জানা** লোক।

(১৩) **তদ্ধিতান্ত-বিশেষণ** ঃ (তদ্ধিতান্ত-শব্দ দ্বারা গঠিত যে-বিশেষণ) যেমন—**জলীয়** বাষ্প। **সৌর** জগৎ। **বৈজ্ঞানিক** সত্য। **জাগতিক** সুখ। **ভৌগোলিক** তথ্য।

(১৪) **সমাসবদ্ধ-বিশেষণ** ঃ (সমাসবদ্ধ শব্দ দ্বারা গঠিত যে-বিশেষণ) যেমন—**শরণাগত** ব্যক্তি। **চরণাশ্রিত** ভৃত্য। **স্নেহমুগ্ধ** পুত্র। **মা-মরা** ছেলে। **গোয়াল-ভরা** গোরু। **হাতে গরম** নিমকি।

(১৫) **বহুপদময়-বিশেষণ** ঃ (বহু পদ দ্বারা গঠিত যে-বিশেষণ) যেমন—**নাম-না-জানা** ফুল। **বানের-জলে ভেসে আসা** মেয়েটি। **মায়ে তাড়ানো-বাপে-খেদানো** ছেলে।

(১৬) **বিধেয়-বিশেষণ** ঃ (বাক্যের বিধেয় অংশে যে-বিশেষণ থাকে) যেমন—তিনি আনন্দে **অধীর**। মা পুত্রশোকে **অস্থির**। রবীন্দ্রনাথ দেশের **গৌরব**।

(১৭) **বিশেষ্য-বিশেষণ** ঃ (যে বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়) যেমন—**মিথ্যা** কথা। **সত্য** ভাষণ। **দিন** মজুর। **শেষ** দিন। **পাপ** কাজ।

ক্রিয়া-বিশেষণ ঃ যে-বিশেষণ ক্রিয়ার প্রকৃতি বা অবস্থা সঠিকভাবে প্রকাশ করে, তাহাকেই বলে ক্রিয়া-বিশেষণ। ক্রিয়া-বিশেষণ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) **গুণবাচক** (বা অবস্থাবাচক) **ক্রিয়া-বিশেষণ** ঃ (যে-বিশেষণের সাহায্যে ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা বুঝা যায়) যেমন—**দ্রুত** চল। **জোরে** হাঁটিতেছে। **আস্তে** বলুন। **তাড়াতাড়ি** খাও।

(২) **কালবাচক** (বা সময়বাচক)-**ক্রিয়া-বিশেষণ** ঃ (যে-বিশেষণে ক্রিয়া-সংঘটনের সময় জানা যায়) যেমন—**সর্বদা** সত্য কথা বলিও। **কখন** দেখাবে? তুমি **যখন** আসবে, **তখন** তাকে সঙ্গে এনো।

(৩) **স্থানবাচক-ক্রিয়া-বিশেষণ** ঃ (যে-বিশেষণে ক্রিয়া-সংঘটনের স্থান জানা যায়) যেমন—**কোথায়** যাবে? **নিচে** এসো। **ওপরে** ওঠো।

ক্রিয়া-বিশেষণ নানাভাবে গঠিত হইতে পারে। যেমন—(ক) **মৌলিক শব্দযোগে** ঃ **সহসা** আসিল; **যুগপৎ** ভীত ও বিস্মিত হইলাম; **তাড়াতাড়ি** কর। (খ) **বিশেষ্য-পদের সঙ্গে 'এ'-বিভক্তি যোগে** ঃ **সুখে** আছ; **দুঃখে** কাঁদছি। (গ) **বিশেষণ বা**

সমাসবদ্ধ-পদের সঙ্গে 'এ'-বিভক্তি যোগ করিয়া : সে **নিরাপদে** পৌঁছিল ; **সযত্নে** উঠাও ; **প্রাণপণে** ধরিয়াছি। (ঘ) অ-সমাপিকা-ক্রিয়া-যোগে : সে **কাঁদিয়া** বলিল ; **বুঝে সুঝে** চলো ; **ঢেকেঢুকে** রাখো ; **হাসিয়া খেলিয়া** বেড়াইতেছে। (ঙ) ধ্বন্যাত্মক-শব্দযোগে : **গুরুগুরু** মেঘ ডাকে ; সে **ধেইধেই** নাচে ; শিশুটি **মিটিমিটি** চায় ; শিশির ঝরে **টুপ্‌টাপ**। (চ) **দ্বৈতশব্দযোগে :** (এই শ্রেণীর ক্রিয়া-বিশেষণকে বীপ্সামূলক ক্রিয়া-বিশেষণও বলা যায়) সে **পথে পথে** ঘোরে ; **ধীরে ধীরে** কথা বলে ; **ডুবেডুবে** জল খায় ; **আশায় আশায়** আছি। (ছ) মাত্র, পূর্বক, ক্রম প্রভৃতি অব্যয়-যোগে : **কহিবামাত্র** পলাইল ; **বিনয়পূর্বক** বলিতেছি ; **ঘটনাক্রমে** আসিয়াছি।

বিশেষণীয়-বিশেষণ : যে-বিশেষণ অপর কোনো বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাহাকেই বলা হয় বিশেষণীয় বিশেষণ। যেমন—রবি **খুব** চালাক ছেলে। অনিল আমার **একান্ত** আপনার জন। **অত** জোরে জোরে হাঁটতে পারি না। আপনার ছেলেটি তো **ডাহা** মিথ্যে কথা ব'লে গেল !

বিশেষণের তারতম্য : দুই বা তাহার অধিক কোনো বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের যে-তুলনা করা হয়, তাহাতেই বিশেষণের তারতম্য প্রকাশ পায়। তৎসম-শব্দের ক্ষেত্রে **তর, তম** বা **ঈয়স্‌, ইষ্ঠ** প্রত্যয় যোগ করিয়া এই তারতম্য দেখানো হইয়া থাকে। যেমন—মহৎ (মহান্‌)—**মহত্তর—মহত্তম** ; বৃহৎ—**বৃহত্তর—বৃহত্তম** ; লঘু—**লঘুতর - লঘুতম**। প্রিয়—**প্রিয়তর—প্রিয়তম** ; গুরু—**গুরুতর—গুরুতম** কিংবা **গরীয়স্‌** (গরীয়ান্‌)—**গরিষ্ঠ** ; অল্প—**অল্পীয়স্‌** (অল্পীয়ান্‌)—**অল্পিষ্ঠ** কিংবা **কনীয়স্‌** (কনীয়ান্‌)—**কনিষ্ঠ**। চলিত-বাংলায় সাধারণত **অধিক, অপেক্ষা, চেয়ে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক, সবচেয়ে, সকলের চেয়ে** প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ যোগ করিয়া বিশেষণের তারতম্য দেখানো হয়। যেমন—রমেশ ও দেবেশের মধ্যে রমেশই **অধিক** বলবান। ইহা **অপেক্ষা** আর কি ভালো সম্ভব ? আধুনিক গানের **চেয়ে** মার্গসঙ্গীতই আমার পছন্দ। বয়সে সে **সবার চেয়ে** বড়। **সবচেয়ে** বড় মাছটা শান্তনুকেই দাও।

সর্বনাম

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে-পদ ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলা হয় **সর্বনাম**। যেমন—**শৈলেন** (বিশেষ্য) আমার বন্ধু। **সে** (সর্বনাম) কানপুরে থাকে। কিংবা, **আমি** (**সর্বনাম**) **নরেন্দ্রনাথ** বিশ্বাস (বিশেষ্য) নামে পরিচিত।

পুরুষ-ভেদে সর্বনাম তিন শ্রেণীয়। **উত্তম-পুরুষের সর্বনাম**—আমি (আমরা), মুই (মোরা) ; **মধ্যম-পুরুষের সর্বনাম**—তুমি (তোমরা), তুই (তোরা), আপনি (আপনারা) ; **প্রথম-পুরুষের সর্বনাম**—সে (তাহারা, তারা), তিনি (তাঁহারা, তাঁরা)। (যাবতীয় বিশেষ্য পদ প্রথম-পুরুষের অন্তর্গত।)

সর্বনাম-পদকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **ব্যক্তিবাচক** (বা পুরুষবাচক)-**সর্বনাম :** আমি, তুমি, সে, আপনি প্রভৃতি।

(২) **নির্দেশবাচক** (বা নিশ্চয়সূচক)-**সর্বনাম :** ইনি, উনি, এটি, ইহা, এ, ও প্রভৃতি।

(৩) **অনির্দেশক** (বা অনিশ্চয়সূচক)-**সর্বনাম :** কেহ, কেউ, কিছু, কেহ কেহ, কেউ কেউ প্রভৃতি।

(৪) **সাপেক্ষ** (বা সমুচ্চয়ী)-**সর্বনাম** : যত—তত ; যিনি—তিনিই ; যেটা—সেটা প্রভৃতি।

(৫) **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** কে, কি, কাকে, কাহাকে, কি-কি, কোন্-কোন্, কাহারা, কারা প্রভৃতি।

(৬) **আত্মবাচক-সর্বনাম** : আপনি, নিজ, স্বয়ং, খোদ প্রভৃতি।

(৭) **ব্যতিহারিক** (বা পারস্পরিক)-**সর্বনাম :** আপনি-আপনি, আপসে, নিজেই প্রভৃতি।

(৮) **সাকল্যবাচক-সর্বনাম :** সকল, সব, সমস্ত, উভয় প্রভৃতি।

অব্যয়

সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে, যে-পদের কোনো অবস্থাতেই কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, লিঙ্গ, বচন ও কারক-বিভক্তিতে অবিকৃত থাকে তাহাকেই বলা হয় **অব্যয়**। যদ্যপি, যদি, যাবৎ, এবং, বরং, সুতরাং, কিংবা, তথাপি, তত্রাচ, কিন্তু, যথা প্রভৃতি শব্দ তৎসম বা তদ্ভব অব্যয়। আর খাঁটি বাংলা-অব্যয় বলিতে বুঝায়—ও, আর, তবু, তাই, হাঁ, না, কি প্রভৃতি শব্দ।

অব্যয়কে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **পদান্বয়ী-অব্যয় :** (যে-অব্যয় এক পদের সহিত অন্য পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন করে) যেমন—যদু **আর** মধু দুই ভাই। দরিদ্রের নিকট শীত **এবং** গ্রীষ্ম দুই-ই সমান। সে আমার **সঙ্গে** পড়ে। তাহার **সহিত** আপনার কি সম্পর্ক ? সে **যেন** আমাকেই খুঁজছে!

(২) **বাক্যান্বয়ী** (বা সমুচ্চয়ী)-**অব্যয়ঃ** যে-অব্যয় বাক্যের সংযোগ, বিয়োগ, সংকোচন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন—নরেন সামান্য এক কেরানী, **কিন্তু** ভাব দেখায় কত বড়লোক! এই শ্রেণীর অব্যয়কে আবার সাত ভাগে ভাগ করা চলে। যেমন—

(ক) **সংযোজক-অব্যয়**—রাম দিনে অফিসে কাজ করে, **এবং** রাত্রে ছেলে পড়ায়। (এবং, ও, আর প্রভৃতি।)

(খ) **বিয়োজক-অব্যয়**—তুমি এখন যাবে, **না** আমিই যাব? (না, বা, অথবা, কিংবা প্রভৃতি)।

(গ) **সংকোচসাধক-অব্যয়**—টাকা নেই, **অথচ** বাবুগিরি তো বেশ করছ। (অথচ, কিন্তু, তবু, তথাপি, আবার, বরং, বরঞ্চ, পক্ষান্তরে প্রভৃতি।)

(ঘ) **হেতুবাচক** (বা কারণাত্মক)-**অব্যয়**—পণ্ডিত রবিশঙ্কর কলকাতায় এসেছেন, **তাই** জলসার আয়োজন করা হয়েছে। (তাই, কারণ, যে-হেতু, বলিয়া প্রভৃতি।)

(ঙ) **সিদ্ধান্তবাচক-অব্যয়**—এখানে চোরের বড় ভয়, **কাজেই** দরজা খুলে শুয়ো না। (কাজেই, তাই, অতএব, সুতরাং প্রভৃতি।)

(চ) **সংশয়বাচক-অব্যয়**—সে **যদি** হঠাৎ চ'লে যায়, তখন কী করবে? (যদি, যদ্যপি প্রভৃতি।)

(ছ) **সাপেক্ষ-অব্যয়**—**যেমন** বাপ, তার **তেমন** ছেলে! (যেমন—তেমন, যদি—তবেই, যদি—তবুও, পাছে—তাই, বটে—কিন্তু প্রভৃতি।)

(৩) **অনন্বয়ী-অব্যয়ঃ** যে অব্যয়ের সহিত বাক্যের অন্যান্য পদের ব্যাকরণগত কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে না, তাহাকেই বলা হয় অনন্বয়ী অব্যয়। এই শ্রেণীর অব্যয়ের মধ্যে পড়ে—

(ক) **সম্বোধনসূচক-অব্যয়**—**ওরে**, তোরা কি আজ কাজে যাবি না? (ওরে, ওলো, ওহে, হে, ওগো, অয়ি, হ্যাঁগা, হ্যাঁগো, হে, রে প্রভৃতি।)

(খ) **ভাবদ্যোতক-অব্যয়**—**ছি ছি**, তোর কাণ্ডকারখানা দেখে লজ্জায় যে ম'রে যাই! (ছি ছি, মরি মরি, হায় হায়, বাপ্‌রে-বাপ্, বাবা-রে-বাবা, ওরে বাবা, ইস্, বাপ্‌স্, প্রভৃতি।)

(গ) **প্রশ্নবোধক-অব্যয়**—সে খায়নি তো, আমি **কী** করব? (কি, কী, কেন, নাকি প্রভৃতি।)

(ঘ) **বাক্যালঙ্কার-অব্যয়**—সেই **তো** আমার আপনার জন। (তো, না, না না, গো প্রভৃতি।)

(৪) **অনুসর্গ অব্যয়ঃ** বিভক্তি রূপে যে-অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম-পদের পরে বসে, তাহাকেই বলা হয় অনুসর্গ-অব্যয়। (ইহাকে **কর্মপ্রবচনীয় অব্যয়**-ও বলা হয়)। যেমন—তিনি কলম **দিয়ে** লিখছেন। (দিয়ে, দ্বারা, কর্তৃক, হইতে, হ'তে, চেয়ে প্রভৃতি।)

(৫) **উপসর্গ-অব্যয়ঃ** প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি উপসর্গ। ইহারা ধাতুর পূর্বে বসে এবং তাহাদের নানাভাবে বৈশিষ্ট্য দান করে।

(৬) **ধ্বন্যাত্মক** (বা অনুকারাত্মক)-**অব্যয়ঃ** ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিই অব্যয়রূপে গণ্য হইয়া থাকে। যেমন—ঝর্‌ঝর্, ঝুর্‌ঝুর্, কল্‌কল্, কুল্‌কুল্, হন্‌হন্, ভন্‌ভন্, **খাঁ খাঁ**, ঝাঁ ঝাঁ প্রভৃতি।

(৭) **উপমাসূচক-অব্যয়ঃ** উপমা বা তুলনাসূচক কতকগুলি শব্দকেও অব্যয়রূপে গণ্য করা হয়। যেমন—ন্যায়, মতন, তদ্রূপ, সেইরূপ, যেমন, মতো প্রভৃতি।

(৮) **নিষেধসূচক অব্যয়ঃ** যে অব্যয় নিষেধ সূচনা করে। যেমন—না, নয়, নাই, নহে প্রভৃতি।

অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগঃ একই অব্যয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—

ইঃ (১) নরেন খেলিবে**ই** (নিশ্চয়-অর্থে); (২) চিঠি লিখলে**ই** জানা যাবে (হেতু অর্থে); (৩) কাজটা শেষ হইলে**ই** হলো (উদ্দেশ্যপূরণ অর্থে); (৪) সাত**ই** মাঘ তার বিয়ে (পূরণবাচক বিশেষণ অর্থে); (৫) তপস্যা**ই** সিদ্ধি আনতে পারে (নির্দেশ অর্থে); (৬) আহা, কি কাণ্ড**ই** করলে বাছা! (শ্লেষ অর্থে); (৭) বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছে**ই**! (অবিচ্ছিন্ন অর্থে); (৮) বাজ পড়তে**ই** সে চমকে উঠ্‌লো (নির্দিষ্ট সময়ে অর্থে) প্রভৃতি।

ওঃ (১) লাল **ও** দুলালী পড়তে বসলো (এবং অর্থে), (২) তাকে আমি চিনতে**ও** পারিনি (আদৌ অর্থে); (৩) বাবা বলতে**ও** সে শুনলে না (তথাপি অর্থে); (৪) মায়া বড় ভালো মেয়ে, একটা জিনিস**ও** তার হাতে ভাঙে না (নির্দেশ অর্থে); (৫) সে এমন কুঁড়ে যে, খেলতে যেতে**ও** চায় না! (এমন কি অর্থে); (৬) তিনি খেলে**ও** খেতে পারেন (হয়তো অর্থে); (৭) **ও** যদু, কোথায় গেলি বাপু? (সম্বোধন অর্থে); (৮) যাব যাব করে**ও** সে দেখি নড়তে চায় না (কার্য-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা অর্থে) প্রভৃতি।

কিঃ (১) তুমি খাবে **কি**? (প্রশ্ন অর্থে); (২) তুমি **কি** (কী) বই পড়ছ? (নির্দিষ্ট কোনো কিছু অর্থে); (৩) মানুষটা কোমল **কি** কঠোর বোঝা

দায়! (অথবা অর্থে); (৪) সে এখন কোথায় আছে, আমি তার **কি** (কী) জানি? (নেতিবাচক অর্থে); (৫) লেখার **কি** ছিরি! (শ্লেষ অর্থে); (৬) আকাশের রঙটা **কি** অপরূপ! (প্রশংসা অর্থে); (৭) **কি**, এত বড আস্পর্ধা! (বিস্ময় বা খেদ অর্থে); (৮) কাজটা করবে **কি** না বল (বিতর্ক অর্থে); (৯) **কি** দাদা, ভালো আছেন তো? (সম্বোধন অর্থে); (১০) সাধ্য **কি** সে পারে (অনিশ্চয়তা অর্থে), প্রভৃতি।

বাঃ (১) নরেশ **বা** পরেশ একজন হইলেই হ'লো (অথবা অর্থে); (২) কেউ **বা** গান করে, কেউ বাগান করে (অনিশ্চয়তা অর্থে); (৩) ধোপা এলে টাকা দিতে হবে, তারই **বা** কি (সিদ্ধান্ত অর্থে); (৪) ধরো সেই যেন এলো, তাতেই **বা** এগোল কি? (উপেক্ষা অর্থে); (৫) তুমি বলছিলে, হবেও, **বা**! (সংশয়-যুক্ত স্বীকারোক্তিতে); (৬) **বা**, তোমাকেই না বললাম! (লঘু-তিরস্কার অর্থে) প্রভৃতি।

নাঃ (১) সে আসবে **না** (নিশ্চিত 'না' অর্থে); (২) **না**, তোমাকে বলব কেন! (শ্লেষ অর্থে); (৩) কিরে খেতে বসবি **না**? (প্রশ্ন অর্থে); (৪) **না** হলো বাজার, **না** হলো রান্না! (খেদ অর্থে); (৫) যা **না** বাপু, লক্ষ্মীটি (অনুজ্ঞাসূচক 'হাঁ' অর্থে); (৬) পুজোয় এবার দিল্লী যাবে **না** বোম্বাই? (বিকল্প অর্থে); (৭) কত **না** খাটিয়ে নিলাম তোমাকে দিয়ে (আতিশয্য অর্থে); (৮) মা বললে, আমি আর **না** করতে পারি না (বিশেষ্য অর্থে); (৯) সেই কথা **না** বলে সে তো পগার-পার! (বাক্যালঙ্কারে); (১০) দেশের উন্নতি কিসে, **না** শিক্ষার প্রসারে (উত্তরসূচক 'হাঁ' অর্থে); (১১) যতই দাও **না** কেন, আশা তার ফুরাবে না (নির্বন্ধ অর্থে); (১২) কেরে, মণি **না** কি? (সন্দেহার্থক উক্তিতে) প্রভৃতি।

তোঃ (১) আমি দিতেই চাই, তারা **তো** নিচ্ছে না (কিন্তু অর্থে); (২) কিগো, সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে **তো**? (প্রশ্ন অর্থে); (৩) অনিল **তো** সুস্থ আছে? (নির্দিষ্ট কোনো কিছুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অর্থে); (৪) হলো **তো** এতক্ষণে! (উদ্দেশ্যপূরণ অর্থে); (৫) না নিয়ে থাক **তো** স্পষ্ট ব'লে ফেল (যদি অর্থে); (৬) লিখব **তো** বলছি, সময় কোথায়? (বটে অর্থে); (৭) যা **তো** বাপু, একছুটে নিয়ে আয় (অনুজ্ঞা অর্থে) প্রভৃতি।

যেঃ (১) **যে** রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? (সর্বনাম অর্থে); (২) **যে** মানুষ এত কথা বলতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা শক্ত (বিশেষণ অর্থে); (৩) তুমি **যে** বললে দেবে, তাই তো নিতে এসেছি (হেতু অর্থে); (৪) গান **যে** হঠাৎ থামিয়ে দিলে! (বিস্ময় অর্থে); (৫) তাকে নেহাত **যে-সে** লোক ভেব না

(সামান্য অর্থে) ; (৬) গৌর এসে বললে **যে,** এ সময় তার পক্ষে দিল্লী যাওয়া সম্ভব নয় (বাক্যের সংযোগে) প্রভৃতি।

আর : (১) বাজার থেকে মাছ **আর** মাংস দুই-ই আসবে (এবং অর্থে) ; (২) দাদু আছেন, **আর** কেউ বাড়িতে নেই (অপর অর্থে) ; (৩) হোক **আর** নাই হোক, কাজটা ক'রে দেখতে দোষ কি (অথবা অর্থে) ; (৪) **আর** দু'দিন থেকেই যাও না (আরও অধিক অর্থে) ; (৫) **আর** বছর এমন দিনেই সে এসেছিল (গত অর্থে) ; (৬) দুধের সাধ কি **আর** ঘোলে মিটে (কখনও অর্থে) ; (৭) এই শেষ, তোমার সঙ্গে **আর** কথা বলব না (পুনরায় অর্থে) ; (৮) আমিও গেলাম, **আর** ট্রেনটা ছেড়ে দিল (অব্যবহিত পরে অর্থে) ; (৯) সেই যে গেল, **আর** ফেরবার নামটি নেই ! (তদবধি অর্থে) ; (১০) কালাপদ কি **আর** তোমাকে কিছু বলে ? (বাক্যালঙ্কারে) প্রভৃতি।

ক্রিয়াপদ

যে-পদে কোনো কাজ করা বুঝায় তাহাকেই বলা হয় **ক্রিয়াপদ**। যেমন—সে **পড়ে**। তুমি **হাসিতেছ**। আমি **আসিয়াছি**। তিনি **গেলেন**। বইটি এখানেই **আছে**। মায়া এখন বাড়ি **যাবে**। মা হয়তো **ব'লে থাকবেন**। ইত্যাদি।

ধাতু ও প্রত্যয় : ক্রিয়াপদের মূলকে বলা হয় **ধাতু**। যেমন, 'যাই' ক্রিয়াপদ আর 'যা' হইল ধাতু ; 'করিল'—ক্রিয়াপদ, আর 'কর্' হইল ধাতু। ধাতু প্রধানত তিন প্রকার—(১) **সিদ্ধ ধাতু** (বা মৌলিক), (২) **সাধিত-ধাতু,** (৩) **সংযোগ-মূলক-ধাতু**। ধাতুর শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয় তাহাকে বলা হয় **প্রত্যয়**। যেমন—বল্+অা=(বলা) ; খা+**ওয়া**=(খাওয়া) প্রভৃতি।

সিদ্ধ ও (বা মৌলিক)-ধাতু : যে-সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, অর্থাৎ মৌলিক তাহাদের বলা হয় **সিদ্ধ-ধাতু** বা মৌলিক-ধাতু। এই জাতীয় ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সিদ্ধ-ধাতু আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন, (১) **তৎসম** (বা সংস্কৃতমূলক)—ভজ্, সাধ্ চল্ প্রভৃতি ; (২) **তদ্ভব ধাতু**—পড়্ (<পঠ্), কর্ (<কৃ) প্রভৃতি ; (৩) **খাঁটি বাংলা ধাতু**—বল্, নাচ্, ফেল্, ঠেল্, মর্, খা, থাক্ প্রভৃতি। (৪) **পদ্যে ব্যবহৃত ধাতু**—স্মর্, ত্যজ, সেব্ প্রভৃতি।

সাধিত-ধাতু : যে-সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্য কোনো ধাতু, নামশব্দ, প্রত্যয় প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের বলা হয় **সাধিত-ধাতু**। যেমন—বলা ('বল্' ধাতু+'আ' প্রত্যয়='বলা' ধাতু) ; দেওয়া ('দে' ধাতু+'ওয়া'-প্রত্যয়='দেওয়া' ধাতু

প্রভৃতি। এই জাতীয় ধাতুকে আবার তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) **প্রযোজক** (বা ণিজন্ত) ধাতু; (২) **ধ্বন্যাত্মক** ধাতু ও (৩) **নামধাতু**।

(ক) **প্রযোজক ধাতু:** মৌলিক কোনো ধাতুর শেষে **আ** বা **ওয়া** প্রত্যয় যোগ করিলেই এই ধাতু গঠিত হয়। যেমন—কর্+আ=করা, খা+ওয়া=খাওয়া।

(খ) **ধ্বন্যাত্মক-ধাতু:** যে সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক-ধাতু বলে। যেমন—হাঁচ্, খ্যাঁক্, ধুঁক্, ফট্ প্রভৃতি। ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে **আ** প্রত্যয় যোগ করিয়াও এই শ্রেণীর ধাতু গঠিত হয়। যেমন—মচমচ্+আ=মচমচা; গুন্‌গুন্+আ=গুন্‌গুনা; ধুঁক+আ=ধুঁকা; হাঁপ্+আ=হাঁপা প্রভৃতি।

(৩) **নামধাতু:** সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণের শেষে আ-প্রত্যয় যোগে যে-ধাতু গঠিত হয় তাহাকেই বলা হয় নামধাতু। যেমন—ঘুম্+আ=ঘুমা; চমক্+আ=চমকা; আটক্+আ=আটকা; আগল্+আ=আগলা; ঘন+আ=ঘনা; রাঙ+আ=রাঙা প্রভৃতি। [এইরূপ ধাতু হইতে ঘুমায়, ঘুমিয়ে, চমকায়, চমকিয়ে, আটকায়, আটকিয়ে, আটকে, আগলায়, আগলিয়ে, ঘনায়, ঘনিয়ে, রাঙিয়ে প্রভৃতি ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।]

[সাধিত-ধাতু হিসাবে আর একপ্রকার ধাতুর নাম করা যায়। তাহা হইল—**কর্মবাচ্যের ধাতু**। সে-ধাতুও 'আ'-প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়। যেমন—মান্+আ=মানা; শোন্+আ=শোনা প্রভৃতি।]

সংযোগমূলক-ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কর্, পা, গা, হ প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়া বাংলায় এক বিশেষশ্রেণীর ধাতু গঠিত হয় তাহারাই সংযোগমূলক-ধাতু নামে পরিচিত। যেমন—সেবন কর্, দান কর্, বৃদ্ধি পা, গান গা, সোজা হ' প্রভৃতি। [ক্রিয়াপদ যেমন—বায়ু সেবন করুন; অন্ন দান করিবেন। এই জাতীয় ক্রিয়াপদকে আবার—বায়ু-সেবন করুন; অন্ন-দান করিবেন, এভাবেও লেখা চলে।]

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া: কোনো বস্তু বা ব্যক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্তার যে-ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে না (অর্থাৎ যে-ক্রিয়ার ব্যাপার কর্তা হইতে অপর কোনো বস্তু বা ব্যক্তির আশ্রয়-গ্রহণ করে), তাহা **সকর্মক ক্রিয়া**। যেমন—নরেন **বই পড়ে**। (নরেন কী পড়ে? না, বই। অতএব, 'পড়ে'-ক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্ম হইতেছে 'বই'।) আলী আকবর স্বরদ **বাজাইতেছেন**। (আলী আকবর কী বাজাইতেছেন? না, স্বরদ। অতএব, 'বাজাইতেছেন' (<'বাজা') ক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্ম হইতেছে 'স্বরদ'।)

[কোনো কোনো সকর্মক-ক্রিয়ার আবার দুইটি করিয়া আশ্রয় বা কর্ম থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে, ঐ-রূপ সকর্মক-ক্রিয়াকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**-ও বলা যাইতে পারে। যেমন—গজেনবাবু **ভানু**-কে একটি **উপন্যাস** দিলেন। এখানে 'দিলেন'-ক্রিয়া দ্বিকর্মক। কারণ, কাহাকে দিলেন ? না, 'ভানু'-কে। অতএব, 'ভানু' একটি কর্ম। আর, কী দিলেন ? না, 'উপন্যাস'। অতএব 'উপন্যাস' দ্বিতীয় কর্ম। **কী অথবা কাহাকে**—এইরূপ একটি প্রশ্নের উত্তর যখন একটি ক্রিয়ার বাক্যে দেওয়া থাকে তখন সেই ক্রিয়া সাধারণভাবে সকর্মক-ক্রিয়া। আর, **কী এবং কাহাকে**—এইরূপ দুইটি প্রশ্নের জবাবই যখন একই ক্রিয়ার বাক্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই ক্রিয়া দ্বিকর্মক-ক্রিয়া। দ্বিকর্মক-ক্রিয়ার একটি বস্তুবাচক, অপরটি ব্যক্তিবাচক। যেমন—মিনতি চারুকে চিঠি লিখেছে। এখানে, 'লিখেছে' এই ক্রিয়ার দুইটি কর্ম—(১) চারু, (২) চিঠি। 'চারু' হইল 'ব্যক্তিবাচক-কর্ম' ; আর, চিঠি 'বস্তুবাচক-কর্ম'। ব্যাকরণে, ক্রিয়ার **বস্তুবাচক-কর্মকেই 'মুখ্য-কর্ম'** এবং **ব্যক্তিবাচক কর্মকে 'গৌণ-কর্ম'**-রূপে গণ্য করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, একটি সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি মুখ্যকর্ম থাকিতে পারে। যেমন—বাবা **আম** ও **জাম** দুই-ই কিনলেন। আবার, দুইটি গৌণকর্মও থাকে। যেমন—মা **ছেলেকে** আর **মেয়েকে** আলাদা ক'রে দেখেন না। ক্ষেত্রবিশেষে, ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মপদ যোগ করিলেও বাক্য হয়তো সম্পূর্ণ হয় না। সেক্ষেত্রে, বাক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রথম কর্মপদের উপর আর একটি কর্ম আনিয়া বসাইতে হয়। তখন, প্রথম কর্মপদকে বলা হয়—**উদ্দেশ্য-কর্ম**, আর আরোপিত দ্বিতীয় কর্মটি **বিধেয়-কর্ম** নামে অভিহিত হয়। যেমন—থিয়েটারে পাঁচুগোপাল জমকালো পোশাক পরিয়ে **ননীগোপালকে** (উদ্দেশ্য-কর্ম) **রাজা** (বিধেয়-কর্ম) সাজাল।]

অপরদিকে, কর্তার যে-ক্রিয়া কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়াই সংঘটিত হইতে পারে (অর্থাৎ যে-ক্রিয়া কেবল কর্তাকে অবলম্বন করিয়াই সম্পন্ন হয়, বা ক্রিয়ার কর্তা ব্যতীত কোনো কর্ম থাকে না), তাহাই **অকর্মক-ক্রিয়া**। যেমন—বৃষ্টি **পড়িতেছে**। সুনীল **কাঁদিতেছে**। পাখিরা **উড়িল**। কানাই **আসিয়াছে**। এখানে, পড়িতেছে, কাঁদিতেছে, উড়িল, আসিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদ কেবল কর্তাকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত, উহাদের অপর কোনো আশ্রয় বা কর্ম নাই। কাজেই, ঐ-সকল ক্রিয়াপদ অকর্মক।

[ক্ষেত্রবিশেষে, সকর্মক-ক্রিয়া অকর্মকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—'পড়ে'-ক্রিয়া সকর্মক। কিন্তু, যদি বলা হয়—'বৃষ্টি পড়ে' সেক্ষেত্রে 'পড়ে' অকর্মক। সেইরূপ, 'খাই'-ক্রিয়া সকর্মক। কিন্তু, 'বাঁচবার জন্যই খাই' বলিলে তাহা

অকর্মক। অকর্মক-ক্রিয়াও আবার সকর্মক-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—বাজনা বাজালে বটে! সে এমন হাসি হাসল যে, পিলে চমকে ওঠে! এখানে, 'বাজালে' ও 'হাসল' (অর্থাৎ, বাজা' ও 'হাসা') এই দুইটি অকর্মক-ক্রিয়া সকর্মকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, 'বাজালে'-ক্রিয়ার কর্ম 'বাজনা' এবং 'হাসল'-ক্রিয়ার কর্ম 'হাসি'। এই শ্রেণীর কর্মকে **সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম** বলা হয়।]

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া:

যে-ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে তাহা **সমাপিকা-ক্রিয়া,** এবং যে-ক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না এবং অর্থ সম্পূর্ণ করিতে অন্য কোনো ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাকেই বলে **অসমাপিকা-ক্রিয়া**। যেমন—প্রফুল্ল এইমাত্র **আসিল** (সমাপিকা)। প্রফুল্ল **আসিয়া** (অসমাপিকা) আবার **চলিয়া** (অসমাপিকা) গেল (সমাপিকা)। [সেইরূপ, খায়, খাইল, খাইতেছে, খাইয়াছে, খাইতেছিল, খাইব প্রভৃতি সমাপিকা-ক্রিয়া; আর খাইয়া, খাইতে, খাইলে প্রভৃতি অসমাপিকা-ক্রিয়া।] ধাতুর সহিত **ইয়া**, **ইতে**, **ইলে** এই তিনটি প্রত্যয় যোগ করিলে অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

'ইয়া': ধাতুর শেষে 'ইয়া'-প্রত্যয় যোগ করিয়া যে-অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে **কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা-ক্রিয়া**। বাক্যে এই জাতীয় অসমাপিকা-ক্রিয়ার কর্তা ও সমাপিকা-ক্রিয়ার কর্তা একই থাকে। যেমন—আনন্দ **কাঁদিয়া** সারা হইল। ডাক্তার **আসিয়া** রোগী দেখিলেন। যমুনা লহর **তুলিয়া** ছুটিতেছে। বাসনপত্র **পড়িয়া ভাঙিয়া** গেল।

'ইলে': ধাতুর শেষে 'ইলে'-প্রত্যয় যোগ করিয়া যে-অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহার কর্তা যদি সমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত এক না হয়, সেক্ষেত্রে তাহাকে বলা হয় **অন্যাশ্রয়ী-অসমাপিকা-ক্রিয়া**। যেমন—তুমি **আসিলে** আমি সুখী হইব। আজ টাকা না **পাইলে**, আমি বিপদে পড়িব। তারিণীবাবু চিঠি **লিখিলে** বারীনবাবু এলাহাবাদ রওনা হইবেন।

'ইতে': ধাতুর শেষে 'ইতে'-প্রত্যয় যোগ করিয়া যে-অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **নিমিত্তার্থক** (বা **উদ্দেশ্যার্থক**)-**অসমাপিকা-ক্রিয়া**। যেমন—গৌর **পড়িতে** বসিয়াছে। জনার্দন কাপড় **কিনিতে** বাজারে গেল। প্রমথবাবু গান **গাহিতে** অনিচ্ছুক। এই শ্রেণীর অসমাপিকা-ক্রিয়াকে **ক্রিয়াবাচক-বিশেষণ** বলিলেও ভুল হয় না। যেমন—তাকে একটা গান **গাইতে** (গাহিতে) বলো না।

[ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় নানাভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে।

নিমিত্তার্থে ইয়া-প্রত্যয়—রৌদ্র **লাগিয়া** জিনিসটির রঙ্ বদলাইয়াছে। সে **কাঁদিয়া** সকলকে কাঁদাইল। বৃষ্টি **নামিয়া** সব যেন ভাসাইয়া দিল।

করণ অর্থে ইয়া-প্রত্যয়—জল **ছিটাইয়া** আসন বিছাও।

অধিকরণ অর্থে ইয়া-প্রত্যয়—আপনি **বসিয়া** (বসা অবস্থা) সবদিকে নজর রাখুন। যখন একই কর্তা একাধিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তখন সমাপিকা-ক্রিয়ার পূর্বস্থিত অসমাপিকা-ক্রিয়াগুলির শেষে ইয়া-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—সুমথবাবু গান **গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া,** সর্বশেষে কবিতা আবৃত্তি **করিয়া** আসর জমাইলেন। সমাপিকা-ক্রিয়ায় অনিষ্পত্তি বুঝাইতে পূর্ববর্তী অসমাপিকা-ক্রিয়ার শেষে ইলে-প্রত্যয় বসে। যেমন—মায়া **আসিলে** বেলা যাইত। ভাবার্থে ইলে-প্রত্যয়—জল **ধরিলে** আবার বাহির হইব। ইচ্ছা অর্থে ইতে-প্রত্যয়—আমি আজ **খেলিতে** চাই। সে এখন কথা **বলিতে** পারে না। সামর্থ্য-অর্থে ইতে-প্রত্যয়—আপনার ন্যায় লোক **থাকিতে** চাকুরিটি হইবে না? আবশ্যক-অর্থে ইতে-প্রত্যয়—জ্ঞানলাভের জন্যই **পড়িতে** হয়। প্রাণধারণের জন্যই **খাইতে** হয়। ইত্যাদি।]

চলিতভাষায় ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় যথাক্রমে এ, লে, তে প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং পূর্ববর্তী ধাতুরও কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন—**ইয়া>এ :** করিয়া (কর্+ইয়া) = **ক'রে** (কর্+এ) ; বলিয়া (বল্+ইয়া) = **ব'লে** (বল্+এ) ; পড়িয়া (পড়্+ইয়া) = **প'ড়ে** (পড়্+এ)। সেইরকম—আসিয়া>**এসে** ; হাসিয়া>**হেসে** ; কাঁদিয়া>**কেঁদে** ; দেখিয়া>**দেখে** ; শুনিয়া>**শুনে** ; উঠিয়া>**উঠে** ইত্যাদি। [আস্+এ হওয়া উচিত 'আসে' কিন্তু অসমাপিকা-রূপে হয় 'এসে'। হেসে, কেঁদে প্রভৃতি ক্রিয়া সেইভাবেই গঠিত।] **ইলে>লে :** করিলে (কর্+ইলে) = **করলে** (কর্+লে) ; বিঁধিলে (বিঁধ্+ইলে) = **বিঁধলে** (বিঁধ্+লে) ; কমিলে (কম্+ইলে) = **কমলে** (কম্+লে)। সেইরকম—বলিলে>বললে ; চলিলে>চললে ; বাজিলে>**বাজলে**। অর্থাৎ, ইলে-প্রত্যয়ের **'ই'** লোপ পায়, থাকে শুধু **'লে'**। **ইতে>তে :** করিতে (কর্+ইতে) = **করতে** (কর্+তে) ; পড়িতে (পড়্+ইতে) = **পড়তে** (পড়্+তে) ; দেখিতে (দেখ্+ইতে) = **দেখতে** (দেখ্+তে)। সেইরকম—হাসিতে>হাসতে ; ভাসিতে>ভাসতে ; আনিতে>আনতে, ধরিতে> ধরতে ; অর্থাৎ ইতে-প্রত্যয়ের 'ই' লোপ পায়, থাকে শুধু 'তে'।

ণিজন্ত-ক্রিয়া :

আর এক শ্রেণীর সমাপিকা ক্রিয়া আছে, যে-সকল ক্রিয়ার কাজ একজনের প্রেরণায় বা চালনায় অপর একজন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সেই শ্রেণীর ক্রিয়াকে

বলা হয় **ণিজন্ত-ক্রিয়া বা প্রযোজক-ক্রিয়া।** যেমন—হেমন্ত আমার ছেলেকে **পড়াইয়াছে।** মা শিশুটিকে চাঁদ **দেখাইতেছেন।** অজিত কথার মারপ্যাচে সকলকে বেশ **হাসায়।** চাষীরা গোরু দিয়ে ধান **মাড়ায়।**

মৌলিক-ক্রিয়া ও যৌগিক-ক্রিয়া ঃ

মূল-ধাতু (যেমন, কর্, চল্, খা, চাহ্ প্রভৃতি)-র সঙ্গে বিভক্তি-যোগে (যেমন, ইতেছে, ইতেছ, ইতেছি, ইয়াছে, ইয়াছ, ইয়াছি, ইল, ইব, য়, এ, ই প্রভৃতি) যে-সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাদের বলা হয় **মৌলিক-ক্রিয়া।** যেমন—কর্+এ=**করে** ; কর্+ইল=**করিল** ; কর্+ইব=**করিব** ; কর্+ইতেছে=**করিতেছে** ; কর্+ইয়াছি=**করিয়াছি** ; খা+য়=**খায়** ; খা+ইল=**খাইল** ; খা+ইব=**খাইব** ; খা+ইতেছি=**খাইতেছি** ; চাহ্+ইল=**চাহিল** (চাইল) ; চাহ্+এ=**চাহে** (চায়) প্রভৃতি। ইয়া বা ইতে প্রত্যয়যুক্ত কোনো অসমাপিকা-ক্রিয়া যখন একটি সমাপিকা-ক্রিয়ার পূর্বে বসে, এবং উভয়ে মিলিয়া একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তখন ঐ মিলিত ক্রিয়াকে বলা হয় **যৌগিক-ক্রিয়া।** যেমন—পরেশ **চাহিয়া রহিল।** জলে নৌকা **ভাসিয়া চলিল।** ভারতবাসী নূতন এক ভারতবর্ষ **গড়িয়া তুলিবে।** তুমি কি **খাইতে চাও**? সে কেবল **হাসিতে থাকে**; এবার তাহাকে **আনিতে যাই।** [চলিতভাষায় এই সকল যৌগিক-ক্রিয়া হইবে—**চেয়ে রইল; ভেসে চল্ল; গ'ড়ে তুলবে; খেতে চাও; হাসতে থাকে; আনতে যাই** প্রভৃতি। পূর্বে আমরা যাহাকে সংযোগমূলক-ক্রিয়া বলিয়াছি, অনেকে আবার তাহাকেও যৌগিক-ক্রিয়ার পর্যায়েই ফেলিয়াছেন। যেমন—গ্রহণ করা; প্রকাশ পাওয়া; মত্ত হওয়া; হাত চালানো; লম্বা দেওয়া; ছটফট করা প্রভৃতি। কিন্তু, উহাদের এই পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে সমাপিকা-ক্রিয়ার পূর্বে কোনো অসমাপিকা-ক্রিয়া থাকে না, থাকে—কোনো বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা কোনো কৃদন্ত-শব্দ। বাংলায় আর একশ্রেণীর মিলিত অসমাপিকা-ক্রিয়া আছে, সেগুলি পাশাপাশি আলাদা বসিলেও মিলিতভাবে একটি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—**দেখিয়া শুনিয়া** চল (**দেখেশুনে** চল); **পড়িয়া শুনিয়া** এই ফল! (**পড়েশুনে** এই ফল!); **মিলিয়া মিশিয়া** কাজ কর (**মিলে মিশে** কাজ কর) প্রভৃতি। এই জাতীয় মিলিত অসমাপিকা-ক্রিয়াকে যৌগিক-ক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু, ইহাদের দ্বৈত-অসমাপিকা-ক্রিয়া বলাই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।)

ক্রিয়ার কাল ঃ

ক্রিয়া সংঘটিত হইবার সময়কে বলা হয় ক্রিয়ার কাল। এই কাল প্রধানত তিন-ভাগে বিভক্ত—(১) **বর্তমান-কাল**; (২) **অতীত-কাল**; (৩) **ভবিষ্যৎ-কাল।**

বর্তমানে যে-ক্রিয়া ঘটে বা ঘটিতেছে, কিংবা সকল সময়ই ঘটে, তাহার কালকে বলা হয় **বর্তমান-কাল**। যেমন—আমি বই **পড়ি**; সে **খেলিতেছে**; সূর্য **অস্ত যায়**। পূর্বে যে ক্রিয়া ঘটিয়াছে, তাহার কালকে বলা হয় **অতীত-কাল**। যেমন—আমি বই **পড়িলাম**; সে **খেলিতেছিল**; সূর্য অস্ত **গিয়াছিল**। পরে যে-ক্রিয়া ঘটিবে, তাহার কালকে বলা হয় **ভবিষ্যৎ-কাল**। যেমন—আমি বই **পড়িব**; সে **খেলিবে**; সূর্য অস্ত **যাইবে**।

বর্তমান-কালঃ বাংলায় বর্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) **নিত্য-বর্তমান** (বা সাধারণ-বর্তমান)ঃ সাধারণভাবে যে-ক্রিয়া বর্তমানে ঘটে, বা নিত্যই ঘটে, তাহাকে বলা হয় নিত্য-বর্তমান। যেমন—সে **হাসে**; আমি **পড়ি**; সূর্য **ওঠে**; মানুষ **মরে**; বাতাস **বয়** ইত্যাদি। [কোনো ঐতিহাসিক অতীত ঘটনা বুঝাইতেও অনেক সময় নিত্য-বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন—মহাত্মা গান্ধী জাতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ **করেন**। নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ' গঠন **করেন**।]

(২) **ঘটমান-বর্তমান**ঃ বর্তমানে যে-ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হইয়াও শেষ হয় নাই, অর্থাৎ যে-ক্রিয়ার কাজ এখনও চলিতেছে, তাহাকেই বলা হয় ঘটমান-বর্তমান। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে 'ইতেছে' (ছে), ইতেছ (ছ), ইতেছি (ছি)-প্রত্যয় বসে। যেমন-সে **হাসিতেছে (হাসছে)**; তুমি **কাঁদিতেছ (কাঁদছ)**; আমি **পড়িতেছি (পড়ছি)**; সূর্য **উঠিতেছে (উঠছে)** ইত্যাদি।

(৩) **পুরাঘটিত-বর্তমান**ঃ কিছুক্ষণ পূর্বে যে-ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে, অথচ যাহার ফল এখনও বর্তমান, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত-বর্তমান। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইয়াছে (এছে), ইয়াছ (এছ), ইয়াছি (এছি)-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—সে **হাসিয়াছে (হেসেছে)**; তুমি **কাঁদিয়াছ (কেঁদেছ)**; আমি **পড়িয়াছি (পড়েছি)**; সূর্য **উঠিয়াছে (উঠেছে)** ইত্যাদি। [কিছুক্ষণ পূর্বে না হইয়া যদি বহুক্ষণ পূর্বে হয় এবং যে-ক্রিয়ার ফল আর বর্তমান থাকে না, সেইরূপ ক্ষেত্রে এই ক্রিয়ারূপের পূর্বে অতীতকালদ্যোতক কোনো শব্দ বসে। যেমন—**গতকাল** সে কি কান্নাই না **কাঁদিয়াছে (কেঁদেছে)**; **গত বছর** এমন দিনেই সে **জন্মিয়াছে** (জন্মেছে)।]

অতীত-কালঃ অতীত-কালকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **নিত্য-অতীত** (বা সাধারণ-অতীত)ঃ সাধারণভাবে যে-ক্রিয়ার কাজ পূর্বে অর্থাৎ, অতীতে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার কালকে বলা হয় নিত্য-অতীত। [ইহাতে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের উল্লেখ থাকে না, তবে বাক্য হইতে বুঝা যায় যে,

এই শ্রেণীর ক্রিয়ার কাজ খুব বেশী পূর্বে নিষ্পন্ন হয় নাই।] এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইল (ল) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—হেনা গান **গাহিল (গাইল)**; আমি একটি গল্প **লিখিলাম (লিখলাম)**; বাবা বাজার হইতে (থেকে) **আসিলেন (এলেন)** ইত্যাদি।

(২) **ঘটমান-অতীত**: পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ চলিতেছিল, তখনও যাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার কালকে বলা হয় ঘটমান-অতীত। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইতেছিল (ছিল) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—হেনা গান **গাহিতেছিল (গাইছিল বা গাচ্ছিল)**; আমি একটি গল্প **লিখিতেছিলাম (লিখছিলাম)**; বাবা বাজার হইতে (থেকে) **আসিতেছিলেন (আসছিলেন)** ইত্যাদি।

(৩) **পুরাঘটিত-অতীত**: অনেক পূর্বেই যে-ক্রিয়া ঘটিয়াছিল, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত-অতীত। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইয়াছিল (এছিল) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—হেনা গান **গাহিয়াছিল (গেয়েছিল)**; আমি একটি গল্প **লিখিয়াছিলাম (লিখেছিলাম)**; তখন বাবা বাজার (থেকে) **আসিয়াছিলেন (এসেছিলেন)** ইত্যাদি।

(৪) **নিত্যবৃত্ত-অতীত**: পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ কিছুকাল ধরিয়া চলিত বা নিয়মিতভাবে যে-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, তাহার কালকে বলা হয় নিত্যবৃত্ত-অতীত। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইত (ত) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—প্রত্যহ সকালে হেনা সঙ্গীত চর্চা **করিত** (রোজ সকালে হেনা গানের রেওয়াজ **করত**); আমি তখন ঘুম হইতে **উঠিতাম** (আমি তখন ঘুম থেকে **উঠতাম**); বাবা তখন প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া বাসায় **ফিরিতেন** (বাবা তখন প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাসায় **ফিরতেন**) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ-কাল: ভবিষ্যৎ-কালকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **সাধারণ-ভবিষ্যৎ**: পরে (অর্থাৎ, ভবিষ্যতে) যে-ক্রিয়ার কাজ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার কালকে বলা হয় সাধারণ-ভবিষ্যৎ। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইব (ব) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—কাল পরীক্ষা **হইবে (হবে)**; আমি তোমার গান **শুনিব (শুনব)**; বাবা বেড়াইতে **যাইবেন (বেড়াতে যাবেন)** ইত্যাদি।

(২) **ঘটমান-ভবিষ্যৎ**: পরে যে-ক্রিয়া ঘটিতে থাকিবে, তাহার কালকে বলা হয় ঘটমান-ভবিষ্যৎ। যেমন—সে তখন **হাঁটিতে থাকিবে (হাঁটতে থাকবে)** আমি যখন **লিখিতে থাকিব (লিখতে থাকব)**, পাশের বাড়িতে তখন কাঁসর-ঘণ্টা **বাজিতে থাকিবে (বাজতে থাকবে)** ইত্যাদি।

(৩) **পুরাঘটিত-ভবিষ্যৎ :** পূর্বে যে-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত-ভবিষ্যৎ। (কিন্তু, এই কালকে অতীত-কালের পর্যায়ে ধরাই যুক্তিসঙ্গত। সেক্ষেত্রে এইরূপ কালকে বলা যাইতে পারে—অনিশ্চিত-অতীত।) যেমন—আপনি সেদিন আমাকে ভুল **বুঝিয়া থাকিবেন** (**বুঝে থাকবেন**); সেই হয়তো **লিখিয়া থাকিবে** (**লিখে থাকবে**) ইত্যাদি।

[**অনুজ্ঞা :** আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, অনুমতি প্রভৃতি অর্থে যে-ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলে অনুজ্ঞা। অনুজ্ঞা দুই শ্রেণীর—(১) **বর্তমান-অনুজ্ঞা** ও (২) **ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা**।

বর্তমান-অনুজ্ঞা : (আদেশার্থে) এক্ষুনি **যাও**; অবিলম্বে প্রস্থান **করুন**; চ'লে **যা** বলছি।
(উপদেশার্থে) ভালো হ'য়ে **চলো**; সদা সত্যকথা **বলিও**।
(অনুমতি অর্থে) এবার তাহ'লে শুরু **হোক**; ও তাহ'লে এবার চ'লে **যাক**।
(প্রার্থনা অর্থে) দয়া ক'রে একটা পয়সা **দিন**; ভগবান এ-বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার **কর**।
(অনুরোধ অর্থে) গান আরম্ভ হবে, এবার সবাই চুপ **করুন**।

ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা : (আদেশার্থে) কাল অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা **করিবে** (**করবে**)।
(অনুরোধ অর্থে) বইটা আগামীকাল **লইয়া আসিবে** (**নিয়ে আসবে**)।
(প্রার্থনা অর্থে) আপনি বলিলেই কাজটা আরম্ভ **করা যাইবে** (আপনি বললেই কাজটা আরম্ভ করা যাবে)।]

মৌলিক-কাল ও যৌগিক-কাল :

ক্রিয়ার কালকে রূপ ও অর্থের দিক হইতে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **মৌলিক-কাল** ও (২) **যৌগিক-কাল**। [মৌলিক-কালকে কেহ কেহ যেমন 'সরল-কাল' বলিয়া অভিহিত করেন, তেমনি যৌগিক-কালকে বলেন 'মিশ্রকাল'।] নিত্য-বর্তমান (সাধারণ-বর্তমান), নিত্য-অতীত (সাধারণ-অতীত), নিত্যবৃত্ত-অতীত ও সাধারণ-ভবিষ্যৎ 'মৌলিক-কাল'এর অন্তর্গত। কারণ, এই সকল কালের ক্ষেত্রে ধাতুর সহিত কেবল বিশেষ কোনো একটি প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—(নিত্য-বর্তমানে) পড়্ + ই = পড়ি, বল্ + এ = বলে; (নিত্য-অতীতে) পড়্ + ইল = পড়িল (পড়্ + ল = পড়ল), বল্ + ইল = বলিল (বল্ + ল = বলল্); নিত্যবৃত্ত-অতীতে) পড়্ + ইত = পড়িত (পড়্ + ত = পড়ত), বল্ + ইত = বলিত

(বল্‌+ত = বল্‌ত) ; (সাধারণ-ভবিষ্যতে) পড়্‌+ইব = পড়িব (পড়্‌+ব = পড়ব), বল্‌+ইব = বলিব (বল্‌+ব = বল্‌ব)। সেইরকম—পড়্‌+ই+লাম = পড়িলাম (পড়্‌+লাম = পড়লাম ; পড়্‌+ই+তাম = পড়িতাম (পড়্‌+তাম = পড়তাম)। কিন্তু, ঘটমান-বর্তমান, ঘটমান-অতীত, ঘটমান-ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত-অতীত ও পুরাঘটিত-ভবিষ্যৎ 'যৌগিক-কালে'র অন্তর্গত। কারণ, এই সকল কালের ক্ষেত্রে ধাতুর সহিত একদিকে যেমন 'ইতে' বা 'ইয়া' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অবস্থানবাচক 'আছ্‌'-ধাতুর মৌলিক-কালের রূপ-ও সংলগ্ন হইয়া থাকে। যেমন—(ঘটমান-বর্তমানে) পড়্‌+ইতে+ছি = পড়িতেছি ; খা+ইতে = ছে = খাইতেছে ; আস্‌+ইতে+ছ = আসিতেছ ; (ঘটমান-অতীতে) পড়্‌+ইতে+ছিলাম = পড়িতেছিলাম ; খা+ইতে+ছিল = খাইতেছিল ; আস্‌+ইতে+ছিল = আসিতেছিল ; (ঘটমান-ভবিষ্যতে) পড়্‌+ইতে+থাক্‌+ইব = পড়িতে থাকিব ; খা+ইতে+থাক্‌+ইবে = খাইতে থাকিবে ; (পুরাঘটিত বর্তমানে) পড়্‌+ইয়া+ছি = পড়িয়াছি ; খা+ইয়া+ছে+খাইয়াছে ; আস্‌+ইয়া+ছ = আসিয়াছ ; (পুরাঘটিত-অতীতে) পড়্‌+ইয়া+ছিলাম = পড়িয়াছিলাম ; খা+ইয়া +ছিল = খাইয়াছিল ; আস্‌+ইয়া+ছিলে = আসিয়াছিলে ; (পুরাঘটিত-ভবিষ্যতে) পড়্‌+ইয়া+থাক্‌+ইব = পড়িয়া থাকিব ; খা+ইয়া+থাক্‌+ইবে = খাইয়া থাকিবে; আস্‌+ইয়া+থাক্‌+ইবে = আসিয়া থাকিবে। [চলিতভাষায় 'যৌগিক-কালে'র রূপ —পড়ছিলাম = পড়+('ইতে'-লোপ) ছিলাম ; খাচ্ছিল = খা+(ইতে'-লোপ) চ+ছিল ; আসছিল = আস+('ইতে'-লোপ) ছিল ; পড়েছি = পড়্‌+এ (<ইয়া)+ছি ; খেয়েছে = খে+এ+ছে ; এসেছে = এস্‌ (<আস্‌)+এ+ছে ; পড়েছিলাম = পড়্‌+এ (<ইয়া)+ছিলাম ; খেয়েছিল = খে+এ+ছিল ; এসেছিলে = এস (<আস্‌) +এ+ছিলে ; পড়তে থাকব = পড়্‌+তে (>ইতে)+থাক্‌+ব (<ইব) ; খেতে থাকবে = খে+তে (<ইতে)+থাক্‌+বে (ইবে) ; আসতে থাকবে = আস্‌+তে (<ইতে)+থাক্‌+বে (ইবে) প'ড়ে থাকব = পড়+এ (>ইয়া)+থাক্‌+ব (<ইব) ; খেয়ে থাকবে = খে+এ (<ইয়ে)+থাক্‌+বে (<ইবে) ; এসে থাকবে = এস্‌ (<আস্‌)+এ+থাক্‌+বে (<ইবে)।]

ক্রিয়ারূপ

সাধুভাষার ও চলিতভাষার ক্রিয়ারূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সাধুভাষায় সমস্ত ক্রিয়ার রূপ একই ধরনের প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে গঠিত হয়। কিন্তু, চলিতভাষায় ধাতুভেদে প্রত্যয় ও বিভক্তির পার্থক্য ঘটে। এই পার্থক্য অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়।

পড়্ (>পড়া)-ধাতুর ক্রিয়ারূপ (সাধুভাষায়)

বর্তমান-কাল

	আমি	তুমি, তুই, আপনি	সে, তিনি
নিত্য :	পড়ি	পড়, পড়িস, পড়েন	পড়ে, পড়েন
ঘটমান :	পড়িতেছি	পড়িতেছ, পড়িতেছিস, পড়িতেছেন	পড়িতেছে, পড়িতেছেন
পুরাঘটিত :	পড়িয়াছি	পড়িয়াছ, পড়িয়াছিস, পড়িয়াছেন	পড়িয়াছে পড়িয়াছেন
অনুজ্ঞা :	×	পড়, পড়্ (পড়ুন)	পড়ুক, পড়ুন

অতীত-কাল

নিত্য :	পড়িলাম	পড়িলে, পড়িলি, পড়িলেন	পড়িল, পড়িলেন
ঘটমান :	পড়িতেছিলাম	পড়িতেছিলে, পড়িতেছিলি, পড়িতেছিলেন	পড়িতেছিল, পড়িতেছিলেন
পুরাঘটিত :	পড়িয়াছিলাম	পড়িয়াছিলে, পড়িয়াছিলি, পড়িয়াছিলেন	পড়িয়াছিল, পড়িয়াছিলেন
নিত্যবৃত্ত :	পড়িতাম	পড়িতে, পড়িতি, পড়িতেন	পড়িত, পড়িতেন

ভবিষ্যৎ-কাল

সাধারণ :	পড়িব	পড়িবে, পড়িবি, পড়িবেন	পড়িবে, পড়িবেন
ঘটমান :	পড়িতে থাকিব	পড়িতে থাকিবে, পড়িতে থাকিবি, পড়িতে থাকিবেন	পড়িতে থাকিবে, পড়িতে থাকিবেন
পুরাঘটিত :	পড়িয়া থাকিব	পড়িয়া থাকিবে, পড়িয়া থাকিবি, পড়িয়া থাকিবেন	পড়িয়া থাকিবে, পড়িয়া থাকিবেন,
অনুজ্ঞা :	×	পড়িও, পড়িস, পড়বেন	পড়বে, পড়বেন

পড়্-ধাতুর ক্রিয়ারূপ (চলিতভাষায়)

বর্তমান-কাল

	আমি	তুমি, তুই, আপনি	সে, তিনি
নিত্য :	পড়ি	পড, পড়িস, পড়েন	পড়ে, পড়েন
ঘটমান :	পড়ছি	পড়ছ, পড়ছিস, পড়ছেন	পড়ছে, পড়ছেন
পুরাঘটিত :	পড়েছি	পড়েছ, পড়েছিস, পড়েছেন	পড়েছে, পড়েছেন
অনুজ্ঞা :	×	পড (প'ড়ো), পড় (পড়িস), পড়ুন	পড়ুক, পড়ুন

অতীত-কাল

নিত্য :	পড়লাম (পড়লেম, পড়লুম)	পড়লে, পড়লি, পড়লেন	পড়ল, পড়লেন
ঘটমান :	পড়ছিলাম (পড়ছিলেম, পড়ছিলুম)	পড়ছিলে, পড়ছিলি, পড়ছিলেন	পড়ছিল, পড়ছিলেন
পুরাঘটিত :	পড়েছিলাম, (পড়েছিলেম, পড়েছিলুম)	পড়েছিলে, পড়েছিলি, পড়েছিলেন	পড়েছিল, পড়েছিলেন
নিত্যবৃত্ত :	পড়তাম (পড়তেম, পড়তুম)	পড়তে, পড়তিস, ডপতেন	পড়ত, পড়তেন

ভবিষ্যৎ-কাল

সাধারণ :	পড়ব	পড়বে, পড়বি, পড়বেন	পড়বে, পড়বেন
ঘটমান :	পড়তে থাকব	পড়তে থাকবে, পড়তে থাকবি, পড়তে থাকবেন	পড়তে থাকবে, পড়তে থাকবেন
পুরাঘটিত :	প'ড়ে থাকব	প'ড়ে থাকবে, প'ড়ে থাকবি, প'ড়ে থাকবেন	প'ড়ে থাকবে, প'ড়ে থাকবেন
অনুজ্ঞা :	×	পড়বে, পড়বি, পড়বেন	পড়বে, পড়বেন

[এই পদ্ধতিতেই, কর্, ধর্, চল্, বল্, খেল্ প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায়, এবং তাহাদের সাধুভাষা ও চলিতভাষায় রূপ উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে গঠিত হয়।]

আস্ (>আসা)-ধাতুর ক্রিয়ারূপ

		সাধুভাষায়	চলিতভাষায়
বর্তমান-কাল ঃ	(আমি)	আসি, আসিতেছি, আসিয়াছি	আসি, আসছি, এসেছি
	(তুমি)	আস, আসিতেছ, আসিয়াছ	আস, আসছ, এসেছ
	(তুই)	আসিস, আসিতেছিস, আসিয়াছিস	আসিস, আসছিস, এসেছিস
	(আপনি)	আসেন, আসিতেছেন, আসিয়াছেন	আসেন, আসছেন, এসেছেন
	(সে)	আসে, আসিতেছে, আসিয়াছে	আসে, আসছে. এসেছে
	(তিনি)	আসেন, আসিতেছেন, আসিয়াছেন	আসেন, আসছেন, এসেছেন
বর্তমান-অনুজ্ঞা ঃ	(তুমি)	আইস	এসো
	(তুই)	আয়	আয়
	(আপনি)	আসুন	আসুন
	(সে)	আসুক	আসুক
	(তিনি)	আসুন	আসুন
অতীত-কাল ঃ	(আমি)	আসিলাম,	এলাম (এলেম, এলুম)
		আসিতেছিলাম,	আসছিলাম (আসছিলেম, আসছিলুম)
		আসিয়াছিলাম,	এসেছিলাম (এসেছিলেম, এসেছিলুম)
		আসিতাম	আসতাম (আসতেম, আসতুম)
	(তুমি)	আসিলে, আসিতেছিলে, আসিয়াছিলে, আসতে	এলে, আসছিলে, এসেছিলে, আসতে
	(তুই)	আসিলি, আসিতেছিলি, আসিয়াছিলি, আসতিস	এলি, আসছিলি, এসেছিলি, আসতিস
	(আপনি)	আসিলেন, আসিতেছিলেন, আসিয়াছিলেন. আসিতেন	এলেন, আসছিলেন. এসেছিলেন. আসতেন

		সাধুভাষায়	চলিতভাষায়
	(সে)	আসিল, আসিতেছিল, আসিয়াছিল, আসিত	এলো, আসছিল, এসেছিল, আসত
	(তিনি)	আসিলেন, আসিতেছিলেন, আসিয়াছিলেন, আসিতেন	এলেন, আসছিলেন, এসেছিলেন, আসতেন
ভবিষ্যৎ-কাল :	(আমি)	আসিব, আসিতে থাকিব, আসিয়া থাকিব	আসব, আসতে থাকব, এসে থাকব
	(তুমি)	আসিবে, আসিতে থাকিবে, আসিয়া থাকিবে	আসবে, আসতে থাকবে, এসে থাকবে
	(তুই)	আসিবি, আসিতে থাকিবি, আসিয়া থাকিবি	আসবি, আসতে থাকবি, এসে থাকবি
	(আপনি)	আসিবেন, আসিতে থাকিবেন, আসিয়া থাকিবেন	আসবেন, আসতে থাকবেন, এসে থাকবেন
ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা :	(তুমি)	আসিও, আসিবে	এসো, আসবে
	(তুই)	আসিবি, আসিস	আসবি, আসিস
	(আপনি)	আসিবেন	আসবেন
	(সে)	আসিবে	আসবে
	(তিনি)	আসবেন	আসবেন

[এইভাবেই লিখ্, দেখ্, শিখ্, চিন্, কিন্, মিশ্, ছিঁড়্ প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়।]

খা (>খাওয়া)-ধাতুর ক্রিয়ারূপ (চলিতভাষায়)

বর্তমান-কাল

	আমি	তুমি, তুই, তিনি	সে, তিনি
নিত্য :	খাই	খাও, খাস, খান্	খায়, খান
ঘটমান :	খাচ্ছি	খাচ্ছ, খাচ্ছিস, খাচ্ছেন	খাচ্ছে, খাচ্ছেন

	আমি	তুমি, তুই, তিনি	সে, তিনি
পুরাঘটিত :	খেয়েছি,	খেয়েছ, খেয়েছিস, খেয়েছেন	খেয়েছে, খেয়েছেন
অনুজ্ঞা :	×	খাও, খা, খান্	খাক্, খান্
		অতীত-কাল	
নিত্য :	খেলাম, খেলেম, খেলুম	খেলে, খেলি, খেলেন	খেল, খেলেন
ঘটমান :	খাচ্ছিলাম, খাচ্ছিলেম, খাচ্ছিলুম	খাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, খাচ্ছিলেন	খাচ্ছিল, খাচ্ছিলেন
পুরাঘটিত :	খেয়েছিলাম, খেয়েছিলেম, খেয়েছিলুম	খেয়েছিলে, খেয়েছিলি, খেয়েছিলেন	খেয়েছিল, খেয়েছিলেন
নিত্যবৃত্ত :	খেতাম (খেতেম, খেতুম)	খেতে, খেতিস, খেতেন	খেত, খেতেন
		ভবিষ্যৎ-কাল	
সাধারণ :	খাব	খাবে, খাবি, খাবেন	খাবে, খাবেন
ঘটমান :	খেতে থাকব	খেতে থাকবে, খেতে থাকবি, খেতে থাকবেন	খেতে থাকবে, খেতে থাকবেন
পুরাঘটিত :	খেয়ে থাকব	খেয়ে থাকবে, খেয়ে থাকবি, খেয়ে থাকবেন	খেয়ে থাকবে, খেয়ে থাকবেন
অনুজ্ঞা :	×	খাও, খাবি, খাবেন	খাবে, খাবেন

[এইভাবেই পা, চা, ধা প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়।]

অন্যান্য কয়েকটি ধাতুর ক্রিয়ারূপ (চলিতভাষায়)

যা (>যাওয়া) : **বর্তমান-কাল**—যাই, যাচ্ছি, গিয়েছি ; যাও, যাস, যান্, যাচ্ছি, যাচ্ছিস, যাচ্ছেন ; গিয়েছ, গিয়েছিস্, গিয়েছেন ; (যাও, যা, যান) ; যায়, যান্, যাচ্ছে, যাচ্ছেন, গিয়েছে, গিয়েছেন, (যাক্, যান) ; **অতীত-কাল**—গেলাম (গেলেম, গেলুম), যাচ্ছিলাম (যাচ্ছিলেম, যাচ্ছিলুম), গিয়েছিলাম (গিয়েছিলেম, গিয়েছিলুম) ; যেতাম (যেতেম, যেতুম) ; গেলে, গেলি, গেলেন ; যাচ্ছিলে, যাচ্ছিলি,

যাচ্ছিলেন ; গিয়েছিলে, গিয়েছিলি, গিয়েছিলেন ; যেতে, যেতিস, যেতেন ; গেল, গেলেন ; যাচ্ছিল, যাচ্ছিলেন ; গিয়েছিল, গিয়েছিলেন ; যেত, যেতেন ; **ভবিষ্যৎ-কাল**—যাব, যেতে থাকব, গিয়ে থাকব ; যাবে, যাবি, যাবেন ; যেতে থাকবে, যেতে থাকবি, যেতে থাকবেন ; গিয়ে থাকবে, গিয়ে থাকবি, গিয়ে থাকবেন, (যাও, যাবি, যাবেন) ; যাবে, যাবেন ; যেতে থাকবে, যেতে থাকবেন ; গিয়ে থাকবে, গিয়ে থাকবেন, (যাবে, যাবেন)।

দে বা **দি** (>দেওয়া) : **বর্তমান-কাল**—দেই, দিই, দিচ্ছি, দিয়েছি ; দাও, দে, দিস্, দেন, দিন্ ; দিচ্ছ, দিচ্ছিস্, দিচ্ছেন; দিয়েছ, দিয়েছিস্, দিয়েছেন ; (দাও, দে, দেন, দিন) ; দেয়, দেন ; দিচ্ছে, দিচ্ছেন ; দিয়েছে, দিয়েছেন ; (দিক, দিন) ; **অতীত-কাল**—দিলাম (দিলেম, দিলুম) ; দিচ্ছিলাম (দিচ্ছিলেম, দিচ্ছিলুম) ; দিয়েছিলাম (দিয়েছিলেম, দিয়েছিলুম) ; দিতাম (দিতেম, দিতুম) ; দিলে, দিলি, দিলেন ; দিচ্ছিলে, দিচ্ছিলি, দিচ্ছিলেন ; দিয়েছিলে, দিয়েছিলি, দিয়েছিলেন ; দিতে, দিতিস, দিতেন ; দিলে, দিল, দিচ্ছিল, দিচ্ছিলেন ; দিয়েছিল, দিয়েছিলেন ; দিত, দিতেন ; **ভবিষ্যৎ-কাল**—দেব, দিতে থাকব, দিয়ে থাকব ; দেবে, দিবি, দেবেন; দিতে থাকবে, দিতে থাকবি, দিতে থাকবেন ; দিয়ে থাকবে, দিয়ে থাকবি, দিয়ে থাকবেন ; (দাও, দিবি, দেবেন) ; দেবে, দেবেন ; দিতে থাকবে, দিতে থাকবেন ; দিয়ে থাকবে, দিয়ে থাকবেন ; (দেবে, দেবেন)।

শো বা **শু** (>**শোওয়া**) : **বর্তমান-কাল**—শুই, শুচ্ছি, শুয়েছি ; শোও, শুস্, শোন ; শুচ্ছ, শুচ্ছিস্, শুচ্ছেন ; শুয়েছ, শুয়েছিস, শুয়েছেন (শোও, শো, শোন) ; শোয়, শোন ; শুচ্ছে, শুচ্ছেন ; শুয়েছ, শুয়েছিস্, শুয়েছেন (শুক্, শোন্) ; **অতীত-কাল**—শুলাম (শুলেম) ; শুচ্ছিলাম (শুচ্ছিলাম, শুচ্ছিলুম) ; শুয়েছিলাম (শুয়েছিলেম, শুয়েছিলুম) ; শুতাম ; শুলে, শুলি, শুলেন ; শুচ্ছিলে, শুচ্ছিলি, শুচ্ছিলেন ; শুয়েছিলে, শুয়েছিলি, শুয়েছিলেন ; শুতে, শুতিস্, শুতেন ; শুল, শুলেন ; শুচ্ছিল, শুচ্ছিলেন ; শুয়েছিল, শুয়েছিলেন ; শুত, শুতেন ; **ভবিষ্যৎ-কাল**—শোব, শুতে থাকব, শুয়ে থাকব ; শোবে, শুবি, শোবেন ; শুতে থাকবে, শুতে থাকবি, শুতে থাকবেন ; শুয়ে থাকবে, শুয়ে থাকবি, শুয়ে থাকবেন (শোবে, শুবি, শোবেন) ; শোবে, শোবেন ; শুতে থাকবে, শুতে থাকবেন ; শুয়ে থাকবে, শুয়ে থাকবেন (শোবে, শোবেন)।

আছ্ (>থাকা) : **বর্তমান-কাল**—আছি, থাকছি, থেকেছি ; আছ, আছিস্, আছেন ; থাকছ, থাকছিস্, থাকছেন ; থেকেছ, থেকেছিস, থেকেছেন ; (থাকো, থাক্, থাকুন) ; আছে, আছেন ; থাকছে, থাকছেন, থেকেছে, থেকেছেন ; (থাকুক, থাকুন) ; **অতীত-কাল**—ছিলাম, থাকছিলাম, থেকেছিলাম (ছিলেম, ছিলুম,

থাকছিলেম, থাকছিলুম, থেকেছিলেম, থেকেছিলুম); থাকতাম (থাকতেম, থাকতুম); ছিলে, ছিলি, ছিলেন ; থাকছিলে, থাকছিলি, থাকছিলেন ; থেকেছিলে, থেকেছিলি, থেকেছিলেন ; ছিল, ছিলেন ; থাকছিল, থেকেছিলেন, থেকেছিল, থেকেছিলেন ; থাকত, থাকতেন ; **ভবিষ্যৎ-কাল**—থাকব, থাকতে থাকব, থেকে থাকব ; থাকবে, থাকবি, থাকবেন ; থাকতে থাকবে, থাকতে থাকবি, থাকতে থাকবেন ; থেকে থাকবে, থেকে থাকবি, থেকে থাকবেন ; থাকবে, থাকবেন ; থাকতে থাকবে, থাকতে থাকবেন ; থেকে থাকবে, থেকে থাকবেন।

ণিজন্ত ক্রিয়ারূপ : কর্>করানো ; খা>খাওয়ানো ; দেখ্>দেখানো ; শো বা শু>শোয়ানো ; লিখ্>লেখানো ; চল্>চালানো প্রভৃতি।

ণিজন্ত 'দেখানো'-ধাতুর ক্রিয়ারূপ

সাধুভাষায়	চলিতভাষায়
বর্তমান-কাল :	
(আমি) দেখাই, দেখাইতেছি, দেখাইয়াছি	দেখাই, দেখাচ্ছি, দেখিয়েছি
(তুমি) দেখাও, দেখাইতেছ, দেখাইয়াছ	দেখাও, দেখাচ্ছ, দেখিয়েছ
(তুই) দেখাস্, দেখাইতেছিস্, দেখাইয়াছিস্	দেখাস্, দেখাচ্ছিস্, দেখিয়েছিস্
(আপনি) দেখান, দেখাইতেছেন, দেখাইয়াছেন	দেখান, দেখাচ্ছেন, দেখিয়েছেন
(সে) দেখায়, দেখাইতেছে, দেখাইয়াছে	দেখায়, দেখাচ্ছে দেখিয়েছে
(তিনি) দেখান, দেখাইতেছেন, দেখাইয়াছেন	দেখান, দেখাচ্ছেন, দেখিয়েছেন
অতীত-কাল :	
(আমি) দেখাইলাম, দেখাইতেছিলাম, দেখাইয়াছিলাম, দেখাইতাম	দেখালাম (দেখালেম, দেখালুম) দেখাচ্ছিলাম (দেখাচ্ছিলেম, দেখাচ্ছিলুম), দেখিয়েছিলাম (দেখিয়েছিলেম, দেখিয়েছিলুম), দেখাতাম (দেখাতেম, দেখাতুম)
(তুমি) দেখাইলে, দেখাইতেছিলে, দেখাইয়াছিলে, দেখাইতে	দেখালে, দেখাচ্ছিলে, দেখিয়েছিলে, দেখাতে
(তুই) দেখাইলি, দেখাইতেছিলি, দেখাইয়াছিলি, দেখাইতিস	দেখালি, দেখাচ্ছিলি, দেখিয়েছিলি, দেখাতিস্

সাধুভাষায়	চলিতভাষায়
(আপনি) দেখাইলেন, দেখাইতেছিলেন, দেখাইয়াছিলেন, দেখাইতেন	দেখালেন, দেখাচ্ছিলেন, দেখিয়েছিলেন, দেখাতেন
(সে) দেখাইল, দেখাইতেছিল, দেখাইয়াছিল, দেখাইত	দেখাল (দেখালে), দেখাচ্ছিল, দেখিয়েছিল দেখাত
(তিনি) দেখাইলেন, দেখাইতেছিলেন, দেখাইয়াছিলেন, দেখাইতেন	দেখালেন, দেখাচ্ছিলেন, দেখিয়েছিলেন, দেখাতেন

ভবিষ্যৎ-কাল ঃ

(আমি) দেখাইব, দেখাইতে থাকিব, দেখাইয়া থাকিব	দেখাব, দেখাইতে থাকিব, দেখিয়ে থাকব
(তুমি) দেখাইবে, দেখাইতে থাকিবে, দেখাইয়া থাকিবে	দেখাবে, দেখাতে থাকবে, দেখিয়ে থাকবে
(তুই) দেখাইবি, দেখাইতে থাকিবি, দেখাইয়া থাকিবি	দেখাবি, দেখাতে থাকবি, দেখিয়ে থাকবি
(আপনি) দেখাইবেন, দেখাইতে থাকিবেন, দেখাইয়া থাকিবেন	দেখাবেন, দেখাতে থাকবেন, দেখিয়ে থাকবেন
(সে) দেখাইবে, দেখাইতে থাকিবে, দেখাইয়া থাকিবে	দেখাবে, দেখাতে থাকবে, দেখিয়ে থাকবে
(তিনি) দেখাইবেন, দেখাইতে থাকিবেন, দেখাইয়া থাকিবেন	দেখাবেন, দেখাতে থাকবেন, দেখিয়ে থাকবেন

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলির পূর্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসাইয়া বাক্য রচনা কর—**কলিকাতা, দুধ, স্বভাব, বন্ধু**, বাতাস, হিমালয়, অরণ্য, ব্যক্তি।

২। বাংলায় কিভাবে বিশেষণের তারতম্য দেখানো হয় ?

৩। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসাইয়া বাক্য রচনা কর—ফুলতোলা, তিমিরলিপ্ত, দেবোত্তর, বৃন্তচ্যুত, ভারতীয়, থাগড়াই, জ্ঞানবৃদ্ধ, মা-মরা, নাতিদীর্ঘ, ভরপেট।

৪। নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ উত্তর লিখ।

৫। সর্বনাম কয় প্রকার ও কী কী ? উদাহরণ দাও।

৬। সমুচ্চয়ী সর্বনাম ও সমুচ্চয়ী অব্যয় বলিতে কী বুঝায় ?

৭। অব্যয় কাহাকে বলে ? উহা প্রধানত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ? উদাহরণসহ তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৮। একই অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখাও।

৯। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির সাহায্যে এক-একটি বাক্য রচনা কর—

পোঁ পোঁ ; বরং ; সুতরাং ; ভন্‌ভন্ ; কেন না ; যদি বা ; আদৌ ; হয়তো ; যদি ; নতুবা।

১০। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

১১। সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলিতে কী বুঝায় ?

১২। উদাহরণসহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর—

সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, যৌগিক ক্রিয়া, ণিজন্ত ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

১৩। মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? অনুজ্ঞা বলিতেই বা কী বুঝায় ? উদাহরণসহ উত্তর লিখ।

১৪। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্ণয় কর—

উঠিয়াছিল, আসিতাম, গিয়ে থাকবে, কহিলেন, গাইতে থাকবে, বাজাত।

১৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ (সাধুভাষায়) নির্ণয় কর—

ডাক্ (> ডাকা), দৌড়া (> দৌড়ান), কর্ (> করা)

১৬। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির অতীত-কালের ক্রিয়ারূপ (চলিতভাষায়) নির্ণয় কর—

পড়া (পড়ানো), চল্ (> চলা), হাস্ (< হাসা)।

২। *লিঙ্গ*

বাংলাভাষায় লিঙ্গ-প্রকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—(১) **পুংলিঙ্গ** (অর্থাৎ, পুরুষবোধক শব্দ) (২) **স্ত্রীলিঙ্গ** (অর্থাৎ, স্ত্রীবোধক শব্দ) এবং (৩) **ক্লীবলিঙ্গ** (অর্থাৎ, জড়-পদার্থ)। যেমন—পুংলিঙ্গ—পিতা, ছেলে, ভাই, কিশোর, খোকা, স্বামী প্রভৃতি ; স্ত্রীলিঙ্গ—মাতা, মেয়ে, বোন, কিশোরী, খুকী, স্ত্রী প্রভৃতি ; ক্লীবলিঙ্গ—জল, বাতাস, পাহাড়, ফুল, গাছ প্রভৃতি। [ক্ষেত্রবিশেষে, ক্লীবলিঙ্গ-জাতীয় শব্দ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের মতও ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন,—নদী

(স্ত্রীলিঙ্গ), নদ (পুংলিঙ্গ)। পর্বত, সাগর, মেঘ, বৃক্ষ প্রভৃতি যেমন পুংলিঙ্গ-বোধক ; বর্ষা, জ্যোৎস্না, লতা, ধরণী, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দও তেমনি স্ত্রীলিঙ্গ-বোধক।]

স্ত্রী-প্রত্যয় ঃ সংস্কৃত ও বাংলা—পুরুষবাচক শব্দের সহিত যে-সকল প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রী-বাচক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই বলা হয় **স্ত্রী-প্রত্যয়**।

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় সাধারণত তৎসম-(অবিকৃত সংস্কৃত)-শব্দের শেষেই বসে। যেমন—**আ (া), ঈ (ী), আনী**।

আ-প্রত্যয় ঃ অ-কারান্ত তৎসম শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গবাচক **আ প্রত্যয়** বসে। যেমন—আর্য—আর্যা ; আচার্য—আচার্যা ; অধীন—অধীনা ; অজ—অজা ; সূর্য—সূর্যা ; জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা ; কৃশ—কৃশা ; বৃদ্ধ—বৃদ্ধা ; প্রথম—প্রথমা ; দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া ; সভ্য—সভ্যা ; মৃত—মৃতা ; জীবিত—জীবিতা ; সরল—সরলা ; মূর্ছিত—মূর্ছিতা ; প্রিয়—প্রিয়া ; প্রিয়তম—প্রিয়তমা ; অনাথ—অনাথা ; পূজনীয়—পূজনীয়া ; কোকিল—কোকিলা প্রভৃতি।

পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে যদি 'অক' থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলিঙ্গে **'অক' স্থানে 'ইক' হয় এবং শেষে আ-প্রত্যয় বসে।** যেমন—বালক—বালিকা (বাল্ + অক্ = বালিক + আ) ; চালক—চালিকা ; গায়ক—গায়িকা ; নায়ক—নায়িকা ; পালক—পালিকা ; বাদক—বাদিকা ; পাঠক—পাঠিকা ; শিক্ষক—শিক্ষিকা ; পাচক—পাচিকা ; লেখক—লেখিকা ; বাহক—বাহিকা ; শ্যালক—শ্যালিকা ; পরিচারক—পরিচারিকা ; অভিভাবক—অভিভাবিকা প্রভৃতি। ['সেবক'—শব্দের শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ সেবকা ; কিন্তু, বাংলায় 'সেবিকা' শব্দই ব্যবহৃত হয়।]

ঈ-প্রত্যয় ঃ জাতিবাচক ও অন্যান্য কতকগুলি পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে **ঈ-প্রত্যয়** যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—কুমার—কুমারী ; কিশোর—কিশোরী ; ময়ূর—ময়ূরী ; সিংহ—সিংহী ; মনুষ্য—মনুষ্যী ; মানব—মানবী ; দানব—দানবী ; হরিণ—হরিণী ; ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী ; সর্প—সর্পী ; রাক্ষস—রাক্ষসী ; বিহঙ্গ—বিহঙ্গী ; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী ; দেব—দেবী ; নট—নটী ; গোপ—গোপী ; বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী ; পাত্র—পাত্রী ; গৌর—গৌরী ; কল্যাণ—কল্যাণী ; দৌহিত্র—দৌহিত্রী ; পিতামহ—পিতামহী ; নদ—নদী ; নর্তক—নর্তকী ; কমলাক্ষ—কমলাক্ষী ; হংস—হংসী ; সৎ—সতী ; চতুর্থ—চতুর্থী ; ষোড়শ—ষোড়শী ; অষ্টাদশ—অষ্টাদশী ; চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখী প্রভৃতি।

[**জাতিবাচক** শব্দের শেষ বর্ণে য্ কিংবা র্ থাকিলে তাহাদের **আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ জাতি-অর্থে** ব্যবহৃত হয়, কিন্তু **ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ** প্রযুক্ত হয় পত্নী-অর্থে। যেমন—বৈশ্য—বৈশ্যা (জাতি অর্থে), বৈশ্যী (স্ত্রী-অর্থে); শূদ্র—শূদ্রা (জাতি-অর্থে), শূদ্রী (পত্নী-অর্থে); ছাত্র—ছাত্রা (জাতি-অর্থে), ছাত্রী (পত্নী-অর্থে) প্রভৃতি। ক্রমবাচক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উত্তর যেমন 'আ'-প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়, তেমনি চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দের উত্তর 'ঈ'-প্রত্যয় যুক্ত হয়।]

ময়, দৃশ্, ইক, কর্ ও **চর্** যুক্ত পুংলিঙ্গবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিতে হইলে তাহাদের শেষে **'ঈ'-প্রত্যয়** বসাইতে হয়। যেমন—চিন্ময়—চিন্ময়ী; মৃন্ময়—মৃন্ময়ী; দয়াময়—দয়াময়ী; জ্যোতির্ময়—জ্যোতির্ময়ী; স্নেহময়—স্নেহময়ী; তাদৃশ—তাদৃশী; যাদৃশ—যাদৃশী; বার্ষিক—বার্ষিকী; সাময়িক—সাময়িকী; কিঙ্কর—কিঙ্করী; ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্করী; শুভকর—শুভকরী; অর্থকর—অর্থকরী; জলচর—জলচরী; অনুচর—অনুচরী; সহচর—সহচরী প্রভৃতি।

অৎ, মৎ, বৎ, বস্, ইয়স্ ও **অঞ্চ্ ভাগান্ত** শব্দের শেষে **'ঈ'-প্রত্যয়** যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন—ভবৎ (ভবান্)—ভবতী; শ্রীমৎ—(শ্রীমান্)—শ্রীমতী; মহৎ (মহান্)—মহতী; বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্)—বুদ্ধিমতী; ভগবৎ (ভগবান্)—ভগবতী; গুণবৎ (গুণবান্)—গুণবতী; রূপবৎ (রূপবান্)—রূপবতী; বিদ্বস্ (বিদ্বান্)—বিদুষী; মহীয়স্ (মহীয়ান্)—মহীয়সী; গরীয়স্ (গরীয়ান্)—গরীয়সী; প্রেয়স্ (প্রেয়ান্)—প্রেয়সী; প্রাঞ্চ্—প্রাচী; উদঞ্চ্—উদীচী প্রভৃতি।

ইন্ ও **বিণ্ প্রত্যয়ান্ত** শব্দের শেষে **'ঈ'-প্রত্যয়** যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ মেলে। যেমন—হস্তিন্ (হস্তী)—হস্তিনী; অভিমানিন্ (অভিমানী)—অভিমানিনী; মায়াবিন্ (মায়াবী)—মায়াবিনী; তপস্বিন্ (তপস্বী)—তপস্বিনী প্রভৃতি।

ঋ-কারান্ত শব্দের শেষেও **'ঈ'-প্রত্যয়** বসাইলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন—কর্তৃ (কর্তা)—কর্ত্রী; ধাতৃ (ধাতা)—ধাত্রী; অভিনেতৃ (অভিনেতা)—অভিনেত্রী; জগদ্ধাতৃ (জগদ্ধাতা)—জগদ্ধাত্রী; শিক্ষয়িতৃ (শিক্ষয়িতা)—শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি।

[স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ কয়েকটি শব্দের উদাহরণ—রাজ্ঞী (<রাজন্); যূনী, যুবতী (<যুবন্, যুবা); সম্রাজ্ঞী (<সম্রাজ্); তন্বী (<তনু); সাধ্বী (<সাধু); মাধ্বী (<মধু); প্রভৃতি।]

আনী-প্রত্যয়ঃ কতকগুলি পুংলিঙ্গবাচক শব্দের উত্তর 'আনী'-প্রত্যয় যোগ করিয়া পত্নী-অর্থে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—শিব—শিবানী; ইন্দ্র—ইন্দ্রানী; ভব—ভবানী; ব্রহ্মা—ব্রহ্মাণী; ঈশ—ঈশানী; বরুণ—বরুণানী (বারুনী); মাতুল—মাতুলানী প্রভৃতি। **নিপাতনে সিদ্ধঃ** অরণ্যানী, বনানী, হিমানী প্রভৃতি।]

[কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে আ ও ঈ-প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—কৃপণ—কৃপণা, কৃপণী; কৃশোদর—কৃশোদরা, কৃশোদরী; চন্দ্রবদন—চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী; সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী; ছাত্র—ছাত্রা, ছাত্রী; সুদন্ত—সুদন্তা, সুদন্তী; চণ্ড—চণ্ডা, চণ্ডী প্রভৃতি। **নিপাতনে সিদ্ধঃ** নর>নারী; সখা>সখী; সূর্য>সূরী; পতি>পত্নী; শ্বশুর>শ্বশ্রূ প্রভৃতি।]

বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়

বাংলা পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে **ঈ, নী, আনি, ইনী** প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়। এই নিয়মে পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে যে-বর্ণ থাকে ক্ষেত্র-বিশেষে তাহার লোপ হয়। যেমন—মামা>মামী (মাম্+আ=মামা, কিন্তু ঈ-প্রত্যয় যোগ করিবার সময় 'মাম্'-এর 'আ'-বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে।

ঈ-প্রত্যয়ঃ খুড়া—খুড়ী; কাকা—কাকী; খোকা—খুকী (এখানে 'খো' 'খু' হইয়াছে); জেঠা—জেঠী; নানা—নানী; পাগল (পাগলা)—পাগলী; মেসো—মাসী (এখানে 'মে' 'মা' হইয়াছে); পিসা—পিসী; বামন—বামনী; ঘোড়া—ঘুড়ী (এখানে 'ঘো' 'ঘু' হইয়াছে); অভাগা—অভাগী; বাঁদর—বাঁদরী; নেড়া—নেড়ী; মোরগ—মুরগী (এখানে 'মো' 'মু' হইয়াছে); ছাগল—ছাগলী প্রভৃতি।

নী-প্রত্যয়ঃ মজুর—মেজুরনী; জেলে—জেলেনী; প্রেত—পেত্নী (<প্রেতিনী); গয়লা—গয়লানী; তেলি—তেলিনী; ধোপা—ধোপানী; ডোম—ডোমনী প্রভৃতি।

আনী-প্রত্যয়ঃ চাকর—চাকরানী; চৌধুরী—চৌধুরানী; ঠাকুর—ঠাকুরানী; মেথর—মেথরানী প্রভৃতি।

ইনী-প্রত্যয়ঃ গোয়ালা—গোয়ালিনী; কাঙাল—কাঙালিনী; ভিখারী—ভিখারিনী; বাঘ—বাঘিনী; ডাক—ডাকিনী; সাপ—সাপিনী প্রভৃতি।

পৃথক্ শব্দের সাহায্যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ-গঠন

[**সংস্কৃতে**] : পিতা—মাতা ; পুত্র—কন্যা ; পুত্র—বধূ ; পতি—পত্নী ; শ্বশুর—শ্বশ্রূ, বৃষ—গাভী ; বিপত্নীক—বিধবা ; পুরুষ—স্ত্রী ; স্বামী—স্ত্রী ; ভ্রাতা—ভগিনী ; ভ্রাতা—ভ্রাতৃবধূ ; জনক—জননী ; বর—বধূ প্রভৃতি।

[**বাংলায়**] : বাবা—মা ; ভাই—বোন, ভাই-বৌ ; বেয়াই—বেয়ান ; কর্তা—গিন্নী ; ছেলে—মেয়ে ; বর—ক'নে, বৌ ; বলদ—গাই ; রাজা—রানী ; ঠাকুরদা—ঠাকুরমা (ঠাকুমা) ; জামাই—ঝি, মেয়ে ; চাকর—ঝি ; দেওর—ননদ, ছোট জা ; ভাসুর—বড় জা ; তাঐ—মাঐ ; দাদা—দিদি, বৌদি প্রভৃতি।

[**বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী-শব্দে**] : সাহেব—মেম, বিবি ; নবাব—বেগম ; খানসামা—আয়া ; বাদশা—বেগম ; গোলাম—বাঁদী।

স্ত্রী-বাচক শব্দের সাহায্যে লিঙ্গ-পরিবর্তন

স্ত্রী-বাচক শব্দের ব্যবহারে বাংলায় বিভিন্ন শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন হয়। যেমন—বেটাছেলে—মেয়েছেলে ; এঁড়ে-বাছুর—বক্না-বাছুর ; ভাইপো—ভাইঝি ; পুরুষ মানুষ—মেয়ে-মানুষ ; ভদ্রলোক—ভদ্রমহিলা ; মদ্দা-কুকুর—মাদী-কুকুর ; কবি—মহিলা-কবি ; শিল্পী—মহিলা-শিল্পী ; শিশুপুত্র—শিশুকন্যা ; গোসাঁই—মা-গোসাঁই ; পুরোহিত—পুরোহিত-পত্নী ; ডেপুটি—ডেপুটি-গিন্নী ; ময়রা—ময়রা-বৌ ; গয়লা—গয়লা-বৌ ; হুলো-বেড়াল—মেনি-বেড়াল ; বসু—বসুজায়া ; ঘোষ—ঘোষজায়া ; দত্ত—দত্তগিন্নী প্রভৃতি।

নিত্য-পুংলিঙ্গ : বিপত্নীক, কৃতদার, মৃতদার, স্ত্রৈণ, বাজনদার, কবিরাজ, কবি, পুরোহিত, কুস্তিগীর, ঢুলী প্রভৃতি।

নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ : তারকা, সজনী, বিধবা, অধিত্যকা, উপত্যকা, রূপসী, সতীলক্ষ্মী, বিমাতা, সতীন, ললনা, এয়ো প্রভৃতি।

উভয়-লিঙ্গ বা দ্বি-লিঙ্গ : শিশু, কবি, বন্ধু, মিত্র, সুহৃৎ, লোক, দম্পতি, শত্রু প্রভৃতি।

স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে পুংলিঙ্গ-শব্দ : দার।

পুংলিঙ্গ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ : সবিতা, অঞ্জলি, অণিমা প্রভৃতি।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : অনাথিনী, গোপিনী, ভয়ঙ্করী, ত্রিনয়নী, রজকিনী, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসম্মত না হইলেও বাংলাসাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে। উহাদের ব্যাকরণসম্মত রূপ—(যথাক্রমে) অনাথা, গোপা, ভয়ঙ্করা, ত্রিনয়না, রজকী, মাতঙ্গী প্রভৃতি।]

অনুশীলনী

১। পুংলিঙ্গবাচক শব্দকে কিভাবে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে পরিণত করা যায়, উদাহরণসহ সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর।

২। নিত্য-পুংলিঙ্গ, নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গবাচক কয়েকটি শব্দের উল্লেখ কর।

৩। পার্থক্য বুঝাইয়া দাও :—

ছাত্রা, ছাত্রী ; আচার্যা, আচার্যানী ; শূদ্রা, শূদ্রী।

৪। লিঙ্গ-নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—

অভিনেত্রী, মজুমদার, জাদুকরী, মাঝি, আহ্লাদী, শুক, শয়তানী, গোসাঁই, কুলী, গিন্নী, নন্দাই, ভাসুর, ত্রয়োদশ, চাচা, গাভী, ঝি, ঠাকুর-পো, বিদ্বান্, মহান্, রজক, রাজা, আয়ুষ্মতী, ভূয়সী, চণ্ড, তনু।

৫। ব্যাকরণগত ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর :—

উদাসিনী, অধিনী, ধার্মিকা, রূপসী, সুকেশিনী।

৩। বচন

যাহার দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনামের সঠিক সংখ্যা সূচিত করে তাহাকেই বলে **বচন**। বাংলায় বচন দুই প্রকার—**একবচন** ও **বহুবচন**। [সংস্কৃতের মত বাংলায় 'দ্বিবচন' নাই। দ্বিবচনবাচক শব্দ বুঝাইতে শব্দের পূর্বে দুই, দো, দু', দ্বি, উভয় প্রভৃতির প্রয়োগ হয়।]

বিশেষ্যের বচন

যে বিশেষ্যে একটিমাত্র বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাহা **একবচন**। যেমন—বালক, পাখি, মনুষ্য, ছাত্র, পুষ্প, আম প্রভৃতি। যে-বিশেষ্যে একাধিক বস্তু বা ব্যক্তি নির্দেশ করে তাহাই **বহুবচন**। যেমন—বালকগণ, বালকগুলি, বালকেরা ; পাখিরা ; মনুষ্য-সকল, মনুষ্যগণ, মনুষ্য-সমাজ ; ছাত্রগণ, ছাত্রেরা, ছাত্রবৃন্দ ; পুষ্পরাজি, পুষ্পনিচয়, পুষ্প-সকল ; আমগুলি প্রভৃতি।

প্রাণিবাচক তৎসম শব্দের সহিত **গণ**, **কুল**, **দল**, **বর্গ**, **বৃন্দ**, **মহল**, **মণ্ডলী**, **সমূহ**, **বাহিনী**, **সমাজ**, **গোষ্ঠী**, **সম্প্রদায়** প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন হয়। যেমন—নরগণ, বালকগণ, মিত্রগণ, জনগণ ; নরকুল,

পাণ্ডবকুল, অলিকুল ; কমলদল, সৈন্যদল ; নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ, পণ্ডিতবর্গ ; ছাত্রবৃন্দ, শ্রমিকবৃন্দ, বীরবৃন্দ ; বন্ধুমহল, কর্মচারীমহল, ছাত্রমহল ; পণ্ডিতমণ্ডলী, মন্ত্রিমণ্ডলী ; কর্মীসমূহ, ছাত্রসমূহ ; সেনাবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ; পণ্ডিত-সমাজ, ছাত্র-সমাজ ; লেখকগোষ্ঠী ; ছাত্র-সম্প্রদায় প্রভৃতি।

অপ্রাণিবাচক তৎসম শব্দের সহিত **সমূহ, গ্রাম, দাম, আবলী, নিকর, নিচয়, মালা, পুঞ্জ, শ্রেণী, রাশি, রাজি, আদি** প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন হয়। যেন—দেশসমূহ, কর্মসমূহ, ফলসমূহ ; ইন্দ্রিয়গ্রাম, গুণগ্রাম ; শৈবালদাম ; ঘটনাবলী, রত্নাবলী, বৃক্ষাবলী ; নক্ষত্রনিকর ; কুসুমনিচয়, পুষ্পনিচয় ; পর্বতমালা, নক্ষত্রমালা, তরঙ্গমালা ; দ্বীপপুঞ্জ, গ্রন্থপুঞ্জ ; পর্বতশ্রেণী, লেখকশ্রেণী ; জলরাশি ; পর্বতরাজি, পুষ্পরাজি ; বৃক্ষরাজি ; উৎসবাদি প্রভৃতি।

বাংলা-শব্দের ক্ষেত্রে, **বহু অনেক, এত, অত, সব, সকল** প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দযোগে বিশেষ্যের বহুবচন হয়। [এই সকল শব্দ বিশেষণরূপে বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া বহুত্ব প্রচার করে।] যেমন—বহুদেশ, বহুলোক ; অনেক কাজ, অনেক দিন, অনেক মাছ ; এত ফল, এত আলো, এত কাণ্ড ; অত কাজ, অত ফুল, অত নাম ; সব লোক, সব লেখা, সব দেশ ; সকল রাগ, সকল ভাই (ভাই সকল), সকল কাজ প্রভৃতি।

বহুত্ববোধক প্রত্যয় [যেমন—**রা, এরা, দের, দিগের, গুলি (গুলা), গুলো** প্রভৃতি] যোগ করিয়াও বহুবচনান্তক বিশেষ্য-পদ গঠিত হয়। উদাহরণ—ছেলেরা (ছেলে+রা); মেঘেরা (মেঘ+এরা); ভাইদের ; বালকদিগের ; ফলগুলি ; ছোকরাগুলো প্রভৃতি।

গোছা, আঁটি, ঝাঁক, মুঠা (মুঠো) প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ বসিলে তাহাতেই বিশেষ্যের বহুবচন প্রকাশ পায়। যেমন— একগোছা চিঠি (অনেক চিঠি); তিন আঁটি শাক (অনেক শাক); একঝাঁক পায়রা (অনেক পায়রা); দু'মুঠো ভাত (অনেক ভাত) প্রভৃতি।

পূরণবাচক বিশেষণ দ্বারাও বিশেষ্যের বহুবচন সূচিত হইতে পারে। যেমন— চার টাকা ; তিনটি মেয়ে ; দশ দিন ; বার মাস ; হাজার লোক প্রভৃতি।

দ্বিরুক্তির সাহায্যেও (বিশেষ্য ও বিশেষণের দ্বিরুক্তির সাহায্যে) বিশেষ্যের বহুবচন হয়। যেমন—বড় বড় বাড়ি ; ভালো ভালো শাড়ি ; গাড়ি গাড়ি ইট ; ধাড়ি ধাড়ি ছেলে ; পাকা পাকা আম ; কালো কালো জাম প্রভৃতি। অন্যান্য কয়েকটি উদাহরণ—

'তোমার **সুরে সুরে** সুর মেলাতে।'—রবীন্দ্রনাথ

'ঐ যে চলে সঙ্গী তোমার **দলে দলে**।'—রবীন্দ্রনাথ

'**ফুলে ফুলে তারায় তারায়** বল্‌ছে সে কোন্ ইশারায়!'—রবীন্দ্রনাথ

বাটি বাটি দুধ; থালা থালা ভাত; ঘটি ঘটি জল; তাল তাল সোনা; দিস্তে দিস্তে কাগজ; গরম গরম লুচি; নরম নরম কলা; ছোট ছোট ফুল; শাদা শাদা মেঘ; ঝুড়ি ঝুড়ি লেবু প্রভৃতি।

যুগ্মশব্দের প্রয়োগে বিশেষ্যের বহুত্ব প্রকাশ পায়। যেমন—পূজাপার্বণ, কায়দা-কানুন, মালপত্র, চিঠিপত্র, বাড়িঘর, লোকজন, চাকর-বাকর, মামলামকদ্দমা প্রভৃতি।

জাতিবাচক একবচনান্ত শব্দের মাধ্যমেও বিশেষ্যের বহুত্ব সূচিত হইতে পারে। যেমন—**বাঙালীর** ঘরে ধান ছিল; **মানুষের** মন কি একরকম; **লোকের** বিপদে সাহায্য করাই ধর্ম; প্রভৃতি।

সর্বনামের বচন

সর্বনাম-পদের বহুবচন হয় **রা, দের, দিগের** প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের প্রয়োগে। যেমন—আমি—আমরা; তুই—তোরা; তুমি—তোমরা; আপনি—আপনারা; সে—তাহারা, তারা; তিনি—তাঁহারা, তাঁরা; আমি—আমাদের, আমাদিগের; তুমি—তোমাদের, তোমাদিগের; আপনি—আপনাদের, আপনাদিগের; সে—তাহাদের, তাহাদিগের; তিনি—তাঁহাদের, তাঁদিগের। সেইরকম—যাহারা, যারা, যাঁহারা, যাঁরা, কাহারা, কারা প্রভৃতি।

সর্বনাম-পদের দ্বিরুক্তি-সাধন করিয়াও বহুবচন গঠিত হয়। যেমন—যে যে (যে-সব) কাজ প'ড়ে আছে; যারা যারা (যাহারা) এখনও আসেনি; সেই সেই (সেই সব) লোককে খবর পাঠাও প্রভৃতি।

[**পুরুষ:** বিশেষ্য ও সর্বনাম-পদকে তিনশ্রেণীর পুরুষে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

উত্তম-পুরুষ—(একবচন) আমি, মুঁই; (বহুবচন) আমরা, মোরা, আমাদের প্রভৃতি।

মধ্যম-পুরুষ—(একবচন)—তুমি, তুই, আপনি; (বহুবচন) তোমরা, তোরা, আপনারা, তোমাদের, তোদের, আপনাদের প্রভৃতি।

প্রথম-পুরুষ—(একবচন) সে, তিনি, যে, যিনি, কে; (বহুবচন) তাহারা, তারা, তাঁহারা, তাঁরা, যাহারা, যারা, যাঁহারা, যাঁরা, কাহারা প্রভৃতি, এবং অবশিষ্ট সকল বিশেষ্য ও সর্বনাম-পদ।

অনুশীলনী

১। বাংলায় বচন কয় প্রকার? কয়েকটি বহুবচনাত্মক শব্দের উদাহরণ দাও।

২। বিশেষণের দ্বিরুক্তি করিয়া কিভাবে বিশেষ্যের বহুবচন সূচিত হয়?

৩। গ্রাম, বাহিনী, দাম, নিচয়, রাশি, বৃন্দ, আবলী এবং রা, এরা ও দের প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের সাহায্যে বহুবচনান্ত শব্দ গঠন করিয়া বাক্য রচনা কর।

৪। কারক ও বিভক্তি

ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ, তাহাকেই বলা হয় **কারক**। এই সম্বন্ধ প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন—কর্তৃসম্বন্ধ, কর্মসম্বন্ধ, করণসম্বন্ধ, সম্প্রদানসম্বন্ধ, অপাদানসম্বন্ধ ও অধিকরণসম্বন্ধ। বাংলায় তাই ছয়টি কারক স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—(১) **কর্তৃকারক**, (২) **কর্মকারক**, (৩) **করণকারক**, (৪) **সম্প্রদানকারক**, (৫) **অপাদানকারক** ও (৬) **অধিকরণকারক**।

একটি বাক্য: নন্দবাবু পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছেন, এমন সময় বাড়ি হইতে তাঁহার ছেলে তাঁহাকে ডাকিতে আসিল।

এই বাক্যে ক্রিয়া দুইটি—'**ধরিতেছেন**' ও '**আসিল**'। প্রথম ক্রিয়া 'ধরিতেছেন'-এর সহিত কাহার কী সম্বন্ধ দেখা যাক। (১) কে ধরিতেছেন? না, নন্দবাবু। অর্থাৎ, 'নন্দবাবু'-র সম্বন্ধ কর্তারূপে। অতএব, নন্দবাবু—কর্তৃকারক। (২) কী ধরিতেছেন? না, মাছ। অর্থাৎ, 'মাছ'-এর সম্বন্ধ কর্মরূপে। অতএব, মাছ—কর্মকারক। (৩) কী দিয়া ধরিতেছেন? না, 'ছিপ দিয়া'। অর্থাৎ, 'ছিপ দিয়া'-র সম্বন্ধ করণরূপে। অতএব, 'ছিপ দিয়া'—করণকারক। (৪) কোথায় ধরিতেছেন? না, পুকুরে। অর্থাৎ 'পুকুরে'-এর সম্বন্ধ অধিকরণরূপে। অতএব, 'পুকুরে'—অধিকরণকারক। এবারে, দ্বিতীয় ক্রিয়া 'আসিল'-র সহিত কাহার কী সম্বন্ধ দেখা যাক। (১) কে আসিল? না, ছেলে। অর্থাৎ, 'ছেলে'-র সম্বন্ধ কর্তারূপে। অতএব, 'ছেলে' কর্তৃকারক। (২) কোথা হইতে আসিল? না, 'বাড়ি হইতে'। 'বাড়ি হইতে'-র সম্বন্ধ অপাদানরূপে। অতএব, 'বাড়ি হইতে' অপাদানকারক।

আর একটি বাক্য: সরকার বন্যার্তদের কাপড় দিতেছেন।

এই বাক্যের ক্রিয়া—'দিতেছেন'। ইহার সহিত 'সরকার'-এর সম্বন্ধ কর্তারূপে। তাই, 'সরকার'—কর্তৃকারক। 'কাপড়'-এর সম্বন্ধ কর্মরূপে। তাই 'কাপড়'—

কর্মকারক। আর কাহাদের দিতেছেন? না, 'বন্যার্তদের'। **এই দান কিন্তু স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।** তাই, 'দিতেছেন'-ক্রিয়ার সহিত ইহার **সম্প্রদান-সম্বন্ধ।** অতএব, 'বন্যার্তদের'—সম্প্রদানকারক।

মূল শব্দের সহিত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করিয়া কারক নিরূপিত হয়, তাহাকেই বলে **বিভক্তি।** এই বিভক্তি দুই প্রকার—(১) **কারক-বিভক্তি** ও (২) **নাম-বিভক্তি।** যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দ্বারা পদের কারক নির্দিষ্ট হয় তাহা কারক-বিভক্তি। যেমন—এ, য়, য়ে; কে, রে; র, এর; তে, এতে। আর, যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করিলে, উহা বাক্যের অংশরূপে পদে পরিণত হয়, তাহা নাম-বিভক্তি। [**নাম-বিভক্তি কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ নামেও পরিচিত।**] যেমন—দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক; তরে, উপরে, নিমিত্ত, জন্য; হইতে, হ'তে, থেকে।

কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা **কর্তা।** অর্থাৎ, যে করে বা হয় তাহা **কর্তৃকারক।** যেমন—**ফুল** ফুটিয়াছে। **মেয়েটি** হাসিতেছে। **বৃষ্টি** থামিল।

[কর্তা নানাশ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—(১) **সমধাতুজ-কর্তা—বাজনা** বাজে। (২) **প্রযোজক-কর্তা—শিক্ষক** ছাত্রকে পড়াইতেছেন (ছাত্রকে—**প্রযোজ্য-কর্তা**)। (৩) **নিরপেক্ষ-কর্তা—নাটক** শেষ হইলে যবনিকা পড়িল। (৪) **ব্যতিহার-কর্তা—রাজায় রাজায়** যুদ্ধ বাধে। (৫) **অনুক্ত-কর্তা—রাম কর্তৃক** রাবণ নিহত হয়। (৬) **অনুপূরক-কর্তা**—রবীন্দ্রনাথ **একজন মহাকবি।**]

কর্তৃকারকে সাধারণত **প্রথমা বিভক্তি** হয়। প্রথমা-বিভক্তির কোনো চিহ্ন নাই, উহাকে **শূন্য-বিভক্তি** বলা যাইতে পারে। যেমন—**নরেন** বই পড়ে। **তুমি** কোথায় যাও? **বেলা** মালা গাঁথিতেছে।

ক্ষেত্রবিশেষে, অন্যান্য বিভক্তিও যুক্ত হয়। যেমন—

কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে): **নন্দকে** আজ অভিনয় করিতে হইবে।

,, **তৃতীয়া বিভক্তি** (দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, হইতে, হ'তে): **তোমা দ্বারা** এ-কাজ হওয়া অসম্ভব। গীতাঞ্জলি **রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক** রচিত হইয়াছে। **আমা হ'তে** এ-কাজ হবে না।

ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর): **মধুর** খাওয়া হবে, কিন্তু **মাধবের** খাওয়া হবে না

কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে, এতে) : '**পাগলে** কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়!' **গাধায়** বোঝা **বয়**। '**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?'

কর্মকারক

কর্তা যাহা করে তাহা **কর্ম**। অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার ব্যাপার সাধিত হয় তাহাকে বলা যাইতে পারে **কর্মকারক**। যেমন—মহাদেব **পার্বতীকে** বলিলেন। ছেলেরা এখন **বই** পড়িতেছে।

[কর্ম নানাশ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—(১) **গৌণকর্ম** ও **মুখ্যকর্ম**—মা **ছেলেকে** একটি **খেলনা** দিলেন (ছেলেকে—গৌণকর্ম ; খেলনা—মুখ্যকর্ম)। (২) **উদ্দেশ্য-কর্ম** ও **বিধেয়-কর্ম**—আমি **তাহাকে অভিনেতা** মনে করিয়াছিলাম (তাহাকে—উদ্দেশ্য-কর্ম ; অভিনেতা—বিধেয়-কর্ম। অর্থাৎ, মূলকর্মটিকেই বলা হয় উদ্দেশ্য-কর্ম, আর অনুপূরক-কর্মটিই বিধেয়-কর্ম।) (৩) **সমধাতুজ-কর্ম**—সে এমন **গান** গাহিল যে, সকলের কানে তালা লাগিবার জোগাড়! [সেইরকম, সে **বাজনা** বাজায় ; কেউ মরা **কান্না** কাঁদে ; তাহাকে চোখের **দেখা** দেখিয়াছি ; সকলে মিলিয়া **বাঁধ** বাঁধিতেছে ; রামকানাই কি **খেলা**-ই না খেলল !]

কর্মকারকে সাধারণত **দ্বিতীয়া বিভক্তি** বসে। ইহার চিহ্ন—'কে' বা 'রে' (-'এরে')। যেমন—বাবা **মণ্টুকে** ডাকছেন। 'রেখো মা **দাসেরে** মনে।'
—মাইকেল মধুসূদন

কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি (০) : '**ক্লান্তি** আমার ক্ষমা কর প্রভু।'
—রবীন্দ্রনাথ

শ্রমিকেরা **বেতন** চাহিতেছে।

সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়) 'আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী **রাঘবে** ?'
—মাইকেল মধুসূদন

'**আমায়** কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে ? '—রবীন্দ্রনাথ।

করণকারক

কর্তা যাহার সাহায্যে বা যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাহার নাম **করণ**। অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত করণসম্বন্ধযুক্ত পদকেই আমরা **করণকারক** বলিতে পারি।

যেমন, আমরা **চোখ দিয়ে** দেখি, **কান দিয়ে** শুনি, **হাত দিয়ে কাজ** করি। '**ফুলদল দিয়া** কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?'—মাইকেল মধুসূদন। **কৃত্তিবাস কর্তৃক** রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছে। **তরবারি দ্বারা** তাহার মস্তক ছিন্ন কর।

[করণ নানা শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—(১) **হেতুবাচক করণ**—**বৃষ্টির জলে** পথঘাট ভাসিয়া গেল। ছেলেরা **আনন্দে** উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। (২) **উপলক্ষণ বা লক্ষণবাচক করণ**—মানুষের **আচরণে-ই** মানুষ চেনা যায়।। (৩) **বীপ্সাকরণ—মেঘে মেঘে** আকাশ আচ্ছন্ন হইল।]

করণকারকে সাধারণত **তৃতীয়া বিভক্তি** বসে। এই বিভক্তির চিহ্ন—দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি।

ক্ষেত্রবিশেষে আবার অন্যান্য বিভক্তিও যুক্ত হইতে পারে। যেমন—

করণকারকে প্রথমা বিভক্তি (০): চারবন্ধু তখন **তাস** (তাস দিয়ে) খেলছিল।
বাবা রেগে চাকরকে **বেত** (বেত দিয়ে) মারলেন।

,, **পঞ্চমী বিভক্তি** (হ'তে, হইতে): '**আমা হ'তে** (আমা দ্বারা) নাহি কোনো ভয়।'
—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

,, **ষষ্ঠী বিভক্তি** (র, এর): **বালির** (বালি দ্বারা নির্মিত) প্রাসাদ কতক্ষণ থাকে? **তালের** (তাল দ্বারা প্রস্তুত) বড়া খাবে নাকি?

,, **সপ্তমী বিভক্তি** (এ, য়, তে) 'জুড়াও **তাহারে** স্নেহনীরে।'—রবীন্দ্রনাথ
ফাঁকা **কথায়** আর ভুলছি না বাপু!
'**ভুঁইচাঁপাতে** ভ'রে গেছে শিউলি গাছের তল।' —যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সম্প্রদানকারক

স্বত্বত্যাগ করিয়া কিছু দেওয়াকে বলে সম্প্রদান। ক্রিয়ার সহিত সম্প্রদান সম্বন্ধযুক্ত পদকে তাই **সম্প্রদানকারক** বলা হয়। বাংলায় সম্প্রদানকারক আসলে গৌণ-কর্মকারকেরই নামান্তর। যেমন—**ভিখারীকে** একটি কাপড় দাও। **অন্নহীনে অন্ন** দাও।

সম্প্রদানকারকে সাধারণত **চতুর্থী বিভক্তি** (বা দ্বিতীয়া বিভক্তি) বসে। উহার চিহ্ন—কে, রে প্রভৃতি। নাম-বিভক্তি দ্বারাও সম্প্রদানকারক সূচিত হইতে পারে (সেখানে উহা নিমিত্তার্থক বা উদ্দেশ্যার্থক)। যেমন—'**যার জন্যে** করি চুরি সেই বলে চোর!' '**সকলের তরে** সকলে আমরা!'—কামিনী রায়। 'বেলা যে প'ড়ে এলো, **জলকে** (জলের জন্য) চল।'—রবীন্দ্রনাথ

সম্প্রদানকারকে অন্যান্য বিভক্তিও বসিতে পারে। যেমন—

সম্প্রদানকারকে প্রথমা বিভক্তি (০) : 'কর **প্রেমসলিল** দান।'—রবীন্দ্রনাথ

" **ষষ্ঠী বিভক্তি** (র, এর) : '**দেবতার ধন** (দেবতাকে দত্ত ধন) কে যায় ফিরায়ে ল'য়ে।'—রবীন্দ্রনাথ

" **সপ্তমী বিভক্তি** (এ) : '**অন্ধজনে** দেহ আলো।'—রবীন্দ্রনাথ

অপাদানকারক

যাহা হইতে কোনো কিছুর বিচ্ছেদ বা বিচ্যুতি ঘটে, অর্থাৎ যাহা হইতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি, ভয়, উত্থান, পতন, চলন প্রভৃতি সংঘটিত হয় তাহাকেই বলা হয় **অপাদানকারক**। যেমন—তিনি **বাড়ি হইতে** বাহির হইলেন। **মেঘ হইতে** বৃষ্টি পড়ে।

[অপাদানকারক নানা শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—(১) **বিচ্ছেদার্থক**—**গাছ হইতে** তাল পড়িল। (২) **অধিকরণার্থক**—**ছাদ হইতে** রাস্তার গোলমাল দেখিতেছিলাম। (৩) **কালার্থক**—**ছেলেবেলা থেকে** পড়াশোনায় তার বিশেষ আগ্রহ। (৪) **তারতম্যবাচক**—শীতকালে **দিন অপেক্ষা** রাত্রি দীর্ঘ। (৫) **দূরত্ববাচক**—**পৃথিবী থেকে** চাঁদ অনেক দূরে থাকলেও, রাশিয়ার রকেট গিয়ে সেখানে পৌঁছুল। (৬) **ভীতিবাচক**—**আণবিক বোমা** হইতেই বিশ্ববাসীর ভয়।]

অপাদানকারকে সাধারণত **পঞ্চমী বিভক্তি** যুক্ত হয়। উহা নাম-বিভক্তি—হইতে, হ'তে, থেকে, চেয়ে, কাছে, নিকট, অপেক্ষা, অবধি, পর্যন্ত প্রভৃতি। যেমন—**ধান হইতে** চাউল হয়। **তোমার চেয়ে** রথীন চার বছরের ছোট। **মার কাছে** শুনলাম বাবা কাল দিল্লী রওনা হবেন।

ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিভক্তিও যুক্ত হইতে পারে। যেমন—

অপাদানকারকে প্রথমা বিভক্তি (০) : রাত দশটায় দিল্লী-মেল **হাওড়া** (হাওড়া স্টেশন হইতে) ছাড়ে।

" **দ্বিতীয়া বিভক্তি** (কে) : বড ভয় **বাবাকে** (বাবা হইতে)।

অপাদান- তৃতীয়া বিভক্তি (দিয়া, দিয়ে) : কারকে	গা **দিয়ে** (গা' হইতে) ঘাম ঝরতে লাগলো।
" **ষষ্ঠী বিভক্তি** (র, -এর) :	রাত্রে **সাপখোপের** (সাপ-খোপ হইতে) ভয়ে বাইরে বের হবার উপায় নেই।
" **সপ্তমী বিভক্তি** (এ) :	'**বিপদে** (বিপদ হইতে) মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।' —রবীন্দ্রনাথ
	'ফুলের **গন্ধে** (গন্ধ হইতে) ঘুম আসে না।' —যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অধিকরণকারক

ক্রিয়ার আধারকে বলা হয় অধিকরণ। অর্থাৎ, যে-স্থানে, যে-বিষয়ে, যে-অবস্থায়, অথবা যে-সময়ে ক্রিয়া ঘটে, তাহাতেই হয় **অধিকরণকারক**। যেমন, **বনে** জীবজন্তু থাকে। **বাংলাসহিত্যে** তাঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বসন্তে** প্রকৃতি কি বিচিত্র রূপ ধারণ করে।

অধিকরণ নানাশ্রেণীর। যেমন—

(১) **আধারাধিকরণ :** তিনি **কলিকাতায়** থাকেন। (ইহাতে আধার বা স্থান বুঝায়)—

(একদেশবাচক) **নদীতে** অনেক নৌকা চলিতেছে। **ঘরে** তখন কেহ ছিল না।

(ব্যাপ্তিবাচক) **আমগুলিতে** বেশ রস আছে। **বিছানায়** এতটুকু ময়লা নাই।

(বিষয়বাচক) **পড়াশুনাতে** ছেলেটির খুব উৎসাহ আছে। **ধর্মে** ও **কর্মে** তোমার অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়া আমি মুগ্ধ।

(সামীপ্যবাচক) **দরজায়** পরদা নাই দেখিতেছি! আমরা **নদীতীরে** বেড়াইতে লাগিলাম।

(২) **কালাধিকরণ**—'রৌদ্রতপ্ত **বৈশাখে** তুমি চাতকের সাথে চাহ **জল**।' —নজরুল। '**সন্ধ্যাবেলায়** প্রদীপখানি জ্বেলে যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

(৩) **ভাবাধিকরণ**—'**দুঃখে শোকে নিন্দা পরবাদে** চিত্ত তার ডোবে না **অবসাদে**।'—রবীন্দ্রনাথ। **সূর্যোদয়ে** রাত্রির অন্ধকার দূর **হইল**।

অধিকরণকারকে সাধারণত সপ্তমী-বিভক্তি হয়। এই বিভক্তির চিহ্ন—এ, য়, তে, এতে প্রভৃতি। যেমন—'কত রূপ ধ'রে **কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজো** হে।—রবীন্দ্রনাথ। তাহার **মাথায়** একগাছি চুলও আর নাই। **নদীতে** জোয়ার আসিল। **ঘরেতে** ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।'—রবীন্দ্রনাথ।

[**বীপ্সায় সপ্তমী :** প্রত্যেক অর্থে সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বিরুক্তি হইলে তাহাকে 'বীপ্সায় সপ্তমী' হইয়াছে বলা হয়। এই জাতীয় দ্বিরুক্তিতে প্রথম পদটি অপাদান কারকের এবং দ্বিতীয় পদটি অধিকরণ কারকের কাজ করে। যেমন—'**ফুলে ফুলে** (এক ফুল হইতে অন্য ফুলে); '**তারায় তারায়** (এক তারা হইতে অন্য তারায়) চলেছে সে কোন্ ইশারায়।'—রবীন্দ্রনাথ।]

ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিভক্তিও বসিতে পারে। যেমন—

অধিকরণ-কারকে	**প্রথমা বিভক্তি** (০) :	আমরা এবার **দিল্লী** (দিল্লীতে) যাব ঠিক করেছি। তাড়াতাড়ি **বাড়ি** (বাড়িতে) ফিরতে হবে। এ-**বছর** (বছরে) মোটেই চাষ আবাদ হলো না।
,,	**তৃতীয়া বিভক্তি** (দিয়া, দিয়ে) :	নদীর **ধার দিয়া** (ধারে) গেলেই মন্দিরটি চোখে পড়িবে।
,,	**পঞ্চমী বিভক্তি** (থেকে) :	**প্রাচীর থেকে** (প্রাচীরে) বট গাছটা উঠেছে।

সম্বন্ধ-পদ

ক্রিয়ার সহিত 'সম্বন্ধ'-পদের কোনো যোগ থাকে না বলিয়া উহাকে **কারক** বলা হয় না। উহার সম্পর্ক বিশেষ্য বা সর্বনাম-পদের সহিত। তাই, 'কারক' **না** বলিয়া উহাকে 'পদ' বলা হয়। **সম্বন্ধ-পদে ষষ্ঠী বিভক্তি** (র, -এর) যুক্ত **হয়।** যেমন—**চন্দ্র** অপেক্ষা **পৃথিবীর** আকর্ষণী-শক্তি অধিক। **পাঁচদিনের** ছুটি নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যাব। সম্বন্ধ নানারকমের হইতে পারে। যেমন—

(১) **সামান্য-সম্বন্ধ**—এসব ফল আমার **বাড়ির** গাছে হয়েছে।

(২) **কারক-সম্বন্ধ**—

কর্তৃ-সম্বন্ধ—**শিক্ষকের** উপদেশ পালন কর।

কর্ম-সম্বন্ধ—তিনি **রোগীর** সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

করণ-সম্বন্ধ—**হাতের** লেখা মন্দ হ'লেও, লেখার হাত আর মন্দ কি ?

সম্প্রদান-সম্বন্ধ—**ধোপার** টাকাটা দিয়ে দাও।

অপাদান-সম্বন্ধ—তার বড় **ভূতের** ভয়। **চোখের** জলে সে বুক ভাসিয়ে দিলে।

অধিকরণ-সম্বন্ধ—সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে **দেশের** লোক একেবারে মেতে উঠলো।

(৩) **নিমিত্ত-সম্বন্ধ**—কোথায় বা **পুজোর** ফুল, আর কোথায় বা **জপের** মালা।

(৪) **জন্য-জনক-সম্বন্ধ**—**টাকার** গরমে লোকটা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

(৫) **সমবায়-সম্বন্ধ**—**ফুলের** গন্ধে কেমন একটা মাদকতা আছে।

(৬) **উপাদান-সম্বন্ধ**—কৃষ্ণনগরের **মাটির** পুতুল বিখ্যাত।

(৭) **রূপক-সম্বন্ধ**—এদেশের **অজ্ঞানতার** অন্ধকার দূর করিতেই হইবে।

(৮) **বিশেষণ-সম্বন্ধ**—ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁর **সুখের** সংসার।

(৯) **কার্যকরণ-সম্বন্ধ**—এ-সবই আপনার **পরিশ্রমের** পুরস্কার।

(১০) **ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ**—**একমাসের** ছুটি নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেলাম।

(১১) **অবলম্বন-সম্বন্ধ**—ছেলেটি সেই বিধবা মায়ের **অন্ধের** নড়ি।

(১২) **নির্ধার-সম্বন্ধ**—ননীবাবুর তিন মেয়ের মধ্যে বেলা-ই **সকলের** ছোট।

(১৩) **ব্যবসায়-সম্বন্ধ**—আমার মামা **কাপড়ের** কারবার করেন।

(১৪) **সর্বনাম-সম্বন্ধ**—**তাহাদের** সঙ্গে আপনার শুধু কাজের সম্বন্ধ।

(১৫) **বীপ্সা-সম্বন্ধ**—তুমিই তো আমার একমাত্র **ব্যথার** ব্যথী।

সম্বোধন-পদ

আহ্বান বা ডাকা অর্থে সম্বোধন-পদের ব্যবহার হয়। সম্বোধন-পদে প্রথমা-বিভক্তি (০) বসে। যেমন—'হে **সখা**! মম হৃদয়ে রহো।'—রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেক ক্ষেত্রে, সম্বোধন-পদে স্ত্রীলিঙ্গে **ঈ-কারের স্থানে ই-কার** বসে। যেমন—**দেবি**! **জননি**! **সখি**! কিন্তু, সর্বত্র এই নিয়ম মানা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কবিতায় **আ-কারান্ত** স্ত্রীলিঙ্গবাচক সম্বোধন-পদকে **এ-কারান্ত** করা হয়। যেমন—**ভদ্রে**! **রাধে**! অনেক সময় **হ্যাগো**, **রে**, **ওলো**, **ওরে**, **ওয়ি**, **ওগো**, **হে** প্রভৃতি অব্যয়-পদের সাহায্যেই সম্বোধন-পদের কাজ চলে। এই জাতীয় অব্যয়-পদ অনেক ক্ষেত্রে সম্বোধন-পদের পূর্বেও বসে। যেমন—'**ওগো** মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।'—রবীন্দ্রনাথ। '**হে গোবিন্দ**, ই-কি হ'লো, পকেটটা কেটে নিল।'—অবনীন্দ্রনাথ।

অনুসর্গ

যে-সকল শব্দ বিভক্তির মতো বিশেষ্য বা সর্বনাম-পদের পর বসিয়া উহাদের কোনো-না-কোনো কারকের রূপ দান করে, তাহাদিগকেই বলা হয় **অনুসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়**।

দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সাহায্যে প্রভৃতি অনুসর্গ করণ-কারক প্রকাশ করে। যেমন—সৈনিকেরা তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিতেছে। ছুরি দিয়া পেন্সিলটি কাটো। তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবার জো নেই! রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মহাজাতিসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আলোর সাহায্যে পথের অন্ধকার দূরীভূত হইল। [এই সকল অনুসর্গ তৃতীয়া-বিভক্তির বিকল্প।]

নিমিত্ত, জন্য, তরে, হেতু, সন্ধানে, অন্বেষণে প্রভৃতি অনুসর্গে সম্প্রদান-কারক প্রকাশিত হয়। যেমন—পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিলাম। যার জন্য এত করলে, সে কি তোমায় মনে রাখলে? কার তরে তুই কাঁদিস? অজ্ঞানতা হেতু সে এমন কাজ করিয়াছে। কাহার সন্ধানে তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? জ্ঞান-অন্বেষণে গুরুর শরণাপন্ন হইলাম। [এই সকল অনুসর্গকে **নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তি** বলা যাইতে পারে।]

হইতে, হ'তে, থেকে, কাছে, নিকট (নিকটে), চেয়ে, অপেক্ষা, অবধি প্রভৃতি অনুসর্গ অপাদান-কারক সূচিত করে। যেমন—চাঁদসদাগর বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তোমা হ'তে আজ এই বিপদ! ঘর থেকে বেরিয়ে এসো। টাকাটা বাবার কাছে চেয়ে নাও। তাঁহার নিকট গতমাসে একশ' টাকা ধার লইয়াছিলাম। সে আমার চেয়ে কোন্ বিষয়ে বড? সত্য অপেক্ষা এ-জগতে বড় কিছু নাই। সেই অবধি এখানে বসিয়া আছি। [এই সকল অনুসর্গ পঞ্চমী-বিভক্তির বিকল্প।]

মধ্যে, মাঝে, উপর (উপরে), ভিতর (ভিতরে) প্রভৃতি অনুসর্গে অধিকরণ-কারক সূচিত হয়। যেমন—বাক্সর মধ্যে টাকা আছে। 'ফুল ফুটে বনমাঝে।'—রবীন্দ্রনাথ। 'একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দু।'—রবীন্দ্রনাথ। বাড়ির ভিতরে তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। [এই সকল অনুসর্গ সপ্তমী-বিভক্তিরই কাজ করে।]

এই সকল অনুসর্গ ব্যতীত বাংলায় আরও কয়েকটি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ্যের মতো বসে এবং ষষ্ঠী-বিভক্তির পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—

প্রতি ঃ তাহার প্রতি চাহিলাম। **সঙ্গে, সাথে, সনে ঃ** তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নাই। আমার সাথে যাবি কে আয় আজকে যমুনায়? যুদ্ধ বেধেছে ঐ কৌরব-সনে। **ছাড়া, ভিন্ন, বিহনে, বিনা ঃ** তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব? সে ভিন্ন এমন কাজ কেহ করিতে পারে না। 'উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?'—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। সঙ্গত্ বিনা সঙ্গীত জমে না। **মত, মতন ঃ** তোমার মত বোকা আর দেখিনি। 'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।'—রবীন্দ্রনাথ। **আগে, পিছে, পরে ঃ** স্নানের আগে ভালো ক'রে তেল মেখে নাও। তাহার পিছে পিছে চলিলাম। খাওয়ার পরে ওষুধটা খেয়ে নিও। [এই জাতীয় আরও অনেক শব্দ যেগুলি কখনও অব্যয়, কখনও বা অনুসর্গের মতো প্রযুক্ত হয়।]

কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি ঃ বাংলায় কারক-বিভক্তি খুবই অল্প। যেমন—কে, রে, র, এ, য়, তে, এতে। সাধারণত দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তিরূপে কর্মকারক বা সম্প্রদানকারকের শব্দের শেষে বসে **কে** বা **রে**, ষষ্ঠী বিভক্তিরূপে সম্বন্ধ-পদের শেষে বসে **র** বা **এর**; আর সপ্তমী-বিভক্তি হিসাবে অধিকরণকারকের শব্দের সহিত যুক্ত হয় **এ, য়, তে,** বা **এতে**। বহুবচনে কারক-বিভক্তির জন্য শব্দের সঙ্গে **গণ, দিগ** বা **দে** প্রত্যয় যোগ করিয়া তাহার শেষে আবার সাধারণ রীতি অনুসারে কারক-বিভক্তি ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—ছাত্র + গণ + কে = ছাত্রগণকে ; ছাত্র + দিগ + কে = ছাত্রদিগকে। ছাত্র + গণ + এর = ছাত্রগণের ; ছাত্র + দিগ + এর = ছাত্রদিগের ; ছাত্র + দে + র = ছাত্রদের প্রভৃতি।

এ-বিভক্তি সকল কারকেই বসিতে পারে। অর্থাৎ, এ-কারান্ত সপ্তমী বিভক্তি সকল কারকেই প্রযুক্ত হয়। যেমন—**কর্তৃকারকে ঃ লোকে** কী না বলতে পারে! **কর্মকারকে ঃ** 'সদা বরিব **সত্যে**।'—কালিদাস রায়। **করণকারকে ঃ** সবুজ **ঘাসে** সারা মাঠ ছেয়ে গেছে। **সম্প্রদানকারকে ঃ** '**অন্ধজনে** দেহ আলো, **মৃতজনে** দেহ প্রাণ।'—রবীন্দ্রনাথ। **অপাদানকারকে ঃ** '**বিপদে** মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।'—রবীন্দ্রনাথ। **অধিকরণকারকে ঃ** 'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত **ভারতে**।'—মাইকেল মধুসূদন।

[অ-ভিন্ন অন্য কোনো স্বরবর্ণান্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে, এই 'এ'-ই আবার **য়, তে** বা **এতে** পরিণত হয়। যেমন—রাজা + এ = **রাজায়** (রাজায় রাজায় বাধে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়) ; নদী + এ = নদী + তে = **নদীতে** (নদীতে বড় বড় নৌকো দেখা যাচ্ছে) ; ঘর + এ = ঘর + এতে = **ঘরেতে** ('ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।'—রবীন্দ্রনাথ।]

কে-বিভক্তি যখন কোনো শব্দের সহিত বসে তখন কর্মকারক বা সম্প্রদান কারক হয়। যেমন—কাকা **সুনীলকে** একখানা ছবির বই দিলেন। (এখানে কর্মকারক)। 'বেলা যে পড়ে এলো : **জলকে** চল।'—রবীন্দ্রনাথ। (এখানে সম্প্রদানকারক—অর্থাৎ, জলের জন্য—নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তি।)

র-এর বিভক্তি সম্বন্ধ-পদের চিহ্ন। যেমন—নদী + র = **নদীর** (নদীর জল); মানুষ + এর = **মানুষের** (মানুষের জীবন)। [**রা** ও **এরা**—বহুবচনের কারক-বিভক্তি চিহ্ন। যেমন—বালিকা + রা = **বালিকারা**; বালক + এরা = **বালকেরা**।]

কারক-নির্দেশকারী এমন কোনো বিভক্ত নাই (একমাত্র 'এ'-ছাড়া); যাহাতে করণকারক বা অপাদানকারক সূচিত হইতে পারে। তাই করণকারক প্রকাশ করিতে **দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সাহায্যে** প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। ইহারা তৃতীয়া-বিভক্তির বিকল্প। সেইরকম, **হইতে, হ'তে, থেকে, কাছে, কাছ হইতে, কাছ থেকে, নিকট হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা অবধি** প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় অপাদানকারক সূচিত করিতে। ইহারা পঞ্চমী-বিভক্তির বিকল্প। সম্প্রদান-কারকেও কয়েকটি অনুসর্গ আছে। যেমন—**জন্য, তরে, নিমিত্ত, লাগিয়া, লেগে, হেতু, সন্ধানে, অন্বেষণে**। ইহারা নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির বিকল্প। অধিকরণকারকেরও কয়েকটি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। উহাদের সপ্তমী-বিভক্তির বিকল্প বলা যাইতে পারে। যেমন—**মধ্যে, মাঝে, ভিতর, ভিতরে, উপর, উপরে**। **রা** ও **এরা** যেমন বহুবচনের (কারক-বিভক্তি) চিহ্ন, সেইরকম, **গুলা, গুলি, গুলো, আদি, গণ, মালা, সমূহ, বৃন্দ, রাজি, রাশি, কুল** প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন (নামবিভক্তি) বা অনুসর্গ।

কারক-অনুসারে শব্দরূপ

[বিশেষ্য]

ছেলে

একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—ছেলে	ছেলেগুলি, ছেলেরা
কর্মকারক, সম্প্রদানকারক—ছেলেকে	ছেলেগুলিকে, ছেলেদের
করণকারক—ছেলেকে দিয়ে	ছেলেগুলিকে দিয়ে, ছেলেদের দিয়ে

একবচন	বহুবচন
অপাদানকারক—ছেলে হ'তে, ছেলে থেকে	ছেলেগুলি হ'তে, ছেলেগুলি থেকে, ছেলেদের থেকে
অধিকরণকারক—ছেলেতে, ছেলের মধ্যে	ছেলেগুলিতে, ছেলেদের মধ্যে, ছেলেগুলির মধ্যে
সম্বন্ধ-পদ—ছেলের	ছেলেগুলির, ছেলেদের

[তৎসম-শব্দ ভিন্ন, তদ্ভব ও খাঁটি-বাংলার অন্যান্য বিশেষ্য-শব্দের রূপ প্রায় এইরকম।]

ছাত্র

কর্তৃকারক—ছাত্র	ছাত্রগণ, ছাত্রবৃন্দ, ছাত্রেরা
কর্মকারক / **সম্প্রদানকারক** —ছাত্রকে	ছাত্রগণকে, ছাত্রবৃন্দকে, ছাত্রদিগের, ছাত্রদের
করণকারক—ছাত্র দ্বারা, ছাত্র কর্তৃক, ছাত্রকে দিয়া (দিয়ে)	ছাত্রগণের দ্বারা, ছাত্রবৃন্দের দ্বারা, ছাত্রদিগের দ্বারা, ছাত্রদের দিয়া (দিয়ে), ছাত্রগণ কর্তৃক, ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক
অপাদানকারক—ছাত্র হইতে, ছাত্র থেকে	ছাত্রগণ হইতে, ছাত্রবৃন্দ হইতে, ছাত্রদিগের হইতে, ছাত্রদের থেকে
অধিকরণকারক—ছাত্রে, ছাত্রের মধ্যে	ছাত্রগণের মধ্যে, ছাত্রবৃন্দের মধ্যে, ছাত্রদিগেতে, ছাত্রদিগের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে
সম্বন্ধ-পদ—ছাত্রের	ছাত্রগণের, ছাত্রবৃন্দের, ছাত্রদিগের, ছাত্রদের

[বেশির ভাগ তৎসম বিশেষ্য শব্দের রূপ এইরকম। তবে, বহুবচনবোধক নাম-বিভক্তি বা অনুসর্গ এক এক শব্দে এক এক রকম।]

[সর্বনাম]

আমি

একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—আমি, মুই	আমরা, মোরা
কর্মকারক / **সম্প্রদানকারক** — আমাকে, আমারে, আমায় মোকে, মোরে	আমাদিগকে, আমাদের, আমাদের মোদিকে (আমাদিকে)
করণকারক—আমা দ্বারা (আমা কর্তৃক), আমার দ্বারা, মোর দ্বারা, আমাকে দিয়া, আমাকে দিয়ে	আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, আমাদের দিয়া, আমাদের দিয়ে, মোদের দিয়ে

	একবচন	বহুবচন
অপাদানকারক—	আমা হইতে, আমা হ'তে, আমার থেকে, মোর থেকে, আমার নিকট হইতে, আমার কাছ থেকে	আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে, আমাদের থেকে, মোদের হ'তে, মোদের থেকে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	আমাতে, আমায়, আমার মধ্যে, আমার মাঝে, মোর মাঝে	আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে, মোদের মাঝে
সম্বন্ধ-পদ—	আমার, মোর, মম	আমাদিগের, আমাদের, মোদের

তুমি

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—	তুমি	তোমরা
কর্মকারক, সম্প্রদানকারক	তোমাকে, তোমায়	তোমাদিগকে, তোমাদের
করণকারক—	তোমা দ্বারা, তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়া, তোমাকে দিয়ে	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদের দিয়া, তোমাদের দিয়ে:
অপাদানকারক—	তোমা হইতে, তোমার হইতে, তোমা হ'তে, তোমার থেকে, তোমার নিকট হইতে, তোমার কাছ থেকে	তোমাদিগের হইতে, তোমাদের হইতে, তোমাদের থেকে, তোমাদিগের নিকট হইতে, তোমাদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	তোমাতে, তোমায়, তোমার মধ্যে, তোমার মাঝে	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে, তোমাদের মাঝে
সম্বন্ধ পদ—	তোমার, তব	তোমাদিগের, তোমাদের

তুই

কর্তৃকারক—	তুই	তোরা
কর্মকারক, সম্প্রদানকারক	—তোকে	(তোদিকে) তোদের
করণকারক—	তোকে দিয়ে, তোর দ্বারা	তোদের দিয়ে, তোদের দ্বারা
অপাদানকারক—	তোর থেকে, তোর কাছ থেকে	তোদের থেকে, তোদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	তোতে, তোর মধ্যে	তোদের মধ্যে, তোদের মাঝে

আপনি

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—	আপনি	আপনারা
কর্মকারক / সম্প্রদানকারক	—আপনাকে	আপনাদিগকে, আপনাদের
করণকারক—	আপনার দ্বারা, আপনাকে দিয়া, আপনাকে দিয়ে	আপনাদিগের দ্বারা, আপনাদের দ্বারা, আপনাদের দিয়া, আপনাদের দিয়ে
অপাদানকারক—	আপনা হইতে, আপনার নিকট হইতে, আপনার কাছ থেকে	আপনাদিগের হইতে, আপনাদের হইতে, আপনাদের নিকট হইতে, আপনাদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	আপনাতে, আপনার মধ্যে, আপনার মাঝে	আপনাদিগেতে, আপনাদের মধ্যে, আপনাদের মাঝে
সম্বন্ধ-পদ—	আপনার	আপনাদিগের, আপনাদের

সে

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—	সে	তাহারা, তারা
কর্মকারক / সম্প্রদানকারক	—তাহাকে, তাকে	তাহাদিগকে, তাদিকে, তাহাদের, তাদের
করণকারক—	তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়া, তাহাকে দিয়ে	তাহাদিগের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, তাহাদের দিয়া, তাদের দিয়ে
অপাদানকারক—	তাহা হইতে, তাহার হইতে, তা হ'তে, তার থেকে, তাহার নিকট হইতে, তার কাছ থেকে	তাহাদের হইতে, তাদের হ'তে, তাদের থেকে, তাহাদের নিকট হইতে, তাদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	তাহাতে, তাতে, তাহার মধ্যে, তার মধ্যে, তার মাঝে	তাহাদিগেতে. তাহাদের মধ্যে, তাদের মধ্যে, তাদের মাঝে
সম্বন্ধ-পদ—	তাহার, তার	তাহাদের, তাদের

তিনি

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক—	তিনি	তাঁহারা, তাঁরা
কর্মকারক / সম্প্রদানকারক	—তাঁহাকে, তাঁকে	তাঁহাদিগকে, তাঁদিকে, তাঁহাদের, তাঁদের

	একবচন	বহুবচন
করণকারক—	তাঁহার দ্বারা, তাঁর দ্বারা, তৎ কর্তৃক, তাঁহাকে দিয়া, তাঁকে দিয়ে	তাঁহাদের দ্বারা, তাঁদের দ্বারা, তাঁহাদের দিয়া, তাঁদের দিয়ে
অপাদানকারক—	তাঁহার হইতে, তাঁর থেকে, তাঁহার নিকট হইতে, তাঁর কাছ থেকে	তাঁহাদের হইতে, তাঁদের থেকে, তাঁহাদের নিকট হইতে, তাঁদের কাছ থেকে
অধিকরণকারক—	তাঁহাতে, তাঁহার উপর, তাঁহার মধ্যে, তাঁর ওপর, তাঁর মাঝে	তাঁহাদের উপর, তাঁহাদের মধ্যে, তাঁদের ওপর, তাঁদের মাঝে,
সম্বন্ধ পদ—	তাঁহার, তাঁর	তাঁহাদের, তাঁদের

[সর্বনাম যাহা, তাহা, ইহা, উহা, এ, ও, যে, কে, ইনি, উনি, যিনি প্রভৃতি শব্দের রূপ এইভাবেই গঠিত হয়। যেমন—

যাহা, তাহা, ইহা, উহা

কর্তৃকারক	(একবচন) :	যাহা, তাহা, ইহা, উহা
	(বহুবচন) :	যাহারা, তাহারা, ইহারা, উহারা
কর্মকারক	(একবচন) :	যাহাকে, তাহাকে, ইহাকে, উহাকে
	(বহুবচন) :	যাহাদিগকে (যাহাদের), তাহাদিগকে (তাহাদের), ইহাদিগকে (ইহাদের), উহাদিগকে (উহাদের)
করণকারক	(একবচন) :	যাহা দ্বারা, তাহা দ্বারা, ইহা দ্বারা, উহার দ্বারা, যাহাকে দিয়া, তাহাকে দিয়া, ইহাকে দিয়া, উহাকে দিয়া
	(বহুবচন) :	যাহাদিগের দ্বারা, তাহাদিগের দ্বারা, ইহাদিগের দ্বারা, উহাদিগের দ্বারা, যাহাদের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, ইহাদের দ্বারা, উহাদের দ্বারা, যাহাদিগকে দিয়া, তাহাদিগকে দিয়া, ইহাদিগকে দিয়া, উহাদিগকে দিয়া, যাহাদের দিয়া, তাহাদের দিয়া, ইহাদের দিয়া, উহাদের দিয়া
সম্প্রদান কারক	(একবচন) (বহুবচন) :	কর্মকারকের অনুরূপ
অপাদান কারক	(একবচন) :	যাহা হইতে, যাহার নিকট হইতে, তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, ইহা হইতে, ইহার নিকট হইতে, উহা হইতে, উহার নিকট হইতে

অপাদান কারক	(বহুবচন) :	যাহাদের হইতে, যাহাদের নিকট হইতে, তাহাদের হইতে, তাহাদের নিকট হইতে, ইহাদের হইতে, ইহাদের নিকট হইতে, উহাদের হইতে, উহাদের নিকট হইতে
অধিকরণ কারক	(একবচন) :	যাহাতে, তাহাতে, ইহাতে, উহাতে, যাহার মধ্যে, তাহার মধ্যে, ইহার মধ্যে, উহার মধ্যে
	(বহুবচন) :	যাহাদিগতে, তাহাদিগতে, ইহাদিগতে, উহাদিগতে, যাহাদের মধ্যে, তাহাদের মধ্যে, উহাদের মধ্যে
সম্বন্ধ পদ	(একবচন) :	যাহার, তাহার, ইহার, উহার
	(বহুবচন) :	যাহাদিগের, তাহাদিগের, ইহাদিগের, উহাদিগের, যাহাদের, তাহাদের, ইহাদের, উহাদের

এ, ও, যে, কে

কর্তৃকারক	(একবচন) :	এ, ও, যে, কে
	(বহুবচন) :	এরা, ওরা, যারা, কারা
কর্মকারক	(একবচন) :	একে, ওকে, যাকে, কাকে
	(বহুবচন)	এদের, ওদের, যাদের, কাদের, এদেরকে, ওদেরকে, যাদেরকে, কাদেরকে
করণকারক	(একবচন) :	এর দ্বারা, ওর দ্বারা, যার দ্বারা, কার দ্বারা, একে দিয়ে, ওকে দিয়ে, যাকে দিয়ে, কাকে দিয়ে, এ দিয়ে, ও দিয়ে, যা দিয়ে, ০
	(বহুবচন)	এদের দ্বারা, ওদের দ্বারা, যাদের দ্বারা, কাদের দ্বারা, এদের দিয়ে, ওদের দিয়ে, যাদের দিয়ে, কাদের দিয়ে এগুলি দিয়ে, ওগুলি, দিয়ে, যেগুলি দিয়ে, ০
সম্প্রদান কারক	(একবচন) (বহুবচন) :	কর্মকারকের অনুরূপ
অপাদানকারক	(একবচন) :	এ থেকে, ও থেকে, যা থেকে, ০ এর থেকে, ওর থেকে, যার থেকে, কার থেকে, এর কাছ থেকে, ওর কাছ থেকে, যার কাছ থেকে, কার কাছ থেকে, এ হ'তে, ও হ'তে, যা হ'তে, ০

অপাদানকারক (বহুবচন) এগুলি থেকে, ওগুলি থেকে, যেগুলি থেকে, o
এদের থেকে, ওদের থেকে, যাদের থেকে, কাদের থেকে, এদের কাছ থেকে, ওদের কাছ থেকে, যাদের কাছ থেকে, কাদের কাছ থেকে, এ-সব হ'তে, ও-সব হ'তে, যা-সব হ'তে, o

অধিকরণকারক (একবচন) এতে, ওতে, যাতে, কা'তে
এর মধ্যে, ওর মধ্যে, যার মধ্যে, কার মধ্যে

(বহুবচন) এগুলিতে, ওগুলিতে, যেগুলিতে, o
এদের মধ্যে, ওদের মধ্যে, যাদের মধ্যে, কাদের মধ্যে

সম্বন্ধ-পদ (একবচন) এর, ওর, যার, কার

(বহুবচন): এগুলির, ওগুলির, যেগুলির, o
এদের, ওদের, যাদের, কাদের

ইনি উনি, যিনি

কর্তৃকারক (একবচন): ইনি, উনি, যিনি

(বহুবচন): এঁরা, ওঁরা, যাঁরা (যাঁহারা)

কর্মকারক (একবচন) এঁকে (এঁনাকে), ওঁকে (ওঁনাকে), যাঁকে (যাঁহাকে)

(বহুবচন) এঁদের, এঁদেরকে, ওঁদের, ওঁদেরকে, যাঁদের (যাঁহাদের)

করণকারক (একবচন) এঁর দ্বারা, ওঁর দ্বারা, যাঁর দ্বারা (যাঁহার দ্বারা),
এঁকে দিয়ে, ওঁকে দিয়ে, যাঁকে দিয়ে (যাঁহাকে দিয়া)

(বহুবচন) এঁদের দ্বারা, ওঁদের দ্বারা, যাঁদের দ্বারা (যাঁহাদের দ্বারা)
এঁদের সবাইকে দিয়ে, ওঁদের সবাইকে দিয়ে, যাঁদের সবাইকে দিয়ে

সম্প্রদান কারক (একবচন) (বহুবচন) } কর্মকারকের অনুরূপ

অপাদান কারক (একবচন) এঁর থেকে, ওঁর থেকে, যাঁর থেকে (যাঁহার হইতে),
এঁর কাছ থেকে, ওঁর কাছ থেকে, যাঁর কাছ থেকে (যাঁহার নিকট হইতে)

(বহুবচন): এঁদের থেকে, ওঁদের থেকে, যাঁদের থেকে (যাঁহাদের হইতে),
এঁদের কাছ থেকে, ওঁদের কাছ থেকে, যাঁহার কাছ থেকে (যাঁহাদের নিকট হইতে)

অধিকরণ কারক	(একবচন) :	এঁতে, ওঁতে, যাঁতে (যাঁহাতে),
		এঁর মধ্যে, ওঁর মধ্যে, যাঁর মধ্যে (যাঁহার মধ্যে)
	(বহুবচন) :	এঁদের মধ্যে, ওঁদের মধ্যে, যাঁদের মধ্যে (যাঁহাদের মধ্যে)
সম্বন্ধ-পদ	(একবচন) :	এঁর, ওঁর, যাঁর (যাঁহার),
		এঁনার, ওঁনার, ০
	(বহুবচন) :	এঁদের, ওঁদের, যাঁদের (যাঁহাদের),
		এনাদের, ওনাদের, ০

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে ? বাংলায় কারক কয় প্রকার ও কী কী ?

২। বিভক্তি কাহাকে বলে ? কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি বসে ? উদাহরণ দাও।

৩। করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক দৃষ্টান্ত দাও।

৪। কারক-বিভক্তি ও নাম-বিভক্তি বলিতে কী বুঝায় ?

৫। অনুসর্গ কী ? কোন্ কারকে কোন্ কোন্ অনুসর্গ বসে ? উদাহরণ দাও।

৬। সমস্ত কারকে 'এ'-যুক্ত সপ্তমী-বিভক্তির দৃষ্টান্ত দাও।

৭। টীকা লিখ :—

কর্মপ্রবচনীয়, নিমিত্তার্থে চতুর্থী, বিষয়াধিকরণ, ভাবাধিকরণ, কালাধিকরণ, জন্য-জনক সম্বন্ধ, বীপ্সায় সপ্তমী, রূপক সম্বন্ধ, অপাদান সম্বন্ধ, নিমিত্ত সম্বন্ধ।

৮। উদাহরণ দাও :—

অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তির লোপ, কর্মকারকে প্রথমা (বা শূন্য) বিভক্তি, অধিকরণকারকে পঞ্চমী বিভক্তি, অপাদানকারকে তৃতীয়া বিভক্তি, সম্প্রদানকারকে প্রথমা (বা শূন্য) বিভক্তি, করণকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি।

৯। বালক, মেঘ, পর্বত, রবীন্দ্রনাথ ও ফুল শব্দের রূপ লিখ।

১০। 'আমি'-শব্দের করণকারকের, 'তুই'-শব্দের কর্মকারকের, 'সে'-শব্দের অপাদানকারকের, 'যিনি'-শব্দের অধিকরণকারকের, 'ও'-শব্দের কর্তৃকারক ও সম্বন্ধ-পদের রূপ লিখ।

পরস্পরের সহিত অর্থের সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে একপদে পরিণত করাকেই **'সমাস'** নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—মেঘ ও রৌদ্র=**মেঘরৌদ্র** ; কুয়াশায় আচ্ছন্ন=**কুয়াশাচ্ছন্ন** ; বীণা পাণিতে যাঁহার=**বীণাপাণি** ; দিন দিন=**প্রতিদিন** ; ভালো যে মানুষ=**ভালোমানুষ** ; দেশের গৌরব=**দেশগৌরব**। সমাসে যে নূতন পদ গঠিত হয় তাহাকে বলে **সমস্ত-পদ,** আর যে-সকল পদের যোগে সমাস হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **সমস্যমান-পদ**। সমাস ঘটাইতে (বা তাহার অর্থ বিশ্লেষণ করিতে) যে-বাক্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে কেহ বলেন **ব্যাসবাক্য**, কেহ বলেন **বিগ্রহ-বাক্য,** কেহ বা বলেন **সমাস-বাক্য**। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমস্যমান-পদগুলিতে যদি সন্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাদের সন্ধি করাই বিধেয়। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যমান-পদের মধ্যে হাইফেন বসাইয়াও সমাসবদ্ধ-পদ প্রকাশ করা হয়।

সংস্কৃতে সমাসের প্রয়োগ-বাহুল্য আছে। সে-তুলনায়, সমাসবদ্ধ খাঁটি বাংলা শব্দ অনেক কম। কিন্তু, বাক্যের সৌষ্ঠববৃদ্ধি তথা গাঢ়বদ্ধতার জন্য তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে আমরা যতদূর সম্ভব সমাস করিবার পক্ষপাতী। এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সহিত দেশজ (বা অসংস্কৃত) শব্দের কখনও সমাস হয় না। আর, অকারণে বা অপ্রয়োজনে সমাস-বন্ধন করা আদৌ উচিত নহে। রচনার সৌন্দর্য-বিধানের জন্যই সমাস,—তাই, অসঙ্গত বা শ্রুতিটুকু কোনো সমাসবদ্ধ-পদ সৃষ্টি না করাই শ্রেয়।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার—**তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, কর্মধারয়, বহুব্রীহি** ও **অব্যয়ীভাব**।

তৎপুরুষ-সমাস

যে-সমাসে পূর্বের পদটি শেষপদের কোনো কারক বুঝায়, এবং শেষপদের **অর্থই** প্রধান হয়, তাহাকে বলা হয় **তৎপুরুষ সমাস**। পূর্বপদের বিভক্তির লোপ অনুসারে তৎপুরুষ-সমাস ছয় প্রকার। যেমন—

(১) **দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ** [পূর্বপদে দ্বিতীয়া-বিভক্তির লোপ]ঃ **ভাতরাঁধা** (ভাতকে রাঁধা), **জলতোলা** (জলকে তোলা), **কাঠকাটা** (কাঠকে কাটা), **ফুলতোলা** (ফুলকে তোলা), **নথনাড়া** (নথকে নাড়া), **চরণাশ্রিত** (চরণকে

আশ্রয় করিয়া যে), **গঙ্গাপ্রাপ্তি** (গঙ্গাকে প্রাপ্তি), **চিরশত্রু** (চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু), **ক্ষণস্থায়ী** (ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী), **মাসাশৌচ** (মাস ব্যাপিয়া অশৌচ) প্রভৃতি। সেইরকম—বাসন-মাজা, রথ-দেখা, লোক-দেখানো, হাঁড়িভাঙ্গা, দেবাশ্রিত, শরণাগত, চিরস্থায়ী, সংখ্যাতীত, পদাশ্রিত, কণ্ঠলগ্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত, মজ্জাগত ইত্যাদি।

(২) **তৃতীয়া-তৎপুরুষ** [পূর্বপদে তৃতীয়া-বিভক্তি বা অনুসর্গের লোপ]: **দা-কাটা** (দা দিয়ে কাটা), **জাঁতাভাঙ্গা** (জাঁতা দিয়ে ভাঙ্গা), **কলছাঁটাই** (কল দিয়ে ছাঁটা), **কালিমাখা** (কালি দিয়ে মাখা), **চামড়াবাঁধা** (চামড়া দিয়ে বাঁধানো), **ছায়াশীতল** (ছায়া দ্বারা শীতল), **শোকার্ত** (শোকের দ্বারা আর্ত), **মেঘাচ্ছন্ন** (মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন), **মোহান্ধ** (মোহ দ্বারা অন্ধ) প্রভৃতি। সেইরকম—ঢেঁকিছাঁটা, কুমড়োবোঝাই, পাথরচাপা, ছাইচাপা, মধুমাখা, বিষপোরা, ঢেরাসই, নজরবন্দী, জবানবন্দী, দুধসাবু, বাদুড়চোষা, ঝাঁটাপেটা, গোঁজামিল, শ্রমলব্ধ, পদদলিত, তিমিরলিপ্ত, শোকাকুল, বাষ্পচালিত, শরবিদ্ধ, শ্রীযুক্ত, ভ্রমশূন্য, বর্ষামুখর, যন্ত্রচালিত, জ্ঞানহীন, সর্পদষ্ট, আলোকদীপ্ত, শ্রীহীন, গুণান্বিত, ভাগ্যহত, রবাহূত, শ্বাপদসঙ্কুল, বিনয়াবনত, তৃষ্ণাতুর, বিরহকাতর, বাগ্দত্তা, গুণমুগ্ধ, স্নেহান্ধ ইত্যাদি।

(৩) **চতুর্থী-তৎপুরুষ** [পূর্বপদে চতুর্থী-বিভক্তি বা নিমিত্তবাচক অনুসর্গের লোপ]: **ডাকমাশুল** (ডাকের জন্য মাশুল), **বিয়েপাগলা** (বিয়ের জন্য পাগলা), **রান্নাঘর** (রান্নার জন্য ঘর), **দেবোৎসৃষ্ট** (দেবতাকে উৎসৃষ্ট), **যূপকাষ্ঠ** (যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ), **রঙ্গমঞ্চ** (রঙ্গের নিমিত্ত মঞ্চ) প্রভৃতি। সেইরকম—মড়াকান্না, মরণকাঠি, জীয়নকাঠি, মালগুদাম, মেয়েস্কুল, খাইখরচা, ঘুম-কাতুরে, চোষকাগজ, লবণ-আইন, মাগ্‌গি-ভাতা, ধানক্ষেত, মালগাড়ি, ঠাকুরঘর, ফুলবাগান, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, নাটমন্দির, বরণমাল্য, বন্দনাগান, স্নানবারি, রন্ধনপাত্র, দেবত্র, অনাথ-আশ্রম, দেবার্পিত ইত্যাদি।

(৪) **পঞ্চমী-তৎপুরুষ** [পূর্বপদে পঞ্চমী-বিভক্তি বা অনুসর্গের লোপ]: **হারছেঁড়া** (হার হইতে ছেঁড়া), **বাড়িছাড়া** (বাড়ি হইতে ছাড়া), **স্কুল-পালানো** (স্কুল হইতে পালানো), **জেলখালাস** (জেল হইতে খালাস), **গাছ-পাড়া** (গাছ হইতে পাড়া), **বিলাতফেরত** (বিলাত হইতে ফেরত), **লোকভয়** (লোক হইতে ভয়), **স্থানচ্যুত** (স্থান হইতে চ্যুত), **সত্যভ্রষ্ট** (সত্য হইতে ভ্রষ্ট), **দুগ্ধজাত** (দুগ্ধ হইতে জাত) প্রভৃতি। সেইরকম—গাঁ-ছাড়া, দিক্‌হারা, ঘরছাড়া, চাকভাঙ্গা, আগাগোড়া, বিদেশাগত, মেঘমুক্ত, পদচ্যুত, বৃন্তচ্যুত, রাজ্যচ্যুত, শ্বাসযুক্ত, জন্মান্ধ, আদ্যন্ত, বিপদাশঙ্কা, চৌরভয়, স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রোত্তর, উত্তরোত্তর, কার্পাসজাত, গমজাত ইত্যাদি।

(৫) **ষষ্ঠী-তৎপুরুষ :** [পূর্বপদে ষষ্ঠীবিভক্তির লোপ] : **পুকুরঘাট** (পুকুরের ঘাট), **ঠাকুরপো** (ঠাকুরের অর্থাৎ শ্বশুরের পো), **তালপাতা** (তালের পাতা), **গঙ্গাজল** (গঙ্গার জল), **রাজপুরী** (রাজার পুরী), **দেশসেবক** (দেশের সেবক), **দুর্গতোরণ** (দুর্গের তোরণ) প্রভৃতি। সেইরকম—ঠাকুরঝি, ভাইপো, বোনপো, ভাসুর-পো, ভাইঝি, বোনঝি, ভাসুরঝি, নাতনি, মামাবাড়ি, কুটুমবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, চা-বাগান, ফুলবাগান, শহরতলি, বাগ্‌দিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, কুকুরছানা, মৌচাক, গঙ্গাতীর, গঙ্গামাটি, দেশগৌরব, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশাপণ সভাপতি, মনোবন, হৃদয়গগন, চরণধ্বনি, নদীতট, আঁখিতারা, ভকত-হৃদয়, ভারত-তনয়, গৃহদীপ, রাজ্য-শাসন, রাজসিংহাসন, পুষ্পগন্ধ, কবিগুরু, ব্রাহ্মসমাজ, জনসভা ইত্যাদি। [সাহায্য কিংবা তুলনা অর্থেও ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন—পিতৃতুল্য, সোদর-প্রতিম, পত্নীসহ, মুনিসঙ্গ, অনুচরসহ প্রভৃতি। বহুত্ববোধক শব্দযোগেও এই সমাস হয়। যেমন—দেবগণ, ছাত্রবৃন্দ, রাজকুল, তরঙ্গরাশি, বৃক্ষরাজি, মেঘমালা প্রভৃতি।]

(৬) **সপ্তমী-তৎপুরুষ :** [পূর্বপদে সপ্তমী-বিভক্তির লোপ] : **বাক্সবন্দী** (বাক্সে বন্দী), **গোলাভরা** (গোলাতে ভরা), **গাছপাকা** (গাছে পাকা), **তালকানা** (তালে কানা), **ঝুড়িভর্তি** (ঝুড়িতে ভর্তি), **ঘরপাতা** (ঘরে পাতা), **গৃহজাত** (গৃহে জাত), **জলমগ্ন** (জলে মগ্ন), **রণদক্ষ** (রণে দক্ষ), **ভোগাসক্ত** (ভোগে আসক্ত), **অশ্বারূঢ়** (অশ্বে আরূঢ়) প্রভৃতি। সেইরকম—রাতকানা, বাটাভরা, পাড়া-বেড়ানী, ভোজনদড়, ঘরপোষা, মনমরা, বস্তাপচা, সিন্দুকবোঝাই, গাড়িভর্তি, কোণঠাসা, মাথাব্যথা, তালিকাভুক্ত অকালমৃত্যু, কর্মনিপুণ, রণনিপুণ, সমরকুশল, শিল্পদক্ষ, কার্যদক্ষ, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, নরাধম, পাপাসক্ত, নরোত্তম, বনজাত, লোকবিশ্রুত, সত্যাগ্রহ, সদ্যোজাত, বনবাস, ভুবন-বিখ্যাত, দলবদ্ধ, সাহিত্যরসিক ইত্যাদি।

[তৎপুরুষ-সমাস বলিতে আরও তিনটি সমাসকে বুঝায়—(ক) **উপপদ-তৎপুরুষ** ; (খ) **নঞ্‌-তৎপুরুষ** ; (গ) **অলুক-তৎপুরুষ**।

(ক) **উপপদ-তৎপুরুষ :** উপপদের সহিত কৃদন্ত-পদের যে-সমাস, তাহাকেই বলা হয় উপপদ-তৎপুরুষ সমাস। যেমন—**ধামাধরা** (ধামা ধরে যে), **ছেলেধরা** (ছেলে ধরে যে) **সর্বনাশ** (সর্বনাশ করে যে), **ঘরভেদী** (ঘর ভেদ করে যে), **পকেটমার** (পকেট মারে যে), **ভূচর** (ভূ-তে চরে যে), **কুম্ভকার** (কুম্ভ করে যে), **সত্যবাদী** (সত্য বলে যে), **শত্রুঘ্ন** (শত্রুকে হনন করে যে) প্রভৃতি। সেইরকম—ছা-পোষা, ফেলকরা, একটানা, শতেকখাকী, মুখপোড়া, পাসকরা, ভুঁইফোড়, বর্ণচোরা, নিমেষহারা, বাজিকর, হালুইকর, সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার,

মালাকর, দিবাকর, প্রভাকর, নিশাচর, স্থলচর, জলচর, শ্রুতিধর, ভূধর, গঙ্গাধর, ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, ইন্দ্রজিৎ, স্মরজিৎ, সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ, মনোজিৎ, সরোজ, পঙ্কজ, মধুপ, পাদপ, ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবজ্ঞ, তন্তুবায়, সত্যভাষী, মিষ্টভাষী ইত্যাদি।

(খ) **নঞ্-তৎপুরুষ :** নঞর্থক (অর্থাৎ, নাই এইরূপ অর্থবোধক) পূর্বপদের সহিত যে-সমাস হয় তাহাকে বলা হয় নঞ্-তৎপুরুষ সমাস। নঞ্ অর্থে না, নাই, নয় ইত্যাদি বুঝায়। খাঁটি বাংলায় নঞর্থক শব্দ হইল—**অ, আ, না, অনা, বে, বি, গর** প্রভৃতি। সংস্কৃতে—অন্, অ, ন, নাতি, নির্, নিঃ প্রভৃতি। যেমন—**অমানুষ** (নয় মানুষ), **আকাল** (কালের অর্থাৎ সুসময়ের অভাব), **নামঞ্জুর** (নয় মঞ্জুর), **অনাছিষ্টি** (সৃষ্টির অভাব বা খারাপ সৃষ্টি), **বেহিসাবী** (নয় হিসাবী), **বিজোড়** (নয় জোড়), **গরহাজির** (নয় হাজির), **অনাচার** (অন্, অর্থাৎ নয়, আচার), **অধর্ম** (নয় ধর্ম), **নগণ্য** (নয় গণ্য), **নাতিশীতোষ্ণ** (নয় অতি শীতোষ্ণ), **নির্ভয়** (নির্ ভয়, অর্থাৎ নাই ভয়), **নিষ্কম্প** (নিঃ কম্প, অর্থাৎ নাই কম্প) প্রভৃতি। সেইরকম—না-বলা, না-দেখা, না-শোনা, অজানা, অচেনা, অদেখা, আগাছা, অপয়া, আঘাটা, আদেখলা, নারাজ, অনাদায়ী, অগোছাল, নিখরচা, নিখোঁজ, বেকসুর, বেবন্দোবস্ত, বেকার, বেকায়দা, বেয়াদপ, বেহায়া, বেমানান, বেপরোয়া, বেসামাল, গরমিল, অচল, অকেজো, আছোলা, আলুনি, অসাধ্য, অস্থির, অম্লান, অক্লান্ত, অশ্রান্ত, অগ্রাহ্য, অভয়, অধীর, অস্নাত, অভুক্ত, অচেতন, অনিমেষ, অশক্ত, অসাধু, অসুখ, অকূল, অজ্ঞাত, অশ্রুত, অদৃষ্ট, অনভিজ্ঞ, অনুচিত, অনুদার, অনাদর, অনাবৃষ্টি, নিথর, নির্নিমেষ, নীরব, নির্লোভ প্রভৃতি।

(গ) **অলুক-তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ-সমাসে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায় না, তাহাকেই বলা হয় অলুক-তৎপুরুষ সমাস। যেমন—**গায়ে-পড়া** (গায়ে যাহা পড়া), **পায়ে-পড়া** (পায়ে যাহা পড়া), **গোরুর-গাড়ি** (গোরুর যে গাড়ি), **হাতে-গরম** (হাতে যাহা গরম), **ঘিয়েভাজা** (ঘিয়ে যাহা ভাজা), **মামারবাড়ি** (মামার যে বাড়ি), **যুধিষ্ঠির** (যুধি, অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির), **ভ্রাতুষ্পুত্র** (ভ্রাতুঃ, অর্থাৎ ভ্রাতার পুত্র)। সেইরকম—ভাগের-মা, পেটের-ভাত, আমের-আচার, ঘোড়ার-গাড়ি, মায়ে-তাড়ানো, বাপে-খেদানো, তাঁতে-তৈরি, মনের-মানুষ, মনসিজ, সরসিজ, বাচস্পতি, পরস্মৈপদ ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব-সমাস

যে-সমাসে একই বিভক্তিযুক্ত দুই বা তাহার অধিক পদ একপদে মিলিত হয় এবং প্রত্যেক পদের-**অর্থ-ই যেখানে প্রধান** থাকে, তাহাকে বলা হয় **দ্বন্দ্ব-সমাস**।

যেমন—**বাপ-মা** (বাপ ও মা), **ভাই-বোন** (ভাই ও বোন), **গান-বাজনা** (গান ও বাজনা), **দিনরাত** (দিন ও রাত), **দেনা-পাওনা** (দেনা ও পাওনা), **নরনারী** (নর ও নারী), **হিতাহিত** (হিত ও অহিত), (দেব ও অসুর), **শত্রুমিত্র** (শত্রু ও মিত্র) প্রভৃতি। সেইরকম—ছেলেমেয়ে, হিসাবনিকাশ, দুধদই, গোমহিষ, উকিল-মোক্তার, বৌ-ঝি, বাপ-বেটা, দেওর-ননদ, নাতিনাতনী, মেয়ে-জামাই, ঠাকুর-চাকর, রুই-কাতলা, কৈ-মাগুর, ডাল-ভাত, মুড়ি-মুড়কি, চুন-সুরকি, গাড়িঘোড়া, গোরু-বাছুর, ধুলোবালি, চোখকান, হাত-পা, দরজা-জানালা, জামাকাপড়, বাঁয়াতবলা, পথঘাট, হাটবাজার, ধুতি-চাদর, আম-কাঁঠাল, মাসি-পিসি, হারজিত, কমবেশি, খাওয়া-পরা, পিতাপুত্র, বন্ধুবান্ধব, ময়ূর-ময়ূরী, মাতাপিতা, দীনদুঃখী, গণ্যমান্য, দাসদাসী, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, লাভক্ষতি, দোল-দুর্গোৎসব, স্বর্গমর্ত্য, আকাশপাতাল, রক্তমাংস, গুরুশিষ্য, রামলক্ষ্মণ, পশুপক্ষী, সুখ-শান্তি, হরগৌরী প্রভৃতি। [**বিশেষ্যে ও বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব-সমাস**—ফলফুল, ঝড়বৃষ্টি, জামাকাপড়, ভাইবোন, ধনদৌলত, লবকুশ, ব্রহ্মাবিষ্ণু, দেবদৈত্য প্রভৃতি। **বিশেষণে ও বিশেষণে দ্বন্দ্ব-সমাস**—চালাক-চতুর, ইতর-ভদ্র, আসল-নকল, ছোটবড়, কমবেশি, গণ্যমান্য, হৃষ্টপুষ্ট, ধনীদরিদ্র প্রভৃতি। **সর্বনামে ও সর্বনামে দ্বন্দ্ব-সমাস**—তুমি-আমি, যে-সে, ইনি-উনি, যার-তার, যাকে-তাকে প্রভৃতি। **ক্রিয়াপদে ও ক্রিয়াপদে দ্বন্দ্ব-সমাস**—নেচে-গেয়ে, হেসে-খেলে, ব'লে-ক'য়ে, শুয়ে-ব'সে, দিয়ে-থুয়ে, লিখে-প'ড়ে প্রভৃতি। **ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্যে ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব-সমাস**—আসা-যাওয়া, পড়া-শোনা, হাসা-কাঁদা, শোওয়া-বসা প্রভৃতি।]

যে-দ্বন্দ্ব-সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না, তাহাকে বলা হয়—**অলুক-দ্বন্দ্ব**। যেমন—**হাতে-পায়ে, ঝোপে-ঝাড়ে, পথে-ঘাটে, ডাইনে-বাঁয়ে, আগে-পাছে, হাতে-কলমে, দুধেভাতে** প্রভৃতি।

বাংলায় বহুপদবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব-সমাসের ব্যবহারও আছে।—যেমন—**জনগণমন; শঙ্খচক্রগদাপদ্ম; ঢাক-ঢোল-কাড়া-নাকাড়া; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ** প্রভৃতি।

দ্বিগু-সমাস

পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে এবং পরপদের সহিত অন্বিত হইয়া সমাহার বা সমবায় বুঝাইলে তাহাকে বলা হয় **দ্বিগু-সমাস**। যেমন—**তেমাথা** (তিন মাথার সমবায়), **বারমাস** (বার মাসের সমবায়) **সাতসমুদ্দুর** (সাত সমুদ্রের সমবায়), **শতাব্দী** (শত অব্দের সমাহার), **সপ্তসুর** (সপ্ত সুরের সমষ্টি),

পঞ্চবটী (পঞ্চ বটের সমাহার) প্রভৃতি। সেইরকম—চৌদিক, চৌ-রাস্তা, তেরনদী, তেরাত্রি, দুয়ানি, ত্রিফলা, পাঁচফোঁড়ন, পঞ্চনদ, নবরত্ন, সপ্তপর্ণ, ত্রিভুবন, অষ্টধাতু, নবগ্রহ, দশদিক, পঞ্চভূত, পঞ্চগব্য, শতদল, দশচক্র, ষড়ঋতু, ত্রিকোণ, ত্রিভুজ ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

বিশেষ্য-পদের সহিত বিশেষণ-পদের যে-সমাস হয় তাহাকে বলে **কর্মধারয়-সমাস**। এই সমাসে পূর্বপদটি পরপদের বিশেষণরূপে অবস্থান করে, এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্যলাভ করে। যেমন—**মেজমামা** (মেজ যে মামা), **বড়দিদি** (বড় যে দিদি), **উড়োজাহাজ** (উড়ো যে জাহাজ), **খাসমহল** (খাস যে মহল), **মহাজন** (মহান্ যে জন), **নীলপদ্ম** (নীল যে পদ্ম), **সুপুরুষ** (সু যে পুরুষ), **শ্বেতচন্দন** (শ্বেত যে চন্দন), **রাজর্ষি** (রাজা এমন ঋষি অথবা রাজাও যিনি, ঋষিও তিনি) প্রভৃতি। সেইরকম—রাঙাকাকা, ছোড়দি, ছোটমা, বড়মা, বড়লাট, বাগ্‌দিবুড়ি, বুড়োমানুষ, কদাকার, লালফুল, আধফোটা, কালপেঁচা, কানাকড়ি, হেডমাস্টার, খোসমেজাজ, কাপুরুষ, গৈরিকসজ্জা, নবজাতক, নববিধান, সুজন, গুণিজন, কালভুজঙ্গ, পূর্ণচন্দ্র, উত্তমপুরুষ, স্বায়ত্তশাসন, সাধুপুরুষ, রক্তজবা, ধ্রুবতারা, ক্ষীণকায়, ক্ষীণকণ্ঠ, প্রিয়দর্শন, সুদর্শন, মহানদী, মহারানী, মহাপুরুষ, মহাত্মা, মহাপ্রভু, চলচ্চিত্র, কালবৈশাখী ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বপদ হয় বিশেষ্য এবং পরপদ হয় বিশেষণ। সেক্ষেত্রে, পূর্বপদের অর্থই প্রাধান্যলাভ করে। যেমন—**হলুদবাটা** (বাটা যে হলুদ), **দিনকতক** (কতক দিন), **শ্রুতিমধুর** (মধুর যে শ্রুতি) প্রভৃতি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার উভয়পদই হয় বিশেষণ। যেমন—**কাঁচামিঠে** (কাঁচাও যা, মিঠেও তা), **চালাকচতুর** (চালাকও যে, চতুরও সে), **পণ্ডিতমূর্খ** (পণ্ডিত যিনি, মূর্খও তিনি), **গুরুগম্ভীর** (গুরুও যা, গম্ভীরও তা), **জীবন্মৃত** (জীবিতও যা, মৃতও তা) প্রভৃতি।

ক্ষেত্রবিশেষে উভয়পদই আবার হয় বিশেষ্য। সেক্ষেত্রে পূর্বপদ পরপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—**ঠাকুরদাদা** (ঠাকুর যে দাদা), **গোলাপফুল** (গোলাপ যে ফুল), **দাদাবাবু** (দাদা যে বাবু), **আম্রবৃক্ষ** (আম্র যে বৃক্ষ), **দেবর্ষি** (দেব যে ঋষি), **গঙ্গানদী** (গঙ্গা যে নদী), **হিমালয় পর্বত** (হিমালয় যে পর্বত) প্রভৃতি।

কর্মধারয়-সমাস আবার কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন—

(১) **মধ্যপদলোপী-কর্মধারয়ঃ** যে-কর্মধারয়-সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যাখ্যানসূচক এক বা একাধিক পদের লোপ হয়। যেমন—**ঘিভাত** (ঘি দিয়ে পাক করা ভাত), **ভাইফোঁটা** (ভাইয়ের কল্যাণে যে ফোঁটা), **হাতপাখা** (হাতে চালানো পাখা), **ঘরজামাই** (ঘরে পালিত জামাই), **ডাকগাড়ি** (ডাক বহনকারী গাড়ি), **সিংহাসন** (সিংহচিহ্নিত আসন), **পলান্ন** (পলমিশ্রিত অন্ন), **ভিক্ষান্ন** (ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ অন্ন), **ছায়াতরু** (ছায়াদানকারী তরু) প্রভৃতি। সেইরকম—বৌভাত, জামাইষষ্ঠী, পাগড়ি, রেলগাড়ি, দুধসাবু, মাঠকোঠা, চালকুমড়া, তেলধুতি, বরফজল, বাষ্পশকট, বরযাত্রী, প্রীতিভোজ, দশমঙ্গল, রামনবমী ইত্যাদি।

(২) **রূপক-কর্মধারয়ঃ** যে কর্মধারয়-সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে নিজস্ব গুণধর্মে অভিন্ন কল্পনা করা হয়। যেমন—**মনমাঝি** (মনরূপ মাঝি), **প্রাণপাখি** (প্রাণরূপ পাখি), **কালসিন্ধু** (কালরূপ সিন্ধু), **বিরহানল** (বিরহরূপ অনল) প্রভৃতি। সেইরকম—কালসাপ, শোকাগ্নি, জ্ঞানালোক, জীবন-প্রবাহ, ভবার্ণব, মুখচন্দ্র, সংসার-সমুদ্র, বিষাদসিন্ধু, চিত্তবীণা, আঁখিপদ্ম, সুখসাগর, সমরানল, স্নেহনীড়, জীবন-নদ, প্রেমসলিল, কাব্যোদ্যান ইত্যাদি।

(৩) **উপমান-কর্মধারয়**—যেখানে উপমিত-পদের উল্লেখ থাকে না, এবং উপমান-পদের সহিত সামান্যধর্মসূচক পদের সমাস হয়। যেমন—**ফুলবাবু** (ফুলের মতো সুন্দর বাবু), **কাজলকালো** (কাজলের মতো কালো), **শশব্যস্ত** (শশের ন্যায় ব্যস্ত), **তুষারধবল** (তুষারের ন্যায় ধবল) প্রভৃতি। সেইরকম—গোবেচারা, মিশকালো, ফুটিফাটা, সিঁদুররাঙা, কুসুমকোমল, তুহিনশীতল, অমৃতমধুর, দুগ্ধ-ফেননিভ, জলদগম্ভীর, স্ফটিকস্বচ্ছ, ঘনশ্যাম, বকধার্মিক, বিড়াল-তপস্বী, হস্তিমূর্খ ইত্যাদি।

(৪) **উপমিত-কর্মধারয়**—যেখানে উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয়বাচক পদের সমাস হয়। এক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট হয় না, কেবল একটি সামান্যধর্মের কথা মনে রাখিয়া উপমা করা হয়। যেমন—**ফুলবাতাসা** (বাতাসা ফুলের মতো, অর্থাৎ হাল্‌কা), **চাঁদবদন** (বদন চাঁদের মতো, অর্থাৎ সুন্দর), **চন্দ্রপুলি** (পুলি চন্দ্রের মতো, অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রাকারবিশিষ্ট পুলি), **পুরুষসিংহ** (সিংহের ন্যায় পুরুষ), **অধরকমল** (কমলের ন্যায় অধর) প্রভৃতি। সেইরকম—গোলকধাঁধা, ফুলঝুরি, পালকিগাড়ি, চাঁদমুখ, চরণকমল, নরশার্দূল, মোহতিমির, চন্দ্রানন, করপল্লব, বীরসিংহ, ভবসাগর, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস

যে-দুই পদের বা যে-পদ-সমূহের সমাস হয়, তাহাদের কাহারও অর্থ-প্রাধান্য না দিয়া যেখানে উভয়-পদের বা পদসমূহের মিলিত অর্থ অন্য কোনো পদার্থ বা ব্যক্তির পরিচয় দেয়, সেখানে **বহুব্রীহি-সমাস** হয়। যেমন—**একতারা** (এক তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র) **মা-মরা** (মা যাহার মৃত এমন কেহ), **পেটসর্বস্ব** (পেটই যাহার সর্বস্ব সে), **পাতাবাহার** (পাতায় যাহার বাহার সেই গাছ), **লক্ষ্মীছাড়া** (লক্ষ্মী যাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে সে), **দশানন** (দশ আনন যাহার সে, অর্থাৎ, রাবণ), **শূলপাণি** (শূল পাণিতে যাহার তিনি, অর্থাৎ মহাদেব), **নির্লোভ** (নির্, অর্থাৎ নাই, লোভ যাহার সে) প্রভৃতি। সেইরকম—বেপরোয়া, বেহায়া, আনাড়ী, দশহাতি, বিশগজী, সমবয়সী, লালপাগড়ি, ছয়নালা, নিটোল, একরোখা, চৌচির, বেসুরো, দোহারা, দিলদরিয়া, শুচিবেয়ে, ডাকাবুকো, হাড়হাবাতে, ঊনপাঁজুরে, গোঁফখেজুরে, বিশমণী, সোদর, বীণাপাণি, চক্রপাণি, চক্রধর, হতভাগ্য, কীর্তিবাস, পীতাম্বর, নীলাম্বর, দামোদর, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রচূড, পদ্মনাভ, ত্রিনয়নী, ষড়ানন, চতুর্মুখ, হলধর, জলধর, শ্রীধর, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রথিতযশা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, প্রিয়ংবদা, তীক্ষ্ণধী, সুধী, কৃতবিদ্য, কৃতকার্য, বিপত্নীক, হতশ্রী, সুহৃৎ, অপুত্রক, অমূল্য, অল্পায়ু, নির্লোভ, নির্ভীক, নির্দয়, নিষ্পাপ, নদীমাতৃক, জিতেন্দ্রিয়, রত্নাকর, ইন্দ্রজিৎ, যুধিষ্ঠির, সহস্রাক্ষ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি-সমাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **ব্যতিহার-বহুব্রীহি:** পরস্পরসাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইতে কোনো একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে সমাস গঠিত হয়। যেমন—**লাঠালাঠি** (লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই), **রক্তারক্তি** (রক্তক্ষয় যে ব্যাপারে)। সেইরকম—কানাকানি, টানাটানি, হাতাহাতি, চুলোচুলি, দলাদলি, কোলাকুলি, ঘুসাঘুসি, দণ্ডাদণ্ডি ইত্যাদি।

(২) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি:** যে-বহুব্রীহি-সমাসে পূর্বপদটি বিশেষণ না হইয়া অন্য কোনো পদ হয়। যেমন—**মা-মরা, পাতাবাহার, আমকাটা, বীণাপাণি, চন্দ্রশেখর**। সেইরকম—পেটসর্বস্ব, দেশপ্রাণ, হলধর, দামোদর, চন্দ্রচূড়, পদ্মনাভ, শূলপাণি, চক্রপাণি ইত্যাদি।

(৩) **সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি:** যে-বহুব্রীহি-সমাসের পূর্বপদটি বিশেষণ এবং পরপদটি বিশেষ্য হইয়া সমান অধিকার রক্ষা করে। যেমন—**লালপাগড়ি, দশহাতি, সোনামুখ, সুধী, তীক্ষ্ণধী, নীলাম্বর**। সেইরকম—ছয়নালা, একতারা, পীতাম্বর, অল্পায়ু, দীর্ঘায়ু ইত্যাদি।

(৪) **মধ্যপদলোপী-বহুব্রীহি** ঃ যে-বহুব্রীহি-সমাসের ব্যাসবাক্যে আগত-পদের লোপ হয়। যেমন—**সবুট** (বুটের সহিত বর্তমান কিছু), **কৃতবিদ্য** (বিদ্যায় যিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি)। সেইরকম—প্রথিতযশা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইত্যাদি।

(৫) **অলুক-বহুব্রীহি** ঃ যে-বহুব্রীহি-সমাসে পূর্বপদ বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন—**গায়ে-হলুদ** (গায়ে হলুদ মাখাইয়া যে প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান), **হাতেখড়ি** (হাতে খড়ি দিয়া যে প্রথম লিখন-পঠন অনুষ্ঠান)। সেইরকম—গায়ে-পড়া, ঘাড়ে-পড়া, মাথায়-ছাতি, চোখে-চশমা, তোমার-বয়সী, পায়ে-চলা ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে বা পরপদে অব্যয় থাকিলে এবং সেই অব্যয়ের অর্থ-ই প্রাধান্যলাভ করিলে **অব্যয়ীভাব-সমাস** হয়। এক্ষেত্রে সমস্তপদটি সাধারণত ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—**ভরপেট** (পেট ভরিয়া), **আকণ্ঠ** (কণ্ঠ পর্যন্ত), **প্রতিদিন** (দিন দিন)। সেইরকম—হররোজ, প্রতিমণ, প্রতিবছর, ফিবছর, জনপ্রতি, মাথাপিছু, লোকপিছু, আগাগোড়া, যথাকাল, যথাসাধ্য, যথাশক্তি, যথারীতি, অনুগমন, অনুসরণ, অনুক্ষণ, উপগ্রহ, উপকণ্ঠ, উপবন, উপদ্বীপ, আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল, আজানু, আবালবৃদ্ধবনিতা, আজীবন, আমরণ, আশৈশব, দুর্ভিক্ষ (ভিক্ষার অভাব) প্রভৃতি।

[**অসংলগ্ন-সমাস** ঃ সমাসবদ্ধ-পদকে যখন একমাত্রায় না লিখিয়া বিচ্ছিন্নভাবে লেখা হয়, তখন তাহাকে অসংলগ্ন-সমাস বলা যায়। যেমন—দাস দাসী (**লেখা** উচিত দাসদাসী, কিংবা দাস-দাসী), সৌন্দর্য বৃদ্ধি (লেখা উচিত সৌন্দর্যবৃদ্ধি **কিংবা** সৌন্দর্য-বৃদ্ধি), বীর পুরুষ (লেখা উচিত বীরপুরুষ কিংবা বীর-পুরুষ), **জন্ম জয়ন্তী** (**লেখা উচিত জন্মজয়ন্তী, কিংবা জন্ম-জয়ন্তী**)।]

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে ? বাংলায় কয়-প্রকার সমাস আছে ? কী কী ? উদাহরণসহ সংক্ষেপে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।

২। বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৩। উপমান-কর্মধারয় ও উপমিত-কর্মধারয় এই দুই সমাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৪। টীকা লিখ :—

রূপক-কর্মধারয়, মধ্যপদলোপী-কর্মধারয়, নঞ্-তৎপুরুষ, অলুক-দ্বন্দ্ব, ব্যতিহার-বহুব্রীহি।

৫। সমাসবদ্ধ একপদে পরিণত কর :—

গাণ্ডীব ধনু যাঁহার ; নদী মাতা যাহার ; কাটা পেট যার ; বিস্তায় যিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ; পল্লবের ন্যায় অধর ; জলদের মতো গম্ভীর ; জ্ঞানরূপ আলোক ; চার রাস্তার সমাহার ; পরস্পরের গলা ধরিয়া যে মিলন ; নাই পরোয়া যার ; পাঁচরকম ফোড়নের সমাহার ; খাদি প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট সপ্তাহ ; মহান্ যে আশয় ; পূর্বে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত ; মন দিয়া গড়া ; পদ্মের গন্ধ যাহাতে ; যে রাতে দেখে না ; সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্যন্ত ; হৃদয়কে যাহা বিদীর্ণ করে ; যে অল্প কথা বলে ; যে কষ্ট সহ্য করিতে পারে ; যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। যাহার কুলশীল জানা নাই ; নিজের বর্ণ চুরি করে যে ; পরের অন্নে যে জীবনধারণ করে ; প্রসবকাল যাহার নিকটবর্তী হইয়াছে ; যে হিসাব ঠিক রাখে না ; ভিক্ষার অভাব ; যে জামাই শ্বশুরবাড়িতেই থাকে ; যিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই।

৬। মোটা-হরফের সমাসবদ্ধ পদগুলির সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর :—

(ক) 'সামাজিক পরিবর্তনের নানা **চিত্তাকর্ষক** অভিব্যক্তির সন্ধান পাইতাম।'—বঙ্কিমচন্দ্র ; (খ) '**কুয়াশাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত** রাত্রে তীরতট কিছুই দেখা যায় না।'—প্রেমেন্দ্র মিত্র ; (গ) সেই **জয়ধ্বনিতে** কেঁপে উঠ্‌লো **আসমুদ্রহিমাচল**, বেরিয়ে পড়লো **আবালবৃদ্ধবনিতা**।'—প্রবোধ সান্যাল ; (ঘ) 'ভিড় জ'মে গেছে, **লাঠালাঠি** হবার জোগাড়।'—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ; (ঙ) 'বলাকা ভালো হ'লে কি হবে, বড্ড **শুচিবেয়ে**'।—আশাপূর্ণা দেবী ; (চ) '**নির্বান্ধবপুরী**-তে একলা যাওয়া ভালো নয়।'—অবনীন্দ্রনাথ ; (ছ) '**নীলসিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল**'—রবীন্দ্রনাথ ; (জ) '**চন্দ্রচূড় জটাজালে** আছিলা যেমতি জাহ্নবী।'—মাইকেল মধুসূদন ; (ঝ) 'সহসা **মড়াকান্না** শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম।'—শরৎচন্দ্র ; (ঞ) **ভারত-ভবন অমৃতপুত্র** আমি **মৃত্যুঞ্জয়**।'—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ; (ট) 'বিশ্ব যখন **নিদ্রামগন** গগন অন্ধকার।'—রবীন্দ্রনাথ ; (ঠ) '**অশ্রুভ** বাঁশি **হৃদয়গগনে** বাজে।'—রবীন্দ্রনাথ ; (ড) 'হতচ্ছাড়া **মুখপোড়া** বাঁদর !'—প্রেমেন্দ্র মিত্র ; (ঢ) 'কচুরি আছে, তবে **হাতে-গরম** নেই।'—মনোজ বসু ; (ণ) **কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের** পালা।'—রবীন্দ্রনাথ ; (ত) 'হাতীর **পাঁচ-পা** দেখেছ নাকি ?'—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; (থ) 'এই **চন্দ্রমণ্ডল মধ্যস্থ** বিভিন্ন।'—বঙ্কিমচন্দ্র ; (দ) 'বাঘের মুখে ঝুলত যদি **রামছাগলের** দাড়ি।'—সুকুমার রায় ; (ধ) 'নে বাপু **দুধসাবুটুকু** খেয়ে নে।'—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ; (ন) **আজীবন** কেবল পরের কথাই ভাবলেন।'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শব্দ-প্রকরণ

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য

অর্থবোধক কোনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বলা হয় **শব্দ**। যেমন—এ, ও, কি, খা, পা, না, দে, এই, ওল, কিছু, খাল, পান, নাম, দেশ প্রভৃতি।

ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) **মৌলিক-শব্দ** ও (২) **সাধিত-শব্দ**।

যে-সকল শব্দকে বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের অর্থ প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ যাহাদের প্রকাশিত অর্থই চরম, তাহাদিগকে **মৌলিক** (বা স্বয়ংসিদ্ধ)-**শব্দ** বলা হয়। যেমন—মাথা, গাছ, ফল, ফুল, নদী, পর্বত, কর্, খা, বল্, চল্ প্রভৃতি। আর, যে-সকল শব্দকে বিশ্লেষ করা যায়, এবং বিশ্লেষ করিবার পর এক একটি মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই বলা হয় **সাধিত-শব্দ**। যেমন—মাথার (মাথা+র), গাছে (গাছ +এ), ফলন্ত (ফল+অন্ত), ফুলের (ফুল+এর), নদীতে (নদী+তে), পার্বত্য (পর্বত+ষ্ণ্য), করিল (কর+ইল), খাইব (খা+ইব), বলিতেছে (বল্+ইতেছে), চলিয়াছে (চল্+ইয়াছে) প্রভৃতি। দেখা যাইতেছে যে, এই সকল সাধিত-শব্দে এক একটি মৌলিক-শব্দের সহিত কোনো-না-কোনো প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। অতএব এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, মৌলিক-শব্দের সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়া যে নূতন শব্দ পাওয়া যায়, তাহাই সাধিত শব্দ।

অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে আবার শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **যৌগিক-শব্দ**, (২) **রূঢ়-শব্দ** ও (৩) **যোগরূঢ়-শব্দ**।

যে-সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়-জাত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **যৌগিক-শব্দ**। যেমন—রাখাল (রাখ্+আল=রাখাল, অর্থাৎ যে রাখে বা রক্ষা করে, বিশেষ করিয়া যে গোরু রাখে বা চরায়) ; ছেলেমি (ছেলে+মি=ছেলেমি, অর্থাৎ 'ছেলে'-শব্দের অর্থ বালক এবং 'মি'-প্রত্যয়ের অর্থ ভাব,—উভয়ে মিলিয়া 'ছেলেমি', যাহার অর্থ 'ছেলের ভাব') ; 'পাঠক' (পাঠ+ক=পাঠক, অর্থাৎ, যে পাঠ করে সে-ই 'পাঠক' ; এই শব্দে আর কাহাকেও বুঝায় না) প্রভৃতি।

যে-সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ না করিয়া, নিজস্ব কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে বলা হয় **রূঢ়-শব্দ**। যেমন—জ্যাঠামি (প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ—

জ্যেঠার মতো ভাব বা কাজ ; নিজস্ব অর্থ—বয়সানুপাতে অতিরিক্ত ভারিক্কী চাল) ; **কুশল** (প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ—যে কুশ তুলিতে পারে ; নিজস্ব অর্থ নিপুণ) প্রভৃতি।

যে-সকল শব্দ, একাধিক শব্দ বা ধাতুযোগে নিষ্পন্ন এবং যাহারা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **যোগরূঢ়-শব্দ**। যেমন—বীণাপাণি (বীণা পাণিতে যাহার, অর্থাৎ যাহার হাতে বীণা, কিন্তু বিশেষ অর্থে—'সরস্বতী') ; জলদ (জল+দা+ক, অর্থাৎ জল দেয় যে, কিন্তু বিশেষ অর্থ 'মেঘ') প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, মৌলিক-শব্দ (অর্থাৎ, ক্রিয়াবাচক অথবা বস্তুবাচক কিংবা বস্তুর গুণ বা সংখ্যাবাচক বর্ণসমষ্টি)-কে **প্রকৃতি**-নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রকৃতি দুই রকমের—**ধাতু** ও **প্রাতিপদিক**।

বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূলকে বলা হয় **ধাতু**। যেমন—কর্, দেখ্, শুন্, চল্ প্রভৃতি। আর, বিভক্তিহীন অবস্থায় বস্তু বা ব্যক্তির শব্দ-সঙ্কেতকে বলা হয় **প্রাতিপদিক**। **প্রাতিপদিক নাম বা নাম-শব্দরূপেও অভিহিত হয়।** যেমন—জল, ফল, ভাই, শিশু, পাহাড়, নদী প্রভৃতি।

যে-প্রাতিপদিক (বা নাম-শব্দ) বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহাকেই বলা হয় **পদ**। যেমন—রাম (রাম+'০'-বিভক্তি, কর্তৃরূপে) ; হরিকে (হরি+'কে'-বিভক্তি) ; বলিল (বল্+'ইল'-বিভক্তি) প্রভৃতি। একটি বাক্য—'পুকুরে মাছ আছে।' এখানে, 'পুকুর' এই প্রাতিপদিকের সহিত 'এ'-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে ; 'মাছ' এই প্রাতিপদিকের সহিত '০'-বিভক্তি যুক্ত ; আর, 'আছ্' এই ধাতুর সহিত 'এ'-বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। অতএব, 'পুকুরে', 'মাছ', 'আছে'—তিনটিই পদ। কিন্তু, পুকুর (পুকুর-এ), মাছ (মাছ-০), আছ (আছ্-এ) এইরূপ অবস্থায় উহাদিগকে বাক্যে ব্যবহার করা যায় না। বাক্যে ব্যবহার করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাতিপদিক ও ধাতুর সহিত কোনো-না-কোনো বিভক্তি যোগ করিতেই হয়। কারণ, সুসঙ্গত পদ ব্যবহারেই বাক্যের অর্থ সম্যক্ প্রকাশিত হয়।

২। বাংলা শব্দ-সম্ভার

প্রাচীন ভারতে, বিশেষত আর্যাবর্তে, সংস্কৃত-ভাষাই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদিগের মাতৃভাষা; কিন্তু, সাধারণ লোকজন ও স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত-শব্দের সঠিক উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া, সেই প্রাচীনযুগেই সংস্কৃত-ভাষার একটি কথ্যরূপ প্রচলিত হয়। তাহাকে বলা হইত—**প্রাকৃত ভাষা**। অর্থাৎ, সে-যুগে সংস্কৃত ছিল 'সাধুভাষা', আর প্রাকৃত ছিল 'চলিত-ভাষা'। সেই প্রাকৃত-ভাষা আবার স্থানভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাহার ফলে প্রাকৃতের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে আর তাহাকে প্রাকৃত বলা চলিল না। পণ্ডিতেরা তাহাব নাম দিলেন—**অপভ্রংশ**। এক সময় আসাম, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল সম্মিলিতভাবে 'মগধ'-নামে পরিচিত ছিল। সেই মগধে যে অপভ্রংশ-ভাষা প্রচলিত হয়, তাহাকে বলা হইত—**মাগধী-অপভ্রংশ**। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে সেই মাগধী-অপভ্রংশ হইতেই বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়। আধুনিক বাংলাভাষায় কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বহু শব্দ বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় স্থান পাইয়াছে। সেই সঙ্গে বিদেশীদের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলাভাষাকে এমন অনেক বিদেশী-শব্দ গ্রহণ করিতে হইয়াছে যে, তাহাদের বিকৃত ও অবিকৃত রূপে বাংলা-শব্দের ভাণ্ডার অনেকখানি পূর্ণ। তাছাড়া, যুগে যুগে অজস্র দেশী-শব্দ আসিয়া বাংলা-শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলা শব্দসম্ভারকে আজ তাই পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **তৎসম-শব্দ**; (২) **তদ্ভব শব্দ**; (৩) **অর্ধ-তৎসম-শব্দ**; (৪) **দেশী-শব্দ**; (৫) **বিদেশী-শব্দ**।

তৎসম-শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত-শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলাভাষায় স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে বলা হয় তৎসম-শব্দ। যেমন—আষাঢ়, প্রথম, দিবস, অম্বর, ধর্ম, কর্ম, অদ্য, ভক্ত, নৃত্য, জনক, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গৃহ, ঘৃত, সর্প, শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি।

তদ্ভব-শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত-শব্দ প্রাকৃত-ভাষার প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাংলাভাষায় নিজস্ব এক একটা রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিকেই বলা হয় তদ্ভব-শব্দ। ইহাদের **প্রাকৃত-শব্দও** বলা যাইতে পারে। যেমন—কাজ (<কজ্জ<কার্য), নাচ (<নচ্চ<নৃত্য), আজ (<অজ্জ<অদ্য), মা (<মাআ<মাতা), সাপ (<সপ্প<সর্প), ঘি (<ঘিঅ<ঘৃত), বৌ (<বহু <বধূ), চলে (<চলই<চলতি) প্রভৃতি।

অর্ধ-তৎসম-শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের উচ্চারণ ও বানান বাংলাভাষায় বিকৃত-রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অর্ধ-তৎসম। যেমন—কেষ্ট (<কৃষ্ণ), বিষ্টু (<বিষ্ণু), ছিদাম (<শ্রীদাম), অমর্ত (<অমৃত);

ছেদ্দা (<শ্রদ্ধা), ছেরাদ্দ (<শ্রাদ্ধ), মিত্তির (<মিত্র), চিত্তির (<চিত্র), নেমন্তন্ন (<নিমন্ত্রণ), বেরাম্ভন (<ব্রাহ্মণ), মচ্ছব (<মহোৎসব), বোষ্টম (<বৈষ্ণব), গিন্নী (<গৃহিণী), পুরুত (<পুরোহিত), মাগ্‌গি (<মহার্ঘ), পীরিতি (<প্রীতি), মন্তর (<মন্ত্র), ছিরি (<শ্রী), পরাণ (<প্রাণ), ঘেন্না (<ঘৃণা), শোলোক (<শ্লোক), জোছ্‌না (<জ্যোৎস্না), পিদিম (<প্রদীপ), উচ্ছন্ন (<উৎসন্ন), বেস্পতি (<বৃহস্পতি), গতর (<গাত্র) প্রভৃতি।

দেশী-শব্দ : অনার্য, কোল, ভিল, দ্রাবিড় প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষা হইতে বাংলাভাষায় যে-সকল শব্দ আসিয়াছে এবং যে-সকল শব্দের মূল (ধাতু বা প্রত্যয়) নির্ধারণ করা যায় না সেই সকল শব্দই দেশী-শব্দ নামে পরিচিত। যেমন—মেয়ে, কয়লা, কুলা, ঝাঁটা, বঁটি, কুড়ুল, ডাঙ্গা, ডিঙ্গি, ঢেলা, ঢোল, বোরা, ডাঁসা, ঢেঁকি, মুড়ি, চাটাই, পাঁঠা, ডাগর, মেকি, নেকা, নেড়া, ঝোল, উচ্ছে, উলু, কোরা, খাজা, চটক, জুড়ি, দুলাল, হাতল, হাপুস, হাতুড়ি, সেক, সেগুন, সাজি, শটকা, লেজা, লেপ, লুচি, লুকোচুরি, মালসা, মাতামাতি, মাঠ, মাগ্‌না, মাইতি, উল্টা, পাল্টা, ভেট, ভেল্কি, ভণ্ডুল, বৈঠক, বুলি, ফালা, ফাঁড়ি, ফটক, পাণ্ডা, পাতকুয়া, পাটালি প্রভৃতি।

বিদেশী-শব্দ : ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশী-জাতির আগমন ঘটে। যেমন—পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি। তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-ই সর্বাপেক্ষা অধিক কাল এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে, বহু ইংরেজী শব্দ লোকমুখে চলিতে চলিতে এদেশের ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সেইরকম, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি জাতির ব্যবহৃত বহু শব্দও বাংলাভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এদেশে মুসলমান-রাজত্বও চলে বহু কাল। ফলে বহু আরবী, ফারসী, তুর্কী শব্দকেও বাঙালীজাতি নিজের করিয়া লইয়াছে। তবে ঐ সব বিদেশী-শব্দ যে একেবারে অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে এমন নয়, বহু ক্ষেত্রে তাহা বিকৃত-ও হইয়াছে। এখানে কতকগুলি অবিকৃত ও বিকৃত বিদেশী-শব্দের উল্লেখ করা হইতেছে—

অবিকৃত বিদেশী-শব্দ : [**ইংরেজী হইতে**] স্কুল, কলেজ, অফিস, কম্পাউণ্ডার, কোট, প্যাণ্ট, শার্ট, শেমিজ, চেয়ার, টেবল্, লাইন, পাস, ফেল, রেডিও, সাইকেল, মোটর, স্টীমার, ট্রেন, এঞ্জিন, বাস্, কোর্ট, পুলিশ, পার্ক, বেঞ্চ, ফুটবল, বল্, ক্রিকেট, সিনেমা, থিয়েটার, ফুটপাত, পকেট, টিকেট, মার্বেল, ফ্যাশন, কমিটি, মাস্টার, নার্স, নোট, নভেল, ডেপুটি, জজ্, ভোট, মাইল, ডিগ্রী, ডজন, গিনি, পাউডার, ব্যাগ, ফী, [illegible] প্রভৃতি। [**পোর্তুগীজ হইতে**] আতা, আয়া, ফিতা, সাগু, শায়া, মার্কা, ফরমা, মেজ প্রভৃতি। [**ফরাসী হইতে**] কুপন, লুজি। [**আরবী হইতে**] আতর, আক্কেল,

কেতাব, কেচ্ছা, কোরান, হুঁকা, তাজ্জব, দফা, মসনদ, মসজিদ, মহল, ইমারত, ইমান, ইল্লৎ, ইশারা, ইস্তফা, আসল, আসবাব, ফৈজৎ, ফকির, ফর্দ, ফতুর, ফসল, ফাজিল, মায়, মাশুল, মালিক, মুসাফির, মুসলমান, ওয়ারিশ, আদালত, কবুল, কব্জা, কলম, কানুন, শহীদ, নম্বর প্রভৃতি। [**ফারসী হইতে**] আবাদ, আন্দাজ, আস্তানা, আস্তর, আশমান, আইন, কামান, খানা, খানসামা, খারিজ, খুব, খেয়াল, বরবাদ, কম, বেশি, পিঁয়াজ, পিয়াদা, ফরিয়াদী, ফাঁস, মওলভী, রেশম, জাহাজ, জোর, জামা, শহর, বরাবর, নালিশ প্রভৃতি। [**তুর্কী হইতে**] কুলি, কাবু, কাঁচি, বিবি, বাহাদুর, বোঁচকা, চাকু, উজবুক, সওগাত, দারোগা প্রভৃতি। [সেইরকম, **ইতালী-ভাষার** 'পিয়ানো', **চীনা-ভাষার** 'চা', 'চিনি', 'লিচু', **বর্মী**-ভাষার 'লুঙ্গি', **তিব্বতী-ভাষার** 'লামা' অবিকৃতভাবেই বাংলাভাষায় স্থান পাইয়াছে।]

বিকৃত-বিদেশী-শব্দ : [**পোর্তুগীজ হইতে**] আলকাতরা (আলকাতরাও), আনারস (আনানস), আলমারি (আর্মারিও), ইস্তিরি (এস্তিরার), ইস্পাত (এস্পাদা), কামিজ (কামিসা), গামলা (গামেলা), চাবি (চাভে), তোয়ালে (তোয়াল্হা), নোনা (আনোনা), পেয়ারা (পেরা), পেরেক (প্রেগো), ফিরিঙ্গী (ফাঞ্জে্জ), বোমা (বম্বা), বালতি (বাল্দে), বোতাম (বোতাও), বারান্দা (ভারাণ্ডা) প্রভৃতি। [**ওলন্দাজ হইতে**] হরতন (হরটেন), ইস্কাপন (স্কোপেন), ইস্ক্রুপ (স্ক্রোএফ্) প্রভৃতি। [**ফরাসী হইতে**] কার্তুজ (কারতুচ্)। [**ইংরেজী হইতে**] আপিস (অফিস), ইস্কুল (স্কুল), গেলাস (গ্লাস), বুরুশ (ব্রাশ), ডাক্তার (ডক্টর), কৌঁসুলী (কাউন্সেল), আপিল (অ্যাপিল), লণ্ঠন (ল্যান্টর্ন), বোতল (বটল্), রসিদ (রিসিট্), হাসপাতাল (হস্‌পিটাল), সান্ত্রী (সেন্ট্রি), বাক্স (বক্স) প্রভৃতি। [**আরবী হইতে**] আক্কেল (অকল), মাফিক (মুবাফিক), মামলা (মাআমলাহ্), মকদ্দমা (মুকদমা), মৌসুম (মৌসিম), মেজাজ (মিজাজ), বিদায় (বিদাঅ), ফতোয়া (ফত্বা), মিছিল (মিস্‌ল), মাহিনা (মানানাহ্), মুচ্ছদ্দি (মুৎসদ্দী), মুসাবিদা (মুসবর্ত্তাহ্), মেরামত (মরাম্মৎ), মোক্তার (মুখতার), ওয়ারিশ (বারিশ), ওস্তাদ (উস্তাদ), খাজনা (খাজনাহ্), কায়দা (কায়দাহ্) প্রভৃতি। [**ফারসী হইতে**] বরফ (বর্ফ), তক্তাপোশ (তখৎপোশ), নাস্তানাবুদ (নীস্ত্-ন-বুদ), ফতুয়া (ফতুহ), ফরমাশ (ফরমায়শ) প্রভৃতি। [এইভাবে, অন্যান্য দেশের অনেক শব্দ বিকৃতভাবে বাংলাভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।]

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : বাংলাভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি তাহার নিজস্ব সম্পদ। ইহারা দেশী-শব্দের অন্তর্গত। এই জাতীয় শব্দ বিভিন্ন জিনিসের রীতি বা প্রকৃতি বুঝাইতে, কিংবা মানুষের কোন অনুভূতি ব্যক্ত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের একক

ও দ্বৈত উভয় রূপই আছে। যেমন—[**একক ধ্বন্যাত্মক শব্দ**] কট্‌, খুট্‌, ফট্‌, ধাঁ, সাঁ, পোঁ, ভোঁ, হুস্‌, ফস্‌, ধপ্‌, ধপাস্‌, বাপ্‌, বাপ্‌স্‌, ক্যাঁচ্‌, ঘ্যাঁচ, কচাং, মচাং, চটাস্‌, ফটাস প্রভৃতি; [**দ্বৈত ধ্বন্যাত্মক শব্দ**] কট্‌কট্‌, খুট্‌খুট্‌, হন্‌হন্‌, ভোঁ ভোঁ, খাঁ খাঁ, খচ্‌খচ্‌, মুচ্‌মুচ্‌, ছল্‌ছল্‌, ছলাং ছলাং প্রভৃতি।

হাসির প্রকারভেদ বুঝাইতে: হা হা; হি হি; হো হো; খল্‌খল্‌; খিল্‌খিল্‌, ফিক্‌ফিক্‌ প্রভৃতি। **জলের গতি বুঝাইতে:** কল্‌কল্‌; কুলুকুলু; তর্‌তর্‌; ছলাং ছলাং প্রভৃতি। **বাতাসের বেগ বুঝাইতে:** সাঁ সাঁ; সোঁ সোঁ; শন্‌শন্‌; ঝির্‌ঝির্‌; প্রভৃতি। **ব্যথা ও বেদনা বুঝাইতে:** কন্‌কন্‌; কট্‌কট্‌; খচ্‌খচ্‌; টন্‌টন্‌; বন্‌বন্‌; ভোঁ ভোঁ প্রভৃতি। **বৃষ্টির প্রকারভেদ বুঝাইতে:** ঝির্‌ঝির্‌; ঝম্‌ঝম্‌; টিপ্‌টিপ্‌ প্রভৃতি। সেইরকম—আঃ; উঃ; ইস্‌; ওঃ; কা কা; সাঁ সাঁ; খাঁ খাঁ; হাঁ হাঁ; রী রী; বোঁ বোঁ; ভোঁ ভোঁ; কচ্‌কচ্‌; কুচ্‌কুচ্‌; কট্‌কট্‌; কুট্‌কুট্‌; ধেই ধেই; ধিন ধিন; ধাঁ; ধাঁ ধাঁ; ধপাস্‌; ধড়াস্‌ ধড়াস্‌; ধ্বস্‌ ধ্বস; কন্‌কন্‌; গম্‌গম্‌; চন্‌চন্‌; ঝন্‌ঝন্‌; টন্‌টন্‌; ঠন্‌ঠন্‌; ঢন্‌ঢন্‌; বন্‌বন্‌; ভন্‌ভন্‌; শন্‌শন্‌; হন্‌হন্‌; ছম্‌ছম্‌; ঝম্‌ঝম্‌; থম্‌থম্‌; দাউদাউ; হাউহাউ; কিচ্‌মিচ্‌; কিচিরমিচির; খুঁৎ খুঁৎ; ঘোঁৎ ঘোঁৎ; গুন্‌গুন্‌; গব্‌গব্‌; গবাগব্‌; গুব্‌গুব্‌; চক্‌চক্‌; চিক্‌চিক্‌; চুক্‌চুক্‌; ঝিল্‌মিল; ঝল্‌মল্‌; ঝিক্‌ঝিক্‌; ঝক্‌ঝক্‌; চট্‌পট্‌; ছট্‌ফট্‌; চটাপট; তুল্‌তুল্‌; টুল্‌টুল্‌; পিল্‌পিল্‌; সুড়্‌সুড়্‌; ধড়্‌ফড্‌; কড়্‌কড়্‌; নড়্‌বড়্‌; পঁইপঁই; খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌; খস্‌খস; মস্‌মস্‌; ফাঁস্‌ফোস্‌; হুস্‌হাস্‌; হাপুস্‌ হাপুস্‌; হুম্‌হাম; ধুম্‌ধাম্‌; দমাদ্দম্‌; গিস্‌গিস; ফিস্‌ফিস্‌; ফুস্‌ফাস্‌ প্রভৃতি।

এই জাতায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

বিশেষণরূপে: [**বিভক্তি ছাড়া**]: ধেই ধেই নাচ; ঘ্যান ঘ্যান শব্দ; ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ; টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি; খিল্‌ খিল্‌ হাসি; কিচির মিচির ডাক প্রভৃতি। [**এ-বিভক্তি যোগে**]: টুলটুলে চাঁপাফুল; ধব্‌ধবে বিছানা; নড়্‌বড়ে দাঁত; গন্‌গনে আগুন; মুচ্‌মুচে লুচি; কট্‌কটে ব্যাঙ; ছট্‌ফটে ছেলে; চন্‌চনে রোদ; কন্‌কনে শীত; খুঁৎখুতে লোক; ঘুসঘুসে জ্বর; ফিন্‌ফিনে ধুতি; ফুরফুরে হাওয়া; ঝক্‌ঝকে দাঁত; লিক্‌লিকে চেহারা; মিন্‌মিনে স্বভাব; থল্‌থলে শরীর; প্যান্‌প্যানে কান্না; ঠন্‌ঠনে চটি; স্যাঁতসেতে ঘর; দগ্‌দগে ঘা; খিট্‌খিটে মেজাজ; ঢল্‌ঢলে জামা প্রভৃতি। [**উ-বিভক্তি যোগে**]: পাতার ঝুরুঝুরু শব্দ; দুরুদুরু বুক; গুরুগুরু ডাক প্রভৃতি।

বিশেষণের বিশেষণরূপে : কুচকুচে কালো; ধব্‌ধবে শাদা; তুলতুলে নরম; টুসটুসে পাকা প্রভৃতি।

ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে : 'শহরে ছ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন **ছড়ছড়** ক'রে ধুলো উড়িয়ে।'—রবীন্দ্রনাথ। '**হুহু** ক'রে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগলো'—শরৎচন্দ্র। 'পিঁপড়ে **কুট্‌কুট** ক'রে আদর জানায় গাত্রে।'—অন্নদাশঙ্কর রায়। গা-টা **রী রী** ক'রে উঠ্‌লো। **ফিস্‌ ফিস্‌** ক'রে সে যা বল্‌লে ভালো ক'রে তা শুনতেই পেলাম না। তোমাকে **পঁইপঁই** ক'রে বারণ করেছি, তবু শুনলে না আমার কথা! লোকটা **হন্‌হন্‌** ক'রে হেঁটে চলেছে প্রভৃতি।

শব্দ-দ্বৈত : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছাড়াও বাংলাভাষায় শব্দ-দ্বৈত অনেক আছে। এই প্রকার দ্বৈত-শব্দ দুই শ্রেণীর—(১) **যুগ্ম-শব্দ** ও (২) **দ্বিরুক্ত-শব্দ**।

যুগ্মশব্দ সাধারণত তিন প্রকারের হয়। যেমন—

(ক) **সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক যুগ্মশব্দ :** কাজকর্ম; লজ্জাশরম; লোকজন; চালাক-চতুর; মাথামুণ্ডু; ছাইভস্ম; মান-মর্যাদা; বলা-কওয়া; ভুল-ভ্রান্তি; ছেলে-ছোকরা; ক্রিয়াকর্ম; পোশাক-পরিচ্ছদ; মামলা-মকদ্দমা; মণি-মানিক; আপদ-বিপদ; কথাবার্তা; হাঁকডাক; শান্ত-শিষ্ট; দয়া-দাক্ষিণ্য; ঠাট্টা-তামাশা; আমোদ-প্রমোদ; বাধা-বিঘ্ন; দুঃখ-কষ্ট; হাট-বাজার; সাধন-ভজন; পাহাড়-পর্বত; সাজ-সজ্জা; যুদ্ধ-বিগ্রহ; চাল-চলন প্রভৃতি।

(খ) **বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ :** পাপ-পুণ্য; সুখ-দুঃখ; উত্থান-পতন; ছেলে-মেয়ে; পিতা-মাতা; মা-বাপ; আয়-ব্যয়; জমা-খরচ; চেনা-অচেনা; মেঘ-রৌদ্র; সুরাসুর (সুর-অসুর); কাঁচা-পাকা; ছোট-বড়; কম-বেশি; হাসি-কান্না; দেনা-পাওনা; জীবন-মরণ; মরণ-বাঁচন; জন্ম-মৃত্যু; ভালো-মন্দ; আদান-প্রদান; ন্যায়-অন্যায়; কেনা-বেচা; শীত-গ্রীষ্ম; হিতাহিত (হিত-অহিত); আগা-গোড়া; মান-অপমান; দোষ-গুণ; ভূত-ভবিষ্যৎ; আকাশ-পাতাল; লাভ-লোকসান প্রভৃতি।

(গ) **বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ :** ঘর-দোর; গোরু-ঘোড়া; বই-খাতা; কালি-কলম; স্কুল-কলেজ; রাস্তা-ঘাট; থাকা-খাওয়া; ঝড়-বৃষ্টি; চেয়ার-টেবিল; কোট-প্যান্ট; বালিশ-বিছানা; লেপ-কাঁথা; মুড়ি-মুড়কি; ডাল-ভাত; চুন-সুরকি; আদা-জল; জামা-কাপড়; হাত-পা; খুড়ো-ভাইপো; বৌ-ঝি; বামুন-কায়েত; আইন-আদালত; ফল-ফুল; অন্ন-বস্ত্র; চন্দ্র-সূর্য; গ্রহ-নক্ষত্র; শীত-বসন্ত; রক্ত-মাংস; জল-বায়ু; স্ত্রী-পুত্র; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি।

পর পর একই শব্দ বসিলে তাহাকে বলা হয় **দ্বিরুক্ত-শব্দ**। এই জাতীয় শব্দ দুই শ্রেণীর—(ক) **প্রকৃত দ্বিরুক্ত শব্দ** ও (খ) **দ্বিরুক্ত অনুচর শব্দ** (বা প্রতিধ্বনিত দ্বিরুক্ত-শব্দ)। যেমন—

[**প্রকৃত দ্বিরুক্ত-শব্দ**]: আগে আগে; আশায় আশায়; একা একা; কচি কচি; কালো কালো; কথায় কথায়; কানে কানে; কাঁদ কাঁদ; কম কম; ক্রমে ক্রমে; খাই খাই; খেটে খেটে; গাড়ি গাড়ি; গলায় গলায়; গরম গরম; গ্রামে গ্রামে; ঘরে ঘরে; ঘটি ঘটি; চুপি চুপি; চেনা চেনা; চোর চোর; চোখে চোখে; ছাড়া ছাড়া; ছোট ছোট; জলে জলে; জমে জমে; জ্বর জ্বর; টানা টানা; তলে তলে; তালে তালে; থেকে থেকে; থালায় থালায়; দলে দলে; দিন দিন; দিস্তা দিস্তা; দাঁতে দাঁতে; দেশে দেশে; দেখতে দেখতে; দিতে দিতে; ধরা ধরা; ধর ধর; নিবু নিবু; নরম নরম; নতুন নতুন; নেচে নেচে; পথে পথে; পড় পড়; পালাই পালাই; পাতায় পাতায়; পায়ে পায়ে; পড়তে পড়তে; পেটে পেটে; পিছু পিছু; পাড়ায় পাড়ায়; ফাঁকা ফাঁকা; ফুলে ফুলে; ফালা ফালা; ফুলো ফুলো; বুকে বুকে; বলতে বলতে; বড় বড়; বেশি বেশি; বাছা বাছা; বাড়ি বাড়ি; ব'সে ব'সে; বস্তা বস্তা; ভয় ভয়; ভালো ভালো; ভাসা ভাসা; ভিতরে ভিতরে; ভালোয় ভালোয়; ভারী ভারী; মর মর; মনে মনে; মানে মানে; মুখে মুখে; মাথায় মাথায়; মাঝে মাঝে; মধ্যে মধ্যে; মরি মরি; মেঘে মেঘে; মানুষে মানুষে; মুঠো মুঠো; মরতে মরতে; যাব যাব; যেতে যেতে; রাগ রাগ; রাস্তায় রাস্তায়; রোগা রোগা; লম্বা লম্বা; লতায় লতায়; শুধু শুধু; শীত শীত; শুনে শুনে; সকাল সকাল; স'রে স'রে; সময় সময়; হাতে হাতে; হাজার হাজার; হারাই হারাই; হাসতে হাসতে প্রভৃতি।

[**দ্বিরুক্ত-অনুচর-শব্দ**]: এই জাতীয় শব্দ-দ্বৈতের পরপদটি যেন পূর্বপদের অনুচর-(বা প্রতিধ্বনি)-রূপে সামান্য বিকৃত হইয়া দেখা দেয়—অলিগলি; অসুখবিসুখ; আলুথালু; আঁকাবাঁকা; আঁকুপাঁকু; আধা-আধি; এঁকেবেঁকে; এলোমেলো; কাপড়-চোপড়; কাঁচুমাচু; কেঁদেকেটে; কাটাকাটি; কাছাকাছি; কানাকানি; কাড়াকাড়ি; কোলাকুলি; কোনাকুনি; খেয়েদেয়ে; খাওয়া-দাওয়া; খোলাখুলি; খেটেখুটে; গিন্নিবান্নি; গোলাগুলি; গরমাগরম; গলাগলি; গালাগালি; গুটিসুটি; গুঁতোগুঁতি; চুপচাপ; চটপট; চোটপাট; চেটেপুটে; চালচলন; ছটফট; জলটল; জপতপ; জড়সড়; ঝাঁটপাট; টানাটানি; ঠেলাঠেলি; ডাগরডোগর; ঢেকেঢুকে; তুকতাক; তাড়াতাড়ি; তর্কাতর্কি; দামটাম; দড়াদড়ি; দৌড়াদৌড়ি; দলাদলি; ধুয়েধুয়ে; দেখাদেখি; ধরাধরি; ধুমধাম; ধানাই-পানাই;

ধারধোর ; নামটাম ; নাদুসনুদুস ; পাকাপাকি ; পয়সা-টয়সা ; ফুটফাট ; ফুটিফাটা ; বেলাবেলি ; বুড়োহুড়ো ; বাসন-কোসন ; ভাগাভাগি ; ভুলটুল ; মোটাসোটা ; মারামারি ; মাথামাথি ; মাতামাতি ; মিছামিছি ; মাঝে মাঝে ; রাতারাতি ; রাগারাগি ; রকমসকম ; লম্বালম্বি ; লাফঝাঁপ ; লুটেপুটে ; লাট-বেলাট ; হাতাহাতি ; হানাহানি ; হিজিবিজি ; হাসাহাসি ; হালচাল প্রভৃতি।

একাধিক বা অনেক বুঝাইতে দ্বিরুক্ত-শব্দ ব্যবহৃত হয় ;—উহা কখনও বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণরূপে বসে। যেমন—

[**বিশেষ্য-রূপে**] ঘরে ঘরে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি' গেল ক্রমে।'—রবীন্দ্রনাথ।

[**বিশেষণ-রূপে**] পথের ধারে সারি সারি গাছ। গরম গরম লুচি খেয়ে নাও।

ঈষদর্থেও দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। উহা বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে বসিতে পারে। যেমন—

[**বিশেষণ-রূপে**] হাসি হাসি মুখ।

[**ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে**] শীত শীত করছে। ভয়ে ভয়ে আছি।

পারম্পর্য বুঝাইতেও দ্বিরুক্ত শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন—গলায় গলায় ভাব। মাথায় মাথায় সমান। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছি!

ক্রিয়ার বিস্তৃতি বা পৌনঃপুনিকতা বুঝাইতে অনেক সময় আমরা দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে উহা অসমাপিকা-ক্রিয়া রূপেই দেখা দেয়। যেমন—কেঁদে কেঁদে সারা হলাম। খেটে খেটে শরীরে আর কিছু নেই। ব'সে ব'সে পা ধ'রে গেল। **আসন্নতা** বা কোনো কিছুর **প্রবণতা** বুঝাইতেও দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন—ছাদটা যে পড়-পড়। তোমার আজ কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব? এসে অবধি পালাই-পালাই করছ যে! ছেলেটা দিনরাত কেবল খাই-খাই করছে!

সংগোপন কোনো ভাব প্রকাশ করিতেও অনেক সময় আমরা দ্বিরুক্ত-শব্দের ব্যবহার করি। যেমন—লোকটা যে ভিতরে ভিতরে এমন শয়তান তা কে জানতো? তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ তো বেশ!

অনুশীলনী

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

২। তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। দেশী ও বিদেশী শব্দের পাঁচটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বাক্য রচনা কর।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ বাছিয়া বাহির কর।

মেকি, জামা, কেতাব, ভক্ত, ছেরাদ্দ, কার্য, কান, বিষ্টু, কলেজ, শহীদ, নগদ, গেলাস, লতা, গতর, নৃত্য, দারোগা, ঝাঁটা, ঢোল, কয়লা, নেমন্তন্ন, মণ্ডপ, ফেল, খুব, আতা, ছত্র, নাচ, ধুতি, মিত্তির, পঙ্কজ, দাঁত।

৫। দশটি ধ্বন্যাত্মক-শব্দের উল্লেখ করিয়া বাক্য রচনা কর।

৬। শব্দ-দ্বৈত কয় প্রকার? উহাদের উদাহরণ দাও।

৭। বাক্য-রচনা কর:

লজ্জা-শরম; কাজ-কর্ম; দিবানিশি; কেনাবেচা; বৌ-ঝি; স্থাবর-অস্থাবর; বামুন-কায়েত; আকাশ-পাতাল; সাধন-ভজন; কানে কানে; গাড়ি গাড়ি; স্তরে স্তরে; স্থানে স্থানে; পাতায় পাতায়; খাওয়া-দাওয়া; মুখোমুখি; আনাচে কানাচে; হাতে হাতে; আঁকুপাঁকু; পাকা পাকা; খচ্ খচ্; খাঁ খাঁ; গম গম, ঝুরু ঝুরু; ক্যাঁচ ক্যাঁচ; ফুটফুটে; দগ্‌দগে; নড়বড়ে; প্যান্‌পেনে; সুড়সুড়।

৩। কৃৎ-প্রত্যয়

ধাতুর সহিত যে-প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় তাহার নাম—**কৃৎ-প্রত্যয়**। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দই **কৃদন্ত শব্দ** নামে পরিচিত। যেমন—'কর্'-ধাতু+আ'-প্রত্যয়=করা; 'জ্ঞা'-ধাতু+'তব্য'-প্রত্যয়=জ্ঞাতব্য।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃতের অনেক কৃৎ-প্রত্যয় বাংলায় প্রচলিত আছে। সংস্কৃতে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হইলে ধাতু-মধ্যস্থ স্বরধ্বনির অনেক পরিবর্তন ঘটে, এবং অনেক সময় ধাতুর স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণেরও লোপ হইতে পারে। যেমন—

তব্য: কোনো কিছু করা হইবে বা করা উচিত, সেই অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। কৃ+তব্য=কর্তব্য; দা+তব্য=দাতব্য, গম্+তব্য=গন্তব্য, ধৃ+তব্য=ধর্তব্য, শ্রু+তব্য=শ্রোতব্য, বচ্+তব্য=বক্তব্য, ভূ+তব্য=ভবিতব্য, দৃশ্+তব্য=দ্রষ্টব্য,

মন্+তব্য=মন্তব্য ; হন্+তব্য=হন্তব্য, ভুজ্+তব্য=ভোক্তব্য প্রভৃতি। [এই প্রত্যয় কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়।]

অনীয়ঃ কোনো কিছু করা উচিত বা করার যোগ্য, সেই অর্থে এই প্রত্যয় যোগ করা হয়। কৃ+অনীয়=করণীয়, বৃ+অনীয়=বরণীয়, স্মৃ+অনীয়=স্মরণীয়, দৃশ্+অনীয়=দর্শনীয়, গম্+অনীয়=গমনীয়, গ্রহ্+অনীয়=গ্রহণীয়, শ্রু+অনীয়=শ্রবণীয়, কৃষ্+অনীয়=কর্ষণীয়, শুচ্+অনীয়=শোচনীয়, পা+অনীয়=পানীয়, পঠ্+অনীয়=পঠনীয় প্রভৃতি। [এই প্রত্যয় কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়।]

যৎ (>য বা য়)ঃ স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সহিত এই প্রত্যয় (কর্ম বা ভাববাচ্যে) যুক্ত হয়। দা+যৎ=দেয়, পা+যৎ=পেয়, জ্ঞা+যৎ=জ্ঞেয়, গ্রহ্+যৎ =গ্রাহ্য, সহ+যৎ=সহ্য, লভ্+যৎ=লভ্য, গম্+যৎ=গম্য প্রভৃতি। [এই প্রত্যয়েরই সমগোত্রীয়—**ণ্যৎ, ক্যপ্** ও **যক্**ঃ কৃ+ণ্যৎ=কার্য, ধৃ+ণ্যৎ=ধার্য, আ-হৃ+ণ্যৎ=আহার্য, ত্যজ্+ণ্যৎ=ত্যজ্য, বচ্+ণ্যৎ=বাচ্য (বাক্য), মন্+ণ্যৎ=মান্য, শ্রু+ণ্যৎ=শ্রাব্য ; কৃ+ক্যপ্=কৃত্য, ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য, শাস্+ক্যপ্=শিষ্য ; চর্+যক্=চর্য, আ-চর্+যক্=আচার্য, বিদ্+যক্+আ=বিদ্যা প্রভৃতি।]

শতৃ (>অৎ) ও **শানচ্ (আন)**ঃ এই দুইটি প্রত্যয় (কর্তৃবাচ্যে) বর্তমান-কালের ভাব প্রকাশ করে। চল্+শতৃ=চলৎ, জ্বল্+শতৃ=জ্বলৎ, ভু+শতৃ=ভবৎ, জাগৃ+শতৃ=জাগ্রৎ, ফল+শতৃ=ফলৎ, অস্+শতৃ=সৎ, মহা+শতৃ=মহৎ প্রভৃতি। বৃত্+শানচ্=বর্তমান, দীপ্+শতৃ=দীপ্যমান, সেব্+শতৃ=সেব্যমান, মৃ+শানচ =ম্রিয়মাণ, বিদ্+শানচ্=বিদ্যমান, বি-বদ+শানচ্=বিবদমান, বহ্+শানচ্= বহমান, শী+শানচ্=শয়ান, আস্+শানচ্=আসীন প্রভৃতি।

ক্ত (>ত)ঃ এই প্রত্যয়টি কর্মবাচ্যে অতীতকালের ভাব প্রকাশ করে। কৃ+ক্ত=কৃত, ধৃ+ক্ত=ধৃত, হন্+ক্ত=হত, ভী+ক্ত=ভীত, জ্ঞা+ক্ত=জ্ঞাত, দহ্+ক্ত =দগ্ধ, লভ্+ক্ত=লব্ধ, বন্ধ্+ক্ত=বদ্ধ, রঞ্জ্+ক্ত=রক্ত, বচ্+ক্ত=উক্ত, বপ্+ক্ত =উপ্ত, ভুজ্+ক্ত=ভুক্ত, মুচ্+ক্ত=মুক্ত, ভুজ্+ক্ত=ভক্ত, দুহ্+ক্ত=দুগ্ধ, সিন্‌হ+ক্ত=স্নিগ্ধ, যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ, রুধ্+ক্ত=রুদ্ধ, স্তন্‌ভ+ক্ত=স্তব্ধ, সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ, বিধ্ +ক্ত=বিদ্ধ, দীপ্+ক্ত=দীপ্ত, সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, দৃশ্+ক্ত=দৃষ্ট, তুষ্+ক্ত=তুষ্ট, পুষ্ +ক্ত=পুষ্ট, কৃষ্+ক্ত=কৃষ্ট, শিষ্+ক্ত=শিষ্ট, শ্রম্+ক্ত=শ্রান্ত, ক্ষম্+ক্ত=ক্ষান্ত, শম্ +ক্ত=শান্ত, ভিদ্+ক্ত=ভিন্ন, ক্ষুদ্+ক্ত=ক্ষুণ্ণ, ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন, রুগ্+ক্ত=রুগ্ণ, মনজ্+ক্ত=মগ্ন, ভন্‌জ্+ক্ত=ভগ্ন, চূর্+ক্ত=চূর্ণ, পূর্+ক্ত=পূর্ণ, শৄ+ক্ত=শীর্ণ, দৄ +ক্ত=দীর্ণ, স্থা+ক্ত=স্থিত, গ্রহ্+ক্ত=গৃহীত, নী+ক্ত=নীত, দা+ক্ত=দত্ত, ধা +ক্ত=হিত, হ্বে+ক্ত=হূত (আ-হ্বে+ক্ত=আহূত), পা+ক্ত=পীত, গৈ+ক্ত=

গীত, মুহ্‌+ক্ত=মূঢ়, রুহ্‌+ক্ত=রূঢ়, পঠ্‌+ক্ত=পঠিত, বদ্‌+ক্ত=উদিত, নিন্দ্‌+ক্ত =নিন্দিত, লিখ্‌+ক্ত=লিখিত, পত্‌+ক্ত=পতিত, মিল্‌+ক্ত=মিলিত প্রভৃতি। [কর্তৃবাচ্যেও ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে। যেমন—গম্‌+ক্ত=গত, নম্‌+ক্ত=নত, মৃ+ক্ত=মৃত প্রভৃতি।] ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাববাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। [কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণরূপেও বসে। যেমন—ভগ্ন তরী ; শ্রান্ত পথিক, ধৃত লোকটি, রুদ্ধ দ্বার, মূঢ় মতি প্রভৃতি।]

ক্তি (>তি)ঃ এই প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত শব্দ গুণবাচক বা ভাববাচক-বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গম্‌+ক্তি=গতি, মন্‌+ক্তি=মতি, স্থা+ক্তি=স্থিতি, স্মৃ+ক্তি=স্মৃতি, বচ্‌+ক্তি=উক্তি, মুচ্‌+ক্তি=মুক্তি, ভজ্‌+ক্তি=ভক্তি, শ্রু+ক্তি=শ্রুতি, স্তু+ক্তি=স্তুতি, গৈ+ক্তি=গীতি, বুধ্‌+ক্তি=বুদ্ধি, তৃপ্‌+ক্তি=তৃপ্তি, শ্রম্‌+ক্তি=শ্রান্তি, ভ্রম্‌+ক্তি=ভ্রান্তি, শম্‌+ক্তি=শান্তি, খ্যা+ক্তি=খ্যাতি, বৃষ+ক্তি=বৃষ্টি, সৃজ্‌+ক্তি=সৃষ্টি, দৃশ্‌+ক্তি=দৃষ্টি, কৃষ্‌+ক্তি=কৃষ্টি প্রভৃতি।

ণক (>অক)ঃ ধাতুর শেষে কালসামান্যে (কর্তৃবাচ্যে) এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। পচ্‌+ণক=পাচক, গৈ+ণক=গায়ক, নী+ণক=নায়ক, কৃ+ণক=কারক, ধৃ+ণক =ধারক, স্মৃ+ণক=স্মারক, তৃ+ণক=তারক, দা+ণক=দায়ক, পূ+ণক=পাবক, নশ্‌+ণক্‌=নাশক, শস্‌+ণক=শাসক, হন্‌ (ঘাত)+ণক=ঘাতক, জন্‌ (>জনি) +ণক=জনক, পাল্‌ (>পালি)+ণক্‌=পালক, যুজ্‌+ণক=যোজক, নৃত্‌+ণক্‌= নর্তক, কৃষ্‌+ণক=কর্ষক (বাংলায় কৃষক) প্রভৃতি। [ণক না বলিয়া 'অক'-প্রত্যয় বলিলেই ভালো হয়।]

তৃচ্‌ (>তৃ)ঃ এই প্রত্যয়ও ধাতুর শেষে কালসামান্যে (কর্তৃবাচ্যে) প্রযুক্ত হয়, তবে বিশেষ বিশেষ অর্থে (যেমন,—শীলার্থে, সম্যকার্থে, কর্মার্থে প্রভৃতি)। কৃ+তৃচ্‌=কর্তৃ, কর্তা ; হৃ+তৃচ্‌=হর্তৃ, হর্তা ; ভৃ+তৃচ্‌=ভর্তৃ, ভর্তা ; দা+তৃচ্‌=দাতৃ, দাতা ; মা+তৃচ্‌=মাতৃ, মাতা ; পা+তৃচ্‌=পিতৃ, পিতা ; নী+তৃচ্‌=নেতৃ, নেতা ; ক্রী+তৃচ্‌=ক্রেতৃ, ক্রেতা ; শ্রু+তৃচ্‌=শ্রোতৃ, শ্রোতা, ধা+তৃচ্‌=ধাতৃ, ধাতা (বি-ধা+তৃচ্‌=বিধাতা), দুহ্‌+তৃচ্‌=দুহিতৃ, দুহিতা ; যুধ্‌+তৃচ্‌=যোদ্ধৃ, যোদ্ধা ; সূ+তৃচ্‌=সবিতৃ, সবিতা ; ভুজ্‌+তৃচ্‌=ভোক্তৃ, ভোক্তা প্রভৃতি।

অন্‌ (>অনট্‌)ঃ এই প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত শব্দ ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক-বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গম্‌+অন্‌=গমন, শী+অন্‌=শয়ন, দা+অন্‌=দান, স্না+অন্‌=স্নান, পী+অন্‌=পান, ভুজ্‌+অন্‌=ভোজন, দৃশ্‌+অন্‌=দর্শন, কৃষ্‌+অন্‌ =কর্ষণ, চি+অন্‌=চয়ন, পত্‌+অন্‌=পতন, সিচ্‌+অন্‌=সেচন, বপ্‌+অন্‌=বপন, পচ্‌+অন্‌=পচন, রঞ্জ্‌+অন্‌=রঞ্জন, মন্থ্‌+অন্‌=মন্থন, নৃৎ+অন=নর্তন, দন্শ+

অন্ = দংশন, রুদ্ + অন্ = রোদন, মৃ + অন্ = মরণ, কৃ + অন্ = করণ, হৃ + অন্ = হরণ, নী + অন্ = নয়ন, সাধ্ + অন্ = সাধন, ভূষ্ + অন্ = ভূষণ প্রভৃতি। [ভাববাচ্যে—গমন, দান, স্নান, দর্শন, রোদন প্রভৃতি। কর্মবাচ্যে—পান। করণবাচ্যে—নয়ন, ভূষণ প্রভৃতি। অধিকরণবাচ্যে—শয়ন, স্থান, ভবন প্রভৃতি।]

ইষ্ণু : ধর্ম অথবা শীল অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু, বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু, ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু প্রভৃতি।

ক্বিপ্ : এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ নানারকমের হইতে পারে (কর্তৃবাচ্যে বা ভাববাচ্যে)। ভাষা + বি + ক্বিপ্ = ভাষাবিৎ, শাস্ত্র + বি + ক্বিপ্ = শাস্ত্রবিৎ, ইন্দ্র + জি + ক্বিপ্ = ইন্দ্রজিৎ, সেনা + নী + ক্বিপ্ = সেনানী, অগ্র + নী + ক্বিপ্ = অগ্রণী, সভা + সদ্ + ক্বিপ্ = সভাসদ্, পরি-সদ্ + ক্বিপ্ = পরিষৎ (পরিষদ্), বি-পদ্ + ক্বিপ্ = বিপদ, সম্-পদ্ + ক্বিপ্ = সম্পদ্ প্রভৃতি।

আলু : শীলার্থে কোনো কোনো ধাতুর শেষে (কর্তৃবাচ্যে) এই প্রত্যয় বসে। নি-দ্রা + আলু = নিদ্রালু, তন্ + দ্রা + আলু = তন্দ্রালু, শ্রৎ + ধা + আলু = শ্রদ্ধালু, দয়া + আলু = দয়ালু প্রভৃতি।

অ (< অচ্, অণ, অপ্, অঙ্, ক, কঙ্, খচ্, খল্, খশ্, ঘ, ঘঞ্, ট, ড, শ) : (**অচ্ > অ**) : চুর্ + অ = চোর, সৃপ্ + অ = সর্প, শোক + হৃ + অ = শোকহর, মন + হৃ + অ = মনোহর, জি + অ = জয়, ভী + অ = ভয়, বি-নী + অ = বিনয়, মুহ্ + অ = মোহ, বুধ্ + অ = বোধ ; ক্রুধ্ + অ = ক্রোধ, হৃষ্ + অ = হর্ষ, স্পৃশ্ + অ = স্পর্শ ; (**অণ্ > অ**) : কর্ম + কৃ + অ = কর্মকার, কুম্ভ + কৃ + অ = কুম্ভকার, সূত্র + ধৃ + অ = সূত্রধর (সূত্রধার), তন্তু + বে + অ = তন্তুবায় ; (**অপ্ > অ**) : ভূ + অ = ভব, রু + অ = রব, স্তু + অ = স্তব, আ-দৃ + অ = আদর, হন্ + অ = বধ ; [কেহ কেহ অপ্ না বলিয়া অল্ প্রত্যয় বলেন] ; [**অঙ্ > অ**—ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, এবং অঙ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া শব্দের শেষে অ-স্থানে 'আ' দেখা যায়]—ক্ষম্ + অ (ক্ষম + আ) = ক্ষমা, পূজ্ + অ (পূজ্ + আ) = পূজা, তৃষ্ + অ (তৃষ + আ) = তৃষা, প্র-ভা + অ (প্রভ + আ) = প্রভা, শ্রৎ + ধা + অ (শ্রদ্ধ + আ) = শ্রদ্ধা, শিক্ষ্ + অ (শিক্ষ + আ) = শিক্ষা, নিন্দ্ + অ (নিন্দ + আ) = নিন্দা, প্র-শন্স্ + অ (প্রশন্স + আ) = প্রশংসা ; (**ক > অ**) : আ-ভাগান্ত ধাতুর শেষে এই প্রত্যয় বসে এবং ধাতুর 'আ' লুপ্ত হয় ; বারি + দা + অ = বারিদ, সুখ-দা + অ = সুখদ, বি-জ্ঞা + অ = বিজ্ঞ, সর্ব + জ্ঞা + অ = সর্বজ্ঞ, ভূমি + স্থা + অ = ভূমিষ্ঠ, মধু + পা + অ = মধুপ ; [**কঙ্ > অ** : 'দৃশ্' ধাতুর শেষে এই প্রত্যয় বসে]—সৎ + দৃশ্ + অ = সদৃশ, তদ্-দৃশ + অ = তাদৃশ, যদ্ + দৃশ্ + অ = যাদৃশ ; (**খচ্ > অ**) : প্রিয়ম্ + বদ্ + অ = প্রিয়ংবদ (+ আ = প্রিয়ংবদা),

বশম্+বদ্+অ=বশংবদ, ভয়ম্+কর্(<কৃ)+অ=ভয়ংকর, স্বয়ম্+বৃ+অ=স্বয়ংবর, সর্বম্+সহ্+অ=সর্বংসহ (+আ=সর্বংসহা), বসুম্+ধৃ+অ=বসুন্ধর (+আ=বসুন্ধরা), (ভুজম্+গম্+অ=ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম; বিহম্-গম্+অ=বিহঙ্গ, বিহঙ্গম), (**খল্>অ**): দুঃ-কৃ+অ=দুষ্কর, সু-গম্+অ=সুগম, দুঃ-লভ্+অ=দুর্লভ; (**খশ্>অ**): মর্মম্+তুদ্+অ=মর্মন্তুদ্, অভ্রম্+লিহ্+অ=অভ্রংলিহ; (**ঘ>অ**): প্র-ছদ্+অ=প্রচ্ছদ, আ-কৃ+অ=আকর, আ-লী+অ=আলয়; (**ঘঞ্>অ**): এই প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ ভাববাচক-বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ধাতুর শেষের চ্ স্থানে হয় ক, জ স্থানে হয় গ)—শুচ্+অ=শোক, পচ্+অ=পাক, ভুজ্+অ=ভোগ, যুজ্+অ=যোগ, নশ্+অ=নাশ, প্র-হৃ+অ=প্রহার, বি-সদ্+অ=বিষাদ, দা+অ=দায়, চি+অ=কায়, বি-স্তৃ+অ=বিস্তার; (**ট>অ**): জল+চর্+অ=জলচর, খে+চর্+অ=খেচর, বন+চর্+অ=বনচর, দিবা+কৃ+অ=দিবাকর, প্রভা+কৃ+অ=প্রভাকর, অগ্র+সৃ+অ=অগ্রসর; (**ড>অ**): অগ্র+জন্+অ=অগ্রজ, পঙ্ক+জন্+অ=পঙ্কজ, পাদ+পা+অ=পাদপ, ভুজ্+গম্+অ=ভুজগ, তুর্+গম্+অ=তুরগ; (**শ>অ**): গো+বিদ্+অ=গোবিন্দ, [**সন্+অ**: পা+সন্+অ=পিপাস+আ=পিপাসা, লভ্+সন্+অ=লিপ্স্+আ=লিপ্সা (সেইরকম—জিজ্ঞাসা, জিগীষা, জিঘাংসা, হিংসা, তিতিক্ষা, বুভুক্ষা, ঈপ্সা প্রভৃতি।)]

[অন্যান্য কয়েকটি সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়:—

ই: বি-ধা+ই=বিধি, জল-ধা+ই=জলধি।

ইন্ (>ঈ): শ্রম্+ইন্=শ্রমী, সম্-যম্+ইন্=সংযমী, অগ্র-গম্+ইন্=অগ্রগামী, মনঃ-হৃ+ইন্=মনোহারী, স্থা+ইন্=স্থায়ী; (**ইন্>ণিন্**): মন্ত্র+ণিন্=মন্ত্রিন্+ঈ=মন্ত্রী, বদ্+ণিন্=বাদিন্+ঈ=বাদী, সত্য+বদ্+ণিন্=সত্যবাদিন্+ঈ=সত্যবাদী, প্র+বস্+ণিন্=প্রবাসিন্+ঈ=প্রবাসী; (**ইন্>ঘিণুন্**) যুজ্+ঘিণুন্=যোগিন্+ঈ=যোগী, অনু-রঞ্জ্+ঘিণুন্=অনুরাগিন্+ঈ=অনুরাগী।

ইত্র (ত্র): চর্+ইত্র=চরিত্র, পূ+ইত্র=পবিত্র, খন্+ইত্র=খনিত্র।]

বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

অন্: ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য বুঝাইতে ধাতুর শেষে অন্-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে। মর্+অন্=মরণ, জীব্+অন্=জীবন, বাঁধ্+অন্=বাঁধন, ঝুল্+অন্=ঝুলন প্রভৃতি। [বস্তুবাচক-বিশেষ্য বুঝাইতেও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন—ঝাড়্+অন=ঝাড়ন, মাজ্+অন্=মাজন।] অন্-প্রত্যয় বিকৃত হইয়া কোনো

কোনো ক্ষেত্রে **'ওন্'** হয়। যেমন—খা + অন = খাওন, দে + অন = দেওন, যা + অন = যাওন।

অনা (অন্ + আ বা না) : ক্রিয়াবাচক বা বস্তুবাচক-বিশেষ্য গঠন করিতে 'অনা' বা 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়। রাঁধ্ + অন্ + আ = (রাঁধন্ + আ) = রান্না (অথবা, রাঁধ্ + না = রান্না), কাঁদ্ + অন্ + আ = (কাঁদন্ + আ) = কান্না (অথবা, কাঁদ্ + না = কান্না), বাজ্ + অন্ + আ = (বাজন্ + আ) = বাজনা (অথবা, বাজ্ + না = বাজনা), পা + অন (= ওন্) + আ = (পাওন্ + আ) = পাওনা, দে + অন্ + আ = (দেঅন্ + আ) = দেনা (অথবা, দে + না = দেনা)। সেইরকম, গাওনা, কুটনা, ঢাক্না, ছানা, পোনা, ঝরনা প্রভৃতি।

অনি (অনী) : অনা-প্রত্যয় যেমন অন্ + আ, অনি-(অনী)-প্রত্যয় সেইরকম অন্ + ই (অন্ + ঈ)। ঢাক + অনি (অন্ + ই) = ঢাকনি, ছাঁক + অনি (অন্ + ই) = ছাঁকনি, লেখ্ + অনী (অন্ + ঈ) = লেখনী। সেইরকম—পাটনী, ঝাড়নী, পোড়নী প্রভৃতি।

অন্ত : 'এই অবস্থায় আছে' বা 'এইরূপ করিতেছে' এই অর্থে ধাতুর সহিত অন্ত-প্রত্যয় যুক্ত হয়। অন্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ বা বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত, জ্বল + অন্ত = জ্বলন্ত, চল্ + অন্ত = চলন্ত। সেইরকম—ফুটন্ত, উঠন্ত, পড়ন্ত, ফলন্ত, জীয়ন্ত (>জ্যান্ত), জীবন্ত, ভাসন্ত, বাড়ন্ত প্রভৃতি।

অত (অতা = অত্ + আ, অতি = অত্ + ই, অতী = অত্ + ঈ) : ফির + অত = ফিরত, মান + অত = মানত্, সব্-জান্ + অতা = সব্জান্তা, ফির্ + অতি = ফিরতি, ফির্ + অতী = ফিরতী প্রভৃতি।

আ : ভাববাচক-বিশেষ্য বা কর্মবাচ্যের অতীতকালসূচক বিশেষণ বুঝাইতে ধাতুর সহিত আ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। নড়্ + আ = নড়া (নড়া দাঁত), ছাড়্ + আ = ছাড়া (ছাড়া কাপড়), শোন্ + আ = শোনা (শোনা কথা)। সেইরকম—করা (করা কাজ), বলা (বলা-র প্রয়োজন কি ?), বাড়া (বাড়া ভাত), চষা (চষা জমি), টানা (টানা পাখা), ধরা (ধরা গলা) প্রভৃতি।

আনো (আন) : ও-কারের মতো উচ্চারিত হয় বলিয়া, আন-প্রত্যয় আনো-রূপেই লিখিত হয়। চাল্ + আনো = চালানো (চাল্ + আন = চালান), কম্ + আনো = কমানো (কম্ + আন = কমান)। সেইরকম—জানানো (জানান), বাড়ানো (বাড়ান), হারানো (হারান), জমানো (জমান), খাওয়ানো (খাওয়ান) প্রভৃতি।

আনি (আনী) : ভাববাচক-বিশেষ্য-পদ গঠন করিতে ধাতুর সহিত আনি (বা আনী)-প্রত্যয় যুক্ত হয়। চাল + আনি = চালানি, ভাঙ্ + আনি = ভাঙানি,

জ্বাল্+আনি=জ্বালানি, শুন্+আনি=শুনানি (শুনানী), ঝাঁক্+আনি=ঝাঁকানি। সেইরকম—বেড়ানি, দেখানি, কোপানি, ছটফটানি, কনকনানি, ভনভনানি, টনটনানি প্রভৃতি।

আই ঃ ভাববাচক-বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক শব্দ গঠন করিতে ধাতুর সহিত কখনও কখনও আই-প্রত্যয় যুক্ত হয়। ঝাড়্+আই=ঝাড়াই, বাছ্+আই=বাছাই, লড়্+আই=লড়াই, যাচ্+আই=যাচাই, খোদ্+আই=খোদাই। সেইরকম—লম্বাই, ঢাকাই, ছাঁটাই, বাঁধাই প্রভৃতি।

আও ঃ ভাবার্থ ধাতুর উত্তর আও-প্রত্যয় বসিতে পারে। ঘের্+আও=ঘেরাও, লাগ্+আও=লাগাও, চড়্+আও=চড়াও প্রভৃতি।

আত্ (<আইত): ডাক্+আত্ (<আইত)=ডাকাত (<ডাকাইত্)।

ই ঃ বস্তুবাচক-বিশেষ্য-পদ গঠন করিতে ধাতুর সহিত ই-প্রত্যয় বসে। ফুট্+ই=ফুটি, ঝাঁপ্+ই=ঝাঁপি, ঝার্+ই=ঝারি, চুষ্+ই=চুষি। ভাববাচ্যেও ইহার ব্যবহার আছে। যেমন—হাস্+ই=হাসি, কাশ্+ই=কাশি, হার্+ই=হারি প্রভৃতি।

ইয়ে (<ইয়া): নাচ্+ইয়ে (<ইয়া)=নাচিয়ে, বাজ্+ইয়ে=বাজিয়ে, গা+ইয়ে=গাইয়ে। সেইরকম—বলিয়ে, কইয়ে, লিখিয়ে প্রভৃতি।

উ ঃ ডুব্+উ=ডুবু, চুম্+উ=চুমু, ঝুর্+উ=ঝুরু। দ্বিরুক্ত শব্দ-গঠনেও উ-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে। যেমন—নিবুনিবু (নিব+উ+নিব্+উ), গুরুগুরু (গুর্+উ+গুরু+উ) প্রভৃতি।

উনি (উ-লোপে নি বা নী): নাচ্+উনি=নাচুনি, রাঁধ+উনি=রাঁধুনি, কাঁদ্+উনি=কাঁদুনি, ছে+নি (নী)=ছেনি (ছেনী)। সেইরকম—জ্বলুনি, কাঁপুনি, গাঁথুনি, ঢাকুনি প্রভৃতি।

উয়া (চলিতভাষায় ও): পড়্+উ=পড়ুয়া (পড়্+ও=প'ড়ো), জল+উয়া=জলুয়া (জল্+ও=জ'লো), উড়্+উয়া=উড়ুয়া (উড়্+ও=উড়ো) প্রভৃতি।

উরী ঃ ডুব্+উরী=ডুবুরী, ধুন্+উরী=ধুনুরী।

তি ঃ ধাতুর সহিত তি-প্রত্যয় বসাইয়া যে-সকল শব্দ গঠন করা হয়, তাহা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উঠ্+তি=উঠতি, পড়্+তি=পড়্তি, চল্+তি=চল্তি, বস্+তি=বসতি (বস্তি), ভর্+তি=ভরতি (ভর্তি), কাট্+তি=কাট্তি। সেইরকম—গুনতি, ঘাটতি, কমতি, ঝর্তি প্রভৃতি।

ক (কা, কি): স্বার্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। মুড়্+ক=(মুড়ক)=মোড়ক, আট+ক=আটক, চড়+ক=চড়ক, সড়্+ক=সড়ক, ঝল্+ক ঝলক; আট্+

কা = আট্‌কা, খট্‌ + কা = খট্‌কা, বল্‌ + কা = বল্‌কা ; চুম + কি = চুমকি, ফুট্‌ + কি = ফুট্‌কি, হুম্‌ + কি = হুম্‌কি, হেঁচ্‌ + কি = হেঁচকি প্রভৃতি।

চা, চি, টা, ড়া, রা, লা, সা : ভাঙ্‌ + চা = ভাংচা ; ভাঙ্‌ + চি = ভাঙ্‌চি ; ঘষ্‌ + টা = ঘষ্‌টা ; থাব্‌ + ড়া = থাব্‌ড়া, ডুক্‌ + রা = ডুক্‌রা ; আগ্‌ + লা = আগ্‌লা ; ঝল্‌ + সা = ঝল্‌সা প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। কৃৎ-প্রত্যয় বলিতে কী বুঝায় ? তিনটি সংস্কৃত কৃদন্ত-শব্দ ও তিনটি বাংলা কৃদন্ত-শব্দের উদাহরণ দিয়া তাহাদের দ্বারা বাক্য রচনা কর।

২। কী কী অর্থে ও কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ধাতুর সহিত তব্য, অনীয়, যৎ, ক্ত, ক্তি, ও তৃচ্‌ প্রত্যয় যুক্ত হয় ? এই সকল প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের উদাহরণ দাও।

৩। অর্থ ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

নড়া, ডুবু, বাঁধন, কান্না, পাওনা, ঢাকনি, ঝাঁকুনি, যাচাই, লাগাও, জীয়ন্ত, বাড়ন্ত, চলতি, বাজিয়ে, চড়ক, প'ড়ো, ডুবুরী, দগ্ধ, নত, বক্তব্য, স্মরণীয়, মুক্তি, দৃষ্টি, কারক, স্মারক, বক্তা, দাতা, ধার্য, পেয়, শিষ্য, শোক, প্রহার, সত্যবাদী, গমন, দান, কুম্ভকার, অগ্রসর, অগ্রজ, শুশ্রূষা, যোদ্ধা, বর্তমান, স্তোত্র।

৪। অন্‌, অনি, অন্ত, আ, ই, তি প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয়গুলির সাহায্যে এক একটি কৃদন্ত-শব্দ গঠন করিয়া বাক্যমধ্যে তাহাদের প্রয়োগ দেখাও।

৫। এক একটি কৃদন্ত-শব্দে পরিণত কর :—

পানের যোগ্য ; যে গিয়াছে ; মোচনের ভাব ; ভূষিত করা যায় ইহা দ্বারা ; কুম্ভ করে যে ; পরকে তাপ দেয় যে ; মর্মে ক্লেশ দেয় যাহা ; চলিতেছে যাহা ; ঝাড়া যায় ইহা দ্বারা ; নাচে যে।

৪। তদ্ধিত-প্রত্যয়

নাম-শব্দ বা নাম-প্রকৃতির সহিত যে-সকল প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহারাই **তদ্ধিত-প্রত্যয়** নামে পরিচিত। আর, তদ্ধিত-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দকেই বলা হয় **তদ্ধিতান্ত-শব্দ**। যেমন—বীর + য (ষ্ণ্য) = বীর্য, পুরাণ + ইক = পৌরাণিক, জগ + আই = জগাই, মুটে + গিরি = মুটেগিরি প্রভৃতি।

সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

অ (ষ্ণ): [**অপত্য অর্থে**] পুত্র+অ (ষ্ণ)=পৌত্র, দুহিতৃ+অ (ষ্ণ)= দৌহিত্র, বিমাতৃ+অ (ষ্ণ)=বৈমাত্র, ভৃগু+অ (ষ্ণ)=ভার্গব, মনু+অ (ষ্ণ)= মানব, দনু+অ (ষ্ণ)=দানব, কুরু+অ (ষ্ণ)=কৌরব, পাণ্ডু+অ (ষ্ণ)=পাণ্ডব, যদু+অ (ষ্ণ)=যাদব ; [**ভক্ত অর্থে**] শিব+অ (ষ্ণ)=শৈব, বুদ্ধ+অ (ষ্ণ)= বৌদ্ধ, শক্তি+অ (ষ্ণ)=শাক্ত, বিষ্ণু+অ (ষ্ণ)=বৈষ্ণব ; [**ভাবার্থে**] শরৎ+অ (ষ্ণ)=শারদ, পৃথিবী+অ (ষ্ণ)=পার্থিব, দেব+অ (ষ্ণ)=দৈব, শিশু+অ (ষ্ণ) =শৈশব, গুরু+অ (ষ্ণ)=গৌরব, লঘু+অ (ষ্ণ)=লাঘব ; [**বিকার অর্থে**] তিল+অ (ষ্ণ)=তৈল, পয়স্+অ (ষ্ণ)=পায়স ; [**উক্তি অর্থে**] ঋষি+অ (ষ্ণ)= আর্ষ ; [**নক্ষত্রযুক্ত মাস**] বিশাখা+অ (ষ্ণ)=বৈশাখ, অশ্বিনী+অ (ষ্ণ)— আশ্বিন, কৃত্তিকা+অ (ষ্ণ)=কার্তিক, পুষ্যা+অ (ষ্ণ)=পৌষ , [**স্বার্থে**] মনস্+ অ (ষ্ণ)=মানস, বন্ধু+অ (ষ্ণ)=বান্ধব, তাপস্+অ (ষ্ণ)=তাপস প্রভৃতি।

ই (ষ্ণি) : [**অপত্য অর্থে**] দশরথ+ই (ষ্ণি)=দাশরথি। সেইরকম—সুমিত্রা >সৌমিত্রি, অরুণ>আরুণি, দ্রোণ>দ্রৌণি, সত্যক>সাত্যকি, রাবণ>রাবণি প্রভৃতি।

য (ষ্ণ্য) : [**অপত্য অর্থে**] চণক+য (ষ্ণ)=চাণক্য। সেইরকম—দিতি> দৈত্য, মুদ্গল>মৌদ্গল্য, শিবি>শৈব্য+আ=শৈব্যা ; [**ভাবার্থে**] আদি+য (ষ্ণ) =আদ্য। সেইরকম—গ্রাম>গ্রাম্য, কণ্ঠ>কণ্ঠ্য, দিব্>দিব্য, বণিজ্>বাণিজ্য, প্রতীচি>প্রতীচ্য, কুমার>কৌমার্য, সুন্দর>সৌন্দর্য, বীর>বীর্য, ধীর>ধৈর্য, স্থির>স্থৈর্য, শীত>শৈত্য, মধুর>মাধুর্য, বিচিত্র>বৈচিত্র্য, মহাত্মা>মাহাত্ম্য, দুর্বল>দৌর্বল্য, বিরাগ>বৈরাগ্য, চোর>চৌর্য, চতুর>চাতুর্য, সম>সাম্য, পণ্ডিত >পাণ্ডিত্য, সরল>সারল্য, উচিত>ঔচিত্য, চপল>চাপল্য, পুরোহিত> পৌরোহিত্য, ন্যায়>ন্যায্য, সহায়>সাহায্য ; [**যোগ্য অর্থে**] বধ+য (ষ্ণ)=বধ্য। সেইরকম—পূজা>পূজ্য, ভেদ>ভেদ্য, দণ্ড>দণ্ড্য, অর্ঘ>অর্ঘ্য , [**স্বার্থে**] সেনা+য (ষ্ণ)=সৈন্য।

এয় (ষ্ণেয়) : [**অপত্য অর্থে**] গঙ্গা+এয় (ষ্ণেয়)=গাঙ্গেয়। সেইরকম— রাধা>রাধেয়, কুন্তী>কৌন্তেয়, বিমাতৃ>বৈমাত্রেয়, ভগিনী>ভাগিনেয় (স্ত্রীলিঙ্গ- বাচক শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় বসে)। [**বিকার অর্থে**] অগ্নি+এয় (ষ্ণেয়)= আগ্নেয়।

ঈয় (ষ্ণীয়) : [**বয়স অর্থে**] দ্বাদশবর্ষ+ঈয় (ষ্ণীয়)=দ্বাদশবর্ষীয়। সেইরকম— পঞ্চবর্ষ>পঞ্চবর্ষীয়, ষোড়শবর্ষ>ষোড়শবর্ষীয় ; [**ভাবার্থে**] মানব+ঈয় (ষ্ণীয়)=

মনবীয়। সেইরকম—দানব>দানবীয়, দেশ>দেশীয়, জল>জলীয়, বাষ্প>বাষ্পীয়, তৎ>তদীয়, মৎ>মদীয়, ভবৎ>ভবদীয়।

ইক (ষ্ণিক) : [**সম্বন্ধ অর্থে**] দিন+ইক (ষ্ণিক)=দৈনিক। সেইরকম—ইহ>ঐহিক, বেদ>বৈদিক, নীতি>নৈতিক, পুরাণ>পৌরাণিক, ভূগোল>ভৌগোলিক, তর্ক>তার্কিক, ন্যায়>নৈয়ায়িক, শরীর>শারীরিক, কায়>কায়িক, মনস্>মানসিক, বচন>বাচনিক, অন্তর>আন্তরিক, অধ্যাত্ম>আধ্যাত্মিক, দর্শন>দার্শনিক, বৎসর>বাৎসরিক, বর্ষ>বার্ষিক, মাস>মাসিক, নগর>নাগরিক, লোক>লৌকিক, সমাজ>সামাজিক, সংবাদ>সাংবাদিক, নৌ>নাবিক, শ্রম>শ্রমিক, সমুদ্র>সামুদ্রিক প্রভৃতি।

ঈন্ : [**নিমিত্তার্থে**] সর্বজন+ঈন=সর্বজনীন, বিশ্বজন+ঈন=বিশ্বজনীন।

ইত (ইতচ্) : [**জাতার্থে**] পুষ্প+ইত=পুষ্পিত। সেইরকম—দুঃখ>দুঃখিত, কলঙ্ক>কলঙ্কিত, নিদ্রা>নিদ্রিত, জাগর>জাগরিত, ক্ষুধা>ক্ষুধিত, পুলক>পুলকিত, উদ্বেল>উদ্বেলিত, আনন্দ>আনন্দিত, গর্ব>গর্বিত, স্পর্ধা>স্পর্ধিত প্রভৃতি।

ইল (ইলচ্) : [**আছে এই অর্থে**] পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল। ফেনা>ফেনিল, জটা>জটিল, পিচ্ছা>পিচ্ছিল প্রভৃতি।

ইন্ : [**আছে এই অর্থে**] গুণ+ইন (=গুণিন্)=গুণী। সেইরকম—জ্ঞান>জ্ঞানী, ধন>ধনী, সুখ>সুখী, বল>বলী, মান>মানী, সাহস>সাহসী প্রভৃতি।

বিন্ : [**আছে এই অর্থে**] মায়া+বিন্ (=মায়াবিন্)=মায়াবী। সেইরকম—তেজস্>তেজস্বী, যশস্>যশস্বী, তপস্>তপস্বী, মেধা>মেধাবী প্রভৃতি।

ঈয়স্ (ঈয়সু) : [**দুইয়ের মধ্যে তুলনায়**] গুরু+ঈয়স্=গরীয়স্, গরীয়ান্ (স্ত্রীলিঙ্গে—গরীয়সী)। সেইরকম—লঘু>লঘীয়স্, লঘীয়ান্; মহৎ>মহীয়স্, মহীয়ান্ (মহীয়সী); বল>বলীয়স্, বলীয়ান্; প্রিয়>প্রেয়স্, প্রেয়ান্ (প্রেয়সী), বৃদ্ধ>বর্ষীয়স্, বর্ষীয়ান্ (বর্ষীয়সী) প্রভৃতি।

ইষ্ঠ : [**বহুর মধ্যে তুলনায়**] গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ। সেইরকম—লঘু>লঘিষ্ঠ, প্রশস্য>শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ; বল>বলিষ্ঠ, অল্প>কনিষ্ঠ, বৃদ্ধ>বর্ষিষ্ঠ প্রভৃতি।

তর : [**দুইয়ের মধ্যে তুলনায়**] গুরু+তর=গুরুতর। সেইরকম—লঘু>লঘুতর, ক্ষুদ্র>ক্ষুদ্রতর, শ্রেয়>শ্রেয়তর, দীর্ঘ>দীর্ঘতর, প্রিয়>প্রিয়তর প্রভৃতি। [ক্ষুদ্র অর্থেও 'তর'-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—অশ্বতর]।

তম : [**বহুর মধ্যে তুলনায়**] গুরু+তম=গুরুতম। সেইরকম—লঘু>লঘুতম, ক্ষুদ্র>ক্ষুদ্রতম, শ্রেয়>শ্রেয়তম, দীর্ঘ>দীর্ঘতম, প্রিয়>প্রিয়তম প্রভৃতি।

[পূরণবাচক বিশেষণ হিসাবেও 'তম'-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—বিংশতিতম, নবতিতম প্রভৃতি।]

ময় (ময়ট্) : [**ব্যাপ্তি অর্থে**] জল + ময় = জলময়। সেইরকম—ধূলি > ধূলিময় ; [**নির্মিত অর্থে**] স্বর্ণ + ময় = স্বর্ণময়। সেইরকম—মৃৎ > মৃন্ময়, দারু > দারুময় ; রৌপ্য > রৌপ্যময়। [**স্বরূপ অর্থে**] বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়।

মৎ (মতুপ) : [**আছে এই অর্থে**] বুদ্ধি + মৎ = বুদ্ধিমৎ, বুদ্ধিমান্। সেইরকম—ধী > ধীমৎ, ধীমান্ ; শ্রী > শ্রীমৎ, শ্রীমান্ ; অংশু > অংশুমৎ, অংশুমান প্রভৃতি। [এই জাতীয় আর একটি প্রত্যয়— **বৎ (বতুপ্)**। আছে এই অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়। যেমন—জ্ঞান + বৎ = জ্ঞানবৎ, জ্ঞানবান্ ; গুণ + বৎ = গুণবৎ, গুণবান্ ; ধন + বৎ = ধনবৎ, ধনবান্।]

তন : [**ভব অর্থে**] পুরা + তন = পুরাতন। সেইরকম—অদ্য > অদ্যতন ; চির > চিরন্তন ; প্রাক্ > প্রাক্তন ; অধুনা > অধুনাতন ; অধঃ > অধস্তন ; ঊর্ধ্ব > ঊর্ধ্বতন প্রভৃতি।

তা : [**ভাবার্থে**] মধুর + তা = মধুরতা। সেইরকম—সাধুতা, সরলতা, জনতা, মত্ততা, সত্তা, চপলতা, চঞ্চলতা, সহায়তা, মূর্খতা, সততা, ভীরুতা, বিলাসিতা, কাতরতা, ওজস্বিতা প্রভৃতি।

ত্ব : [**ভাবার্থে**] প্রভু + ত্ব = প্রভুত্ব। সেইরকম—বীরত্ব, মহত্ত্ব, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, রাজত্ব, ব্যক্তিত্ব, সত্ত্ব, কৃতিত্ব, মূর্খত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি।

ইমন : [**ভাবার্থে**] মহৎ + ইমন্ = (মহিমন্) মহিমা। সেইরকম—নীলিমা, জড়িমা, রক্তিমা, লঘিমা, অণিমা, তনিমা, অরুণিমা, কালিমা, মধুরিমা প্রভৃতি।

আয়ন (ষ্ণায়ন) : [**অপত্যার্থে**] বৎস + আয়ন্ (ষ্ণায়ন) = বাৎসায়ন। সেইরকম—দাক্ষায়ণ (স্ত্রীলিঙ্গে—দাক্ষায়ণী), কাত্যায়ন (স্ত্রীলিঙ্গে—কাত্যায়নী), দ্বৈপায়ণ (দ্বীপে ভব অর্থে) ; রামায়ণ (রাম অবলম্বনে রচিত অর্থে) প্রভৃতি।

আল, আলু, ল : [**আছে যাহার এই অর্থে**] রস + আল = রসাল। তন্দ্রা + আলু = তন্দ্রালু, নিদ্রা + আলু = নিদ্রালু, দয়া + আলু = দয়ালু প্রভৃতি। মাংস + ল = মাংসল, পাংশু + ল = পাংশুল। [**স্বার্থে**] মঞ্জু + ল = মঞ্জুল। সেইরকম—বঞ্জুল, শ্যামল, বহুল, শীতল, পিঙ্গল প্রভৃতি।

ক : [**স্বার্থে**] পঙ্ক + ক = পঙ্কক, বাল + ক = বালক। [**ক্ষুদ্রার্থে**] মানব + ক = মানবক, অশ্ব + ক = অশ্বক। [স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'-যুক্ত হয় এবং 'ক'-এর পূর্বে 'ই'-আগম হয়—অর্থাৎ, **'ইকা'** যেমন—বাল + ই + ক + আ = বালিকা ; মাল + ই + ক + আ =

মালিকা। সেইরকম—কলিকা, কালিকা, চণ্ডিকা, নৌকা, ক্ষণিকা, কণিকা, চয়নিকা, পুত্তলিকা, চণ্ডালিকা, দীপিকা, মালবিকা প্রভৃতি।

ম (মট্): [**পূরণার্থে**] সপ্ত + ম = সপ্তম, পঞ্চ + ম = পঞ্চম। [**স্বার্থে**] আদি + ম = আদিম, মধ্য + ম = মধ্যম, পর + ম = পরম প্রভৃতি।

র : [**আছে এই অর্থে**] মধু + র = মধুর, পাণ্ডু + র = পাণ্ডুর। সেইরকম—মুখর, শিখর, ঊষর, ধূসর, ধূম্র প্রভৃতি।

শ : [**আছে যাহার এই অর্থে**] লোম + শ = লোমশ। সেইরকম—রোমশ, কর্কশ, কপিশ প্রভৃতি।

তস্ (তসিল): [এই প্রত্যয় **তঃ-রূপে** দেখা দেয় এবং ব্যবহৃত হয় অপাদানের বিভক্তি-রূপে] প্রথম + তস্ = প্রথমতঃ (প্রথম হইতে)। সেইরকম—দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয়তঃ, মূলতঃ, স্থূলতঃ, কার্যতঃ ফলতঃ প্রভৃতি। [আধুনিক বাংলা-বানানে অবশ্য বিসর্গ যুক্ত হয় না। যেমন—প্রথমত, দ্বিতীয়ত, মূলত, স্থূলত, কার্যত, ফলত প্রভৃতি।]

শস্ : [এই প্রত্যয় **'শঃ'-রূপে** দেখা দেয়] ক্রম = শস্ = ক্রমশঃ। সেইরকম—প্রায়শঃ, বহুশঃ প্রভৃতি। [আধুনিক বাংলা-বানানে অবশ্য বিসর্গ যুক্ত হয় না। যেমন—ক্রমশ, প্রায়শ, বহুশ।]

ত্র (ত্রল্): [এই প্রত্যয় যুক্ত হয় **অধিকরণের বিভক্তিরূপে**] সর্ব + ত্র = সর্বত্র। সেইরকম—অন্যত্র, একত্র, উভয়ত্র প্রভৃতি। [অৎ + ত্র = অত্র, যৎ + ত্র = যত্র, তৎ + ত্র = তত্র—এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 'অ'-এর লোপ হইয়াছে।]

থা (থাচ্ : [**প্রকারার্থে**] সর্ব + থা = সর্বথা। সেইরকম—অন্যথা। [যৎ + থা = যথা, তৎ + থা = তথা—এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী 'ত'-এর লোপ হইয়াছে।]

দা : [**কাল অর্থে**] এক + দা = একদা। সেইরকম—সর্বদা (সদা), যদা (যৎ + দা : পূর্ববর্তী 'ত' লুপ্ত) প্রভৃতি।

ধা : [**প্রকারার্থে** বা **খণ্ড খণ্ড অর্থে**] শত + ধা = শতধা। সেইরকম—বহুধা, দ্বিধা, ত্রিধা।

শালী (শালিন্) : [**আছে এই অর্থে**] বল + শালী (শালিন্) = বলশালী। সেইরকম—ধনশালী, বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী প্রভৃতি।

সাৎ : [**অবিকৃত অর্থে**] ভূমি + সাৎ = ভূমিসাৎ। সেইরকম—ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ আত্মসাৎ প্রভৃতি।

ভূত (ভূ + ত), **কৃত** (কৃ + ত) : [**অভূত তদ্ভাব অর্থে**] ভূ ও কৃ ধাতু যোগে এই প্রত্যয় গঠিত হয়। এই প্রত্যয় যুক্ত হইলে শব্দের অন্ত্যস্বর হয় দীর্ঘ এবং অন্ত্য

'অ'-ধ্বনি 'ঈ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়।] ভস্ম+ভূত=ভস্মীভূত। সেইরকম—বশীভূত, দূরীভূত। রাশি+কৃত=রাশীকৃত। সেইরকম—ভস্মীকৃত।

বৎ : [তুল্যার্থে] মনুষ্য+বৎ=মনুষ্যবৎ। সেইরকম—দেববৎ, জলবৎ, পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, ভ্রাতৃবৎ, বিষবৎ প্রভৃতি।

কল্প : [**ঈষৎ সমাপ্তি অর্থে**] ঋষি+কল্প=ঋষিকল্প। সেইরকম—মৃতকল্প, ইন্দ্রকল্প, মাতৃকল্প, পিতৃকল্প, ভ্রাতৃকল্প প্রভৃতি।

[**স্থ**, **শীল**, **প্রায়**, **জাত**, **স্বরূপ**, **জ্ঞ**, **জাতীয়**, **স্থানীয়**, **মূলক**, **সূচক**, **দ্যোতক**, **বাচক**, **ত্মক**, **তন** প্রভৃতি শব্দ তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মতই ব্যবহৃত হয়। যেমন—মুখস্থ, তীরস্থ, দেশস্থ, মনস্থ; প্রগতিশীল, স্থিতিশীল, পতনশীল, ধর্মশীল; মৃতপ্রায়, লুপ্তপ্রায়, ভগ্নপ্রায়; স্বজাত, কুলজাত; দণ্ডস্বরূপ, লভ্যস্বরূপ, পুরস্কারস্বরূপ, পারিশ্রমিকস্বরূপ; দেবজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ; বৃক্ষজাতীয়, সর্পজাতীয়, পশুজাতীয়, শূদ্রজাতীয়; পিতৃস্থানীয়, পুত্রস্থানীয়, মিত্রস্থানীয়, ছাত্রস্থানীয়; বস্তুমূলক, ক্রিয়ামূলক, ভ্রান্তিমূলক; কালসূচক, ক্রিয়াসূচক; ভাবদ্যোতক, ক্রিয়াদ্যোতক, প্রেমদ্যোতক; ক্রিয়াবাচক, পুরুষবাচক, কালবাচক; ভাবাত্মক, ধ্বন্যাত্মক, রসাত্মক, ক্রোধাত্মক; প্রাক্তন, পুরাতন, সনাতন, চিরন্তন, অধস্তন, ঊর্ধ্বতন প্রভৃতি।]

বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়

ই : [**গুণ, বৃত্তি, ভাব অর্থে**] রাখাল+ই=রাখালি। সেইরকম—চাকরি, কবিরাজি, জমিদারি, নবাবি, হাকিমি, ডাকাতি, বাহাদুরি, চালাকি, শয়তানি প্রভৃতি। [**দেশীয় অর্থে**] ঢাকা+ই=ঢাকাই, পাটনাই, খাগড়াই, বিলাতি প্রভৃতি। [**স্বার্থে**] আজ+ই=আজই। সেইরকম—কালই, হাসি, খুশি, বাঁশি, ফাঁসি, নিশি, লাথি প্রভৃতি। [**নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ অর্থে**] পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই, নয়ই, দশই এগারই, বারই প্রভৃতি। [**ধ্বন্যাত্মক অর্থে**] চক্‌মক্+ই=চকমকি। সেইরকম—ঝক্‌মকি, কচ্‌কচি, ঝুমঝুমি, ডুগ্‌ডুগি প্রভৃতি।

ঈ : [**স্ত্রী-প্রত্যয়রূপে**] দাস+ঈ=দাসী। সেইরকম—দেবী, বামনী, পাগলী, বুড়ী, মাসী, পিসী, কাকী, খুড়ী, মামী প্রভৃতি। [**বর্ণ বুঝাইতে**] গোলাপ+ঈ=গোলাপী। সেইরকম—জাফরানী, খয়েরী, বাদামী, বেগুনী, আশমানী, ধনী প্রভৃতি। [**উপকরণ অর্থে**] পশম+ঈ=পশমী। সেইরকম—রেশমী, কাগজী, প্রভৃতি। [**দেশীয় অর্থে**] কটক+ঈ=কটকী। সেইরকম—শান্তিপুরী, বিষ্ণুপুরী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, ভাগলপুরী, বিহারী, সিংহলী, জাপানী, জার্মানী, দেশী, বিদেশী,

আরবী, ফারসী, বিলাতী, মাগধী, ভোজপুরী, জৌনপুরী, বেনারসী, যোধপুরী, নেপালী, ভুটানী প্রভৃতি। [**জাতি অর্থে**] চাষ+ঈ=চাষী। সেইরকম—করাতী, ঢাকী, ঢুলী, মালী, তেলী, দোকানী প্রভৃতি। [**নিপুণ অর্থে**] হিসাব+ঈ=হিসাবী। সেইরকম—সেতারী, শিকারী, আলাপী, মজলিসী, শিল্পী, খেয়ালী, দরদী, মরমী প্রভৃতি। [**লাভের অর্থে**] খোরাক+ঈ=খোরাকী। সেইরকম—মজুরী, দালালী, প্রণামী, আশীর্বাদী, বারবরদারী, নমস্কারী, দর্শনী, সেলামী প্রভৃতি। [বানানের আধুনিক রীতি অনুসারে এই সকল শব্দ **'ই'-কারান্তও হয়**; যেমন—বুড়ি, মাসি, পিসি, গোলাপি, পশমি, রেশমি, বাদামি, মজুরি, দালালি, সেলামি প্রভৃতি।]

ইয়া (বা **এ**): [চলিতভাষায় 'ইয়া'-প্রত্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'এ'-তে পরিণত হয়] [**সম্বন্ধ অর্থে**] বারমাস+ইয়া=বারমাসিয়া, বারমেসে। সেইরকম—পাহাড়িয়া, পাহাড়ে; শহরিয়া, শহুরে; জালিয়া, জেলে; রায়বেশিয়া, রায়বেশে মুটিয়া, মুটে, এক ঘরিয়া, একঘরে। [**সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি অর্থে**] হাটুরিয়া, হাটুরে; ভাড়ুরে, আড়ুরে, যশুরে, নাটুকে, হলদে, বেগ্‌নে, সব্‌জে। [**শীলার্থে**] আহ্লাদে, আমুদে, রগুড়ে, ফলারে, হুজুগে, আবদেরে, খোশামুদে, খুনে, একগুঁয়ে, কাঁদুনে। [**নির্দিষ্ট দিন** বা **তারিখ অর্থে**] উনিশে, বিশে, একুশে, বাইশে, তেইশে, চব্বিশে, পঁচিশে, ত্রিশে। [**ধ্বন্যাত্মক অর্থে**] গন্‌গনে, ভন্‌ভনে, কন্‌কনে চট্‌পটে, ছট্‌ফটে, কট্‌কটে, নড়্‌বড়ে, লক্‌লকে, চক্‌চকে।

উয়া (বা **ও**): [চলিতভাষায় 'উয়া'-প্রত্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ও'-তে পরিণত হয়] মাছ+উয়া=মাছুয়া, মেছো। সেইরকম—জালুয়া, জ'লো; পটুয়া, প'টো; পড়ুয়া, প'ড়ো। নানা অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে। [উদাহরণ—হেটো, মেঠো, কেঠো, ধেনো, ভেতো, কেজো, ভুতো, মেধো, রেমো, ছেঁদো, বুনো, গেছো, টেকো, টুলো প্রভৃতি।]

আ: [**স্বার্থে**] ঘোড়্‌+আ=ঘোড়া। সেইরকম—পাতা, চোরা, ইল্‌শা, গলা, থালা, কালা, পাতলা। [**অবজ্ঞার্থে** বা **ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধার্থে**] গোপ্‌লা, নেপ্‌লা, ক্যাবলা। [**সম্বন্ধার্থে**] পশ্চিমা, দখিনা। [**অন্যান্য অর্থে**] লোনা, নোনা, জলা, তেলা, রোগা, জঙ্গ্‌লা, মিঠা, রাঙা, ভঁইসা, গাওয়া, ভাড়া, বাড়া, হাতা, খন্তা, চরকা, চীনা প্রভৃতি।

আই: [**আদরার্থে** নামের পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে] কান (<কানু<কৃষ্ণ) +আই=কানাই। সেইরকম—বলাই, জগাই, মাধাই, লখাই, বিশাই। [**ভাবার্থে**] বড়+আই=বড়াই। সেইরম—খাড়াই, লম্বাই, উৎরাই, চিকনাই, বামনাই,

সাফাই। [**সম্বন্ধার্থে**] বাদশা+আই=বাদশাই। সেইরকম—মোগলাই, বোনাই, ননদাই প্রভৃতি।

আনি : [**স্বার্থে**] তল+আনি=তলানি। সেইরকম—নাকানি, চোবানি, আমানি, স্বক্তানি। [**ভাবার্থে**] হিন্দুয়ানি, বিবিয়ানি, কাতরানি, ভাঙ্গানি, ছটফটানি, ধড়ফড়ানি, কামড়ানি প্রভৃতি।

আলি : [**ভাবার্থে** বা **গুণ-প্রকাশার্থে**] চতুর+আলি=চতুরালি। সেইরকম—ঠাকুরালি, মিতালি, দীপালি, ঘটকালি, চৈতালি, সোনালি রুপালি প্রভৃতি।

আলো (বা আল) : [**বিশিষ্টার্থে** বা **শীলার্থে**] ধার+আলো=ধারালো। সেইরকম—তেজালো, জাঁকালো, জমকালো প্রভৃতি। [**আল-প্রত্যয়**] রসাল, মাতাল, পাঁকাল, বাচাল, দয়াল, দাঁতাল, ভাটিয়াল, বাঙ্গাল, রাখাল, কোটাল, খাটাল প্রভৃতি।

আনা : [**ভাবার্থে**] মুন্সী+আনা=মুন্সীয়ানা (মুন্সিয়ানা)। সেইরকম—বাবুয়ানা, বিবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, মুরুব্বিয়ানা প্রভৃতি।

পনা : [**ভাবার্থে** বা **কার্যার্থে**] বেহায়া+পনা=বেহায়াপনা। সেইরকম—গিন্নিপনা, দাসীপনা, গুণপনা, ঠেঁটাপনা প্রভৃতি।

গিরি : [**কার্যার্থে** বা **ব্যবসায়-অর্থে**] মুটে+গিরি=মুটেগিরি। সেইরকম—বাবুগিরি, চেলাগিরি, সাধুগিরি, কেরানীগিরি, পাণ্ডাগিরি, দাতাগিরি। [ব্যবসায়-অর্থে 'গর্'-প্রত্যয়ও হয়। যেমন—কারিগর, সওদাগর। দক্ষ-অর্থে গীর্-প্রত্যয়ও হয়। যেমন—কুস্তিগীর।]

আরি (আরী) : [**বৃত্তি অর্থে** বা **কার্যার্থে**] শাঁখা+আরি=শাঁখারি (শাঁখারী)। সেইরকম—পূজারি (পূজারী), কাঁসারি (কাঁসারী), জুয়ারি (জুয়ারী), ঝিয়ারি (ঝিয়ারী), ভিখারি (ভিখারী) প্রভৃতি।

দার : [**কর্তা** বা **পদবি অর্থে**] চৌকি+দার=চৌকিদার। সেইরকম—জমিদার, দস্তিদার, তালুকদার, মজুমদার, তরফদার, সমাদ্দার, চাকলাদার, দফাদার, জোতদার, সমঝদার, বর্গাদার, অংশীদার, ভাগীদার, হাবিলদার প্রভৃতি। [**যুক্ত অর্থে**] দানাদার, কল্কাদার, মজাদার, চুড়িদার প্রভৃতি।

ইয়াল : [**বৃত্তি অর্থে**] লাঠিয়াল।

ওয়ালা : (ওলা, আলা) : [**বৃত্তি অর্থে**] মিঠাই+ওয়ালা=মিঠাইওয়ালা (মিঠাইওলা)। সেইরকম—পানওয়ালা (পানওলা), বাড়িওয়ালা (বাড়িওলা, বাড়িআলা), বাসনওয়ালা (বাসনওলা, বাসনআলা), গাড়িওয়ালা (গাড়িওলা), কাপড়ওয়ালা (কাপড়ওলা), রিক্সাওয়ালা (রিক্সাওলা) প্রভৃতি। [স্ত্রীলিঙ্গে হয়

ওয়ালী, উলী, আলী—বাড়িওয়ালী, বাড়িউলী; টাঙ্গাওয়ালী, টাঙ্গাআলী; পান-ওয়ালী, পানউলী প্রভৃতি।]

এইরকম আরও অনেক বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় আছে। যেমন—

আমি, আমো, মি, মো : [**ভাব, কার্য বা অনুকরণ অর্থে**] পাগল+আমি (আমো)=পাগলামি (পাগলামো)। সেইরকম—বাঁদরামি, বাঁদরামো; দুষ্টামি, দুষ্টামো; ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো; ইতরামি, ইতরামো প্রভৃতি। [মি-প্রত্যয়] জ্যাঠামি, ছেলেমি, কুঁড়েমি, বুড়ামি, নেকামি, ইতরামি, গোঁড়ামি প্রভৃতি। [বিকল্পে মো-প্রত্যয়—জ্যাঠামো, নেকামো, গোঁড়ামো প্রভৃতি।]

আরু (রু) : [**স্বার্থে ও সাদৃশ্যে**] (আর+উ='আরু' এবং রূপ হইতে 'রু'-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে) বোম+আরু=বোমারু, সাঁত+আরু=সাঁতারু; গো+রু (>রূপ)=গোরু, শজা+রু (<রূপ)=শজারু প্রভৃতি।

ওয়া : [**বিশেষণভাব বুঝাইতে**] ঘর+ওয়া=ঘরোয়া। সেইরকম—লাগোয়া, বাঁচোয়া, সাঁজোয়া।

ট, টা, টিয়া (টে) : [**স্বার্থে, সাদৃশ্যে, ভাবার্থে, শীলার্থে**] দাপ+ট=দাপট। সেইরকম—ভরাট, জমাট, চাপট। চেপ্+টা=চেপ্টা। সেইরকম—চিমটা, ঘেমটা, আংটা, নেওটা, একটা। ভাড়া+টিয়া (টে)=ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে)। সেইরকম—তামাটে, রোগাটে, বখাটে প্রভৃতি।

ইকা : [সংস্কৃত 'ক'-প্রত্যয়ের অনুকরণে এই প্রত্যয় **স্বার্থে** বা **ক্ষুদ্রার্থে** ব্যবহৃত হয়] চলন্ত+ইকা=চলন্তিকা। সেইরকম—চয়নিকা, কাননিকা, মায়াবিকা, মালবিকা, মাধবিকা প্রভৃতি।

উ, উক : [**আদরার্থে** বা **শীলার্থে**] কান (<কাহ্ন<কৃষ্ণ)+উ=কানু। সেইরকম—কালু, রামু, শ্যামু, দুষ্টু, শিবু, বাবলু, কাবলু প্রভৃতি। লাজ+উক=লাজুক। সেইরকম—পেটুক, ভাবুক, মিথ্যুক, নিন্দুক, চাবুক প্রভৃতি।

ক : [**স্বার্থে**] মোড়+ক=মোড়ক। সেইরকম—ঢোলক, নোলক, গোলক, ফলক, মড়ক, চড়ক, ধনুক প্রভৃতি।

ড়া, উড়ী : [**স্বার্থে** বা **সাদৃশ্যে**] গাছ+ড়া=গাছড়া; শাস্+উড়ী=শাশুড়ী। সেইরকম—চামড়া, দামড়া, কেওড়া, খাগড়া, আমড়া, রাজড়া, ঝিউড়ী প্রভৃতি।

ল, লা, লী : [**স্বার্থে, সাদৃশ্যে, সম্বন্ধে, ঈষদর্থে**] দীঘ+ল=দীঘল। সেইরকম—আদল, ধবল, হাতল, বাদল, মাদল প্রভৃতি। মেঘ+লা=মেঘলা। সেইরকম—বাদলা, আধলা, পাতলা, শ্যামলা প্রভৃতি। বিজ+লী=বিজলী। সেইরকম—শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি।

স, সা, সী : [**সাদৃশ্যে**] মুখ+স=মুখস। সেইরকম—আপস, খোলস প্রভৃতি। ফর্+সা=ফরসা। সেইরকম—ঝাপ্সা, ভ্যাপ্সা, পান্সা, মাকড়সা প্রভৃতি। রূপ+সী=রূপসী।

তা, তি : [**স্বার্থে**] নামতা, রাঙ্তা, ফেরতা, পড়তা ; চাকতি, বাড়তি, ঘাঁকতি, কমতি প্রভৃতি।

জা (<জাত) : [**বংশজাত অর্থে**] বোসজা, ঘোষজা, দত্তজা প্রভৃতি।

ন, না, নি (নী) : [**স্বার্থে** বা **স্ত্রী-বাচক প্রত্যয়রূপে**] নানা+ন= নানান। সেইরকম—বানান, মানান, জানান প্রভৃতি। পাখ্+না=পাখনা। নাত্+নি=নাত্নি, নাতনী। কামার+নী=কামারনী। সেইরকম—জমাদারনী, মালিনী, প্যাঁচানী প্রভৃতি।

ত, তুতো : [**সম্বন্ধে**] খুড়া+ত=খুড়াত ; সেইরকম—জ্যেঠাত, পিসাত, মামাত প্রভৃতি। জ্যাঠ্+তুতো=জ্যাঠ্তুতো। সেইরকম—খুড়তুতো, পিস্তুতো, মাসতুতো প্রভৃতি।

সই : [**প্রমাণ, সম্মত, পর্যন্ত অর্থে**] লাগসই, মানানসই, পছন্দসই, চলনসই, জুতসই প্রভৃতি।

পিছু : [**প্রত্যেক অর্থে**] মাথাপিছু, লোকপিছু, ছেলেপিছু প্রভৃতি।

করা : [**প্রত্যেক অর্থে**] মণকরা, শতকরা, হাজারকরা প্রভৃতি।

ভর, ভরা : [সেই **পরিমাণ অর্থে**] দিনভর, রাতভর ; বাটাভরা, গোলাভরা, গোয়ালভরা, পুকুরভরা, মুঠোভরা প্রভৃতি।

পানা : [**সাদৃশ্যে**] চাঁদপানা, কুলোপানা প্রভৃতি।

টি, টা, খানা, খানি : [**নির্দিষ্ট অর্থে**] দুইটি, চারটি, বাড়িটি, দোকানটি; ছেলেটা, মেয়েটা, দুইটা, তিনটা ; চারখানা, ছয়খানা, দশখানা ; চারখানি, ছয়খানি, দশখানি প্রভৃতি। [**স্থান অর্থেও** 'খানা'-প্রত্যয় বসে। যেমন—কারখানা, বৈঠকখানা, ছাপাখানা, গোসলখানা, ডাক্তারখানা, জিমখানা প্রভৃতি।]

গুলা, গুলো, গুলি : [**বহুবচনার্থে**] লোকগুলা, লোকগুলো, লোকগুলি ; ফলগুলা, ফলগুলো, ফলগুলি প্রভৃতি।

আন, ওয়ান : [**স্বার্থে** বা **চালক অর্থে**] বাগ+আন=বাগান। সেইরকম—মাচান, সাবান, কামান, তুফান। গাড়ি+ওয়ান=গাড়োয়ান। সেইরকম—দারোয়ান (দরোয়ান), কোচ্ওয়ান প্রভৃতি।

খোর : [**আসক্ত অর্থে**] গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুসখোর প্রভৃতি।

বাজ : [**অভ্যস্ত অর্থে**] ফাঁকিবাজ, চালবাজ, গলাবাজ, ধাপ্পাবাজ, মামলাবাজ, জাঁহাবাজ প্রভৃতি।

দান, দানি : [**আধার অর্থে**] কলমদান, আতরদান, ফুলদানি, পিকদানি, ধূপদানি, ছাইদানি প্রভৃতি।

নবিস : [**শিক্ষার্থী অর্থে**] শিক্ষানবিস, নকলনবিস, সুমারনবিস, জমানবিস প্রভৃতি। [অনেকে 'নবীশ'-ও লেখেন।]

বন্দী : [**বদ্ধ আছে এই অর্থে**] নজরবন্দী, বাক্যবন্দী, জবানবন্দী প্রভৃতি।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** আন্, ওয়ান, ওয়ালা, খানা, খোর, গর, গিরি, দান, দানি, নবিস, বন্দী, বাজ প্রভৃতি প্রত্যয় বিদেশী-শব্দের অন্তর্গত। ইহাদিগকে তাই 'বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়'ও বলা যাইতে পারে।]

অনুশীলনী

১। তদ্ধিত-প্রত্যয় কাহাকে বলে? তিনটি বাংলা ও তিনটি সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দগঠন করিয়া তাহাদের বাক্যে প্রয়োগ করিয়া দেখাও।

২। ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণি, ষ্ণেয়, অথবা অ, য, ই, এয় প্রত্যয়ের দ্বারা পাঁচটি করিয়া তৎসম শব্দ গঠন কর।

৩। ওয়ান, ওয়ালা, খানা, খোর, বাজ, দার, দামি, গিরি—এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর।

৪। কোন্ অর্থে কোন্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লিখ—

রাখাল, বর্গাদার, লাগোয়া, একুশে, বুনিয়াদী, তামাটে, খাগড়াই, মেছো, জ্যাঠামি, বাবুয়ানা, লম্বাই, দাঘল, মুখস, ঐশ্বরিক, পঙ্কিল, তন্দ্রালু, ভ্রান্ত, প্রামাণ্য, বৈষ্ণব, স্মার্ত, ঔজ্জ্বল্য, ভস্মসাৎ, বাঙ্ময়, কনিষ্ঠ, শ্রমিক।

৫। তদ্ধিতান্ত শব্দে পরিণত কর :—

রঘুর পুত্র ; দিতির পুত্র ; সুমিত্রার পুত্র ; গণপতির উপাসক ; রস আছে যাহার ; শ্রী আছে যাহার ; আগে বশে ছিল না এখন হইয়াছে ; বুড়ার ভাব ; সাঁতারে দক্ষ ; ধাপ্পা দিতে অভ্যস্ত।

৬। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর—

কানাই, কানু, দারোয়ান, মেঠো, মুন্সিয়ানা, লাগসই, লাগোয়া, পানসে, আঁষটে, দাঁতাল, জগাই, পূজারী, বোমারু, বেনারসী, নেকামি।

৫। উপসর্গ

অর্থ-পরিবর্তন ও নূতন শব্দ-গঠন

যে-সকল অব্যয়-পদে কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় না এবং যাহারা ধাতুর পূর্বে বসিয়া তাহাদের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বা নূতন শব্দ গঠন করে তাহাদিগকেই বলা হয় **উপসর্গ**। বাংলাভাষায় ধাতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম-শব্দ-র সহিত সংস্কৃত, দেশী ও বিদেশী উপসর্গ যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—

সংস্কৃত-উপসর্গ

সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গ আছে—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

একই ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হইলে কিভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে কয়েকটি উদাহরণ হইতেই তাহা স্পষ্ট হইবে। যেমন—

কৃ-ধাতু : (কার) প্র+কৃ=প্রকার ; অপ+কৃ=অপকার ; সম্+কৃ=সংস্কার ; অনু+কৃ=অনুকার ; বি+কৃ=বিকার ; অধি+কৃ=অধিকার ; প্রতি+কৃ=প্রতিকার ; পরি+কৃ=পরিষ্কার ; উপ+কৃ=উপকার ; আ+কৃ=আকার।

হৃ-ধাতু : (হার) প্র+হৃ=প্রহার ; সম্+হৃ=সংহার ; বি+হৃ=বিহার ; উৎ+হৃ=উদ্ধার ; পরি+হৃ=পরিহার ; উপ+হৃ=উপহার ; আ+হৃ=আহার।

গম্-ধাতু : (গম্+ক্ত=গত) অপ-গম্ (+ক্ত)=অপগত ; সম্-গম্ (+ক্ত)=সঙ্গত ; অনু-গম্ (ক্ত)=অনুগত ; অব-গম্ (+ক্ত)=অবগত ; দুর্-গম্ (+ক্ত) =দুর্গত ; বি-গম্ (ক্ত)=বিগত ; অধি-গম্ (+ক্ত)=অধিগত ; সু-গম্ (+ক্ত)=সুগত ; উৎ-গম্ (+ক্ত)=উদ্গত ; নির্-গম্ (ক্ত)=নির্গত ; উপ-গম্ (+ক্ত) উপগত ; আ-গম্ (+ক্ত)=আগত।

বিভিন্ন ধাতুর পূর্বে বসিয়া, সংস্কৃত উপসর্গগুলি প্রধানত যে-সকল অর্থে নূতন নূতন শব্দ-গঠন করে তাহা এইরূপ—

প্র—[**আধিক্যে**] : প্রচণ্ড, প্রকোপ, প্রকট, প্রলয়, প্রখর, প্রগল্‌ভ, প্রলাপ, প্রতাপ ; [**উৎকর্ষে**] প্রকাণ্ড, প্রখ্যাত, প্রভাব, প্রগতি. প্রচলট, প্রফুল্ল, প্রকাশ,

প্রবাহ, প্রণাম. প্রকৃষ্ট, প্রণতি, প্রগাঢ়, প্রজ্বলিত ; (**আরম্ভে**) প্রদোষ, প্রজনন, প্রবেশিকা, প্রভব প্রভৃতি।

পরা : [**আধিক্যে**] পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম ; (**প্রতিকূল অবস্থায়**) পরাজয়, পরাক্রান্ত, পরাজিত, পরাধীন, পরাভব, পরাভূত, পরাহত।

অপ : [**খারাপ অর্থে**] অপকর্ম, অপদেবতা, অপভাষা, অপমৃত্যু, অপবাদ, অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার ; [**বিপরীত অর্থে**] অপব্যয়, অপচয়, অপযশ, অপমান, অপকার ; [**স্থানান্তরিত** বা **দূরীকৃত অর্থে**] অপসরণ, অপহরণ, অপনয়ন, অপসৃত, অপহৃত, অপনীত।

সম্ : [**সহিত, একত্র** বা **সংযোগ অর্থে**] সমকাল, সমকালীন, সমাবর্তন, সমবেত, সঙ্কলন, সংবাদ, সন্ধান, সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সন্দর্ভ, সন্দর্শন, সন্ততি ; [**সম্যক্ অর্থে**] সংস্কার, সংস্কৃত, সংকীর্তন, সমাকীর্ণ, সঙ্কুচিত, সংক্ষেপ, সঙ্গীত, সংঘর্ষ, সংঘাত, সঞ্চার, সঞ্চালন, সঞ্চয়, সন্তরণ, সন্তোষ, সন্তুষ্ট, সমাবৃত, সমাচ্ছন্ন, সমাদর, সমাদৃত, সংগ্রহ, সমুচিত, সম্প্রদান।

নি : [**খারাপ অর্থে**] নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিবীর্য ; [**বিরতি অর্থে**] নিবারণ, নিবৃত্ত ; [**আধিক্যে**] নিদারুণ, নিদান ; [**সম্যক্ অর্থে**] নিযুক্ত, নিবিষ্ট, নিয়োগ, নিক্ষেপ, নিপাতন ; [**মধ্যে**] নিমজ্জন, নিমগ্ন, নিবাস।

অব : [**খারাপ অর্থে**] অবনত, অবজ্ঞা ; [**নিম্ন অর্থে**] অবতরণ, অবরোহণ, অবগাহন, অবগুণ্ঠন, অবরোধ ; [**দূরে**] অবসর, অবকাশ ; [**নিশ্চয় অর্থে**] অবগতি, অবদান।

অনু : [**পশ্চাৎ অর্থে**] অনুচর, অনুজ, অনুতাপ, অনুশোচনা, অনুধাবন, অনুগমন, অনুবর্তন ; [**সাদৃশ্যে**] অনুকরণ, অনুসরণ, অনুবাদ, অনুলিপি, অনুকৃতি, অনুরূপ ; [**নিকৃষ্ট অর্থে**] অনুকম্পা ; [**বীপ্সায়**] অনুদিন, অনুক্ষণ ; [**সম্যক্ অর্থে**] অনুকূল, অনুভব ; [**সম্মতিতে**] অনুজ্ঞা ; [**মধ্যে**] অনুবিদ্ধ, অনুপ্রবেশ।

নির্ : [**নাই অর্থে** বা **অভাবে**] নির্দয়, নির্ভয়, নির্লোভ, নির্জন, নির্ধন, নিরামিষ, নিরপরাধ, নিরভিমান, নির্লিপ্ত, নির্বিষ, নিঃসংশয়, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসহায়, নিঃসম্বল, নিঃসন্দেহ, নিঃস্পন্দ, নিঃস্পৃহ ; [**সম্যক্ অর্থে**] নিরীক্ষা, নিরীক্ষণ ; [**বাহির অর্থে**] নির্গমন, নিঃসরণ, নির্যাস, নিঃশ্বাস।

দুর্ : [**খারাপ অর্থে**] দুর্ভাগ্য, দুর্গতি, দুরদৃষ্ট, দুরন্ত, দুঃশীল, দুঃশাসন, দুরবস্থা, দুঃসময়, দুঃস্বপ্ন, দুষ্পাচ্য, দুর্গন্ধ ; [**অভাবে**] দুর্ভিক্ষ, দুর্বল, দুঃসাধ্য, দুরতিক্রম ; [**আধিক্যে**] দুর্মূল্য।

বি : [**বিশেষ অর্থে**] বিখ্যাত, বিকশিত, বিকীর্ণ, বিক্রম, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিবর্তন, বিবর্ধন ; [**বিপরীত অর্থে**] বিকার, বিকৃত, বিকট, বিক্রয়, বিসর্জন, বিবাদ, বিপক্ষ ; [**অভাবে**] বিনিদ্র, বিতৃষ্ণা, বিধবা, বিস্মরণ, বিরক্ত, বিয়োগ ।

অধি : [**আধিক্যে**] অধিকাংশ ; [**আধিপত্যে**] অধিকার, অধিকরণ, অধিকারী, অধিকৃত, অধিগতি, অধিরাজ, অধিনায়ক ; [**উপরে**] অধিরোহণ, অধিত্যকা ; [**মধ্যে**] অধিগত, অধিবাসী ।

সু : [**ভালো, সুন্দর, উৎকৃষ্ট** প্রভৃতি **অর্থে**] সুকুমার, সুকোমল, সুদর্শন, সুনীতি, সুচারু, সুবেশ, সুকেশ, সুজন, সুচরিত, সুকণ্ঠ, সুকৃতি ; [**আধিক্যে**] সুদক্ষ, সুনিপুণ, সুনির্মল, সুকঠিন, সুকৌশল ; [**অনায়াসে**] সুগম, সুবহ, সুলভ ।

উৎ : [**আধিক্যে** বা **প্রাবল্যে**] উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট, উদ্বেল, উত্তম, উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উত্তপ্ত, উৎপীড়ন ; [**স্থানচ্যুতি অর্থে**] উত্থান, উত্তোলন, উৎক্ষিপ্ত, উদ্বাস্তু, উৎপাটন ; [**বাহিরে**] উৎপত্তি, উৎখাত, উদ্ভিদ্‌, উদ্ধার, উদ‍্‍বোধন, উৎকর্ণ, উত্তরণ ।

পরি : [**বিশেষ অর্থে**] পরিপূর্ণ, পরিপুষ্ট, পরিত্যক্ত, পরিশ্রান্ত, পরিতাপ, পরিশ্রম, পরিদর্শন, পরিচালক, পরিকল্পনা, পরিচর্যা, পরিচয়, পরিগ্রহ ; [**বিরোধে**] পরিবাদ, পরিপন্থী ; [**চতুর্দিকে**] পরিভ্রমণ, পরিবৃত, পরিদৃশ্যমান ।

প্রতি : [**বিপরীত** বা **বিরোধ অর্থে**] প্রতিকূল, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিধান, প্রত্যাগমন, প্রত্যুত্তর, প্রত্যাদেশ, প্রতিনায়ক ; [**সাদৃশ্যে**] প্রতিনিধি, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ, প্রতিবিম্ব ; [**সামীপ্যে**] প্রতিবেশী, প্রতিবাসী, প্রতিহারী, [**প্রকর্ষে**] প্রতিজ্ঞা, প্রতিবন্ধক, প্রতিপত্তি, প্রতিপালন, প্রতিকার ; [**বীপ্সায়**] প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ ।

অভি : [**প্রকর্ষে**] অভিজাত, অভ্যুদয়, অভ্যুত্থান, অভ্যাগত, অভিনয়, অভিনেতা, অভিনব, অভিভাষণ, অভিবাদন, অভিজ্ঞান, অভিনিবেশ, অভিলাষ ; [**বিরোধে**] অভিশাপ, অভিযান, অভিযোগ ।

অতি : [**আধিক্যে** বা **আতিশয্যে**] অতিকায়, অতিমানব, অতিভক্তি, অতিভোজন, অতিগর্ব, অতিমাত্র, অতিদর্প, অতিবৃষ্টি, অত্যাচার ; [**বাহিরে**] অতিক্রম ।

অপি : [**ভিতরে, উপরে, নিশ্চয়** প্রভৃতি **অর্থে**] অপিনদ্ধ, অপিনিহিত, অপিধান, অপিচ ।

উপ : [**সন্নিকটে, দিকে** বা **প্রতি**] উপকণ্ঠ, উপকূল, উপকরণ, উপচার, উপহার, উপস্থিত, উপবেশন, উপকার ; [**সাদৃশ্যে** বা **হীনতায়**] উপকথা, উপবন, উপদ্বীপ, উপদেবতা, উপপতি, উপমন্ত্রী ।

আ : [**ব্যাপ্তি অর্থে**] আশৈশব, আকৈশোর, আসমুদ্র, আকণ্ঠ, আজন্ম, আমরণ; [**বিপরীত অর্থে**] আদান, আগমন, আরম্ভ, আরব্ধ ; [**ঈষৎ অর্থে**] আভাস, আকুঞ্চন, আনত, আরক্ত ; [**সম্যক্ অর্থে**] আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ, আকৃষ্ট, আকীর্ণ।

[এই কুড়িটি উপসর্গের মধ্যে 'অতি' ও 'প্রতি' এই দুইটি উপসর্গ আলাদাভাবেও বসিতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য উহারা 'অব্যয়'-রূপেই পরিগণিত হয়। উপসর্গ নয়, অথচ উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয় এইরূপ **কয়েকটি সংস্কৃত-অব্যয়ও** আছে। যেমন—অন্তর্, অলম্, আবিস্, তিরস্, পুরস্, পূর্ব, বহিস্ প্রভৃতি। উদাহরণ—

অন্তর্ : অন্তর্যামী, অন্তর্দেশীয়, অন্তরাত্মা, অন্তঃপুর, অন্তর্বর্তী, অন্তস্তল, অন্তঃপাতী।

অলম্ : অলঙ্করণ, অলঙ্কার, অলঙ্কৃত।

আবিস্ : আবির্ভাব, আবির্ভূত, আবিষ্করণ, আবিষ্কার, আবিষ্কৃত, আবিষ্ট।

তিরস্ : তিরস্কার, তিরস্কৃত, তিরোধান, তিরোভাব, তিরোহিত।

পুরস্ : পুরস্কার, পুরস্কৃত, পুরোধা, পুরোবর্তী, পুরোহিত।

পূর্ব : পূর্বকাল, পূর্বগামী, পূর্বজন্ম, পূর্বতন, পূর্বপদ, পূর্বপুরুষ, পূর্ববর্তী।

বহিস্ : বহির্জগৎ, বহির্দেশ, বহির্বাণিজ্য, বহির্বাস, বহির্ভূত, বহিষ্করণ, বহিষ্কৃত।]

দেশী (বাংলা) উপসর্গ

বাংলাভাষার নিজস্ব উপসর্গ বড় বেশি নাই। যে-সকল উপসর্গ বাংলা-উপসর্গ নামে চলিতেছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃতজ। যেমন—

অ : [**না, নয়**, বা **নাই অর্থে**] অচেনা, অজানা, অদেখা, অসুবিধা, অকেজো, অঢেল, অফুরন্ত ; [**মন্দ অর্থে**] অকাজ, অবেলা, অদিন, অখাদ্য, অনড, অকথ্য, অবুঝ, অযাত্রা, অহিন্দু।

অনা : [**নাই অর্থে**] অনাবৃষ্টি ; [**মন্দ অর্থে**] অনামুখ, অনাসৃষ্টি, অনাছিষ্টি।

আ : [**না, নয়** বা **নাই অর্থে**] আলুনি, আধোয়া, আকাঁড়া, আছাঁটা, আছোলা, আবাছা, আভাঙা ; [**সাদৃশ্যে**] আগাছা, আবাধা ; [**মন্দ অর্থে**] আঘাটা, আকাল, আবাগী।

কু : [**মন্দ অর্থে**] কুকাজ, কুকথা, কুনজর, কুযাত্রা, কুপথ্য, কুচ্ছিত, কুদিন, কুপথ।

না : [**নয় অর্থে**] নামঞ্জুর, নাবালক, নালায়েক, নাছোড়, নারাজ।

নি : [**না বা নাই অর্থে**] নিদয়, নিঠুর, নিখাঁজ, নিখোঁজ, নির্ভাজ, নিলাজ, নিখুঁত, নিটোল, নিখাদ, নিখরচা।

নির্ : [**না অর্থে**] নির্ভেজাল, নির্ভরসা।

নিম : [**ঈষৎ অর্থে**] নিমরাজি।

পর : [**অন্য অর্থে**] পরচুল, পরগাছা, পরদেশ।

পাতি : [**ক্ষুদ্র অর্থে**] পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতি-কুয়া (পাত্‌কো)

বি : [**না অর্থে**] বিজোড়; [**মন্দ অর্থে**] বিভুঁই, বিকাল, বিকল।

বে : [**না, নয় বা নাই অর্থে**] বেজোড়, বেপরোয়া, বেমানান, বেহায়া, বেঠিক; [**মন্দ অর্থে**] বেসুরো, বেচাল, বেগার, বেজাত, বেনামা, বেফাঁস, বেতাল।

ভর্ : [**পূর্ণ অর্থে**] ভরদিন, ভরপেট, ভরদুপুর।

ভরা : [**পূর্ণ অর্থে**] ভরাযৌবন, ভরানদী, ভরাডুবি।

রাম : [**বৃহৎ বা বোকা অর্থে**] রামছাগল, রামদা।

রাজ : [**বৃহৎ বা প্রধান অর্থে**] রাজহাঁস, রাজযক্ষ্মা, রাজপথ।

স : [**সহিত অর্থে**] সজোর, সবুট, সঠিক।

সু : [**ভালো অর্থে**] সুখবর, সুসমাচার, সুনজর, সুবিচার।

হা : [**নিন্দা অর্থে**] হা-ঘরে, হা-ভাতে, হা-হুতাশ, হা-পিত্যেশ।

বিদেশী উপসর্গ

কয়েকটি বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় উপসর্গের মতই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন—

গর্ : [**না বা অভাব অর্থে**] গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

দর্ : [**অধীন বা নিম্ন অর্থে**] দরপত্তনি, দরদস্তুর, দরখাস্ত, দরদালান।

ফি : [**প্রতি অর্থে**] ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন্।

ব : [**সহিত অর্থে**] বকলম, বনাম, বমাল।

বদ্ : [**নিন্দা অর্থে**] বদলোক, বজ্জাত, বদনাম; [**অভাব অর্থে**] বদহজম।

বে : [**না বা অভাব অর্থে**] বে-কসুর, বেতার, বেহুঁশ, বে-বন্দোবস্ত, বে-কায়দা, বেমালুম; [**নিন্দায়**] বে-আইনী, বে-পরদা, বে-আক্কেল, বেদখল, বেকার, বেঘোর, বেহেড্।

হর : [**প্রত্যেক অর্থে**] হররোজে, হরেক, হরবোলা।

উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

(১) "যাহা **অন্যায়** হোক্ না **প্রবল** করিয়াছি **প্রতিবাদ**।"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। (২) "আরোহীগণ **অবতরণ** করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য **সম্পাদনে প্রবৃত্ত** হইলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র। (৩) "যাহা কিছু ন্যায় ও **সুযুক্তির অনুসারী** তাহার **উৎপত্তি** প্রাচীন গ্রীসে।"—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (৪) "ব্রাহ্মণের তপোবন **অদূরে** তাহার—**নির্বাক্**, গম্ভীর, শান্ত, সংযত, উদার।"—রবীন্দ্রনাথ। (৫) "আমি তোমায় **প্রতিপালন** করিয়াছিলাম।"—বিদ্যাসাগর। (৬) "মঙ্গল করো **নিরলস নিঃসংশয়** করো হে।"—রবীন্দ্রনাথ। (৭) "**পরিশেষে** সকলের **উপবাসের উপক্রম** দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে **সম্বোধন** করিয়া কহিলেন। —বঙ্কিমচন্দ্র। (৮) "অমন **বে-আক্কেলে** মানুষ আমি বাপের জন্মে দেখিনি বাপু।"—মনোজ বসু। (৯) "কাজে অমন **গরমিল** হ'লে চলবে কেন?"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। (১০) "**পরদিন সুকান্ত** এসে বল্‌লে—**সুখবর** আছে।" (১১) "ভদ্রলোক **বরখাস্তটা** দেখে শেষ পর্যন্ত **অনুমতি** দিয়েছেন।"—মনোজিৎ বসু। (১২) "মন-**অভিলাষ** যদি দেশেই পূর্ণ হইত, **বিদেশ** গমনে তবে ইচ্ছা কার হইত।"—অবনীন্দ্রনাথ। (১৩) "এত ঘাত-**প্রতিঘাত**, এত রকম চরিত্র, এ-**পরিণাম সংস্কার**-মুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।"—অন্নদাশঙ্কর রায়। (১৪) "**অধীর নাছোড়-বান্দার** মত মাথা নাড়ল: যাবই।"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। (১৫) "সহসা যদি তার **আভাস** পাও।"—প্রেমেন্দ্র মিত্র। (১৬) "**ফি-বছর** সে আসে তার বহুরূপী সাজ দেখাতে।"—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি? প্রত্যেক উপসর্গ-যুক্ত এক একটি শব্দের উল্লেখ কর।

২। পাঁচটি বাংলা উপসর্গ-যুক্ত শব্দের সাহায্যে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৩। তিনটি বিদেশী উপসর্গের উল্লেখ কর এবং কোন্ কোন্ অর্থে তাহাদের ব্যবহার করা হয় লিখ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্বে চারিটি বিভিন্ন উপসর্গ বসাইয়া শব্দ রচনা কর:— কার, গত, স্থান, যোগ, কৃতি।

৫। স্থা-ধাতুর পূর্বে প্র, অধি, অনু, অব, প্রতি, সম্, উৎ এই উপসর্গগুলি বসাইয়া এক একটি শব্দ গঠন কর ও তাহাদের অর্থের পার্থক্য নির্ণয় কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাক্য-প্রকরণ

১। বাক্য

সুবিন্যস্ত পদ বা পদ-সমষ্টির সাহায্যে যখন বক্তার মনের কোনো ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সেই পদ বা পদসমষ্টিকেই বলা হয় **বাক্য**।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও **আসত্তি**—এই তিনটি হইল বাক্যের প্রধান লক্ষণ। বাক্যের অর্থবোধের জন্য এক পদের পর অন্য পদ শুনিতে মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহাকেই বলা হয় বাক্যের **আকাঙ্ক্ষা**। এই আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই বাক্যে বিভিন্ন পদ বিন্যস্ত হয় যেমন—'তাহার জন্য আমার উৎকণ্ঠার' এই পর্যন্ত বলিলে 'আকাঙ্ক্ষা' পূর্ণ হয় না। যদি বলি 'তাহার জন্য আমার উৎকণ্ঠার শেষ নাই' তবেই 'আকাঙ্ক্ষা' শেষ হয় এবং বাক্যও সম্পূর্ণ হয়। বাক্যের দ্বিতীয় লক্ষণ—'যোগ্যতা'। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাক্যে যে-সকল পদ বসে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থগত বা ভাবগত একটা সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। বাক্যের এই লক্ষণকেই বাক্যের **যোগ্যতা** বলা হয়। যদি বলা হয় 'রাত্রে সূর্য উঠিল', তাহাতেও হয়তো বাক্যের 'আকাঙ্ক্ষা' সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু অর্থগত বা ভাবগত কোনো সঙ্গতি সে-বাক্যে থাকে না। কারণ, রাত্রে কখনও সূর্য উদিত হয় না, সেইরূপ, 'জলে আগুন লাগিতে মাছেরা গাছের উপরে উঠিল' বলিলেও সে-বাক্যের 'যোগ্যতা' থাকে না। তবে, ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই জাতীয় বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে। বাক্যের তৃতীয় লক্ষণ 'আসত্তি'। অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভাষার নিয়ম বা রীতি অনুসারে পদগুলিকে পর পর সুবিন্যস্ত করার নামই বাক্যের **আসত্তি**। যেমন—'মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন দেখা দিল।' এই বাক্যের পদগুলির অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া পর পর সুবিন্যস্ত হইয়াছে। কাজেই, ইহা আসত্তি-পূর্ণ বাক্য। কিন্তু, যদি বলা হয়—'সারা গান্ধীর আহ্বানে মহাত্মা ভারতবর্ষের একটা আলোড়ন দেখা দিল মধ্যে জনগণের'—তাহা হইলে উহা আসত্তি-হীন নিরর্থক একটি বাক্যে পরিণত হইবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ থাকে। একটি অংশ হইল—'উদ্দেশ্য', অপরটি 'বিধেয়'। বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোনো কিছু বলা হয় তাহা **উদ্দেশ্য**; এবং সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বলা হয় তাহাই **বিধেয়**। উদ্দেশ্য বা বিধেয়

কখনও এক একটি মাত্র পদ লইয়া হইতে পারে ; কখনও বা তাহারা একাধিক পদসমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। বিশেষণ-পদ উদ্দেশ্যের সহিত প্রযুক্ত হইলে তাহা উদ্দেশ্য-অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়. এবং সেই নিয়মে ক্রিয়া-বিশেষণাদি বিধেয়-অংশের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। সাধারণত, বিশেষণ, কৃদন্ত, সম্বন্ধ-পদ ইত্যাদি দ্বারা উদ্দেশ্য-অংশ এবং কর্মকারক বা সম্প্রদান-কারকে ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় প্রভৃতির সাহায্যে বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত হইতে পারে।

উদাহরণ—

[ক]

	উদ্দেশ্য	**বিধেয়**
১।	যদু	আসিতেছে।
২।	মাধব ঘোষের ছেলে যদু	এখন আসিতেছে।
৩।	শ্যামপুকুরের মাধব ঘোষের ছেলে যদু	এখন আমাদের বাড়িতে আসিতেছে।
৪।	শ্যামপুকুরের নামজাদা উকিল মাধব ঘোষের বড় ছেলে যদু	এখন আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিবার জন্য আসিতেছে।

[খ]

১।	বিনোবা ভাবে	উপস্থিত হইলেন।
২।	আচার্য বিনোবা ভাবে	কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন।
৩।	ভারতের বিশিষ্ট সমাজকর্মী আচার্য বিনোবা ভাবে	একদল সঙ্গীসহ কাশ্মীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।
৪।	মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রধান সহচর ভারতের বিশিষ্ট সমাজ-কর্মী আচার্য বিনোবা ভাবে	ভূদানযজ্ঞ-পরিক্রমায় দিল্লী হইতে পদব্রজে একদল সঙ্গীসহ কাশ্মীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুসারে বাক্য সাধারণত তিন প্রকার - (১) **সরল বাক্য**, (২) **জটিল** বা **মিশ্র বাক্য** এবং (৩) **যৌগিক বাক্য**।

সরল বাক্য ঃ একটিমাত্র কর্তা ও একটিমাত্র সমাপিকা-ক্রিয়া লইয়া সরল-বাক্য গঠিত হয়। যেমন—

(১) সূর্য উঠিল। (২) সে গান গাহিতেছে। (৩) হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। (৪) আমি এখন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়িতেছি। (৫) দধীচির আত্মদানের ফলে দেবতারা রক্ষা পাইলেন।

জটিল বা মিশ্র বাক্যঃ যে-বাক্যে একটি প্রধান বাক্যের সহিত এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য অপেক্ষাসূচক অব্যয় বা সর্বনাম-পদের দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলা হয়। যেমন—

(১) যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আবার সূর্য উঁকি দিল। (২) আমরা উপস্থিত হইতে সে গান বন্ধ করিল। (৩) আমার ইচ্ছা হয় যে, একবার হিমালয় পর্বতের কোনো জায়গায় বেড়াইতে যাই। (৪) তুমি যখন আসিলে তখন আমি গীতাঞ্জলি পড়িতেছি। (৫) দধীচি যখন আত্মদান করিলেন, তখন দেবতারা রক্ষা পাইলেন।

যৌগিক বাক্যঃ দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র সরলবাক্য কোনো অব্যয়ের (এবং, কিংবা, সুতরাং, আর, ও, কিন্তু, নতুবা, নইলে প্রভৃতি) দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যখন একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় যৌগিক বাক্য। যেমন—

(১) আকাশ মেঘমুক্ত হইল এবং সূর্য উদিত হইল। আমরা উপস্থিত হইলাম, আর সেও তাহার গান বন্ধ করিল। (৩) আমাদের খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হিমালয় পর্বতের কোনো জায়গায় বেড়াইতে যাইতে পারিলাম না। (৪) তুমি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি হইতে কোনো কবিতা আবৃত্তি কর, কিংবা আমিই আবৃত্তি করিয়া শোনাই। (৫) দধীচি আত্মদান করিলেন, নতুবা দেবতারা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না।

বাক্যের রূপান্তর

উল্লিখিত এক এক প্রকার বাক্যকে কিভাবে অপরাপর শ্রেণীর বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় তাহা দেখানো হইতেছে—

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর

সরল	খেলার সময় খেলিবে।
জটিল	যখন খেলার সময়, তখন খেলিবে।
সরল	মহৎ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধালাভ করেন।
জটিল	যিনি মহৎ (ব্যক্তি), তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
সরল	বৃষ্টি থামিতে আমরা বাহির হইলাম।
জটিল	যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আমরা বাহির হইলাম।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল : বাড়িতে কাজ থাকায় তোমাদের বাড়ি যাইতে পারি নাই ।
যৌগিক : বাড়িতে কাজ ছিল, সেজন্য তোমাদের বাড়ি যাইতে পারি নাই।
সরল : দোষ করায় তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে।
যৌগিক : তুমি দোষ করিয়াছ, সুতরাং তুমি শাস্তি পাইবে।
সরল : প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।
যৌগিক : তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

জটিল : যদি তুমি রাগ কর, সেইজন্য ও-কথা আর বলি নাই।
সরল : তোমার রাগের ভয়ে ও-কথা আর বলি নাই।
জটিল : তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি একদিন তোমার বাড়িতে যান।
সরল : তিনি একদিন তোমার বাড়িতে যাইতে ইচ্ছুক।
জটিল : যখন স্টেশনে পৌছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিল।
সরল : স্টেশনে পৌছিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

জটিল : যদি আমার কথা না শোন, তবে অনুতাপ করিবে।
যৌগিক : আমার কথা শোন, নতুবা অনুতাপ করিবে।
জটিল : যদি-বা কিছু টাকা পেলাম, তাতেও অভাব মিটল না।
যৌগিক : কিছু টাকা পেলাম বটে, কিন্তু তাতে অভাব মিটল না।
জটিল : যখন তার দেখা পাব, তখন খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করব।
যৌগিক : তার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এবং খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করব।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক : তাহার বয়স বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নাই।
সরল : তাহার বয়স বাড়িলেও বুদ্ধি বাড়ে নাই।
যৌগিক : সে স্পষ্টবক্তা, সেইজন্য সকলে তাহাকে ভয় করে।
সরল : স্পষ্টবক্তা বলিয়া সকলে তাহাকে ভয় করে।
যৌগিক : সে প্রতিশ্রুতি দিল, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।
সরল : প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে, তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক : মন দিয়া লেখাপড়া কর, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।

জটিল : যদি মন দিয়া লেখাপড়া কর, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।

যৌগিক তোমার বেতন বৃদ্ধি হউক, তাহাতেই আমাদের আনন্দ।

জটিল : যখন তোমার বেতন-বৃদ্ধি হইবে, তখন আমাদের আনন্দ হইবে।

যৌগিক ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল, এবং ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিল।

জটিল : যখন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল, (তখন) তাহার ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিল।

তিন প্রকার বাক্যে একই বক্তব্য

সরল বৃষ্টি থামিতে আমরা বাহির হইলাম।

জটিল : যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আমরা বাহির হইলাম।

যৌগিক বৃষ্টি থামিল এবং আমরা বাহির হইলাম।

বিভিন্ন ধরনের বাক্য

অর্থানুসারে বাক্য সাধারণত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন—

(১) **নির্দেশসূচক-বাক্য :** তিনি বক্তৃতা দিতেছেন। সূর্য উঠিতেছে। তাহারা উভয়েই সমান পারদর্শী।

নির্দেশসূচক বাক্য দুই প্রকার—(ক) **অস্ত্যর্থক**—পরোপকার মহৎ ধর্ম।
(খ) **নাস্ত্যর্থক**—পরোপকারের মতো ধর্ম নাই।

(২) **প্রশ্নবাচক-বাক্য :** কে ওখানে? তুমি কী চাও? কানাই কোথায় কাজ করে?

(৩) **ইচ্ছাসূচক** বা **প্রার্থনাসূচক-বাক্য :** তোমার জিনিস ফিরিয়ে নাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

(৪) **অনুজ্ঞাসূচক** বা **আদেশবাচক-বাক্য :** এই মুহূর্তে স্থানত্যাগ কর। যাও, বেশী বকবক্ ক'রো না। ধরো এই ছেলেটাকে।

(৫) **কার্যকারণাত্মক-বাক্য :** না খাটলে পয়সা মেলে না। যদি রোদ হয়, তবে সব শুকোতে দেব।

(৬) **সন্দেহদ্যোতক** বা **সংশয়-সূচক-বাক্য :** সে বোধহয় আর আসবে না। আজ হয়তো তার দেখা পাব। যদি একবার দেখা পাই, তাহ'লে তাকে নিয়ে আসব।

(৭) **বিস্ময়াদিবোধক-বাক্য :** মরি মরি, কী সুন্দর দৃশ্য! এ যে দেখছি মজুমদার মশাই! উঃ, সে এখন কী দুর্দশাতেই না পড়েছে!

বিভিন্ন ধরনের বাক্যের রূপান্তর

অস্ত্যর্থক-বাক্য	নাস্ত্যর্থক-বাক্য
তোমাকে চিরদিন মনে রাখিব।	তোমাকে কোনদিন ভুলিব না।
তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।	তিনি আর জীবিত নাই।
চরিত্র-গুণেই মানুষ স্মরণীয় হয়।	চরিত্র না থাকিলে মানুষ স্মরণীয় হয় না।
নির্দেশসূচক-বাক্য	**প্রশ্নবাচক-বাক্য**
তোমার সকল কাজই তো করিতেছি।	তোমার কোন্ কাজটা করি না?
ইহাতে সকলেরই রাগ হয়।	ইহাতে কাহার না রাগ হয়?
মেহনত করলেই পারিশ্রমিক পাবে।	মেহনত না করেই কি পারিশ্রমিক পাবে?
নির্দেশসূচক-বাক্য	**বিস্ময়াদিবোধক-বাক্য**
অনেক টাকা পাইতে ইচ্ছা করে।	আহা! অনেক টাকা যদি পেতাম!
সে বড়ই বিপদে পড়েছে।	উঃ! সে কতই-না বিপদ্‌গ্রস্ত!
সূর্যোদয়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।	মরি মরি! কী সুন্দর সূর্যোদয়!
নির্দেশসূচক-বাক্য	**প্রার্থনা-সূচক বাক্য**
তোমার কল্যাণ কামনা করি।	তোমার কল্যাণ হোক।
ঈশ্বর তোমাকে বিপন্মুক্ত করিবেন।	ঈশ্বর তোমাকে বিপন্মুক্ত করুন।

উক্তি-পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ-উক্তি-সূচক-বাক্য	পরোক্ষ-উক্তি-সূচক-বাক্য
বিমলা বলিলেন, "গজপতি, ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ কর।"	বিমলা গজপতিকে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে বলিলেন।
সাজাহান বলিলেন, "ঔরংজীব কি এখানে এসেছে, একবার দেখে আয় তো জাহানারা!"	ঔরংজীব এখানে আসিয়াছে কিনা তাহা একবার দেখিয়া আসিবার জন্য সাজাহান জাহানারাকে বলিলেন।

প্রত্যক্ষ-উক্তি-সূচক বাক্য	পরোক্ষ-উক্তি-সূচক-বাক্য
"কী চাই ?"—জিজ্ঞাসা করলেন রতন ঠাকুর-পো।	সে কী চায় রতন-ঠাকুর-পো তাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করলেন।
শিক্ষকমহাশয় বলিলেন, "আশা ছেড়ো না, চেষ্টা ক'রে দেখ আর একবার।"	শিক্ষক-মহাশয় তাহাকে আশা ছাড়িতে নিষেধ করিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলিলেন।
তিনি বলিলেন, 'আমি আজও ফিরতে পারি, কালও ফিরতে পারি।"	তিনি বলিলেন যে, তিনি আজ কিংবা কাল ফিরতে পারেন।

অনুশীলনী

১। বাক্য-গঠনের যে-সব লক্ষণ আছে উদাহরণসহ তাহা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত কর—

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। নরেন আজ দেখা করতে আসবে। দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হইল। রামচন্দ্র বনগমন করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক।

৩। গঠন-অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৪। জটিল ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৫। অর্থানুসারে বাক্য কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? উদাহরণ দাও।

৬। সরল-বাক্যে পরিণত কর:—

সময় থাকতে এসো, নইলে দেখা হবে না। আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো আমি একটা দোকান খুলব। যদি কাজ কর তবে দাম পাইবে। কেমন করিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহা মনে করিতে পারি না। যে ভালো ছেলে তাহাকে সকলেই স্নেহ করে।

৭। জটিল-বাক্যে পরিণত কর:—

পড়ার সময় পড়িবে। গুণীজনকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা উচিত। সূর্যোদয় হইলে নৌকা ছাড়িল। বিনা দোষে তাহার সাজা হইল।

৮। যৌগিক-বাক্যে পরিণত কর:—

সত্য কথা বলায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। যখন হাতে টাকা হবে, তখন একটা ভালো কাজ করব। যদি নিষ্ঠার সহিত কাজ কর, তবেই সাফল্যলাভ করিবে। যথাসময়ে আসিলেও তাঁহার দেখা পাইলাম না। যদি পড়াশোনা কর, তবে পাস করিবে।

৯। নাস্ত্যর্থক বাক্যে রূপান্তরিত কর :—

এখানে তাহার বিস্তর খরচ। সে এখন খাইতে বসিবে। চেষ্টা করলে সবই হয়। কাজ করিলে দাম মিলিবে। তোমার পরবার কাপড়খানা দেখছি ছিঁড়ে গেছে।

১০। উক্তি-পরিবর্তন কর :—

(ক) নারায়ণী বলিলেন, "চুল না পাকতেই আমি একদিন নদীর জলে ডুবে মরব।" (খ) মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্তিক-সভায় বলিলেন যে, হিংসা দ্বারা কখনও শান্তি মেলে না। (গ) নবীনবাবু তাঁর মেয়েকে ডেকে বল্লেন, "হ্যাঁরে কমলা, তোর মা এখনও কালীঘাট থেকে ফেরেনি ?" (ঘ) গজেনবাবু বলিলেন যে, সুমথবাবুরা ঘাটশীলা বেড়াইতে যাইবেন, এবং আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইব কিনা সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। (ঙ) রাজা অশ্বপতি তখন ঋষিগণকে কহিলেন,—"তোমরা সকলেই বৈশ্বানর আত্মাকে জান, অথচ কেহই স্বরূপ জান না।"

২। বাচ্য

কর্তা, কর্ম (কর্তার কর্ম) ও ভাব (বা ক্রিয়ার কর্ম)-এর সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক স্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ক্রিয়ার রূপের যে তারতম্য ঘটে, তাহাকেই বলা হয় **বাচ্য**। বাচ্য প্রধানত তিন শ্রেণীর—(১) **কর্তৃবাচ্য**, (২) **কর্মবাচ্য**, (৩) **ভাববাচ্য**।

কর্তৃবাচ্য : যেখানে কর্তৃপদের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ হয়, অর্থাৎ কর্তা যেখানে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেখানে ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য হয়। যেমন—

(ক) **আমি** এই কবিতাটি রচনা **করিয়াছি**।

(খ) **রামচন্দ্র** রাবণকে **বধ করেন**।

(গ) **শিক্ষক-মহাশয়** আমাকে **পাঠাইয়াছেন**।

কর্মবাচ্য : যেখানে কর্মপদের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ হয়, অর্থাৎ যেখানে কর্মপদই কর্তার স্থান অধিকার করে, সেখানে ক্রিয়ার **কর্মবাচ্য** হয়। যেমন—

(ক) আমা দ্বারা **এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে**।

(খ) রামচন্দ্র কর্তৃক **রাবণ নিহত হয়**।

(গ) **আমি** শিক্ষক-মহাশয় কর্তৃক **প্রেরিত হইয়াছি**।

[ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি বসে, এবং ক্রিয়াপদের পুরুষ কর্তৃপদের অনুসারী হয়। সেইরকম, কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি ও কর্মে প্রথমা-বিভক্তি বসে, এবং ক্রিয়াপদের পুরুষ নির্ধারিত

হয় কর্মের পুরুষ অনুসারে। পূর্বপৃষ্ঠায় কর্মবাচ্যের যে-সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে এই জাতীয় কর্মবাচ্যের বড় বেশী প্রয়োগ দেখা যায় না। আধুনিক লেখকগণ 'আমা দ্বারা এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে' না লিখিয়া, লিখিবেন—'এই কবিতাটি আমার রচনা।' 'আমি শিক্ষক-মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি' না লিখিয়া, লিখিবেন—'আমি শিক্ষক-মহাশয়ের নিকট হইতে আসিতেছি' কিংবা 'আমি শিক্ষক-মহাশয়ের কাছ থেকে আসছি'।]

ভাববাচ্য: যেখানে ক্রিয়ার কর্ম-(বা ভাব)-ই হয় প্রধান, কর্তা বা কর্মের কোনোরূপ প্রাধান্য থাকে না, সেখানে ক্রিয়ার **ভাববাচ্য** হয়। যেমন—

(ক) তোমার আজ সেখানে **গিয়ে কাজ নেই**।

(খ) অবেলায় আর **খাওয়া চলবে না**।

(গ) আমাকে এবার **উঠ্‌তে হবে**।

[ভাববাচ্যে ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্যে প্রথমা-বিভক্তি বসে, এবং অনুক্ত কর্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী-বিভক্তি (কখনও কখনও তৃতীয়া বা সপ্তমী) প্রযুক্ত হয়।]

বাংলা ভাষায় আর এক শ্রেণীর বাচ্য প্রচলিত আছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—**কর্মকর্তৃবাচ্য**। ক্রিয়াপদের রূপ যেখানে কর্তৃবাচ্যের মতো, অথচ যাহার সম্পর্ক কর্মের সহিত এবং কর্মপদটি যেখানে কর্তৃপদের কাজ করে সেখানে কর্মকর্তৃবাচ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বাচ্যে ক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে সকর্মক, অথচ উহা অকর্মকের রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়। যেমন—

(ক) তিনদিন পরেই কাছারি খুলবে।

(খ) আকাশে বেশ মেঘ করেছে।

(গ) রোগীর নাড়ী বড়ই চঞ্চল।

['মশায়ের কোথায় **থাকা হয়**?' 'কম দামে মাল **বিকোয়** না।' 'নীল শাড়িটাতে তোমাকে বেশ **মানায়**।' 'এখন এককাপ চা **খাওয়া চলে**।' প্রভৃতি বাক্যগুলিকেও কর্মকর্তৃবাচ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইসব বাক্যের ক্রিয়া দেখিতে অকর্মক-ক্রিয়ার মতো হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহারা সকর্মক ক্রিয়া।]

বাচ্য-পরিবর্তন

	কর্তৃবাচ্য	>	কর্মবাচ্য
(১)	মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।		মহাকবি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত হয়।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
(২) তোমরা ঐ কায সম্পাদন করিতে পারিবে না।	তোমাদের দ্বারা ঐ কার্য সম্পাদিত হইবে না।
(৩) পূজারী পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিয়াছেন।	পূজারী কর্তৃক পূজার জন্য পুষ্প আহৃত হইয়াছে।
(৪) আমি সকালে খবরের কাগজ পড়েছি।	সকালে আমার খবরের কাগজ পড়া হয়েছে।
(৫) পাড়ার ছেলেরা চোরটিকে ধরেছে।	পাড়ার ছেলেদের হাতে চোরটি ধরা পড়েছে।
(৬) রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেন।	রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি' রচিত হয়। অথবা—'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের রচিত।

কর্তৃবাচ্য >	ভাববাচ্য
(১) আমরা এখন খাইতে বসিব।	আমাদের এখন খাইতে বসিতে হইবে।
(২) বাবা এখনও বাজারে যান নাই।	বাবার এখনও বাজারে যাওয়া হয় নাই।
(৩) এখানে বসুন।	এখানে বসা হোক।
(৪) চাকরিটার জন্যে তাকে একবার ধর।	চাকরিটার জন্যে তাকে একবার ধরা হোক।
(৫) সারা আকাশে কালো মেঘ দেখছি।	সারা আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।
(৬) পথে একটা মণিব্যাগ কুড়িয়ে পেলাম।	পথে একটা মণিব্যাগ কুড়িয়ে পাওয়া গেল।

কর্তৃবাচ্য >	কর্মকর্তৃবাচ্য
(১) আগামীকাল তুমি আসিবে।	আগামীকাল তোমার আসা চাই।
(২) আমি আর চলিতে পারি না।	আমার আর পা চলে না।
(৩) তাহারা কষ্ট সহিতে পারে।	তাহাদের কষ্ট সয়।

কর্মবাচ্য >	কর্মকর্তৃবাচ্য
(১) বাজারে কবিতার বই চালানো যায় না।	বাজারে কবিতার বই চলে না।
(২) এই বস্তায় একমণ চাল ধরানো যায়।	এই বস্তায় একমণ চাল ধরে।
(৩) আমাদের রুচির বদল হইতেছে।	আমাদের রুচি বদলাইতেছে।

অনুশীলনী

১। বাক্য কয় প্রকার ও কী কী ? প্রত্যেক বাক্যের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। বাচ্য নির্ধারণ কর :—

(ক) মশায়ের কোথায় থাকা হয় ? (খ) সিদ্ধার্থ দেবদত্তকে আহ্বান করিলেন। (গ) গাছ কাটা হয়েছে। (ঘ) রাজপুত রমণীগণ কর্তৃক জহরব্রত উদ্‌যাপিত হইল। (ঙ) আজ কখন ফিরছেন ?

৩। বাচ্য পরিবর্তন কর :—

(ক) আকাশে তারার মেলা দেখিতেছি। (খ) বইখানি এখনও পড়া হয় নাই। (গ) শিক্ষক-মহাশয় আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। (ঘ) আপনারা কখন এলেন ? (ঙ) বাবাকে এখনই বের হ'তে হবে। (চ) তোমার আজ বেড়াতে যেতে হবে না। (ছ) ফুলের গাছগুলি আমারই সংগৃহীত। (জ) ও-গানটি আগেই আমার শোনা। (ঝ) বন্যার জলে বহু সহস্র বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। (ঞ) শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা 'চণ্ডালিকা' অভিনয় করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

১। বিশেষ্য-পদের বৈশিষ্ট-প্রয়োগ

মাথা : **মাথায়** (মস্তকে) তেল দাও। নবীনবাবু গ্রাম-সমাজের **মাথা** (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা অগ্রণী)। ছেলের ব্যবহারে আমার **মাথা কাটা** যায় (লজ্জা হয়)। 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ***ঠেকাই মাথা***।'—রবীন্দ্রনাথ (এখানে 'ঠেকাই মাথা' অর্থ 'প্রণাম করি'।) **মাথা খাও,** অমন কথা আর ব'লো না (দিব্য দেওয়া অর্থে)। কাজ করেছ, না আমার **মাথা করেছ** (অর্থাৎ, ঠিক কাজ হয় নাই)! অঙ্কে ছেলেটির খুব **মাথা** (অর্থাৎ, অঙ্কে ছেলেটি সুনিপুণ ; কিংবা অঙ্কে ছেলেটির খুব 'বোধশক্তি' আছে)। আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির **মাথা খেও না** (অর্থাৎ, নষ্ট ক'রো না)। লাই দিলেই কুকুর **মাথায় ওঠে** (অর্থাৎ, আশ্রয়দাতাকে অবজ্ঞা করে)। পরের **মাথায় হাত বুলিয়ে** তিনি বিস্তর টাকা করেছেন (অর্থাৎ, পরকে 'প্রতারণা করিয়া')। সর্দিতে খুব **মাথা ধরেছে** (অর্থাৎ মাথা ভারী বোধ হইতেছে)। কোনো কথাই দেখছি তোমার **মাথায় ঢোকে না** (বোধগম্য হয় না)। একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে দেখছি তিনি তোমার **মাথা কিনে** রেখেছেন (অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন)। জটিল অঙ্ক দেখলেই সে আর **মাথা ঘামাতে** (বুদ্ধি খাটাইতে) চায় না। দইয়ের **মাথাটা** (অগ্রভাগ) এই ভদ্রলোকের পাতে দাও।

মুখ : তার দিকে একবার **মুখ তুলে চাও** (অর্থাৎ, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর)। এবার বুঝি ভগবান **মুখ তুলে চাইলেন** (অর্থাৎ, দয়া করিলেন)। ছেলেটার **মুখে খই ফুটছে** (অর্থাৎ, ছেলেটি অনর্গল কথা বলিতেছে)। অমন ক'রে **মুখ করছ** (মুখ করা অর্থে বকাবকি বা তিরস্কার করা) কেন ? **মুখ সামলে** (অর্থাৎ, সতর্কতার সঙ্গে) কথা ব'লো, নইলে ভালো হবে না বলছি। কাজের মতো কাজ ক'রে সে তার মা-বাপের **মুখ রেখেছে** (মুখ রাখা অর্থে সম্মান-রক্ষা করা)। তোমার **মুখ ভার** কেন (অর্থাৎ, তুমি বিষণ্ন কেন)? কুলাঙ্গার ছেলেটি শেষ পর্যন্ত বংশের **মুখে চুনকালি দিয়ে** ছাড়ল (অর্থাৎ, বংশে কলঙ্কলেপন করিল)। তুমি বড় **মুখ আলগা** (অর্থাৎ, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বল)। সকাল থেকেই তোমার **মুখ চলছে** দেখছি (অর্থাৎ, সকাল হইতেই তুমি খাইতেছ দেখিতেছি)। আসল ব্যাপারটা প্রকাশ হ'তেই তার **মুখ চুন** (অর্থাৎ, সে নীরব)। বৌটি দিনরাত শাশুড়ীর **মুখ ঝামটা** খাচ্ছে (অর্থাৎ, বকুনি খাইতেছে)।

চোখ : আজকাল **চোখ রাঙিয়ে** (রাগ দেখাইয়া) ছেলেদের বশে আনা যায় না। তার উন্নতি দেখে তোমার অমন **চোখ টাটাচ্ছে** কেন (অর্থাৎ, পরশ্রীকাতর হইতেছ কেন)? **চোখের পলকেই** (এক নিমেষেই) সে যে কোথায় পালিয়ে গেল টের পেলাম না। ভাতটা ধ'রে না যায় সেদিকে একটু **চোখ রেখো** (অর্থাৎ, মনোযোগ দিও)। অমন ক'রে ছেলেটার দিকে **চোখ দিও না** বাপু (অর্থাৎ, কু-নজর দিও না)। এতদিন পরে দেখছি তোমার **চোখ খুললো** (অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে)। নরেনের **চোখ উঠেছে** (অর্থাৎ, চোখের রোগবিশেষ হইয়াছে)। আমাকে প্রত্যুত্তর দিবার জন্যে সে **চোখ ঠারতে** লাগল (অর্থাৎ, চোখ দিয়া ইশারা করিল)। দিনরাত তাকে অমন **চোখে চোখে** রেখেছ কেন (অর্থাৎ, সতর্ক পাহারায় রাখিয়াছ কেন)? অমন ক'রে ধাক্কা মারলে কেন, **চোখ খেয়ে** (অন্ধ হয়ে) বসেছ নাকি?

কান : তোমাকে বলতে-না-বলতেই সে-কথা বড় সাহেবের **কানে তুললে** (কানে তোলা অর্থাৎ বলা বা উত্থাপন করা)? **কান পেতে** (মনোযোগ দিয়া) কী শুনছ অমন ক'রে? রমেশবাবু দেখছি তারাপদবাবুর **কান ভাঙিয়েছেন** (কুমন্ত্রণা দিয়েছেন)। এত ক'রে তাঁকে বোঝালাম, তবু তিনি আমার কথায় **কান দিলেন না** (অর্থাৎ, শুনিলেন না)। এরই মধ্যে মুখরোচক খবরটা দেখছি পাড়ার সকলের **কানে উঠেছে** (কানে ওঠা অর্থ কর্ণগোচর হওয়া)। তাঁর গান সত্যিই **কানে লাগার মতো** (অর্থাৎ, শ্রুতিমধুর মনে হওয়া)।

হাত : তাঁর মতো লোককে যখন **হাত করেছ** তখন আর ভাবনা কি (হাত করা অর্থ বশ করা)? সময় নেই, এখন আর রান্নার কাজে **হাত দিতে** পারব না (হাত দেওয়া অর্থ প্রবৃত্ত হওয়া)। এ-ব্যাপারে তোমার যদি কোনো **হাত থাকে** তাহ'লে ভদ্রলোকের একটু উপকার ক'রো ভাই (হাত থাকা অর্থাৎ প্রভাব থাকা)। ছেলেবেলা থেকেই সে কবিতায় **হাত পাকিয়েছে** (অর্থাৎ, কবিতা রচনায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে)। আদিনাথের আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে, এখন আর কোন কাজে **হাত উঠছে না** (হাত ওঠা অর্থ মন লাগা বা আগ্রহ থাকা)।

পা : বাজারে যাবার জন্যে সে **পা বাড়াল** (অগ্রসর হইল)। বড়লোকের **পা চাটা** তার যেন স্বভাব (অর্থাৎ, বড়লোকের কাছে হীনতা স্বীকার করা)। হাতে সময় বেশি নেই, এবার **পা চালিয়ে** চল (দ্রুত)। লটারীতে টাকা পেয়ে, তোমার দেখছি খুব **পা (পায়া) ভারী** হয়েছে (অর্থাৎ, তুমি খুব গর্বিত বা অহঙ্কারী হইয়াছ)। অনাথ ছেলেটাকে **পায়ে রাখুন** (আশ্রয় দিন)। চাকরির উন্নতির জন্য সে আজকাল বড়সাহেবের **পায়ে তেল** দিতে শিখেছে (তোষামোদ করিতে)।

গরিব বেচারাকে পায়ে **ঠেলবেন** না হুজুর (অর্থাৎ তাড়াইয়া দিবেন না)! তাঁর **পায়ে ধরতে** (বিশেষ তোষামোদ করিতে) কি আর বাকি রেখেছি! এত রাত্রে বাইরে বের হতে আর **পা উঠছে না** (অর্থাৎ, ইচ্ছা না হওয়া)।

গা : তুমি যদি একটু **গা কর** তাহ'লেই কাজ হয় (গা করা অর্থে মনোযোগ দেওয়া)। তার কথা অমন ক'রে **গায়ে মেখো না** (গায়ে মাখা অর্থ গ্রাহ্য করা)। লোকটা **গা ঝাড়া** দিয়ে উঠতেই, তাকে চিনে ফেললাম (গা ঝাড়া দেওয়া অর্থাৎ উঠিবার উপক্রম করা)। 'গা **তোল**, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল।' (গা তোলা অর্থ উঠা)। কীর্তন-গান শুনে যেন **গা জুড়িয়ে** গেল (শান্তি পাইলেন)। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সে এবার **গা ঢেলে দিয়েছে** (অর্থাৎ, শুইয়া পড়িয়াছে)। এতদিন কোথায় **গা ঢাকা দিয়ে** ছিলে (অর্থাৎ, আত্মগোপন করিয়া)? অমন ক'রে **গায়ে ফুঁ দিয়ে** (অর্থাৎ, দায়িত্ব-হীনভাবে) চল্‌লেই কি চলবে?

কথা : আমার **কথা রাখতেই** হবে তোমাকে (কথা রাখা অর্থ অনুরোধ রক্ষা করা)। মণির সঙ্গে **কথায়** কে পেরে উঠবে (অর্থাৎ, তর্কে)! এখন লোকের মুখে কেবল স্পুটনিকের **কথা** (প্রসঙ্গ)। **কথা** দিলে (অঙ্গীকার করিলে) তা রাখাই উচিত। তিনি রামায়ণের **কথা** (গল্প) শোনাচ্ছিলেন।

২। *বিশেষণ-পদের বিশিষ্ট-প্রয়োগ*

কাঁচা : (অপক্ব) **কাঁচা পেয়ারা** খেতেই বেশী ভালো লাগে। (রান্না করা নয়) এক সময় মানুষও **কাঁচা মাংস** খেত। (ভালো পোড়ানো নয়) বাড়িটা দেখছি **কাঁচা ইঁটে** তৈরী! (অবিবেচনা-যুক্ত) তুমি যে এমন **কাঁচা কাজ** ক'রে বসবে, তা কি আর জানি? (অসম্পূর্ণ) ছেলেটার **কাঁচা ঘুম** ভাঙিয়ো না। (অসার) রমেশবাবু **কাঁচা কথার** মানুষ নন। (অনিপুণ) গল্পটা আদৌ পছন্দ হয়নি, **কাঁচা হাতের** লেখা তা পড়লেই বোঝা যায়। (অপরিণত) এ যে দেখছি একেবারে **কাঁচা বয়সের** মেয়ে! (অনায়াসলভ্য বা প্রচুর) যুদ্ধের বাজারে **কাঁচা পয়সার** অভাব ছিল না। (অস্থায়ী) জানালায় **কাঁচা রং**, সাবধানে হাত দিয়ো। (পরিবর্তনীয়) **কাঁচা খাতায়** হিসেবটা টুকে রেখে ওকে একটা **কাঁচা রসিদ** দিয়ে দাও। (উপকরণ-দ্রব্য) ভারতের শিল্পজগতে এখনও **কাঁচা মালের** বিশেষ অভাব রয়েছে।

পাকা : (পক্ব) গাছটা দেখছি **পাকা আমে** ভর্তি। (বৃদ্ধ বয়সের ইঙ্গিত) আশীর্বাদ করি, **পাকা চুলে** সিঁদুর পরতে পার। (অভিজ্ঞ) এ বড় কঠিন কাজ,

তাই **পাকা লোক** চাই। (ইট দিয়ে তৈরী) গাঁয়েঘরে ক'জন লোক আর **পাকা বাড়িতে** বাস করে? (স্থায়ী) একেবারে **পাকা রং** দেখেও বুঝতে পারছেন না? (খাঁটি) **পাকা সোনায়** খাদ না মেশালে গহনা তৈরি করা শক্ত! (শক্ত) বুড়ো হ'লে কি হয়, একেবারে **পাকা হাড়!** (আশীর্বাদ-পর্ব) মেয়েটার **পাকা দেখা** হ'য়ে গেছে, সাত দিন পরেই বিয়ে। (অপরিবর্তনীয়) আমার একেবারে **পাকা কথা**, আপনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন। (নিপুণ) **পাকা হাতের** কাজ, তা দেখলেই বোঝা যায়। (পরিণত) বয়স অল্প হ'লে কি হবে, তার **পাকা বুদ্ধি** দেখলে অবাক হ'তে হয়।

ছোট : (ক্ষুদ্র) তাঁর বাড়ির সামনেই দেখবে কতকগুলি **ছোট গাছ**। (অনুন্নত) **ছোটলোকদের** সঙ্গে এক সারিতে বসতে তিনি মোটেই রাজী নন। (কনিষ্ঠ) মিনু আমার **ছোটবোন**। (সঙ্কীর্ণ) লোকটার টাকা থাকতে পারে, কিন্তু বড় **ছোট নজর!** (ক্ষমতার দিক হইতে নিম্ন) হাইকোর্টে **ছোট আদালতের** রায় আর টিকল না। (স্বল্পায়তন) এমন **ছোট বাড়িতে** এতগুলি লোকের কি জায়গা হয়? (সংক্ষিপ্ত) আপনার কাছ থেকে একটা **ছোট লেখা** পেলেই আমরা খুশী হব।

বড় : (বৃহৎ) বেশ **বড় বাড়িই** তৈরি করেছ দেখছি। (সম্ভ্রান্ত) সে যে **বড় বংশের** ছেলে, তা চেহারা দেখেই টের পেয়েছি। (জ্যেষ্ঠ) তার **বড় ছেলে** এবার বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। (অত্যন্ত) বোঝাটা **বড় ভারী**। (ধনী) এ গাঁয়ে **বড়লোকের** সংখ্যা বেশি নয়। (গঠিত) ছোট মুখে **বড় কথা** সহ্য হয় না।

নরম : (তুলতুলে) **নরম বিছানায়** শুয়েও তার ঘুম হ'লো না। (মৃদু) এখন অমন **নরম সুরে** কথা বলছ যে? (কোমল) শিশুদের **নরম মনে** আঘাত দিও না। (পচা) তুমি শেষে এমন **নরম মাছ** নিয়ে আসবে, তা কখনও ভাবিনি। (শান্ত) সব সময় সব মানুষ কি আর **নরম মেজাজে** থাকতে পারে? (সস্তার) এখন তো বেশ **নরম বাজার** দেখছি!

গরম : (গ্রীষ্ম) **গরমকালেই** দিন বড় আর রাত ছোট। (পশমী) দার্জিলিঙ থেকে সে এবার অনেক **গরম কাপড়** নিয়ে এসেছে। (তপ্ত) সর্দিতে **গরম চা** বিশেষ উপকারী। (উগ্র) টাকার গরমেই কি **গরম মেজাজ** দেখাচ্ছ? (উত্তেজক) একগাদা **গরমমসলা** দিলেই কি তরকারি ভালো হয়, আসলে রান্নার হাত থাকা চাই! (মূল্য বৃদ্ধি) বাজার করব কি মশাই, যে-রকম **গরম বাজার!**

মোটা : (বিপুলায়তন) গরমকালে **মোটা লোকদের** বড় অসুবিধা। (স্থূল) তোমার মতো **মোটা বুদ্ধির** লোক নিয়ে কাজ চলে না বাপু! (আসল বা কঠিন) বাড়ির সব **মোটা কাজগুলিই** তো নিজে হাতে করছি। (ভারী বা পুরু) শীত এসে পড়ল, এবার **মোটা কাপড়গুলি** বের করতে হবে। (প্রচুর বা অধিক) বেশ তো **মোটা মাইনের** চাকরি করছ, তবু এত অভাব কেন ?

পোড়া : (দগ্ধ) শ্রীবৎসের হাত থেকে **পোড়া মাছ**-ও পালিয়ে গেল। (মন্দ) সবই দেখছি আমার **পোড়া কপাল !** (নিরর্থক) ও-সব **পোড়া কথায়** কান দিও না। (জনহীন বা অসুবিধাপূর্ণ) এমন **পোড়া দেশে** মরতে এলে কেন বাপু!

৩। *ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট-প্রয়োগ*

ধরা : (মনে করা অর্থে) **ধরা** চাকরিটি যদি না-হয়, তাহ'লে কী করবে ? (সামলানো অর্থে) ছেলেটা যে কেঁদে সারা হ'লো, ওকে একটু **ধর না** বাপু! (বোঝা বা চেনা অর্থে) এটা যে কার হাতের লেখা, দেখে তা **ধরা** শক্ত। (নিশ্চিত অর্থে) আজ আর তার দেখা মিলবে না, সেটা **ধরেই** রাখ। **মাথা ধরা**—(যন্ত্রণা অর্থে) **মাথা ধরলেই** তিনি বড় কাবু হয়ে পড়েন। **বৃষ্টি ধরা**—(থামা অর্থে) এতক্ষণ পরে বৃষ্টিটা **ধরল**। **ফল ধরা**—(হওয়া অর্থে) গাছটায় কত ফলই না **ধরেছে**। **গলা ধরা**—(স্বরভঙ্গ হওয়া অর্থে) আজ আর গান গাইতে পারব না, **গলাটা ধরে** আছে। (কুটকুট করা অর্থে) ওলের তরকারিটা খেতেই **গলাটা** বেশ **ধরে উঠল**। **ওষুধ ধরা**—(ফল-হওয়া অর্থে) এতক্ষণে **ওষুধটা ধরেছে** দেখছি! (পাত্রের তলায় লাগিয়া যাওয়া অর্থে) ডালটা **ধ'রে** গেছে, গন্ধে টের পাচ্ছ না ? (গ্রাহ্য করা অর্থে) ও নেহাত ছেলেমানুষ, ওর কথা কি **ধরতে আছে ? তামাক-ধরা** (অভ্যাস করা অর্থে) কি হে, তামাক **ধরলে** কবে ? **নাম ধরা** (তালিকাভুক্ত করা) তোমার নামটা **ধরতেই** ভুল হয়ে গেছে দেখছি। (স্থান সঙ্কুলান হওয়া অর্থে) এতটুকু বারান্দায় কি আর অত লোক **ধরে ? ধামা ধরা** (তোষামোদ করা) গোপালদা বড় সাহেবের **ধামা ধরতে** ওস্তাদ! **ম্যাও ধরা** (আসল কাজ আরম্ভ করা অর্থে) সবই তো বুঝতে পারছি, কিন্তু **ম্যাও ধরবে** কে ? **রোগ ধরা**—(নির্ণয় করা অর্থে) বড় বড় ডাক্তার এসেও তাঁর **রোগটা ধরতে** পারলেন না।

করা : **রাগ করা**—(ক্রুদ্ধ হওয়া) তুমি অমন **রাগ করলে,** কথাটা বলি কী ক'রে ? **গাড়ি করা**—(ভাড়া করা ; কেনা অর্থে) এত রাতে হেঁটে যেতে পারব না বাপু, একটা **গাড়ি কর**। **মানুষ করা**—(লালন-পালন করা অর্থে)

ছেলেবেলা থেকে তিনিই আমাকে কোলে-পিঠে ক'রে **মানুষ করেছেন**। **মাটি করা**—(নাশ করা) তোমরা যে এমন ক'রে কাজটা **মাটি করবে** তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। **ভয় করা**—(ভীত হওয়া অর্থে) অমাবস্যার রাতে শ্মশানের পথে চলতে কার না **ভয় করে**! **মুখ করা**—(ভর্ৎসনা করা অর্থে) শাশুড়ী দিনরাত নতুন বৌকে **মুখ করছেন**। **টাকা করা**—(সঞ্চয় করা অর্থে) এই ক'বছরেই এত **টাকা করেছ**? **দোকান করা**—(চালানো অর্থে) **দোকান করা** সবার পক্ষে সহজ নয়। **হাত করা**—(আয়ত্ত করা) কেমন ক'রে যে তুমি বড়সাহেবকে এমন ক'রে **হাত করলে** সে-কথা ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি।

তোলাঃ **কথা তোলা**—(উত্থাপন করা) সভায় সার **কথা তুলতেই** সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌লো। **হাত তোলা**—(আঘাত করা) ঐ কচি ছেলের গায়ে **হাত তুলতে** তোমার একবারও হাত কাঁপলো না! **চাঁদা তোলা**—(সংগ্রহ করা) বন্যার্তদের জন্য **চাঁদা তুলে** আমরা কেন্দ্রীয় অর্থ-ভাণ্ডারে তা জমা দিলাম। **ফুল তোলা**—(চয়ন করা) পূজার জন্য **জল তুলে** আন। **কানে তোলা**—(শোনা) কি গো! আমার **কথা** যে **কানেই তুলছ** না? **জাতে তোলা**—(উন্নীত করা) সকল মানুষই সমান, কাজেই কাউকে **জাতে তোলার** প্রশ্ন ওঠে না। **দাগ তোলা**—(দূর করা) মনের ভিতর যে-দাগ একবার বসেছে, সে **দাগ তোলা** কি এতই সহজ? **মুখ তোলা**—(দয়া করা) অধমের দিকে একটু **মুখ তুলে** চান হুজুর। **পটল তোলা**—(মৃত্যু হওয়া) কাল রাত্রেই বেচারা **পটল তুলেছে**।

কাটাঃ **দিন কাটা**—(অতিবাহিত হওয়া) কোনোরকমে **দিন কাটছে**। **দুধ কাটা**—(নষ্ট হওয়া) নিশ্চয়ই খারাপ ছিল, নইলে **দুধটা** অমন **কাটবে** কেন? **সুতা কাটা**—(তৈয়ারি করা) গান্ধীঘাটের চত্বরে ব'সে কাটুনীরা তখন চরকায় **সুতা কাটছিল**। **বই কাটা**—(বিক্রয় হওয়া) আজকাল বাজারে কবিতার **বই কাটে** না। **মেঘ কাটা**—(দূর হওয়া) ঘণ্টা দুই বৃষ্টির পর আকাশের **মেঘ কেটে** গেল। **কথা কাটা**—(খণ্ডন করা) যুক্তি দিয়ে **কথা কাটতে** সে ওস্তাদ। **তিলক কাটা**—(রচনা করা) সকালে স্নান সেরেই সে কপালে **তিলক কাটল**। **সাঁতার কাটা**—(সন্তরণ করা) বাংলাদেশের তিন জন **সাঁতার কেটে** ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে। **ফাঁড়া কাটা**—(মৃত্যুর যোগ দূর হওয়া) এই **ফাঁড়াটা কাটলেই** আপনার আর ভয় নেই।

ওঠা (উঠা): (উদিত হওয়া) **সূর্য ওঠার** আর বিশেষ দেরি নেই। (আরোহণ করা) সে কেমন তরতর ক'রে **গাছে উঠে** গেল। **রং ওঠা**—(ক্ষয় পাওয়া) কাপড়ের অমন সুন্দর **রংটা উঠে** যাবে আগে তা বুঝতে পারিনি। **পাখা**

ওঠা—(উদ্গত হওয়া) পিঁপড়ের **পাখা উঠেছে,** এইবার পুড়ে মরবে। **মাথায় ওঠা**—(আস্পর্ধা পাওয়া) লাই পেয়ে পেয়ে সে একেবারে **মাথায় উঠেছে**। **মন ওঠা**—(তুষ্ট হওয়া) এত ভালো ভালো জিনিস পেয়েও তোমার **মন ওঠে** না দেখছি! **চোখ ওঠা**—(রোগবিশেষ হওয়া) ছেলেটার **চোখ উঠেছে,** ওর কাছ ঘেঁষে ব'সো না। **চুল ওঠা**—(লোপ পাওয়া) এখানকার জলেই মাথার **চুল উঠতে** আরম্ভ করেছে।

খাওয়া : মাথা খাওয়া—(নষ্ট করা বা দিব্য দেওয়া) (ক) দিনরাত অমন আদর দিয়ে ছেলেটার **মাথা খেও** না। (খ) '**মাথা খাও**, কথা রাখো, মাথা মাটি ক'রো না।' **টাকা খাওয়া**—(ঘুষ লওয়া) সে নিশ্চয়ই **টাকা খেয়েছে,** নইলে অমন কাজ করতে পারে! **নুন খাওয়া**—(অন্নে প্রতিপালিত হওয়া বা কৃতজ্ঞ থাকা অর্থে) '**নুন খাই** যার, গুণ গাই তার।' **ধমক খাওয়া**—(তিরস্কৃত হওয়া)—অন্যায় করলে, অথচ **ধমক খাবে** না? **হাওয়া খাওয়া**—(বেড়ানো অর্থে) খালি **হাওয়া খেলেই** কি চলবে, কাজকর্ম কিছু করতে হবে না? **চাকরি খাওয়া**—(বরখাস্ত করা) তিনি অকারণে কারও **চাকরি খান** না। **খাবি খাওয়া**—(অন্তঃশ্বাস লওয়া) জলে প'ড়ে সে তখন **খাবি খাচ্ছে**। **খাপ খাওয়া**—(মানাইয়া চলা) সে কি সব অবস্থায় নিজেকে **খাপ খাওয়াতে** পারে? **চোখ খাওয়া**—(অন্ধ হওয়া) **চোখ খেয়ে** ব'সে আছ নাকি, দেখতে পাও না?

দেওয়া : পাড়ি দেওয়া—(পার হওয়া) উড়োজাহাজ ক'রেই **পাড়ি দিলাম**। **লম্বা দেওয়া**—(পলায়ন করা) গোলমাল হ'তেই সে **লম্বা দিল**। **বরাত দেওয়া**—(অন্যের উপর ভার দেওয়া) কাজটা শেষ করবার জন্যে, তাকেই **বরাত দিলাম**। **কান দেওয়া**—(শোনা) পরনিন্দায় **কান দিতে** নেই। **হাত দেওয়া**—(শুরু করা) সময় বেশি নেই, এবার নিজেদের কাজে **হাত দাও**। **শান দেওয়া**—(ধারাল করা) সে তখন বঁটিতে **শান দিচ্ছিল**। **ছুটি দেওয়া**—(মঞ্জুর করা) দেড়মাসের জায়গায় বড়সাহেব মাত্র একমাসের **ছুটি দিলেন**। **ডাকে দেওয়া**—(পাঠানো) চিঠিটা **ডাকে দাও**। **কথা দেওয়া**—(অঙ্গীকার করা) **কথা দিলে** তা রাখতে হয়।

রাখা : (স্থাপন করা অর্থে) ভালো ক'রে **রাখ,** প'ড়ে যায় না যেন। **কথা রাখা**—(প্রতিশ্রুতি পালন করা) ভদ্রলোক তাঁর **কথা রেখেছেন,** চাকরিটা আমি পেয়েছি। **নাম রাখা**—(সম্মান রক্ষা করা) পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে সে নিজের **নাম রেখেছে**। **মন রাখা**—(তুষ্ট করিয়া চলা) দিনরাত সকলের **মন রেখে** চলা কি এতই সহজ? **পায়ে রাখা**—(আশ্রয় দেওয়া) আপনি **পায়ে না রাখলে** কে রাখবে হুজুর? **হাতে রাখা**—(বশে রাখা অর্থে) তাকে যখন **হাতে রেখেছি**

তখন আমার ভয় কি! **চোখ রাখা**—(নজর দেওয়া) দরজাটা খোলা আছে, খাবার-দাবারের ওপর একটু **চোখ রেখ**।

পড়া : (পাঠ করা) তিনি এখন **বই পড়ছেন**, গোলমাল ক'রো না। **বৃষ্টি পড়া**—(বৃষ্টি হওয়া) **বৃষ্টি পড়ছে,** তাড়াতাড়ি চ'লে এসো। **রক্ত পড়া**—(রক্ত বাহির হওয়া) গিয়ে দেখি, তার পা কেটে **রক্ত পড়ছে** খুব। **গরম পড়া**—(গরম শুরু হওয়া) ভাদ্র মাসে অত্যন্ত **গরম পড়ে,** যাকে বলে তালপাকা গরম। **বেলা পড়া**—(বৈকাল হইয়া আসা) '**বেলা** যে **প'ড়ে** এলো, জল্‌কে চল।' —রবীন্দ্রনাথ। **বাজার পড়া**—(দ্রব্যাদির মূল্য কমা অর্থে) **বাজার প'ড়ে** এসেছে, আর চিন্তা নেই! **পেটে পড়া**—(খাওয়া) **পেটে** কিছু **পড়েছে,** না উপবাসেই আছ এখনও পর্যন্ত? **হাত পড়া**—(হাতের স্পর্শ লাগা) তাঁর **হাত পড়লেই** নির্বিঘ্নে সব হ'য়ে যাবে। **রাগ পড়া** — ক্রোধের অবসান হওয়া অর্থে) বাবুর আমার এতক্ষণ বাদে **রাগ পড়ল,** ধন্যি যা হোক!

[এইভাবেই—আসা, যাওয়া, থাকা, বসা, হওয়া, মারা, ভাঙা প্রভৃতি ক্রিয়াও বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। যেমন—**আসা ঃ** বিপদ আসা, হাতে আসা, কাজে আসা, জ্বর আসা, পেটে আসা। **যাওয়া ঃ** মাস যাওয়া, জাত যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া, চুলোয় যাওয়া, শ্রীঘরে যাওয়া, বলিহারি যাওয়া। **থাকা :** মনে থাকা, কাছে থাকা, কথায় থাকা, হাতে থাকা, মান থাকা, মুখ থাকা। **বসা :** সভা বসা, মন বসা, দৈ বসা, চোখ বসা, একটু বসা। **হওয়া ঃ** টাকা হওয়া, রোদ হওয়া, সময় হওয়া, ছেলে হওয়া, ফসল হওয়া, আগুন হওয়া, কাজ হওয়া। **মারা ঃ** ভাত মারা, লাঠি মারা, পকেট মারা, পেরেক মারা, আড্ডা মারা, চাল মারা, টিকেট মারা, মাঠে মারা যাওয়া।]

৪। *বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের প্রয়োগ*

অকূল : (বি) আমাকে **অকূলে** ভাসিয়ে তুমি কোথায় চ'লে গেলে?
(বিণ) **অকূল** সাগরজলে তাহারা কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না।

আর : (বি) যাহা ছিল সবই গিয়াছে, কিছু **আর** অবশিষ্ট নাই।
(বিণ) **আর** বই নেই, যা তোমার পড়া নয়।
(ক্রি-বিণ) যে গেছে, সে কি **আর** ফিরে আসবে?
(অব্যয়) তোমার এখানেই খাব, সে-কথা **আর** বলতে!

ইতর : (বি) **ইতরের** সঙ্গে কথা বলতে গেছ কেন ?
(বিণ) তার মতো **ইতর** লোক আর একটিও দেখিনি।

উত্তর : (বি) প্রশ্নের **উত্তর** বুঝিয়া শুনিয়া লিখিবে।
(বিণ) তিনি সোজা **উত্তর** দিকে চ'লে গেলেন।

এ : (সর্বনাম) এ কে, আগে তো কখনও দেখিনি ?
(বিণ) এ-সময় তোমার কথা শুনতে পারব না।

ঐ : (বিণ) ঐ বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দাও।
(অব্যয়) ঐ যে, কে যেন আসছে।

কত : (বিণ) এ ঘরে **কত** লোক বসতে পারে ?
(ক্রি-বিণ) পাড়ার ছেলেরা চোরটিকে **কত** মারলে।

খোলা : (বি) **খোলা**-র ঘরেই তাদের বাস।
(বিণ) আমার বাপু **খোলা** মন ;খোলাখুলিই সব বলব।

গুরু : (বি) **গুরু**-র আদেশে শিষ্য বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গেল।
(বিণ) লঘু পাপে **গুরু** দণ্ড দেওয়া কি উচিত ?
(ক্রি-বিণ) মেঘ ডাকে **গুরু গুরু**, বুক কাঁপে দুরু দুরু।

ঘোর : (বি) তোমার দেখছি ঘুমের **ঘোর** এখনও কাটেনি।
(বিণ) **ঘোর** অন্ধকারে সে একাই বেরিয়ে পড়লো।
(ক্রি) কোথায় যে দিনরাত **ঘোর** বুঝি না বাপু।

চালাক : (বি) ঢের ঢের **চালাক** দেখেছি, আমার কাছে কোনো **চালাকি** চলবে না!
(বিণ) সমর বেশ **চালাক** ছেলে।

ছাড়া : (বিণ) **ছাড়া** কাপড়গুলো ধুয়ে আন।
(অব্যয়) তুমি **ছাড়া** আমার আর কে আছে বলো ?
(ক্রি) পথ **ছাড়**, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না।

জোর : (বি) তোমার টাকার **জোর** না-থাক, কথার **জোর** আছে।
(বিণ) শীতলবাবু একসঙ্গে হাজার টাকা দিয়ে ফেললেন, আমার **জোর** বরাত দেখছি।
(ক্রি-বিণ) ছেলেরা **জোর** দৌড়াইল।

ঝাল : (বি) বকাবকি ক'রে খুব যা-হোক মনের **ঝাল** মেটালে!
(বিণ) কিহে, তোমার ঝুড়িতে **ঝাল** লঙ্কা আছে ?

টক : (বি) কাঁচা আমের **টক** খেতে বেশ লাগে।
(বিণ) টাকা খরচ ক'রে শেষকালে যত **টক** আম নিয়ে এলে!

ঠিক : (বি) সব সময় কি আর মাথার **ঠিক** থাকে?
(বিণ) সে কোথায় থাকে **ঠিক** খরবটা একবার নিয়ে এসো তো।
(ক্রি-বিণ) আজ আর পেরে উঠব না, কাল **ঠিক** যাব।
(অব্যয়) **ঠিক,** তোমার কথাই শোনা উচিত ছিল।

ডাক : (বি) বন্ধুর **ডাকে** তখনই গিয়ে হাজির হলাম।
(বিণ) তাকে চিনি তার **ডাক**-নামেই।
(ক্রি) ঘুমোলেই তার নাক **ডাকে** বিশ্রী স্বরে।

ঢোলে : (ক্রি) সন্ধ্যা হ'তে-না-হতেই সে ঘুমে **ঢোলে**।
(বিণ) সে একটা **ঢোলা**-হাতা পাঞ্জাবি প'রে এলো।

তোলা : (ক্রি) যাও, পূজোর জন্যে বাগান থেকে ফুল **তুলে আন**।
(বি) পাঁচ **তোলা** জদার দাম কত?
(বিণ) **তোলা** কাপড়গুলো একবার নামিয়ে আন তো?

থাক : (ক্রি) কোথায় **থাক** হে তোমরা?
(বি) বইগুলি **থাক** দিয়ে সাজিয়ে রাখ।

দরিদ্র : (বি) আমাদের দেশে **দরিদ্রের** সংখ্যাই অধিক।
(বিণ) **দরিদ্র** বালকটিকে অর্থ দিয়া না-হোক,পুস্তক দিয়া সাহায্য কর।

ধরা : (ক্রি) ছেলেটিকে একটু **ধরো,** কেঁদে সারা হ'লো যে!
(বিণ) **ধরা**-গলায় সে তার কাহিনী বলতে লাগলো।

নাই : (বি) তোমার মুখে দিনরাত কেবল **'নাই নাই'** শুনছি।
(বিণ) **নাই**-মামার চেয়ে কানা মামাও যে ভালো।
(ক্রি) এখন আর কিছু করবার উপায় **নাই**।
(অব্যয়) সে এখনও অফিসে যায় **নাই**।

পশ্চাৎ : (বি) **পশ্চাতে** একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন।
(বিণ) **পশ্চাৎ** দিক হইতে কে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণক রিয়া বসিল।
(ক্রি-বিণ) আমরা তাঁহার **পশ্চাৎ পশ্চাৎ** চলিলাম।
(অব্যয়) এক্ষণে সম্ভব নয়, **পশ্চাৎ** বিবেচনা করিয়া দেখিব।

ফলারে : (বি) নেমন্তন্ন বাড়িতে **ফলারের** অভাব হয় না।
(বিণ) **ফলারে** বামুন কিনা জানতে চাও?

বড় : (বিণ) তিনি শুধু **বড়** বাড়িই করেননি, দু'খানা মোটরগাড়িও কিনেছেন।
(বি) **বড়** আর ছোটর মধ্যে সব সময় বন্ধুত্ব হয় না।
(বিণ-বিণ) সে **বড়** ভালো ছেলে, তাতে কোনো ভুল নেই।
(ক্রি-বিণ) তোমার মেয়েটা কিন্তু **বড়** কাঁদে।

ভালো : (বিণ) সংসারে **ভালো** মানুষের সংখ্যা যেন ক'মে আসছে।
(অব্যয়) **ভালো**, কোন জবাব দিয়ো না।
(ক্রি-বিণ) ছেলেপুলে নিয়ে তোমরা সবাই **ভালো** আছ তো ?

মিথ্যা : (বি) কখনও **মিথ্যা** বলতে নেই, তাতে নিজেকেই অপরাধী করা হয়।
(বিণ) **মিথ্যা** ভাষণে সে বিশেষ পটু।

যে : (অব্যয়) মা বললেন **যে**, তোমার এখন গিয়ে কাজ নেই।
(বিণ) **যে**-গল্প তোমাকে বল্‌লাম তা নেহাত গল্প নয়, সত্যি।
(সর্ব) **যে** বলতে পারবে তাকেই এই আপেলটা দেব।

রক্ত : (বিণ) '**রক্ত** জবায় পূজব এবার শ্যামা মায়ের চরণ দু'টি।
(বি) হোঁচট খেতেই তার পা দিয়ে **রক্ত** পড়তে আরম্ভ করল।

লোভী : (বিণ) তোমার মতো **লোভী** ছেলে আর দ্বিতীয় নেই।
(বি) **লোভী**দের কপালে শেষটায় যে কিছু মিলবে না, তা জানতাম।

শোনা : (ক্রি) তিনি কী বলছেন, যাও **শুনে** এসো।
(বিণ) **শোনা**-কথায় অত গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়।

সকল : (বি) বাড়ির **সকলেই** কি এবার মধুপুর যাবেন ?
(বিণ) **সকল** কাজেই আমরা আপনার সাহায্য চাই।
(সর্ব) অনেক বিষয় আছে, **সকল** বলিতে পারি না।

হলুদ : (বি) বাজারে যাচ্ছ যখন, তখন এক-পো **হলুদ** এনো।
(বিণ) তোমার **হলুদ** রঙের জামাটা দেখি।

৫। *বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ*

অকালকুষ্মাণ্ড (অপদার্থ)—ছেলেটি একটি অকালকুষ্মাণ্ড, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, কোনো কাজেই আসে না।

অন্ধের যষ্ঠি বা **নড়ি** (একমাত্র অবলম্বন)—ঐ আমার একমাত্র ছেলে, বিধবা মায়ের অন্ধের যষ্ঠি।

আমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু)—কি হে, একেবারে যে অমাবস্যার চাঁদ হ'য়ে উঠ্‌লে, তিনমাসের মধ্যে একবারও দেখা নেই !

অগস্ত্য যাত্রা (না ফিরিবার জন্য যে যাওয়া)—সে যুগে কত তীর্থযাত্রাই না অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত হয়েছে !

অর্ধচন্দ্র প্রদান (গলাধাক্কা দেওয়া)—শিক্ষকমহাশয় অবাধ্য ছাত্রটিকে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

অমৃতে অরুচি (অতি তৃপ্তির লক্ষণ)—তুমি নাকি চা খাবে না, সে কি হে অমৃতে অরুচি কেন ?

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)—তাঁর মতো কৃপণের কাছে কিছু চাইতে গেলে অরণ্যে রোদন-ই সার হবে, কিছুই মিলবে না।

অষ্টরম্ভা (কিছুই না)—দিনরাত এটা চাই, সেটা চাই—কিন্তু কাজের বেলায় তো দেখছি অষ্টরম্ভা !

অহিনকুল-সম্বন্ধ (চির-শত্রুতা)—তোমাদের মধ্যে তো দেখছি অহিনকুল-সম্বন্ধ,—কখনও কি একবার মিল হয় না ?

আক্কেল গুড়ুম (স্তম্ভিত)—নরেনের মতো বিশ্বাসী ছেলে ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে পালিয়েছে, সে-কথা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম !

আক্কেল-সেলামি (নির্বুদ্ধিতার খেসারত)—তোমার পরামর্শ শুনলে আমার আর আক্কেল সেলামি দিতে হ'তো না ; এদিকে টাকার টাকাও গেল, ঠিকসময়ে জিনিসগুলোও পেলাম না।

আদায়-কাঁচকলায় (ভীষণ শত্রুতা)—কাশ্মীর নিয়ে একসময় ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল আদায়-কাঁচকলায়।

আমড়াকাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ)—লোকটার না-আছে বিদ্যে-বুদ্ধি, না-আছে কাজের কোনো ক্ষমতা, অমন আমড়াকাঠের ঢেঁকি নিয়ে কী করব !

আমড়াগাছি (তোষামোদে আত্মবিস্মৃত করা)—বড়সাহেবকে আমড়াগাছি ক'রে খুব যা-হোক বাগিয়ে নিলে।

আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ও আব্‌দারে ছেলে)—ছেলেবেলা থেকে তুমি যেভাবে নিজের ছেলেকে আলালের ঘরের দুলাল তৈরি করেছ তাতে ফল যে ভালো হবে না, সে তো জানা কথা।

আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী)—মাছগুলো হঠাৎ পাখনা মেলে গাছের ডালে গিয়ে বস্‌লো, অমন আষাঢ়ে গল্প আমার কাছে বলতে এসো না।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ ভাগ্য-পরিবর্তন)—সামান্য একজন কেরানীর পদ থেকে একেবারে অফিসার, যাকে বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ—বিজয়বাবুর সেই দশা !

আকাশ থেকে পড়া (অজ্ঞতার ভান করিয়া চমকাইয়া উঠা)—আজ যে তোমার টাকা শোধ করবার কথা, সেটা মনে করিয়ে দিতেই আকাশ থেকে পড়লে যে !

আকাশ-পাতাল ভাবা (নানারকমের চিন্তা করা)—দুর্দিনের বাজারে চাকরিটা গেল, আকাশ-পাতাল ভেবে কিছুই যে ঠিক করতে পারছি না।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ বস্তু লাভ করা)—ছেলের দু'শো টাকার মাইনের একটা চাকরি হয়েছে, শুনে মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

আপন কোলে ঝোল টানা (স্বার্থপর হওয়া)—বাবা মারা যেতে-না-যেতেই তোমরা যদি অমন ক'রে আপন কোলে ঝোল টানতে শুরু কর তাহ'লে তার চাইতে আর দুঃখের কী থাকতে পারে ?

আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা)—অরুণের মত যার আঠার মাসে বছর, তাকে দিয়ে কোন্ কাজ করাবে ?

আদাজল খেয়ে লাগা (দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া)—সামনে তোমার বার্ষিক পরীক্ষা, এবারে আদাজল খেয়ে লেগে যাও, তাহ'লে হয়তো পাস করতে পারবে।

আঁতে ঘা (প্রাণে আঘাত)—সব সময় আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলার অভ্যাসটা কি ছাড়বে না ?

আদার ব্যাপারী (সামান্য কারবারী)—টেলিভিশন-সেট কিনতে কত লাগে সে-কথা সামান্য কেরানী বলবে কী ক'রে, আদার ব্যাপারী কি আর জাহাজের খবর রাখে ?

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)—বার বছরের ছেলে হ'লে কি হবে, একেবারে ইঁচড়ে পাকা, এই বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছে।

ইতর-বিশেষ (ভেদাভেদ)—সেই যখন দিতে হচ্ছে, আর ইতর-বিশেষ না ক'রে সবাইকে সমান দাও।

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য)—যেমন ইঁদুর-কপালে মেয়ে, তেমন অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলে—ভদ্রলোকের তাই দুঃখের সীমা নেই।

উচ্ছের ঝাড় (খারাপ বংশ)—ও ছেলে আর ভালো হবে কী ক'রে, বাপ একটা দাগী চোর, আর ঠাকুরদা হ'লো ডাকাত—একেবারে উচ্ছের ঝাড় !

উত্তম-মধ্যম (প্রহার)—ট্রামের মধ্যে পকেটমার ধরা পড়তেই সকলে তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে নামিয়ে দিল।

উপর-চাল (অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ ক'রে নিপুণতার ভান)—ও-রকম উপর-চাল দিতে সবাই পারে, কাজটা ক'রে দেখাও তো, তবেই বুঝব তোমার বাহাদুরি !

উভয়-সঙ্কট (দুইদিকে বিপদ)—সেক্রেটারির কথা শুনলে প্রেসিডেণ্ট চটবেন, আবার প্রেসিডেণ্টের কথা রাখতে গেলে সেক্রেটারি চটবেন—আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব)—তিনকুলে তোমার কেউ নেই জানতাম, হঠাৎ ঐ মামাটি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো ?

উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কষ্টস্বীকার)—পেট ভরা সত্ত্বেও, সে যেমন ক'রে দু'ডজন সন্দেশ খেলে, তাতে মনে হ'লো যেন উপরোধে ঢেঁকি গিলছে !

উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য নিক্ষেপ করা)—তোমার মতো বেরসিককে 'জয়জয়ন্তী'-রাগের গান শোনানো আর উলুবনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা !

উনপাজুরে (দুর্বল বা মন্দভাগা)—যেমন উনপাজুরে তার চেহারা, তেমনি তার স্বভাব !

একচোখো (পক্ষপাতদুষ্ট)—তুমি যে এমন একচোখো হবে তা ভাবিনি, লোকটার দোষগুলিই শুধু দেখলে, তার গুণগুলি আর নজরে পড়লো না !

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (একই দশা প্রাপ্তি)—রাম, শ্যাম, যদু, মধু সবাই জরিমানা দিয়ে যেন এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে এলো !

একাদশে বৃহস্পতি (অত্যন্ত সুসময়)—গৌরবাবুর এখন যেন একাদশে বৃহস্পতি, যে-কাজেই হাত দিচ্ছেন তাতেই প্রচুর লাভ করছেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা (একই প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্য সাধন)—সাধনবাবু নবীনবাবুর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে একঢিলে দুই পাখি মারলেন ; একদিকে এমন প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে যেমন তাঁর আত্মীয়তা হ'লো, অন্যদিকে তেমনি মেয়েটার একটা খুঁত থাকা সত্ত্বেও তাকে পার করতে পেরে দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলেন।

এক হাত নেওয়া (সুযোগ বুঝিয়া জব্দ করা)—বাগে পেলে সে কি আর এক হাত নেবে না ভেবেছ ?

এক-ঘরের গিন্নি (স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব)—এতদিন বিদেশে একা ঘরের গিন্নি হয়ে ছিলে, এবারে দেশে ফিরে যখন একান্নবর্তী সংসারের বিরাট দায়িত্ব মাথায় তুলে নেবে, তখনই বুঝব তোমার কত হিম্মত !

ওৎ পাতা (সাগ্রহে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা)—ইঁদুর ধরবার লোভে বেরালটা কেমন ওৎ পেতে আছে দেখ !

ওজন বুঝে চলা (অবস্থানুযায়ী আচরণ)—এখন থেকেই নিজের ওজন বুঝে চলতে শেখ, নইলে পরে অনুতাপ করতে হবে।

ওষুধ করা (তুক করা)—কেউ তাকে নিশ্চয়ই ওষুধ করেছে, নইলে স্ফূর্তিবাজ মানুষটা এমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে ?

ওষুধ ধরা (ঈপ্সিত ফললাভ)—কিছু টাকা দেবে কবুল কর, তাহ'লেই দেখবে ওষুধ ধরবে, লোকটা ঠিক কাজ সেরে দিয়ে যাবে।

ওষুধ পড়া (যথাযোগ্য প্রভাবে পড়া)—মার লাগাতেই মনে হ'লো ওষুধ পড়েছে, এবারে দেখ লোকটা কেমন আসল কথা প্রকাশ না ক'রে পারে।

ক-অক্ষর গো-মাংস (বর্ণপরিচয় জ্ঞানহীন)—তোমার বাবা অতবড় বিদ্বান, আর তুমি যে এমন ক-অক্ষর গো-মাংস হবে তা কে ভেবেছে !

কংস-মামা (নির্দয় আত্মীয়)—কংস-মামার পাল্লায় প'ড়ে ভাগ্নে বেচারীর যা দুরবস্থা, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত।

কই-মাছের প্রাণ (সহজে যাহা মরে না)—আমাদের দেশের কৃষকদের যেন কই-মাছের প্রাণ, শত দুরবস্থার মধ্যেও তারা বেঁচে থাকে।

কড়ায়-গণ্ডায় (পুরাপুরি)—এই নাও বাপু, তোমার কাছ থেকে যে-টাকা ধার নিয়েছিলাম কড়ায়-গণ্ডায় আজ তো শোধ ক'রে দিয়ে গেলাম।

কত ধানে কত চাল (অভিজ্ঞতা)—দু'হাতে কেবল খরচ করেই চলেছ, কত ধানে কত চাল হয় সে-হিসেব তো আর রাখ না !

কথায় কথা (অসার উক্তি)—সত্যিই কি আর তোমাকে খাটাব, নেহাত কথার কথা বললাম, কিছু মনে ক'রো না।

কল্কে পাওয়া (অধিকার বা মর্যাদা লাভ)—সেদিনের গাইয়ে তুমি, এরই মধ্যে যে ওস্তাদ গাইয়েদের আসরে কল্কে পাবে অতটা ভাবিনি।

কলকাঠি নাড়া (কোনো ব্যাপার গোপনে পরিচালনা করা)—তোমার ওপর-ওয়ালাই যখন কলকাঠি নাড়ছেন, তখন তাঁকেই একবার ব'লে দেখ, নইলে হয়তো ফ্যাসাদে প'ড়ে যাবে !

কলুর বলদ (পরাধীনভাবে যে অবিশ্রান্ত খাটে)—চাকরিতে কোনো উন্নতিই হ'লো না, দশটা-পাঁচটা শুধু কলুর বলদের মতো খেটেই মরলাম !

কলির সন্ধ্যা (কিছুদূর অগ্রসর হওয়া)—সবে তো কলির সন্ধ্যা, এখনও বিশ মাইল হাঁটতে হবে, সে-কথা ভুলে যেও না।

কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা)—যুদ্ধের বাজারে সে কাঁচা পয়সা লুটেছে খুবই, কিন্তু বাবুগিরি ক'রে সবই প্রায় উড়িয়ে দিয়েছে

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (এক শত্রুর সাহায্যে অপর শত্রু বিনাশ)—আসামী পক্ষের একজনকে সরকারী সাক্ষীরূপে পাওয়ায় ডাকাতির ষড়যন্ত্রটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হ'য়ে পড়লো, পুলিস কর্তৃপক্ষ এইভাবেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললেন।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভবপর ব্যাপার)—সে একটা আস্ত পাগল, নইলে কি আর কাঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে চায় ?

কাঁচা বাঁশে ঘুণ (অল্প বয়সে খারাপ)—ছেলেটা যেভাবে বখাটেদের আড্ডায় মিশতে শুরু করেছে তাতে আশঙ্কা হয় কাঁচা বাঁশে না শেষটায় ঘুণ ধ'রে যায়।

কান-পাতলা (অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণ)—আনন্দ বড় কানপাতলা লোক, নইলে কি আর সকলের কথাই বিশ্বাস করে !

কান-ভারী করা (বিরূপ করিয়া তোলা)—আমার মনে হয়, মনোমোহনবাবুর নামে কেউ কিছু ব'লে বড়সাহেবের কান ভারী করেছে, তাই তিনি আজকাল ওঁর ওপর এত চটা।

কাঠের পুতুল (নিষ্ক্রিয়)—ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে শুনে অমন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তোমার টাকা তো আর ও ব্যাঙ্কে ছিল না ?

কাষ্ঠহাসি (কপট হাসি)—মানুষের কাষ্ঠহাসি দেখে তার মনের আসল ভাব বোঝা বড়ই শক্ত !

কুনোব্যাঙ (কূপমণ্ডুক, যাহার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ)—যারা জীর্ণ সমাজ-গণ্ডীর মধ্যে কেবল কুনোব্যাঙের মতো বাঁচতে চায়, কোনো উন্নতিই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কুলকাঠের আঙার (তীব্র বেদনাদায়ক)—সে যে এমন ক'রে বিশ্বাসভঙ্গ করবে তা ভাবতেই পারি না, সেই বেদনাই আজ কুলকাঠের আঙারের মতো বুকে বাজছে।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা (চিরনিদ্রাভিভূত জড়ের মতো)—বাঙালী আজও বহু কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন, কবে যে তাদের এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙবে কে জানে !

কেষ্ট-বিষ্টু (গণ্যমান্য)—বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে তুমি আজ একজন কেষ্টবিষ্টু, গরিব বন্ধুটির সঙ্গে কি আর ছেলেবেলাকার মতো মিশতে পারবে ?

কেঁচে গণ্ডুষ (পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ)—যা শিখেছিলে সবই যখন ভুলে ব'সে আছ, তখন আবার কেঁচে গণ্ডুষ কর।

কুরুক্ষেত্র কাণ্ড (মারামারি বা অ-গোছাল কোনো ব্যাপার)—কতক্ষণ আর ঘরে ছিলাম না ব'লো, এরই মধ্যে এসে দেখি দু'ভাই-বোনে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছে !

খয়ের খাঁ (খোসামুদে বা স্তাবক)—তোমরা সব জমিদারের খয়ের খাঁ, তোমরা তো তাঁর কোনো দোষই দেখতে পাবে না !

খাঁদা নাকে তিলক (অশোভন সাজ)—গায়ের রঙ তো কুচ্‌কুচে কালো, তুমি পরবে লাল রঙের জামা, খাঁদা নাকে তিলক পরতে লজ্জা করবে না তোমার ?

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া (জোর করিয়া বড হওয়া)—আমাদের অবস্থা তো এই, তাতে কি আর খুঁড়িয়ে বড় হওয়া চলে ?

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা (অপরের জিনিস দিয়াই তাহার তুষ্টিসাধন)—আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী, তাঁর কবিতা আবৃত্তি ক'রে যাঁরা তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন,—তাঁরা তো গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই করলেন।

গড্ডলিকা-প্রবাহ (অন্ধভাবে অনুসরণ)—আমাদের এখন নতুন কিছু করা উচিত, গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কখনও উন্নতি সম্ভব নয়।

গভীর জলের মাছ (যাহার স্বরূপ বোঝা দুষ্কর)—অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁর কাছ থেকে আসল কথাটা আদায় করা গেল না,—তিনি এক গভীর জলের মাছ !

গণেশ উল্টানো (ব্যর্থতায় পর্যবসিত)—এই তো সেদিন সে দোকান খুল্‌লো, এরই মধ্যে তার গণেশ উল্টে গেল !

গলায় পড়া (ভারবোধ হওয়া)—সে কি তোমার এতই গলায় পড়েছে যে, এরই মধ্যে তাকে বিদেয় করতে চাও ?

গায়ে পড়া (অযাচিতভাবে)—সব ব্যাপার যখন জানেন না, তখন আর গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে আসবেন না।

গা করা (আগ্রহ-প্রকাশ করা)—তাড়াতাড়ি কাজগুলি সেরে ফেলতে বলছি, অথচ গা করছ না, ব্যাপার কী বলতো ?

গা-ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)—অতগুলো টাকা নিয়ে গোপাল যে এমন ক'রে গা-ঢাকা দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

গায়ে গায়ে শোধ (দেনাপাওনার শোধবোধ)—আমি তোমার কাছ থেকে বইয়ের দরুন যে টাকা পাব, আর তুমি আমার কাছ থেকে ছবির জন্যে যে-টাকা পাবে তা প্রায় একই—অতএব, গায়ে গায়ে শোধ।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)—আজ নন্দ আসবে ভাবছ, কিন্তু সে গুড়ে বালি, নন্দ গতকালই রাঁচী চ'লে গেছে।

গুরুমারা বিদ্যা (যাহার নিকট হইতে কৌশল শেখা, তাহাকে সেই কৌশলেই পরাস্ত করা)—আমার কাছ থেকে এই তো সেদিন তুমি ম্যাজিক শিখলে, অথচ আজ আমাকেই ম্যাজিকে হারিয়ে দিচ্ছ—ভালো গুরুমারা বিদ্যা শিখেছ যা-হোক !

গোঁফ খেজুরে (অতিশয় অলস)—হাতের কাছেই জানালা, অথচ সেটা বন্ধ ক'রে দিতে আমাকে ডাকছ, তোমার মত এমন গোঁফখেজুরে লোক আর দেখিনি।

গোকুলের ষাঁড় (কাজকর্মহীন ভবঘুরে)—মাথার উপরে যার কেউ নেই, সে তো অমন গোকুলের ষাঁড়ের মতই ঘুরে বেড়াবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ?

গোবর গণেশ (নির্বোধ অকর্মণ্য)—তারাপদবাবুর ছেলেটি একটি গোবর-গণেশ, না-আছে কোনো বুদ্ধি, না আছে কাজ করবার কোনো ক্ষমতা !

গোবরে পদ্মফুল (নীচকুলে মহৎ-ব্যক্তি বা অধমের মধ্যে উত্তম)—অমন কৃপণের বংশে এমন দাতা ছেলে জন্মালো কী ক'রে, এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল !

গোড়ায় গলদ (প্রথমেই ভুল)—সবার মতামত না নিয়ে যখন অমন সভাপতি ঠিক করেছ তখন তো কথা উঠবেই, এ-যে গোড়ায় গলদ !

গোলে হরিবোল (গোলমালে চণ্ডীপাঠ, বিশৃঙ্খল কাজ)—প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গোলে হরিবোল ক'রো না, ভালো ক'রে বুঝে শুনে উত্তর দিও।

গৌরচন্দ্রিকা (ভনিতা)—কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না ক'রেই তিনি নিজের বক্তব্য বলে ফেললেন।

ঘরভেদী বিভীষণ (গৃহবিবাদী)—সম্পর্কে মামা হ'লে কী হবে, উনি একটি ঘরভেদী বিভীষণ, ওর জন্যেই তো ভাইয়েরা সব আলাদা হ'য়ে গেল।

ঘুঘু চরানো (সর্বনাশ করা)—তুমি গেছ জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করতে, তিনি যে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়তে পারেন তা জানো ?

ঘোড়ার ঘাস কাটা (বাজে কাজ করা বা অলসভাবে দিন কাটানো)—এখানে এসেছ পড়াশোনা করতে, ঘোড়ার ঘাস কাটতে আসনি সেটা ভুলে যেয়ো না।

ঘোড়া রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ে সাধ)—রোজ ট্যাক্সি ক'রে অফিস যাওয়ার ঐ ঘোড়ারোগটা ছাড়, তোমার মত লোকের পক্ষে ওটা শোভা পায় না।

ঘোল খাওয়ান (নাকাল করা)—বলিহারি ছেলে বাবা, একটা ছবি দেখাতেই আমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়লে !

চক্ষুদান করা (চুরি করা)—দেখো বাপু, ঘড়িটা এখানে রেখে যাচ্ছি, কেউ যেন চক্ষুদান না করে !

চর্বিত চর্বণ (আলোচিত বিষয়ের অনাবশ্যক পুনরালোচনা)—এই প্রবন্ধে তিনি নতুন কী বলেছেন, এ তো তাঁর আগেকার প্রবন্ধেরই চর্বিত চর্বণ!

চাঁদের হাট (গুণীজনের সমাবেশ)—বাড়িতে আপনার তো চাঁদের হাট,—এক ভাই সরকারী অফিসার, আর এক ভাই বড ব্যবসায়ী, ওদিকে ছেলেরা তো সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

চিনির বলদ (ভারবাহী মাত্র, ফলভোগী নয়)—ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হ'য়ে জীবনভর শুধু চিনির বলদের মতো লাখ লাখ টাকা গুনেই গেলাম, অথচ নিজে কোনদিন একসঙ্গে পাঁচশো টাকা জমাতে পারলাম না।

চোখের বালি (চক্ষুশূল)—আমি যেন তোমার চোখের বালি, আমার কোনো কাজেই তোমার মন ওঠে না।

চোখের চামড়া (চোখের পরদা, লজ্জা)—সেদিন তার কাছে অপমানিত হ'লে, অথচ তারই কাছে গেলে টাকা ধার করতে, তোমার কি চোখের চামডা ব'লে কিছুই নেই?

চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া)—বাবার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়, তিনি সব খবরই রাখেন।

চোখে পড়া (দৃষ্টিগোচর হওয়া)—যে-পথে রোজ হেঁটে যাও, সেই পথেই যে বাড়িটা, তা কি তোমার একদিনও চোখে পড়েনি?

চোখ টাটানো (হিংসে করা)—বন্ধু একটা মোটরগাড়ি কিনেছে ব'লে তোমার অত চোখ টাটাচ্ছে কেন?

ছ'কড়া ন'কড়া (সস্তা দর)—জমিটা শেষকালে ছ'কড়া ন'কড়ায় বেচে ফেললে, ক'দিন আর সবুর সইলো না!

ছাই-চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন তেজসম্পন্ন)—সে যে এমন জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করতে পারে তা আমার জানা ছিল না, লোকটি যেন ছাই-চাপা আগুন!

ছিনে জোঁক (সহজে যে ছাড়িতে চায় না)—এমন ছিনে জোঁকের মত সে আমার সঙ্গে লেগে রইল যে, শেষ পর্যন্ত তাকে টাকা ধার দিতেই হ'লো।

ছুঁচোর কীর্তন (অসার কলরব)—আসল প্রস্তাব রইলো প'ড়ে, সবাই শুরু করলে ছুঁচোর কীর্তন (কেত্তন), এমন করলে কি সভার কাজ করা চলে!

জাগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্খল বা জটপাকানো)—কাগজপত্র সব জগাখিচুড়ি ক'রে রাখলে আসল কাগজ আর পাবে কেমন ক'রে?

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)—বাইরে ভালোমানুষ সেজে থাকলে কী হবে, পেটে পেটে ওর জিলিপির প্যাঁচ, কখন কাকে কোন্ বিপদে ফেলে কে জানে!

ঝাঁকের কই (একদলের লোক)—চুরি করতেই যে অভ্যস্ত, তাকে উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিলে, এটা কিন্তু ভাই সুবুদ্ধির কাজ করনি, ঝাঁকের কই আবার ঝাঁকেই ফিরে যাবে।

ঝোড়ো কাক (বিশৃঙ্খল চেহারা)—মাথার চুল উস্কোখুস্কো, গায়ের জামা ময়লা —তোমার এমন ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা হ'লো কী ক'রে !

টইটম্বুর (কানায় কানায় পূর্ণ)—বর্ষার জলে খাল-বিল সবই এখন টইটম্বুর।

টনক নড়া (চৈতন্যোদয়)—নায়েব-গোমস্তারা তলে তলে জমিদারি লাটে ওঠাবার চেষ্টা করছে, অথচ সেদিকে জমিদারবাবুর এখনও টনক নড়েনি।

টাকার কুমির (বিশেষ অর্থশালী)—ধনীরাম ঝুনঝুনওয়ালা পোস্তায় ব'সে আলুর ব্যবসা করলে কী হবে, লোকটা একটা টাকার কুমির, কলকাতায় ওর দশখানা বাড়ি।

টাকার গরম (অর্থের অশোভন অহঙ্কার)—টাকার গরমে তুমি যে আজ কাউকেই মানছ না, এটা তোমার ভালো হচ্ছে কি ?

ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য)—দিনরাত যদি অমন ঠুঁটো জগন্নাথের মতো ব'সে থাক তাহ'লে সংসার চলবে কেমন ক'রে ?

ঠোঁটকাটা (অপ্রিয় সত্যভাষী)—তুমি যেমন ঠোঁটকাটা, তাতে ভয় হয় সভায় গিয়ে একটা হৈ-চৈ না বাধিয়ে বসো।

ডানহাতের ব্যাপার (আহার)—ডানহাতের ব্যাপারটা আজ না হয় তোমার বাড়িতে গিয়েই করা যাবে।

ডামাডোলের বাজার (গোলযোগপূর্ণ অবস্থা)—ডামাডোলের বাজারে এতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে যে কোথায় গিয়ে উঠব তাই ভাবছি।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কার্যসিদ্ধি করা)—প্রমোদ নাকি সুদের কারবার করে, তার এই ডুবে ডুবে জল খাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আমরা কেউ আগে টের পাইনি।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বা বিরল)—সে এখন ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠেছে, আজকাল তার দেখা মেলাই ভার !

ঢাক পিটানো (প্রচার করা)—তোমাকেই কেবল কথাটা বললাম, দেখো বাপু তুমি যেন আবার এ-নিয়ে ঢাক পিটিয়ো না।

ঢাকের বাঁয়া (অকেজো)—কানাইয়ের কথা আর ব'লো না, ও তো একটা ঢাকের বাঁয়া, যা করবার সবই তো বলাই করছে।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা)—আমি বাপু স্পষ্ট কথাই বলব, আমার কাছে ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব'লে কিছু নেই।

ঢি-ঢি পড়া (কলঙ্ক রটা)—বুড়ো বয়সে কামদাকিঙ্করবাবু চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছেন শুনে, সারা গ্রামে ঢি-ঢি প'ড়ে গেল।

ঢিমে তেতালা (অতি মৃদুগতি)—তুমি যেমন ঢিমে তেতালায় কাজ করছ তাতে ক'রে সব কাজ শেষ করতে দিন কাবার ক'রে দেবে দেখছি!

তালকানা (কাণ্ডজ্ঞানশূন্য)—পকেটেই কলমটা রয়েছে, অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছ সারা বাড়ি, এমন তালকানা মানুষ তো আর দেখিনি।

তাসের ঘর (ভঙ্গুর)—আমরা যাকে সুখের সংসার বলি, সে তো একটা তাসের ঘর, ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ!

তালপাতার সেপাই (অতিশয় কৃশকায়)—চেহারা তো তালপাতার সেপাইয়ের মতো, তুমি আবার বক্সিং করবে, তবেই হয়েছে!

তামার বিষ (অর্থের বিষময় প্রভাব)—তামার বিষে তোমরা যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছ, তাতে আর যে তোমাদের কাছ থেকে মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে না, এতক্ষণে তা টের পাচ্ছি।

তিলকে তাল করা (অতিরঞ্জনের ফলে তুচ্ছ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া)—মধুবাবু যেরকম তিলকে তাল করতে ওস্তাদ, তাতে ক'রে আর তার কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।

তীর্থের কাক (বিশেষ প্রত্যাশী বা সাগ্রহ প্রতীক্ষাকারী)—বিয়েবাড়িতে ভিয়েন বসেছে, ছেলেমেয়েরা তো সেখানেই ব'সে আছে তীর্থের কাকের মতো।

তুলসীবনের বাঘ (ভণ্ড)—গেরুয়া পরলে কী হবে, লোকটা আসলে তুলসীবনের বাঘ, ওকে বিশ্বাস ক'রো না।

তুঁষের আগুন (কিছু কালের স্থায়ী শোক বা হিংসা)—বুড়ো বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে হরিহরবাবু যেভাবে তুঁষের আগুনে জ্বলছেন তা দেখলে মায়া হয়।

তেলে-বেগুনে জ্বলা (অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া)—অফিস থেকে ফিরে বড়দা যেই শুনলেন ছেলেমেয়েরা তখনও বাড়ি ফেরেনি অমনি তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

থতমত খাওয়া (কী করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া যে নিশ্চল অবস্থা)—সে হঠাৎ অমন অগ্নিশর্মা হ'য়ে আমার সামনে হাজির হ'তে আমি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেলাম।

থই পাওয়া (সীমা পাওয়া)—দিনরাত এত কাজ করছি তবু যেন কাজের থই পাচ্ছি না।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা)—সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার, ছাত্রেরা কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া চেঁচামেচি, হাতাহাতি শুরু করিয়া দিয়াছে।

দহরম-মহরম (ঘনিষ্ঠতা)—বড়সাহেবের সঙ্গে তোমার যখন দহরম-মহরম রয়েছে, তখন ভাইটির জন্যে একটা চাকরি জুটিয়ে দাও-না বাপু!

দাঁও মারা (সুবিধায় কেনা বা লাভ করা)—ছেলের বিয়ে দিয়ে পূর্ণবাবু কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ বাবত পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছেন,—এ-বাজারে বেশ দাঁও মেরেছেন বলতে হবে।

দাঁত ফুটানো (দন্তস্ফুট করা; দুরূহ বিষয় আয়ত্ত করা)—ইংরেজী পরীক্ষার প্রশ্ন যে-রকম কঠিন হয়েছিল, তাতে অনেক ছাত্রই নাকি দাঁত ফোটাতে পারেনি।

দাঁতে কুটো কাটা (অতি বিনয়ের ভাব)—তোমার মতো রগচটা লোক যে শেষটায় দাঁতে কুটো কাটবে এ আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি।

দিনে ডাকাতি (প্রকাশ্যে সর্বনাশ-সাধন)—এতগুলো জোয়ান মরদের চোখের সামনে দিয়ে গুণ্ডারা ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল, এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি ব্যাপার!

দুষ্টা সরস্বতী (দুর্বুদ্ধি)—তার ওপরে দুষ্টা সরস্বতী ভর না করলে, সে কি আর বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে অমন দুর্বিনীতের মতো কথা বলে?

দু-কান কাটা (অতিশয় নির্লজ্জ)—অমন দু-কান কাটা লোক ব'লেই না আজও সে নেশা ক'রে সভায় আসতে সাহস পায়,—সেদিন যে সবার কাছে চরম অপমানিত হ'লো সেটা যেন ওর কাছে কিছুই নয়!

দু'মুখো সাপ (বিপরীতধর্মী খলস্বভাব)—অমলবাবু আমার কাছে আমার বন্ধুদের নিন্দা করেন, আর তাদের কাছে করেন আমার নিন্দা;—এমন লোককে দু'মুখো সাপ না ব'লে আর কী বলব?

দু' নৌকায় পা (দুই কাজ বা মতের মধ্যে অচল অবস্থা)—হয় পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে যাও, নয় তো ভারতে চ'লে এসো চিরদিনের মতো,—আর কতদিন এমন ক'রে দু' নৌকায় পা দিয়ে থাকবে?

দো-টানায় পড়া (উভয়সঙ্কটে পড়া)—বড়দা চান আমি কলেজের চাকরিটা নিই, কিন্তু মেজদার ইচ্ছা তাঁর অফিসে গিয়ে ঢুকি—এই দো-টানায় প'ড়ে কী যে করব ভেবে উঠতে পারছি না।

ধরাকে সরা জ্ঞান (অহঙ্কারের সকল কিছু তুচ্ছ মনে করা)—টাকার মুখ দেখেছ কি, অমনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছ!

ধর্মের ষাঁড় (অকর্মণ্য)—ভাগ্নেটি আমার খাচ্ছে দাচ্ছে আর দিনরাত ধর্মের ষাঁড়ের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওকে নিয়ে আমার এক জ্বালা !

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (বিদ্রূপ অর্থে)—সামান্য একটু মিথ্যা কথা বললেই যখন পার পেয়ে যাও তখন তা বলবে না কেন, একালে অমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হওয়া কোনো কাজের কথা নয় !

ধামা ধরা (খোশামোদ করা)—অত তো ধামা ধরলে, কিন্তু বড়সাহেব কি তোমার জন্যে কিছু করলেন শেষ পর্যন্ত ?

ননীর পুতুল (কোমলদেহ ও শ্রমকাতর)—একেবারে যেন ননীর পুতুল, একটু হেঁটেছ কি অমনি ঘেমেচুমে অস্থির !

নয়-ছয় (বিশৃঙ্খল বা ছড়াছড়ি)—এই ক'দিন মাত্র বাড়িতে ছিলাম না, এরই মধ্যে তোমার জিনিসপত্র সব নয়-ছয় ক'রে রেখেছ !

নাম ডোবান (সম্মান নষ্ট)—এতটুকু বয়স থেকেই চুরি করতে শিখেছ, বাপ-ঠাকুরদার নাম ডুবিয়ে ছাড়বে দেখছি !

নিমরাজি (অর্ধেক সম্মত)—আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করাতে তিনি শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন।

নেই-আকড়া (নাছোড়বান্দা)—বারবার আমার কাছ থেকে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছ, তবু আমার কাছেই আসবে—তোমার মতো এমন নেই-আকড়া লোক তো আর দেখিনি বাপু !

নেকনজরে পড়া (সুদৃষ্টিতে পতিত হওয়া)—বড়কর্তার নেকনজর পড়েছে যখন, তখন আর আপনার ভাবনা নাই, মাইনে বাড়লো ব'লে।

পগার পার (পলায়ন)—তোমরা যখন তার খোঁজ করছ, সে তখন সকলের চোখ এড়িয়ে পগার পার !

পায়াভারী (অহঙ্কার)—অফিসার হ'তে-না-হতেই তার এমন পায়াভারী হবে এতটা ভাবিনি।

পি-পু-ফি-শু (অলস)—এখানে যত পি-পু-ফি-শু'র দল, কাউকে দিয়ে কোনো কাজ হবার জো নেই !

পুকুরচুরি (নিঃশেষে সমস্ত অপহরণ)—একটু র'য়ে সয়ে নাও, একেবারে পুকুরচুরি করো না, ধরা পড়লে ধনে প্রাণে মারা যাবে।

পুঁটিমাছের প্রাণ (ক্ষীণ শক্তি)—বাঙালীদের যে পুঁটিমাছের প্রাণ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বাঙালী সৈন্যই তা সপ্রমাণ করেছে।

পোয়া বারো (পরম সুযোগ)—বড়দা বাড়িতেই নেই, এখন আমাদের পোয়া বারো,—নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে পারব কয়েকটা দিন।

ফাঁসির খাওয়া (জীবনের শেষ-খাওয়া)—লোকটা কেমন গোগ্রাসে গিলছে দেখ, যেন ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছে !

ফুঁকে দেওয়া (নিঃশেষে খরচ করা)—অমন খরচে মানুষ আর দেখিনি, একমাসেই একহাজার টাকা ফুঁকে দিলে।

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা (কোমল দেহে আঘাত সহ্য করতে অনভ্যস্ত)—গায়ে হাত দিতে-না-দিতেই সে কেঁদে উঠ্‌লো, এরকম ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া ছেলে তো আর দেখিনি।

ফেউ লাগা (পিছনে শত্রুতা)—চাকরি তোমার থাকলে হয়, পেছনে যখন অমন ফেউ লেগেছে !

ফোঁড়ন কাটা (উত্তেজনামূলক মন্তব্য করা)—একেই তো নানা জ্বালায় দিবারাত্র জ্বলছি, তার মধ্যে তুমি আর ফোঁড়ন কেটো না বাপু !

ফোপোল-দালালি (অযাচিতভাবে মধ্যস্থতা)—আমরা দু'বন্ধুতে ঝগড়া যদি করেই থাকি, তাতে তোমার কী, তুমি অমন ফোপোল-দালালি করতে এলে কেন ?

বকধার্মিক (বাহিরে তপস্বী অথচ অন্তরে খল)—গঙ্গাস্নান বা পূজা-অর্চনা করতে করতেও কত লোক পাপ-চিন্তায় বিভোর হয়, তাদের মতো বকধার্মিকের সংখ্যাও বড় কম নয়।

বর্ণচোরা আম (যাহা'র স্বরূপ বোঝা কঠিন)—নন্দবাবু যেন একটি বর্ণচোরা আম, তিনি যে এমন কবিতা লিখতে পারেন, তা আমরা কোনদিন জানতেই পারিনি।

বাপের ঠাকুর (পিতামহস্থানীয় ব্যক্তি—বিদ্রূপ ছলে)—কি আমার বাপের ঠাকুর এলেন রে, কথায় কথায় তার পরামর্শ নিতে হবে !

বালির বাঁধ (অস্থায়ী সম্বন্ধ)—'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ !'—চণ্ডীদাস।

ব্যাঙের সর্দি (অবিশ্বাস্য ব্যাপার)—চা-খোর মানুষ চা খাবে না, বলছ কী হে, —ব্যাঙের আবার সর্দি !

ব্যাঙের আধুলি (তুচ্ছ বস্তু লইয়া আত্মপ্রসাদ)—ভারি তো একটা কবিতা ছাপা হয়েছে, তাই আবার ব্যাঙের আধুলির মতো সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ !

বিদুরের ক্ষুদ (শ্রদ্ধাদত্ত যৎসামান্য দান)—আপনার মতো ধনী ব্যক্তি আমার মতো গরিবের ঘরে বিদুরের ক্ষুদেই যে তুষ্ট হবেন এ আমার আশাতীত।

বিড়ালতপস্বী (ভণ্ড)—ফোঁটাতিলক কেটেও যারা পরনিন্দা আর পরচর্চায় দিন কাটায়, তাদের যদি বিড়ালতপস্বী বলা যায়, তাতে কি আর অন্যায় হবে ?

বিসমিল্লায় গলদ—['গোড়ায় গলদ' দ্রষ্টব্য]।

বুক দিয়ে পড়া (আন্তরিকভাবে)—আপদে বিপদে সে অমন বুক দিয়ে পড়ে ব'লে সবাই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

ভরাডুবি (কাজের মধ্যেই সর্বনাশ)—এতদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তুমি যে অমন ক'রে মাঝপথেই ভরাডুবি করাবে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান)—নবেনবাবু তাঁর ছেলেকে ডাক্তার ক'রে তুলবেন ব'লে কত টাকাই না খরচ করলেন, কিন্তু সবই হ'লো ভস্মে ঘি ঢালা, কারণ বারবার চেষ্টা ক'রেও ছেলে আর ডাক্তারি পাস করতে পারলে না।

ভাঁড়ে মা ভবানী (শূন্য ভাণ্ডার)—চেয়ে দেখছ কি, ভাঁড়ে মা ভবানী, আজ কিছু টাকা না আনলে সবাইকে উপোস ক'রেই থাকতে হবে।

ভিজে বিড়াল (কপট)—তার মতো ভিজে বেরালকে কী ক'রে জব্দ করতে হয় তা আমার জানা আছে।

ভূতের বেগার (নিষ্ফল কর্ম)—দিনরাত তো কেবল ভূতের বেগার খেটেই চলেছি, তবু যদি একদিন তোমার মুখে একটু ভালো কথা শুনতাম।

ভূষণ্ডী কাক (নিজে অলস থাকিয়া যিনি বিজ্ঞের ন্যায় ভূয়োদর্শিতার ভান করেন)—বাড়িতে সবাই পরিশ্রম ক'রে সারা হচ্ছে, আর উনি ওদিকে ভূষণ্ডী কাকের মতো নিজের ঘরেই চুপচাপ ব'সে আছেন!

ভেক ধরা (ছদ্মবেশ ধারণ)—সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে ভালোই করেছ,—এদেশে ভেক না ধরলে কেউ ভিখ দেয় না বাপু!

মগের মুলুক (অরাজকতা)—এটা মগের মুলুক নয় যে, গায়ের জোরে তোমরা আমার জমি বেদখল করবে, এখনও থানা-পুলিস আছে, আইন-আদালত আছে।

মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য)—ছেলেটি দেখতে সুন্দর হ'লে কী হবে, আসলে ও একটি মাকাল ফল, তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, এখন রকে রকে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

মাছের মায়ের পুত্রশোক (মায়াকান্না)—চিরকাল যে তোমার শত্রুতা ক'রে বেড়ালো, সে এখন তোমার দুঃখ দেখে কাঁদতে বসেছে, এ যে দেখছি মাছের মায়ের পুত্রশোক।

মামার বাড়ির আবদার (অন্যায় আবদার)—মাসের পর মাস তোমাকে ব'সে ব'সে খাওয়াব, একি মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ?

মাণিকজোড় (অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু)—যেখানেই যাও না-কেন, দেখবে কানাই আর বলাই একই সঙ্গে আছে, ওরা যেন ঠিক মাণিকজোড়!

মাঠে মারা যাওয়া (ব্যর্থতায় পর্যবসিত)—পরীক্ষার আগে একমাস ধ'রে বিমান কি পড়াশোনাই না করেছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সে আর পরীক্ষা দিতে পারল না, তার সমস্ত পরিশ্রমই মাঠে মারা গেল।

মান্ধাতার আমল (সুপ্রাচীন কাল)—নানা বিষয়ে পৃথিবী যখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তখনও যদি আমরা মান্ধাতার আমলের রীতি অনুসরণ ক'রে চলি তাহ'লে কি কোনোদিনও আমাদের উন্নতি হবে?

মিছরির ছুরি (যাহাতে মধুরতা আছে আবার জ্বালাও আছে)—মধুবাবুর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বিশেষ কটাক্ষপূর্ণ, শুনতে বেশ অথচ অন্তরে গিয়ে বেঁধে, ঠিক যেন মিছরির ছুরি!

মুখ তুলে চাওয়া (প্রসন্ন হওয়া)—দিনের পর দিন এত দুঃখ আর সহ্য হয় না, একটিবার মুখ তুলে চাও ভগবান!

মুখে ফুলচন্দন পড়া (আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন)—রমেশ এবার জলপানি পাবে বলছ, আহা তাই যেন সত্যি হয়, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

মুশকিল আসান (বিপদের অবসান)—দেনার দায়ে হরেনবাবুর যখন মাথা খারাপ হবার জোগাড়, শৈলেনবাবু তখন এলেন দু'হাজার টাকা নিয়ে বন্ধুর মুশকিল আসান করতে।

ম্যাও ধরা (ঝক্‌কি পোহানো)—তোমরা তো প্রস্তাব পাস ক'রে খালাস, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে—ক্লাব গড়তে হ'লে গোড়াতেই যে টাকাটা দরকার হবে সেটা আসবে কোত্থেকে?

যখের ধন (অতিশয় কৃপণের মতো যে দ্রব্য সঞ্চিত)—ঘরবাড়ি সবই তো গেছে, এখন আর যখের ধনের মতো একরাশ পুরোনো পুঁথি আগলে রেখে কী হবে, ওগুলি কোনো গ্রন্থাগারে দান ক'রে দাও।

যমের অরুচি (অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিয়াও যাহার মৃত্যু হয় না এইরূপ বক্রোক্তি)—ভালো খেতে না পেয়ে লোকটা অস্থিচর্মসার, ওদিকে বয়সও হ'লো আশির কাছাকাছি, তার ওপর অসুখ-বিসুখ তো লেগেই আছে, তবু মরণ হয় না, লোকটা যেন যমের অরুচি!

রক্তের টান (রক্তের সম্বন্ধজনিত মায়া)—বৈমাত্রেয় ভাই অনিলের অসুখের সংবাদ পেয়েই সুনীল হাজারিবাগে ছুটল বড় একজন ডাক্তার নিয়ে, হাজার হোক রক্তের টান তো আছে।

রাজা-উজির মারা (লম্বাচওড়া কথা বলা)—মুখে তো খুব রাজা-উজির মারছ, এদিকে ঘরে যে একটা ফুটো পয়সাও নেই সেদিকে কোনো হুঁশ আছে?

রগচটা (বদমেজাজী)—শঙ্করবাবু যেমন রগচটা মানুষ তাতে ক'রে ওঁর কাছে সুধীনের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব তোলাটা কি ঠিক হবে, তার চেয়ে ওঁর স্ত্রীকে আগে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাও, দেখবে তাতেই কাজ হবে।

রাহুর দশা (অত্যন্ত দুঃসময়)—অজিতের এখন রাহুর দশা চলছে, নইলে কি আর একই সঙ্গে চাকরি যায়, আর তার ব্যাঙ্কও ফেল পড়ে ?

রাঙামুলো (অপদার্থ)—['মাকাল' দ্রষ্টব্য]।

রাবণের চিতা (চিরস্থায়ী অশান্তি বা দুঃখ)—একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে নিবারণবাবু যে শোক পাইলেন, আজও তাহা রাবণের চিতার মতো তাহার অন্তরে জ্বলিতেছে।

রুই-কাতলা (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)—আসল রহস্য প্রকাশ পেলে দেখবে, ঐ কেলেঙ্কারী ব্যাপারের মধ্যে শহরের অনেক রুই-কাতলাও আছেন।

লগন-চাঁদ (ভাগ্যবান)—পরেশ তোমার লগন-চাঁদ ছেলে, যে-ব্যাপারেই ও হাত দিচ্ছে তাতেই দেখছি সোনা ফলাচ্ছে।

লাটে ওঠা (সম্পূর্ণ নষ্ট)—যে-রকম বেহিসাবী হয়ে তুমি খরচপত্র করছ, তাতে দেখছি বাপের সম্পত্তি লাটে উঠিয়ে ছাড়বে।

লেফাফা-দুরস্ত (বাহ্যিক রীতিনীতিতে সুনিপুণ, অথচ আসল কাজে বিপরীত) —পোশাক-পরিচ্ছদে সে একেবারে লেফাফা-দুরস্ত, দেখে মনে হবে যেন কোনো বড়ঘরের ছেলে, কিন্তু লোকটা আসলে নামকরা এক গুণ্ডার ভাই—এমন কাজ নেই যা ও করতে পারে না।

শকুনি-মামা (অনিষ্টকারী ব্যক্তি)—কত লোকের কত অনিষ্টই না তিনি করেছেন, তাই লোকে যদি তাকে শকুনি-মামা ব'লেই ডাকে, তাহ'লে কি খুব অন্যায় হবে ?

শনির দৃষ্টি (অত্যন্ত দুঃসময়)—তোমার ওপরে দেখছি শনির দৃষ্টি পড়েছে, নইলে কি আর একই সঙ্গে এত বিপদে পড় ?

শাঁখের করাত (উভয়সঙ্কট)—এখন যদি 'হাঁ' বলি তাতেও বিপদ, আবার যদি 'না' বলি তাতেও বিপদ, আমার অবস্থা হয়েছে শাঁখের করাতের মতো, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে।

শাপে বর (অমঙ্গলের আবরণে মঙ্গল)—জমিটার ওপর দিয়ে রাস্তা বেরুবে শুনে আমার শাপে বর হ'লো, কারণ জমি গেলেও যে ক্ষতিপূরণ পাব তা কেনাদামের প্রায় তিনগুণ।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা)—এখনও ভালো ক'রে পড়াশোনা করছ না, এদিকে যে শিরে সংক্রান্তি! পরীক্ষার আর তো মাত্র দু'দিন বাকি; এভাবে চললে পাস করবে কেমন ক'রে ?

শিবরাত্রির সল্‌তে (শেষ আশা)—পর পর তিন ছেলে মারা যাবার পর, ঐটিই কোনোমতে এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে—অনাথা মায়ের ঐ তো শিবরাত্রির সল্‌তে।

শ্রীঘর (ব্যঙ্গার্থে কারাগার)—মারামারি করতে যাবার সময় মনে ছিল না, এখন কান্নাকাটি করলে কী হবে, যাও একবার শ্রীঘরে ঘুরে এসো।

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ)—না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে কোনো কাজকর্ম, তোমার মতো ষাঁড়ের গোবর দিয়ে কোন্ কাজ হবে ?

ষোলকলা পূর্ণ (ব্যঙ্গার্থে পূর্ণ)—চেয়ারের হাতল দুটো তো ভেঙেছ, এবার কাপড়টাও ছেঁড়, তবেই ষোলকলা পূর্ণ হবে !

সরফরাজি করা (মাতব্বরি করা)—আমাদের কাজ আমরা বুঝব, তোমার আর ওপর-পড়া হ'য়ে সরফরাজি করতে হবে না বাপু!

সবে ধন নীলমণি—['শিবরাত্রির সল্‌তে' দ্রষ্টব্য]।

স-সে-মি-রা (বাহ্যজ্ঞানশূন্য)—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যখন সকলেই তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল তখন তার এক স-সে-মি-রা অবস্থা !

সাক্ষীগোপাল (কর্তৃত্বহীন কর্তা)—জমিদারির যা কিছু দেখাশোনা সবই করেন গিন্নী-মা, বড়কর্তা তো সাক্ষীগোপাল !

সাত-সতের (নানা প্রকার)—একটা তো শুধু চিঠি লিখবে, তাই অত সাত-সতের ভাবছ ?

সাপের পাঁচ পা দেখা (স্পর্ধাযুক্ত হওয়া)—আমি বাড়িতে নেই ব'লেই কি তুমি যা-খুশি তাই ক'রে বেড়াবে, সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি ?

সুখের পায়রা (যাহারা কেবল সুখভোগী)—আজ তোমার এত টাকাকড়ি আছে ব'লেই এত বন্ধু জুটেছে, কিন্তু যেদিন তা থাকবে না, সেদিন দেখবে ওরা আর তোমার ছায়াও মাড়াচ্ছে না,—আসলে তো সব সুখের পায়রা !

সোনায় সোহাগা (ভালোর উপর ভালো)—ছেলেটি একে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান, তার ওপরে ডবল-এম-এ,—এ যে দেখছি সোনায় সোহাগা।

সোনার পাথরবাটি—['কাঁঠালের আমসত্ত্ব' দ্রষ্টব্য]।

স্বখাত সলিল (নিজের তৈয়ারী বিপদ)—তখনই বলেছিলাম যে বন্ধুকে আর নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার ক'রো না, তাতো শুনলে না, এবারে স্বখাত সলিলে ডুবে মর ! সে ত্রিশহাজার টাকা সরিয়ে হাওয়া হয়েছে, সে কি আর ফিরে আসবে ভেবেছ ?

হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খল অবস্থা)—খাতাপত্র যেভাবে হ-য-ব-র-ল ক'রে রেখেছ, তাতে আসল কাগজ উদ্ধার করি কেমন ক'রে বলতো ?

হরিষে বিষাদ (আনন্দ হইতে না হইতেই দুঃখ)—এদিকে খবর এলো নন্দীর নামে লটারিতে দশ হাজার টাকা উঠেছে, ওদিকে আবার খবর পেলাম লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে সে নাকি এক মোটর-দুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে হাসতাপালে গেছে—আমার তখন হরিষে বিষাদ অবস্থা।

হরি ঘোষের গোয়াল (বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্থান)—ক্লাব তো নয় যেন এক হরি-ঘোষের গোয়াল, সেখানে যার যা খুশি তাই করছে, কেউ গলা সাধছে, কেউ তবলায় চাঁটি মারছে, কেউ বা উঁচু গলায় বক্তৃতা করছে সবই চলেছে একসঙ্গে।

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তিলাভ করা)—বখাটে ছেলেগুলো শেষ পর্যন্ত পাড়া ছেড়ে চ'লে যাওয়াতে সবার যেন হাড়ে বাতাস লাগলো।

হাড়-হদ্দ (খুঁটিনাটি বিষয়)—আমার কাছে চেপে গেলে কী হবে, আমি ওদের হাড়হদ্দ সব জানি।

হাতে কলমে (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত)—বই প'ড়েই কি আর সব কিছু শেখা যায়, হাতে-কলমেও শিখতে হয়, তবেই সে-শিক্ষা হয় সার্থক।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা)—ভালো চাও তো চুপ ক'রে থাক, নইলে হাটে হাঁড়ি ভাঙব, তখন আর তোমার লজ্জার শেষ থাকবে না।

হালে পানি পাওয়া (কোনোরকমে সফলকাম হওয়া)—সামান্য এক কেরানী হয়ে তুমি যাচ্ছ কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, সেখানে কি আর হালে পানি পাবে ভেবেছ ?

৬। *প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা*

বিশিষ্ট অর্থবোধক পদের সমষ্টি, তথা বাক্যাংশকেই বলা হয় **বাগ্‌ধারা**। বাংলা ভাষা এই বাগ্‌ধারায় বিশেষ সমৃদ্ধ। পূর্ব পরিচ্ছেদে এই বাগ্‌ধারা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা হইতেছে প্রবচনমূলক বাক্যের। বাংলাভাষায় প্রবচনমূলক বাক্য প্রচুর। এই জাতীয় বাক্য এক একটি বিশেষ অর্থ দ্যোতনা করে। ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহারে রচনা রস-সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই জাতীয় বাক্য ও বাগ্‌ধারা প্রয়োগের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের বিশেষ অর্থ যেন অবলীলাক্রমে প্রকাশ পায়, কোনো রকম কষ্ট-কল্পনা যেন তাহাতে না থাকে।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট বা অতি চালাকের গলায় দড়ি : (বেশী লাভ করিতে গিয়া পস্তানো)

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে : (অত্যধিক আস্ফালনের শোচনীয় পরিণতি)

অনভ্যাসে চন্দনের ফোঁটা, কপাল চচ্চড়্ করে : (অনভ্যস্ত কিছু করিতে গিয়া অস্বস্তিবোধ)

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট : (বেশী লোকের হস্তক্ষেপের ফলে আসল কাজ পণ্ড হওয়া)

অসারের তর্জন-গর্জন সার : (শক্তিহীনের ব্যর্থ আস্ফালন)

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী : (কম শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম)

আপন হাত জগন্নাথ : (নিজের শক্তি থাকিতে অপরের উপর নির্ভর না-করা)

আপনি বাঁচলে বাপের নাম : (বিপদের সময় আত্মরক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া)

আপনি আচরি শিখায় ধর্ম : (নিজের সৎশিক্ষা দ্বারা অন্যের নিকট আদর্শ-স্থাপন)

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না শঙ্করাকে ডাকে : (সম্বলহীন হইয়াও অপরকে অংশ দিতে আহ্বান করে)

আসলে মুষল নেই ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া : (যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব)

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে : (একজনের ব্যাপার অপরজনে আরোপ)

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ : (যে-জিনিস হাতছাড়া হইতেছে তাহা নিজের ইচ্ছায় ভালো কাজে দেওয়ার ভান)

উপরোধে ঢেঁকি গেলা : (অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া নিজের অনিচ্ছা বিসর্জন দেওয়া)

উল্টা বুঝলি রাম : (বক্তার কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ)

এক ঢিলে দুই পাখি মারা : (একটিমাত্র কৌশলে উভয় উদ্দেশ্য সাধন)

একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ : (যে-বস্তু বা ব্যক্তি যাহার বিরুদ্ধধর্মী তাহার নিকট সেই বস্তু ব্যক্তির সংযোগ)

এক মাঘে শীত পালায় না : (একবার সুযোগ হারাইলেও, দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষা)

কনের ঘরের মাসি, বরের ঘরের পিসি : (উভয় পক্ষে সংশ্লিষ্ট বা উভয় পক্ষের সংবাদ রাখে যে)

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন : (অসুন্দর জিনিসের শোভন নামকরণ, ব্যঙ্গার্থে)

কানু ছাড়া গীত নাই : (একই বিষয়ের বারংবার উল্লেখ)

কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ : (একই ব্যাপারে কাহারও লাভ এবং কাহারও ক্ষতি)

কালনেমির লঙ্কা ভাগ : (কর্ম-সম্পাদনের পূর্বেই মনে মনে লাভের কল্পনা)

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি : (সাধ্যসাধনা দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া বদনাম দেওয়া)

কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা : (নিজে অপরাধ করিয়া নিরপরাধ লোকের উপর সেই অপরাধের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া)

কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও নয় : (সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ চিরস্থায়ী)

কেঁচো খুঁড়তে সাপ : (তুচ্ছ ব্যাপার হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব)

খাল কেটে কুমির আনা : (নিজের দোষে বিপদাপন্ন হওয়া)

খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে : (যাহার বিপদ রোধ করিবার শক্তি কম, তাহার সেই বিপদই প্রায় ঘটে, এই অর্থে বক্রোক্তি)

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল : (স্বয়ং নেতৃত্ব, কেউ মানুক আর নাই মানুক)

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল বা **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি :** (কার্যসিদ্ধির পূর্বেই লাভের প্রত্যাশা)

গাছেরও খায়, তলেরও কুড়ায় : (সকল কিছুই আত্মসাৎ করা)

গোরু মেরে জুতো দান, গোড়া কেটে আগায় জল : (জানিয়া শুনিয়া অন্যায় করা এবং পরে তাহা সংশোধনের প্রয়াস)

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না : (নিজের পরিবেশে অনাদর লাভ অথচ অন্য পরিবেশে যাহার সমাদর)

ঘর থাকতে বাবুই ভেজা : (অবিমৃষ্যকারিতা বা নিজের দোষে ক্ষতিস্বীকার)

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় : (ভুক্তভোগীরাই বিপদের আশঙ্কা বুঝিতে পারে)

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ? : (ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে যে নিজেরও একদিন জব্দ হইবার সম্ভাবনা থাকে—সে-কথা উপেক্ষা করিলেই এইরূপ বক্রোক্তি ব্যবহার করা হয়)

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে নেই : (কার্যের প্রথম অনুষ্ঠাতাকে বাদ দিয়া কার্যসিদ্ধির প্রয়াস অনুচিত বা উপরওয়ালাকে লঙ্ঘন করিয়া কার্যসিদ্ধির চেষ্টা না করাই শ্রেয়)

ঘোড়া দেখে খোঁড়া : (সুযোগের সন্ধানী)

চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না : (পরিচিত ব্যক্তিকে আর অপরের সাহায্যে পরিচিত করাইতে হয় না)

চোখে সরষে ফুল দেখা : (অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদানুভব)

চোরের মায়ের কান্না : (নিজের অপরাধে যে দুঃখ, তাহা কাহাকেও জানাইবার নয়)

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে : (ঠিক সময়ে বুদ্ধির অভাব)

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল : (সমান শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা)

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো : (অকিঞ্চিৎকর বা অপ্রিয় কর্মসাধনের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি)

ছুঁচ হ'য়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয় : (প্রথমে সামান্য অবস্থায় প্রবেশ করিয়া পরে বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ, বা প্রথমে অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরে সেই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া অনিষ্টসাধন)

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ : (বড়র পক্ষে ছোট বা তুচ্ছের অনিষ্টসাধন অসম্মান-জনক)

ছেলের হাতের মোয়া : (সামান্য বা তুচ্ছ কোনো ব্যাপার নয়)

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ : (উভয়-সঙ্কট)

জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ানো : (সৎ লোককে অনর্থক অসৎ বলিয়া হয়রানি বা অপমান করা)

ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে : (অপরে সাধিত কর্মের ফলভোগ)

ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো : (ইঙ্গিতে ভৎর্সনা করা)

ঝোপ বুঝে কোপ মারা : (অবস্থা বুঝিয়া কোনো সুযোগ গ্রহণ করা)

টেনে বুনতে কুলোয় না : (অল্প আয়ে ব্যয়নির্বাহ সম্ভব নয়)

ঠেলার নাম বাবাজী : (বাধ্য হইলে কঠিন কাজও করিতে হয়)

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই : (উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই খরচ, অর্থাৎ স্বল্প পুঁজিতে অভাব মেটে না)

ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার : (অক্ষমতা সত্ত্বেও আস্ফালন)

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে : (যাহার যে-কাজ, যে-কোনো পরিবেশেই সে তাহা করিতে পারে)

তিল কুড়িয়ে তাল : (অল্প অল্প করিয়া বৃহৎ সঞ্চয়)

তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার : (বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য)

তেলা মাথায় তেল ঢালা : (যাহার অভাব নাই তাকেই বেশি করিয়া দান, অর্থাৎ অপচয়)

তোর শিল তোরই নোড়া তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া : (অপর লোকের প্রদর্শিত কৌশলের দ্বারা তাহাকেই জব্দ করা)

থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড় : (একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি)

দশচক্রে ভগবান ভূত : (বহু লোকের অন্যায়ে কর্মনাশ)

দশদিন চোরের একদিন সাধুর : (বারংবার অন্যায় করার পর একদিন ধরা পড়া)

দশে মিলি করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ : (ঐক্যবদ্ধ কর্মসাধনের পরেও যদি ব্যর্থতা আসে তাহাতে লজ্জার কিছু থাকে না, অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হইয়াই সৎ কাজ করা উচিত)

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা : (শত্রুকে যত্ন করিয়া পালন করা)

ধরি মাছ না ছুঁই পানি : (যাহাতে কোনোরকম বেগ না পাইতে হয় সেইভাবে সুকৌশলে কার্যসিদ্ধি)

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা **ধর্মের ঢাক আপনি বাজে :** (অন্যায় বা অধর্ম কখনও লুক্কায়িত থাকে না)

ধান ভানতে শিবের গীত : (অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন)

নানা মুনির নানা মত : (মতভেদ)

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা : (অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা ওজর দেখানো)

নিজের কোলে ঝোল টানা : (স্বার্থপর হইয়া কাজ করা)

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ : (নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়াও অপরের অনিষ্টসাধন)

নেই মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো : (একেবারে কিছু না-পাওয়া অপেক্ষা সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো)

প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা : (অপ্রত্যাশিত লাভ)

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা : (অপরের দ্বারা নিজের কার্যসিদ্ধি)

পরের মুখে ঝাল খাওয়া : (নিজে ব্যক্তিগতভাবে না জানিয়া অপরের কথায় আস্থা স্থাপন)

পাথরে পাঁচ কিল (কপাল ভালো থাকিলে ক্ষতির বৃথা আশঙ্কা)

পেটে খেলে পিঠে সয় (লাভের আশা থাকিলে খাটুনি বা নিগ্রহও সহ্য হয়)

পেট জ্বলে ভাতে সোনার আংটি হাতে (বাহিরে আড়ম্বর অথচ ভিতরে সারহীন)

ফাঁপা (বা **ফোঁপরা**) **ঢেকির শব্দ বেশী :** (অসার বা শক্তিহীনের বৃথা আস্ফালন)

ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই : (প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া নিজের মিথ্যা আড়ম্বর প্রকাশ)

বড় মাছের কাঁটাও ভালো : (মহৎ ব্যক্তির সামান্য কথাও মূল্যবান)

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো : (বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও অসাবধানতা)

বাড়া ভাতে ছাই (বা **পাকা ধানে মই**) **:** (ফললাভের সময়ে উপস্থিত যে বিঘ্ন)

বানরের গলায় মুক্তাহার : (অপাত্রে উৎকৃষ্ট কোনো দান)

বানের জলে ভেসে আসে : (অনায়াস-লব্ধ)

বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো : (অনাদৃত ভবঘুরে ব্যক্তি)

বামন হয়ে চাঁদে হাত : (অসম্ভব বা অভাবনীয় কিছু প্রত্যাশা)

বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর : (নেতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া পলায়ন)

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা : (কোন ব্যাপারে একবার লিপ্ত হইলে যখন নানারকম ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয় তখন এই জাতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয়)

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত : (আকস্মিক বিপদের উপস্থিতি)

বুনো ওল বাঘা তেঁতুল : (সমান শক্তিসম্পন্ন প্রতিপক্ষ)

বোঝার উপর শাকের আঁটি : (একটা বড় কাজের সঙ্গে আর একটি ছোট কাজ)

ভাঁড়ে নাই ঘি ঠকঠকালে হবে কি : (দোষ গোপন করিয়া গুণ প্রকাশের চেষ্টা)

ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত : (একই সঙ্গে কর্তার আদর ও কর্ত্রীর তিরস্কার লাভ)

ভাগের মা গঙ্গা পায় না : (ভাগের কাজে যত্ন থাকে না বলিয়া উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়)

ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া : (ভিক্ষায় পাওয়া জিনিসে পছন্দ-অপছন্দ নাই)

ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া : (প্রতিশোধপরায়ণ কাহারও ক্রোধের উদ্রেক করা)

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ : (অনর্থক অতিরিক্ত অপব্যয়)

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা : (বিপদ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া গোলমাল করা)

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন : (হয় ক্ষতিস্বীকার নতুবা কার্যসিদ্ধি)

মশা মারিতে কামান দাগা : (সামান্য কাজ করিতে অতিরিক্ত আয়োজন)

মাথা নেই তার মাথা ব্যথা : (কারণ অভাবে কার্যের কল্পনা)

মুখে মধু পেটে বিষ : (যাহার কথা মিষ্টি কিন্তু মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা)

মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে : (ইচ্ছা থাকিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ)

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ : (শেষ পর্যন্ত আশা পোষণ)

যত গর্জে তত বর্ষে না : (মুখের আস্ফালন অনুযায়ী কাজ না করিতে পারা)

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ : (কোনো জায়গায় উপস্থিত হইয়া সেই জায়গায় রীতি-প্রকৃতি আয়ত্ত করা)

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর : (সমান শক্তিসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী)

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না : (নানা কাজের প্রচ্ছন্ন শক্তি)

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় : (যাহা পরিহার করিতে চাওয়া যায়, তাহাই আসিয়া পড়ে)

লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না : (পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি লঘু শাসনে কাজ করে না)

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় : (প্রতারণা-লব্ধ অর্থ অকাজে ব্যয়িত হওয়া)

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন : (অর্থ দিবার লোক থাকিতে দুশ্চিন্তার কারণ নাই)

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা : (তুচ্ছ আপত্তি জানাইয়া নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন)

শূন্যে সৌধ নির্মাণ : (অলীক কল্পনা)

সমুদ্রে বাস করেও শিশিরে ভয় : (বহু বিপদের মধ্যে থাকিয়াও সামান্য বিপদের ভয়)

সাত নকলে আসল খাস্তা : (বারংবার নকল করিলে মূলের সহিত সাদৃশ্য থাকে না)

সাপ হয়ে কামড়ানো রোজা হয়ে ঝাড়া : (একই সঙ্গে ক্ষতিসাধন ও ক্ষতিপূরণ)

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে : (বিনা ক্ষতিতে কার্যসিদ্ধি)

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় : (নিজের ইচ্ছায় দুঃখ-বরণ)

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার : (প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকিতেও বৃথা অনুমান বা তর্ক)

হাতের লক্ষ্মী পায়ের ঠেলা : (উপস্থিত সুযোগের অবহেলা করা)

হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা : ('হাতে পাঁজি মঙ্গলবার'-এর সমার্থক)

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই : (প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতেও তাহা অগ্রাহ্য করা)

[এই জাতীয় প্রবচন বাক্য ছাড়াও বাংলাভাষায় অনেক **সংস্কৃত বাক্যাংশ** প্রবচনের মতই স্থায়ী স্থানলাভ করিয়া বাংলাভাষার বাগ্‌ধারাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যেমন—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা : (অত্যধিক অহঙ্কারে নিজের অনিষ্টসাধন)। **প্রহারেণ ধনঞ্জয় :** (প্রিয়জনের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রহারের দ্বারা তাহাকে বিতাড়ন)। **ফলেন পরিচীয়তে :** (কার্যের দ্বারা কর্তার দোষ-গুণের পরিচয় লাভ)। **বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া :** (সামান্য কাজে অত্যধিক আয়োজন)। **বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে :** (বিদ্বান্ ব্যক্তির সর্বত্রই সমাদর)। **বিষকুম্ভম্ পয়োমুখম্ :** (মুখে মধু পেটে বিষ)। **বিষস্য বিষমৌষধম্ :** (বিষই বিষ দূর করিবার ঔষধ, অর্থাৎ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)। **ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র :** (সবখানেই ভাগ্য ফলে)। **মধুরেণ সমাপয়েৎ :** (মধুর কোনো জিনিস দিয়া কর্মসমাপ্তি)। **মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা :** (মহাজন প্রদর্শিত পথ বা উপায়ই শ্রেষ্ঠ)। **মিষ্টান্নমিতরে জনা :** (সাধারণ লোকের সামান্য সাধ)। **মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ** (ভুল সকলেরই হইতে পারে)। **মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি :** (অজ্ঞানতা দূর করিবার উপায় তিরস্কার বা শাসন)। **যঃ পলায়তি স জীবতি :** (আপনি বাঁচলে বাপের

নাম)। **যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ** (যে দেশের যে আচার তাহাই গ্রহণ করা উচিত)। **যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ** (ধর্মের কল বাতাসে নড়ে)। **শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ:** (খারাপ লোকের সহিত খারাপ ব্যবহার করিতে হয়)। **শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ঃ** (শরীরই ধর্মাচরণের মাধ্যম)।]

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কর :—

মাথা, মুখ, হাত, পা, চোখ, কান ; কাঁচা, পাকা, নরম, গরম, মোটা, বাঁকা।

২। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যেকটিকে অন্তত তিনটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া দেখাও :—

ধরা, করা, খাওয়া, যাওয়া, কাটা, রাখা।

৩। বিভিন্ন পদরূপে ইহাদের প্রয়োগ কর :—

আর, উত্তর, ঐ, কি, গরিব, জোর, শোনা, ধরা, যে, তোলা।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখ ও তাহাদের দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর :—

অমাবস্যার চাঁদ, অকালকুষ্মাণ্ড, আকাশকুসুম, আমড়াকাঠের ঢেঁকি, আলালের ঘরের দুলাল, ইঁচড়ে পাকা, কলুর বলদ, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, কাঠের পুতুল, খয়ের খাঁ, গোঁফখেজুরে, গোকুলের ষাঁড়, গোবরগণেশ, চোখের বালি, চিনির বলদ, ঝাঁকের কই, ঠোঁটকাটা, ডুমুরের ফুল, তাসের ঘর, তুঁষের আগুন, তুলসীবনের বাঘ, ননীর পুতুল, পুকুরচুরি, বিদুরের ক্ষুদ, ব্যাঙের সর্দি, ব্যাঙের আধুলি, মিছরির ছুরি, শাঁখের করাত, সোনায় সোহাগা, ষাঁড়ের গোবর, গৌরচন্দ্রিকা, বিসমিল্লায় গলদ, বিড়াল-তপস্বী, স-সে-মি-রা, পি-পু-ফি-শু, হরিঘোষের গোয়াল, সুখের পায়রা, শিবরাত্রির সলতে।

৫। বাক্যে প্রয়োগ কর :—

অরণ্যে রোদন, আক্কেল গুড়ুম, আদাজল খেয়ে লাগা, আমড়াগাছি করা, উড়ে এসে জুড়ে বসা, একা ঘরের গিন্নি, কইমাছের প্রাণ, খুঁড়িয়ে বড় হওয়া, গা-ঢাকা দেওয়া, গা করা, গায়ে গায়ে শোধ, ঘুঘু চরানো, চোখে ধুলো দেওয়া, টনক নড়া, ঢি ঢি পড়া, দাঁও মারা, দু' নৌকায় পা, নয় ছয়, ফোঁড়ন দেওয়া, ভস্মে ঘি ঢালা, মুখ তুলে চাওয়া, লাটে ওঠা।

৬। অর্থ প্রকাশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ কর :—

অনভ্যাসে চন্দনের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে ; আপন হাত জগন্নাথ ; উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ; একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ ; কানের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি ; কেঁচো খুঁড়তে সাপ ; খাল কেটে কুমির আনা ; গরু মেরে জুতো দান ; ঘোড়া দেখে খোঁড়া ; ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ; ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই ; ধরি মাছ না ছুঁই পানি ; ধান ভানতে শিবের গীত ; নিজের কোলে ঝোল টানা ; পরের মুখে ঝাল খাওয়া ; পাকা ধানে মই ; মশা মারতে কামান দাগা ; যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ; সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে ; হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার

অলঙ্কারের প্রয়োজন শোভা বর্ধনের জন্য। হার, মালা, কেয়ূর, কঙ্কণ, নূপুর, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কার যেমন মনুষ্য-দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি উপমা, অনুপ্রাস, যমক, রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার কাব্য-দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কাজেই, একথা আমরা বলিতে পারি যে, যে-সকল গুণের দ্বারা ভাষার শব্দগত ও অর্থগত বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাহাই ভাষার **অলঙ্কার**। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, অলঙ্কারে যেমন শোভা বৃদ্ধি পায়, তেমনি আবার সুপ্রযুক্ত না হইলে সেই অলঙ্কারই সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। কাজেই, রচনায় কোথায় কোন্ অলঙ্কার বসিলে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সেই সঙ্গে তাহার সৌন্দর্যও রক্ষা পাইবে তাহা অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষা করিতে হইবে।

বাংলাভাষার অলঙ্কার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) **শব্দালঙ্কার** ও (২) **অর্থালঙ্কার**।

শব্দালঙ্কার

যে-সকল অলঙ্কারের সাহায্যে শব্দগত বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাহাই **শব্দালঙ্কার**। এই শ্রেণীর অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষা একদিকে যেমন হয় শ্রুতিমধুর, অন্যদিকে তেমনি হয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই শ্রেণীর অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান হইল—(ক) **অনুপ্রাস**, (খ) **যমক**, ও (গ) **শ্লেষ**।

[ক] অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির পুনরাবৃত্তিতে বা বারংবার প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তাহাকেই বলা হয় **অনুপ্রাস**। এই বর্ণ শব্দের আদিতে পুনরাবর্তিত হইলে হয় **আদ্যানুপ্রাস**, শব্দের মধ্যে হইলে হয় **মধ্যানুপ্রাস**, এবং শব্দের অন্তে হইলে হয় **অন্ত্যানুপ্রাস**। যেমন—

[শব্দের আদিতে, অর্থাৎ আদ্যানুপ্রাস]

(১) '**আ**কাশ **আ**মার ভরলো **আ**লোয়, **আ**কাশ **আ**মি ভরব গানে।'—**রবীন্দ্রনাথ**

(২) '**উ**ৎসব-**উ**চ্ছ্বাসে, **উ**ন্মাদ শঙ্খের গর্জে বিজয় **উ**ল্লাসে।'—**রবীন্দ্রনাথ**

(৩) 'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।'—রবীন্দ্রনাথ

(৪) 'পথের মোড়ে প'ড়ে ছিল প্রকাণ্ড এক পাথর।'—কৃষ্ণদয়াল বসু

(৫) 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।'—রবীন্দ্রনাথ

(৬) 'সনাতন সরকার সকলের সঙ্গে সমান সম্পর্ক রাখিতে চায়।'

—মনোজিৎ বসু

(৭) 'আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা।'—রবীন্দ্রনাথ

(৮) 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।'—রবীন্দ্রনাথ

(৯) 'মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥'—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(১০) 'আনা দরে আনা যায় কত আনারস।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[প্রথম চারিটি, ষষ্ঠ ও নবম উদাহরণে যথাক্রমে আ, উ, চ, প, স ও ম এই সকল বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। পঞ্চম উদাহরণে একদিকে যেমন 'গ'-বর্ণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, তেমনি বলা যায় যে 'গু' ও 'গ'-এর অনুপ্রাস হইয়াছে। সপ্তম উদাহরণে 'ম'-বর্ণের অনুপ্রাস (ম + ঋ, ম + উ এবং ম) এবং অষ্টম উদাহরণে 'উ'-স্বরবর্ণের (দ + উ, ফ + উ, ঝ + উ) অনুপ্রাস ঘটিয়াছে। আর, দশম উদাহরণে যে অনুপ্রাস হইয়াছে তাহা আ + না = আনা বর্ণসমষ্টির।]

[শব্দের মধ্যে, অর্থাৎ মধ্যানুপ্রাস]

(১) 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।'—মাইকেল মধুসূদন

(২) 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'—কালিদাস রায়

(৩) 'নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।'—গোবিন্দদাস

(৪) 'অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে।'—চণ্ডীদাস

[এই চারটি উদাহরণে যুক্তবর্ণ-যুক্ত ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। এই জাতীয় যুক্তবর্ণ-যুক্ত ধ্বনির শব্দের শেষে বারংবার প্রযুক্ত হইয়া অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করিতে পারে।]

[শব্দের শেষে, অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস]

(১) 'না মানে শাসন, বসন বাসন, অশন আসন যত।'—রবীন্দ্রনাথ

(২) 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়ণের মণি, ষোল-আনা গৃহিণী।'—বঙ্কিমচন্দ্র

(৩) 'মিষ্টি অনাসৃষ্টি তাহার, মিষ্টি চপলদৃষ্টি।'—কৃষ্ণদয়াল বসু

(৪) 'ষণ্ডা সে গুণ্ডার মুণ্ড প্রকাণ্ড।'— „

(৫) 'বাঁশ লেগে ঠাস ক'রে ভাঙিল ঠকাস্ করে।' —কৃষ্ণদয়াল বসু

(৬) 'লহু লহু হাসনি, গদগদ ভাসনি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।'

—গোবিন্দদাস

(৭) 'পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।'—রবীন্দ্রনাথ

(৮) 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে।'—জ্ঞানদাস

(৯) 'বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্ত-স্বভাব হইল।'

—বিদ্যাসাগর

(১০) 'পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি।'—রবীন্দ্রনাথ

[অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ণের পুনরাবৃত্তি অপেক্ষা ধ্বনির পুনরাবৃত্তিই বড় কথা। 'শন' ও 'সন' বর্ণে পৃথক হইলেও ধ্বনিতে এক, যেমন এক—'ণি', 'ণী', 'নি', 'নী'; 'আশ্', 'আস্'; 'পুর', 'ধুর'। ধ্বনিগত পুনরাবৃত্তিতে কিভাবে অনুপ্রাস হয় নিচের কয়েকটি উদাহরণে তাহা আরও ভালোভাবে বুঝা যাইবে।

'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে।'—মাইকেল মধুসূদন। 'আদি অনাদিক নাথ কহায়সি, ভবতারণ-ভার তোহারা।'—বিদ্যাপতি (এখানে 'আ'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।'—কৃত্তিবাস (এখানেও 'আ'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।'—ভারতচন্দ্র ('দ' বর্ণ ও ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'ভ্রান্ত হ'য়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রমপথ।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ('ভ্র' বর্ণ ও ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'অনল শীতল হয় সলিল সম্পাতে।'—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া কাঁধে ফেলিল।'—শরৎচন্দ্র ('ইয়া'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়।'—বঙ্কিমচন্দ্র। 'হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙিয়া গলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে।'—বঙ্কিমচন্দ্র ('ইয়া'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'দুলিতেছে তরী, জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।'—কাজী নজরুল ইসলাম। 'রূপ-সনাতন রহেন দু'জন সাধন-ভজন-রত।'—কালিদাস রায় ('অন্'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!'—মোহিতলাল মজুমদার।

'**মাল-চেনাচিনি**, **দর-জানাজানি**, কানাকড়ি দিয়ে কত **টানাটানি**।'—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার উহার কাছে মানছে যে হার।'—কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক। 'মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে, মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ('ম'-বর্ণ ও ধ্বনির অনুপ্রাস)। '**আবাদ** করে, বি**বাদ** করে, সু**বাদ** করে তারা।'—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। 'লুটায় যুবতী বুদ্ধচরণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ।'—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ('উ'-ধ্বনির অনুপ্রাস)। 'গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। '**দিবে** আর নি**বে**, মিলা**বে** মিলি**বে** যা**বে** না ফিরে'—রবীন্দ্রনাথ।]

[খ] যমক

বাক্যের মধ্যে ভিন্নার্থক একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে যমক অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাও তিন প্রকার—**আদ্যযমক**, **মধ্যযমক** ও **অন্ত্যযমক**। যেমন—

[বাক্যের আদিতে, অর্থাৎ আদ্যযমক]

(১) '**ভারত ভারত**-খ্যাত আপনার গুণে।'—ভারতচন্দ্র

(২) '**আনা**-দরে **আনা** যায় কত আনারস।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(৩) **উত্তর উত্তর** না দিয়া **উত্তর** দিকে ছুটিল।

(৪) **ধর্মের ধর্মই** হইল ন্যায়বিচার করা।

(৫) **হারাধনের হারাধন** ঘরে ফিরিতেই সকলে আনন্দে অধীর।

[প্রথম উদাহরণের প্রথম 'ভারত' অর্থ কবি ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয় 'ভারত' অর্থ ভারতবর্ষ। সেইরকম, দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম 'আনা' অর্থ চারপয়সা, দ্বিতীয় 'আনা' অর্থ আনয়ন করা। তৃতীয় উদাহরণের প্রথম 'উত্তর' লোকের নামবিশেষ, দ্বিতীয় 'উত্তর' জবাব, আর তৃতীয় 'উত্তর' দিক্‌বিশেষ। চতুর্থ উদাহরণের প্রথম 'ধর্ম' অর্থ যমরাজ, দ্বিতীয় 'ধর্ম' অর্থ কর্তব্য বা গুণ। পঞ্চম উদাহরণের প্রথম 'হারাধন'-এর অর্থ কোনো লোকের নাম, দ্বিতীয় 'হারাধন' অর্থ হারানো ছেলে।]

[বাক্যের মধ্যে, অর্থাৎ মধ্যযমক]

(১) 'পাইয়া চরণ-**তরী** (চরণরূপ নৌকা) **তরি** (পার হই) ভাবে আশা।'
—ভারতচন্দ্র

(২) 'আহা তায় **রোজ রোজ** (প্রত্যহ) কত **রোজ** (Rose = গোলাপ) ফুটে।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(৩) তাহার সেই **অর্থ** (টাকা) দিবার কোনো **অর্থ** (মানে) খুঁজিয়া পাইলাম না।

(৪) তাহার সহিত **ভাব** (বন্ধুত্ব) থাকিলেও, তাহার মনের **ভাব** (অভিপ্রায়) সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

(৫) আমি **খোলা**-র (খোলা দিয়া ছাউনি-করা) ঘরে বাস করলেও, **খোলা** (সাদাসিধে) মন আমার।

[**বাক্যের শেষ, অর্থাৎ অন্ত্যযমক**]

(১) 'দুহিতা আনিয়া যদি না **দেহ** (দাও)।
এখনি আমি সে ত্যজিব **দেহ** (শরীর) ॥'—ভারতচন্দ্র

(২) 'আটপণে আধসের আনিয়াছি **চিনি** (শর্করা)।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি** (জানি) ॥'—ভারতচন্দ্র

(৩) 'যত কাঁদে বাছা বলি' **সর সর** (দুধের সর)।
আমি অভাগিনী বলি **সর্ সর্** (সরিয়া যা) ॥—কৃষ্ণকমল

(৪) 'যাহা নাই **ভারতে** (মহাভারতে), তাহা নাই **ভারতে** (ভারতবর্ষে)।'

(৫) '**কবিতার বই কম কাটে** (বিক্রয় হয়), বেশির ভাগই পোকায় **কাটে** (কর্তিত হয়)।'

[ইংরেজী 'Pun'-কে বাংলায় যমক বলা যাইতে পারে। বাংলা-সাহিত্যের বহু রসরচনাই যমক-সমৃদ্ধ। যমকের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যেমন—পান্নাবাবু **পান** বা না-পান, তবু **পান** তাঁর চাই। **হাতের** লেখা মন্দ হ'লেও লেখার **হাত** আর মন্দ কি! **কথা** দিয়ে **কথা** রাখা উচিত। কেউ করে **বাগান**, কেউ করে **বা গান**। **কাল না** গিয়ে আজই **কালনা** রওনা হব। মানুষটা দেখতে **বড়** হ'লে কি হবে, **বড়** ছোট মন তার। **ধরা** গলায় কি আর গান **ধরা** যায়? ঘরে **চাল** না থাকলে কি হবে, পোশাকের **চাল** তার এখনও আছে।]

[গ] শ্লেষ

কোনো বাক্যে যখন কোনো শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেখানে শ্লেষ-অলঙ্কার বসিয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন—

'**চতুর্দশ বসন্তের** একগাছি মালা।'—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'চতুর্দশ বসন্ত' বলিতে যেমন চতুর্দশ বসন্তকাল বুঝায়, তেমনি আবার বুঝায় চৌদ্দ বৎসর। **অন্যান্য উদাহরণ :—**

(১) 'কে বলে **ঈশ্বর গুপ্ত** ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় **প্রভাকর**॥'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এখানে 'ঈশ্বর গুপ্ত' বলিতে যেমন 'ভগবান অপ্রকাশ' বুঝায়, তেমনি বুঝায় 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' নামক কবিকে। আবার, 'প্রভাকর' অর্থে 'সূর্য' ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' উভয়কেই বুঝায়।

(২) '**কু**-কথায় **পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ**।
কেবল আমার সঙ্গে **দ্বন্দ্ব** অহর্নিশ॥—ভারতচন্দ্র

অর্থ: কু=(১) পৃথিবী, (২) অসৎ; পঞ্চমুখ=(১) মুখর, (২) মহাদেব; কণ্ঠভরা বিষ=(১) নীলকণ্ঠ (মহাদেব), (২) কটু কথায় পূর্ণ কণ্ঠ; দ্বন্দ্ব=(১) মিলন, (২) কলহ।

(৩) পূজা শেষ ক'রে মেয়েটি প্রার্থনা জানালে, 'হে ঠাকুর আমাকে একটি **বর** দাও।

এখানে, 'বর' অর্থ (১) আশীর্বাদ, (২) স্বামী।

(৪) 'এদেশে **বিদ্যার** মন্দিরে **সুন্দরের** প্রবেশ নিষেধ।'—রবীন্দ্রনাথ

এখানে, 'বিদ্যা' বলিতে যেমন 'শিক্ষা-পদ্ধতি' বুঝায়, তেমনি বুঝায় 'বিদ্যা' নাম্নী নায়িকা। আর, 'সুন্দর' বলিতে যেমন 'ভালো কিছু' বুঝায় তেমনি বুঝায় 'সুন্দর' নামক নায়ক।

(৫) 'এ মন্দিরে **শিবের** বদলে **শিবা** বিরাজ করে।'

'শিব' অর্থ—(১) মহাদেব, (২) সুন্দর; 'শিবা' অর্থ—(১) কালী, (২) শৃগাল বা অসুন্দর।

[ইংরেজী 'Pun'-এর সমগোত্রীয় যেমন 'যমক', তেমনি 'শ্লেষ'-ও।]

অর্থালঙ্কার

যে-সকল অলঙ্কারের দ্বারা শব্দের অর্থগত গৌরব বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় তাহাদিগকেই বলা হয় অর্থালঙ্কার। **অর্থালঙ্কার** অনেক প্রকার। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল—**উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক** ও **সমাসোক্তি**।

[ক] উপমা

সমান গুণ-(বা ধর্ম)-যুক্ত দুইটি পৃথক বস্তুর মধ্যে যখন সাদৃশ্য দেখানো হয় তখন তাহাকে বলা হয় **উপমা**। উপমার অঙ্গ চারিটি (১) **উপমেয়**, (২) **উপমান**,

(৩) **সাধারণ গুণ বা ধর্ম** এবং (৪) **সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ**। যাহাকে তুলনা দেওয়া হয় তাহা উপমেয়, এবং যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় তাহা উপমান। সাধারণ ধর্ম বলিতে বুঝায়, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে গুণ বা ধর্ম সমান। আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ যেমন—যেন, হেন, তথা, যেমতি, ন্যায়, তুল্য, সমান, সদৃশ, মতো প্রভৃতি অব্যয়।

উদাহরণ :—

(১) 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'লো, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।'—রবীন্দ্রনাথ

এখানে—উপমেয় : 'ঝিলমের বাঁকা স্রোতখানি' ; উপমান : 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার' ; সাধারণ ধর্ম : 'আঁধারে মলিন' ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ : 'যেন'।

[উপমার চারিটি **অঙ্গই** এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তাই, এই জাতীয় উপমার নাম **পূর্ণোপমা**। অন্যান্য উদাহরণ :—

(ক) 'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।'—রবীন্দ্রনাথ

এখানে, উপমেয়—ছুরি, উপমান—প্রভাতরশ্মি, সাধারণধর্ম—তীক্ষ্ণদীপ্ত, সাদৃশ্য-বাচক শব্দ—সম।

(খ) 'ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে, কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে।'—মাইকেল মধুসূদন।

এখানে, উপমেয়—মোরা, উপমান—কপোত-কপোতী, সাধারণধর্ম—'বাঁধি নীড় থাকে সুখে', সাদৃশ্যবাচক শব্দ—যথা।

(গ) 'শিরীশ সদৃশ তব তনু সুকুমার।'

এখানে, উপমেয়—তনু, উপমান—শিরীষ, সাধারণ ধর্ম—সুকুমার, সাদৃশ্যবাচক শব্দ—সদৃশ।

(ঘ) 'তব মুক্তবেণীসম শোভা পায় সুনীল অটবী।'—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

এখানে, উপমেয়—সুনীল অটবী, উপমান—মুক্তবেণী, সাধারণ ধর্ম—শোভা পায়, সাদৃশ্যবাচক শব্দ—সম।]

(২) 'বিষের মতন কিন্তু তোমার বচন।'

এখানে, উপমেয়—বচন, উপমান—বিষ, সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মতন। কিন্তু, সাধারণ-ধর্ম—'জ্বালাময়ী' উহ্য আছে।

[যেখানে এইভাবে উপমার কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গ উহ্য থাকে, সেখানে তাহাকে বলা হয় **লুপ্তোপমা**। অন্যান্য উদাহরণ—

(ক) 'ললাটে সিন্দুর-বিন্দু দিনান্ত-তপন।'

(খ) 'লাবণ্য তোমার সখি সুধার মতন।'

(গ) 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'—সঞ্জীবচন্দ্র

(ঘ) 'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম ফিরে মরীচিকা-সম।'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথমটিতে সাধারণ-ধর্ম—'দেখিতে সুন্দর' ও সাদৃশ্যবাচক পদ 'যেন', দ্বিতীয়টিতে সাধারণ-ধর্ম 'মধুর', তৃতীয়টিতে সাদৃশ্যবাচক-শব্দ 'যেমন' এবং চতুর্থটিতে সাধারণ-ধর্ম —'মিথ্যা' উহ্য আছে।]

(৩) 'কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রানী,
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি।'—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

এখানে উপমেয় একটি—'বীণাপাণি'। কিন্তু উপমান একাধিক—কুন্দ, ইন্দু, তুষার ও শঙ্খ।

[যে-উপমার উপমেয় থাকে একটি, কিন্তু উপমান থাকে একাধিক, সেই জাতীয় উপমাকে বলা হয় **মালোপমা**। অন্যান্য উদাহরণ—

(ক) 'বজ্রের মত কঠোর, কুসুমের মত মৃদু, হিমশিলার ন্যায় স্বচ্ছ ও গঙ্গাধারার ন্যায় বিক্রুত তাঁহার চিত্ত।'

এখানে উপমেয় একটি—চিত্ত। কিন্তু, উপমান একাধিক—বজ্র, কুসুম, হিমশিলা, গঙ্গাধারা।

(খ) 'সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্র উপেন্দ্ররমণী শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে।'—মাইকেল মধুসূদন।

এখানে উপমেয় একটি—বীর্যবতী সতী (অর্থাৎ প্রমীলা)। আর, উপমান একাধিক—মহিষমর্দিনী দুর্গা, শচী, ইন্দ্রাণী, উপেন্দ্ররমণী।]

[খ] উৎপ্রেক্ষা

উপমেয়ের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য যেখানে সম্ভাবনাবাচক (যেন, কি, বুঝি, মনে হয়, মনে গণি, জনু প্রভৃতি শব্দ যোগে) বিতর্ক-ভাব দেখানো হয়, সেখানে হয় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে তাহাকে বলা হয় **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** ; আর ঐ-জাতীয় কোনো শব্দ না থাকিলে তাহাকে বলা হয় **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**। যেমন—

[বাচ্যোৎপ্রেক্ষা]

(১) 'অরুণ-উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলোকেশ মধ্যে ভালে সিন্দুর প্রকাশে॥' —মাইকেল মধুসূদন

(২) 'এতেক কহিয়া পুনঃ বসিল যুবতী
পদতলে, আহা মরি সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিক।' —মাইকেল মধুসূদন

(৩) 'ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।' —নজরুল ইসলাম

(৪) 'হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা।' —মোহিতলাল মজুমদার

(৫) 'সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাঁধা-বাঁধন-হারা।' —যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা]

(১) 'কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ॥' —ভারতচন্দ্র

(২) 'লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে।' —রবীন্দ্রনাথ

(৩) 'কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর!
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।' —গোবিন্দদাস

(৪) 'দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি।' —অক্ষয়কুমার বড়াল

[গ] রূপক

উপমেয় ও উপমানের তুলনা দিতে গিয়া যেখানে তাহাদের অভেদ কল্পনা করা হয়, সেখানে হয় রূপক অলঙ্কার। রূপক যেন উপমারই সংহত রূপ। এই অলঙ্কারে উপমানই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন—

(১) 'ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে হই ভবসিন্ধু।' —বিদ্যাপতি

(২) 'আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি বিপদ-সলিলে মগ্ন।'
—মাইকেল মধুসূদন

(৩) '**জীবন-প্রবাহ** বহি **কালসিন্ধু** পানে ধায় ফিরাব কেমনে ?'

—মাইকেল মধুসূদন

(৪) 'ধন্য, আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
আবার **সংসার-চক্র** ঘোরে নিরবধি ।' —নবীনচন্দ্র সেন

(৫) 'পুরাকালে তব তটে কত কত দেনা
ঐশ্বর্য কিরণে বিশ্ব করেছিল আলো ।' —বিহারীলাল চক্রবর্তী

(৬) '**সংসার-সমরাঙ্গনে** যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব ।' —হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) '**যৌবনেরি যৌবনে** সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি ।'—মোহিতলাল মজুমদার

(৮) '**আমি** কি তোমার **উপদ্রব**, **অভিশাপ**,
দুরদৃষ্ট, **দুঃস্বপ্ন**, **করলগ্ন কাঁটা** ?' —রবীন্দ্রনাথ

(৯) '**শোকের ঝড়** বহিল সভাতে ।' —মাইকেল মধুসূদন

(১০) 'কিয়ে করব কুল **দিবস দীপ** তুল পবনে ঘন ডোল ।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত **লাজক-জালে** আগোল ॥'—গোবিন্দদাস

[অষ্টম উদাহরণে 'আমি' উপমেয়-র সহিত অনেকগুলি উপমান—'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপ্ন' ও 'করলগ্ন-কাঁটা'-র অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে ।]

[ঘ] ব্যতিরেক

যেখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হয়, সেখানে **ব্যতিরেক-অলঙ্কার** হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যেমন—

[উৎকর্ষ বুঝাইতে] : (১) 'কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন ।' —মুকুন্দরাম

এখানে, (কালকেতুর) 'মুখ' এই উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তাহার কাছে 'ইন্দীবর'-(পদ্ম)-ও নিন্দালাভ করে ।

(২) 'বিম্বফল জিনিয়া কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজে জিনিয়া করী-শুণ্ড ॥' —চণ্ডীদাস

এখানে, উপমান 'বিম্বফল' অপেক্ষা উপমেয় 'ওষ্ঠ', এবং উপমান 'করী-শুণ্ড' (হাতির শুঁড়) অপেক্ষা উপমেয় 'ভুজ'-এর উৎকর্ষ বুঝাইতেছে ।

[অপকর্ষ বুঝাইতে] : (১) 'দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশ হইল তনু
তার তো নূতন নাহি হয়।'
—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

এখানে, 'শশধর' এই উপমান অপেক্ষা 'নরের তনু' এই উপমেয়ের অপকর্ষ বুঝাইতেছে।

(২) 'অরুণ-নয়ন বিজুরি-চমক বিতি
দগধল কুলবতী-লাজ।'—গোবিন্দদাস

এখানে, 'অরুণ নয়ন' এই উপমান অপেক্ষা 'বিজুরি চমক' এই উপমেয়ের অপকর্ষ বুঝাইতেছে।

['ব্যতিরেক'-অলঙ্কারের অন্যান্য উদাহরণ]

(ক) 'গতি জিনি' গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন॥ —মুকুন্দরাম

(খ) 'দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশ হইল তনু
আর তো নূতন নাহি রয়॥" —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(গ) 'কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।' —ভারতচন্দ্র

(ঘ) 'খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।' —কাশীরাম দাস

(ঙ) 'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন ;
সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদ, দেব, ছুটিতে পবন
পথে, কিন্তু ভয় নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কার !
কভু নাহি দেখি নর হেন ভয়ঙ্কর।' —মাইকেল মধুসূদন

(চ) 'তমাল জিনি বরণ তব
অঙ্গে মরকতের দ্যুতি।' —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[৬] সমাসোক্তি

যেখানে সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জীব-পদার্থে সজীব-পদার্থের আচরণ আরোপিত হয় সেখানে সমাসোক্তি-অলঙ্কার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন—(১) 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ-ভয়াল,
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।' —রবীন্দ্রনাথ

এখানে, নির্জীব 'বৈশাখ'-এ সজীব এক তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর সমান আচরণাদি আরোপিত হইয়াছে।

(২) 'ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে,
ঝিল্লির মঞ্জীরমালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।'
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

এখানে, নির্জীব 'সন্ধ্যা'-য় সজীব এক রমণীর সমান আচরণাদি আরোপিত হইয়াছে।

(৩) 'বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।' —রবীন্দ্রনাথ

এখানে, নির্জীব 'বসুন্ধরা'-য় সজীব মানবধর্মের সমান আচরণাদি আরোপিত হইয়াছে।

['সমাসোক্তি'-অলঙ্কারের অন্যান্য উদাহরণ]

(ক) 'নিদাঘ ভাস্কর
বরষি' অনলরাশি সহস্রকিরণ
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে শ্রান্ত কলেবর
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।' —নবীনচন্দ্র সেন

(খ) 'দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।' —রবীন্দ্রনাথ

(গ) 'আজ কোনো কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে

আজন্ম সাধন-ধন-সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে ব'স।' —রবীন্দ্রনাথ

(ঘ) 'অয়ি বরাঙ্গি শ্যামশোভনা
কানন-কুন্তলা চঞ্চলা।' —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(ঙ) 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।'
—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(চ) 'এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীখানি কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি' বক্ষে তাহার পড়ত লুটি'।'
—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনুশীলনী

১। অলঙ্কার বলিতে কী বুঝায়? বাংলা ভাষায় অলঙ্কার কয় শ্রেণীর? প্রধান অলঙ্কার-সমূহের নামোল্লেখ কর।

২। 'শ্লেষ' ও 'যমক' অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৩। সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও :—
অনুপ্রাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক ও উপমা।

৪। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহে কোথায় কোন্ অলঙ্কার হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর :—

(ক) 'কুসুমের বাস ছাড়ি কুসুমের বাস,
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(খ) 'ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুরভাষী;
মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর।' —মাইকেল মধুসূদন

(গ) 'সদা স্মরিব সত্যে, বরিব সত্যে, দূরিব মিথ্যা ভয়।' —কালিদাস রায়

(ঘ) 'দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী।' —হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঙ) 'চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।'
—মোহিতলাল মজুমদার

(চ) 'যদিও সকল হাস্য ফেন-পুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথাসিন্ধু দোলে।' —প্রেমেন্দ্র মিত্র

(ছ) 'তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।' —রবীন্দ্রনাথ

(জ) 'তোমাদের পুরুষদের হাতে ইস্পাত, আমাদের নারীর হাতে লোহা।'
—বীরবল

(ঝ) 'যত তাপস বালক শিশির সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক, ভক্তি অশ্রু ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা।' —রবীন্দ্রনাথ

(ঞ) 'সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে।' —বঙ্কিমচন্দ্র

(ট) 'আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।'—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(ঠ) 'এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাকঢোল। বাংলা সংবাদপত্র কাঁসিদার।' —বঙ্কিমচন্দ্র

(ড) 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা
গীতিময় তরুলতিকা—
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।' —রবীন্দ্রনাথ

(ঢ) 'কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।' —চণ্ডীদাস

(ণ) 'শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দুর্বাদলে দীপ জ্বলে।' —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রচনা-বিতান

[চতুর্থ খণ্ড]

পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ

PRE
UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

॥ পদ্যাংশ ॥

(ক) ফুল্লরার বারমাস্যা ঃ (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

সন্ধি ঃ নিরামিষ = নির্ + আমিষ। সিতাসিত = সিত + অসিত। কুজ্ঝটী = কুৎ + ঝটী। দুর্গতি = দুঃ + গতি।

সমাস ঃ দুঃখ-বাণী = দুঃখের বাণী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। তালপাতার = তালের পাতা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহার। তরুতল = তরুর তল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। নিরামিষ = নির্ (নাই) আমিষ যাহা (নঞ্ তৎপুরুষ বা বহুব্রীহি)। রবিকর = রবির কর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। নব-মেঘে = নব যে মেঘ (উপমান কর্মধারয়) তাহাতে। গৃহস্থ = গৃহে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। দিবসরজনী = দিবস ও রজনী (দ্বন্দ্ব)। সিতাসিত = সিত ও অসিত (দ্বন্দ্ব)। অভাগ্য = অ (মন্দ) ভাগ্য যাহার (বহুব্রীহি)। নদনদী = নদ ও নদী (দ্বন্দ্ব)। কিরাতনগর = কিরাতের দ্বারা অধ্যুষিত যে নগর (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বন্ধুজন = বন্ধু যে জন (কর্মধারয়)। জগজনে = জগের (জগতের) জন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহার দ্বারা। বলিদানে = বলির নিমিত্ত দান (নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ), তাহাতে। প্রসাদ-মাংস = প্রসাদের মাংস (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। টানাটানি = টানের সহিত যে টান জাতীয় ব্যাপার (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। মার্গশীর্ষ = মার্গের শীর্ষ যে মাস, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ (বহুব্রীহি)। বনিতা-জনম = বনিতা রূপ জনম (রূপক কর্মধারয়)। ধূলিভয়ে = ধূলির ভয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। কুজ্ঝটী = কুৎ অর্থাৎ কুৎসিত যে ঝটী বা ঝটিকা (কর্মধারয়)।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) বাচ্য ঃ পাপিষ্ঠ = পাপ + ইষ্ঠ প্রত্যয়। দহন = দহ্ + অন্ (<অনট্), ভাববাচ্যে। অবধান = অব-ধা + অন্ (<অনট্), ভাববাচ্যে। বৃষ্টি = বৃষ্ + ক্তি, ভাববাচ্যে। নিবারণ = নি-বৃ + ণিচ্ + অন্ (<অনট্), ভাববাচ্যে। বিধি = বি-ধা + ক্বিপ্, কর্তৃবাচ্যে (নিপাতনে)। গোঠে = গোষ্ঠে > গোট্‌ঠে > গোঠে। উদর = উৎ-ঋ + অচ্, কর্তৃবাচ্যে। ভক্ষ্য = ভক্ষ্ + ণ্যৎ, কর্মবাচ্যে। পরিত্রাণ = পরি—ত্রৈ (বা ত্রা) + অন্ (<অনট্), ভাববাচ্যে। তনূনপাৎ (অগ্নি) = তনূ-নঞ্-পত্ + ণিচ্ + ক্বিপ্, কর্তৃবাচ্যে। শয়নে = শী + অন (<অনট্), ভাববাচ্যে—শয়ন, তাহাতে 'এ'। নয়ন = নী + অন (<অনট্), করণবাচ্যে। আঁধারে = আঁধার (<অন্ধআর < অন্ধকার) + এ। মৃগ = মৃগ্ + ক, কর্মবাচ্যে। বিপাক = বি-পচ্ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। উপবাস = উপ-বস্ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। মাটিয়া = মাটি + আ, তু° মেটে। ব্যাধিনী = ব্যাধ্ + ইনী (স্ত্রী)। মধুকর = মধু + কৃ + ট, কর্তৃবাচ্যে। চইতের = চইত (<চৈত্ত < চৈত্র) + এর। বিদ্যমান = বিদ্ + শানচ্, কর্তৃবাচ্যে।

শব্দসম্ভার ঃ [দেশী শব্দ] কুঁড়ে ঘর, ছাউনি, ভেরেণ্ডা, থাম (তু° থাম<স্তম্ভ), খরা, পসরা (পশরা), এড়িয়া (এড়াইয়া), আধা, খুদকুঁড়া, জোঁক, বান (তু° বন্যা), বাদল, ছড়, পাথর (<পত্থর<প্রস্তর), চইত (চৈত), আমানি। [হিন্দী] উধার (ঋণ), মাটিয়া (তু° গির্‌মাটিয়া), পিরাণ (পির্‌হান), দোপাটা (দোপাট্টা)।

স্বরভক্তি (বিপ্রকর্ষ) ঃ বরিষে (বর্ষে), নিরমিল (নির্মিল), বরিষয়ে, (বর্ষয়ে), বনিতাজনম (বনিতাজন্ম)।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
দুঃখ	দুঃখিত	বৈশাখ	বৈশাখী
বিষ	বিষময়, বিষাক্ত	নিরামিষ	নিরামিষাশী
জল	জলীয়, জোলো	ফল	ফলন্ত, ফলারে
উপবাস	উপবাসী	মেঘ	মেঘলা
মাংস	মাংসল	দোষ	দোষী
বান	বেনো	মাস	মাসিক
বাদল	বাদলা	ভার	ভারী
অবধান	অবহিত	পূজা	পূজিত, পূজ্য
হিম	হিমেল	বিধি	বৈধ
নিবারণ	নিবারিত	শীত	শীতল
তৈল	তৈলাক্ত	শয়ন	শায়িত
অংশ	আংশিক	গান	গীত

প্রতিশব্দ ঃ অনল—তনূনপাৎ, অগ্নি, আগুন, বৈশ্বানর, হুতাশন, পাবক। তরু—গাছ, বৃক্ষ, অটবী। রবি—সূর্য, তপন, ভানু দিবাকর, ভাস্কর, মার্তণ্ড। কিরণ—কর, রশ্মি, অংশু। মহী—পৃথিবী, ক্ষিতি, অবনী, ধরণী, ভূ, পৃথ্বী। বন্ধু—মিত্র, সুহৃৎ, সখা।

বিপরীত-শব্দ ঃ ধীরে ধীরে—জোরে জোরে। দুঃখ—সুখ। ভাঙ্গা—আস্ত, গোটা। বিষ—অমৃত। নিরামিষ—আমিষ। বড় বড়—ছোট ছোট। দোষী—নির্দোষ। লঘু—গুরু। দুরন্ত—শান্ত। বন্ধু—শত্রু। উত্তম—অধম। আদরে—অনাদরে। জনম—মরণ।

অলংকার ঃ অনুপ্রাস ঃ (১) হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।
(২) জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
(৩) তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপনে।
(৪) মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥

উপমা ঃ (১) বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
(২) অনলসমান পোড়ে চইতের খরা।

(খ) বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড় (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

সন্ধি : বৃত্রাসুর = বৃত্র + অসুর। আচ্ছাদিয়া = আ + ছাদিয়া। অস্তোদয় = অস্ত + উদয়। উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল। বিস্তীর্ণ = বিঃ + তীর্ণ। চতুর্দিকে = চতুঃ + দিকে। অহরহঃ = অহঃ + অহঃ। অহর্নিশ = অহঃ + নিশ (<নিশা)। সভাসীন = সভা + আসীন। নির্ভয় = নিঃ + ভয়। অস্ত্রাঘাতে = অস্ত্র + আঘাতে। দুর্নিবার = দুঃ + নিবার। তিরস্কৃত = তিরঃ + কৃত। নিস্তব্ধ = নিঃ + তব্ধ। বিস্তারে = বিঃ + তারে। ইন্দ্রাস্ত্র = ইন্দ্র + অস্ত্র। কৃতাঞ্জলি = কৃত + অঞ্জলি। দৈত্যকুলেশ্বর = দৈত্য-কুল + ঈশ্বর। যশোভাগী = যশঃ + ভাগী। উপার্জন = উপ + অর্জন। যশোদীপ = যশঃ + দীপ। পুনর্বার = পুনঃ + বার। যশোলিপ্সা = যশঃ + লিপ্সা। উদ্দীপ্ত = উৎ + দীপ্ত। দনুজেশ্বর = দনুজ + ঈশ্বর। যশোরশ্মি = যশঃ + রশ্মি। অদ্যাপি = অদ্য + অপি। গঙ্গোত্রী = গঙ্গা + উত্রী (উত্তরতি)। প্রত্যাগত = প্রতি + আগত। প্রোজ্জ্বল প্র + উৎ + জ্বল। উত্থিত = উৎ + স্থিত। পিত্রাদেশে = পিতৃ + আদেশে। দৈত্যেশ্বর = দৈত্য + ঈশ্বর।

সমাস : ইন্দ্রপুরী = ইন্দ্রের পুরী (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। দেব-অনীকিনী = দেবের অনীকিনী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। চৌদিকে = চতুঃ দিকের সমাহার (দ্বিগু), তাহাতে। সাগর-সিকতা = সাগরের সিকতা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অস্তোদয় = অস্ত ও উদয় (দ্বন্দ্ব)। গিরিশৃঙ্গ = গিরির শৃঙ্গ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ভীষণদর্শন = ভীষণ দর্শন যাহার (উপপদ তৎপুরুষ)। সিংহনাদ = সিংহের নাদ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সমরবহ্নি = সমররূপ বহ্নি (রূপক কর্মধারয়)। সুদৃঢ়সঙ্কল্প = সুদৃঢ় সঙ্কল্প (কর্মধারয়)। সভাসীন = সভায় আসীন যে (উপপদ তৎপুরুষ)। মত্তমাতঙ্গ = মত্ত যে মাতঙ্গ (কর্মধারয়)। চিররণজয়ী = চিরকাল ব্যাপিয়া রণ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ), তাহা জয় করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। বসুন্ধরাবাসীগণ = বসুন্ধরায় বাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ), তাহাদের গণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। যশোবিমণ্ডিত = যশের দ্বারা বিমণ্ডিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অস্ত্রধারী = অস্ত্র ধারণ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। অনন্ত = নাই অন্ত যাহার (বহুব্রীহি)। সন্দেশবহ = সন্দেশের বহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মঙ্গলবারতা = মঙ্গলরূপ বারতা (রূপক কর্মধারয়)। তড়িৎ-গমনা = তড়িতের ন্যায় গমনা (উপমান কর্মধারয়)। ক্ষুণ্ণমতি = ক্ষুণ্ণ মতি যাহার (উপপদ তৎপুরুষ)।

কারক ও বিভক্তি : প্রদীপ্ত 'ভানুতে'—করণে সপ্তমী। 'প্রভায়' উজ্জ্বল—করণে সপ্তমী। কখন 'বসুন্ধরা' যুদ্ধে করি জয়—কর্মে প্রথমা (শূন্যবিভক্তি)। 'চিত্তে' মম—অধিকরণে সপ্তমী। 'শিরে' শুনিয়া—করণকারকে সপ্তমী। 'ভারতী'—কর্মকারকে প্রথমা (শূন্যবিভক্তি)। দেবসৈন্যদলে—করণে সপ্তমী। নির্ভয়ে—করণে সপ্তমী।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) : বাচ্য : প্রদীপ্ত = প্র-দীপ + ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। সন্নিহিত = সম-নি-ধা + ক্ত, কর্মবাচ্যে। দৈত্য = দিতি + ষ্ণ্য। দনুজ = দনু + জন্ + ড। দানব

কারক ও বিভক্তি ঃ কর্তায় প্রথমা—ঝংকারিছে 'বীণা'। কর্মকারকে সপ্তমী—বসুধারে। করণে সপ্তমী—কেতকীর 'বাসে'।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ ম্লান = ম্লৈ + ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। বিগলিত = বি-গল্ + ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। সঞ্চিত = সম্-চি + ক্ত, কর্মবাচ্যে। বসুন্ধরা = বসু-ধৃ + ণিচ্ + খচ্, কর্তৃবাচ্যে + আপ্। প্রকৃতি = প্র-কৃ + ক্তি, করণবাচ্যে। রূপসী < রূপীয়সী।

ব্যাকরণসঙ্গত শব্দ ঃ শ্যামাঙ্গিণী (অশুদ্ধ)—শ্যামাঙ্গী (শুদ্ধ)। চাতকিনী (অশুদ্ধ)—চাতকী (শুদ্ধ)। গৌরাঙ্গিণী (অশুদ্ধ)—গৌরাঙ্গী (শুদ্ধ)। রূপসী (অশুদ্ধ)—রূপবতী (শুদ্ধ)।

স্বরভক্তি (বিপ্রকর্ষ) ঃ বরষা (বর্ষা); পরশা (স্পর্শা)।

বিপরীত শব্দ ঃ শ্যামাঙ্গিণী—গৌরাঙ্গিণী। ম্লান—অম্লান, উজ্জ্বল। অমৃত—গরল। আদরে—অনাদরে। যত্নে—অযত্নে, অবহেলায়। তিমিরে—আলোকে।

কবিতায় ব্যবহৃত ফুলের নাম ঃ নীপ, যূথিকা, গোলাপ, অশোক, কর্ণিকা, কমল, শেফালিকা, ঝুমকা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, হাস্না-হানা (হাস্নু-হেনা), কেতকী, বকুল, রজনীগন্ধা।

অলংকার ঃ (সমাসোক্তি) ঃ 'অয়ি শ্যামাঙ্গিনি ধনি, অয়ি বর্ষা করুণারূপিণী
ম্লান নেত্রে দরদর বিগলিত একি বারি ঝরে'।
(উৎপ্রেক্ষা) ঃ 'বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আহা হ'য়ে উন্মাদিনী।
(অনুপ্রাস) ঃ জাগায়েছে **অ**ঙ্গে **অ**ঙ্গে **অ**পরূপ **অ**পূর্ব পুলক!

(৬) কৃষ্ণা রজনী (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

সমাস ঃ প্রখরঝটিকামুখর = প্রখর যে ঝটিকা (কর্মধারয়), প্রখরঝটিকা দ্বারা মুখর (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। মৃতপতিদেহ = মৃত যে পতি (কর্মধারয়), মৃতপতির দেহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। ধূলিলুণ্ঠিতা = ধূলিতে লুণ্ঠিত যে স্ত্রী (বহুব্রীহি)। চণ্ডালবেশী = চণ্ডালের ন্যায় বেশ আছে যাহার (বহুব্রীহি)। বনমর্মর = বনের মর্মর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বনমাঝ = বনের মাঝ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। বদনশতদলে = বদন যে শতদলের ন্যায় (উপমান কর্মধারয়), তাহাতে।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ গর্জন = গর্জ + অনট্, ভাববাচ্যে। দেহ = দিহ্ + ঘঞ্, কর্মবাচ্যে। লুণ্ঠিতা = লুণ্ঠ + ক্ত, কর্মবাচ্যে স্ত্রী আপ্। কালিমা = কাল + ইমন্ ভাবে।

কারক ও বিভক্তি ঃ শিয়রে—অধিকরণ কারকে সপ্তমী। তুনয়ন—কর্মে দ্বিতীয়া। বনমর্মরে—করণে সপ্তমী। মত্ত 'পবনে'—করণে সপ্তমী। বরুণরাজ্য—কর্তায় প্রথমা। মৃতপতিদেহ—কর্মকারকে প্রথমা।

অলংকার ঃ (অনুপ্রাস) ঃ '**শি**য়রে **শ**মন **ক**ত **ক**থা বলে
দমকে **দা**মিনী বারেবারে।'

(চ) ফরিয়াদ (কাজী নজরুল ইসলাম)

সন্ধি : নীরক্ত = নিঃ + রক্ত। স্বাধীন = স্ব + অধীন। উত্থান = উৎ + স্থান।

সমাস : ধূলিমাখা = ধূলির দ্বারা মাখা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অসহায় = নাই সহায় যাহার (নঞর্থক বহুব্রীহি)। আদিপিতা = আদি যে পিতা (কর্মধারয়)। সৃষ্টি-শিয়রে = সৃষ্টির শিয়রে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। দুখদীপ = দুখ রূপ দীপ (রূপক কর্মধারয়); বা দুখের দীপ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। প্রভাতসন্ধ্যা = প্রভাত ও সন্ধ্যা (দ্বন্দ্ব)। বাসে-ভরা = বাস দ্বারা ভরা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। রসে-ভরা = রস দ্বারা ভরা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। কাটাকাটি = পরস্পরকে কাটিবার জন্য বা কাটিয়া যে যুদ্ধ (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। মহারণী = মহান্ যে রণী (কর্মধারয়)। বেহায়া = হায়া নাই যার (বহুব্রীহি)। মহামহীয়ান = মহান্ মহীয়ান্ (কর্মধারয়)। নীরক্ত = নাই রক্ত যাহার (বহুব্রীহি)। শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার (দ্বিগু)। সৃজনদিন = সৃজনের দিন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। কারা-প্রাচীর = কারার প্রাচীর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মুক্ত-কণ্ঠে = মুক্ত যে কণ্ঠ (কর্মধারয়), তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি : 'দুঃখদীপ' নিয়া—কর্মে প্রথমা। 'বিস্ময়ে' মরি—করণে সপ্তমী। সৃষ্টিশিয়রে—অধিকরণে সপ্তমী। মুড়েছ 'মরকতে'—করণে সপ্তমী। সৃজিলে 'মানবে'—কর্মে সপ্তমী। রবি-শশি-'দীপে'—করণে সপ্তমী। ধরণীরে—কর্মে দ্বিতীয়া। 'ঈর্ষায়' মাতি—করণে সপ্তমী। মুখের 'গ্রাস'—কর্মে প্রথমা।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) : বাচ্য : প্রতিকার = প্রতি-কৃ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। ভগবান = ভগ + বতুপ্, অস্ত্যর্থে। বিস্ময়ে = বি-স্মি + অচ্, ভাববাচ্যে। মহীয়ান্ = মহৎ + ঈয়স্। বীজন = বিজ্ + অনট্, ভাববাচ্যে। অধিকার = অধি-কৃ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। আনন্দ = আ-নন্দ্ + অচ্। ঈর্ষা = ঈর্ষ্ + অ, স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'। ধড়িবাজ = ধড়ি + বাজ। অভিযান = অভি-যা + অন, ভাববাচ্যে। বিজ্ঞান = বি-জ্ঞা + অনট্, ভাববাচ্যে। প্রতিবিধান = প্রতি-বি-ধা + অনট্, ভাববাচ্যে। অবনত = অব-নম্ + ক্ত, কর্তৃবাচ্যে।

লিঙ্গান্তর : ভগবান—ভগবতী। মহীয়ান্—মহীয়সী। ভীতা—ভীত। কনিষ্ঠা—কনিষ্ঠ। ময়ূর—ময়ূরী। বলবান—বলবতী। নিপীড়িত—নিপীড়িতা।

বিদেশী শব্দ : ফরমান্, শয়তান, গোলাগুলি, কামান, ডাকু, আইন, গর্দান।

অলংকার : (রূপক) : "আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া"

(উপমা) : (১) "ময়ূরের মত কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া—"

(২) "জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়।"

(৩) "সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।"

(অনুপ্রাস) : (১) "'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে
'মার্ মার্!'"

(২) "জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!"

॥ গদ্যাংশ ॥

(ক) ললিতগিরি ঃ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সন্ধি ঃ পর্বতারোহণ = পর্বত + আরোহণ। সমুদ্রাভিমুখে = সমুদ্র + অভিমুখে। মনোমোহিনী = মনঃ + মোহিনী। হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ। পুষ্পমাল্যাভরণ = পুষ্প-মাল্য + আভরণ। স্ফুরিতাধরা = স্ফুরিত + অধরা। গাত্রোত্থান = গাত্র + উত্থান। দুর্ভাগ্য = দুঃ + ভাগ্য। নিরীক্ষণ = নিঃ + ঈক্ষন্। বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি। পুরুষোত্তম = পুরুষ + উত্তম। বাক্যালাপ = বাক্য + আলাপ। বহির্গত = বহিঃ + গত।

সমাস ঃ স্বচ্ছসলিলা = স্বচ্ছ সলিল যাহার সে (অর্থাৎ সেই নদী) (বহুব্রীহি)। সমুদ্রাভিমুখে = সমুদ্রের অভিমুখ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহাতে। তালবৃক্ষশোভিত = তালের বৃক্ষ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তালবৃক্ষ দ্বারা শোভিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। সর্বাঙ্গসুন্দরী = সর্ব অঙ্গ (কর্মধারয়), সর্বাঙ্গ হইয়াছে সুন্দর যাহার সে (বহুব্রীহি)। পর্বতারোহণ = পর্বতকে আরোহণ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। পৃথিবীদর্শন = পৃথিবীকে দর্শন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। মৃত্তিকাপ্রোথিত = মৃত্তিকাতে প্রোথিত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। ভগ্নগৃহাবশিষ্ট = ভগ্ন গৃহ (কর্মধারয়), ভগ্নগৃহের অবশিষ্ট (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মনোমুগ্ধকর = মনকে মুগ্ধ করে যাহা (বহুব্রীহি)। প্রস্তরগঠিত = প্রস্তর দ্বারা গঠিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। পুতুল-গড়া = পুতুলকে গড়া (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত = পুষ্প দ্বারা নির্মিত মাল্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ), পুষ্পমাল্যের আভরণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), পুষ্পমাল্যাভরণ দ্বারা ভূষিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য = বিকম্পিত চেলাঞ্চল (কর্মধারয়), বিকম্পিতচেলাঞ্চল দ্বারা প্রবৃদ্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ), বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ যে সৌন্দর্য (উপপদ তৎপুরুষ)। কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা = কোপ প্রেম (কর্মধারয়), কোপপ্রেমের গর্ব (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), কোপপ্রেমগর্ব ও সৌভাগ্য (দ্বন্দ্ব), কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্য দ্বারা স্ফুরিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ), কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিত অধর যাহার (বহুব্রীহি)। চীনাম্বরা = চীন অম্বর (কর্মধারয়), চীনাম্বর পরিহিতা যিনি (বহুব্রীহি)। তরলিতরত্নহারা = তরলিত রত্ন (কর্মধারয়), তরলিতরত্নহার পরিহিতা যিনি (বহুব্রীহি)। পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা = পীবর যৌবন (কর্মধারয়), পীবরযৌবনের ভার (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), পীবরযৌবনভারের দ্বারা অবনত (তৃতীয়া তৎপুরুষ), পীবরযৌবনভারাবনত যে দেহ তিনি (বহুব্রীহি)। মহাত্মা = মহান্ আত্মা (কর্মধারয়)। ধ্যানভঙ্গ = ধ্যানকে ভঙ্গ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। তালপত্রলিখিত = তালপত্রে লিখিত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। সময়ান্তরে = অন্য সময় (নিত্য সমাস) তাহাতে।

কারক ও বিভক্তি ঃ 'কপালে' আছে—অধিকরণে সপ্তমী। 'স্ত্রীমূর্তি' যাহারা গড়িয়াছে—কর্মে প্রথমা। 'জন্মগ্রহণ' করিয়া—কর্মকারকে প্রথমা তোমার 'অদৃষ্টে'—অধিকরণে সপ্তমী। 'দুর্ভাগ্য' দেখিতেছেন—কর্মে প্রথমা।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) : বাচ্য : অতিশয় = অতি-শী অচ্, কর্তৃবাচ্যে। শোভাময় = শোভা + ময়ট্। উপস্থিত = উপ-স্থা + ক্ত, কর্মবাচ্যে। আধুনিক = অধুনা + ইক, ভাবার্থে। নির্দেশ = নিঃ-দিশ্ + ঘঞ্। বর্তমান = বৃৎ + শানচ্। সন্দর্শন = সম্-দৃশ + অন্। ধ্যানস্থ = ধ্যান-স্থা + ক, কর্তৃবাচ্যে।

বাচ্য পরিবর্তন : (কর্তৃবাচ্য) আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি।
(কর্মবাচ্য) আমার দ্বারা যাহা দৃষ্ট হইয়াছে তাহাই লেখা হইতেছে।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর : আরোহণ (বি), আরোহিত (বিণ)। অতিশয় (বিণ), আতিশয্য (বি)। শোভিত (বিণ), শোভা (বি)। গঠিত (বিণ), গঠন (বি)। অলঙ্কার (বি), অলঙ্কৃত (বিণ)। লোপ (বি), লুপ্ত (বিণ)। সুন্দর (বিণ), সৌন্দর্য (বি)। সমাপন (বি), সমাপ্ত (বিণ)। আদেশ (বি), আদিষ্ট (বিণ)। সমাবেশ (বি), সমাবিষ্ট (বিণ)। গমন (বি), গত (বিণ)। নির্দেশ (বি), নির্দিষ্ট (বিণ)। বহির্গত (বিণ), বহির্গমন (বি)।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সন্ধি : আবির্ভূত = আবিঃ + ভূত। সর্বাপেক্ষা = সর্ব + অপেক্ষা। উদ্ভূত = উৎ + ভূত। সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়। মহোৎসব = মহা + উৎসব। সারোদ্ধার = সার + উদ্ধার। বিদ্বজ্জন = বিদ্বৎ + জন। সমুজ্জ্বল = সম্ + উজ্জ্বল। অত্যুন্নতি = অতি + উন্নতি। সর্বতোভাবে = সর্বতঃ + ভাবে। জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ + ময়। ব্রতানুষ্ঠানের = ব্রত + অনুষ্ঠানের। নিষ্ক্রমণ = নিঃ + ক্রমণ। নিম্নাসনে = নিম্ন + আসনে।

সমাস : সুধাভাণ্ড = সুধার ভাণ্ড (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সাহিত্যভূমি = সাহিত্যের ভূমি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সৌভাগ্যক্রমে = সৌভাগ্যের ক্রম যাহাতে (বহুব্রীহি)। অনভ্যস্ত = ন অভ্যস্ত (নঞ্ তৎপুরুষ)। হৃৎপদ্ম = হৃদয় পদ্মের ন্যায় (উপমিত কর্মধারয়)। বালক-ভুলানো = বালককে ভুলানো (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। বিরহমিলন = বিরহ ও মিলন (দ্বন্দ্ব)। নবযৌবনপ্রাপ্ত = নব যৌবন (কর্মধারয়), নব যৌবনকে প্রাপ্ত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। শ্রদ্ধাসহকারে = শ্রদ্ধাসহকার যাহাতে (বহুব্রীহি)। শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ = শিক্ষিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। প্রতিভাহীন = প্রতিভা দ্বারা হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বালির বাঁধ = বালির বাঁধ (অলুক তৎপুরুষ)। চিন্তাজাত = চিন্তা হইতে জাত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। অনাদর-মলিন = অনাদর দ্বারা মলিন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। স্নেহপালিত = স্নেহের দ্বারা পালিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। আত্মসমাহিত = আত্মা হইয়াছে সমাহিত যাহার তিনি (বহুব্রীহি)। লোকবিশ্রুত = লোকের দ্বারা বিশ্রুত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ = মধ্যাহ্নের রৌদ্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহার দ্বারা দগ্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। জড়ত্বশাপ = জড়ত্ব রূপ শাপ (রূপক কর্মধারয়)। সুহৃদ = সু হৃদয় যাহার (বহুব্রীহি)।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ অভ্যর্থনা = অভি-অর্থ + অন্, ভাববাচ্যে—আপ্। বিদ্বেষ = বি-দ্বিষ্ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। প্রভাব = প্র-ভূ + ঘঞ্। বিচ্ছিন্ন = বি-ছিদ্ + ক্ত, কর্মবাচ্যে। অনুভূত = অনু-ভূ + ক্ত। প্রবাহ = প্র-বহ্ + ঘঞ্। অপরিচিত = নঞ্-পরি-চি + ক্ত, কর্মবাচ্যে। অনুভব = অনু-ভূ + অল্, ভাববাচ্যে। উপনীত = উপ-নী + ক্ত, কর্মবাচ্যে। বিস্মৃত = বি-স্মৃ + ক্ত, ভাববাচ্যে।

বিপরীত শব্দ ঃ নবীন—প্রবীণ, প্রাচীন। বিচ্ছিন্ন—সংযুক্ত। প্রবল—মন্দ, দুর্বল। দৃঢ়—শ্লথ। গৌরব—লাঘব। উন্নতি—অবনতি। চঞ্চল—স্থির। বৃদ্ধি—হ্রাস। অস্তমিত—উদিত।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর ঃ আবির্ভূত (বিণ), আবির্ভাব (বি)। অভ্যর্থনা (বি), অভ্যর্থিত (বিণ)। উপহাস (বি), উপহসিত (বিণ)। বিদ্বেষ (বি), বিদ্বিষ্ট (বিণ)। অনুকরণ (বি), অনুকৃত (বিণ)। উদ্ভূত (বিণ), উদ্ভব (বি)। প্রভাব (বি), প্রভাবিত (বিণ)। অনভ্যস্ত (বিণ), অনভ্যাস (বি)। উদ্ঘাটিত (বিণ), উদ্ঘাটন (বি)। সমালোচনা (বি), সমালোচিত (বিণ)। জাগ্রত (বিণ), জাগরণ (বি)। হিল্লোলিত (বিণ), হিল্লোল (বি)। নৈরাশ্য (বি), নিরাশ (বিণ)। সমাগম (বি), সমাগত (বিণ)। স্মৃতি (বি), স্মার্ত (বিণ)। অতিক্রম (বি), অতিক্রান্ত (বিণ)। সমাজ (বি), সামাজিক (বিণ)। গৌরব (বি), গৌরবান্বিত (বিণ)। জ্ঞান (বি), জ্ঞাত (বিণ)। স্বপ্ন (বি), স্বপ্নালু (বিণ)। ইচ্ছা (বি), ঐচ্ছিক (বিণ)। দৈন্য (বি), দীন (বিণ)। স্ফীত (বিণ), স্ফীতি (বি)। পরিত্যাগ (বি), পরিত্যক্ত (বিণ)। নিয়োগ (বি), নিযুক্ত (বিণ)। প্রলোভন (বি), প্রলুব্ধ (বিণ)। প্রেরণ (বি), প্রেরিত (বিণ)। বিশ্বাস (বি), বিশ্বস্ত (বিণ)। অনুগ্রহ (বি), অনুগৃহীত (বিণ)। অর্পণ (বি), অর্পিত (বিণ)। প্রস্ফুটিত (বিণ), প্রস্ফুটন (বি)। উৎকর্ষ (বি), উৎকৃষ্ট (বিণ)। নিন্দা (বি), নিন্দিত (বিণ)। কঠিন (বিণ), কাঠিন্য (বি)। শৈথিল্য (বি), শিথিল (বিণ)। স্পর্ধা (বি), স্পর্ধিত (বিণ)। ইতরতা (বি), ইতর (বিণ)। দান (বি), দত্ত (বিণ)। যথার্থ (বিণ), যাথার্থ্য (বি)। ধারণ (বি), ধৃত (বিণ)। ভ্রান্ত (বিণ), ভ্রম (বি)। উপেক্ষিত (বিণ), উপেক্ষা (বি)। মোচন (বি), মুক্ত (বিণ)। সঞ্জীবিত (বিণ), সঞ্জীবন (বি)।

(গ) শুভ উৎসব (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সন্ধি ঃ ফলাহার = ফল + আহার। মর্যাদানুসারে = মর্যাদা + অনুসারে। উৎসবাঙ্গ = উৎসব + অঙ্গ। কর্মোপলক্ষে = কর্ম + উপলক্ষে। ভোজনান্ত = ভোজন + অন্ত। শুভানুষ্ঠান = শুভ + অনুষ্ঠান। একান্ন = এক + অন্ন। গোষ্ঠাষ্টমী = গোষ্ঠ + অষ্টমী। তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত। তাড়িতালোক = তাড়িত + আলোক। যজ্ঞোপবীত = যজ্ঞ + উপবীত। বাহ্যাড়ম্বর = বাহ্য + আড়ম্বর।

সমাস ঃ দেনাপাওনা = দেনা ও পাওনা (দ্বন্দ্ব)। হিসাবী = হিসাব আছে যাহার (বহুব্রীহি)। ফলাহার = ফলের আহার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা = কাংস্য ও পিত্তল (দ্বন্দ্ব) তাহার বিক্রেতা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। খরিদ-বিক্রয় = খরিদ ও বিক্রয় (দ্বন্দ্ব)। কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। নীলাম্বরী = নীল অম্বর যে স্ত্রীর (বহুব্রীহি)। মধ্যাহ্নভোজনান্তে = মধ্যাহ্নকালীন ভোজন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) তাহার অন্তে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। হাস্যপরিহাস = হাস্য ও পরিহাস (দ্বন্দ্ব)। বিধিব্যবস্থা-নির্ধারণ = বিধি ও ব্যবস্থা (দ্বন্দ্ব) তাহাদের নির্ধারণ (ষষ্ঠীতৎ)।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ পুরাতন = পুরা + তন, ভাবার্থে। উৎসব = উৎ-সু + অল, ভাববাচ্যে। কুম্ভকার = কুম্ভ + কৃ + অন, কর্তৃবাচ্যে। শালওয়ালা = শাল + ওয়ালা। কাশ্মীরী = কাশ্মীর + ঈ। সদালোচনা = সদ্-আ-লোচ্ + ণক কর্তৃবাচ্যে + আপ্। ভিক্ষুক—ভিক্ষু + কণ্ স্বার্থে। বেনারসী = বেনারস + ঈ।

বিপরীত শব্দ ঃ পুরাতন—নূতন। সূক্ষ্ম—স্থূল। প্রসন্ন—বিষণ্ণ। বৃহৎ—ক্ষুদ্র। ক্ষুণ্ণ—অক্ষুণ্ণ। ঐশ্বর্য—দারিদ্র্য। শুভ—অশুভ। অন্তরে—বাহিরে। বাহ্য—আভ্যন্তরীণ।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর ঃ সভ্যতা (বি), সভ্য (বিণ)। বিচিত্র (বিণ), বৈচিত্র্য (বি)। বিলুপ্ত (বিণ), বিলোপ (বি)। আপিসী (বিণ), আপিস (বি)। হিসাবী (বিণ), হিসাব (বি)। কাশ্মীরী (বিণ), কাশ্মীর (বি)। যোগ (বি), যুক্ত (বিণ)। প্রসন্নতা (বি), প্রসন্ন (বিণ)। সমর্থ (বিণ), সামর্থ্য (বি)। সঞ্চারিত (বিণ), সঞ্চার (বি)। প্রীতি (বি), প্রীত (বিণ)। বাহুল্য (বি), বহুল (বিণ)।

অলংকার ঃ (অনুপ্রাস) (১) **অ**নেক সময়ে **অ**ত্যন্ত **অ**শোভন ও **অ**সঙ্গত বলিয়া ঠেকে।
(২) **আ**মার **আ**নন্দে সকলের **আ**নন্দ হউক।

(ঘ) অভাগীর স্বর্গ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সন্ধি ঃ আচ্ছাদিত = আ + ছাদিত। মুখোপাধ্যায় = মুখ + উপাধ্যায়। শোকার্ত = শোক + ঋত। স্বর্গারোহণ = স্বর্গ + আরোহণ। নিরীক্ষণ = নিঃ + ঈক্ষণ। অধিকাংশ = অধিক + অংশ। বিচ্ছেদ = বি + ছেদ।

সমাস ঃ সঙ্গতিপন্ন = সঙ্গতি দ্বারা পন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বহুমূল্য = বহু মূল্য যাহার (বহুব্রীহি)। চন্দনেচর্চিত = চন্দন দ্বারা চর্চিত (অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ)। পুত্রহস্ত = পুত্রের হস্ত (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। মন্ত্রপূত = মন্ত্রের দ্বারা পূত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। সদ্যপ্রজ্বলিত = সদ্যঃ প্রজ্বলিত (সুপ্ সুপা)। প্রসন্নমুখে—প্রসন্ন মুখ যাহাতে (বহুব্রীহি)। শশব্যস্ত = শশের ন্যায় ব্যস্ত (উপমিত কর্মধারয়)। অশনবসন = অসন ও বসন (দ্বন্দ্ব)।

কারক ও বিভক্তি ঃ ধানের 'কারবারে'—করণে সপ্তমী। চন্দনেচর্চিত—করণে তৃতীয়া। ছ্যাখ ছ্যাখ বাবা—সম্বোধনে প্রথমা। মায়ের 'বুক' ঘেঁষিয়া—কর্মে প্রথমা।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ চর্চিত = চর্চ + ক্ত, কর্মবাচ্যে। আচ্ছাদিত = আ-ছদ্ + ণিচ্ + ক্ত, কর্মবাচ্যে। উপস্থিত = উপ-স্থা + ক্ত। আলোড়িত = আ-লুড্ + ণিচ্ + ক্ত, কর্মবাচ্যে। সৌভাগ্য = সুভগ + ষ্ণ্য। প্রতিবাদ = প্রতি-বদ্ + ঘঞ্। সুযোগ = সু-যুজ্ + ঘঞ্।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর ঃ অতিশয় (বিণ)—আতিশয্য (বি)। মেয়ে (বি)—মেয়েলি (বিণ)। আচ্ছাদিত (বিণ)—আচ্ছাদন (বি)। সঞ্চিত (বিণ)—সঞ্চয় (বি)। আরোহণ (বি)—আরূঢ় (বিণ)। বিস্মিত (বিণ)—বিস্ময় (বি)। অভিজ্ঞতা (বি)—অভিজ্ঞ (বিণ)। অগ্নি (বি)—আগ্নেয় (বিণ)।

লিঙ্গান্তর ঃ বর্ষীয়সী—বর্ষীয়ান্। স্ত্রী—স্বামী। বৃদ্ধ—বৃদ্ধা। ছেলে—মেয়ে। জামাই—মেয়ে। প্রতিবেশী—প্রতিবেশিনী। শাশুড়ী—শ্বশুর। গৃহিণী—গৃহকর্তা। কন্যা—জামাতা। মা—বাবা। নাতি—নাতিনী। দাস—দাসী। পিতা—মাতা। রাজপুত্তুর—রাজকন্যা। কবিরাজ—কবিরাজ-পত্নী। বৌদি—দাদা। জমিদার—জমিদারগিন্নী।

শব্দ-দ্বৈত ঃ চাকর-বাকর ; ধুমধাম ; মুছিতে মুছিতে ; মনে মনে ; ফুলিয়া ফুলিয়া ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া ; সঙ্গে সঙ্গে ; বার বার ; কাঁদাকাটি ; হাতে পায়ে ; হুল হুল ; আস্তে আস্তে ; হাঁকা-হাঁকি ; অনুরোধ-উপরোধ ; ধীরে ধীরে।

অলংকার ঃ (অনুপ্রাস) (১) '**পুষ্পে পত্রে, গন্ধে, মাল্যে**' (যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাস)। (২) '**শো**কার্ত **স্বা**মী **শে**ষ পদধূলি দিয়া'। (৩) 'হাত পাতি**য়া** খড়ি কয়টি গ্রহণ করি**য়া** মাথায় ঠেকাই**য়া** উনানে ফেলি**য়া** দি**য়া** কহিল।' (৪) '**অ**ভাগীর **অ**ভাগ্যের দেবতা **অ**গোচরে বসিয়া'। (৫) '**কু**ড়ুল **কা**ড়িয়া লইয়া **ক**হিল'। (৬) **অ**তবড় **অ**সঙ্গত **অ**ত্যাচারের কথা'। (৭) '**উ**ত্তেজনায় **উ**দ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে **উ**পরে **উ**ঠিয়া আসিয়াছিল'।

(৬) অব্যক্ত জীবন (জগদানন্দ রায়)

সন্ধি ঃ পূর্বোক্ত = পূর্ব + উক্ত। শবাধার = শব + আধার। মুণ্ডচ্ছেদ = মুণ্ড + ছেদ। নির্জীব = নিঃ + জীব। বহিরাবরণ = বহিঃ + আবরণ। উদ্ভিদ = উদ্ + ভিদ। বর্ণচ্ছত্র = বর্ণ + ছত্র। নিশ্চলতা = নিঃ + চলতা। স্বেচ্ছায় = স্ব + ইচ্ছায়।

সমাস ঃ শ্বাসযন্ত্র = শ্বাসের যন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সংজ্ঞাহীন = সংজ্ঞা দ্বারা হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। শারীরতত্ত্ববিদগণ = শারীর যে তত্ত্ব (কর্মধারয়), তাহা জানে যে (উপপদ তৎপুরুষ), তাহাদের গণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দেহস্থ = দেহে স্থিত যে (উপপদ তৎপুরুষ)। দেহযন্ত্র = দেহরূপ যন্ত্র (রূপক কর্মধারয়)। জীবনমৃত্যু = জীবন ও মৃত্যু (দ্বন্দ্ব)। শবাধার = শবের আধার (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পূর্বোক্ত =

উক্ত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। একশেষ = এক শেষ যাহাদের (বহুব্রীহি)। উষ্ণশোণিত-যুক্ত = উষ্ণ যে শোণিত (কর্মধারয়) তাহার দ্বারা যুক্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। রাজত্বকাল = রাজত্বের কাল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অঙ্গুলিস্পর্শে = অঙ্গুলির স্পর্শে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহাতে। সংযোগ-বিয়োগ (দ্বন্দ্ব) জড়-পদার্থ = জড় যে পদার্থ (কর্মধারয়)।

কারক ও বিভক্তি ঃ অব্যক্ত-'শক্তিকে'—কর্মে দ্বিতীয়া। 'স্বহস্তে' শবাধারের ডালা ভাঙিয়া—করণে সপ্তমী বিভক্তি। 'সঞ্জীবতা' বুঝিতে গেলে—কর্মে প্রথমা।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ জিজ্ঞাসা = জ্ঞা + সন্ + আ। ক্রিয়া—কৃ + শ, ভাববাচ্যে—আপ্। শক্তি—শক্ + ক্তি, ভাববাচ্যে। আহরণ—আ-হৃ + অন। বিবরণ—বি-বৃ + অনট্, ভাববাচ্যে।

বিপরীত শব্দ ঃ শীতলতা—উষ্ণতা। মৃত—জীবিত। উন্নত—অবনত। আধুনিক—প্রাচীন। নিশ্চিত—অনিশ্চিত। স্পষ্ট—অস্পষ্ট। সংযোগ—বিয়োগ। নিষ্ক্রিয়—সক্রিয়। নিশ্চেষ্ট—সচেষ্ট। বিষ—অমৃত।

(চ) সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুনী

(রেজাউল করিম)

সন্ধি ঃ সমন্বয় = সম্ + অন্বয়। সর্বাঙ্গীণ = সব + অঙ্গীণ। মনোভাব = মনঃ + ভাব। উচ্চাসন = উচ্চ + আসন। দুর্লভ = দুঃ + লভ। নিরপেক্ষ = নিঃ + অপেক্ষ। বিচ্ছিন্ন = বি + ছিন্ন। সদ্ভাব = সৎ + ভাব।

সমাস ঃ দৃষ্টিশক্তি = দৃষ্টির + শক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। আচারপদ্ধতি = আচার ও পদ্ধতি (দ্বন্দ্ব)। শিক্ষাদীক্ষা = শিক্ষা ও দীক্ষা (দ্বন্দ্ব)। মনোভাব = মনের ভাব (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সমন্বয়সাধন = সমন্বয়কে সাধন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। দেশ-বিজয়—দেশকে বিজয় (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। সংস্কৃতি-সমন্বয়—সংস্কৃতির সমন্বয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অপক্ষপাতপূর্ণ = অপক্ষপাতের দ্বারা পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। যুক্তিপূর্ণ = যুক্তি দ্বারা পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। ঈশ্বরপ্রেরিত = ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। জ্ঞানলাভ = জ্ঞানকে লাভ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। প্রভাব = প্রকৃষ্ট ভাব (প্রাদি তৎপুরুষ)।

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি) ঃ বাচ্য ঃ মানবীয় = মানব + ঈয়। বৈশিষ্ট্য = বিশিষ্ট + ঘঞ্। অভিজ্ঞতা = অভি-জ্ঞা + কর্তৃবাচ্যে, তা। প্রেরণা = প্রে-ঈর + অন ভাববাচ্যে—আপ্। পার্থক্য = পৃথক্ + ঘঞ্। পরিশ্রম = পরি-শ্রম্ + ঘঞ্, ভাববাচ্যে। আরাধনা = আ-রা + অন্, ভাববাচ্যে + 'আ'।

বিপরীত শব্দ ঃ আরম্ভ—সমাপ্ত। বৃদ্ধি—হ্রাস। বিখ্যাত—অখ্যাত। নিরপেক্ষ—সাপেক্ষ। পরিত্যাগ—গ্রহণ। মিলন—বিরহ। সদ্ভাব—অসদ্ভাব।

বিদেশী শব্দ ঃ গ্রীক্, ইসলাম, মুসলমান, সুলতান, সুফি, তুর্কি, আলাদা।

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর ঃ সম্প্রদায় (বি), সাম্প্রদায়িক (বিণ)। সহযোগিতা (বি), সহযোগী (বিণ)। ধর্ম (বি), ধার্মিক (বিণ)। উন্মুক্ত (বিণ), উন্মোচন (বি)। কঠোর (বিণ), কঠোরতা (বি)। বৈশিষ্ট্য (বি), বিশিষ্ট (বিণ)। লিখিত (বিণ), লেখা (বি)। শান্তি (বি), শান্ত (বিণ)। ঈশ্বর (বি), ঐশ্বরিক (বিণ)। দর্শন (বি), দার্শনিক (বিণ)।

অলংকার ঃ (অনুপ্রাস) (১) '**সং**স্কৃতি **স**ম্বন্ধে **সা**ধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।' (২) '**অনুবাদের অনুবাদ** তস্য **অনুবাদ**'। (৩) '**বি**শ্বাসের মধ্যে **বি**রোধ **বা**ধিত।' (৪) 'তাঁহাদের **বি**জ্ঞান **বি**ভিন্ন শাখায় **বি**ভক্ত ছিল।' (৫) 'বিভিন্ন **স**ম্প্রদায়ের মধ্যে **সং**স্কৃতিগত **স**মন্বয়, মিলন ও **স**দ্ভাব **স**ম্ভব হইবে।'

[পরিশিষ্ট]

॥ ছন্দ ॥

ছন্দেই কবিতার জন্ম। ছন্দোবদ্ধ রসমধুর বাণীই কবিতা। ভাষাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ যেদিন ভাবপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেইদিন হইতে কিন্তু তাহার অনুসন্ধিৎসার গতি রুদ্ধ হয় নাই। সে নিরন্তর নূতনত্বকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছে। ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া তাহার কানে বাজিয়াছে ভাষার ধ্বনি; যে-ধ্বনির চমৎকারিত্বে সৃষ্টি হইয়াছে তাল ও ছন্দ। ঘুমপাড়ানিয়া গানের মধ্য দিয়া এই ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়াছে এই ছন্দ, কবিতা-লক্ষ্মীর চরণে-চরণে বাজিয়া উঠিয়াছে ছন্দেরই নূপুর-ধ্বনি!

বাংলা কবিতার ছন্দকে আমরা মোটামুটি তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করিতে পারি। যেমন—(১) **অক্ষরবৃত্ত** বা **তানপ্রধান**; (২) **মাত্রাবৃত্ত** বা **ধ্বনিপ্রধান**; (৩) **স্বরবৃত্ত** বা **স্বরাঘাতপ্রধান** বা **ছড়ার ছন্দ**।

এই তিন শ্রেণীর ছন্দ আলোচনা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ অক্ষর, ছেদ, যতি, পর্ব, পর্বাঙ্গ, চরণ, স্তবক, মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা চাই। কেননা, ছন্দের বিশ্লেষণে এইসব কথা বারবার আসিবে।

অক্ষরঃ ইংরেজিতে সিলেবল্ বলিতে যাহা বুঝায়, কবিতায় অক্ষর বলিতে ঠিক তাহাই বুঝাইবে। যেমন, 'বাগান' এই শব্দটি। এখানে 'বা' একটি অক্ষর, 'গান' একটি অক্ষর। কারণ, উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে, আমরা বা+গান্=বাগান—এইভাবেই উচ্চারণ করি। তেমনি, আকাশ=আ+কাশ্; নেমেছে=নে+মে+ছে; শিল্পী=শিল্+পী; জল=জল (অর্থাৎ, একটি অক্ষর); স্ফটিক=স্ফ+টিক্ ইত্যাদি।

অক্ষর আবার দুই রকমের—**স্বরান্ত** ও **হলন্ত**। অর্থাৎ, যে-সকল অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তাহারা স্বরান্ত অক্ষর। যেমন—বা, আ, নে, মে, ছে, পী, স্ফ প্রভৃতি। আর, যে-সকল অক্ষরের শেষে হসন্তধ্বনি থাকে, তাহারা হলন্ত অক্ষর। যেমন—গান্, কাশ্, শিল্, জল্, টিক্ প্রভৃতি। 'জল' শব্দের ক্ষেত্রে জল যেমন হলন্ত অক্ষর; জলজ শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন নয়। সেক্ষেত্রে অক্ষর তিনটি, অর্থাৎ জ+ল+জ; আর, প্রত্যেকটি অক্ষরই স্বরান্ত। কাজেই, উচ্চারণ-ভঙ্গি শুনিয়াই বুঝিতে হইবে কোন্ অক্ষর স্বরান্ত এবং কোন্‌টি হলন্ত।

[আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, স্বরধ্বনি দুই প্রকার—(১) **মৌলিক স্বরধ্বনি** ও **যৌগিক স্বরধ্বনি**। অ, ই, উ প্রভৃতি স্বর মৌলিক,

কিন্তু ঐ (অই), ঔ (অউ), আই, এই, য়েই, ইউ প্রভৃতি স্বর যৌগিক। 'কানাই' এই শব্দে কান্ ও আই এই দুইটি অক্ষর। 'কান্' হলন্ত অক্ষর, আর 'আই' যৌগিক-স্বর বা যৌগিক অক্ষর। কিন্তু 'ভাই' শব্দটি একাক্ষর বা দুই-অক্ষর সমন্বিত। অর্থাৎ, 'ভাই' বলিলে হইবে স্বরান্ত একাক্ষর। আবার, ভা+আই এইভাবে টানিয়া বলিলে হইবে দুই অক্ষরের শব্দ। অর্থাৎ, 'ভা' স্বরান্ত অক্ষর, এবং 'আই' যৌগিক অক্ষর।]

ছেদঃ কবিতা আবৃত্তির সময় আমরা একনাগাড়ে সব বলিয়া যাই না, নিশ্বাস গ্রহণ ও বক্তব্যের অর্থ বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে থামি; কখনও সামান্যক্ষণের জন্য, কখনও বা একটু বেশি। ছন্দোবিজ্ঞানে কথা-বলার এই বিরতিকেই বলা হইয়াছে **ছেদ**। প্রধানত উচ্চারণের সুবিধার জন্যই এই ছেদ-এর প্রয়োজন হয়। যেমন—

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।"

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র এই প্রথম লাইনটি আবৃত্তি করিবার সময় আমরা কয়বার থামি ও কিভাবে? চার বার থামি এবং এইভাবে—

শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবই গেছে | ঋণে ॥

অর্থাৎ, প্রথম তিনবার থামি সমান অল্প সময়, কিন্তু শেষবার থামিতে হয় একটু বেশি। যেখানে যেখানে থামিলাম, সেখানে সেখানেই একটি করিয়া ছেদ পড়িল। বাক্যের মধ্যে সাধারণত ছেদ বা উপচ্ছেদ পড়ে, আর বাক্যের শেষে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্—

(১) কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্ ॥ —কাশীরাম দাস

(২) অঘ্রাণে শীতের রাতে | নিষ্ঠুর শিশির-ঘাতে | পদ্মগুলি গিয়াছে ম | রিয়া ॥ —রবীন্দ্রনাথ

(৩) রাজার নির্দেশে | শিল্পী রচিছে | দেউল কাঞ্চী | পুরে ॥ —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৪) সবাই যখন | বুদ্ধি যোগায় | আমরা করি | ভুল ॥ —কাজী নজরুল

(৫) জীবের মঙ্গল হেতু | তোমার জনম ॥ —রজনীকান্ত সেন

এই সকল উদাহরণে যেখানে এক দাঁড়ি (।) দেওয়া হইয়াছে সেখানে পড়িয়াছে ছেদ বা উপচ্ছেদ, এবং যেখানে দুই দাঁড়ি (॥) দেওয়া হইয়াছে সেখানে পড়িয়াছে পূর্ণচ্ছেদ।

যতিঃ যতিও কথা-বলার একরকম বিরতি। কিন্তু ছেদ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। অনেকে ছেদ ও যতিকে এক মনে করিয়া ভুল করে। ছন্দের ক্ষেত্রে এইরূপ

ভুল করা সঙ্গত নয়। সহজভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এক ঝোঁকে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় যেখানে সেই ঝোঁকের শেষ হয়, সেখানেই যতি পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আবার যতি ও ছেদ একই জায়গায় পড়িতে পারে। কিন্তু, তাই বলিয়া যতি ও ছেদকে এক মনে করিবার হেতু নাই। যতি দুই প্রকার—**অর্ধযতি** (*) ও **পূর্ণযতি** (**)।

একাকিনী শোকাকুলা * অশোক কাননে * *
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে * *
নীরবে * * ॥ —মাইকেল মধুসূদন

এখানে 'একাকিনী শোকাকুলা'-র পরে পড়িয়াছে অর্ধযতি, কিন্তু পূর্ণযতি পড়িয়াছে 'অশোক কাননে'-র পর। এ-পর্যন্ত কোনো ছেদ পড়ে নাই। ছেদ বা উপচ্ছেদ পড়িয়াছে 'কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা' বলিবার পর। বলিবার ঝোঁক অনুসারে সেখানে অর্ধযতিও পড়িয়াছে। পূর্ণযতি আবার পড়িয়াছে 'আঁধার কুটীরে'-র পর, এবং 'নীরবে' আসিয়া পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি একই সঙ্গে পড়িয়াছে।

সবাই.যখন * | বুদ্ধি যোগায় * * | আমরা করি | ভুল * ॥
—কাজী নজরুল

এখানে কোথায় কিভাবে যতি ও ছেদ পড়িয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

[যে ভালোভাবে কবিতা পড়িতে পারিবে না, তাহার পক্ষে যতি ও ছেদ ঠিক জায়গায় ফেলিয়া কবিতা আবৃত্তি সম্ভব নয়। কাজেই, এ-বিষয়ে অনুশীলন প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, **অর্থানুসারে পড়ে 'ছেদ', আর জিহ্বার সামর্থ্য অনুসারে পড়ে 'যতি'**।

পর্ব ও পর্বাঙ্গ : উচ্চারণের সময় এক এক বারের ঝোঁকে কবিতার যতটা উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলা হয় পর্ব। অর্থাৎ যতি দ্বারা বিভক্ত বাক্যের অংশই **পর্ব**। আর, পর্বাঙ্গ হইল **পর্বের অংশ**। যেমন—

(১) একটি শুধু * | পয়সা দিয়ে * | বকেছিলাম * | কত ** ॥
—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

(২) ঈশ্বরীরে : জিজ্ঞাসিল * : ঈশ্বরী : পাটনী ** ॥
—ভারতচন্দ্র

(৩) নব বৎসরে * | করিলাম পণ * | লব স্বদেশের * ॥ দীক্ষা **
—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম উদাহরণে, 'একটি শুধু', 'পয়সা দিয়ে,' 'বকেছিলাম,' 'কত'—ইহারা এক-একটি পর্ব। দ্বিতীয় উদাহরণে, 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল' একটি পর্ব এবং অন্য পর্ব হইল 'ঈশ্বরী পাটনী'। আর, প্রথম পর্বে 'ঈশ্বরীরে' ও 'জিজ্ঞাসিল' দুইটি পর্বাঙ্গ এবং

দ্বিতীয় পর্বে 'ঈশ্বরী' ও 'পাটনী' আর দুইটি পর্বাঙ্গ। তৃতীয় উদাহরণে সেইরকম 'নব বৎসরে', 'করিলাম পণ', 'লব স্বদেশের' ও 'দীক্ষা' এই চারিটি পর্ব।

এই পর্ব-ই হইল বাংলা ছন্দের অন্যতম প্রধান কথা। কারণ, ছন্দের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে এই পর্বের উপরে।

চরণ : সাধারণ কথায় কবিতার লাইন বা 'পঙ্‌ক্তি'কেই আমরা কবিতার 'চরণ' বলি। কিন্তু, সব সময় 'লাইন' বা 'পঙ্‌ক্তি'কে চরণ বলা যায় না। যেমন—ত্রিপদী ছন্দের কবিতা প্রায়ই লেখা হয় দুই লাইনে বা তিন 'পঙ্‌ক্তি'তে। যেমন—

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্য মন।

—নবীনচন্দ্র সেন

এখানে দুই লাইনে বা তিন পঙ্‌ক্তিতে সাজানো হইলেও, 'একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন।'—এই পর্যন্তই একটি চরণ। কাজেই, আমাদের বলা উচিত যে, কবিতার 'চরণ' (বা 'পদ') কয়েকটি পর্ব লইয়া গঠিত হয়। যেমন, উপরের উদাহরণে 'একদিন নিরজনে', 'মনোহর পুরোদ্যানে', 'সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা' ও 'বসি' অন্যমন' এই চারিটি পর্ব লইয়াই কবিতার একটি 'চরণ' (বা পদ) গঠিত হইয়াছে। সেইরকম—

কোথায় স্বর্গ কোথায়, নরক! কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক,—মানুষেতে সুরাসুর।

—শেখ ফজলল্ করিম

এখানে 'কোথায় স্বর্গ' হইতে 'বহুদূর' পর্যন্ত একটি চরণ, এবং 'মানুষেরি মাঝে' হইতে 'সুরাসুর' পর্যন্ত আর একটি চরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে চারিটি করিয়া পর্ব আছে। যেমন—প্রথম চরণে (১) 'কোথায় স্বর্গ'; (২) 'কোথায় নরক'; (৩) 'কে বলে তা' ও (৪) 'বহুদূর'; এবং দ্বিতীয় চরণে (১) 'মানুষেরি মাঝে'; (২) 'স্বর্গ নরক'; (৩) 'মানুষেতে' ও (৪) 'সুরাসুর'।

স্তবক : কয়েকটি চরণ লইয়া কবিতার একটি স্তবক (স্ট্যান্‌জা) গঠিত হয়।

মাত্রা : মাত্রা বলিতে আমরা বুঝি পরিমাণ। যেমন কথার মাত্রা, ওষুধের মাত্রা, রাগের মাত্রা, ইত্যাদি। কবিতাতেও মাত্রা তেমনি ছন্দের পরিমাণ প্রকাশ করে। মাত্রার উপরেই ছন্দের সার্থকতা। একটি হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকেই বলা যায় কবিতার মাত্রা। সাধারণত হ্রস্বস্বরকে এক মাত্রার ও দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রার ধরা হয়। মৌলিক স্বরান্ত

অক্ষর একমাত্রিক এবং যৌগিক অক্ষর কখনও একমাত্রার, কখনও বা দুইমাত্রার, যেমন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আপনারে ল'য়ে | বিব্রত রহিতে |

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আসে নাই কেহ | অবনী প'রে।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সকলের তরে | সকলে আমরা— |

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১
প্রত্যেকে আমরা | পরের তরে ॥ —কামিনী রায়

এখানে ৬+৬ ; ৬+৫ ; ৬+৬ ও ৬+৫ এইভাবে পর্বের মাত্রা রহিয়াছে

আ=১ ; প=১ ; না=১ ; রে=১, অর্থাৎ আপনারে=৪ ; ল=১, য়ে=১ অর্থাৎ লয়ে=২। অতএব 'আপনারে লয়ে' এই পর্ব ৬ মাত্রার। তেমনি, বি=১ ; ব্র (যৌগিক অক্ষর)=১ ; ত=১ অর্থাৎ বিব্রত=৩, এবং র=১, হি=১, তে=১ অর্থাৎ রহিতে=৩। অতএব, 'বিব্রত রহিতে' এই পর্বও ৬ মাত্রার। কিন্তু দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্ব 'আসে নাই কেহ' ৬ মাত্রার হইলেও, 'অবনী 'পরে' ৫ মাত্রার। আর তৃতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ৬+৬ মাত্রার হইলেও, চতুর্থ চরণের পর্ব দুইটি ৬+৫ মাত্রার। কাজেই, দেখা যাইতেছে—এই স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণ হইল ৬+৬ ও ৬+৬ মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ৬+৫ ও ৬+৫ মাত্রার। অর্থাৎ, মাত্রার সমতা বজায় আছে। আর সেইজন্য ছন্দও ঠিক হইয়াছে। [মনে রাখিতে হইবে, যেখানেই মাত্রার গরমিল হয়, সেখানেই ছন্দোপতন হয়। কাজেই, মাত্রার সমতার উপরেই যে ছন্দের সাফল্য নির্ভর করে, তাহা না বলিলেও চলে।]

অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান-ছন্দ

এই জাতীয় ছন্দকে পয়ার-জাতীয় ছন্দও বলা যায়। এই ছন্দের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—একটানা একটা বিলম্বিত সুর, প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব এবং সাধারণত ১৪ মাত্রার চরণ। কখনও কখনও অবশ্য ১৬ বা ১৮ মাত্রার চরণও দেখা যায়। এই ছন্দে যেমন যুক্তাক্ষরহীন চরণ দেখা যায় ; তেমনি দেখা যায় যুক্তাক্ষরবহুল চরণ। এই জাতীয় ছন্দে, প্রত্যেকটি অক্ষরকে (বা সিলেবল্) ধরা হয় এক মাত্রার ; কিন্তু, অন্ত্য-হলন্ত অক্ষরকে ধরা হয় দুই মাত্রার।

কয়েকটি উদাহরণ লইলেই, বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

১ ২ ১২ ১ ১ ১ ১ ২ ২
(১) বাহির করেন সীতা—আপনার হার।

১ ১১ ১ ২ ১ ১ ১১ ২ ২
কী কব তাহার মূল্য। ভুবনের সার— —কৃত্তিবাস ওঝা

এখানে ৮+৬ করিয়া ১৪ মাত্রার দুইটি চরণ। প্রথম চরণে 'বাহির করেন সীতা' ও 'আপনার হার' এই দুইটি পর্ব। দ্বিতীয় চরণেও তেমনি দুইটি পর্ব—'কী কব তাহার মূল্য' ও 'ভুবনের সার'। বাহির—বা+হির। কাজেই স্বরান্ত 'বা' অক্ষর ১ মাত্রার, কিন্তু হলন্ত 'হির্' অক্ষরটি ২ মাত্রার। তেমনি, করেন=ক+রেন। ক=১ মাত্রা; রেন্=২ মাত্রা। সীতা—সী+তা। কাজেই, সী=১ মাত্রা; তা=১ মাত্রা। 'আপনার' শব্দটিতে ৩টি অক্ষর—আ+প+নার্। 'আ' ও 'প' স্বরান্ত অক্ষর। কাজেই, উহাদের প্রত্যেকটি এক এক মাত্রার। কিন্তু 'নার্' যখন হলন্ত অক্ষর, তখন উহা দুই মাত্রার ধরিতে হইবে। সেইরকম, 'হার্'-ও দুই মাত্রার। দ্বিতীয় চরণে কী=১ মাত্রার; কব=ক+ব, অর্থাৎ ১+১ মাত্রার; তাহার=তা+হার, অর্থাৎ ১+২ মাত্রার। মূল্য বলিতে মূল+ল। যদিও 'মূল' হলন্ত অক্ষর, তথাপি উহা দুই মাত্রার নয়। কারণ, উহা অন্ত্য হলন্ত অক্ষর নয়। কাজেই, মূল্=১ মাত্রা এবং ল=১ মাত্রা। 'ভুবনের' বলিতে ভু+ব+নের; তাই, উহা ১+১+২ মাত্রার হইয়াছে। আর, 'সার্'-ও যখন অন্ত্য হলন্ত অক্ষর, তখন উহাকে দুই মাত্রারই ধরিব। কাজেই দেখা যাইতেছে, এই স্তবকে দুইটি চরণ, প্রত্যেক চরণে দুইটি করিয়া পর্ব এবং প্রত্যেক চরণের প্রথম পর্ব ৮ মাত্রার ও দ্বিতীয় চরণ ৬ মাত্রার। বিলম্বিত একটা সুর বা তানও আছে এই কবিতায়। অতএব ইহাকে আমরা অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ বলিতে পারি।

১১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
(২) শুধু বিঘে দুই। ছিল মোর ভুঁই,।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আর সবি গেছে ঋণে,

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২
বাবু বলিলেন,। —বুঝেছ উপেন!।

১ ১ ১ ১১১ ১ ১
এ-জমি লইব। কিনে।। —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই স্তবকটিও অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে রচিত। এই স্তবকে চারিটি চরণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণ ৬+৬ মাত্রার দুইটি করিয়া পর্ব আছে। আর, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে ৬+২ মাত্রার দুইটি করিয়া পর্ব। অর্থাৎ, এই স্তবকটি ৬+৬+৬+২ ; ৬+৬ ও ৬+২ এইরূপ মাত্রা-সমন্বিত। ⌣ চিহ্নিত অক্ষরগুলি অন্ত্য হলন্ত অক্ষর, কাজেই উহারা প্রত্যেকেই দুই মাত্রার অক্ষর।

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১
(৩) চন্দ্রচূড় জটাজালে | আছিলা যেমতি ॥

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ২
জাহ্নবী ভারত-রস | ঋষি দ্বৈপায়ন, ॥

১ ১ ১ ২ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে | রাখিলা তেমতি, ॥

১ ২ ১ ২ ১১   ১ ১ ১ ১ ২
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ | করিত রোদন। ॥ —মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদনের অমিতাক্ষর জাতীয় কবিতার এই স্তবকটিও অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে রচিত। এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব এবং প্রথম পর্বগুলির মাত্রা ৮ ও দ্বিতীয় পর্বগুলির মাত্রা ৬, অর্থাৎ ৮+৬ মাত্রার চরণ।

[চন্‌+দ্র+চূড় (চন্দ্রচূড়)=১+১+২ মাত্রা ; চন্‌ হলন্ত অক্ষর হইলেও অন্ত্য হলন্ত অক্ষর নয়, কাজেই উহা একমাত্রিক। জা+হ্ন+বী (জাহ্নবী)=১+২+১ মাত্রা। ভারত এখানে ভা+র+ত, ভা+রত্‌ নয় ; কাজেই ১+১+১ মাত্রা। দ্বৈ+পা+য়ন্‌ (দ্বৈপায়ন)=১+১+২ মাত্রা ; য়ন্‌ অন্ত্য হলন্ত অক্ষর। সং+অস্‌+কৃ+ত (সংস্কৃত)=১+১+১+১ মাত্রা ; সং ও অস্‌ অন্ত্য হলন্ত অক্ষর নয় বলিয়াই এখানে এক এক মাত্রার। তৃষ্‌+ণায় (তৃষ্ণায়)=১+২ ; তৃষ্‌ ১ মাত্রার, কারণ উহা হলন্ত হইলেও, অন্ত্য হলন্ত অক্ষর নয় ; কিন্তু ণায় অন্ত্য হলন্ত অক্ষর, তাই দ্বিমাত্রিক। বঙ্‌+গ (বঙ্গ)=১+১ মাত্রা। কিন্তু, রো+দন্‌ (রোদন) =১+২ মাত্রা।]

প্রাচীন কবিরা সাধারণত এই ছন্দেই কবিতা রচনা করিতেন।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান-ছন্দ

ধ্বনির পরিমাণের উপরেই যে-ছন্দ নির্ভর করে, তাহাকেই বলা হয় ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। সাধারণত যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘ ও অপরাপর অক্ষরকে

হ্রস্ব ধরা হয় এই ছন্দে। মাত্রার বিচারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। কারণ, বাংলা কবিতার সমস্ত ছন্দই সমমাত্রিক পর্ব লইয়া গঠিত হয়। অর্থাৎ, যে যে চরণে মিল হইবে তাহাদের পর্বগুলি হইবে সমান মাত্রার। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে আসল যে-পার্থক্য, তাহা তাল ও ধ্বনি সম্পর্কিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের মতো, একটানা কোনো সুর বা তান নাই; এই ছন্দে ধ্বনিই প্রধান। তাই এই জাতীয় ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান-ছন্দ বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয়।

এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল—শব্দের মধ্য ও অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে সর্বদা দুই মাত্রার ধরা হয়; যৌগিক অক্ষরের ধ্বনি এখানে দীর্ঘ বলিয়া যৌগিক অক্ষরও দ্বিমাত্রিক; প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটু ঝোঁক পড়ে; আর প্রত্যেক চরণ দুই বা তাহার বেশি পর্বে বিভক্ত হইতে পারে। যেমন—

(১) ২ ১ ১ ১ ১ /১ ১ ২ ১ ১ /১ ২ ১ ১ ১ /১ ১
উমরাটিপুরে | সুবেদার-গৃহে | সেদিন বাজিছে | বাঁশি |

/১ ১ ১ ২ ১ /২ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১১ ১ ১
তানাজী-পুত্র | রায়বার বিয়ে | প্রমত্ত পুর | বাসী |

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অর্থাৎ ৬+৬+৬+২ মাত্রার দুইটি চরণ। প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটু ঝোঁক পড়িতেছে; প্রত্যেক চরণে দুইয়ের বেশি পর্ব, এবং মধ্য ও অন্ত্য হলন্ত অক্ষরগুলিকে এখানে দুই মাত্রার ধরা হইয়াছে। কাজেই, ইহা মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দের।

উমরাটিপুরে = উম্+রা+টি+পু+রে, অর্থাৎ মধ্য হলন্ত অক্ষর উম্ এখানে ২ মাত্রার, বাকি সব ১ মাত্রার। গৃহে = গৃ+হে, তাই ১+১ মাত্রার। গৃ = গ্+ ঋ, অর্থাৎ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর (ইহাকে যৌগিক অক্ষর বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে)। পুত্র = পুৎ+র; কাজেই ২+১ মাত্রার। রায়বার = রায়+বার, তাই ২+২ মাত্রার। প্রমত্ত = প্র+মৎ+ত, অর্থাৎ ১+২+১ মাত্রা হইয়াছে এইখানে। পুর এখানে পু+র, পুর্ নহে। তাই, এক এক মাত্রার।

২ ১ ২১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১
(১) শীর্ষে শুভ্র | তুষার-কিরীট, | সাগর-ঊর্মি | ঘেরিয়া জঙ্ঘা |

১ ২ ১ ১ ১ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ১১১ ২ ১
বক্ষে দুলিছে | মুক্তার হার | পঞ্চ সিন্ধু | যমুনা গঙ্গা। |

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এখানে প্রত্যেকটি পর্ব ৬ মাত্রার। আর, প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ ঝোঁক আছে। অর্থাৎ,—

/ / / /
শীর্ষে শুভ্র | তুষার-কিরীট | সাগর-ঊর্মী | ঘেরিয়া জঙ্ঘা, |

/ / / /
বক্ষে ঝুলিছে | মুক্তার হার | পঞ্চসিন্ধু | যমুনা গঙ্গা। |

তাছাড়া শব্দগত ধ্বনির প্রাধান্য তো সুস্পষ্ট।

[শীর্ষে = শীর্ + ষে = ২ + ১ মাত্রা। শুভ্র = শুভ্ + র = ২ + ১ মাত্রা। তুষার = তু + ষার্ = ১ + ২ মাত্রা। কিরীট = কি + রীট্ = ১ + ২ মাত্রা। সাগর = সা + গর্ = ১ + ২ মাত্রা। ঊর্মি = উর্ + মি = ২ + ১ মাত্রা। জঙ্ঘা = জঙ্ + ঘা = ২ + ১ মাত্রা। বক্ষে = ব + ক্ষে = ১ + ২ = ৩ মাত্রা; এখানে ক্ষে একটি যৌগিক অক্ষর। অথবা. বক্ + ষে = বক্ষে এইভাবে অক্ষর ভাগ করিলেও, উহা ২ + ১ মাত্রার, একুনে ৩ মাত্রার হইবে। মুক্তার = মুক্ + তার = ২ + ২ মাত্রা। হার্ = ২ মাত্রা পঞ্চসিন্ধু = পঞ্ + চ + সিন্ + ধু = ২ + ১ + ২ + ১ মাত্রা। গঙ্গা = গঙ্ + গা = [illegible]

(৩) /২ ১ ১ ২ /১১ ২ ১ ১
একটি ইটের | আধখানা বোঝা

/১ ১ ১ ১ ১ ১ /১ ১
পাশাপাশি থাকি | শুয়ে।

/১ ১ ২ ২ /১ ১ ১ ১ ২
এ-ছাদের জল | ও-ছাদে গড়ায়।

/২ ১ ১ ১ ১ /১ ১
ভিত্ গড়া একই | ভুঁয়ে। | —প্রেমেন্দ্র মিত্র

এটিও মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দের একটি স্তবক। চারিটি পঙ্‌ক্তিতে সাজানো হইলেও আসলে দুইটি চরণ। প্রত্যেক চরণে সাড়ে তিনটি পর্ব। প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটা ঝোঁকও আছে। আর, পর্বগুলির মাত্রা সমান, অর্থাৎ ৬ + ৬ + ৬ + (২)। শেষের পর্বটি ভাঙ্গা, তাই উহাকে আলাদাভাবেই ধরিতে হইবে। যে চরণের সহিত উহার মিল, তাহাতেও শেষ পর্বটি ভাঙ্গা, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের এই শেষ পর্ব দুইটির মাত্রা সমান। মধ্য ও অন্ত্য হলন্ত অক্ষরগুলিও দ্বিমাত্রিক।

[একটি = এক্ + টি = ২ + ১ মাত্রা। ইটের = ই + টের্ = ১ + ১ মাত্রা। ব্যবধান = ব্য + ব + ধান্ = ১ + ১ + ২ মাত্রা। এ-ছাদের = এ + ছা + দের্ = ১ + ১ + ২ মাত্রা। জল্ = ২ মাত্রা। গড়ায় = গ + ড়ায়্ = ১ + ২। ভিত্ = ২ মাত্রা। একই = (এবি) = ১ + ১ মাত্রা।]

স্বরবৃত্ত বা স্বরাঘাত-প্রধান-ছন্দ

তৃতীয় এই ছন্দটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। ইহার সহিত আগেকার দুইটি ছন্দের কোনো মিল নাই। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক পর্বের প্রথমেই একটা প্রবল স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত পড়িবে। অনেকে তাই ইহাকে 'শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দও' বলেন। (ছড়া-জাতীয় বেশির ভাগ কবিতাই এই ছন্দে রচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ এই ছন্দের নামকরণ করিয়াছেন—'ছড়ার ছন্দ'।)

এই ছন্দের মাত্রা-বিচারে কোনো ভেদ ধরা হয় না। অর্থাৎ, এই জাতীয় ছন্দে, প্রত্যেক অক্ষরই এক মাত্রার—স্বরান্তই হউক, মধ্য বা অন্ত্য হলন্তই হউক, কিংবা যৌগিকই হউক। তাছাড়া, প্রত্যেক পর্বের মাত্রা-সংখ্যা একই ধরনের, অর্থাৎ ৪-মাত্রার। ভাঙ্গা-পর্ব থাকিলে অবশ্য তাহা এক বা দুই মাত্রার হয়। এই জাতীয় ছন্দে, প্রতি চরণে সাধারণত চারিটি পর্ব থাকে এবং শেষ পর্বটি হয় ভাঙ্গা বা অপূর্ণ যেমন—

/১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ ১
(১) আকাশ জুড়ে | চল নেমেছে | সূয্যি চলে | ছে

/১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ ১
চাঁচর চুলে | জলের গুঁড়ি | মুক্ত ফলে | ছে —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অর্থাৎ, ৪ + ৪ + ৪ + ১ মাত্রার চরণ

[আ + কাশ্ = ১ + ১ মাত্রা। চল্ = ১ মাত্রা। সূয্যি = সূয্ + যি = ১ + ১ মাত্রা। চাঁচর = চাঁ + চর্ = ১ + ১ মাত্রা। জলের = জ্ + লের = ১ + ১ মাত্রা। মুক্ত = মু + ক্ত বা মুক্ + ত = ১ + ১ মাত্রা।]

১/ ১ ১ ১ | /১ ১ ১ ১ /১১ ১ ১ /১১
(২) ঐ এলো রে | মোদের দোরে | দুষ্টু মেয়ে | বৃষ্টি |

/১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১
জাগিয়ে দিয়ে | মাতিয়ে দিয়ে | ভাসিয়ে দিয়ে | সৃষ্টি

—কৃষ্ণদয়াল বসু

এখানে, ৪ + ৪ + ৪ + ২ মাত্রার চরণ।

[মোদের = মো + দের = ১ + ১ মাত্রা। দুষ্টু = দুষ্ + টু = ১ + ১ মাত্রা। বৃষ্টি = বৃষ্ + টি = ১ + ১ মাত্রা। জাগিয়ে = জাগ্ + ইয়ে (ইএ)। প্রথমটি মধ্য হলন্ত অক্ষর, পরেরটি যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর, তাই এক এক মাত্রার। সেইরকম—মাতিয়ে = মাত্ + ইয়ে (ইএ) = ১ + ১ মাত্রা। ভাসিয়ে = ভাস্ + ইয়ে (ইএ) = ১ + ১ মাত্রা। সৃষ্টি = সৃষ্ + টি = ১ + ১ মাত্রা।]

/১ ১ ১ ১ /১১১ ১ /১ ১ ১১ /১ ১
(৩) মা কেঁদে কয় | মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে |

/১১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১১১ ১ /১ ১
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে ? | বয়সে ওর | চেয়ে |

/১ ১ ১ ১ ১১
পাঁচ গুণে সে | বড়

/১ ১ ১ ১ /১১ ১ ১ /১ ১ ১১ /১১
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড় | —রবীন্দ্রনাথ

এখানে, চরণগুলি চতুর্মাত্রিক পর্বে বিভক্ত। অর্থাৎ ৪ + ৪ + ৪ + ২ মাত্রার। তৃতীয় চরণটি কেবল ৪ + ২ মাত্রার হইলেও সমগোত্রীয়।

[কয়্ = ১ মাত্রা। মঞ্জুলী = মন (ঞ্) + জু + লী = ১ + ১ = ১ মাত্রা। মোর্ = ১ মাত্রা। ঐ = ওই (যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর) = ১ মাত্রা। ওর্ = ১ মাত্রা। পাঁচ্ = ১ মাত্রা। আমার = আ + মার্—১ + ১ মাত্রা। ভয়েই = ভ + য়েই (এই, অর্থাৎ যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর) = ১ + ১ মাত্রা।]

তিনটি বিভিন্ন ছন্দে একই বিষয়বস্তু

(ক) **অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেঃ**

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১১১.১ ১
প্রেমের আসনে যারে করেছ বরণ

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
মরণ কি পারে তারে | করিতে হরণ ? |

অর্থাৎ, ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার পয়ার জাতীয় কবিতার ছন্দে এই চরণ দুইটি রচিত হইয়াছে।

(খ) **মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে :**

/১ ২ ১ ১ ১ /১ ২ ১ ১ ১ /১ ১
প্রেমের আসনে | বরণ করেছ | যারে, |

/১ ২ ১ ১ ১ /১ ২ ১ ১ ১ /১ ১
মরণ কি তারে | হরণ করিতে | পারে ? |

অর্থাৎ, ৬+৬+২ মাত্রার চরণ এবং প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটা ঝোঁকও আছে।

(গ) **স্বরবৃত্ত বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে :**

/১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১'
বরণ যাকে | করলে তুমি | প্রেমের আসন 'পরে, |

/১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১ ১ ১ /১ ১
মরণ এসে | আর কি তাকে | ভুলেও হরণ | করে ? |

এখানে, ৪+৪+৪+৪+২ মাত্রার চরণ, প্রতি পর্বের প্রথমেই প্রবল স্বরাঘাত। আর, সমস্ত অক্ষরই এখানে একমাত্রার। (ভুলেও = ভু+লেও = ভুল্+এও = ১+১ মাত্রা।)

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যিক বাংলা প্রশ্নপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬১

বাংলা

১। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বীরধর্মের কথা বারবার বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সব্যসাচী আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বীরধর্মের পরিচয় ও সব্যসাচী আখ্যার সার্থকতা কতটা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আলোচনা কর।

অথবা

"আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি,—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।"—'শুভ উৎসব' নিবন্ধ অবলম্বন করিয়া বলেন্দ্রনাথের এই উক্তিটির ভাব, নিজের মন্তব্য সহ, সম্প্রসারিত কর।

২। প্রসঙ্গসূত্র নির্দেশপূর্বক যে কোন **দুইটি** উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

(খ) সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া কতকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদও করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে।

(গ) সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভ্যজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক, কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না।

৩। মৌলবী রেজাউল করিম তাঁহার নিবন্ধে লিখিয়াছেন—'সংস্কৃতি ধর্ম হইতে আলাদা বস্তু।' লেখক ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে সংস্কৃতির কি ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।

অথবা

'অব্যক্ত জীবন' প্রবন্ধে আছে—"জীবতত্ত্ববিদ্গণ জীবনীশক্তির এই রাসায়নিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—।" কোন্ রাসায়নিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া তাঁহারা কি বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত কর।

৪। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় কবি বর্ষাঋতুর সৌন্দর্য ও গৌরব কিরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা সরল ভাষায় বিবৃত কর।

অথবা

'কাজী নজরুল ইসলাম লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ব্যথিত, পতিতের কবি বলিয়া পরিচিত।' 'ফরিয়াদ' কবিতা সম্বন্ধে এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

৫। প্রসঙ্গসূত্র নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

অথবা

শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি,
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন **একটিকে** অবলম্বন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখ :—

(ক) লোকশিক্ষা (প্রাচীন যুগ ও বর্তমান যুগ)।
(খ) বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান।
(গ) একটি সভার অনুষ্ঠান।

৭। পদাবলী সাহিত্য ও তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা

বাংলার নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখ।

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন **চারিটি** সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পরিচয় দাও :—

(ক) কাশীরামের মহাভারত, (খ) কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, (গ) বীরাঙ্গনা কাব্য, (ঘ) পলাশীর যুদ্ধ, (ঙ) নীলদর্পণ, (চ) বৃত্রসংহার।

৮। যে-কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ :—

(ক) যে কোন **পাঁচটির** উদাহরণ দাও :—

অপত্যার্থে তদ্ধিত পদ, করণ কারকে 'এ' বিভক্তি, নিপাতনে সন্ধি, দন্ত্যবর্ণ, কৃদন্ত বিশেষণ, বাক্যালঙ্কারে অব্যয়পদ, ব্যতিহার বহুব্রীহি, বিভক্তিশূন্য অধিকরণ কারক, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, নামধাতু।

(খ) যে কোন **পাঁচটির** সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

ব্যুৎপন্ন, উত্তমর্ণ, অনূদিত, মন্বন্তর, প্রাতরাশ, শীতার্ত, শিরশ্ছেদ, উচ্ছৃঙ্খল।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির **পাঁচটির** ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—

সৌর, জাজ্বল্যমান, মহিমা, সবিতা, ত্বরিত, তাড়িত, শয়ান, দৌরাত্ম্য।

(ঘ) ব্যাসবাক্য সহ **পাঁচটির** সমাস নির্ণয় কর :—

কদাচার, বেয়াদব, গরমিল, আবাল্য, শতাব্দী, সুধী, আত্মস্থ, গায়েহলুদ, গোঁজামিল, পঞ্চবটী।

(ঙ) যে কোন **পাঁচটির** স্ত্রীলিঙ্গের রূপ দেখাও :—

আবিষ্কর্তা, আচার্য, শারদ, সারদ, বিদ্বান্, বিদূষক, সুশ্রী, নিরপরাধ।